সাতরঙ

প্রথম খণ্ড

রবি বসু



মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৯৬

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—গৌতম রায়
মুদ্রণ—ব্লকম্যান প্রসেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

এতে আছে

সবিনয় নিবেদন

অবশেষে আমার দীর্ঘকালের একটি আক্ষেপের অবসান ঘটল। আমার সাংবাদিক জীবনের সূচনায় বিভিন্ন চলচ্চিত্র পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কালে চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানবার আগ্রহ জন্মায়। তারও বহু পূর্বে, কিশোর বয়সে, রূপালী পর্দাব বুকে প্রতিফলিত শিল্পীদের সম্পর্কে আমার কৌতূহল জেগে ওঠে। কিন্তু সাংবাদিক জীবনে সেই কৌতূহল নিরসনের জন্য অনেক খোঁজখবর করেও তেমন কোন বই হাতেব কাছে পাইনি। যাও বা দু-একটি পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সেগুলি এতই অকিঞ্চিৎকর যে তার সাহায্যে আমার কৌতূহল আদৌ নিবৃত্ত হয নি। তখন থেকেই মনে মনে ভাবতাম, শিল্পীদের জীবনের অজানা তথ্য জানবাব জন্য কোন বই থাকলে কতই না ভালো হতো।

সেই জাতীয় কোন বই যে আমিই রচনা করব তেমন কোন বাসনা আমার কোনকালেই ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে সে ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করতে থাকেন 'বর্তমান' পত্রিকার শ্রীমতী কাকলি চক্রবর্তী। মূলত তাঁরই উৎসাহে এবং ক্রমাগত তাগাদায় আমি ধারাবাহিক ভাবে 'স্মৃতির সরণিতে' পর্যায়ে ছায়াছবিব শিল্পীদের সম্পর্কে রচনাগুলিতে প্রবৃত্ত হই। তবে সেই ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমাকে দীর্ঘ একটি বছর অপেক্ষা করতে হয়।

এই লেখাগুলি প্রকাশ পাবাব সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা একের পর এক চিঠি লিখে আমাকে উৎসাহিত করতে থাকেন। মূলত তাদের উৎসাহেই আমি প্রায় দীর্ঘ চার বছর যাবৎ একের পর এক শিল্পীকে নিয়ে লিখে যেতে পেরেছি। অনিবার্য কারণে দু-একবার সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে যাওয়ায পাঠকমহল তীব্রভাবে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। চিঠিপত্রের মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। একজন লেখকের কাছে পাঠকের এই প্রতিক্রিয়া বিরল সৌভাগ্য বলেই মনে করি।

যাঁরা এই রচনাগুলিকে শিল্পীদের জীবনী ভেবে পড়া শুরু করবেন তাঁরা কিঞ্চিৎ হতাশ হতে পারেন। এইসব রচনাগুলিকে শিল্পীদের জীবনকাহিনী বলাই বোধহয় সঙ্গত হবে। ছায়াছবির শিল্পীদের আপাত চাকচিক্য, গ্ল্যামার এবং জনপ্রিয়তার আড়ালে যে সব মানুষগুলি লুকিয়ে আছেন তাঁদেরই খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছি আমি। কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল তাঁদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয়েছে। সে সময়ে আমি তাঁদের জীবনের সংগ্রাম, ক্ষোভ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা এবং বঞ্চনার যে সব ঘটনা শুনেছি, সেটাই আজ এতকাল পরে স্মৃতির সঞ্চয় থেকে উদ্ধার করে পরিবেশনের চেষ্টা করেছি। জানিনা সফল হয়েছি কি না। সে বিচারের ভার পাঠকদের ওপর। তবে ধারাবাহিক ভাবে এই রচনাগুলি প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি পাঠকদের কাছ থেকে যে সব উৎসাহব্যঞ্জক চিঠিপত্র পেতে থাকি, যেগুলির সংখ্যা প্রায় কয়েক হাজার, সেগুলিই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে পরবর্তী রচনাগুলির ব্যাপারে। তাঁদের ওই ধরনের উৎসাহ যদি না পেতাম তাহলে দীর্ঘ প্রায় চার বছর যাবৎ একটানা লিখে যেতে পারতাম না।

কেবল সাধারণ পাঠকই নয়, বাংলাদেশের বহু গুণী জ্ঞানী এবং বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে আমি উৎসাহ পেয়েছি। কেউ বা টেলিফোনে, কেউ বা আলাপচারিতায়, আবার কেউ বা পত্রযোগে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সংগীত বিশেষজ্ঞ এবং নানাবিধ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী স্বর্গত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় আমাকে এমন একখানি চিঠি লেখেন যা আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। তিনি আমার রচনার মূল সুরটিকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর চিঠিটি পেয়ে আমি অশ্রুসংবরণ করতে পারি নি।

এই রচনাগুলির দৈনিকপত্রের পৃষ্ঠা থেকে মুক্তি পেয়ে কোনদিনই পুস্তকাকারে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব

হত না, যদি না শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ওরফে শংকর ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ না নিতেন। তাঁরই পরামর্শে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দে'জ পাবলিশিং-এর স্বনামখ্যাত সুধাংশু দে। এইসব মানুষগুলির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কোনদিনই শোধ করতে পারব না। যেমন পারব না সাহিত্যিক বন্ধু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই পুস্তকের একটি বিষয়োপযোগী ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, যেটির সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে তরুণ সাহিত্যিক কিন্নর রায়ের কার্যকরী ভূমিকার কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় আমার পরম স্নেহভাজন সাংবাদিক রিণ্টু চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি অশেষ পরিশ্রম করে শিল্পীদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সংকলিত করেছেন, যা এই পুস্তকের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

এত মানুষের এত ভালোবাসার ঋণ আমি বোধহয় কোনদিনই শোধ করতে পারব না। শোধ করতে চাইও না। সেইসব অকৃত্রিম ভালোবাসা আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকুক।

রবি বসু

বি-৫, সরকারি আবাসন
এম. এম. ফিডার রোড
কলকাতা ৭০০০৫৭

ও বনের পাখি।

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো অন্দোলনের ঢেউ এসে পড়ল তমলুকের হ্যামিলটন স্কুলে। সেই ঢেউয়ে স্কুলের উঁচু ক্লাশের একটি ছেলে ভেসে গিয়ে কলকাতায় এসে উঠল। তমলুকে থাকতে সে মাঠে মাঠে তাঁবু খাটিয়ে দেখানো সিনেমার দর্শক ছিল। এবার কলকাতায় সে সিনেমা দেখতে লাগল। রঙমহলে গিয়ে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে বাঘা বাঘা অভিনেতার অভিনয়ও দেখতে লাগল।

কলকাতায় থাকতে গেলে তো পয়সা চাই। ছেলেটি খিদিরপুরে অরফ্যানগঞ্জ মার্কেটে চায়ের দোকানে কাপ ডিশ ধোয় আর ডায়মন্ডহারবার রোডে ইলেকট্রিক খুঁটির গায়ে কাননদেবী রবীন মজুমদারের নতুন ছবির পোস্টার দেখতে দেখতে স্বপ্নলোকে ডুবে যায়।

খিদিরপুরেই এক গেঞ্জির কলে কাজ হল তার। তখন কলকাতায় পথে পথে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিলিটারি। রাতে ব্ল্যাকআউট। ছেলেটি তার ভেতরেই খিদিরপুরের সেকেন্ডক্লাস ট্রামে চড়ে ধর্মতলায়। সারাদিন খাটাখাটুনির পর সন্ধ্যেবেলায় সে নিউ সিনেমায় ঢুকে পড়ে যোগাযোগ দেখতে। হিরো জহর গাঙ্গুলী।

চোখে তার অভিনয় জগতের মায়া কাজল। সিনেমা থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী তার স্বপ্নের লবকুশ। তাদের অভিনয়, একান্ত ব্যক্তিজীবন, টানাপোড়েন তাকে টানে। এবার সে খিদিরপুর ডকে ঠিকাদারের টালিক্লার্ক। তারপর মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরিতে এ-বেলা ও-বেলা বই দেয় মেম্বারদের। আর ভাবে কাশীনাথ ছায়াছবিতে নায়িকা সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়ক অসিতবরণের নিজের গলায় গানটি—ও বনের পাখি—

আমাদের এই বনের পাখির নাম রবি বসু। এবার তিনি কলকাতার দিকে একটু এগোলেন। হেস্টিংসে একটি চ্যারিটেবল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানায় বিনে পয়সার রুগীদের হাঁ করতে বলে গলায় হোমিওপ্যাথির গ্লোবিউল ঢেলে দেন তিনি খুব সাবধানে। পাছে ওষুধ পড়ে যায়।

রবি বসু মানিকতলায় দীপালি প্রেসে কমপোজের কাজে ঢুকলেন। সেখান থেকে সেকালের রূপাঞ্জলি কাগজে এলেন। এইবার তিনি মলিনা দাসী—পরে মলিনা দেবী, কাননবালা—পরে কানন দেবী, সুলালবাবু ওরফে জহর গাঙ্গুলীদের কাছের থেকে দেখতে লাগলেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। বুঝতে শিখলেন—একজন অভিনেতা, অভিনেত্রী কীভাবে তৈরি হয়ে ওঠেন, স্টার প্রেজেন্স কাকে বলে, অভিনয়ের সময় দুই শিল্পীর ভেতরকার রেষারেষি কেমন হতে পারে।

স্বয়ংসিদ্ধা উপন্যাসের ছায়াছবি বাঙালিকে মাতিয়ে দিয়েছিল একসময়। এই উপন্যাসের লেখক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সেখানে রবি বসু যোগ দিলেন। মণিলাল এই তরুণের ওপর সব কাজের ভার চাপিয়ে দিলেন। রবি বসু সম্পাদক হয়ে উঠতে লাগলেন।

চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের কাগজ উল্টোরথ একদিন রবি বসুকে ডেকে নিল। তখন ১৯৫৪। সেখানে প্রায় দশটি বছর। রবি বসু তাঁর মনোমত জায়গায়। গভীর নিশীথে তোপচাঁচির রাস্তায় সুপ্রিয়াকে দিয়ে রবিবাবু উত্তমকুমারের মান ভাঙাচ্ছেন, হাওড়া থেকে কলকাতায় আসার পথে তুলসী চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাসের ভেতর গুনগুন করে কালোয়াতি গাইছেন—সে-গান ভিড়ের বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তারিফ করছেন রবিবাবু। বনের পাখির পক্ষে উল্টোরথ হয়ে উঠল মনোমত বন। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, নাটক, নায়ক, নায়িকা, গায়ক, লেখক, পরিচালক, সম্পাদক, নাট্যকার—সবার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মিলে মিশে বনের পাখি একাকার হয়ে গেল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান উপদেষ্টা। কাগজের নাম সাতরঙ। সম্পাদক রবি বসু। তাও প্রায়

পঁয়ত্রিশ বছর হতে চলল। একদিন দুপুরে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আর আমি কলেজ রোয়ে সাতরঙ অফিসে বনের পাখির মুখোমুখি বসলাম। কত স্বপ্ন। কত ভাবনা।

ফের উল্টোরথ। তারপর উল্টোরথের প্রিয় সম্পাদক প্রসাদ সিংহের নাম দিয়ে কাগজ বেরোলো—প্রসাদ। তখন প্রসাদবাবু প্রয়াত। সম্পাদক আমাদের সেই বনের পাখি। একদিন বিশাল এক প্রেসে গিয়ে দেখি—রবিবাবু পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে লাইনো মেশিনে মেশিনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পাঁচ ছ' হাতে প্রসাদ পুজো সংখ্যার উপন্যাস বনের পাখি নিজে মেশিন থেকে মেশিনে ঘুরে কমপোজ করাচ্ছেন। এইসময় রবি বসু যাত্রার জগতের সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছেন। অনেক পরে বনের পাখিকে দেখেছি—বড় হাউসের নিশ্চিন্ত ভালো বেতনের কাজের পরোয়া না করে যাত্রা নিয়ে মেতে উঠতে। রবিবাবু যাত্রার দল খুলে সুদূর মধ্যপ্রদেশে চলে গিয়েছিলেন। তখন তিনি দেশ পত্রিকায় সহ-সম্পাদক। তাঁর জন্যে চাকরিটি রাখা ছিল—যদি তিনি যাত্রার দুনিয়া থেকে ঘিরে এসে ফের যোগ দেন। তিনি আর যোগ দেননি দেশ পত্রিকায়। রবিবাবুকে দেখতে দেখতে আমি মুগ্ধ হচ্ছিলাম। বনের পাখিকে নিয়ে একদিন একটি গল্পই লিখে বসলাম। রাজরাজেশ্বর। কোন থই পাই না। ব্যাখ্যা পাই না। মানে বুঝি না।

ছায়াছবির পেছনে যিনি নায়ক, যিনি পরিচালক, যিনি নায়িকা—তাঁরা কেমন মানুষ—কী করে অমন করেন—তাই নিয়েই রবিবাবু মাথা ঘামাতেন—উল্টোরথ, প্রসাদে লিখতেন।—যে জন্যে ওই দুই কাগজ সিনেমা, থিয়েটার, সাহিত্য, যাত্রা জগতের খবরাখবর দিয়ে—মনোরম উপহার সাজিয়ে বাঙলা সাহিত্য চলচ্চিত্র জগতে সাংবাদিকতায় একনম্বর হয়ে উঠেছিল।

১৯৬৫ সনের ভারত-পাক যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর একজন বাঙালি অফিসার পাকিস্তানের ভেতর 'ইছোগিল' খালের পাশের পরিত্যক্ত পাকিস্তানি বাঙ্কারে একখানি উল্টোরথ পত্রিকা পেয়েছিলেন। বোঝাই যায় তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের কোন পাকিস্তানী বাঙালী সৈনিক ঘোর যুদ্ধের ভেতর বাঙ্কারে বসে উল্টোরথ পড়ছিলেন। পালাবার সময় বাঙ্কারে ফেলে গিয়েছিলেন।

শুধু কি সিনেমা? তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসু, বিমল মিত্র—সবাই তখন লিখছেন। তাঁদের লেখা তো বটেই—তাঁদের জীবনও মনোহারী ভাবে ওদের পাতায় সাজিয়ে দিত উল্টোরথ। আর এসবের পেছনে যেসব মাথা কাজ করত—তার একটি ছিল আমাদের এই বনের পাখির।

চার দশক জুড়ে সঞ্চিত এই বিপুল অভিজ্ঞতা, তার সঙ্গে বিস্ময়বোধ, সরস গদ্য, অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে রবি বসু দৈনিক বর্তমানের রবিবারের পাতায় একটানা চার বছরের নিজের স্মৃতির সরণি ধরে লিখেছেন চন্দ্রাবতী, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, কাননদেবী, ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেনের কথা। সেইসঙ্গে উঠে এসেছে বাঙলা ছায়াছবির জগতের কথা। কালের কথা।

চন্দ্রাবতী অভিনয় করবেন বলে স্বামীর অনুমতি চেয়েছিলেন। পাননি। তিনি সংসার থেকে চলে এলেন। অংশীদারীতে একটি ছবিঘর করলেন কলকাতার বুকে। কোন এক ছবির প্রিমিয়ারে ছবি দেখতে গেছেন। শো ভাঙলে সেই ছবিঘরেই তিনি নিউ থিয়েটার্সের মীরাবাই ছবির জন্যে ডাক পেলেন নিউ থিয়েটার্স থেকে।

তুলসী চক্রবর্তী জানতেন না তিনি কতবড় অভিনেতা। মদ খেয়ে যারা রাস্তার ধারের দোকানে চাট খেতে আসতেন—তার এঁটো থালা, ডিশ ধোয়ার কাজ নিয়েছিলেন। জীবনের স্বাভাবিকতা তিনি ক্যামেরার সামনে স্বাভাবিকভাবেই দেখাতেন। সেটাই সেরা অভিনয়। একথা রবিবাবু তাঁকে বলায় তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

নরেশ মিত্র আসনে বসে প্রয়াত স্ত্রী, প্রয়াত বন্ধু শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে কথা বলতেন। তিনি এসব কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে করতেন না।

নৃপতি চট্টোপাধ্যায়কে ছাড়া লুকোচুরির শুটিং করতে রাজি হননি কিশোরকুমার। নৃপতিবাবুর মাসিক সংসারযাপনে অল্প টাকাই লাগত। সেই টাকা হাতে এসে গেলে তিনি সেই মাসের মত আর অভিনয় করতেন না। ডাকলেও ফিরিয়ে দিতেন। আবার টাকা ফুরিয়ে গেলে নিজেই স্টুডিওতে চলে যেতেন। মেক আপ দিতে বলতেন। বলতেন—একটা রোল বের কর। অভিনয় করব।

কাননদেবী যখন খ্যাতির শিখরে—তখন তাঁর আজ্ঞাধারী বন্ধু এসেছেন স্টুডিওতে। দূর থেকে

কাননকে দেখে তিনি চলে গেলেন। কথাটি না বলে। আলোর ফোকাসের বাইরে এসে কানন জানতে চাইলেন, কে এসেছিলেন? নামটি জেনে তিনি ফের আলোর ভেতর চলে গেলেন। কথাটি তিনিও বলতে পারেননি। দু'জনের মাঝখানে তখন খ্যাতি দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বইতে এ জায়গাটি পড়ে ভোলা যায় না।

জহর গাঙ্গুলীকে থিয়েটারে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে তুলসী চক্রবর্তী পরিচালকের পা জড়িয়ে ধরেছিলেন। একথা বলতে বলতে জহর গাঙ্গুলী কেঁদে ফেলতেন। অসিতবরণকে পরিচিত করিয়েছিলেন পাহাড়ী স্যানাল। শেষ জীবনে তিনি নিজে কাজ পেতেন না। প্রমথেশ বড়ুয়া গানের অনুমতির জন্যে পঙ্কজকুমারকে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ গান দিলেন। গল্পটি শুনলেন। বললেন, ছবির নাম দাও—মুক্তি। রবীন মজুমদারকে এনেছিলেন প্রথমেশ বড়ুয়া। ছবি বিশ্বাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুত্বের শুরু নৃপতির কঠোর সমালোচনায়। সে সমালোচনা ছবি বিশ্বাস মেনে নিয়েছিলেন। মণি শ্রীমানীর মেয়ের বিয়ে আটকে যাচ্ছে। টাকা নেই। তরুণকুমারের চেষ্টায় অনুষ্ঠান হল। উত্তমকুমার গাইলেন, অসিতবরণ তবলা বাজালেন। টিকিট বিক্রির টাকায় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। উত্তমকুমার স্যুটিংয়ের বহু আগে থেকেই মনে মনে তৈরি হতেন যে-চরিত্রে অভিনয় করবেন—সেই চরিত্রের ভাব, ভঙ্গিমায়, ভাবনায়। মন ভালো থাকলে একটার পর একটা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। সুচিত্রা সেন কিছু ভুলতেন না। এক পরিচালকের ছবিতে তিনি অভিনয় করবেন না বলে সেই পরিচালক আর কাজই পেলেন না। অপরাধ—গোড়ার দিকে সেই পরিচালক একটি ছবিতে সুচিত্রা সেনকে দ্বিতীয় নায়িকার রোল দিয়েছিলেন। পরিচালক দায়ী নন। প্রযোজক প্রথম নায়িকা হিসেবে চেয়েছিলেন সাবিত্রীকে। বাবামায়ের ছেলে না থাকায় বাড়ির বড় ছেলের মতই সারা পরিবার দেখেছেন সাবিত্রী। নিজের আর বিয়ে করা হয়ে উঠেনি তাঁর। স্টেজে নাচের দলে নাচতে হত বলে ছোট্ট মেয়ে মলিনা গ্রীনরুমে ঘুমিয়ে পড়তেন।

যাঁদের আমরা স্বপ্নলোকের মানুষ ভাবি—তাঁরা আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ। এই কথাটি বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন লেখক। বাঙলা ছায়াছবির কালের কথা লেখার জন্য তাঁকে বাঙালি বহুদিন মনে রাখবে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ঘড়িঘর
টালিগঞ্জ

সুলালদা

সালটা ছিল ১৯৪৬। তারিখ ১৭ আগস্ট। ঠিক তার আগের দিন কলকাতার বুকে শুরু হয়েছে হিন্দু আর মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। মহম্মদ আলি জিন্না সাহেবের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'-র আহ্বানকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে একটা সন্ত্রস্ত ভাব তো ছিলই। কিন্তু তার পরিণতি যে এমন ভয়ংকর আকার নেবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। সভ্যতা আর মানবতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হত্যা আর লুণ্ঠনের বীভৎস লীলায় মেতে উঠেছে সারা কলকাতা। রাজপথ থেকে গলিপথ সর্বত্র বয়ে চলেছে তাজা রক্তের প্লাবন।

ওই সময়ে আমি থাকতাম বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রিটে। ১৬ আগস্টের সারা দিনের বিমূঢ় হতচকিত ভাবটা ১৭ আগস্ট সকালে কিছুটা কাটিয়ে ওঠা গেছে। এখন সকলের মনে আত্মরক্ষার চিন্তাটাই প্রবল। উত্তরে কাশিপুর আর পূর্বে বেলগাছিয়া দুই দিক থেকেই তখন বাগবাজারের ওপর আক্রমণের আশঙ্কা। গতকাল বিকেলেই বেলগাছিয়ার দিক থেকে আক্রমণের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল শ্যামবাজার পেরিয়ে বাগবাজারের মোড়ে বিখ্যাত তেলেভাজার দোকান পর্যন্ত। কায়ক্লেশে সেটা ঠ্যাকানো গেছে।

আজ সকাল থেকে তাই পাড়ার মাতব্বরেরা উদ্যোগ নিচ্ছেন পাড়ারক্ষী ডিফেন্স পার্টি গড়ার ব্যাপারে। দুপুর নাগাদ খবর এল পশুপতি বসুর বাগবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে বিকেলে মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানেই ইতিকর্তব্য স্থির হবে। আট-দশজন ছেলে সাইকেলে করে গোটা বাগবাজার ঘুরে ঘুরে খবরটা জানিয়ে দিয়ে গেল।

বিকেলের মিটিংয়ে সবাই মিলে আলোচনা করে স্থির করলেন, ডিফেন্স পার্টি গড়া হবে। তরুণ সম্প্রদায়ের উপর দায়িত্ব পড়ল লাঠিসোঁটা নিয়ে রাত জেগে পাড়া পাহারা দেবার। মিটিংয়ে মাঝে মাঝেই একজনের প্রসঙ্গ বার বার উঠছিল। কেউ বললেন : কই, সুলাল তো এখনও এল না। কেউ বললেন : সত্যিই তো, সুলালবাবু এখনও আসছেন না কেন! আবার কেউ বললেন : সুলালদা তো এত দেবি করবার লোক নয়।

বুঝলাম সুলালবাবু নামক ব্যক্তিটি বাগবাজারে খুবই বিখ্যাত এবং জনপ্রিয়। আমি বাগবাজারে নবাগত, তাই হয়তো তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না। এমন সময় একজন প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন : ওই তো সুলালদা আসছেন।

দেখলাম আধময়লা অথচ দামি ধুতি আর ঢোলাহাতা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে জহর গাঙ্গুলি এসে ঢুকলেন সভাস্থলে। আমি পাশে বসা এক ভদ্রলোককে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম : সুলালবাবু কোথায়? উনি তো জহর গাঙ্গুলি!

ভদ্রলোক আমার দিকে এক পলক দেখে নিয়ে বললেন : জহর গাঙ্গুলির ডাকনাম সুলাল। আপনি বুঝি বাগবাজারে নতুন?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

সেই মিটিং-এ সর্বসম্মতিক্রমে সুলালবাবুকে ডিফেন্স পার্টির সর্বাধিনায়ক করা হল। তিনি আমাদের কী কী করতে হবে আর কী কী করতে হবে না তা অল্প কথায় বুঝিয়ে দিলেন। শেষকালে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন : একটা কথা সব সময়ে মনে রাখবে। আগ বাড়িয়ে কাউকে আক্রমণ করবে না। কিন্তু আক্রান্ত হলে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে—তা সে যে কোনও অস্ত্রে আর যে কোনও উপায়েই হোক।

পরে, অনেক কাল পরে, যখন সাংবাদিক হিসেবে সুলালদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে, তখন একদিন তাঁকে ওই ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। বলেছিলাম : সুলালদা, আপনি তো সারা জীবন কংগ্রেস করেছেন,

গান্ধীজির অহিংসার আদর্শে ঘোরতর বিশ্বাসী। আপনি কী করে সেদিন আমাদের হিংসার বদলে হিংসায় উৎসাহ দিয়েছিলেন?

সুলালদা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন : মহাত্মাজির অহিংসা শব্দটার এমনি একটা কদর্থ অনেকেই করে বটে। গান্ধীজি কখনও বলেননি, ভীরুর মতো, কাপুরুষের মতো রণাঙ্গনকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে। সারা দেশ, সমস্ত জাতিকে তিনিই তো শিখিয়েছিলেন হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে, প্রতিরোধ করতে। তাঁর সংগ্রামের মূল মন্ত্র ছিল সেটাই। আমিও সেদিন ঠিক ওই একই কথা তোদের বলেছিলাম। তোরা কতটা মানতে পেরেছিলি আর কতটা পারিনি সেটা তোরাই জানিস।

তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন : তুইও ছিলি নাকি ডিফেন্স পার্টিতে? কই, তোকে দেখিনি তো!

একটু হেসে বলেছিলেন : আপনারা কি সাধারণ মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করেন যে দেখবেন। আমরাই বরং দেখি আপনাদের। এবং তার জন্যে রীতিমতো দর্শনী দিতে হয়।

সুলালদা একটু হেসে বলেছিলেন : তা যা বলেছিস। তারপর একটু গম্ভীর গলায় বলেছিলেন : না রে, আমরাও দেখি। না দেখলে অভিনয় করব কী করে! এই যে এতক্ষণ 'সাত নম্বর বাড়ি' ছবিতে আমার এত প্রশংসা করছিলি, ওটা তো আমার দেখা একটি চরিত্রের কার্বন কপি। আমাদের গ্রামে এক ডাক্তার ছিল, ওইরকম হ্যাট মাথায় দিয়ে সাইকেলে চেপে এ-গ্রাম ও-গ্রামে রুগি দেখে বেড়াত। তাকে ভেবেই ওই চরিত্রটা করেছি। কাজেই আমাদেরও দেখতে হয় বইকি। যার দেখবার চোখ নেই সে অভিনেতা হিসেবে কক্ষনো বড় হতে পারে না।

বুঝলাম, সুলালদার অভিনীত চরিত্রগুলি, বিশেষ করে গ্রামের চরিত্র, সবই প্রায় ওঁর দেখা মানুষগুলিকে কেন্দ্র করেই রূপায়িত হয়েছে। একমাত্র সেই কারণেই ওইসব চরিত্রগুলিকে এত জীবন্ত মনে হয়।

সত্যি কথা বলতে কি, গ্রাম্য চরিত্রের অভিনয়ে সুলালদা তাঁর যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বিশেষ করে ভোলাভালা সরলপ্রাণ দিলখোলা গ্রাম্য চরিত্রে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বিখ্যাত 'শহর থেকে দূরে' ছবিতে রতন চরিত্রটি তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। বস্তুত জহর গাঙ্গুলির অভিনয়ের গুণেই ছবিটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রূপবাণী সিনেমায় মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি প্রায় এক বছর ধরে চলেছিল।

সুলালদার ওই অভিনয়ের ধারা পরবর্তী কালে অনেককেই প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। 'চাঁপাডাঙার বৌ' ছবিতে উত্তমকুমারের অভিনয় দেখে আমার তো সেই রকমই মনে হয়েছিল। পরে এ ব্যাপারে উত্তমবাবুকে প্রশ্নও করেছিলাম। তার উত্তরে উত্তমবাবু বলেছিলেন : 'চাঁপাডাঙার বৌ' ছবিতে সুলালদাকে আমি যে হুবহু কপি করেছিলাম সে অভিযোগটা ঠিক নয়। তবে কোনও গ্রাম্য চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে প্রথম প্রথম আমার চোখের সামনে সুলালদার মুখটাই ভেসে উঠত। গ্রাম তো আমার দেখা ছিল না তেমন। পরে অবশ্য এ ব্যাপারটা কাটিয়ে উঠেছিলাম। আমার পরের দিকের গ্রাম্য চরিত্রগুলোর অভিনয় দেখলে এ কথাটা বুঝতে পারবেন।

সুলালদার ওইরকম তড়বড়ে অভিনয় অভিনেতাদের কী পরিমাণ প্রভাবিত করেছিল সেটা গবেষণার ব্যাপার। কিন্তু ওইভাবে কথা বলার ছোঁয়াচ যে সেই মিড-ফর্টিসের তরুণ সম্প্রদায়কে ভয়ানকভাবে প্রভাবিত করেছিল, এই প্রতিবেদক তার জীবন্ত সাক্ষী।

সুলালদার জন্ম ১৯০৪ সালে উত্তর চব্বিশ পরগণার সেতপুর গ্রামে। ছোটবেলায় অসম্ভব দুরন্ত ছিলেন। পড়াশোনা ছাড়া আর সব কিছুতেই প্রচণ্ড মনযোগ। যে কারণে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর লেখাপড়া আর এগোল না। তবে কিশোর বয়স থেকেই অত্যন্ত পরোপকারী। মানুষের বিপদে-আপদে প্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

তবে যতই পরের উপকার করা যাক না কেন এই সংসারে বেকার যুবকের কোনও মান-মর্যাদা নেই। বেকার জহর গাঙ্গুলিকে ঠিক এই কারণেই ঘরে-বাইরে প্রচুর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হত। অনেক কষ্টে একে-ওকে-তাকে ধরে বেঙ্গল টেলিফোনে একটি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি পেয়ে

কলকাতাবাসী হলেন সুলালদা। মাইনে যা পেতেন তাতে কলকাতায় মেসের খরচ চলত না। দেশ থেকে ডাক্তার দাদা প্রতি মাসে দশটি করে টাকা পাঠাতেন বলে কোনও রকমে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতেন।

কিন্তু সুলালদার মতো মুক্ত বিহঙ্গের দশটা-পাঁচটার বদ্ধ ঘরে মন টিকবে কেন। শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল। বিরক্ত হয়ে একদিন দিলেন চাকরিটা ছেড়ে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই ঘটনাটি না ঘটলে জহর গাঙ্গুলির মতো একজন শক্তিমান অভিনেতাকে বাংলাদেশ খুঁজে পেত না।

পেটের দায়ে সুলালদা দশ টাকা মাইনের চাকরি নিয়েছিলেন মিত্র থিয়েটারে। তাও অনেক উমেদারি করে। ১৯২৬ সালে 'শ্রীদুর্গা' নাটকে খুবই অকিঞ্চিৎকর একটি ভূমিকা পেলেন। তার চেয়েও বেশি পেলেন সহকর্মীদের দুর্ব্যবহার। গ্রামের যাত্রাপালার যৎসামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে কলকাতায় থিয়েটার করতে এলে যা হয় আর কি। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তুলসী চক্রবর্তীকে ধরলেন সুলালদা।

তুলসী চক্রবর্তী তখন স্টার থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। তিনি সুলালদাকে নিয়ে গেলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রবাদপুরুষ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে। অপরেশবাবু তখন স্টার থিয়েটারের সর্বাধিনায়ক। সেটা ১৯৩০ সাল। এই স্টার থিয়েটারে অপরেশবাবুর স্নেহচ্ছায়ায় সুলালদা ছোট থেকে মাঝারি, তারপর বড় বড় ভূমিকা পেতে লাগলেন। সেই সঙ্গে পেতে লাগলেন অর্থ, সম্মান এবং জনপ্রিয়তা। প্রথম জনপ্রিয়তা এল রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকে নায়ক মানস মুখার্জির চরিত্রে অভিনয় করে। তারপর থেকে তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

স্টার, রঙমহল, নাট্যনিকেতন, মিনার্ভা, নাট্যভারতী, শ্রীরঙ্গম, বিশ্বরূপা, কাশী-বিশ্বনাথ মঞ্চ, ইদানীংকালের দু-একটি থিয়েটার ছাড়া বাকি সব থিয়েটারেই সুলালদা অভিনয় করেছেন। যুবক থেকে প্রৌঢ়, প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ, ধনবান থেকে ধনহীন, মাতাল থেকে ভবঘুরে—কত রকমের বিচিত্র চরিত্রে সুলালদা অভিনয় করেছেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম বলি। সেগুলি হল মন্ত্রশক্তি, পোষ্যপুত্র, বাংলার মেয়ে, পথের শেষে, সাজাহান, মিশরকুমারী, রাষ্ট্রবিপ্লব, তটিনীর বিচার, পরিণীতা, দেবদাস, শেষরক্ষা, দুই পুরুষ, সীতারাম, রামের সুমতি, মাটির ঘর, শ্যামলী, গিরীশচন্দ্র, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, এন্টনি কবিয়াল ইত্যাদি অজস্র নাটক সুলালদার অভিনয়ে সমৃদ্ধ। তাঁর সর্বশেষ অভিনয় 'নটী বিনোদনী' নাটকে।

চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সুলালদার সম্পর্ক ১৯৩১ সাল থেকে। একটি মাত্র নির্বাক ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন। ছবিটির নাম গীতা। ১৯৩৪ সালে সবাক চিত্রে তাঁর প্রথম অভিনয় চাঁদ সদাগর ছবিতে। ছোট্ট একটি ভূমিকায়। ওই বছরই তুলসীদাস ছবিতে একটি বড় ভূমিকা পেলেন। কিন্তু ওঁর চলচ্চিত্র জীবনের রমরমা শুরু হয় ১৯৩৫ সালে মানময়ী গার্লস স্কুল ছবি থেকে? ওই ছবিতে ওঁর নায়িকা ছিলেন কানন দেবী। ওঁদের রোমান্টিক অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে এক দর্শক নাকি রূপবাণী সিনেমার পর্দার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন ওঁদের স্পর্শ করতে। এই রকমই একটা গল্প তখনকার দর্শকমহলে চালু ছিল।

এরপর অজস্র ছবিতে অভিনয় করেছেন সুললাদা। ছোট-বড় নানা চরিত্রে। সেসব ছবির হিসেব দিতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবে ১৯৪২ সালে শৈলজানন্দের 'বন্দী' ছবিতে অভিনয় করে তিনি সে বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানজনক পুরস্কার পান এবং ১৯৪৪ সালে শহর থেকে দূরে ছবির সাফল্য উপলক্ষে প্রদত্ত সংবর্ধনা সভায় সাহিত্যিক-পরিচালক শৈলজানন্দ তাঁর নিজের গলার মালাটি জহর গাঙ্গুলির গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন : এই ছবিতে রতন চরিত্রে যদি সুলালকে না পেতাম তবে এ ছবি এতটা সাফল্য পেত না।

১৯৬৯ সালের ৭ জুন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সুলালদা অভিনয় করে গেছেন নাটকে এবং ছবিতে। এ এক পরম সৌভাগ্য।

সুলালদাকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম : আপনার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কী?

উত্তরে সুলালদা ডান হাতের তিনটি আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন : তিনটি। এক—মোহনবাগান, দুই—কংগ্রেস, তিন—থিয়েটার।

সত্যি কথা বলতে কি ওরকম মোহনবাগান-পাগল আমি খুব লোককেই দেখেছি। মোহনবাগানের হয়ে যেমন উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতেন, মোহনবাগানের পরাজয়ে তেমনি মুষড়ে পড়তেন। কলকাতায়

আসার পর থেকে মোহনবাগানের খেলা থাকলে ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক আর বজ্রপাতই হোক, মাঠমুখো হওয়া চাইই চাই। সঙ্গী থাকতেন উত্তর কলকাতার আর দু'জন পাঁড় মোহনবাগানি সত্যেন ঘোষাল আর মাতাল মিত্তির।

পরবর্তীকালে সুলালদা মোহনবাগান ক্লাবের কর্ম সমিতির সদস্য হয়েছেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল এই তিন বছর হকি সেক্রেটারির দায়িত্বও পালন করেছেন। তাঁর সেই আমলটা ছিল মোহনবাগানের হকির গৌরবময় যুগ। বিখ্যাত সেন্টার ফরোয়ার্ড সি এস গুরুংকে সুলালদাই মোহনবাগান ক্লাবে এনেছিলেন বলে শুনেছি।

এবারে কংগ্রেসের কথায় আসি। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সুলালদা জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে ঘোরতর বিশ্বাসী ছিলেন। সেজন্য তাঁর কয়েকবার প্রাণ সংশয়ও হয়েছে।

একবারের একটি ঘটনা বলি।

তখন পুরোপুরি বৃটিশ আমল। ভারতের স্বাধীনতা আসতে তখনও অনেক দেরি। কিন্তু দেশ ও জাতি তখন প্রচণ্ড জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আর দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের ছবি তখন বাংলার ঘরে ঘরে সসম্মানে পূজা পাচ্ছে।

সেই আমলে প্রতি বছর ছাব্বিশে জানুয়ারি তারিখটি জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হত। ওইদিন ঘরে ঘরে তিনরঙা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হত বৃটিশ শাসকদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে।

সে বছর সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল, ছাব্বিশে জানুয়ারিতে যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করে তবে পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। সেই অনুযায়ী ছাব্বিশে জানুয়ারির ভোর থেকেই কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় অলিতে গলিতে পুলিশি টহল চলছে।

সুলালদা তখন স্টার থিয়েটারে। উনি আগেরদিন মনে মনে ঠিক করলেন, কাল সকালে এই স্টার থিয়েটার বিল্ডিংয়ের মাথাতেই জাতীয় পতাকা তুলতে হবে।

কিন্তু কী ভাবে? যা পুলিশি টহল আর গোয়েন্দা টিকিটিকির হুজ্জুত, তাতে ব্যাপারটা খুব সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু তা বলে চুপচাপ বসে থাকাও তো চলে না।

পঁচিশে জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা সুলালদা শো করতে এলেন গায়ে চাদর জড়িয়ে। তার আগে বাড়িতে বসে সারা বুকে ব্যান্ডেজ করার মতো করে একটি জাতীয় পতাকা জড়িয়ে নিয়েছেন। তার ওপর মোটা একটা গেঞ্জি চাপিয়েছেন, তার ওপর পাঞ্জাবি। গ্রিনরুমে মেক্-আপ নেবার সময় খুব সাবধানে পোশাক পরেছেন, যাতে বুকে বাঁধা ব্যান্ডেজটি কারও নজরে না পড়ে।

শো শেষ হবার পর সুলালদা সকলের অলক্ষে আর বাইরে না বেরিয়ে একেবারে হাজির হয়েছেন স্টার থিয়েটারের ছাদে। সেখানে আগে থেকেই একটি বাঁশের লাঠি রেখে এসেছিলেন যেটি পতাকা দণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সারা রাত প্রচণ্ড শীতে সেই ছাদে কাটিয়েছেন একটি মাত্র চাদর গায়ে দিয়ে। ঘুম আর হয়নি। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে স্টার থিয়েটারের শীর্ষে জাতীয় পতাকাটি উত্তোলন করে চিৎকার করে উঠলেন সুলালদা : বন্দে মাতরম্।

রাস্তায় পাহারাদার পুলিশ আর টহলদার পুলিশ বাহিনী চমকে উঠল সেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে। তারা তাড়া করে এসে দারোয়ানদের দিয়ে গেট খুলিয়ে ছাদে পৌঁছবার আগেই পেছনের পাঁচিল টপকে স্টার লেনে পড়েই সুলালদা বেপাত্তা।

পরে এই ব্যাপারে স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে পুলিশ অনেক জেরা করেছিল। তাঁদের কয়েকটা দিন লালবাজারে ছোটাছুটি করানোও হয়েছিল। কিন্তু আসল অপরাধীর হদিশ কেউ পায়নি। বন্ধুরা কেউ কেউ আঁচ করেছিলেন, কিন্তু তারা কেউ ফাঁস করে দেননি। উল্টে গোপনে তাঁরা সুলালদাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁর সাহস এবং দেশপ্রেমের তারিফ করেছিলেন।

এই রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল সুলালদার জীবনে। সেই ঘটনার সঙ্গে একালের চার-পাঁচজন কবি-সাহিত্যিক জড়িত। তাঁরা হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি

চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। এই ঘটনাটি বলে সুলালদা সম্পর্কে এই রচনার সমাপ্তি ঘটাব।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকে ধর্মতলা স্ট্রিটের ওপর ষাটের দশকের গোড়ার দিকে একটি নামকরা পানশালা ছিল। সেটির তখন কী নাম ছিল ভুলে গেছি। পরে ওটির নাম হয় 'মদিরা'। ওখানে সুলালদার একটা সান্ধ্যকালীন আড্ডা বসত। ধর্মতলার ডিস্ট্রিবিউটার পাড়ার নামকরা প্রযোজক-পরিবেশকরা আসতেন ওখানে আড্ডা দিতে। পান-ভোজন সারতে। ওই আড্ডা শুরু হত সিনেমা-থিয়েটারের আলোচনা দিয়ে আর শেষ হত রাজনীতি নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে তখন বামপন্থার স্বর্ণযুগ। সুলালদা কট্টর কংগ্রেসি। সুতরাং রাজনীতি প্রসঙ্গে আড্ডা খুব জমাট বেঁধে যেত।

ওই পানশালার দোতালার বড় ঘরটিতে সুলালদাদের টেবিলের একটু দূরেই সুনীল-শক্তিদের আড্ডা বসত। সেটাও নিয়মিত। সেই আড্ডায় আলোচনা হত বাংলা সাহিত্য, কৃত্তিবাস এবং কবিতার ভালো-মন্দ নিয়ে। কিন্তু সুলালদাদের টেবিলে রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হলে এই আড্ডার মেজাজটাও বদলে যেত। এই পাঁচ তরুণ সাহিত্যিক তখন অল্পবিস্তর বাম-অনুরাগী। সুলালদা কংগ্রেসের গুণকীর্তন শুরু করলে এঁরা পাঁচ রকম ফোড়ন কাটতে শুরু করতেন সুলালদাকে উদ্দেশ্য করে।

সবচেয়ে মজার কথা, এঁরা পাঁচজনই ছিলেন সুলালদার অভিনয়ের অনুরাগী। দল বেঁধে সুলালদার অভিনীত ছবি দেখতেন, থিয়েটার দেখতেন। রাজনীতি নিয়ে সুলালদাকে কটাক্ষ করা ছিল এঁদের তরুণ মনের মজার একটি অনুষঙ্গ।

প্রথম প্রথম সুলালদা এঁদের কটাক্ষকে পাত্তা দিতেন না। ফলে এদিক থেকে টিপ্পনির মাত্রা দিনে দিনে চড়তে লাগল। শেষকালে একদিন অসহ্য হওয়ায় সুলালদা কর্তৃপক্ষের কাছে এঁদের নামে কম্‌প্লেন করতে বাধ্য হলেন।

এই পানশালাটির ম্যানেজার ছিলেন সুনীল-শক্তিদের বন্ধু। তাঁর কল্যাণে বিশেষ কিছু সুখ-সুবিধাও ভোগ করতেন এঁরা। তাছাড়া পরিবেশটাও ছিল এঁদের মেজাজের উপযুক্ত। তুচ্ছ একটা মজা করতে গিয়ে সেই আড্ডা ভেঙে যাবে এটা এই তরুণ পঞ্চকের কাছে বিশ্রি ব্যাপার বলে মনে হল।

তাই পরের দিন সুলালদা আসতেই কিঞ্চিৎ পানোন্মত্ত উৎপলকুমার বসু এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় নাটকীয় ভঙ্গিতে সুলালদার দুই জানু জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন : জহরদা, উই আর ভেরি স্যরি। আমরা সবাই আপনার অ্যাকটিং-এর ভক্ত। একটু মজা করবার জন্যে আপনার পেছনে লাগতাম। প্লিজ আপনি কিছু মনে করবেন না। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

এই কথা শুনে সুলালদা সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় ভঙ্গিতে উৎপল আর সন্দীপনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন : বল কী হে ইয়াং ম্যান, তোমরা আমার অ্যাকটিং-এর ভক্ত। তবে তো তোমাদের সাত খুন মাপ। অ্যাই, বেয়ারা, আমার এই ইয়াং ফ্রেন্ডসদের সবাইকে ড্রিংকস দাও। বিলটা আমার নামে করবে।

ঠিক যেন কোন বাংলা মিলনান্ত ছবির শেষ দৃশ্য।

এমনি দিলখোলা মানুষ ছিলেন সুলালদা। এইসব মানুষের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এটা নিশ্চয় এই প্রজন্মের দুর্ভাগ্য।

নরেশদা

১৯৩৮ সালের জুলাই মাসের তিরিশ তারিখে উত্তর কলকাতার 'চিত্রা' (বর্তমানে মিত্রা) সিনেমায় 'গোরা' ছবিটি যখন মুক্তি পেল, তখন দর্শকরা চমকে উঠেছিলেন ছবির টাইটেল কার্ড দেখানোর আগে একটি দৃশ্য দেখে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বেঁটেখাটো এক ভদ্রলোকের হাতে 'গোরা' ছবির চিত্রনাট্যের খাতা তুলে দিচ্ছেন এবং তিনি সেটি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করছেন। ওই বেঁটেখাটো ভদ্রলোকই 'গোরা' ছবির পরিচালক। তাঁর নাম নরেশচন্দ্র মিত্র।

১৯১৯ সালে নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ থেকে শুরু করে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর কত লেখারই তো চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এমন করে কারও হাতে তো তিনি চিত্রনাট্য তুলে দেননি! 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক প্রিয় উপন্যাস। তার চিত্রনাট্য রবীন্দ্রনাথের এত ভালো লেগেছিল যে প্রযোজকদের অনুরোধে ক্যামেরার সামনে হাজির হতেও দ্বিধাবোধ করেননি তিনি। ইদানীংকালের দর্শকরা দূরদর্শনে 'গোরা' চিত্রের পুনঃপ্রদর্শনের সময় নিশ্চয় ওই দৃশ্যটি লক্ষ্য করেছেন। এই একটি ঘটনাতেই বোঝা যায় নরেশদা বাংলা চলচ্চিত্রের কত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন।

আমার জীবনের একটি বিশেষ পর্ব নরেশদার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। সেই সময়ে চলচ্চিত্রের বাইরে একটি ভিন্ন মানুষ হিসেবে নরেশদাকে আমি দেখেছি। সেসব কথা বলার আগে নরেশদার অতীত জীবনের প্রতি একটু আলোকপাত করি।

নরেশদারা যশোর জেলার লোক। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষের সম্পর্কে ভাই হন উনি। ওঁরাও একই জেলার মানুষ। নরেশদা জন্মেছেন কিন্তু ত্রিপুরার আগরতলায় ১৮৮৮ সালে। অর্থাৎ আজ থেকে একশো দশ বছর আগে। কলকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ১৯১১ সালে বি এ পাশ করেন। কলেজে পড়তে পড়তেই নাটকের দিতে ঝোঁকেন। ১৯০৮ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' নাটকে দুর্বাসার চরিত্রে অভিনয় করে প্রচুর প্রশংসা পান। ওই নাটকে অভিমন্যু সেজেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। ছাত্রাবস্থা থেকেই শিশিরবাবু আর নরেশদার বন্ধুত্ব। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। শিশিরবাবুর মৃত্যুর পরও সে বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি। পরলোক থেকে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন নরেশদার সঙ্গে। সে এক বিচিত্র ঘটনা। সে কথায় পরে আসছি।

১৯১৪ সালে নরেশদা ওকালতি পাস করেন। কিন্তু কোর্টে পশার জমল না। ভাগ্যিস জমেনি, জমলে বাংলাদেশ একজন শক্তিমান অভিনেতাকে খুঁজে পেত না। ওকালতি ছাড়া, আরও দু-একটি পেশায় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন নরেশদা। কিন্তু কোথাও সুবিধা হল না। অবশেষে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে ১৯২০ সালে মিনার্ভা মঞ্চে যোগ দিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য সেজে দর্শকদের প্রশংসা আদায় করে নিলেন। পরবর্তীকালে ওই চরিত্রে শিশিরকুমার ভাদুড়ি দারুণ নাম করেন। নরেশদা তখন করতেন ক্যাত্যায়ন?

অভিনেতা হতে গেলে যে জিনিসগুলির প্রাথমিক প্রয়োজন তার কোনটিই নরেশদার অনুকূলে ছিল না। তাঁর উচ্চতা কম, কণ্ঠস্বর অনুনাসিক, দেখতেও সুদর্শন নয়। কিন্তু তাঁর অভিনয়ের ক্ষমতা এতই বেশি যে ওইসব ত্রুটি দর্শকরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না। যে কারণে 'কেদার রায়' নাটকে শ্রীমন্ত, 'কর্ণার্জুন'-এ শকুনি, 'দুই পুরুষ'-এ গুপী মিত্তির প্রভৃতি তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলি স্মৃতিতে ইতিহাস হয়ে আছে। তৎকালীন গুণীজনসমাজ তাঁক 'নটশেখর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

তবে স্টেজের চেয়ে ফিল্মেই নরেশদার সাফল্য বেশি। অভিনেতা হিসেবে তা বটেই, পরিচালক হিসেবে বোধ হয় আরও বেশি। তাঁর পরিচালিত কয়েকটি ছবির কথা তো প্রবীণ দর্শকদের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৯৩৮ সালে 'গোরা', ১৯৪১ সালে 'বাংলার মেয়ে', ১৯৪৬ সালে 'পথের সাথী', ১৯৪৭ সালে 'স্বয়ংসিদ্ধা', ১৯৪৯ সালে 'বিদুষী ভার্যা', ১৯৫০ সালে 'কঙ্কাল', ১৯৫১ সালে 'নিয়তি', 'পণ্ডিতমশাই', ১৯৫৩ সালে 'বৌঠাকুরানীর হাট' (রবীন্দ্রনাথের কাহিনী), ১৯৫৪ সালে

'অন্নপূর্ণার মন্দির' (উত্তম সুচিত্রা অভিনীত), ১৯৫৫ সালে 'কালিন্দী', ১৯৫৭ সালে 'উল্কা'।

এরপর থেকে নরেশদা আর কোনো ছবি করেছেন কিনা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। তবে ছবিতে কিংবা মঞ্চে অভিনয় করে গেছেন আরও বেশ কয়েক বছর। বিশ্বরূপা মঞ্চে দু-তিনটি নাটকে অভিনয় করা ছাড়াও শিল্পীদের অভিনয় শিখিয়েছিলেন তিনি।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে আমি একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতাম। পত্রিকাটির নাম ছিল 'সাতরঙ'। অর্থের আয়োজন করেছিলেন আমার বন্ধু ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, যিনি শুধু চিকিৎসাকার্যেই নয়, লেখক হিসেবেও ছিলেন সুপরিচিত। তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ জামাতা। ওই ষাটের দশকের শুরুতে আমাদের দু'জনের রক্তই টগবগ করে ফুটত নতুন কিছু করবার জন্য। আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা তারাশঙ্করবাবুকে পেয়েছিলাম আমাদের উপদেষ্টা হিসেবে। লেখার প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি পত্রিকার ব্যাপারে আমাদের সময় দিতেন। নিয়মিত লেখা তো দিতেনই, যা ওই সময় প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলিও পেত না।

শিশিরকুমার ভাদুড়িকে কেন্দ্র করে একটা সময়ে বাংলাদেশের ইনটেলেকচুয়ালদের একটা আড্ডা গড়ে উঠেছিল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ তৎকালীন বাগ্মীর দল সেই আড্ডার নিয়মিত সদস্য ছিলেন। আর ছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র। নাট্যকলা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও যে নরেশদার অধিকার ছিল তার প্রমাণ তখনই পাওয়া যায়। নরেশদার এই বাগ্মিতার সংবাদ দিনেন্দ্রনাথ মারফত রবীন্দ্রনাথের কানেও পৌঁছোয়। উভয়ের আলাপচারিতাও ঘটে। সেই থেকে নরেশদা রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজনদের একজন হয়ে ওঠেন।

শেষ জীবনে নরেশদা বৌদির অসুখ নিয়ে খুব বিব্রত ছিলেন। একটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে বৌদি আক্রান্ত হয়েছিলেন। দু-তিন বছর অনেক কষ্ট ভোগ করে বৌদি মারা যান। ওই সময় নরেশদা সব কাজকর্ম ছেড়ে বৌদিকে নিয়ে পড়ে থাকতেন। ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ছিলেন নরেশদার পারিবারিক চিকিৎসকদের একজন। বিশ্বনাথবাবুকে নরেশদা খুবই ভালবাসতেন।

'সাতরঙ' সম্পাদনা করতে গিয়ে আমার প্রায়ই নরেশদার কথা মনে হত। পঞ্চাশের দশকে একবার নরেশদাকে দিয়ে স্মৃতিকথা লেখানোর চেষ্টা করেছিলাম। চলচ্চিত্র এবং মঞ্চ সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, সমাজের তাবড় তাবড় ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়মিত ওঠা-বসা, সব মিলিয়ে ওঁর স্মৃতিকথা উপভোগ্য তো বটেই, একটা সময়ের বিশ্বস্ত দলিল হতে পারে বলে আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু নরেশদা তখন ছবির ব্যাপারে প্রচণ্ড ব্যস্ত। আমার প্রস্তাবে কান দিয়েছিলেন কিন্তু কলম ধরার অবকাশ পাননি। বৌদির মৃত্যুর পর নরেশদা যখন প্রায় নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে শুরু করলেন তখন আমি বিশ্বনাথবাবুকে বললাম নরেশদার স্মৃতিকথার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে।

এবং নরেশদা রাজিও হলেন। সেই স্মৃতিকথার প্রথম কিস্তি যখন আমার হাতে এল, সেটা পড়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। সবথেকে ভাল লাগল আর্টিকেলটির নামকরণ। 'স্মৃতির সুরভি'। বড় চমৎকার নাম।

নরেশদার প্রথম কিস্তির লেখাটা পড়ে অভিভূত হলাম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতুনি রয়ে গেল। নরেশদা তাঁর জীবনের অনেক ঘটনাই ছুঁতে ছুঁতে চলেছেন, কিন্তু সবই ওপর-ওপর, ভাসা-ভাসা। ঘটনার গভীরে তিনি যাচ্ছেন না। অথচ আমি চাইছিলাম একটি দীর্ঘ স্মৃতিচারণ যাতে গভীরতা তো থাকবেই, সেই সঙ্গে থাকবে নাটকীয়তা। পাঠকরা রুদ্ধশ্বাসে পড়বে এবং ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে।

আমার এই আকাঙ্ক্ষাটা নরেশদাকে জানানো প্রয়োজন। তাঁকে একটু 'ওয়ার্ম আপ' করানোও দরকার। সেই উদ্দেশ্যে একদিন সন্ধ্যেবেলা বিশ্বনাথবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বেলতলার বাড়িতে হাজির হলাম।

নরেশদাদের পুরনো আমলের বাড়ি। ভবানীপুর অঞ্চলের পুরনো বাড়িগুলি যেমন একটু স্যাঁতসেঁতে হয়, তেমনি। বাড়ির কাজের লোকটি আমাদের নিচের ঘরে বসাল। বললো ঃ বাবু পুজোয় বসেছেন একটু দেরি হবে আসতে।

ঘরে পুরনো আমলের আসবাব। ভারি ভারি চেয়ার টেবিল ইত্যাদি। মাথার ওপরের ডি-সি ফ্যানটিও

সাবেককালের। ঘরের আলো তেমন উজ্জ্বল নয়। একটা লালচে লালচে ভাব। সারা পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে।

আধ ঘণ্টাটাক পরে নরেশদা খড়ম পায়ে খটখট করতে করতে ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর অঙ্গে রক্তরাঙা পট্টবস্ত্র। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে গাঢ় করে আঁকা সিঁদুরের টিপ। ঘরে ঢুকে বললেন: তোমাদের বৌদির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।

কথাটা শুনে আমি আর বিশ্বনাথবাবু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। বছর দুই হল বৌদি গত হয়েছেন। নরেশদা কি এই বয়সে আবার সংসার পাতলেন। নরেশদা বোধহয় আমাদের মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন : না না, তোমরা যা ভাবছো তা নয়। আমি আমার বিগতা স্ত্রীর কথাই বলছি।

এবারে নরেশদার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ হল। আমি একা থাকলে আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি কাজের কথায় চলে আসতাম। কিন্তু বিশ্বনাথবাবু ঠোঁটকাটার মতো বলে ফেললেন : বৌদি তো দু'বছর আগেই—

নরেশদা বললেন : হ্যাঁ, তিনি গত হয়েছেন। আপনি তো তাঁর চিকিৎসা করতেন। আপনার চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে। কিন্তু সেটা তো তাঁর পার্থিব দেহ। আমার কাছে তিনি আসেন অপার্থিব দেহে। প্রত্যহই আসেন। আমার সুখ-দুঃখের খবর নেন।

আমি প্রশ্ন করলাম : কীভাবে?

নরেশদা বললেন : আমি পুজোয় বসে তাঁকে স্মরণ করি। তিনি এসে উপস্থিত হন। এই তো কিছুক্ষণ আগেও তিনি ছিলেন। চপলার সঙ্গেও কথা হল।

বিশ্বনাথবাবু বললেন : চপলা কে?

নরেশদা বললেন : আমাদের বাড়ির পুরনো-কাজের লোক। সম্প্রতি সে গত হয়েছে। আমার স্ত্রী আছেন পঞ্চম স্বর্গে। চপলাও সেখানেই গেছে।

বিশ্বনাথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : পঞ্চম স্বর্গ ব্যাপারটা কী?

নরেশদা বললেন : ওপারে সাতটি স্বর্গ আছে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্বর্গে স্থান পান। এছাড়া যাঁরা পুণ্যকর্ম করেছেন তাঁরা চতুর্থ এবং পঞ্চম স্বর্গে যান। বাকি সবাই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্বর্গে। একেবারে যারা পাপিষ্ঠ তারা প্রথম স্বর্গে ঠাঁই পায়। ওটাকেই বলে নরক।

আমি বললাম : আপনাদের কাজের লোক চপলা তাহলে পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন?

নরেশদা বললেন : তাই তো দেখছি। ব্যাপারটায় আমিও কম অবাক হইনি? ও একটা বস্তিতে থাকত। আমার স্ত্রীকে এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি তো মহা খাপ্পা। বললেন, যত পুণ্যে তোমাদের মতো ভদ্রলোকদেরই একচেটে অধিকার নাকি! চপলা বস্তিতে থাকে বলে সে পুণ্য কাজ করতে পারে না। মেয়েটি বড় ভালো। এখানে এসেও আমার দেখাশোনা করছে। তোমার জন্যে আমার মতো ওর মনেও খুব কষ্ট।

সমস্ত ব্যাপারটা রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখে আমি আলোচনার মোড় ঘোরাবার জন্য বললাম : নরেশদা, আপনার স্মৃতিকথার প্রথম কিস্তিটা দারুণ হয়েছে। তবে আমি আর একটু ডিটেলে চাইছি। তাতে যত বড় হয় হোক। আর নামকরণটাও অপূর্ব হয়েছে। 'স্মৃতির সুরভি'। বেশ কাব্যিক নাম।

নরেশদা বললেন : বেশ, তাই হবে। তবে 'স্মৃতির সুরভি' নামটা আমার দেওয়া নয়। শিশিরের দেওয়া।

আমি বললাম : শিশির মানে? শিশিরকুমার ভাদুড়ি?

নরেশদা বললেন : হ্যাঁ। প্রথম কিস্তিটা লেখার পর ভাবছিলাম কী নামকরণ করা যায়! তা শিশিরই আমাকে সেদিন বললে, তুই 'স্মৃতির সুরভি' নামটা দে।

ওঁকে বাধা দিয়ে বললাম : কিন্তু শিশিরবাবু তো ১৯৫৯ সালে দেহ রেখেছেন।

নরেশদা বললেন : সে তোমাদের হিসেবে। আমার কাছে তার মৃত্যু নেই। আমরা তো দু-একদিন ছাড়া ছাড়াই কথাবার্তা বলি। গল্পগুজব করি। আমার স্ত্রীই তো শিশিরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে

দিয়েছেন। ও থাকে তৃতীয় স্বর্গে।

নাঃ, নরেশদার মাথাটা দেখছি একেবারেই গেছে। এ যে পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবাকেও হার মানায়। এরপর হয়তো শুনব উনি পূজার আসনে বসে চৈতন্যদেব বা যিশুখ্রিস্টের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছেন। ওঁর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম।

নরেশদা বোধহয় আমাদের মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বললেন ঃ আমার কথাটা বিশ্বাস হল না, না? তাহলে একটা জিনিস দেখাই দেখো। আমার স্ত্রী আমার দেখাশোনা করার জন্য একজন শক্তিশালী ভৈরবকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি সব সময় আমার কাছে-কাছেই থাকেন।

এই বলে নরেশদা সেদিন যে কাণ্ডটা করলেন সে কথা ভাবলে আজও আমার সারা শরীর ভয়ে আর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

আগেই বলেছি নরেশদার ঘরে রয়েছে আগেকার আমলের ভারি ভারি কাঠের টেবিল-চেয়ার ইত্যাদি। ওইসব ভারি ভারি চেয়ার কোনও শক্তিমান লোকের পক্ষেও এক হাতে তোলা সম্ভব নয়। তেমনি একটি চেয়ারের পেছনে নরেশদা এসে দাঁড়ালেন। ডান হাতের একটিমাত্র আঙুল দিয়ে সেই চেয়ারের মাথাটা স্পর্শ করলেন। চোখ দুটি বোজা অবস্থায় তাঁর সেই অননুকরণীয় অনুনাসিক কণ্ঠস্বরে ডাকতে লাগলেন ঃ বাবা এসো। বাবা এসো। বাবা এসো।

হঠাৎ অনুভব করলাম ঘরের পরিবেশটা যেন আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। 'স্মৃতির সুরভি'-র লেখকের শরীর থেকে যেন অন্য এক ধরনের সুরভি ভেসে আসছে। ম্রিয়মান বাল্বের আলোটা যেন আমার চোখে আস্তে আস্তে আরও ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে। রক্তাম্বর পরিহিত, রুদ্রাক্ষের মালা শোভিত, কপালে সিন্দুরচর্চিত বৃদ্ধ নরেশচন্দ্র মিত্রের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান শোনা যাচ্ছে ঃ বাবা এসো...বাবা এসো...বাবা এসো...।

হঠাৎ শব্দ করে চেয়ারটি একপাক ঘুরে নরেশদার সামনাসামনি হয়ে গেল। নরেশদার চোখ দুটি তখনও বোজা। কণ্ঠে 'বাবা এসো' ধ্বনি। পুনরায় শব্দ করে চেয়ারটি আবার স্বস্থানে চলে গেল। নরেশদা কিন্তু একবারের জন্যেও চেয়ারের মাথায় একটি আঙুলের জায়গায় দুটি আঙুল স্পর্শ করাননি।

এই ঘটনার পর নরেশদার সঙ্গে আর দুটি একটি কথা বোধহয় হয়েছিল। উনি চা খাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের তখন চা খাবার মতো শারীরিক বা মানসিক অবস্থা কোনটাই ছিল না। কেমন একটা আচ্ছন্নের মতো বেরিয়ে এসেছিলাম নরেশদার বেলতলার বাড়ি থেকে।

আমি না হয় সাধারণ মানুষ। ভূত-প্রেত-ভগবান সবেতেই বিশ্বাস করি। কিন্তু ডাঃ বিশ্বনাথ রায় তো বিজ্ঞানের সেবক। ওসবে ওঁর বিশ্বাস করার কথা নয়। কিন্তু তিনিও সেদিন আমার মতো আচ্ছন্ন অবস্থাতেই বাড়ি ফিরেছিলেন। ওঁর গাড়িতে বসে সারা রাস্তা আমরা বোধহয় একটি কথাও বলতে পারিনি।

এই সমস্ত ব্যাপারটা হিপ্নোটিজম্ অথবা সিনিয়ার পি সি সরকারের ম্যাজিক (জুনিয়ার তখনও আবির্ভূত হননি) ভেবে মনটাকে প্রবোধ দিতে পারতাম হয়তো। কিন্তু তার কয়েকদিন পরেই আমার বন্ধু গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর মুখে শুনলাম নরেশদা নাকি রেডিও স্টেশনে নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে একঘর লোকের সামনে ভৈরবের ব্যাপারটা ঘটিয়েছেন। সবার তাক লেগে গেছে নরেশদার কাণ্ডকারখানা দেখে।

নরেশদা কিন্তু তাঁর 'স্মৃতির সুরভি' দু-তিনটি সংখ্যার বেশি লিখতে পারেননি। ওটা লেখা হলে বাংলা সংস্কৃতিজগতের একটা অধ্যায়ের দলিল হয়ে থাকতে পারত। না লেখার ব্যাপারে নরেশদা শারীরিক কারণ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা অন্য। হয়তো অন্য স্বর্গ থেকে না লেখারই নির্দেশ এসেছিল তাঁর কাছে। কারণ সব সত্যি কথা যদি নরেশদা লিখতেন তাহলে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির ভাবমূর্তির বেলুনটি হয়তো ফুটো হয়ে যেত।

আমার এই ধারণাটা সত্যি কিনা সেটা নরেশদার কাছ থেকে জেনে নেওয়া হয়নি। কারণ ১৯৬৮ সালে তাঁর পার্থিব শরীরটাই তো চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে। নরেশদা এখন কত নম্বর স্বর্গে আছেন কে জানে।

ধীরাজদা

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে সিনেমাপাড়ায় একটা রসিকতা চালু ছিল। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দুষ্টুমি করলে তাদের বাবা-মা নাকি ভয় দেখাতেন : ওই ধীরাজ ভট্‌চাজ আসছে। এক্ষুনি ধরে নিয়ে যাবে।

এটা হয়তো রসিকতাই। তবে সেই সময় ছবির পর্দায় ধীরাজ ভট্টাচার্যকে যে রকম ভয়াল ভয়ঙ্কর চেহারায় দেখা যেত তাতে এই রসিকতাটা খুব খাপ খেয়ে গিয়েছিল। চল্লিশের দশকের শেষ থেকে পরবর্তী দশটা বছর ধীরাজদাকে হয় খলনায়ক নতুবা কোনও বীভৎস চরিত্রে দেখা গেছে। দর্শকবা তো প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিলেন যে ধীরাজ ভট্টাচার্য নামক অভিনেতাটি এককালে ধর্মমূলক ছবির বাঁধাধরা কেষ্টঠাকুর অথবা সামাজিক ছবির একটু বোকাসোকা, একটু ভালমানুষ প্রেমিকের চবিত্রে প্রায় ডজন তিনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন।

ধীরাজদার জন্ম যশোর জেলার পাঁজিয়া গ্রামে ১৯০৫ সালে। ১৯২৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ইন্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে সিনেমার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সুদর্শন চেহারা, একমাথা ঘন কোঁকড়া চুল, ঈষৎ ট্যারা হলেও চোখের চাউনিতে মাদকতা। এরই জোরে ম্যাডান কোম্পানির নির্বাক ছবি 'সতীলক্ষ্মী'তে চান্স পেয়ে গেলেন।

ছবি মুক্তি পাবার পর বাড়িতে অশান্তি। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অসন্তোষ। ধীরাজদার বাবা শিক্ষকতা করতেন। সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্যে ধীরাজদাকে পুলিশের চাকরিতে ভর্তি করে দিলেন। প্রথম পোস্টিং চট্টগ্রামে। সেখান থেকে বর্মায়। ব্রহ্মদেশ তখন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ওই চাকরিতে টিকতে পারলেন না। চাকরি ছেড়ে পালিয়ে এলেন।

দেশে ফিরে নানাভাবে চেষ্টা করলেন একটি চাকরি পাবার জন্য। নিষ্ফল প্রচেষ্টা। অনন্যোপায় হয়ে সিনেমা জগৎটাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইলেন। পরিচালক মধু বসু তখন ম্যাডান কোম্পানির হয়ে রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' গল্পটি নিয়ে 'গিরিবালা' নামে একটি ছবি করার তোড়জোড় করছেন। তখনকার অধিকাংশ ছবির একচ্ছত্র নায়ক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুবাবু নতুন মুখ খুঁজছিলেন। বিখ্যাত ব্যঙ্গলেখক এবং 'অচলপত্র'র সম্পাদক দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের পিতা সুধীরেন্দ্র সান্যাল ছিলেন সিনেমার পাবলিসিটি অফিসার। সুধীরদাই মধুবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন ধীরাজদার। মধুবাবুর পছন্দ হয়ে গেল। সেই থেকে পাকাপাকি ভাবে ধীরাজদার চলচ্চিত্রজীবন শুরু। সেটা ১৯৩০ সাল।

পুলিশ-জীবন এবং নায়ক-জীবনের প্রথম পর্ব নিয়ে ধীরাজদা পরবর্তীকালে দু'খানি বই লেখেন। প্রথমটির নাম 'যখন পুলিশ ছিলাম' এবং দ্বিতীয়টি 'যখন নায়ক ছিলাম'। দুটি লেখাই 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। দারুণ প্রশংসাও পেয়েছিল।

ম্যাডান কোম্পানিতে ধীরাজদার আলাপ হয় বিখ্যাত অভিনেতা এবং পরিচালক নরেশ মিত্রের সঙ্গে। উভয়ে একই জেলার মানুষ। নরেশদা ধীরাজদাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। বস্তুত অভিনয়ের ব্যাপারে ধীরাজদা যতটুকু তালিম পেয়েছেন তা নরেশদার কাছ থেকেই পেয়েছেন।

সতীলক্ষ্মী এবং গিরিবালা ছাড়া আর তিনখানি নির্বাক ছবিতে ধীরাজদা অভিনয় করেছেন। সেগুলি হল কাল পরিণয়, মৃণালিনী এবং রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে নৌকাডুবি। শেষোক্ত ছবিটি নরেশ মিত্রের পরিচালনা।

সবাক যুগে ধীরাজদার প্রথম ছবি কৃষ্ণকান্তের উইল। তারপর থেকেই তাঁর শুরু হল পৌরাণিক এবং ধর্মমূলক ছবিতে অভিনয়ের পালা। যমুনা পুলিনে, চাঁদ সদাগর, দক্ষযজ্ঞ, রাজনটী বসন্ত সেনা, বাসবদত্তা, নরনারায়ণ, কৃষ্ণ সুদামা ইত্যাদি। কস্টিউম ছবিতে অভিনয় করতে করতে ধীরাজদা বীতশ্রদ্ধ

হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর ওই কেষ্টঠাকুর মার্কা চেহারা দেখে প্রযোজকরা অন্য ধরনের ছবিতে তাঁর কথা ভাবতে চাইলেন না। ধীরাজদা যে অন্য কোনও রাস্তা ধরবেন তার উপায়ও নেই। সংসারের সব দায়-দায়িত্ব তখন তাঁর কাঁধে। যেমন করে হোক পয়সা রোজগার করতেই হবে। প্রযোজকদের ইচ্ছাপূরণ ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা তাঁর সামনে খোলা নেই।

ওই ধরনের একঘেঁয়ে ভূমিকায় তাঁকে দেখতে দেখতে দর্শকদের মনেও ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে তাঁর বোধহয় অন্য কোনও ধরনের অভিনয় করবার যোগ্যতা নেই। দর্শকদের ভাষায় তখন তিনি 'রাঙামুলো'।

১৯৩৫ সাল নাগাদ ধীরাজদা 'কণ্ঠহার' ছবিতে কানন দেবীর বিপরীতে অন্য এক ধবনের একটা ভূমিকা পেলেন। একটু ভিলেন টাইপের রোল। অভিনয় ভালই করলেন। কিন্তু কস্টিউম ড্রামার হাত থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেলেন না। 'জোয়ার ভাঁটা' নামে চার রিলের একটা ছোট ছবি পরিচালনাও করলেন। কিন্তু সেটা তেমন জমল না। তবে একটা কাজ হল। পরপর সামাজিক ছবিতে কাজ পেতে লাগলেন। অধিকাংশই মেরুদণ্ডহীন নায়কের ভূমিকা। যার কাজ কেবলমাত্র প্রেম করে যাওয়া। 'ব্যবধান' নামে একটা ছবিতে প্রতিমা দাশগুপ্তর বিপরীতে প্রেমের খেলায় রীতিমত সেক্স-টেক্সের প্রয়োগ করলেন। কিন্তু রাঙামুলো বিশেষণের শাপমুক্তি তাতেও ঘটল না। ফলে ধীরাজদার বয়স যখন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে তখনও তাঁকে বিশ বছরের তরুণী নায়িকার বিপরীতে গাছের ডাল ধরে ধরে প্রেমের গান গেয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

ওই সময়ে সাহিত্যিক পরিচালক শৈলজানন্দের হাতে পায়ে ধরেছিলেন ধীবাজদা। উনি তখন শৈলজানন্দেব 'শহর থেকে দূরে', 'মানে না মানা' ইত্যাদি ছবিতে রোমান্টিক নায়ক করছিলেন। ধীরাজদা বলেছিলেন · শৈলজা, তোর পায়ে পড়ি। একটু অন্য ধরনের রোল আমায় দে। এই বয়েসে আমি আর প্রেম প্রেম খেলা খেলতে পারছি না রে' লোকে আমার বাপ-বাপান্ত করছে।

শৈলজানন্দ হেসে বলেছিলেন : পাগল নাকি! তুমি হচ্ছো নায়ক। মহানায়ক। সিনেমার রাজ্যে তুমি নায়ক হয়ে জন্মেছো, নায়ক হয়েই তোমাকে মরতে হবে।

ধীরাজদার শাপমুক্তি ঘটিয়েছিলেন আর এক সাহিত্যিক পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯৪৭ সালে 'নতুন খবর' ছবিতে তিনি ধীরাজদাকে একটি টাইপ রোল দিলেন। যশুরে ভাষার সংলাপে ওই চরিত্রটিতে ধীরাজদা কামাল করে দিলেন। আর তার পরের বছরই 'কালো ছায়া' ছবিতে ভিলেন রোল। একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেল ধীরাজদার সামনে। ১৯৫০ সালে নরেশ মিত্রর 'কঙ্কাল' ছবির পর ধীরাজদা বাংলা সিনেমার সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ খলনায়ক হিসেবে একের পর এক ভিলেন করে যেতে লাগলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখিত বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের ভয় দেখানোর রসিকতাটা চালু হয়ে গিয়েছিল।

ধীরাজদার সেই সময়কার ছবিগুলোর নাম শুনলেই বোঝা যাবে কী ভয়াল ভয়ঙ্কর রোল তাঁকে করতে হত। মরণের পরে, হানাবাড়ি, ডাকিনীর চর, রাত একটা, ধূমকেতু—এইসব ছিল ধীরাজদা অভিনীত তখনকার সব ছবির নাম।

শেষ জীবনে আবার ব্যাড ম্যানের ইমেজ কাটিয়ে গুড ম্যান হয়ে গিয়েছিলেন ধীরাজদা। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকে হাজারি ঠাকুরের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করার পর তাঁর এই রূপান্তর ঘটে।

ঠিক ওই সময় থেকেই ধীরাজদার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়। সপ্তাহে একদিন কি দুদিন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হওয়াটা ছিল অবধারিত। ওই 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকের সূচনাপর্বে আমার একটা ছোট্ট ভূমিকা ছিল। পরে তিনি একবার আমার দেশের বাড়িতেও গিয়েছিলেন বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে।

পঞ্চাশের দশকেই ধীরাজদার লেখক হিসেবে আবির্ভাব 'দেশ' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। 'যখন পুলিশ ছিলাম'। কিন্তু ধীরাজদার ভাগ্যটা বরাবরই মন্দ। অনেকেই বলাবলি করতে লাগল : ওটা ধীরাজ ভট্চাযের লেখা হতেই পারে না। প্রেমেন মিত্তির ওর বন্ধু। সেই ওর নামে লিখে দিয়েছে।

ধীরাজদাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম : ধীরাজদা, এসব কী শুনছি। লোকজন কী বলাবলি করছে

শুনেছো?

ধীরাজদা কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন : সবই আমার ভাগ্য। তুই বিশ্বাস কর রবি, প্রেমেন আমার বন্ধু বটে, এক পাড়ায় থাকি, কাজ না থাকলে সকালটা ওর বাড়িতে আড্ডাও দিই, কিন্তু ছাপার আগে আমার লেখাটা ও পড়েও দেখেনি কোনওদিন।

প্রেমেনদাকেও একদিন আড়ালে জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রশ্নটা। প্রেমেনদা হাসতে হাসতে বলেছিলেন : তুমি পাগল হয়েছো! আমি হলাম কুঁড়ের বাদশা। আমার কাছ থেকে একটা লেখা পেতে কতটা কালঘাম ছুটে যায় সেটা তো তুমি ভাল করেই জানো! সেই আমি কিনা অত বড় একটা লেখা লিখে দেব ধীরাজের নামে' ওসব নিন্দুকের রটনা। ওরকম মানুষ চিরকালই থাকে। রবীন্দ্রনাথকে প্রথম প্রথম এরমক অনেক অপবাদ সইতে হয়েছে।

ধীরাজদাও প্রথম প্রথম এসব কথায় আহত হতেন। পরে ওসব আর ভ্রূক্ষেপ করতেন না। 'দেশ' পত্রিকার হাজার হাজার পাঠকের প্রশংসা তাঁকে সাহস যুগিয়েছিল। নইলে তার পরে 'যখন নায়ক ছিলাম' লেখায় হাত দিতে পারতেন না।

তবে বই দুটো বাজারে বেরুবার পর একটা ঘটনায় খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। যে নরেশ মিত্রকে ধীরাজদা অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন, সেই নরেশদার একটি মর্মান্তিক ব্যবহারই তাঁর দুঃখের কারণ।

ঘটনাটা ঘটেছিল অমৃতবাজার পত্রিকার তুষারকান্তি ঘোষকে কেন্দ্র করে। তুষারবাবু, ধীরাজদা আর নরেশদা তিনজনই যশোরের লোক। নরেশদা আবার তুষারবাবুর সম্পর্কে ভাই হন। একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে ধীরাজদাকে দেখতে পেয়ে তুষারবাবু বলে উঠলেন : এই যে ধীরাজ, তুমি সত্যিই আমাদের জেলার গর্ব। কী অসাধারণ দু'খানা বই যে তুমি লিখেছো—

তুষারবাবুর কথার মাঝখানেই নরেশদা হঠাৎ বলে উঠলেন : হ্যাঁ তুষার, যে কথা বলছিলাম—

এই বলে তিনি তুষারবাবুকে প্রসঙ্গান্তরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরকম একবার আধবার নয়, অন্তত বার পাঁচেক। তুষারবাবু যতবারই ধীরাজদার লেখার প্রসঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে যান, নরেশদা ততবারই তাঁকে থামিয়ে দেন অন্য কথা তুলে।

ধীরাজদা পরে আমাকে বলেছিলেন : বুঝলি রবি, সেদিন আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল। নরেশদা অভিনেতা হিসেবে, পরিচালক হিসেবে, এমনকি মানুষ হিসেবে কত বড়। তিনি আমার মতো চুনোপুঁটি একজন লেখক সম্পর্কে এতটা জেলাস হয়ে পড়বেন, এটা তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

বলতে বলতে ধীরাজদার চোখে সত্যিই জল এসে গিয়েছিল।

এবারে ধীরাজদার জীবনের আর একটি ঘটনা বলে এই স্মৃতিচারণা শেষ করব। ঘটনাটি মজারও বটে, দুঃখেরও বটে।

সেটা ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস। আমি তখন উল্টোরথ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ক'দিন পরেই পুজো সংখ্যা বেরুবে। কাজের প্রচণ্ড চাপ। সন্ধে সাতটা নাগাদ আমার একটা টেলিফোন এল। ফোনের অপর প্রান্তে ধীরাজদা। বললেন : এত রাত পর্যন্ত দফতরে বসে কী করছিস? বাড়ি যাবি না?

বললাম : সাতদিন পরে পুজো সংখ্যা বেরুবে। এখন নিজের বাড়ি কেন, যমের বাড়ি থেকে ডাক এলেও যাবার উপায় নেই।

ধীরাজদা বললেন : ষাট ষাট! যমের বাড়ি যাবি কেন! তার চেয়ে এক্ষুনি একবার আমার বাড়ি চলে আয়। ভয়ানক জরুরি দরকার।

বিব্রত কণ্ঠে বললাম : আজ থাক না ধীরাজদা। অনেক কাজ। নেক্সট উইকে নিশ্চয় যাব।

টেলিফোনের ওপার থেকে ধীরাজদার উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে এল : নেক্সট উইক কী রে, নেক্সট ডে পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। এক্ষুনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আয়। ভাড়া আমি দেব। তুই না আসা পর্যন্ত চোখের সামনে থেকে ডেড বডিটাকে সরাতে পারছি না

আঁতকে উঠে বললাম : ডেড বডি! তার মানে মৃতদেহ?

ধীরাজদা বললেন : হ্যাঁ রে হ্যাঁ, মৃতদেহ। পেটটা ফুলে ঢোল হয়ে আছে। টেলিফোনে সব কথা বলা যাবে না। তাড়াতাড়ি চলে আয়।

সব জরুরি কাজ মাথায় উঠল। মৃতদেহের খবর শোনার পর ধীরাজদার বাড়ি তো না গেলেই নয়। কোথায় কী ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসে আছেন কে জানে!

বিবেকানন্দ রোড থেকে ট্যাক্সি ধরে ভবানীপুরে বলরাম বসু ঘাট রোডে ধীরাজদার বাড়ির দরজায় পৌঁছলাম প্রায় আটটায়। হন্তদন্ত হয়ে ধীরাজদার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে আহ্বান এল : এসিচিস! আয়, ভেতরে আয়।

ভিতরে ঢুকেই নজরে পড়ল ধীরাজদার হস্তধৃত রঙিন পানীয়ের দিকে। চোখ দুটি রসসিক্ত। অনুমানে বুঝলাম অন্তত ঘণ্টাখানেক ধরে এই সান্ধ্য আহ্নিকের পালা চলছে।

ঘরের ভিতরে ডেডবডি কেন একমাত্র ধীরাজদার লিভিং বডি ছাড়া আর কোনও বডি নজরে পড়ল না। স্পষ্টই বুঝলাম ধীরাজদা আমার সঙ্গে রসিকতা করেছেন।

ধীরাজদার সামনাসামনি একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসতে বসতে বললাম : জরুবি কাজ ফেলে আমাকে এভাবে টেনে আনার মানে হয়! খুব অন্যায় করেছেন আপনি।

ধীরাজদা বরাভয় দানের ভঙ্গিতে ডান হাতখানা উঁচু করে বললেন : ঠাণ্ডা হয়ে বোস দিকি। ডেডবডিটা দেখার পর থেকে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। একজন কাউকে না বলা পর্যন্ত আমার উত্তেজনা কাটবে না।

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম : কোথায় ডেডবডি?

ধীরাজদা বললেন : বসুশ্রী সিনেমায়।

আমি বললাম : তার মানে' বসুশ্রীতে কোনও খুন-খারাবির ব্যাপার ঘটেছে নাকি?

ধীরাজদা ঠোঁট উল্টেট বললেন : তুই একটা ওয়ার্থলেস। আমি বলছি ডেডবডির কথা, আর তুই গোয়েন্দা কাহিনীর মতো অকুস্থলে একটা রক্তাক্ত লাশ দেখতে চাইছিস। তোর কিস্যু হবে না। কী করে যে সাংবাদিকতা করিস!

আমি হতভম্বের মতো বললাম : আপনিই তো বললেন বসুশ্রী সিনেমায় ডেডবডির কথা।

ধীরাজদা হাতের গ্লাসে আরাম করে একটা চুমুক দিয়ে বললেন : বলেছি নাকি! তাহলে ওটা একটু কারেকশান করে নিতে হবে। আমি ডেডবডিটা দেখেছি বসুশ্রী সিনেমার পর্দায়।

আমি বললাম : সেখানে তো সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' দেখানো হচ্ছে।

ধীরাজদা একটা চোখ একটু নাচিয়ে বললেন : এই এতক্ষণে টু দ্য পয়েন্ট আসতে পেরিচিস। ওই পথের পাঁচালী ছবিতেই তো দেখলাম একটা ব্যাং মরে চিৎপটাং হয়ে জলের ওপর ভাসছে। তার পেটখানা ফুলে ঢোল। ব্যাং মরলে ঢোলাপেটে চিৎ হয়ে পড়ে থাকে আগে কখনও দেখেছিস?

আমি ঠোঁট উল্টে বললাম : তা দেখব না কেন। আমি মফস্বলের ছেলে। ওরকম মরা ব্যাং পুকুরের জলে ভেসে থাকতে কয়েক ডজন দেখেছি।

ধীরাজদা বললেন : সে তা আমিও দেখেছি! কিন্তু ছবির পর্দায় দেখেছিস কখনো। এমন মরা ব্যাং, জলের ওপর পোকা-মাকড়ের খেলা, গ্রামের শুঁড়িপথ, কাশবন, অনেক দূরে হারিয়ে যাওয়া রেলের লাইন—সব কিছু যেন জীবন্ত। তার চেয়েও জীবন্ত এই ছবির মানুষগুলো। এতকাল তো সিনেমার পর্দায় সাজা-মানুষ দেখে এসেছি। নিজেও যা করেছি সব সাজা-মানুষ। এই পথের পাঁচালী ছবিটা দেখিয়ে দিল আমরা কত ব্যাক ডেটেড।

বুঝলাম ডেডবডি-ফেডবডি কিছু নয়, পথের পাঁচালী ছবিটাই ওঁর উত্তেজনার কারণ। অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের আক্ষেপের সঙ্গে সাহিত্যিক ধীরাজ ভট্টাচার্যের অনুভূতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

এই 'পথের পাঁচালী' ছবিটি পরবর্তীকালে কান্ চলচ্চিত্র উৎসবে যখন 'বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট'-এর মর্যাদা পেল তখন ধীরাজদা আবার আমাকে টেলিফোন করে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অনেক কথা হয়েছিল বাংলা চলচ্চিত্রের অতীত আর বর্তমান নিয়ে। আর তার কিছুদিন পরে এক সত্যজিৎ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ধীরাজদার মতো গোপন সত্যজিৎ-অনুরাগীকে উপেক্ষিত অবস্থায় উঠতি ইনটেলেকচুয়ালদের কনুইয়ের গুঁতো খেতে খেতে ম্লান মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলাম। আমার সঙ্গে

চোখাচোখি হতে একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা ওল্ড হ্যাগার্ডসদের দলে পড়ে গেছি, তাই না?

আমি সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলেছিলাম . না না, ও কথা ভাবছেন কেন?

ধীরাজদা বললেন : ভাবতে বাধ্য করছে যে! ওরা কি জানে না, যে রাস্তার ওপর ওরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই রাস্তা আমরা বুকের রক্ত দিয়ে মসৃণ করে রেখেছি। ওঃ, সে সব কী দিনকাল গেছে। সিনেমায় অভিনয় করি বলে বাড়ি ভাড়া দিতে চাইত না কেউ। পাড়ায় ঢুকলে পট পট করে এ-বাড়ি ও-বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ হয়ে যেত আইবুড়ো মেয়েদের ইজ্জত বাঁচানোর জন্যে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ির কোনও অনুষ্ঠানে গভীর রাতে হাজির হতাম পাছে অন্যান্য আমন্ত্রিতরা আমাদের দেখলে রাগ করে সম্পর্ক ছেদ করেন। এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেও সিনেমার মতো এত বড় আর্ট আর কালচারকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি। এই তার পুরস্কার?

বলতে বলতে ধীরাজদার চোখের কোল দুটো জলে ভরে এসেছিল।

এরই এক দশকের মধ্যে ধীরাজদা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন এক বুক অভিমান নিয়ে।

কমলদা

'খিস্তির চোটে ভূত ভাগানো' কথাটা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছিলাম। কিন্তু সেটার সার্থক প্রয়োগ দেখেছিলাম স্টার থিয়েটারের গ্রিনরুমে অভিনেতা কমল মিত্রের কাছে এসে। কেউ যদি কোন বদ মতলব নিয়ে স্টার থিয়েটারের গ্রিনরুমের চত্বর মাড়াতেন, তাহলে কমলদা তাকে এমন খিস্তি করতেন যে শুধু ভূত কেন, ভূতের বাবাও পালাতে পথ পেত না। এই নিয়ে একটা মজার ঘটনা আছে। ঘটনাটা আমি নিজের চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি খুব রিলায়েবল সোর্স থেকে। হুয়াদা, মানে অভিনেতা শ্যাম লাহার মুখ থেকে ঘটনাটা শোনা।

কমলদা যখন স্টার থিয়েটারে অভিনয় করতেন তখন সেখানে বেশ কিছু অভিনেত্রী ছিলেন যাঁরা ছোট ছোট রোল করতেন। এইরকম দু-তিনজন অভিনেত্রী একবার কমলদাকে এসে বললেন : কমলদা, এক ভদ্রলোক গত ছ'মাস ধরে আমাদের খুব বিরক্ত করছেন। আপনি এর একটা বিহিত করুন।

কমলদা মেয়ে তিনটির দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন : ভদ্রলোকের সঙ্গে মাখামাখি শুরু করবার সময় খেয়াল ছিল না? এখন আমার কাছে এসেছো কেন?

একটি মেয়ে বললে : আমরা মাখামাখি করিনি কমলদা। মাস ছয়েক আগে উনিই আমাদের কাছে এসে বললেন, উনি একটা থিয়েটার গ্রুপ করতে চান। মফস্বলে কল্ শো করবেন। ভালো ভালো অভিনেত্রী চান। আমাদের অভিনয় ওঁর খুব পছন্দ হয়েছে। তাই ওঁকে খাতির করতাম। উনি এলে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম।

কমলদা বললেন : এ তো ভালো কথা। এতে গোলমালটা কোথায়?

অন্য একটি মেয়ে বললে . গত ছ'মাস ধরে উনি কেবল আমাদের সঙ্গে কথাই বলে যাচ্ছেন। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তার ওপর আমাদের তিনজনকেই আলাদা করে বলেছেন তাকেই হিরোইন করবেন। তাতেই আমাদের মনে সন্দেহ হচ্ছে।

কমলদা বললেন : এতে সন্দেহের কী আছে। একটা নাটকে কি তিনজন হিরোইন থাকতে পারে না? আর বড় করে প্রোডাকশন নামাবেন তাই হয়তো একটু দেরি হচ্ছে।

তৃতীয় মেয়েটি বললে : না কমলদা, ভদ্রলোকের মতলব খারাপ। আমাকে ওঁর সঙ্গে দীঘা যেতে বলছেন। দু'রাত্তির থাকবেন সেখানে। আর এ কথাটা কাউকে বলতে বারণ করেছেন। ওঁর প্রস্তাবে রাজি হলে হিরোইনের রোলটা আমার পাকা হবে!

কমলদা বললেন : এই ব্যাপার! তা কোন লোকটা বল দেখি। ওই যে একটা কালো মুশকো মতো লোক তোদের ভিজিটিং রুমে ডেকে পাঠায় সেই লোকটা নাকি?

তিনটি মেয়ে একসঙ্গে বলে উঠল : হ্যাঁ হ্যাঁ কমলদা, ওই লোকটাই।

কমলদা বললেন : ঠিক আছে। তোরা মেক-আপ রুমে যা। আজকে ভদ্রলোক দেখা করার জন্যে স্লিপ পাঠালে স্লিপটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি। তারপর যা করবার আমি করব। তোদের আর কিছু ভাবতে হবে না।

যথাসময়ে ভিজিটিং রুম থেকে ভদ্রলোকের স্লিপ এল। সে স্লিপ যথারীতি কমলদার হাতে পৌঁছল। তিনি ভিজিটিং রুমে গিয়ে ভদ্রলোককে বললেন : আপনি থিয়েটার পার্টি করবেন?

ভদ্রলোক মেয়েদের সঙ্গে গপ্পো করবার জন্যে বেশ আয়েস করে বসে ছিলেন, হঠাৎ কমলদাকে দেখে কেমন হকচকিয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন : হ্যাঁ মানে না—না মানে—

কমলদা ধমকে উঠলেন : আর মানে মানে করতে হবে না। আপনার মতলব বোঝা গেছে। যদি সত্যিই থিয়েটার করতে চান তাহলে কাল ওদের তিনজনের জন্যে পাঁচশো টাকা করে দেড় হাজার টাকা অ্যাডভান্স আমার কাছে দিয়ে যাবেন। আমি ওদের লোকাল গার্জেন।

ভদ্রলোক সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে সুট সুট করে ভিজিটিং রুম থেকে সরে পড়বার তাল করছিলেন। কমলদা তাঁর পথ আটকালেন। বললেন : যাচ্ছেন কোথা? গত ছ'মাস ধরে যে ওদের সিটিং দিইয়েছেন তার জন্যে একশোটা টাকা ছাড়ুন দেখি। ওরা মিষ্টি খাবে।

ভদ্রলোক হতভম্বের মতো বললেন : আজ্ঞে আমার কাছে তো অত টাকা নেই।

কমলদা বললেন : কত আছে?

ভদ্রলোক পাঞ্জাবির ভেতরের পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে বললেন : আমার কাছে এই পাঁচটা টাকাই আছে।

কমলদা খপ করে ভদ্রলোকের হাত থেকে পাঁচটা টাকা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন : পাঁচ টাকা সম্বল করে থিয়েটারের মেয়েদেব সঙ্গে আড্ডা দিতে এসেছেন। এই পাঁচ টাকা নিয়েই দীঘা ঘুরে আসার মতলব ছিল নাকি?

ভদ্রলোকে বুঝলেন বড় শক্ত পাল্লায় পড়েছেন। মিনমিন করে বললেন : আজ্ঞে ওর থেকে দুটো টাকা ফেরত দিন। আমার বাস ভাড়া নেই।

কমলদা চেঁচিয়ে উঠলেন : হেঁটে হেঁটে বাড়ি যান, শরীরের মেদ ঝরবে। ওরে আমার ফোতো কাপ্তেন! থিয়েটারের মেয়েরা খুব সস্তা, না? ফের যদি কোনদিন এ তল্লাটে দেখি তাহলে মেরে খাল খিঁচে দেব। উল্লুখ পাজি ছুঁচো রাস্কেল কোথাকার।

কমলদার চিৎকারে স্টার থিয়েটারের গ্রিনরুমের দারোয়ান ছুটে এল। বললে : কী হয়েছে কোমলবাবু?

কমলদা বললেন : কিছুই হয়নি। তুই তোর কাজে যা। আর এই লোকটাকে দেখে রাখ। একে কোনদিন গ্রিনরুমে ঢুকতে দিবি না।

এই বলে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে কমলদা ধমকে উঠলেন : এখনও দাঁড়িয়ে আছিস। তোর সাহস তো কম নয়। যা হতভাগা, বেরো। দূর হ এখান থেকে!

এই হলেন কমল মিত্র। কোনও মতলববাজ মানুষকে দেখলে তাঁর চোখ দিয়ে আগুন আর মুখ দিয়ে অনর্গল খিস্তি ছুটত।

কমলদাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আপনি এত খিস্তি করেন কেন?

কমলদা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন : স্বাস্থ্যটা ভালো রাখার জন্যে।

বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : তার মানে?

কমলদা বলেছিলেন : আমাদের মনের মধ্যে যত ক্লেদ, যত আবর্জনা জমে তার একটা আউটলেট দরকার তো! অন্য কে কী ভাবে সেটা বার করে তা আমি জানি না। তবে আমি সেটা মুখ দিয়ে বার করে দিই। এতে শরীর আর মন দুটোই ভালো থাকে। আর জানো তো, আমি বরাবরই একটু বীররসের অভিনয় করতে ভালোবাসি।

কমলদার কথা শুনে হেসে ফেলেছিলাম। বলেছিলাম : কিন্তু লোকে তো আপনার এই খিস্তির জন্যে নিন্দেমন্দ করে।

কমলদা বলেছিলেন : লোকের কথায় আমি থোড়াই কেয়ার করি। যারা খিস্তি খাবার মতো কাজ করবে তাদের খিস্তি না করে পুজো করতে হবে নাকি? কই তোমাকে তো খিস্তি করি না, পঞ্চাকে (প্রচার সচিব শ্রীপঞ্চানন) তো করি না। তোমরা তো রোজ আসো এখানে। তোমাদের কোনদিন কোনও কটু কথা বলেছি?

উত্তরে বলেছিলাম : তা অবশ্য বলেননি। তবু একটু রেখে ঢেকে চললে ক্ষতি কী!

কমলদা রেগে গিয়েছিলেন আমার কথা শুনে। বলেছিলেন : ওসব রাখ-ঢাক গুড়-গুড় আমার ধাতে নেই। যা বলবার পষ্টাপষ্টি মুখের ওপরেই বলে দিই। এর জন্য ঠোঁটকাটা বলে বদনাম আছে আমার।

সেটা ঠিক কথা। কমলদা সত্যিই স্পষ্টবক্তা। কারও পেছনে কোন কথা বলেন না। যা বলবার সামনাসামনি বলে দেন। এর জন্যে তাঁর অনেক ক্ষতিও হয়েছে। কিন্তু কমলদা সেসব কিছুই কেয়ার করেননি। কী থিয়েটার আর কী সিনেমার জগতে চিরকাল সম্রাটের মতোই কাটিয়ে গেছেন। আজও

এই রিটায়ার্ড লাইফেও তাঁর সেই সম্রাটের মেজাজ। ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে সম্রাট সুলভ মেজাজ নিয়েই কাল কাটাচ্ছেন অভিনয় জীবন থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে। এই আশি বছর বয়সেও জরা তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কারও কাছে যান না কাজের জন্য উমেদারি করতে।

কমলদার জন্ম ১৯১২ সালের ৯ ডিসেম্বর বর্ধমান শহরে। ওঁদের আদি নিবাস হুগলি জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত চাঁদড়া গ্রামে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইয়ের নির্দেশে কমলদার ঠাকুর্দা ডাক্তার জগবন্ধু মিত্র বর্ধমান শহরে এসে বসবাস শুরু করেন। ডাক্তাব মিত্র বিদ্যাসাগব মশাইয়ের অনুরাগী এবং অনুগামী ছিলেন। তিনি ছিলেন বর্ধমানের নামকরা চিকিৎসক এবং প্রথম শ্রেণীর অনাবারি ম্যাজিস্ট্রেট। কমলদাব বাবার নাম নরেশচন্দ্র মিত্র। তিনি ছিলেন বর্ধমান কোর্টের একজন নামকবা উকিল। বেশ কিছুদিন তিনি বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মারাত্মক চোখের অসুখে অন্ধ হয়ে যান। কমলদা তাঁকে কলকাতায় এনে সাধ্যাতীত ভাবে চিকিৎসা করিয়েছিলেন, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। আজও এই আশি বছর বয়সেও বাবা-মায়েব কথা বলতে গিয়ে কমলদার চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে।

১৯৩৭ সালে বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল থেকে কমলদা ম্যাট্রিক পাশ কবেন। পরে রাজ কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু সাংসারিক বিপর্যয়ে তাঁকে বর্ধমান কালেক্টরিতে কেরানির চাকরি নিতে হয়। মাইনে মাসে পঞ্চান্ন টাকা। কিন্তু দীর্ঘ এগারো বছরেও সে চাকরি পার্মানেন্ট হয়নি।

কমলদার চাকরি জীবনে একটি অদ্ভুত মজার ঘটনা ঘটেছিল। কিছুদিন চাকরি করার পব তিনি বর্ধমান থেকে কালনাব এস ডি ও অফিসে বদলি হয়ে যান। কিন্তু সেখানে তাঁব বসবার জন্যে কোন চেয়াব টেবিল জোটেনি। অফিসের বারান্দায় মাদুর পেতে তাঁকে কাজ করতে তো একদিন কাজ করতে করতে কাগজপত্র চাপাচুপি দিয়ে কয়েক মিনিটেব জন্য প্রস্রাবখানায় গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন একটি গরু তাঁর রেখে যাওয়া কাগজপত্রগুলি চিবোচ্ছে। হাঁকডাক মারপিট ককরে গরুর মুখ থেকে কাগজপত্র ছাড়ানো হল বটে, কিন্তু ততক্ষণে একটি প্রয়োজনীয় দলিল গরুটির পাকস্থলীতে চলে গেছে। এই ঘটনার পরদিন থেকে কমলদার জন্য অফিসে টেবিল চেয়ার বরাদ্দ হয়েছিল।

কিশোর বয়স থেকেই কমলদার অভিনয় সম্পর্কে আগ্রহ। প্রথম যৌবনে তিনি বর্ধমানে বেশ কিছু অ্যামেচার নাটকে অংশ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যখন তিনি অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে চাকরি ছেড়ে অভিনয়জীবনকে বরণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তখন তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। বাধা দিয়েছিলেন দেবকীকুমার বসু। কমলদা ওই দুজনের শরণাপন্ন হয়েছিলেন অভিনেতা হবার উদ্দেশ্যে।

কমলদার প্রথম অভিনয় ১৯৪৩ সালে গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'নীলাঙ্গুরীয়' ছবিতে। এক্সট্রার রোল। এক লাইন ডায়লগ। এক পয়সাও পাবিশ্রমিক পাননি। পরবর্তী ছবি দেবকী বসু পরিচালিত 'রামানুজ'। হিন্দি ছবি। এক লাইন ডায়লগ এবং কয়েক ঘা হান্টারের আঘাত। পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন কুড়ি টাকা। অভিনেতা জীবনের প্রথম উপার্জন। শুটিং সেরে ফেরার পথে কমলদা কালীঘাটে ষোল আনার পুজো দিয়েছিলেন আর বাকি টাকায় বাবা মায়ের জন্যে সন্দেশ আর মিষ্টি দই কিনে বর্ধমান ফিরে গিয়েছিলেন।

পরবর্তী ছবিটিও হিন্দি। দেবকী বসু পরিচালিত 'কৃষ্ণলীলা'। কানন দেবী করেছিলেন রাধিকা। কমলদা ওঁর বাবা বৃষভানুর রোল করেছিলেন। দু'দিনের কাজ। পঁচাত্তর টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। ওই সময়ে দেবকীবাবু কমলদাকে বলেছিলেন ঃ আপনি কখনও নায়ক করবেন না। মানাবে না। আপনি চরিত্রাভিনয় করবেন।

পরবর্তী ছবিও হিন্দি। দেবকীবাবুর 'স্বরগ সে সুন্দর দেশ হামারা'। পনেরো-ষোলো দিনের কাজ বলে পিকচার কন্ট্রাক্ট হল দুশো টাকায়। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল কিনা মনে পড়ছে না, তবে ওই ছবির পর রঙ্গমঞ্চের দরজা কমলদার কাছে খুলে গেল। ওই ছবিতে জমিদারের রোল করেছিলেন বিপিন গুপ্ত আর কমলদা করেছিলেন তাঁর লাঠিয়াল হরি সর্দার। কমলদার চেহারা কণ্ঠস্বর এবং অভিনয় তিনটেই ভালো লেগে গেল বিপিনদার। তিনি নিজে ওকে সঙ্গে করে স্টার থিয়েটারে মহেন্দ্র গুপ্তর কাছে নিয়ে

গেলেন। মহেন্দ্রবাবু তখন স্টার থিয়েটারের নাট্যকার, নির্দেশক এবং সর্বাধ্যক্ষ। তাঁর পছন্দটাই প্রথম এবং শেষ কথা।

স্টারে তখন 'টিপু সুলতান' নাটক হচ্ছে। টিপু করছেন বিপিন গুপ্ত। অভিনেতা বীরেশ্বর সেনের জায়গায় ক্যাপ্টেন ব্রেথওয়েটের চরিত্রে একজন অভিনেতা খুঁজছিলেন মহেন্দ্রবাবু। বিপিনদার সার্টিফিকেটের জোরে সেই জায়গায় ভর্তি হয়ে গেলেন কমলদা। মাসিক মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

স্টার থিয়েটারে তখন সপ্তাহে ছ'দিন করে অভিনয় করতে হয়। তারপর খুচখাচ ছবির শ্যুটিং। এতদিন বর্ধমানের সবকারি চাকরিতে ছুটি নিয়ে নিয়ে কোনরকমে চলছিল। এখন আর তা সম্ভব নয়। দেবকীবাবুর অনুমতি নিয়ে চাকরিটা ছেড়ে দিলেন কমলদা। সেটা বোধহয় ১৯৪৪ সাল।

ওই ১৯৪৪ সালটা কমলদার জীবনে নানা কারণে স্মরণীয়। ওই বছরেই বিপিনদা বম্বে চলে যান। তাঁর জায়গায় 'টিপু সুলতান' নাটকের নাম ভূমিকায় কমলদাকে সুযোগ দেন মহেন্দ্রবাবু। কমলদা ওই ভূমিকায় দারুণ প্রশংসা পান। পাশাপাশি 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটকে নন্দুয়ার চরিত্রে অভিনয় করে আরও বেশি প্রশংসা পান। সিনেমায় ওই বছরেই সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত এম পি প্রোডাকসন্সের 'সাত নম্বর বাড়ি' ছবিতে তাঁর লিপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'ফেলে আসা দিনগুলি মোর' গানখানি লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। কমলদার অভিনয়েরও খুব প্রশংসা হয়। পাশাপাশি অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'সংগ্রাম' ছবিতে ওই তরুণ বয়সেই অশীতিপর বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করে দারুণ নাম করেন। তাঁর মেকআপ দেওয়া হয়েছিল অনেকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো। ওই ছবিতে কমলদা করেছিলেন ছবি বিশ্বাসের শ্বশুর।

সত্যি কথা বলতে কি কমলদা তাঁর যৌবনকালেই নানারকম বৃদ্ধের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। দেবকীবাবুর 'কৃষ্ণলীলা' ছবিতে কানন দেবীর বাবা করেছেন, অর্ধেন্দু মুখার্জির 'সংগ্রাম' ছবিতে ছবিদার শ্বশুর, বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তপোভঙ্গ' ছবিতে সুলালদার (জহর গাঙ্গুলি) বাবা, অমর মল্লিকের 'সতী' ছবিতে ধীরাজ ভট্টাচার্যের বাবা। এমনকি শৈলজানন্দ পরিচালিত 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম' ছবিতে তিনি অহীন্দ্র চৌধুরীর বাবা হিসেবে দু'দিন শ্যুটিং করেন। পরে মতান্তর হওয়ায় ওই কাজটা ছেড়ে দেন।

অন্যদিকে আবার চিত্ত বসুর 'একটি রাত' ছবিতে সুচিত্রা সেনের স্বামী করেছেন প্রৌঢ় বয়সে, হরিদাস ভট্টাচার্যের 'নববিধান' ছবিতে কানন দেবীর স্বামী করেছেন, এমনকি সুরেন সরকারের 'আত্মদর্শন' ছবিতে ওঁর মেয়ের বয়সি সবিতা চ্যাটার্জির (বসু) স্বামী করেছেন। আবার ধীরেশ ঘোষ ও মানু সেনের পরিচালনায় 'রাত্রি' ছবিতে প্রতিমা দাশগুপ্তার বিপরীতে ভিলেন-নায়ক করেছেন। আসলে কমলদা সব ধরনের চরিত্রকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করেছেন।

১৯৪৫ সালে সিনেমার পাশাপাশি থিয়েটারেও কমলদার ভাগ্য খুলে গেল। মিনার্ভা থিয়েটারে 'গৈরিক পতাকা' নাটকে শিবাজীর চরিত্রে কমলদার অভিনয় কলকাতার দর্শকদের কাঁপিয়ে দিল। স্টার থিয়েটারের পঁয়ষট্টি টাকা মাইনে থেকে মিনার্ভায় মাসে একশো পঁয়ষট্টি টাকা মাইনে হয়ে গেল। তাও সপ্তাহে মাত্র তিনদিন অভিনয় করতে হত।

এরপর থেকে কমলদাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ছবির পর ছবি, নাটকের পর নাটক। এক মঞ্চ থেকে আরেক মঞ্চে। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি যেটা ঘটল সেটা হল শিশিরকুমার ভাদুড়ির শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'পরিচয় নাটকে অভিনয়। সেই সঙ্গে শিশিরবাবুর স্নেহ।

সারাজীবনে শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন কমলদা। ছোট বড় মাঝারি নানা চরিত্রে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'কংস', 'রাজদ্রোহী', 'প্রতিরোধ', 'মহিষাসুর' ইত্যাদি। 'পথের দাবী' ছবিতে রামদাস তলোয়ারকরের ছোট চরিত্রটিও কেবল কমল মিত্রের অভিনয়ের গুণে এখনও অনেকের স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে আছে। তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'খেলার পুতুল' তাঁর শেষ অভিনীত ছবি। শেষ অভিনীত নাটক নেতাজি মঞ্চে 'সোনার খোঁজে'।

কমলদা যাত্রার আসরেও অভিনয় করেছেন। সে সময়ে তিনি সর্বাধিক মাইনে পেতেন। মাসে দশ হাজার টাকা। মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটক অবলম্বনে 'কংস' পালায় তাঁর অভিনয় গ্রামে-গঞ্জে রীতিমত আলোড়ন তুলেছিল।

কমলদাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম . আচ্ছা কমলদা, আপনার দীর্ঘ অভিনয় জীবনে তো ভালো মন্দ অনেক ঘটনাই ঘটেছে। তার মধ্যে কোন্ ঘটনা আপনাকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে যা আজও ভুলতে পারেননি।

কমলদা বললেন : 'টিপু সুলতান' নাটকে প্রথম যেদিন অভিনয় করতে নামলাম, সেদিনকার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি।

আমি বললাম : কী হয়েছিল সেদিন?

কমলদা বললেন : ব্যাপারটা তাহলে তোমাকে খুলেই বলি। একশো রাত্রি সুনামের সঙ্গে টিপুর ভূমিকায় অভিনয় করে বিপিনদা তো বম্বে চলে গেলেন। তখনও ওই নাটকের প্রচুর বিক্রি। প্রতিটা শো হাউস ফুল। মাঝে মাঝে থিয়েটারে আলোচনা হত বিপিনদা চলে গেলে টিপু কে করবে। সকলেরই ধারণা ছিল রবি রায়, জয়নারায়ণ মুখার্জি, ভূপেন চক্রবর্তী ইত্যাদি সিনিয়র অভিনেতাদের মধ্যে কেউ না কেউ টিপু করবে। মহেন্দ্রবাবু কিন্তু কাউকে কিছু বলেননি।

যে রবিবার রাত্রে বিপিনদা শেষবারের মতো টিপু করে চলে গেলেন, তার পরের দিন অর্থাৎ সোমবারে অভিনয়ের সময় মহেন্দ্রবাবু লোক মারফত বলে পাঠালেন আমি যেন অভিনয়ের শেষে বাসায় ফেরার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই। অভিনয় শেষে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি একা চুপ করে বসে আছেন। আমি যেতে তাঁর সামনে চেয়ারে বসতে বললেন। আমি বসতেই আমার হাতে 'টিপু সুলতান' নাটকের একটা মোটা হাতে লেখা স্ক্রিপ্ট তুলে দিয়ে বললেন : আগামী শনিবার থেকে আপনাকে টিপু করতে হবে, কিন্তু কোন বিহার্সাল হবে না। আর আপনি একথা ঘুণাক্ষরে থিয়েটারে অথবা অন্য কোথাও বলবেন না।

এই কথা শুনে আমার তো হাত-পা কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। আমি কোনওদিন টিপু সুলতান নাটকের পুরো অভিনয় দেখিনি। তাছাড়া আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে স্টারে তখন অত সব বড় বড নামী অভিনেতা থাকতে মাত্র চার পাঁচ মাস অভিনয় করার পরই আমার ওপর এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। তাই আমি মহেন্দ্রবাবুকে বললাম : স্যার, আমি এত বড় পার্ট বিনা রিহার্সালে এত অল্প সময়ের মধ্যে করতে পারব না। আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন।

মহেন্দ্রবাবু বললেন · ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনি এই স্ক্রিপ্টটা বাসায় নিয়ে গিয়ে ভালো করে পড়ুন। আপনি তো থিয়েটারের কাছেই থাকেন। রোজ সকাল সাড়ে আটটায় থিয়েটারে আসবেন, আপনাকে সব শিখিয়ে দেব।

কী আর করব, ভয়ে ভয়ে স্ক্রিপ্টটা নিয়ে বাসায় ফিরেই পড়তে আরম্ভ করলাম। যতই পড়ি ততই মনে হয় এত বড় পার্ট এত অল্প সময়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। রাত্রে ঘুম হল না এবং ভয়ের চোটে জ্বর এসে গেল। পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় জ্বর নিয়ে থিয়েটারে গিয়ে মহেন্দ্রবাবু হাতে স্ক্রিপ্টটা ফেরত দিয়ে আমার অক্ষমতার কথা জানালাম। সব শুনে মহেন্দ্রবাবু বললেন : কমলবাবু, কেন আপনি ভয় পাচ্ছেন? আমি বলছি আপনি টিপু করতে পারবেন। আমি আপনাকে এই ক'দিনে শিখিয়ে দেব। যে সুযোগ আমি আপনাকে দিচ্ছি, এ সুযোগ কেউ দেবে না। এ সুযোগ যদি কখনও পান তো সে আপনার প্রৌঢ়ত্বের আগে নয়। প্রথম কয়েকদিন অভিনয়ের সময় প্রম্পটার বিমলবাবু একদিকে বই ধরবেন আর আপনার সব কটি দৃশ্যে অপরদিকে আমি নিজে প্রম্পটে থাকব।

কী আর করব। অত্যন্ত আতঙ্কের সঙ্গে পার্ট মুখস্ত করতে লাগলাম আর রোজ সকালে থিয়েটারে গিয়ে মহেন্দ্রবাবুর কাছে তালিম নিতে লাগলাম।

অবশেষে আমার বলিদানের অর্থাৎ টিপু সুলতান নাটকের অভিনয়ের দিন এগিয়ে এল। মহেন্দ্রবাবু আমায় বলে দিয়েছিলেন বিপিনদা কোন কোন জায়গায় হাততালি পেতেন। আমার কিন্তু কখনই হাততালির দিকে ঝোঁক ছিল না। আমি শুধু ভাবছিলাম প্রম্পটিং-এর ওপর যেন বেশি নির্ভর করতে না হয়। কিন্তু নির্ভর না করে উপায় কী। আমার পার্ট তো ভালো করে মুখস্তও হয়নি। আরও একটা ভয় ছিল। অত বড় বড় শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করতে হবে। তাঁরা একশো নাইট ধরে অভিনয় করে নিজেদের পার্ট ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়েছেন। তাছাড়া এঁদের মধ্যে অনেকেই মুখে কিছু না বললেও

আমার মতো আনকোরা নতুন একটা ছেলেকে এত বড় একটা চরিত্রে সুযোগ দেওয়াটাকে খুশি মনে মেনে নিতে পারেননি।

প্রথম দিন একটু আগে আগে-মেক আপ করে পোশাক পরে লবিতে মা কালী ও শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিকে এবং ওপরে গিয়ে মহেন্দ্রবুকে প্রণাম করে ঘরে এসে চুপ করে বসে রইলাম। কারও সঙ্গে বাক্যালাপ নেই। ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাঁটু দুটোও মনে হল একটু একটু কাঁপছে।

যথাসময়ে অভিনয় আরম্ভ হল। হাউস ফুল। আমার দৃশ্য যখন এল তখন তাকিয়ে দেখলাম বাঁ দিকে বিমলবাবু আর ডান দিকে মহেন্দ্রবাবু নিজে বই ধরে দাঁড়িয়ে প্রম্পট করছেন। আমি দৃশ্যের পব দৃশ্য মরিয়া হয়ে অভিনয় কবে গেলাম। দর্শকরা কোনও আওয়াজ দিচ্ছেন না। উল্টে মাঝে মাঝে তাঁদের করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হচ্ছে। প্রথম অঙ্ক তো নির্বিঘ্নে শেষ হল। অঘটন ঘটল দ্বিতীয় অঙ্কের একেবারে শেষে ঘন ঘন করতালি ধ্বনির মধ্যে।

দ্বিতীয় অঙ্কেব শেষে যখন স্টেজ থেকে বেরিয়ে আসছি ড্রেস চেঞ্জ করবার জন্যে তখন আমার পেছন পেছন বেরিয়ে আসছিলেন রুনী বেগম রূপী শেফালিকা (পুতুল)। তিনি উইংসের ভিতর থেকেই আমাব দিকে তাকিয়ে রাগত স্বরে বলে উঠলেন : কী করে হাত ধরে তুলতে হয জানেন না?

আমি ওঁর দিকে ফিবে জিজ্ঞাসা করলাম : কেন, কী হল? আপনার লেগেছে নাকি?

তিনি আমার দিকে কটকট করে তাকিয়ে বললেন : কী হয়েছে জানেন না?

এই কথা বলে তিনি গটগট করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমি আমার ঘরে এসে পোশাক বদল করতে কবতে ভাবতে লাগলাম কী এমন হল যাতে শেফালিকা আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার কবলেন। হঠাৎ মনে হল দ্বিতীয় অঙ্কের একেবারে শেষে রুনী বেগম যখন টিপুর পায়ের কাছে বসেছিলেন তখন তাঁর হাত ধরে তুলতে গিয়ে আমার অজান্তে আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা তাঁর বক্ষস্থল স্পর্শ করে থাকলেও থাকতে পারে। একে অমি ভীষণ নার্ভাস ছিলাম, সুতরাং এমন একট অঘটন ঘটে যাওয়া কিছুই অসম্ভব নয়; কিন্তু শেফালিকা তো একজন নামী শিল্পী। যদি এমন কিছু ঘটেও থাকে তাহলে কি তাঁর সেটা উপেক্ষা কবা উচিত ছিল না।

আবাব ভাবলাম তিনি যদি এই ঘটনাটা অতিরঞ্জিত করে মহেন্দ্রবাবুর কাছে আমার নামে কমপ্লেন করেন তাহলে তো আমার চাকরিটাই চলে যাবে। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমি সোজা ভিতরের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতালায় মহেন্দ্রবাবুর কাছে চলে গেলাম। দেখলাম তিনি খোলা ছাদে একটি বেতের চেয়ারে একা চুপচাপ বসে আছেন। তাঁকে সব কথা ডিটেলে জানালাম এবং বললাম যে যদি ঘটনাটা ঘটেই থাকে তবে সেটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়।

আমার কথাগুলো মহেন্দ্রবাবু মনে দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন : কমলবাবু, এসব কথা আমাকে বলার সাহস ওদের নেই। আসল কথা কি জানেন, ওরা সব সেটিং সান। একজন নতুন ছেলে উঠছে দেখলে ওদের হিংসে হয়। তাছাড়া ওই ঘটনার পেছনে অন্য লোকের উস্কানি আছে। আপনার অভিনয় বিপিনবাবুর চেয়েও ভালো হচ্ছে। বিপিনবাবু যে ক'জায়গায় ক্ল্যাপ পেতেন সেখানে তো আপনি পাচ্ছেনই, তাছাড়াও এক্সট্রা দু'জায়গায পেয়েছেন। আপনার কোনও ভয় নেই। আপনি নিশ্চিন্তে কাজ করুন। আপনার পেছনে আমি আছি।

মহেন্দ্রবাবুর এই কথাগুলো আমি জীবনে কোনও দিনও ভুলতে পারব না।

কথাগুলো বলতে বলতে কমলদা কেমন আনমনা হয়ে গেলেন। হয়তো ফিরে গেলেন তাঁর অতীতের দিনগুলিতে যেখানকার সুখ-দুঃখের স্মৃতি আজ এই আশি বছর বয়সেও রোমন্থন করা যায়।

চন্দ্রাদি

সালটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ১৯৪১ সাল। পুজোর দিন পনেরো আগে কলকাতায় দর্জিপাড়ায় মামাবাড়িতে বেড়াতে এসেছি। প্রতি বছর বার দুয়েক করে আসি। সামারে আর পুজো ভেকেশানে। মামাবাড়ির আবদার খাওয়া ছাড়াও কলকাতায় তখন আমার প্রথম এবং প্রধান আকর্ষণ সিনেমা দেখা। জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া তার অনেক আগেই পুরনো হয়ে গেছে। একমাত্র সিনেমার আকর্ষণটাই প্রবল।

তমলুকে দেশের বাড়িতে অবস্থানকালে সিনেমা যে দেখি না তা নয়। প্রতি বছর শীতকাল তিন মাস চুটিয়ে সিনেমা দেখি। ট্যুরিং সিনেমায়। তবে সে সবই সেকেন্ড হ্যান্ড কি থার্ড হ্যান্ড ছবি। কলকাতায় এলে টাটকা নতুন নতুন ছবি দেখা যায়। ফিরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবের কাছে গল্প করলে ইজ্জত বাড়ে। তাছাড়া ট্যুরিং সিনেমায় ইংবিজি ছবি দেখা যায না। কলকাতায় এলে টার্জানের ছবি দেখা যায়। সেটাও একটা বড আকর্ষণ।

ওই ১৯৪১ সালের এক বিকেলে চোখের সামনে জলজ্যান্ত চন্দ্রাবতী দেবীকে দেখতে পেলাম। সেই আমার প্রথম অভিনেত্রী দর্শন। মাত্র কয়েকদিন আগে অভিনেতা জহর গাঙ্গুলিকে দেখেছি রঙমহল থিয়েটারের সামনে। পরপর দুটো বিস্ময়ের ধাক্কায় আমার কিশোর মনে তখন দারুণ উত্তেজনা।

চন্দ্রাবতী দেবীকে দেখেছিলাম টকি শো হাউসের চার আনার লাইনে দাঁড়িয়ে। টকি শো হাউসে তখন নিয়মিত ইংরিজি ছবি দেখানো হত। হাউসের বাইরের লবিতে উনি দাঁড়িয়েছিলেন। বোধহয় কারও জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তখনকাব দিনে রাস্তায় ঘাটে ফিল্মস্টার দেখলে মানুষজন তাঁদের শরীরের ওপব হামলে পড়ত না। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে মনের কৌতূহল এবং চোখের তৃষ্ণা মেটাত। অতএব দণ্ডায়মান চন্দ্রাবতী দেবীকে ঘিরে কোন মনুষ্যবলয় তৈরি হয়নি।

আমি অপলক চোখে সেই ছায়াসুন্দরীকে দেখছিলাম। ঝলমলে শাড়ি, উজ্জ্বল অলঙ্কার আর উজ্জ্বলতর রূপের ছটায় সেই পড়ন্ত বিকেলটি আলোকিত হয়ে উঠেছিল আমার চোখের সামনে। মানুষের এত রূপ হয়?

আমার সেই অভিভূতিব আরও একটা বড কারণ মাত্র দুদিন আগে চন্দ্রাবতী দেবীকে দেখেছি চিত্রা (বর্তমানে মিত্রা) সিনেমার পর্দায়। 'প্রতিশ্রুতি' ছবিতে এক বারাঙ্গনার ভূমিকায়। ছবির পর্দার থেকে সশরীরে আরও অনেক বেশি উজ্জ্বল তিনি।

একটু পরেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি গাড়িতে চলে গেলেন চন্দ্রাবতী দেবী। সঙ্গে সঙ্গে আমার দু চোখে আঁধার ঘনিয়ে এল। একটা ঘোরের মধ্যে চলন্ত লাইনে পাযে পা মিলিয়ে সিনেমা হলে ঢুকেছিলাম। পুরো আড়াইঘণ্টা সেই ঘোরের মধ্যেই কাটিয়েছিলাম। এরল্ ফ্লিনের বিখ্যাত সোর্ড ফাইটও আমার সে ঘোর কাটাতে পারেনি।

বছর কুড়ি বাইশ বাদে আর এক বিকেলে আমার সেদিনের সেই অভিভূতির বর্ণনা চন্দ্রাবতী দেবীর সামনে করেছিলাম। আমার তখন সাংবাদিক জীবনের এক যুগ পেরিয়ে গেছে। চন্দ্রাবতী দেবীর মতিলাল নেহরু রোডের বাড়ির বারান্দায় বসে আমাদের কথা হচ্ছিল। আমার মুখে সেই বালখিল্য ব্যাপারটির বর্ণনা শুনে চন্দ্রাবতী দেবী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেছিলেন : তখন আপনার বয়স কত?

আমি উত্তর দিয়েছিলাম : কত আর হবে। চোদ্দো পনেরো বোধহয়।

চন্দ্রাবতী দেবী হাসিটা আরও বিস্তৃত করে বলেছিলেন : তাই। আজকের চন্দ্রাবতীকে দেখলে নিশ্চয় সে ফিলিংটা আর হত না। বরং উল্টোটাই হত।

আমি চন্দ্রাবতীর দেবীর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেছিলাম। খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছিলাম বয়স সে মুখে কোনও আঁচড় ফেলতে পেরেছে কি না? মাথার ঘন চুলে কোন রুপোলি

ঝিলিক দেখা যায় কিনা?

না, অনেক খুঁটিয়ে দেখেও তেমন কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি। অঙ্কের হিসেবে তাঁর বয়েস তখন পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন। কিন্তু আজও তিনি সেই প্রথম দেখার মতোই সুন্দর। বরং এই ঢলে পড়া যৌবনে তাঁকে আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। একটা মাতৃত্বময়ী সৌন্দর্যের মাধুর্যে তাঁর মুখ ঝলমল করছে। তবে সেদিন যেটা শুনতে পাইনি আজ সেটা পেলাম। তাঁর কণ্ঠস্বরে জলতরঙ্গের ব্যঞ্জনা।

চন্দ্রাদির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ পত্র মারফত। না, আমি তাঁকে কোন ফ্যান-লেটার লিখিনি। পক্ষান্তরে তিনিই আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। একজন সম্পাদকের কাছে একজন লেখিকার পত্র। সে পত্রের ভাষা ছিল যেমন পরিশীলিত তেমনি বিনয়াবনত।

একটি মান-অভিমানকে কেন্দ্র করে উল্টোরথ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে আমার বন্ধু ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের সহায়তায় সাতরঙ নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা এবং সম্পাদনা করেছিলান ষাটের দশকের প্রথম পর্বে। সেই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য চন্দ্রাবতী দেবী একটা লেখা পাঠিয়েছিলেন আমাদের পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা শ্রীমতী সন্ধ্যা সেনের মারফত। সঙ্গে একটি চিঠি। তার মর্মার্থ : যদি কোনও কারণে লেকাটি প্রকাশ করা সম্ভব না হয় তাহলে অনুগ্রহ করে ফেরত পাঠাবেন।

লেখাটি পরবর্তী সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। না, চন্দ্রাবতী দেবীর নাম ব্যবহার করার মোহে নয়, লেখাটির মধ্যে অসাধারণত্ব ছিল বলে। কৈশোর এবং যৌবনেব সন্ধিক্ষণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁব প্রথম পরিচয়, তাঁরই অনুরোধে তাঁর পায়ের কাছে বসে রবীন্দ্রসংগীত শেখা, কবিগুরুর অনাবিল স্নেহের স্পর্শে ভেসে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলি এমন আন্তরিক ভঙ্গিতে, এমন আবেগ মিশিয়ে চন্দ্রাদি প্রকাশ করেছিলেন যা পড়ার পরমুহূর্তে একজন সম্পাদকের পক্ষে পত্রস্থ না করে আর কোন উপায় থাকে না।

পত্রিকা প্রকাশ পাবার পর শ্রীমতী সন্ধ্যার হাত দিয়ে একটি কপি চন্দ্রাদির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সঙ্গে একটি ছোট চিঠিতে কিছু স্তুতি সহকার ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম চন্দ্রাবতী দেবীকে।

এর তিন-চার দিন পরে তারাশঙ্করবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর টালার বাড়িতে। স্বনামধন্য সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন আমাদের ওই সাতরঙ পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা। ওঁর সামনাসামনি হতে চন্দ্রাদির লেখাটা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : এই মহিলাটি কে হে? ইনিই কি আমাদের সেই অভিনেত্রী চন্দ্রাবতী?

আমি বললাম : আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই।

তারাশঙ্করবাবু বললেন : বড় চমৎকার লিখেছে তো! পড়তে পড়তে মনটা অন্যরকম হয়ে গেল। ভারি ভালো লাগল। ওঁকে আমার ধন্যবাদ জানিও।

ওঁব কথাব জের টেনে সম্পাদকসুলভ অহমিকা নিয়ে বললাম : ভাষাটা কিন্তু বড় দুর্বল।

সঙ্গে সঙ্গে তারাশঙ্করবাবু বলে উঠলেন : ওই তো তোমাদের দোষ! ভাষা ভাষা করেই মরলে! আরে আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষাটা বড কথা নয়, ভাবটাই বড় জিনিস। গুরুগম্ভীর ভাষাটাই বরং আবেগ প্রকাশের অন্তরায়। ডিকশনারি খুঁজে খুঁজে শব্দ চয়ন করে আবেগ প্রকাশ করা যায় না। করলে ভাষার নানা অলঙ্কারের আড়ালে আবেগটাই হারিয়ে যায়।

এর কয়েকদিন পরেই শান্তি চৌধুরি মশাইয়ের বাড়িতে চন্দ্রাবতী দেবীর পুত্র জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আলাপ। আমার জীবনে যে ক'জন অল্পসংখ্যক ইনটেলেকচুয়ালের দেখা আমি পেয়েছি শান্তিবাবু তাঁদেরই একজন। সত্যজিৎ রায়ও ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। সত্যজিৎবাবুর প্রথম দিকের কয়েকটি ছবির বিশ্ব-পরিচিতিতে শান্তিবাবুর বেশ কিছুটা অবদান আছে। এটা আমি শান্তিবাবুর কাছেই জানতে পেরেছি।

জ্যোতিবাবুর সঙ্গে শান্তিবাবুই আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার পত্রিকা পেয়ে জ্যোতিবাবু বললেন : আপনাদের কাগজে মায়ের লেখাটা বেরোতে মা খুব আনন্দ পেয়েছেন। জনে জনে ডেকে ডেকে সে কথাটা বলছেন। সবাইকে লেখাটা দেখাচ্ছেন। কাউকে কাউকে পড়াচ্ছেন।

কথাটা শোনার পর আমার মনে হল আমার একবার চন্দ্রাবতী দেবীর সঙ্গে দেখা করা উচিত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় নেই। তাঁকে স্টুডিওর সেটে কয়েকবার দেখেছি, কিন্তু আলাপ

করার কোনও সুযোগ হয়নি। সাহসও হয়নি।

স্টুডিওতে তাঁকে প্রথম দেখি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ছবির সেটে। সেটা ১৯৪৯ সাল। তখন আমি রূপাঞ্জলি পত্রিকায় শিক্ষানবিশ হিসেবে সবেমাত্র ঢুকেছি। সেই সুবাদে শুটিং দেখার ছাড়পত্র পেয়েছি। সেদিন সেটে ছিলেন চন্দ্রাবতী দেবী এবং মীরা মিশ্র। চন্দ্রাদি শচীমাতা আর মীরা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। ওই ছবিতে নিমাই করেছিলেন প্রদীপকুমার। ধার্মিক নিমাই অপেক্ষা সমাজ সংস্কারক, সরকারের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নিমাইয়ের প্রতি ওই ছবিতে জোর দেওয়া হয়েছিল বেশি। আর পরিচালক ছিলেন দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হেমচন্দ্র চন্দ্র, যাঁর তোলা 'প্রতিশ্রুতি' ছবিটি আমি খেপে খেপে অন্তত বার আষ্টেক দেখেছি। সেটাও নিউ থিয়েটার্সেরই ছবি ছিল। তাতেও চন্দ্রাবতী দেবী অভিনয় করেছিলেন এক উচ্চবিত্ত রূপোপজীবিনীর ভূমিকায়। ওই ছবির নায়ক ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল আর রোমান্টিক পেয়ার হিসেবে ছিলেন অসিতবরণ আর ভারতী দেবী। পাহাড়ী সান্যালের সে অভিনয় ভোলবার নয়। ওই ছবিতে ছবি বিশ্বাস একটা ছোট্ট দু'সিনের চরিত্রে মারাত্মক অভিনয় করে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন।

যাক যে কথা বলছিলাম। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ছবির সেটে সেদিন কী দারুণ অভিনয় করলেন চন্দ্রাদি। দৃশ্যটি ছিল নিমাই গৃহত্যাগ করেছেন। শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে উন্মাদিনীর মতো খুঁজে বেড়াচ্ছেন। 'নিমাই নিমাই' করে পাগলের মতো ডাকতে ডাকতে ছুটে বেড়াচ্ছেন চন্দ্রাবতী দেবী। একবার ক্লান্ত হয়ে তিনি মীরা দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন : তুমিও একটু ডাকো না বৌমা। আমি যে আর পারছি না।

কথাটা শুনে মীরা দেবী মাথাটা একটু নীচু করে নিলেন। সেদিকে এক পলক তাকিয়ে চন্দ্রাবতী দেবী বললেন : ও, তোমাকে তো আবার স্বামীর নাম ধরতে নেই।

এই বলে তিনি আবার 'নিমাই নিমাই' বলে ডাকতে ডাকতে পাগলিনীর মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন সেট থেকে। পরিচালক হেমচন্দ্রের ভরাট কণ্ঠে শোনা গেল : কাট্।

সেট লাইট জ্বলে উঠল। সেই আলোয় দেখা গেল আলুথালু বেশে পাগলিনীর মতো টলতে টলতে মেক আপ রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন চন্দ্রাবতী দেবী। তখনও তাঁর শচীমাতার ঘোর ভাঙেনি। সেদিন বুঝেছিলাম ডেডিকেশান কাকে বলে! চরিত্রের মধ্যে মিশে যাওয়া কাকে বলে!

তা সেদিন সেই তরুণ বয়সে চন্দ্রাবতী দেবীর মতো ব্যক্তিত্বময়ী মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার কথা কল্পনাই করতে পারতাম না। আরও বেশ কিছু ছবির শ্যুটিং-এ দূর থেকেই তাঁকে দেখতাম। এগিয়ে গিয়ে দুটো কথা বলবার সাহস হয়নি।

সেই ভীরুতার কথা সেদিন বিকেলে অকপটে চন্দ্রাদির কাছে কবুল করেছিলাম। শুনে চন্দ্রাদি একটু হেসে বলেছিলেন খুব অন্যায় করেছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : কেন?

চন্দ্রাদি বলেছিলেন : একটা ছবির কাজ শুরু হওয়া থেকে রিলিজ করা পর্যন্ত এই সময়টা আমরা দর্শকদের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকি। আপনারা, সাংবাদিকরা সেই সময়টায় আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন দুটো ছবি ছেপে, দু-চার কথা লিখে। নইলে তো ওই এক বছরের মধ্যে আমরা দর্শকদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতাম।

আমি বলেছিলাম : আমি তো তখন এক নাবালক সাংবাদিক। আমার লেখা না-লেখায় আপনার তেমন কিছু যেত আসত না বোধহয়।

চন্দ্রাদি হাসতে হাসতে বলেছিলেন : রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় ছোট্ট কাঠবিড়ালিরও একটা ভূমিকা ছিল জানেন বোধহয়। ধরে নিলাম আপনি তখন সেই কাঠবিড়ালি সাংবাদিক। তো আপনার দু'চার লাইন লেখাতেও তো আমার যতটুকুই হোক উপকার হতে পারত।

তা এসব তো আরও অনেক পরের কথা। তার আগে প্রথম যেদিন ওঁর মুখোমুখি হলাম সেই কথাটা বলে নিই। মতিলাল নেহরু রোডে আমার এক বান্ধবী থাকতেন। লেখিকা মায়া বসু। শুনেছিলাম ওঁর সঙ্গে চন্দ্রাবতী দেবীর আলাপ আছে। চন্দ্রাদির অন্দরে পৌঁছবার জন্য শেষ পর্যন্ত ওঁরই শরণাপন্ন

হলাম।

মায়া দেবী আমাকে নিয়ে হাজির করলেন একেবারে চন্দ্রাদির অন্দরেব মহিলামহলে। সেখানে তখন জমাট আড্ডা চলছে। চন্দ্রাদি ছাড়া আরও জন পাঁচ ছয় মহিলা আছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের কথা মনে আছে। তিনি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ। ভদ্রমহিলা একাই মাতিয়ে রাখছিলেন আসর। শুনলাম এরকম জমায়েত নাকি প্রায়শই এখানে হয়।

সেই অসমবয়স্ক মহিলাগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যন্ত সাবলীলভাবে মিশে গিয়েছিলেন চন্দ্রাবতী দেবী। দেখে ভারি ভালো লেগেছিল। হাসি ঠাট্টা গান কৌতুক সবই ছিল সেই আসরে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই চন্দ্রাদি অংশ নিচ্ছিলেন। স্টুডিও চত্বরের সেই ব্যক্তিত্বময়ী চন্দ্রাবতী দেবী তখন সম্পূর্ণ উধাও।

এক ফাঁকে চন্দ্রাদিকে তাঁর লেখা সম্পর্কে তারাশঙ্করবাবুর অভিমত জানিয়েছিলাম। শুনে শিশুর মতো আনন্দে আকুলিবিকুলি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বলেছিলেন : ওঁর মতো মানুষের আমার লেখা ভালো লেগেছে এ তো আমার কত জন্মের ভাগ্যি। ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে গিয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিই।

আমি বললাম : যেতেই তো পারেন। বেশি দূরে তো নয়। এই তো টালাতেই থাকেন তারাশঙ্করবাবু।

চন্দ্রাদি একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন : না বাবা, থাক। ওইসব বড় বড় মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন কাঁপে। যেমন হয়েছিল শরৎবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : শরৎবাবু মানে শরৎচন্দ্র? আপনি মিট করেছিলেন তাঁকে?

চন্দ্রাদি বললেন : আমি কি আর করেছিলাম! উনিই এগিয়ে এসেছিলেন আমার কাছে।

আমি বললাম : সেটা কী ব্যাপার?

চন্দ্রাদি বললেন : বড়ুয়া সাহেবের 'দেবদাস' ছবির একটা স্পেশাল শো করা হয়েছিল ওঁকে দেখানোর জন্যে। আমিও ছিলাম সেখানে। ছবি শেষ হবার পর দেখলাম সকলেরই চোখ ভিজে ভিজে। সিট থেকে উঠে শরৎবাবু হঠাৎ এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। বললেন : তোমার চন্দ্রমুখী দারুণ ভালো হয়েছে। এটা তোমার কৃতিত্ব। আমি চরিত্রটাকে ঠিক ওভাবে ভাবিনি। বুঝতে পারছি, তোমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা আমার ভাবনার চেয়েও উন্নত। তুমি যদি নায়িকা হও তাহলে আমার অন্য উপন্যাসগুলো ছবি করতে দিতে ভরসা পাই। বিজয়া কিংবা ষোড়শীর চরিত্রে তো তোমাকে দারুণ মানাবে।

আমি বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম : বলেন কী। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে এত বড় সার্টিফিকেট পাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়।

চন্দ্রাদি বললেন : অথচ দেখুন, ছবি করার সময় চন্দ্রমুখীর চরিত্রটা আমার আদৌ পছন্দ হয়নি। বড়ুয়া সাহেবকে বলেওছিলাম সে কথা। বলেছিলাম, আমাকে পার্বতীর চরিত্রটা দিচ্ছেন না কেন? ওটা আমার খুব পছন্দ।

আমি বললাম : বড়ুয়াসাহেব কী বললেন?

চন্দ্রাদি বললেন : আমার কথা শুনে উনি একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'চন্দ্রমুখীকে আমি যে ভাবে ভেবেছি সেটা শুধু তোমার পক্ষেই সম্ভব। পার্বতীর চরিত্রে এতটা দায়িত্ব নেই। আমার স্ক্রিপ্টটা শোনো, তারপর বলো রাজি আছো কি না!' তা বড়ুয়া সাহেবের মুখে ও কথা শোনার পর আর রাজি না হয়ে পারা যায়। স্ক্রিপ্ট শোনার ধৃষ্টতা আমি দেখাইনি।

সেই ১৯৩৫ সালে প্রথমেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' ছবিতে চন্দ্রমুখীর চরিত্রে চন্দ্রাদি যে কী অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন তা যাঁরা ওই ছবি না দেখেছেন তাঁদের বোঝানো মুশকিল। আমি পরবর্তীকালে বিমল রায়ের হিন্দি দেবদাস ছবিতে ওই চরিত্রে বৈজয়ন্তীমালার অভিনয় দেখেছি, তারও পরে বাংলায় দিলীপ রায়ের দেবদাস ছবিতে ওই চরিত্রে সুপ্রিয়া দেবীকেও করতে দেখেছি, কিন্তু চন্দ্রাবতী দেবীর ধারে কাছেও তাঁরা পৌঁছতে পেরেছেন বলে আমি মনে করি না। চন্দ্রাদি কিন্তু আমাকে একটা কথা বার বার বলেছেন। বলেছেন, ওই চরিত্রে ভালো অভিনয় করার কৃতিত্ব যদি যদি কিছু থাকে তবে তার সবটাই বড়ুয়া সাহেবের। উনি তাঁকে মনে প্রাণে চন্দ্রমুখীতে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন।

চন্দ্রাদির এই বিনয়টুকু আমার খুব ভালো লেগেছিল সেদিন।

চন্দ্রাবতী দেবীর জন্ম ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরের এক অভিজাত বংশে। ওঁর বাবা গঙ্গাধরপ্রসাদ সাহু ওখানকার একজন জমিদার ছিলেন। তিনি ছিলেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। বিহারে জন্ম হলেও চন্দ্রাবতী এবং ওঁর দিদি কঙ্কাবতীর স্কুল-কলেজের লেখাপড়া সব কলকাতায়। কঙ্কাবতী পরবর্তীকালের নামকরা অভিনেত্রী। শিশিরকুমার ভাদুড়ির মন্ত্রশিষ্যা এবং তাঁর ছবি ও নাটকের নায়িকা এবং জীবন-নায়িকা।

চন্দ্রাদি যখন বেথুন কলেজে পড়েন তখনই রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-সংস্পর্শে আসেন। তাঁর পায়ের কাছে বসেই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গান শেখেন। রবীন্দ্রসংগীত।

ওইসময় শিশিরকুমার ভাদুড়ি তাঁকে অভিনয় করার অফার দিয়েছিলেন। শিশিরবাবু তখন 'সীতা' ছবি করছিলেন। রামের ভূমিকায় তিনি নিজে আর সীতা করেছিলেন কঙ্কাবতী। শিশিরবাবু বলেছিলেন: চন্দ্রা, তোমার দিদির কাছে শুনেছি, তোমার খুব অভিনয় করার শখ। তা আমাদের 'সীতা' ছবিতে তুমি উর্মিলার পার্টটা করো না কেন? তোমাকে মানাবে খুব ভালো। আমি তোমাকে ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব।

আপত্তি করেছিলেন কঙ্কাবতী। বলেছিলেন : না না, চন্দ্রা এখনও বাচ্চা মেয়ে, তাছাড়া ও লেখাপড়া করছে। এমনিতে গান শিখছে শিখুক। এই বয়সেই ওকে তোমাদের এই অভিনয়ের জগতে টেনে আনবার দরকার নেই।

দিদির আপত্তিতে চন্দ্রাদির সেই মুহূর্তে অভিনয়ের জগতে আর আসা হল না। কিন্তু শিশিরবাবু ওই যে অভিনয়ের হাতছানি দিয়েছিলেন সেটা মাথার মধ্যে থেকে গেল। দিনে দিনে আকর্ষণটা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল।

তারপর একদিন চন্দ্রাবতীর বিয়ে হয়ে গেল। সুপুরুষ স্বামী, সুখী সংসার। কোলে সন্তানও এল। কিন্তু অভিনয়ের পোকাটা সব সময় চন্দ্রাদির মাথার মধ্যে কুরে কুরে খায়। অবশেষে একদিন স্বামীকে বলেই ফেললেন : আমি সিনেমায় অভিনয় করতে চাই।

শুনে স্বামী আঁতকে উঠলেন। বললেন : অসম্ভব। গান বাজনা করো সেটা ঠিক আছে। কিন্তু তুমি সিনেমায় নামো সেটা আমি চাই না। সিনেমায় নামলে মেয়েরা ভালো থাকে না।

চন্দ্রাবতী বললেন : যে যারা ভালো থাকবার নয় তারা সিনেমায় না নামলেও ভালো থাকে না। আমি সিনেমায় অভিনয় করবই।

স্বামী বললেন : তা যদি করতে চাও তাহলে আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে তোমাকে চলে যেতে হবে। এখানে আর ফিরে আসা চলবে না।

কথাটা শুনে সেই মুহূর্তে দমে গিয়েছিলেন চন্দ্রাবতী। কিন্তু কালক্রমে যা অনিবার্য তাই ঘটল। সব কিছু ছেড়ে একদিন তাঁকে বেরিয়ে আসতে হল সংস্কৃতির মুক্ত অঙ্গনে। বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ পেয়ে গেল তার সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠা এক অভিনেত্রীকে।

চন্দ্রাদিকে আমরা প্রথম নায়িকা হিসেবে পাই 'পিয়ারী' ছবিতে। ছবিটি নির্বাক। মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩০ সালের ষোলোই ফেব্রুয়ারি ক্রাউন (বর্তমান উত্তরা) সিনেমায়। এ ছবির নায়ক ছিলেন শান্তিনিকেতনের এক তরুণ অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দ্রাবতী দেবী কেবল এ ছবির নায়িকাই ছিলেন না, ছিলেন অন্যতম প্রযোজিকাও। সে আর এক ইতিহাস।

স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করে চলে আসার পর বিমল পাল নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে চন্দ্রাদির পরিচয় হয়। বিমলবাবু ছিলেন 'বায়স্কোপ' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক এবং মালিক। পরিচয়ের পর চন্দ্রাদিই বিমলবাবুকে উদ্বুদ্ধ করেন ছবি করতে। ওঁদের উভয়ের পার্টনারশিপে মুভি প্রোডিউসার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 'পিয়ারী' ওই প্রতিষ্ঠানের ছবি। ছবির কাহিনী লিখেছিলেন বিখ্যাত গায়িকা সুচিত্রা মিত্রের পিতা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—যিনি ছিলেন তৎকালের এক বিখ্যাত সাহিত্যিক।

শুধু ছবি তৈরিই নয়, বিমলবাবু এবং চন্দ্রাদি উভয়ে মিলে একটি সিনেমা হলও তৈরি করেন শ্যামবাজার অঞ্চলে। সেটির নাম টকি শো হাউস। ১৯৩৩ সালে ওঁদের এই পার্টনারশিপ ভেঙে যায়

এবং চন্দ্রাবতী দেবী যোগদান করেন নিউ থিয়েটার্সে।

এসব ঘটনা আমি পঞ্চাশের দশকে বিমল পালের মুখ থেকেই শুনি। উনি তখন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে (বর্তমান বিধান সরণি) শ্রীমানী বাজারের উল্টোদিকে উল্টোরথ পত্রিকার অফিসে প্রায়শই আসতেন। বিমলদা সেইসব হারানো দিনের নানা ঘটনা বলতেন। বলতে বলতে উত্তেজিত হতেন, আক্ষেপ করতেন। ক্ষোভ প্রকাশও করতেন। বিমলদার কথা শুনতে শুনতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই ভদ্রলোককেই আমি চন্দ্রাবতী দেবীর সঙ্গে টকি শো হাউসের লবি থেকে গাড়িতে উঠে চলে যেতে দেখেছিলাম।

ষাটের দশকের সেই ঝকঝকে বিকেলে চন্দ্রাদির বারান্দায় বসে আলাপচারিতার সময় আমি বিমলদার সেই আক্ষেপের কথা চন্দ্রাদিকে বলিনি। চন্দ্রাদি তখন তাঁর সোনালি অতীতের স্মৃতিচারণায় মুগ্ধ ছিলেন, মুখর ছিলেন। ছন্দভঙ্গের আশঙ্কায় আমি বিমলদার প্রসঙ্গ তুলিনি। কারণ সেই মুহূর্তে চন্দ্রাদি বিবৃত করছিলেন তাঁর 'মীরাবাঈ' ছবি করার ইতিহাস।

১৯৩২ সালের চব্বিশে সেপ্টেম্বর চিত্রা সিনেমায় মুক্তি পেল নিউ থিয়েটার্সের 'চণ্ডীদাস' ছবি। প্রথম শো-টি ট্রেড শো হিসেবে চিহ্নিত ছিল। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তি সেই শো-তে আমন্ত্রিত। 'পিয়ারী' ছবির অন্যতম প্রযোজক এবং নায়িকা হিসেবে চন্দ্রাবতী দেবীও আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

উনি যখন হলে ঢুকলেন তখন ছবি শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে তাঁর প্রবেশ এবং একটি সিটে উপবেশন। ছবি শেষ হবার পর আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল চন্দ্রাদি যেখানে বসেছেন তাঁর আশেপাশে রয়েছেন প্রযোজক বি এন সরকার, পরিচালক দেবকী বসু, ক্যামেরাম্যান নীতিন বসু। সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল, নায়ক দুর্গাদাস, নায়িকা উমাশশী, অভিনেতা অমর মল্লিক এবং আরও অনেকে। এঁদের কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই চন্দ্রাদির, তবে 'বায়স্কোপ' পত্রিকায় এঁদের সকলের ছবিই তিনি দেখেছেন। তাই মুখগুলি চেনা।

শো-এর শেষে চন্দ্রাদি বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় কে যেন ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন বি এন সরকারের। বললেন : ইনি চন্দ্রাবতী, অভিনেত্রী কঙ্কাবতীর ছোট বোন।

মামুলি একটি নমস্কার করে সরকার সাহেব বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চন্দ্রাদির মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে থমকে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন : আমাদের 'মীরাবাঈ' ছবিতে মীরার চরিত্রটা আপনি করে দেবেন? আপনাকে বেশ ভালো মানাবে।

চন্দ্রাদি বললেন : সবকারসাহেবের কথাটা শুনে আমার তো বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। নিউ থিয়েটার্সের ছবির নায়িকা! এ যে এক অকল্পনীয় সৌভাগ্য। পর মুহূর্তে ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, আমাকে দিয়ে কি ওই চরিত্র হবে? মীরাবাঈকে তো গান গাইতে হবে। আমি তো গান জানি না।

মিস্টার সরকার বললেন : একদম গান জানেন না?

আমি বললাম : অল্পস্বল্প জানি। তাও তো রবীন্দ্রসংগীত।

পাশ থেকে নীতিন বসু বললেন ব্যস, ব্যস, তা হলেই হবে। যে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে সে সব গানই গাইতে পারে।

মিস্টার সরকার বললেন : কাল বিকেল একবার আসুন না আমাদের স্টুডিওতে। একটা টেস্ট নেওয়া যাক। গলার রেঞ্জটাও দেখা যাক। তারপর তো রাইচাঁদবাবু আছেনই। তেমন কোনও অসুবিধে হবে বলে আমার মনে হয় না।

চন্দ্রাবতী দেবীর সবাক ছবির জয়যাত্রা 'মীরাবাঈ' দিয়েই শুরু। পরিচালক দেবকী বসু তাঁকে গড়েপিটে অভিনেত্রী করে তুলেছিলেন। রাইবাবু তাঁর গানের গলার রেঞ্জ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ছবি রিলিজ করার পর চন্দ্রাবতী দেবী প্রশংসার তুঙ্গে উঠেছিলেন।

তারপর থেকে তাঁর অভিনয়ের দীপ্তি কত ছবিতেই না দেখা গেছে। দেবদাস, দিদি, প্রতিশ্রুতি, দেশের মাটি, বিজয়া, বড়দিদি, দক্ষযজ্ঞ, রাজকুমারের নির্বাসন, শুকতারা, স্বামী স্ত্রী, বিজয়িনী, রাসপূর্ণিমা, কর্ণার্জুন, ভীষ্ম, প্রিয়বান্ধবী, দুই পুরুষ, পথের দাবী, মন্দির, বিষ্ণুপ্রিয়া, মানদণ্ড, দুর্গেশনন্দিনী

এবং আরও বহু ছবি তাঁর অভিনয়ে সমৃদ্ধ।

মাঝখানে প্রায় একটা যুগ চন্দ্রাদি অভিনয় জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পরে পরিচালক সুনীল বসুমল্লিক তাঁর 'জয়জয়ন্তী' ছবিতে স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। এরপর সূর্যতপা, ছিন্নপত্র, আটাত্তর দিন পরে, আমি সিরাজের বেগম ইত্যাদি ছবিতে চন্দ্রাদি প্রৌঢ় বয়সের চরিত্রচিত্রণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন চন্দ্রাবতী দেবীর ছবির সংখ্যা দুশোর মতো। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর ছবির সংখ্যা অত হবে না। বড়জোর শ' দেড়েক হতে পারে। শেষের দিকে যে রোল পেয়েছেন তাই করেছেন, কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি বাছাই করে করে ছবির কাজ নিতেন। চরিত্র দেখতেন, স্ক্রিপ্ট দেখতেন, পরিচালক দেখতেন। তাই সে সময়ে অত উল্লেখযোগ্য চরিত্র চিত্রণ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

১৯৪০ সালে 'শুকতারা' ছবিতে মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর স্বীকৃতি পান। ১৯৪৩ সালে 'প্রিয় বান্ধবী' ছবির জন্য আবার ওই স্বীকৃতি। তারপর ১৯৪৫ সালে 'দুই পুরুষ' ছবিতে বিমলার চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করে পান সাংবাদিকদেব দেওয়া বি এফ জে এ পুরস্কার। কিন্তু কোনও সরকারি পুরস্কার বা স্বীকৃতি তাঁর ভাগ্যে জুটেছে বলে শুনিনি। অথচ চন্দ্রাদি যে মাপের অভিনেত্রী তাতে এরকম কোনও স্বীকৃতি পাওয়া তাঁর উচিত ছিল।

১৯৭৮ সালের পর চন্দ্রাদির সঙ্গে আমার আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। ওই সময়ে সাংবাদিকের নামাবলীটি আমি স্বেচ্ছায় নিজের শরীর থেকে খুলে ফেলেছিলাম। চন্দ্রাদি সাংবাদিকদের খুব ভালোবাসতেন। সব সময়ে চাইতেন তাঁর জন্যে কিছু না কিছু লেখা হোক। কিন্তু নামাবলী খুলে ফেলার পর আমার তো আর সে সুযোগ ছিল না। দেখা করে কী করব?

তারপর এই ১৯৯২ সালের উনত্রিশে এপ্রিল বুধবার রাত্রে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন চুরাশি বছর বয়সে। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। পরলোক মানি। সেই পরলোক থেকে চন্দ্রাদি নিশ্চয় দেখতে পাবেন তাঁর একদার 'কাঠবিড়ালী সাংবাদিক' তাঁর পায়ের কাছে যৎসামান্য শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

নৃপতিদা

প্রায় আধখানা শতাব্দী জুড়ে বাংলা সিনেমার জগতে যিনি কমেডিয়ানগিরি করে গেছেন, সেই নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমার কাছে এক আশ্চর্য পুরুষ। তিনি ছিলেন একজন দুর্দান্ত অভিনেতা, দুরন্ত মাতাল এবং অতি সাধারণ ভাঁড়ের ছদ্মবেশে এক পরম দার্শনিক। সত্যি কথা বলতে কি, ওরকম একটি মানুষ আমি আমার জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।

নৃপতিদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ১৯৫২/৫৩ সাল থেকেই ছিল। ওঁকে বিভিন্ন স্টুডিওর সেটে দেখেছি। উনি যখন ইন্দ্রাণী পার্কে থাকতেন তখন একবার ওঁর বাড়িতেও গেছি উল্টোরথ পত্রিকার বার্ষিক উৎসবে নেমন্তন্ন করতে। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হল ষাটের দশকের গোড়ার দিকে কলকাতা থেকে অনেক দূরে উত্তরপ্রদেশের আগ্রা শহরে। সেটাও একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনার মধ্যে দিয়ে।

সে বছর উত্তরপ্রদেশে রীতিমত জাঁকিয়ে শীত পড়েছিল। আগ্রা শহরের এমপ্রেস হোটেলের একটি ঘরে আমরা চারজন বঙ্গসন্তান সর্বাঙ্গে কম্বল ঢেকে বিছানার ওপর আধশোয়া হয়ে চা খেতে খেতে নানা ধরনের গল্প করছিলাম। ভোর চারটের সময় বেয়ারা এসে ঘুম ভাঙিয়ে বেড-টি দিয়ে গেছে। অসীম ব্যানার্জি পরিচালিত 'হারানো প্রেম' ছবির আউটডোর শুটিং উপলক্ষে আমাদের আগ্রায় আসা।

সেদিন ভোরে আলাপচারী চার বঙ্গসন্তানের পরিচয় আপনাদের দিয়ে রাখি। এঁদের মধ্যে একজন সাংবাদিক, অর্থাৎ এই প্রতিবেদক। দ্বিতীয়জন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান অজয় মিত্র, যিনি বেশ কয়েক বছর আগেই লোকান্তরিত। তৃতীয়জন বিখ্যাত শব্দগ্রাহক অতুল চ্যাটার্জি—যাঁর চলনে-বলনে দস্তুরমত সাহেবিয়ানা। ইনিও এখন লোকান্তরে। আর চতুর্থজন বাংলা ফিল্মের স্বনামখ্যাত কমেডিয়ান নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে 'প্রভু' নামে বিখ্যাত। আশির দশকের মধ্যভাগে যাঁর লোকান্তরণের সংবাদ তো বাংলাদেশের সকলেরই জানা। একমাত্র এই অধমই এখনও বেঁচেবর্তে আছে স্মৃতির সরণিতে মাঝে মধ্যে ভ্রমণ করবার জন্যে।

নৃপতিদার কথা আমি এর আগে বহু জায়গায় বহুবার লিখেছি। বিভিন্ন আড্ডায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছি। কিন্তু মহাভারতের কথা যেমন অমৃত সমান, বার বার শুনে বা শুনিয়েও তৃপ্তি ঘটে না, নৃপতিদার কথাও আমার কাছে তেমনই। বার বার শুনিয়েও আশ মেটে না। মনে হয় আরও শোনাই, আরও শোনাই। সেইহেতু পুনর্বার স্মৃতিচারণ।

তা সেবারে আগ্রায় তার আগের দিন রাত্রের শীত হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। যে কারণে আমাদের ঘরের ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালাতে হয়েছিল। এম্প্রেস হোটেলের ম্যানেজার জানালেন, তার দীর্ঘ বারো বছরের চাকুরি জীবনে এই প্রথম ফায়ারপপ্লেসে আগুন দিতে হল। অজয়বাবুর আবার তাতেও শানাল না। তিনি একটি হট্‌ওয়াটার ব্যাগে গরম জল ভরে পায়ের নীচে রেখে দিলেন শরীরটাকে উষ্ণ করে তোলার জন্যে।

ভোরবেলা দেখা গেল তাঁর পায়ের পাতার নীচে একটি নৈনিতাল আলুর সাইজের ফোস্কা পড়েছে। সেই অবস্থায় কী করে শুটিং করতে বেরোবেন সেই সমস্যা নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম। কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত সমস্যা সেই অজয়বাবু আবার কথা বলতে বলতেই একপ্রস্থ ঘুম সেরে নিতেন। সেটা বোঝা যেত তাঁর নাক ডাকার আওয়াজে। ভদ্রলোক যেমন শীতকাতুরে তেমনি ঘুমকাতুরে। আর তাঁর হাতব্যাগটিতে শরীরটাকে সুস্থ রাখার জন্যে কত রকমের ট্যাবলেট যে ছিল তার হিসেব রাখাই মুশকিল। কিন্তু এই রোগাভোগা খুঁতখুঁতে লোকটি যখন ক্যামেরায় বসতেন তখন একেবারে বাঘের বাচ্চা। ভুল বললাম। ওটা হবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

পাঁচটা নাগাদ হোটেলের বেয়ারা এসে বাথরুমে গরম জল দিয়ে যেত। হোটেলটি পুরনো আমলের। স্ট্রাকচার দেখে মনে হত বোধহয় ভিক্টোরিয়ান যুগের। বাথরুমে গরম জলের ট্যাপ নেই। সুতরাং

প্রত্যেকের জন্যে এক এক বালতি গরম জল বরাদ্দ। আমরা একের পর এক স্নান-টান সেরে রেডি হয়ে থাকতাম। সাড়ে ছ'টা নাগাদ ডাক পড়ত ব্রেকফাস্টের। তার আগে সাজগোজ সেরে আমরা আবার গল্প করতে বসতাম। ঠিক সাতটায় গাড়ি আসত লোকেশানে নিয়ে যাবার জন্যে।

কিন্তু প্রতিদিন সাড়ে ছটায় ব্রেকফাস্টের ডাক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৃপতিদা ছিটকে বেরিয়ে যেতেন ঘর থেকে। হয়তো কোনও গভীর আলোচনা হচ্ছে, নৃপতিদা বক্তা আর আমরা শ্রোতা, কিন্তু ব্রেকফাস্টের প্রস্তাব নিয়ে বেয়ারা এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে নৃপতিদা তাকে প্রায় ধাক্কা মেরে পথ করে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেন। উঠোনের দিকে তাকিয়ে এক-দুই-তিন-চার করে কী যেন গণনা করতেন। ঠিক সতেরো পর্যন্ত গুনে নিয়ে ফিরে আসতেন হাসি-হাসি মুখে। তারপর আবাব পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে কথাবার্তা বলতে শুরু করতেন।

পর পব তিন-চারদিন এই রকম ঘটনা ঘটার পর একদিন আর কৌতূহল চাপতে পারলাম না। জিগ্যেস করলাম : রোজ রোজ কী এত গোনেন বলুন তো?

প্রশ্নটা শুনে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়লেন নৃপতিদা। লাজুক লাজুক গলায় বললেন : ও কিছু না। ওই রোজ সকালে একটু ধারাপাত মুখস্থ করি আর কি!

তারও দিন পাঁচ-ছয় পরে আসল ব্যাপারটা জানা গেল। তার আগের দিন রাত্রে প্রযোজক সুবোধ দাস এসে জানিয়ে গেলেন, পরেরদিন ফতেপুর সিক্রির লোকেশানে যাওয়া হবে সকাল পাঁচটায়। লোকেশানেই ব্রেকফাস্ট, লোকেশানেই লাঞ্চ। খবরটা শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা কেমন কালো হয়ে গেল নৃপতিদার।

আমার সেদিন বিকেল থেকে জ্বর জ্বর ভাব। যে কারণে রাত্রে ডিনার খাইনি। সেটা অসীমবাবু জানতেন। তিনি কিছু ওষুধপত্রেব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে গরম দুধ আর বিস্কিট।

আমি সুবোধবাবুকে বললাম : অত সকালে তো আমি যেতে পারব না। আমার শরীরটা ভালো নেই।

সুবোধবাবু বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, অসীম বলছিল বটে আপনার শরীর খারাপ। তা আপনার আর গিয়ে দবকার নেই। আপনি বরং কালকে রেস্ট নিন। তবে একটা কাজ করতে পারেন। ন'টার সময় গাড়ি আসবে সুপ্রিয়া দেবী আর নির্মলকুমারকে নিয়ে যেতে। যদি ভালো বোধ করেন ওদের সঙ্গে চলে যাবেন। নইলে সারাদিন একা একা বড্ড বোর ফিল্ করবেন।

আমি বললাম : তাই হবে।

ভোরবেলা বেড-টি দিয়ে যাবার পর আমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেলেন নৃপতিদা। একবারে একান্তে। তারপর নিচু গলায় বললেন : আমার একটা উপকার করে দেবেন রবিবাবু?

আমি বললাম : কী বলুন।

নৃপতিদা বললেন : ব্যাপারটা একটু গোপনীয়। কেউ যেন জানতে না পারে।

আমি বললাম . আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কেউ জানতে পারবে না।

নৃপতিদা তখন এম্প্রেস হোটেলের প্রশস্ত উঠোনের একদিকে যে সব বিরাট বিরাট মানিপ্ল্যান্ট আছে সেদিকে দেখিয়ে বললেন : ঠিক সাড়ে ছ'টায় আপনাদের যখন ব্রেকফাস্ট দেবে তখন ওই মানিপ্ল্যান্টের নীচে হোটেলের একপাল কুকুরকেও ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়। আপনি শুধু দয়া করে গুনে নেবেন কটা কুকুর ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম : তা না হয় গুনে নেব। কিন্তু এতে আপনার কী লাভ? আর এতে এত গোপনীয়তারই বা কী আছে?

নৃপতিদা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন : আছে আছে। সে সব কথা আপনাকে পরে বলব।

একটু পরে গাড়িতে উঠতে উঠতেও নৃপতিদা বললেন : যা বললাম মনে থাকবে তো? ঠিক সাড়ে ছটায়।

আমি একটু হেসে বললাম: থাকবে। মনে মনে ভাবলাম, যতো সব পাগলের কাণ্ড।

তা সেদিন নটার গাড়িতে আমার লোকেশানে যাওয়া হয়নি। জ্বর ছিল না বটে, তবে শরীরটা বেশ

ম্যাজম্যাজ করছিল।

সন্ধেবেলা লোকেশান থেকে ফিরে গাড়ি এসে থামামাত্র সবার আগে প্রায় লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন নৃপতিদা। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে আমি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। গাড়ি থেকে নেমেই নৃপতিদা সটান আমার সামনে। হাত ধরে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন : গুনেছিলেন?

আমি বললাম : হ্যাঁ।

নৃপতিদা জিগ্যেস করলেন : কটা?

আমি বললাম : সতেরোটা।

সঙ্গে সঙ্গে নৃপতিদার মুখে এক গাল হাসি। নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বললেন : বাঁচালেন আপনি।

এতে বাঁচাবাঁচির কী আছে আমার মাথায় এল না। এবারে আমার চেপে ধরার পালা নৃপতিদাকে। বললাম : এই কুকুর গোনাব রহস্যটা কী বলুন তো আমাকে। না বললে ছাড়ছি না।

নৃপতিদা একটু কী যেন ভেবে নিলেন। তারপর বললেন : ব্যাপারটা কেবল আপনাকেই খুলে বলছি। আর কাউকে বলবেন না। তাহলে ভারি লজ্জায় পড়ে যাব। আসল ব্যাপারটা কী জানেন! এই হোটেলে প্রথম যেদিন এলাম সেদিন দেখলাম লাঞ্চে মাংস দিয়েছে, ডিনারেও তাই। পরের দিন সকালে দেখলাম একপাল কুকুরকে আদর করে খাবার খাওয়াচ্ছে। মনে কেমন একটা সন্দেহ হল। এরা কুকুরের মাংস খাওয়ায় না তো? সঙ্গে সঙ্গে ক'টা কুকুর আছে গুনে ফেললাম। দেখলাম সতেরোটা। সেই থেকে রোজ সকালে গুনে দেখি কুকুরের সংখ্যাটা ঠিক আছে কি না! দু-একটা কম দেখলেই বুঝব...

নৃপতিদার কথা শেষ হতে না হতেই হো হো করে হেসে ফেললাম। রোজ সকালে উঠে নামতা পড়ার পেছনে এত কাণ্ড। হাসতে হাসতে বললাম : কুকুরেব মাংস শুনেছি নাকি উপাদেয়। নাগাল্যান্ড না কোথাকার লোকেরা তো শুনেছি কুকুরের মাংস চেটেপুটে খায়।

নৃপতিদা বললেন : তাহলে নাগাল্যান্ডে যদি কোনও ছবির আউটডোর পড়ে তবে আমি সেখানে কোনও মতেই যাচ্ছি না। দরকাব হলে এ কথাটা আপনাদের কাগজে লিখে দিতে পারেন। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন, আমার মতো কুৎসিত দেখতে কোনও প্রাণীকে আমি একদম সহ্য করতে পারি না। কী, ঠিক বলছি কি না?

এই হলেন নৃপতি চাটুজ্যে।

নৃপতিদার সঙ্গে আমার পরিচয় আগে থেকেই ছিল, তবে ঘনিষ্ঠতার শুরু ওই আগ্রা থেকেই। এর আগে আমি ওঁকে 'বাবু' সম্বোধন করতাম। কিন্তু আগ্রার ওই কুকুর গোনার রহস্য ভেদের পর আমার তরফ থেকে তিনি 'দাদাত্ব' পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অনেক চেষ্টাতেও ওঁকে দিয়ে আমার নামের শেষের 'বাবু' বর্জন করাতে পারিনি। এটা নিয়ে রাগ কিংবা অভিমান করলে বলতেন : সর্বনাশ! আপনারা হলেন গিয়ে শিক্ষিত মানুষ। সাংবাদিক। আর আমি হলাম আকাট মুখ্যু। সিনেমা-থিয়েটারের পুরোদস্তুর অভিনেতাও নয়, কাটা সৈনিকের পার্ট করি। আমার কি আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকেদের নাম ধরে ডাকা সাজে!

আমি চোখ নামিয়ে বলতাম : কেন দ্যায়লা করছেন 'প্রভু'। আপনি যে ভাঁড়ের ছদ্মবেশে একজন বর্ণচোরা দার্শনিক সে কথা কি এই দশ-বারো বছরের পরিচয়ের পর লুকোনো আছে নাকি?

নৃপতিদাকে 'প্রভু' সম্বোধনের একটা কারণ আছে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সবাই ওঁকে 'প্রভু' বলে ডাকতেন ওঁর অমায়িক ব্যবহার আর পরোপকার প্রবৃত্তির জন্যে। ছবি বিশ্বাসের মতো রাশভারি লোকও ডাকতেন আবার বসন্ত চৌধুরির মতো কালচার্ড মানুষও ডাকতেন।

আমার কথা শুনে নৃপতিদা মুচকি মুচকি হাসতেন। বলতেন : ডি এল রায়ের 'সাজাহান' নাটকে দিলদারের ডায়লগটা মনে আছে? সেই যে দিলদার বলছেন, 'ঘাস খেতে খেতে চোখ তুলে চাওয়ার নাম যদি দর্শন হয় তাহলে আমি দার্শনিক।' আমিও তাই। অর্থাৎ একটি আস্ত গোরু।

এই মানুষের সঙ্গে কথায় পারা যায়? একটু হেসে রণে ভঙ্গ দিয়েছিলাম।

নৃপতিদার জন্ম ১৯০৭ সালে। আর আমার ১৯২৭-এ। অঙ্কের হিসেবে তফাত বিশ বছরের। কিন্তু এই বিরাট পার্থক্য বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এবং এটা সর্বক্ষেত্রেই। উনি অনায়াসে

কচিকাঁচা দুধের বাচ্চাদের সঙ্গেও আড্ডা দিতে পারতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

নৃপতিদা জন্মেছিলেন পূর্ববঙ্গেব ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জে। কিন্তু প্রথম জীবনের বেশির ভাগটাই কেটেছে চট্টগ্রামে। লেখাপড়া বেশিদূর শেখেননি। শিখতে চানওনি। কাজকর্মেও কোনওদিন মনোযোগ দেননি। ভালোবাসতেন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে। এক জায়গায় থিতু হয়ে বাস করার মানসিকতা একেবারেই ছিল না। কলকাতায় আসার আগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর আগমন সংবাদ।

কলকাতায় এসে স্থায়ী আস্তানা গাড়লেও পূর্ববঙ্গের স্মৃতি অনুক্ষণ আলোড়িত করত নৃপতিদাকে। কত মজার মজার গল্প শোনাতেন সেখানকার। গোয়ালন্দের স্টিমারঘাটের নানা ঘটনা যে তার মুখ থেকে কতবার শুনেছি তার আর ইয়ত্তা নেই। স্টিমারঘাটের সামনে একটি হোটেলের পাতলা জলের মতো ইলিশ মাছের ঝোলের স্বাদ তাঁর বর্ণনার মধ্যে দিয়েই আমার জিভে এসে যেত। বাংলাদেশ হবার পর ওঁতে আর আমাতে ঠিক করেছিলাম দিনকতকের জন্যে ওপার বাংলাটা ঘুরে আসব। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

কলকাতায় এসে নৃপতিদা শেল্টার পেলেন পরিচালক সুশীল মজুমদারের কাছে। তারও আগে ভাব জমিয়ে নিয়েছিলেন সুশীলদার ভাই ননী মজুমদারের সঙ্গে। ননীবাবুই নৃপতিদাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সুশীলদাব কাছে।

প্রথম আলাপেই নৃপতিদার সিড়িঙ্গে চেহারা আর লম্বা লম্বা বোলচাল শুনে ওঁকে সহকারী পরিচালক করে নিলেন সুশীলবাবু। 'মুক্তিস্নান' ছবিতে একটি চরিত্রে আর 'তটিনীর বিচার' ছবিতে ভিলেনের ভূমিকায় চান্স পেয়ে গেলেন। নৃপতিদা বলেছিলেন · ভেবেছিলাম দিনকতক কলকাতায় কাটিয়ে আবার যেদিকে দু'চোখ যায় কেটে পড়ব। কিন্তু 'তটিনীর বিচার' ছবিতে ভিলেনের অভিনয় করবার পর ফিল্ম লাইনের প্রেমে পড়ে গেলাম। এ লাইনটা ভারি ইন্টারেস্টিং। এখানে ভালো মানুষকে ভিলেন বানানো হয়, আর ভিলেনরা ভালোমানুষ সেজে নির্বিবাদে ঘুরে বেড়ায়। অতএব এটাই আমার আসল জায়গা।

নৃপতিদা খুব বড় মাপের মানুষ ছিলেন। হিউম্যানিটি নামক বস্তুটি তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। একটা ঘটনার কথা বলি।

নৃপতিদা একবার বাজার থেকে একটা মোরগ কিনে এনেছিলেন। সেদিন দুপুরে চিকেন-কারি সহযোগে ভুরিভোজ সারবেন এটাই ছিল অভিপ্রায়। মোরগটিকে জবাই করতে গিয়ে দেখলেন সেটি করুণ চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বড় মায়াময় সেই দুটি চোখ। নৃপতিদা প্রেমে পড়ে গেলেন মোরগটির। সেটিকে পুষলেন।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় নৃপতিদা সান্ধ্য-আহ্নিক করতেন কারণবারি সহযোগে। সেদিন সন্ধ্যায় মোরগটি তাঁর সঙ্গী হল সান্ধ্য আহ্নিকের। একটি প্লেটে খানিকটা মদ ঢেলে দিয়ে তাকে নিবেদন করলেন। মোরগটি চুক চুক করে মদটা খেয়ে নিয়ে ডেকে উঠল ক্কক্ ক্কক্ ক্কক্ অর্থাৎ আরও চাই।

এইভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওদের আহ্নিকের আসর বসত। সময়ের একটু হেরফের হলেই মোরগটি ডানা ঝাপটে আর ডাকের পর ডাক ছেড়ে উদ্ব্যস্ত করে তুলত। যতক্ষণ আসর চলতে ততক্ষণ নৃপতিদা তাঁর যত কিছু প্রাণের কথা সব উজাড় করে দিতেন মোরগটির সামনে। মোরগটি এক মনে সব শুনত। মাঝে মাঝে সমর্থনের ভঙ্গিতে ডাক ছেড়ে দু-একটি উত্তরও দিত।

এইভাবে একটি মানুষ আর মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে ভাবনার মেলবন্ধন গড়ে উঠেছিল। কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন মোরগটি দেহত্যাগ করল। শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন নৃপতিদা। কটা দিন রীতিমত কান্নাকাটি করলেন। তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মোরগের একটি ছবি আঁকলেন। কাঠের বোর্ডে পেস্ট করে দরজার সামনে প্রোথিত করলেন। জুবিলি পার্কের নিজের এই দেড়খানা কামরার ফ্ল্যাটটি প্রয়াত মোরগের নামে উৎসর্গ করলেন। নাম দিলেন 'খেলাঘর'।

আমার বন্ধু দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল ঘটনাটি শুনে তাঁর সম্পাদিত 'অচল পত্র'-র পরবর্তী সংখ্যায় নৃপতিদার মানবতাবোধ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধের শেষ ছত্রে লেখা ছিল : 'চার্লি চ্যাপলিন

তাঁর 'গোল্ড রাশ' ছবিতে ক্ষুধার তাড়নায় মানুষকে মোরগ হিসেবে কল্পনা করেছেন আর আমাদের 'প্রভু' সুধার আবেশে মোরগকে কল্পনা করেছেন মানুষ হিসেবে। চ্যাপলিন নিঃসন্দেহে গ্রেট, কিন্তু আমাদের নৃপতি চট্টোপাধ্যায় অন্তত এই ক্ষেত্রে, গ্রেটেস্ট।'

দুর্মুখ সাংবাদিক দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের কাছ থেকে এতবড় কম্‌প্লিমেন্ট আর কেউ পেয়েছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই।

নৃপতিদার জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে একটা ঋষিতুল্য ভাব ছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জনকে উনি পাপ মনে করতেন। সঞ্চয়ের ব্যাপারটাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। উনি হিসেব করে দেখেছিলেন, মাসে পাঁচদিন কাজ করলেই ওঁর আর ওঁর সেবকের গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা মিটে যায়। ওঁর একটি কাজের লোক ছিল। তার বাড়ি মেদিনীপুরে। নৃপতিদা তাকে 'সেবক' বলে উল্লেখ করতেন। মাস-মাইনে হিসেবে তার নামে একটা অর্থ বরাদ্দ ছিল। কিন্তু কোনওদিনই সেটা সে দাবি করেনি। দিতে চাইলেও নিত না। 'প্রভু'-র সেবা করাই সে তার জীবনের কর্তব্য বলে মনে করত।

প্রায় প্রতিদিনই মধ্য রাত্রের পর নৃপতিদার কারণগুণ যখন তুঙ্গে উঠত তখন এই সেবকটি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে যেত। পরদিন সকালে প্রভুকে চা সেবন করাবার পর যখন নিজের একমাত্র সুটকেসটি নিয়ে নিষ্ক্রমণের উদ্যোগ করত তখনই নতুন করে ভারব্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যেত সে। তৎক্ষণাৎ খুশি মনে সুটকেসটি যথাস্থানে রেখে গৃহকর্মে মন দিত নৃপতিদার এই অকৃত্রিম সেবক।

নৃপতিদাকে দিয়ে ছবিতে অভিনয় করানোর একটা ঝামেলা ছিল। কাজের অফার নিয়ে গেলেই নৃপতিদা কেসটা অ্যাকসেপ্ট করতেন না। বলতেন : দাঁড়াও ভাই, আগে ডায়েরিটা দেখে নিই।

ডায়েরি খুলে হয়তো দেখলেন সে মাসে পাঁচদিন কাজ হয়ে গেছে। তখন বলতেন : স্যরি ভাই, এ মাসে আমার পাঁচদিনের কোটা কমপ্লিট। সামনের মাসে ডেট দিতে পারি।

এসব অনেক আগের ব্যাপার। পরবর্তীকালে নৃপতিদাকে কাজের কোটা বাড়াতে হয়েছিল। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে ক্রমশ ঊর্দ্ধমুখী হচ্ছিল তাতে পাঁচদিনে আর পোষাচ্ছিল না।

নৃপতিদার কাজ চাওয়ার ভঙ্গিটিও ছিল খুব ইন্টারেস্টিং। সকালে উঠে হয়তো সেবকের কাছ থেকে জানতে পারলেন সেদিন ভাঁড়ারে কিছুই নেই। শোনামাত্র বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠতেন। পায়জামা আর পাঞ্জাবিটা শরীরে গলিয়ে সটান হাজির হতেন কোনও স্টুডিওতে।

একদিনের ঘটনা বলি।

ভাঁড়ারে খাদ্যবস্তু কিছু নেই দেখে সেদিন নৃপতিদা হাজির হলেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। দারোয়ানের কাছে খবর নিয়ে জানলেন তপন সিংহের ছবির শুটিং হচ্ছে। সটান হাজির হলেন ফ্লোরে। গিয়ে দেখলেন দারোয়ান একটু ভুল বলেছে। শুটিং হচ্ছে তপনবাবুর প্রধান সহকারী বলাই সেনের প্রথম ছবি 'সুরের আগুন'-এর। তপনবাবুই উদ্যোগ করে ছবিটা পাইয়ে দিয়েছেন বলাই সেনকে। এবং যেহেতু বলাইয়ের প্রথম ছবি তাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপারটার তত্ত্বাবধান করছেন।

নৃপতিদা সোজা তপনবাবুর সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আমার মেক-আপটা কী হবে তপনবাবু?

তপনবাবু সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। নৃপতিদার কাজ দরকার। এবং এই মানুষটি সকলের এত প্রিয় যে, তাঁকে আজ এই মুহূর্তে কাজের ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। বলাইবাবুকে একান্তে ডেকে তপনবাবু বললেন : বলাই, নৃপতিবাবু এসেছেন। ওঁর কাজের ব্যবস্থা করে দাও।

বলাইবাবু একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। আজকের দৃশ্যটিতে কেবল অজয় গাঙ্গুলি আছেন। তিনি ছবির নায়ক এবং অন্ধ। একটা ঘরোয়া আসরে কয়েকজন শ্রোতার সামনে তিনি গান শোনাবেন আর সুমিতা সান্যাল নাচবেন। অজয়বাবু আর সুমিতা ছাড়া দৃশ্যটিতে বাকি যে ক'জন আছেন তাঁরা সব'ই এক্সট্রার পর্যায়ভুক্ত। কারও মুখে কোনও সংলাপ নেই।

বলাইবাবু নৃপতিদাকে একটু আড়ালে ডেকে বললেন : নৃপতিদা, আজ তো অজয়ের মুখে গান আর সুমিতা সান্যালের নাচ ছাড়া আর কোনও আর্টিস্ট নেই। সব এক্সট্রা। আপনাকে কী রোল দিই

বলুন তো?

নৃপতিদা বললেন : এক্সট্রাদের ফাংশান কী?

বলাইবাবু বললেন : ওই গান শুনবে আর মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে তারিফ করবে। ডায়লগ কিছু নেই।

নৃপতিদা বললেন : বেশ বেশ, ওতেই চলবে। দু-একটা ক্লোজ-আপ নেবে তো?

বলাইবাবু হেসে বললেন . তা নেওয়া যাবে। তবে আমার একটু কিন্তু কিন্তু লাগছে। আপনার মতো লোককে একেবারে এক্সট্রাদের মধ্যে বসাব!

নৃপতিদা বললেন : আমি আবার করে এক্সট্রা অর্ডিনারি হলাম। সব ছবিতেই তো কাটা সৈনিকের পার্ট করি।

ওই দৃশ্যে নৃপতিদার মেক্-আপ ছিল কলকাতার আদি বাবুদের মতো। পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি। সেটে বসবার সময় নৃপতিদা ধুতির কোচাটাকে মুঠো করে ফুলের পাপড়ির মতো মেলে দিলেন।

ছবির অন্ধ নায়ক অজয় গাঙ্গুলির মুখের গানটি গেয়েছিলেন বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটি রাগাশ্রয়ী আধুনিক। গানের একটি অংশে তিনবার ভেঙে ভেঙে এ-এ-এ করে একটি টান আছে। নৃপতিদা সুকৌশলে ওই দৃশ্যটি নিজের দখলে আনবার জন্য গানের ওই টানের অংশটির সুযোগ নিলেন। যে যে মুহূর্তে গানের এই টানটি এসেছে তখনই পরম সমঝদারের ভঙ্গিতে চোখ বুজিয়ে এমন একটি এক্সপ্রেশন দিলেন, যা ওই দৃশ্যের আর সব কিছুতেই ম্লান করে দিল। ক্যামেরাম্যান দীপক দাসও ওই ওই জায়গায় নৃপতিদার মুখের ক্লোজ-আপ নিয়ে নিলেন।

ছবিটি যখন পর্দায় এল তখন দেখা গেল অজয় গাঙ্গুলির অমন প্রাণঢালা অভিনয়, সুমিতার নাচ, প্রসূনবাবুর অমন মনমাতানো গান সব কিছুই অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে। দর্শকরা সানন্দে কলরব করে তারিফ জানাচ্ছেন নৃপতিদার ওই এক্সপ্রেশনের।

একেই বলে শিল্পী। যাঁরা একেবারে শূন্যের মধ্যে থেকেই কিছু সৃষ্টি করে নিতে পারেন।

নৃপতিদা কত বড় শিল্পী সেটা আমার বিচার্য নয়। সেটা বলতে পারবেন সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, সুশীল মজুমদারের মতো পরিচালকরা—যাঁরা তাঁকে নিয়ে অনেক ছবিতে কাজ করেছেন। আমি শুধু বলব 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির একটি দৃশ্যের কথা। যেখানে হাল্লার রাজার কারাগারে গুপী আর বাঘা বন্দি অবস্থার মধ্যেও ভূতের রাজার বরে নানাবিধ সুখাদ্য এনে খাচ্ছে আর কারাগারের বাইরে প্রহরী হিসেবে নৃপতিদা বুভুক্ষুর মতো সেই খাবারের দিকে তাকিয়ে আছে। নৃপতিদার সেই বুভুক্ষু দৃষ্টি আমি কোনওদিনই ভুলতে পারব না। সত্যজিৎ রায় ওই দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, তা ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা এনে দিয়েছেন নৃপতিদা তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। এর জন্যে এক লাইন ডায়লগেরও প্রয়োজন হয়নি।

নৃপতিদার অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। নৃপতি চট্টোপাধ্যায়কে অভিনেতা বললে উনি খুব রেগে যেতেন। বলতেন : দূর মশাই, আমি আবার অভিনেতা নাকি! করি তো কাটা সৈনিকের পার্ট। অভিনেতা হতে গেলে অনেক 'এলেম' থাকার দরকার। আমার সে সবের বিন্দুমাত্রও নেই। আপনারা পাঁচজনে ভালোবেসে আমাকে অভিনেতা বলেন। আমি শুনি আর মনে মনে হাসি।

তা নৃপতিদা কথাটা মিথ্যে বলেননি। ছবিতে উনি যে সব চরিত্র পেতেন সেগুলিকে চরিত্র বললে 'চরিত্র' নামক শব্দটিকে অপমান করা হয়। ছবির মূল ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কমিক রিলিফের জন্য নৃপতিদাকে মেক্-আপ দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হত।

অথচ নৃপতিদা যে কত বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন তার দু-একটি উদাহরণ তো আগেই দিয়েছি। একেবারে শূন্যের মধ্যে থেকেও কিছু সৃষ্টি করে নেবার মতো অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল।

বাংলা ছায়াছবিতে নৃপতিদা যে অপরিহার্য ছিলেন এ কথা আমি মনে করি না। কিন্তু কারও কারও কাছে তিনি সত্যিই অপরিহার্য ছিলেন। যেমন বোম্বাইয়ের বিখ্যাত গায়ক অভিনেতা কিশোরকুমারের কাছে। সে এক বিচিত্র ঘটনা।

কিশোরকুমারের 'লুকোচুরি' ছবিতে নৃপতিদা একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ছবির শ্যুটিং হয়েছিল বোম্বাইতে। কমল মজুমদার ছিলেন ছবির পরিচালক। নৃপতিদা ছাড়াও কলকাতার আরও অনেক শিল্পী ছিলেন ওই ছবিতে। অভিনেতা শ্যাম লাহার ওপর দায়িত্ব ছিল কলকাতার শিল্পীদের বোম্বাই নিয়ে যাবার।

সেবার নৃপতিদার যাবার পালা। শ্যাম লাহা যথাসময়ে প্লেনের টিকিট কেটে রেডি করেছেন। নির্দিষ্ট দিনে আরও কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে নৃপতিদাকে নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে হাজির হলেন। এমনিতে নৃপতিদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে চালিয়ে দেন, সেবার বম্বে যাবেন বলে কোট প্যান্ট পরে সাহেব সেজেছেন।

এয়ারপোর্টের ওয়েটিং কর্নারে সবাই বিশ্রাম নিচ্ছেন। নৃপতিদা কিন্তু বসছেন না। চঞ্চলভাবে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছেন। একটু পরে এসে শ্যাম লাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা হুয়া, জওহরলালকে তো প্রায়ই প্লেনে যাওয়া আসা করতে হয়, তাই না?

শ্যাম লাহার ডাকনাম হুয়া। হুয়াদা জবাব দিলেন : তা তো হয়ই। দেশের প্রধানমন্ত্রী বলে কথা!

নৃপতিদা ডান হাতে তুড়ি মেরে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলে উঠলেন : তা হলে আর ভয়ের কী আছে? অ্যাঁ?

এই বলে আবার পায়চারি করতে লাগলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে।

মিনিট পনেরো পরে আবার শ্যাম লাহার কাছে এসে বললেন : দেখ হুয়া, তুই তো প্রায়ই প্লেনে যাওয়া-আসা করিস। তাছাড়া এই তো কত ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি, বাচ্চা-কাচ্চা সবাই প্লেনে করে যাচ্ছে। তা হলে আর ভয়ের কী আছে বল্?

এই বলে নৃপতিদা আবার পায়চারি করতে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই রিপোর্টিং-এর কাউন্টার খুলে গেল। নৃপতিদার টিকিট হুয়াদার কাছে। ব্যাগ-ব্যাগেজও এখানে রাখা। কিন্তু নৃপতিদা গেলেন কোথায়? অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া গেল না। মাইক্রোফোনে বারবার নৃপতিদার নাম ধরে অ্যানাউন্স করেও তাঁর পাত্তা পাওয়া গেল না। অগত্যা হুয়াদারা নৃপতিদাকে ছাড়াই বম্বে চলে গেলেন।

বম্বে পৌঁছে সব ঘটনা কিশোরকুমারকে জানিয়ে হুয়াদা বললেন : কী আর করবেন, নৃপতিদার বদলে এখানকার অন্য কাউকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিন।

সঙ্গে সঙ্গে কিশোরকুমার বলে উঠলেন : অসম্ভব! নৃপতিদার রোল করবে অন্য কেউ! আপনি পাগল হয়েছেন!

একটুক্ষণ কী যেন ভেবে নিলেন কিশোরকুমার। ডায়েরিটা একবার দেখে নিলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে। মহম্মদ যদি পর্বতের কাছে না আসে তবে পর্বতই যাবে মহম্মদের কাছে। আমার ছবির নৃপতিদার ওই পোর্শানের শুটিং কলকাতাতেই হবে।

তাই হয়েছিল। এবং কেন নৃপতিদাকে বাদ দিয়ে শুটিং করতে চাননি কিশোরকুমার সেটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ছবি দেখার পর। লম্বা সিড়িঙ্গে হাতখানা দিয়ে মাথায় চাঁটি মারছেন আর এক-একটা আইডিয়া বেরোচ্ছে, ঠিক এমন অভিনয়টি আর কেই বা করতে পারতেন নৃপতিদা ছাড়া।

এখন তো আর ছবির পর্দায় ওই জাতীয় কমেডি অ্যাকটিং দেখতেই পাওয়া যায় না।

সত্তরের দশকের শেষের দিকে নৃপতিদাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আজ পর্যন্ত যত ছবিতে আপনি কাজ করেছেন তার সংখ্যা কত হবে?

নৃপতিদা তখন একটু তুরীয় অবস্থায় ছিলেন। বললেন : কত আর! চারশো-পাঁচশো-ছশো-সাতশো। হাজারও হতে পারে।

আমি বললাম : যাঃ, অত হতেই পারে না।

নৃপতিদা একটু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন : ওই তো আপনাদের দোষ! আপনারা, সাংবাদিকরা কেবল সামনেটাই দেখেন। পেছনটা তো আর দেখেন না।

আমি বললাম : তার মানে?

নৃপতিদা বললেন : মানে জানতে গেলে ইন্ডিয়া ল্যাবের মেহ্‌তার কাছে যেতে হবে। কিংবা বেঙ্গল ল্যাবে ঢুঁ মারতে হবে।

আমি বললাম : অ্যাই মরেছে! এ তো সেই রবীন্দ্রনাথের 'সূক্ষ্ম বিচার'-এর চেয়েও জটিল হয়ে গেল দেখছি।

রবীন্দ্রনাথের নাম শুনে নৃপতিদা একটু নড়েচড়ে বসলেন। পানপাত্র সমেত একবার হাতটা কপালে ঠেকিয়ে নিলেন। তারপর বললেন : সেটা কী রকম!

আমি বললাম : 'সূক্ষ্ম বিচার' রবীন্দ্রনাথের একটি আড়াই পাতার কৌতুক-নাটিকা। কেবলরাম নামে এক অতি সহজ সরল ভদ্রলোক রাস্তার মাঝখানে চণ্ডীচরণ নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তিকে একটি অত্যন্ত নিরীহ প্রশ্ন করেছিলেন : 'মশায়, ভালো আছেন?' তা সেই কথার উত্তরে পণ্ডিত ব্যক্তিটি এমন সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন যে কেবলরাম পালাতে পথ পান না। আপনার হয়েছে সেই অবস্থা। আমি একটি নিরীহ প্রশ্ন করেছিলাম : 'নৃপতিদা, আপনার ছবির সংখ্যা কত?' তা আপনি তার উত্তরে সামনে-পেছন, ইন্ডিয়া ল্যাব-বেঙ্গল ল্যাব ইত্যাদি আরও কী সব বলে সব ব্যাপারটাকে জটিল করে তুললেন।

নৃপতিদা বললেন : আমার উত্তরটা এখনই এত জটিল মনে হচ্ছে? এর পাঁচ-সাত দশ বছর পরে যখন সব ব্যাপারটা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পুরো ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিটাকে ক্যাওড়াতলা পৌঁছে দেবে, তখন কী বলবেন?

আমি হাত জোড় করে বললাম : দোহাই নৃপতিদা, আর হেঁয়ালি করবেন না। এর পরে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

নৃপতিদা বললেন : আপনার প্রশ্নটা হওয়া উচিত ছিল, আমার রিলিজ করা ছবির সংখ্যা কত? তাহলে একটা আন্দাজ করে বলতে পারতাম। কিন্তু আপনি জিজ্ঞেস করলেন, কতগুলো ছবিতে কাজ করেছি। তা রিলিজ করা ছবি ছাড়াও ইন্ডিয়া ল্যাব কিংবা বেঙ্গল ল্যাবে ওই যে হাজার হাজার এক রিল, দু রিল, পাঁচ রিল করে তোলা আনফিনিশড সব ছবি ডাঁই হয়ে পড়ে আছে, তার হিসেব কে নেবে। ওগুলোতেও তো আমি অভিনয় করেছি, না কি?

আমি বললাম : ওগুলো আমরা হিসেবের মধ্যে ধরি না।

নৃপতিদা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন : কেন ধরবেন না। কিছু আজেবাজে পরিচালক ছবি করবার লোভ দেখিয়ে কিছু মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটার জোচ্চোর বদনাম করে দিয়েছে, যার ফলে নতুন ফিনান্স আর আসছে না। এরকম আর কিছুদিন চললে তো সব ডকে উঠে যাবে।

বলতে বলতে উত্তেজনা দমন করবার জন্যে নৃপতিদা কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন। তারপর 'মা-আ-আ' বলে একটি লম্বা চুমুক দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

বুঝলাম, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ চিন্তা এই ঋষিতুল্য মানুষটির অন্তরের শান্তি বিঘ্নিত করছে। অথচ ইন্ডাস্ট্রির ভালো কিংবা মন্দের সঙ্গে ওঁর কোনও স্বার্থ জড়িত নেই। উনি তো সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী।

আগ্রা শহরে এম্‌প্রেস হোটেলের সেই ঘনিষ্ঠ আলাপের পর থেকেই নৃপতি চট্টোপাধ্যায় নামক মানুষটিকে আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গতৃষা আমাকে এমন প্রবলভাবে আকর্ষণ করত যে মাঝে মাঝেই হানা দিতাম তাঁর জুবিলি পার্কের দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটে। সঙ্গে থাকত সান্ধ্য-আহ্নিকের উপকরণ।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ। সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য। তখন প্রস্তাব দিতাম : চলুন বেরিয়ে পড়ি বাইরে।

নৃপতিদা মুচকি মুচকি হাসতেন আর বলতেন : ঝাড়ের বাঁশ ঝাড়ে থাকাই ভালো। সেটাকে পশ্চাদদেশে টেনে আনছেন কেন? শেষকালে সামলাতে পারবেন তো?

আমিও হেসে হেসে জবাব দিতাম : বাঁশ থেকেই তো বাঁশি হয়। দেখাই যাক না আপনি শেষ পর্যন্ত সুরে বাজেন না বেসুরে বাজেন।

আমার কথা শুনে নৃপতিদা করমর্দনের জন্যে তাঁর লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে

বলতেন · আপনার সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে মশায়।

এরপব নৃপতিদা 'মা-আ-আ' বলে একটি লম্বা চুমুকে পানপাত্রটি খালি করে লুঙ্গি ছেড়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে নিতেন।

আমাদের নৈশবিহার শুরু হত ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজারের তৃপ্তি হোটেল থেকে। দোতাল‌া একেবারে কোণের দিকের একটা কেবিন দেখিয়ে নৃপতিদা বলতেন : ছবি যখন আসত তখন ওই কেবিনে বসত।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতাম . ছবি মানে? ছবি বিশ্বাস? আমাদের ছবিদা? এইরকম পরিবেশে?

নৃপতিদা বলতেন : হ্যাঁ তাই। এখন পরিবেশটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে বটে, তবে একসময় এই তৃপ্তি বারই কলকাতা শহরেব খানদানি মাতালদের প্রধান আড্ডাখানা ছিল

এই বলে ছবিদার জীবনেব নানা ঘটনা বলতে শুরু কবতেন নৃপতিদা। ওইসব কথা থেকে বুঝতে পারতাম নৃপতিদাব বুকের মধ্যে কতখানি জুড়ে আছেন ছবিদা। যে কারণে ছবিদার মৃত্যুর পর প্রায় এক মাসের ওপর শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। শোকে বুকটা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। তিনি আর কোনওদিন সুস্থ হয়ে উঠবেন কিনা এই সন্দেহও দেখা দিয়েছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কোনওরকমে সামলে উঠেছিলেন

অথচ এই ছবি বিশ্বাসের প্রথম ছবি 'অন্নপূর্ণার মন্দির' রিলিজ করার পর নৃপতিদা এখানে-ওখানে ছবিদার সম্পর্কে নিন্দেমন্দ করে বেড়াতেন। সেই নিয়ে ছবিদার সঙ্গে একদিন নৃপতিদার তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। সেই প্রসঙ্গে নৃপতিদা ছবিদার অভিনয়ের বিস্তৃত এবং সহৃদয় সমালোচনা করেন। ছবিদা বুঝতে পারেন নৃপতিদা সত্যিই ওঁর একজন সুহৃদ। সেই থেকে উভয়ের বন্ধুত্বের শুরু। আর সে বন্ধুত্ব বলে বন্ধুত্ব! বোধ হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও ওরকম বন্ধুত্ব হয় না।

ছবিদার মৃত্যুর বছরখানেক পরে একদিন কথায় কথায় নৃপতিদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম · আচ্ছা নৃপতিদা, আপনি তো ছবিদাকে অত ভালোবাসতেন। তাহলে অন্নপূর্ণার মন্দির রিলিজের পর ওঁর নামে অত নিন্দেমন্দ করে বেড়াতেন কেন? একজন নতুন শিল্পী, আপনার ওইসব মন্তব্যে তো ওঁর কেরিয়ার শেষ হয়ে যেতে পারত। বাংলা সিনেমা তো তাহলে কোনওদিনই ছবি বিশ্বাসকে পেত না। কতবড় ক্ষতি হয়ে যেত বলুন তো?

নৃপতিদা একটু ম্লান হেসেছিলেন। বলেছিলেন : সেদিন ওই ট্রিটমেন্ট না করলে তো কোনওদিনই ছবি বিশ্বাসকে পাওয়া যেত না। অন্নপূর্ণার মন্দির-এ আমি ওর শুটিং দেখেছি, ওর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছি। বুঝেছিলাম এক টুকরো আগুন হঠাৎ ছিটকে এসে পড়েছে। ওর শিক্ষা-দীক্ষা আভিজাত্য আর ওই সুদর্শন চেহারা, কী অসাধারণ মুখশ্রী, চোখ-নাক—গোটা দুই তিন ছবিতে চান্স পাবে, তারপর অসৎসঙ্গে পড়ে ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে। যার শেষ পরিণতি নিষিদ্ধপল্লীর কোনও বাড়িতে রোগে শোকে দারিদ্র্যের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। আমাদের ফিল্ম লাইনে তেমন উদাহরণের তো অভাব নেই। সুতরাং আমি চেয়েছিলাম, ও আমার কাছে আসুক, আমার নির্দেশ মেনে চলুক, আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করুক। তাই ওই ট্রিটমেন্ট। বলুন, ভুল করেছিলাম কি?

বলতে বলতে হু-হু করে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন নৃপতিদা। আর আমি ওঁর মুখোমুখি বসে ভাবতে লাগলাম, ভালোবাসা কত গভীর হলে এত অশ্রু নিষ্কাশিত হয়। সত্যিই বড় ভাগ্যবান ছিলেন ছবিদা।

এইভাবে রাতের পর রাত একটু একটু করে নৃপতিদা উন্মোচিত হয়েছেন আমার কাছে। ভবানীপুর থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত গলির গলি তস্য গলির ভিতর অবস্থিত বিভিন্ন পানশালায় বসে এই অদ্ভুত আর আশ্চর্য মানুষটির হাসি-কান্নার নানা কাহিনী জানতে পেরেছিলাম।

ওইরকম একটা রাতে গাঁজা পার্কের ঝুপঝুপে অন্ধকার এক কোণে বসে নৃপতিদাকে প্রশ্ন করেছিলাম : ফিল্ম লাইনে এতদিন আছেন, এত মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, অথচ কারও প্রেমে পড়লেন না। এটা তো ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার।

নৃপতিদা অবশিষ্ট পানীয়টুকু গলায় ঢেলে ভাঁড়টি মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন : কে বললে প্রেমে পড়িনি। আলবৎ পড়েছি। আমারও তো একসময় 'জৈবন' ছিল, না কি?

নৃপতিদা রসিকতা করে 'যৌবন' শব্দটি ওইভাবে উচ্চারণ করতেন।

আমি ততক্ষণে রগরগে একটি প্রেমের কাহিনী শোনবার জন্যে নড়েচড়ে বসেছি। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম : কার সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন? মেয়েটির নাম কী?

নৃপতিদা বললেন : তার নামটা তো জানা হয়নি।

শুনে আমি তো হাঁ। বললাম : সে কী! প্রেম নিবেদন করলেন অথচ তার নাম জানলেন না, এ তো ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার!

নৃপতিদা বললেন : নাম জানব কী করে। আসলে, মেয়েটি তো জানতেই পারেনি যে আমি তার প্রেমে পড়েছি।

আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছিল। বললাম : সে আবার কী কথা!

নৃপতিদা বললেন : বুঝতে পারলেন না? আমার ওই প্রেমটা তো ছিল লংশটে। আর সেই লংশট থেকেই ডিজলভ করে গেছে। মিড লং, ক্লোজ-আপ কি বিগ ক্লোজ-আপের সুযোগই হয়নি।

শুনে হাসতে হাসতে সন্ধে থেকে যতটা পানীয় পেটে পড়েছিল তা পাকস্থলী থেকে উঠে আসার যোগাড়। হায় ঈশ্বর' এই মানুষের কাছে শুনতে চেয়েছি কিনা রগরগে প্রেমের গপ্পো!

এবার নৃপতিদার মঞ্চ-জীবনের কিছু ঘটনা শোনাই। মঞ্চ-জীবনের অর্থ মঞ্চাভিনয়ের নয়। বৃহস্পতি শনি রবি এবং ছুটির দিনে যে সব নিয়মিত মঞ্চাভিনয় হয়, তেমন কোনও মঞ্চে নৃপতিদা যুক্ত ছিলেন কিনা আমার জানা নেই! আমি তাঁকে দেখেছি বিভিন্ন কম্বিনেশন নাইটে অভিনয় করতে।

না, এইসব আসরে বড়সড় কোনও রোল্ নৃপতিদা কোনওদিনই পেতেন না। পেতেন ছোটখাটো অকিঞ্চিৎকর কিছু ভূমিকা। নৃপতিদার ভাষায় 'কাটা সৈনিকের পার্ট'। তা সেই কাটা সৈনিকের দাপটে তা-বড় তা-বড় শিল্পীরা কীভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছেন সে রকম কয়েকটি ঘটনা এখানে শোনাব।

সেবার মিনার্ভা থিয়েটারে কম্বিনেশন নাইটে অভিনীত হচ্ছে 'মিশরকুমারী'। সেকালের এক বিশেষ জনপ্রিয় নাটক। ভূমিকালিপিও বেশ জমকালো। ওই নাটকে আবনের ভূমিকায় আছেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরি, সামন্দেশ করছেন বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ি, রামেশিস—জহর গাঙ্গুলি, খারেব—রবি রায়, ফারাও-এর চবিত্রে কে ছিলেন তা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। সম্ভবত ছবি বিশ্বাস। স্ত্রী চরিত্রগুলিতে ছিলেন নাহরিন—সরযূবালা, বুলা—শান্তি গুপ্তা। এছাড়া ছিলেন নামী অনামী আরও অনেক শিল্পী। নৃপতিদা করছেন বুলার চাকর কাকাতুয়া। চরিত্রটিতে কিছু হাস্যরস সৃষ্টির অবকাশ ছিল, সেইজন্যেই নৃপতিদাকে নেওয়া।

যে কোনও অভিনয়ের আগে নৃপতিদা জনান্তিকে দু-পাত্তর চড়িয়ে নিতেন মুড-টুড ঠিক রাখবার জন্যে। সেদিনও তাই করেছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল কাকাতুয়া তো একটা পাখির নাম। সে কেন হেঁটে হেঁটে উইংসের পাশ দিয়ে স্টেজে ঢুকবে। তার তো ডানা মেলে উড়ে আসাই উচিত।

যে ভাবা সেই কাজ। সকলের অলক্ষে নৃপতিদা উইংসের ফ্রেম বেয়ে ওপরের কাঠ-কাঠরা সরিয়ে প্রায় আড়াইতলা সমান উঁচুতে কোনওরকমে একঠেঙে হয়ে বসে রইলেন আধ ঘণ্টাটাক। তারপর এল কাকাতুয়ার অ্যাপিয়ারের মুহূর্তটি।

মঞ্চের ওপরে সেই দৃশ্যে আবন, নাহরিন আর বুলা। অর্থাৎ অহীন্দ্র চৌধুরী, সরযূবালা এবং শান্তি গুপ্তা। অভিনয় করতে করতে যথাসময়ে শান্তি গুপ্তা উইংসের পাশে প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন : কাকাতুয়া।

ওই ডাক পাবার সঙ্গে সঙ্গে 'ক্ব' বলে একটি ডাক ডেকে পাখির ডানা মেলে দেবার মতো দু'হাত ছড়িয়ে নৃপতিদার এসে দাঁড়াবার কথা। কিন্তু কেউ আসছেন না দেখে শান্তি গুপ্তা কণ্ঠস্বর আর একটু চড়িয়ে পুনরায় ডাকলেন : কাকাতুয়া।

সঙ্গে সঙ্গে শূন্য থেকে ধপাস করে কী যেন একটা পড়ল আবনরূপী অহীনবাবুর সামনে। দারুণ চমকে উঠে দু-পা পিছিয়ে গেলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। দু-এক সেকেন্ড সময় লাগল সামলাতে। তারপর

আবিষ্কার করলেন তাঁর সামনে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো দু'হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছেন 'ঞ্ক'-'ঞ্ক'-'ঞ্ক'। আর তাঁর ডান পায়ের সামনে খানিকটা অংশের ছাল উঠে নীচের দিকে ঝুলছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে স্টেজের ফ্লোর।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখে অহীন্দ্র চৌধুরী—যিনি প্রায় দুশো-আড়াইশো রাত্রি আবনের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন—তিনি তাঁর পরবর্তী সংলাপটাই ভুলে গেলেন। অহীনবাবুর পাশে দাঁড়ানো সরযূবালা আর শান্তি গুপ্তাও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন এই ঘটনায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সরযূবালা নিজেকে সামনে নিয়ে চাপা গলায় অহীনবাবুকে ডায়লগের কিউটা ধরিয়ে দিলেন। তারপর কোনওরকমে দৃশ্যটি শেষ করলেন সবাই মিলে।

পর্দা পড়ার পর গ্রিনরুমে নৃপতিদাকে এই মারেন তো সেই মারেন অহীনবাবু। যাচ্ছেতাই করে গালাগালি করতে লাগলেন। নৃপতিদা যতবার তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে দৃশ্যটাকে বাস্তবসম্মত করবার জন্যেই তিনি এই কাণ্ডটা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই অসাধারণ কাজের কেউ তো প্রশংসা করলই না, উল্টে সবাই তাঁকেই দোষ দিতে লাগল।

মনের দুঃখে গ্রিনরুমে বসে টিংচার আইওডিন দিয়ে নিজেই নিজের পদসেবা করতে লাগলেন নৃপতিদা। আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এই পৃথিবীতে ভালো কিছু করার উপায় নেই। এমন একটা এক্সপেরিমেন্টের মর্ম কেউ বুঝল না।

এর দু-একদিন পরে শ্রীরঙ্গম মঞ্চের সামনে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে দেখা নৃপতিদার। শিশিরবাবু লোকমুখে মিনার্ভা থিয়েটারের সেদিনকার ঘটনা সবই শুনেছিলেন। নৃপতিদাকে দেখে তিনি সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন : কী হে নৃপতি, কেমন আছো?

নৃপতিদা বললেন : ভালো নেই বড়বাবু।

শিশিরবাবুকে সবাই 'বড়বাবু' বলে ডাকতেন। নৃপতিদার কথা শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কেন কেন, ভালো নেই কেন?

নৃপতিদা বললেন : আপনাকে কোনওদিন কম্বিনেশন নাইটে পেলাম না, তাই।

শিশিরবাবু সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন : পেলে কী করতে?

নৃপতিদা বললেন : একটু টাইট দেবার চেষ্টা করতাম।

শিশিরবাবু হেসে ফেললেন। বললেন : অপেক্ষা করো। একদিন না একদিন সুযোগ পেয়ে যাবে নিশ্চয়।

তা নৃপতিদা অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু শিশিরবাবু আর অপেক্ষা করেননি। নৃপতিদাকে 'টাইট' দেবার কোনও সুযোগ না দিয়েই তিনি ইহলোক ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সবাইকে কাঁদিয়ে।

ঘটনাটা বলতে বলতে নৃপতিদার চোখ দুটোও জলে ভরে উঠেছিল।

যে ছবিদার সঙ্গে নৃপতিদার গলায় গলায় ভাব ছিল, যাঁদের সখ্যতাকে লোকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করত, সেই ছবিদাকেও মঞ্চের ওপর টাইট দিতে কসুর করেননি নৃপতিদা। সেটাও এক মজার ঘটনা। সে কথায় পরে আসছি।

কিং কমেডিয়ান নৃপতি চাটুজ্যেকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম : আচ্ছা নৃপতিদা, আপনি জীবনে কখনও পলিটিক্স করেছেন।

প্রশ্নটা করার একটা উদ্দেশ্য ছিল। নৃপতিদার জীবনের বেশ খানিকটা সময় চট্টগ্রামে কেটেছে। সেই চট্টগ্রাম, যে চট্টগ্রাম একটা সময়ে ছিল বিপ্লবের পীঠস্থান। মাস্টারদা সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের স্মৃতি বিজড়িত সেই বিখ্যাত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কথা মনে পড়লে শ্রদ্ধায় মাথাটা আজও নত হয়ে আসে। সেইসব ঘটনা সেদিনের তরুণ নৃপতি চট্টোপাধ্যায়কে কতখানি আলোড়িত করেছিল, সেটা জানবার জন্যেই প্রশ্নটা করা।

নৃপতিদা গম্ভীরভাবে বললেন : উচ্চারণটা ভুল হল। ওটা শুধরে নেবেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম : কোন্ উচ্চারণটা?

নৃপতিদা বললেন : ওই যে বললেন পলিটিক্স, ওটার সঠিক উচ্চারণ হবে পলিট্রিক্স।

আমি বললাম : কক্ষনো না। আমার উচ্চারণটাই ঠিক। দরকার হলে ডিক্‌শনারি খুলে দেখাতে পারি।

নৃপতিদা তেমনি গম্ভীরভাবে বললেন : বিশ বছর আগেও পলিটিক্সের ওই উচ্চারণটাই চলত। এখন সেটা বদলে গিয়ে হয়েছে পলিট্রিক্স।

আমি বোকার মতো জিজ্ঞাসা করলাম : তার মানে?

নৃপতিদা বললেন : এখন ট্রিকস না জানলে পলিট্রিক্স করা যায় না। ট্রিকসটা ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারলে গাড়ি হয়, বাড়ি হয়, শালা-শেলেজদের চাকরি হয়, ভাইপো-ভাগনেদের ব্যবসা হয়। যারা ট্রিকস জানে না তারা পলিট্রিক্সের জগতে টিকে থাকতে পারে না। অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়ে।

নৃপতিদার ট্রিকস শব্দের মর্মার্থ এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম হল। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম : তা আপনি কখনও পলিটিক্স করেছেন।

নৃপতিদা বললেন : করিনি মানে! আলবাৎ করেছি। এখনও করছি। ট্রিকসের রাজত্বেই তো আমার বসবাস।

নৃপতিদার এই কথার কোনও থই পেলাম না। সব কেমন ধোঁয়াটে হয়ে গেল। বললাম : একটু খোলসা করে বলুন না কী বলতে চাইছেন।

নৃপতিদা একটু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন : এই সোজা কথাটার মানে বুঝতে পারলেন না? আপনার মাথায় কি গোবর পোরা আছে নাকি স্যার?

আমি বললাম : ঠিক ধরেছেন। আমাদের হ্যামিলটন স্কুলের অঙ্কের স্যারও আমাকে এই কথাটাই বলতেন। তা গোবর থেকে তো শুনেছি বেশ ভালো সার হয়। এবারে আপনি একটু খোলসা করে বললে আপনার কথার সারমর্ম কি আর আমার মাথায় ঢুকবে না? নিশ্চয় ঢুকবে।

নৃপতিদা হাসতে হাসতে বললেন : শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে মশায়। আমি আপনার মাথায় গোবর পুরে দিলাম, আর আপনি এক মুহূর্তে সেটাকে দামি সার বানিয়ে দিলেন। এই না হলে সাংবাদিক।

আমি একটু গম্ভীর হয়ে বললাম : এই যে কথার পিঠে কথা ফেলে দু'জনে দু'জনের পিঠ চুলকোচ্ছি, এটা এবারে থামান দিকি। ট্রিকসের রাজত্বে বসবাস বলতে কী বোঝাতে চাইছেন সেটা স্পষ্ট করে বলুন।

নৃপতিদা বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, স্পষ্ট কথার আর কষ্ট কী। তাহলে ব্যাপারটা খুলেই বলি। এই যে সিনেমার রাজত্বে কাজকর্ম করে খাচ্ছি এটাই তো ট্রিকসের রাজত্ব। ছবির পর ছবিতে কত রকমের ট্রিক। দশতলা বাড়ির ওপর থেকে নায়ক লাফ দিয়ে পড়ল অথচ তার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না, বিশজন লোকের সঙ্গে একা লড়ে গিয়ে সবাইকে কাত করে দিলে, এর থেকে বড় ট্রিক আর হয় নাকি? সন্তানের জন্যে মায়ের চোখে জল ঝরছে, সেটা জল নয় গ্লিসারিন। রক্তে ভিলেনের সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে, সেটা রক্ত নয় এক ধরনের কেমিক্যাল। এই ট্রিকসের ঠ্যালায় গল্পের গরু গাছে চড়ছে, কত লক্ষপতি প্রোডিউসার এক বছরের মধ্যে রাস্তার ভিকিরি বনে গিয়ে ধর্মতলা পাড়ায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ট্রিকসের রাজত্বেই তো আমার বসবাস। বলুন স্যার কথাটা কি খুব ভুল বলেছি?

আমি বললাম : না, ভুল বলেননি। খুব খাঁটি কথাই বলেছেন। তবে এর ব্যতিক্রমও তো আছে। এই যে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহরা ছবি করেন, এঁদের ছবিতে তো গল্পের গরু গাছে ওঠে না।

নৃপতিদা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন : ওই ওই, ওই যে নামটি করলেন, সত্যজিৎ রায়, ওঁর তুলনা হয় না মশাই। আহা! ছবি তো নয়, খাঁটি জীবনের নির্যাস। হ্যাটস্ অফ টু সত্যজিৎ রায়।

বলতে বলতে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে নাচতে লাগলেন নৃপতিদা, আর চিৎকার করে বলতে লাগলেন : এই তো পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি!

আমি ওঁর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলাম। এ কী কাণ্ড! আজ কি ডোজটা একটু বেশি হয়ে গেল নাকি? সামনে রাখা বোতলটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। না, তা তো নয়। এখনও তো তিনটে পেগই শেষ করতে পারেননি। তাহলে?

বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম : কী পেয়ে গেছেন?

নৃপতিদা ধীরেসুস্থে গ্লাসে একটা চুমুক দিলেন। দু'কুচি আদা মুখে ফেললেন। তারপর বললেন : ক'দিন ধরে ভাবছিলাম একটা ব্যবসা করব। তা কী ব্যবসা করব সেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আজ সেটা পেয়ে গেছি।

আমি বললাম : কিসের ব্যবসা?

নৃপতিদা বললেন : টুপির।

আমি বললাম : সে কী মশাই! আমরা কি সাহেব না আমাদের ইস্‌লামিক কান্ট্রি যে এখানে টুপির ফলাও ব্যবসা চলবে?

নৃপতিদা আবার সেই রহস্যময় হাসি হেসে বললেন : চলবে মশাই, চলবে। আমাদের এই স্টুডিও পাড়াতেই চলবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তার মানে?

নৃপতিদা বললেন : মানেটা বুঝতে পারলেন না? স্টুডিওপাড়ায় প্রতি মুহূর্তে এ-ওকে টুপি পরাচ্ছে, সে তাকে টুপি পরাচ্ছে। ডিরেক্টার প্রোডিউসারকে পরাচ্ছে, প্রোডিউসার আর্টিস্টকে পরাচ্ছে, ডিস্ট্রিবিউটার প্রোডিউসারকে পরাচ্ছে, প্রোডিউসার আবার টেকনিশিয়ানকে পরাচ্ছে। দিনরাত কেবল টুপি পরানোর খেলা। অথচ কারও হাতে টুপি নেই। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকে একটা ঝুপড়ি ভাড়া নিয়ে একটা টুপির দোকান করলে কীরকম চলবে বলুন। সকলের হাতে একটা করে টুপি ধরিয়ে দেওয়া যাবে। অদৃশ্য টুপি হাতে নিয়ে একঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে যে মেহনতটা হয় সেটা বেঁচে যাবে।

শুনে হাসতে হাসতে তো আমার দম বন্ধ হবার যোগাড়। কিন্তু এটা তো নিছক হাসির কথা নয়। নৃপতিদার এই ব্যঙ্গকৌতুকের আড়ালে যে নিষ্ঠুর এবং মর্মান্তিক সত্যটা লুকিয়ে আছে সেটাকে অস্বীকার করি কী করে! সাধে কি আর তাঁর নাম দিয়েছি 'বর্ণচোরা দার্শনিক'।

যাক, এবারে সেই থিয়েটারের কম্বিনেশন নাইটে ছবি বিশ্বাসকে টাইট দেবার ঘটনাটা বলি।

সেবার কম্বিনেশন নাইটে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' নাটক হচ্ছে রঙমহলে। কাস্টিং দারুণ। উপীন—অহীন্দ্র চৌধুরী, সতীশ—ছবি বিশ্বাস, দিবাকর—মিহির ভট্টাচার্য, কিরণময়ী—শান্তি গুপ্তা এবং সাবিত্রীর ভূমিকায় আছেন রানিবালা। এছাড়া নামকরা আরও অনেকেই আছেন। নৃপতিদা করছেন ছোট্ট এক সিনের একটা রোল। সতীশের এক মাতাল বন্ধু।

প্রতিবারে যেমন করেন এবারেও তেমনি মেক্-আপ নেবার আগে দু'পাত্তর চড়িয়ে নিয়েছেন নৃপতিদা। মেক্-আপটা উনি সকলের আগেই সেরে নিতেন। তারও একটা কারণ ছিল। অনেক সময় শেষ মুহূর্তে অভিনয় বাতিল হয়ে যেত অনিবার্য কারণে। সেক্ষেত্রে শিল্পীদের কাউকে পয়সা দিতে হত না। ব্যতিক্রম ঘটত যাঁরা মেক-আপ নিয়ে নিয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে। তাঁদের টাকা-পয়সা পুরো না হোক অর্ধেকটা দিতেই হত। দু-একবার এইভাবে ঠকবার পর পরবর্তীকালে নৃপতিদা প্রথমে এসেই মেক্-আপটা নিয়ে নিতেন।

যেদিনকার কথা বলছি সেদিন শো শুরু হবার কথা সন্ধে সাতটায়। কিন্তু সাড়ে ছ'টা বেজে যাবার পরও দেখা গেল ছবি বিশ্বাস এসে পৌঁছননি। তাই নিয়ে বুকিং অফিস থেকে শুরু করে গ্রিনরুম পর্যন্ত প্রচণ্ড টেনসন। কেউ বলছেন, ছবিবাবু এখনও এলেন না তো! কেউ জানতে চাইছেন, ছবিদার কোনও ফোন-টোন এসেছে নাকি? অহীনবাবুর মতো ধীর-স্থির মানুষও দু-তিনবার খবর নিয়েছেন, ছবি এসেছে হে?

তা ছবিদা আজকের নাটকের অন্যতম মুখ্য শিল্পী, তাঁর অনুপস্থিতিতে সবাই উদ্বিগ্ন হতেই পারেন। নৃপতিদা এতে দোষের কিছু খুঁজে পেলেন না। কিন্তু পৌনে সাতটা নাগাদ যখন ছবিদা এসে পৌঁছলেন তখন তাঁকে যেভাবে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হল, রঙমহলের বটগাছতলা থেকে সাজঘরের দরজা পর্যন্ত যেভাবে কলরব করতে করতে নিয়ে আসা হল, তাতে নৃপতিদা বিরক্তি বোধ করলেন। ছবি দেরি করে এসেছে, সুতরাং অপরাধটা তার। সে হিসেবে তার তো প্রাপ্য ছিল কিছু অনুযোগ। তার বদলে একেবারে রাজকীয় সম্মান!

হঠাৎ নৃপতিদার মাথায় দুষ্টু সরস্বতী ভর করল। ছবিকে আজ 'টাইট' দিতে হবে। সেটা কীভাবে

কববেন মনে মনে তারই পরিকল্পনা করতে লাগলেন।

ওদিকে ছবিদা তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট সাজঘরে আয়নার সামনে বসে বসে মেক-আপ নিচ্ছেন। এমন সময় আয়নায় নৃপতিদার ছায়া পড়ল। ছবিদা আয়নার দিকে মুখ রেখেই জিজ্ঞাসা করলেন : কী ব্যাপার?

নৃপতিদা বললেন : একটা কথা ছিল।

ছবিদা বললেন : বলে ফেলো।

নৃপতিদা বললেন : দশটা টাকা দিবি?

ছবিদা জিজ্ঞাসা করলেন : কী হবে?

নৃপতিদা বললেন · মাল খাব।

ছবিদা বিরক্ত কণ্ঠে বললেন . ছবি বিশ্বাস কাউকে মদ খাবার জন্যে টাকা দেয় না। তুমি এখন যেতে পারো।

নৃপতিদা শান্ত কণ্ঠে বললেন : দিলে ভালো করতিস।

ছবিদা ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : না দিলে খারাপটা কী হবে?

নৃপতিদা বললেন . তোর সঙ্গে আমার একটা সিন আছে তো, সেখানে টাইট খেয়ে যেতে পারিস।

এবারে চেয়ারটায় ঘুরে বসলেন ছবিদা। নৃপতিদার মুখেব দিকে তাকিয়ে শ্লেষভরা কণ্ঠে বললেন: ছবি বিশ্বেসকে টাইট দেবে তুমি? উঁ! করো তো এক সিনের মাতালের পার্ট!

নৃপতিদা আদৌ উত্তেজিত হলেন না। রীতিমতো শীতল কণ্ঠে বললেন : দশটা টাকা ফেলে দিলে আর কোনও ঝামেলাই থাকবে না!

ছবিদার কণ্ঠস্বর এবার চড়ে গেল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন · তুমি যাবে এখান থেকে।

নৃপতিদা কয়েক সেকেন্ড ছবিদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন : ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন।

কথাকটি বলে ধীর পায়ে ছবিদার মেক-আপ রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। নৃপতিদার গমনপথের দিকে তাকিয়ে ছবিদা নিজেব মনে উচ্চাবণ কবলেন : হুঁঃ। তারপর মুখ ফিরিয়ে আবার মেক-আপে মন দিলেন।

সেদিন নাটক খুব জমে গিয়েছিল। সবাই দারুণ অভিনয় করছিলেন। অবশেষে এল সেই দৃশ্যটি।

মেসের ঘরে সতীশ খাটে বসে কথাবার্তা বলছে মেসের ঝি সাবিত্রীর সঙ্গে। এমন সময় সতীশকে খোঁজবাব জন্যে তার বন্ধুরা এসে হাজির। বাইরের সিঁড়িতে তাদের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সতীশ ওদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক নয়। তাই ফুঁ দিয়ে ঘবের আলো নিভিয়ে খাটের উপর আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

সাবিত্রীবেশী রানিবালা চাপা কণ্ঠে বলে উঠলেন : এ কী করলেন আপনি!

কম্বলটা টেনে মুখে ঢাকা দেবার আগে ছবিদা বললেন : তুমি ওদের বলে দাও আমি বাড়িতে নেই।

কিন্তু তার আর উপায় নেই। মাতাল বন্ধুর বেশে নৃপতিদা ঘরের দরজার সামনে চলে এসেছেন। তাঁর মুখে সংলাপ : কী অন্ধকারে বাবা! সতীশবাবুর ঘরটাই বা এতো অন্ধকার কেন?

বলতে বলতে স্টেজে ঢুকে পড়লেন নৃপতিদা। রানিবালাকে দেখে বলে উঠলেন : এই যে ঝি, সতীশবাবু কোথায়?

রানিবালা তাঁর স্থূল শরীরটা দুলিয়ে খাটের দিকে ইঙ্গিত করে স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এরপর নৃপতিদার কাজ হল খাটের কাছে গিয়ে ছবিদার মুখ থেকে কম্বলটা সরিয়ে বলে ওঠা : এ কী সতীশবাবু, আপনি এখানে। আর আমি আপনাকে সারা মেসময় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু নৃপতিদা সে ধার দিয়েও গেলেন না। যে খাটে ছবিদা কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছেন একেবারে তার উল্টোদিকে টেবিলের কাছে চলে গেলেন। সেখান থেকে ফুলদানিটা তুলে নিয়ে তার তলাটা ভালো করে দেখে বললেন : কই, এখানে তো সতীশবাবু নেই।

নৃপতিদার এহেন কাণ্ড দেখে সারা প্রেক্ষাগৃহে তুমুল হাস্যরোল।

সেদিন কলকাতায় অসম্ভব গরম পড়েছিল। টেম্পারেচার একশো চার ডিগ্রি ফারেনহাইটেরও

ওপরে। সুতরাং ছবিদা আদ্যোপান্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে কী পরিমাণ ঘামতে শুরু করেছেন তা বলাই বাহুল্য। সেইরকম অবস্থায় ঘামতে ঘামতে ছবিদা চাপা গলায় বলে উঠলেন : অ্যাই প্রভু! কী ইয়ার্কি হচ্ছে!

নৃপতিদা খোঁজাখুঁজির ভান করতে করতে খাটের কাছাকাছি এসে তেমনি চাপা কণ্ঠে বললেন : দশটা টাকা হবে?

ছবিদা চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন : জুতো মারব হারামজাদা।

সঙ্গে সঙ্গে নৃপতিদা ছিটকে সরে গেলেন খাটের পাশ থেকে। এবারে টেবিলের পায়ার নিচে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বলে উঠলেন : কই, সতীশবাবু গেলেন কোথায়!

এইভাবে প্রায় দশ মিনিট কেটে গেছে। নাটক এক জায়গায় থেমে আছে। কিন্তু তাতে দর্শকদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁরা নৃপতিদার কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে কুটিপাটি।

নৃপতিদা তখন হয়তো বকের মতো গলা বাড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখা বইয়ের পৃষ্ঠার মধ্যে সতীশবাবুকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

ওদিকে কম্বলের মধ্যে ছবিদার দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। চাপা গলায় কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন : প্রভু, আমার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

নৃপতিদা খাটের কাছাকাছি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : দশটা টাকা হবে তো?

ছবিদা তেমনি কাতর কণ্ঠে বললেন : হবে রে বাবা, হবে।

সঙ্গে সঙ্গে নৃপতিদা তড়াক করে লাফ দিয়ে একটানে ছবিদার মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন : আরে সতীশবাবু, আপনি এখানে। আর আমি ওদিকে...

নৃপতিদাকে ডায়লগ শেষ করার ফুরসত না দিয়ে ছবিদা সটান দাঁড়িয়ে উঠে গট গট করে বেরিয়ে গেলেন স্টেজ থেকে।

এরপর ছবিদা আর নৃপতিদার আরও কিছু সংলাপ ছিল। কিন্তু সেসব আর হল না। মাঝপথেই ড্রপ ফেলে দেওয়া হলো।

গ্রিনরুমে নৃপতিদার সামনে একটি দশ টাকার নোট এগিয়ে ধরে ছবিদা বিকৃত মুখে বলে উঠলেন: তোমার খুরে খুরে দণ্ডবৎ!

নৃপতিদা টাকাটা হস্তগত করে একখানা হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন : জিতা রহো বেটা।

অর্থাৎ ছবিদা কায়দা করে নৃপতিদার 'খুরে-খুরে' দণ্ডবৎ বানিয়ে তাঁকে গোরু প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন, আর নৃপতিদা তাঁকে 'বেটা' সম্বোধন করে বাছুর বানিয়ে দিলেন।

আজকাল এরকম কোন কাণ্ড ঘটলে হয়তো মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যেত। সেকালে আর একালে কত তফাত।

এবারে নৃপতিদার জীবনের শেষ দুষ্টুমির কাহিনীটি জানিয়ে এই স্মৃতিচারণার ইতি ঘটাব!

প্রয়াত কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছায়াছবির একজন বিখ্যাত শিল্পী। 'পথের পাঁচালী' ছবিতে হরিহরের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছিলেন। মঞ্চাভিনেতা হিসেবে তাঁর খ্যাতিও কম ছিল না। দীর্ঘকাল তিনি শিশির ভাদুড়ির গ্রুপে ছিলেন। তবে খুব বড় ভূমিকা বিশেষ পাননি। মোটামুটি মাঝারি ধরনের ভূমিকা ছিল তাঁর জন্যে বরাদ্দ। কানুদার খুব ইচ্ছে ছিল 'সাজাহান' নাটকে আওরঙ্গজেবের চরিত্রে অভিনয় করার। কিন্তু সে সুযোগ কোনদিনই আসেনি।

একবার এল। কানুদার এক পরিচিত ভদ্রলোক কানুদাকে সুযোগ করে দেবার জন্যেই কম্বিনেশন নাইটে 'সাজাহান' মঞ্চস্থ করবার জন্য রাজি হলেন। কানুদা উঠে পড়ে লাগলেন নাটকটিকে সফল করার জন্যে। চরিত্রলিপি ঠি হল সাজাহানের ভূমিকায় তৎকালীন এক এবং অদ্বিতীয় অহীন্দ্র চৌধুরী, আওরঙ্গজেব—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলদার—ছবি বিশ্বাস, মহম্মদ—মিহির ভট্টাচার্য, যশোবন্ত সিংহ—বিজয়কার্তিক দাস, জাহানারা—সরযূবালা, পিয়ারা—শান্তি গুপ্তা। এছাড়া আরও অনেকে। এঁদের সঙ্গে জিহন আলির অকিঞ্চিৎকর চরিত্রটি পেলেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। হই-হই করে টিকিট বিক্রি হয়ে ক'দিনের মধ্যে হাউস ফুল হয়ে গেল। কানুদার মনে খুব আনন্দ। এতদিনে তাঁর স্বপ্ন সফল হতে

চলেছে।

শো-এর দিন যথারীতি দু'পাত্তর চড়িয়ে মঞ্চে এসে হাজির হলেন নৃপতিদা। এদিন আর মেক-আপ নেবার জন্যে তাড়াহুড়ো ছিল না। কারণ পুরো টাকাটাই অগ্রিম হাতে পেয়ে গেছেন। গ্রিনরুমে ঢুকে দেখলেন কানুদা আওরঙ্গজেবের মেক-আপ নিয়ে এ-মাথা থেকে ও-মাথা সম্রাটের মতো বিচরণ করছেন। একে ধমকাচ্ছেন তাকে গালাগালি দিচ্ছেন। কারও সামান্য একটু ত্রুটি দেখলে তার পিতৃপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ছেন।

একটা আলো আঁধারি কোণে বসে কানুদার এইসব কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে নৃপতিদার মনে হল, আচ্ছা, কানুর এত ডাঁট হবে কেন? চিরকাল কানু আমাদের সঙ্গে বসে মেক-আপ নিয়েছে। আজ না হয় তারই পার্টির শো, বড় রোল্ পেয়েছে, আলাদা মেক-আপ রুম পেয়েছে, তা বলে হাতে মাথা কাটবে নাকি? সবাইকে এমন গালিগালাজ, এটা তো ভালো কথা নয়। আরে বাবা এখনও তো তুই ভারতের সম্রাট হোসনি। এখনও তো সাজাহান বেঁচে আছে, না কী?

হঠাৎ নৃপতিদার মাথায় খেলে গেল, কানুর কাছে দশটা টাকা চাইলে কেমন হয়?

যা ভাবা তাই কাজ। কানুদা তখন আওরঙ্গজেবের পোশাক পরে কাকে যেন ধমকাচ্ছেন। নৃপতিদা পেছন থেকে গিয়ে তাঁর কাঁধে টোকা দিলেন।

কানুদা মুখ ফিরিয়ে দেখলেন নৃপতিদা দাঁড়িয়ে। পূর্বতন ধমকানির জের তখনও তাঁর কণ্ঠে ছিল। রুক্ষকণ্ঠে বললেন : কী চাই?

নৃপতিদা বিনীত ভঙ্গিতে বললেন : দশটা টাকা।

কানুদা জিজ্ঞাসা করলেন : কেন, তুমি তোমার পেমেন্ট পাওনি?

নৃপতিদার বললেন : তা পেয়েছি। এটা এক্সট্রা।

কানুদা বললেন : ওসব এক্সট্রা-ফেক্সট্রা চলবে না। এটা কি আমার বাবার জমিদারি নাকি?

নৃপতিদা বললেন : টাকাটা আমি তোর ভালোর জন্যেই চাইছি।

কানুদা অবাক হলেন। বললেন · আমার ভালো! তার মানে?

নৃপতিদা কথা শুনে কানুদা রেগে গেলেন। বললেন : আমার ভালো-মন্দ দেখার জন্যে তোমাকে এখানে আনা হয়নি। আনা হয়েছে অভিনয় করতে। এখনও তো মেক-আপই নাওনি দেখছি। এখানে দাঁড়িয়ে আমার মাথা খারাপ না করে নিজের কাজ করোগে যাও।

নৃপতিদা বললেন : তা হলে তুই টাকাটা দিবি না?

কানুদা সরোষে বললেন : না না না।

এই বলে সেখান থেকে রীতিমতো বিরক্ত হয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

কানুদার গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওপর দিকে মুখ তুলে নৃপতিদা বলে উঠলেন: এরপর আমার আর দোষ নিও না ঠাকুর।

সেদিনও অভিনয় জমেছিল দারুণ। কানুদা একেবারে ফাটাফাটি অভিনয় করছিলেন। তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন আওরঙ্গজেব করা। সেদিন একেবারে মনপ্রাণ ঢেলে অভিনয় করছিলেন তিনি। দর্শকরা মুগ্ধ, বিস্মিত, পরিতৃপ্ত।

তারপরে এল সেই দৃশ্য। একের পর এক ভ্রাতৃহত্যার পাপবোধ, অনুশোচনা আওরঙ্গজেবকে বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে। সারা প্রেক্ষাগৃহের মানুষ রোমাঞ্চিত হয়ে দেখছে কানুদার আশ্চর্য নিপুণ অভিনয়। দৃশ্যটিতে কানুদার সঙ্গে আছেন দিলদাররূপী ছবি বিশ্বাস আর জিহন আলির বেশে নৃপতিদা। ওঁরাও সবিস্ময়ে দেখছেন কানুদার ওই প্রাণঢালা অভিনয়।

কানুদার মুখে তখন সেই দীর্ঘ সংলাপের অংশ : ওই—ওই মোরাদের কবন্ধ, দারার ছিন্নমুণ্ড—আঃ! আমি আর সহ্য করতে পারছি না—কাকে দেব—কে নেবে—

কানুদার মুখ থেকে এই কথা কটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাশ থেকে নৃপতিদা বকের মতো গলা বার করে লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে ঈষৎ নাকি সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন : আমায় দিন, আমায় দিন, আমায় দিন জাঁহাপনা—

নৃপতিদাব মুখে ওইভাবে ওই কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রেক্ষাগৃহে হাসির তুফান ছুটল। ওই দৃশ্যেব প্রবল গাম্ভীর্য, কানুদার অত ভালো অ্যাকটিং কোথায় ভেসে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

কানুদা হতবাক্‌, বিস্মিত। আহত বাঘের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন স্টেজ থেকে। যে দৃশ্যে তাঁর মুগ্ধ করতালি পাবার কথা, সেই দৃশ্য শেষ মুহূর্তে এনে দিল কিছু হই-চই আর চিৎকার।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে দেখে পরিতৃপ্ত নৃপতিদাও সহাস্যে বেরিয়ে গেলেন স্টেজ থেকে। রয়ে গেলেন কেবল ছবিদা তাঁর শেষ সংলাপটি বলার জন্যে। তারপরই ড্রপ পড়ে গেল।

গ্রিনরুমে এসে নৃপতিদা দেখলেন একটি খালি বেঞ্চের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কানুদা বাচ্চা ছেলের মতো চিৎকার করে ফুলে ফুলে কাঁদছেন। কান্নার দমকে তাঁর সারা শরীরটা বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন নৃপতিদা। কানুদার কান্নার প্রতিটি ছন্দ এক-একটা চাবুক হয়ে তাঁর বিবেককে কষাঘাত করতে লাগল। হায় হায়! এ তিনি কী করেছেন। একটা মানুষের সারা জীবনেব স্বপ্ন তিনি এইভাবে ভেঙে চুবমার করে দিয়েছেন! তিনি কি মানুষ!

আর এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়াতে পারলেন না নৃপতিদা। ছুটে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো রামকৃষ্ণদেবেব ছবিব নিচে পাগলেব মতো মাথা ঠুকতে লাগলেন, আর হাউ-হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন : এ আমি কী করলাম ঠাকুব। আমার যে নরকেও স্থান হবে না। তুমি আমায় শাস্তি দাও ঠাকুর। শাস্তি দাও! শাস্তি দাও!

সেদিনকার সেই কান্নাই যেন আবার নৃপতিদাব চোখে ফিবে এসেছিল তাঁর এই জুবিলি পার্কের বাড়িতে আমার সামনে? হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে নৃপতিদা বলেছিলেন : সেইদিন থেকে, জানেন রবিবাবু, সেইদিন থেকে জীবনে আর কাউকে কোনদিন কোনভাবে টাইট দেবার চেষ্টা করিনি। কানুব ওই চোখের জল আমাব সব বদমায়েশি চিবকালের মতো খুচিয়ে দিয়েছে। আমাকে নতুন মানুষ করে দিয়েছে।

নৃপতিদা আজ আব বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁব সেই কান্নাস্নাত যন্ত্রণাদগ্ধ মুখটা আজও আমার চোখেব সামনে ভাসে। সেই ঋষিতুল্য অকপট মানুষটিব কথা যখনই ভাবি তখনই আমার চোখের দুটো কোণ ভিজে আসে তাঁর প্রয়াণের এতদিন পরেও।

মোরগের জন্য তৈরি নৃপতিদার সেই খেলাঘর কবেই ভেঙে গেছে। সব খেলা সাঙ্গ করে তিনিও চলে গেছেন অনেকদিন। কিন্তু আমার স্মৃতিতে তিনি চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

মলিনাদি

আমার পানের নেশাটা মলিনাদিই ধরিয়েছিলেন। কথাটা শুনেই চমকে উঠলেন তো? আজ্ঞে না, এতে চমকাবার কিছু নেই। আপনারা যাকে পানদোষ বলেন, সে পানের ব্যাপারই নয় এটা। এ পান অতি পবিত্র জিনিস। ঠাকুরপুজোয় লাগে। একটু চিবোলেই ঠোঁট দুটি রাঙা টুকটুকে হয়ে ওঠে। পুরাকালে যখন ওষ্ঠরঞ্জনী আবিষ্কৃত হয়নি, তখন মহিলারা এই পান চিবিয়েই ওষ্ঠ দুটি রাঙা করে তুলতেন। পুরুষের চোখে মোহিনী হয়ে উঠতেন।

আমার বাবা প্রতিদিন একশোটা করে পান খেতেন। বাবার একটা বিরাট কারুকার্য করা রুপোর পানের ডিবে ছিল। বাবা কোর্টে বেরোবার আগে মা নিজের হাতে একশোটি পান সেজে সেটা ভরে রাখতেন। মাকেও দেখেছি দুপুরে খাওয়ার পর একটি পান মুখে দিয়ে ঠোঁট দুটোকে টুকটুকে লাল করে তুলতেন। মলিনাদেবীকে যেদিন প্রথম দেখলাম সেদিন তাঁর মুখমণ্ডলেও একটা মা-মা ভাব, ঠোঁট দুটিতে আমার মায়ের ঠোঁটের প্রতিচ্ছবি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিয়েছিলাম ইনিও আমার বাবা-মায়ের মতোই পানাসক্ত।

মলিনাদিকে আমি প্রথম চাক্ষুষ করি রূপাঞ্জলি পত্রিকার সরস্বতী পুজোর সময়। সেটা ১৯৪৯ সাল। ওই পুজোর উদ্যোক্তা রূপাঞ্জলি পত্রিকা, কিন্তু পূজানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতেন শিল্পীরা। প্রতি বছর একজন বয়স্ক শিল্পীকে প্রেসিডেন্ট করে তাঁর কাঁধে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হত। সেবার দায়িত্ব ছিল ছবি বিশ্বাসের ওপর। ছবিদা সেই কোন সকাল থেকে এসে সব কিছুর তদারক করছিলেন। পুজোটা হত বালিগঞ্জে ট্র্যাংগুলার পার্কের কাছে ব্যারিস্টার আর পি লাহিড়ির কম্পাউন্ডওলা বাড়িতে। দুটো প্যান্ডেল করা হত। একটা প্রতিমাপুজোর জন্যে, আর একটা সন্ধেবেলা বিচিত্রানুষ্ঠানের জন্যে। দিনের বেলা যে সব শিল্পীকে দেখেছি পূজা আর ভোগের কাজে দমভর খাটতে, সন্ধেবেলা তাঁদেরই দেখতে পেতাম রীতিমতো সাজগোজ করে প্যান্ডেল আলো করে বসে থাকতে। মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়িকা আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় (এখন মুখোপাধ্যায়), স্বাগতা চক্রবর্তী, সুমনা ভট্টাচার্য, সুদীপ্তা রায়, ওঁর স্বামী প্রেমতোষ রায় (নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবির নায়ক) ইত্যাদি শিল্পীকে এই পুজোর কাজে বেশি পরিশ্রম করতে দেখা যেত।

সেবারে মলিনাদি পূজা প্যান্ডেলে এসে হাজির হলেন বেলা বারোটা নাগাদ। তাঁর দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে ছবিদা যেখানে ভোগ রান্না হচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন : ওহে ঠাকুর, তোমার খিচুড়িটা আজ দারুণ হচ্ছে কিন্তু। বাসমতী চলের সুবাস ভবানীপুরের বলরাম বোসের ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দেখছো না খাবার কুটুমরা সব আসতে শুরু করে দিয়েছে।

মলিনাদি বুঝলেন কথাটা তাঁকে ঠেস দিয়েই বলা হচ্ছে। তাঁর বাড়ি বলরাম বসু ঘাট রোডে। তাই ছবিদার সামনাসামনি হয়ে কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন : আহা, আমার যেন আর বাড়িতে পুজো নেই! সেটা সেরে তবে তো আসতে পারব।

ছবিদা বলে উঠলেন : এই দেখো! পড়ল কথা সবার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। আমি কি তোমার নাম করে কিছু বলেছি নাকি শ্রীমতী মলিনা দাসী?

মলিনাদি একটা ভ্রূভঙ্গি করে বলে উঠলেন : তা নয়তো কী? বলরাম বোস ঘাট রোডে আমি ছাড়া আর কে থাকে শুনি।

ছবিদা বলে উঠলেন : কেন, ধীরাজ ভট্চাজ থাকেন না? আর একটু এগিয়ে গঙ্গার ধারে প্রেমেন মিত্তির থাকেন না?

মলিনাদি বললেন : তা থাকবেন না কেন। তবে তাঁরা তো কেউ এখানে উপস্থিত নেই। কাজেই কথাটা আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে।

ছবিদা মলিনাদির মুখের সামনে হাতখানা নেড়ে বলে উঠলেন : বলেছি তো বলেছি, বেশ করেছি। আমরা বলে লোক হিসেব করে চাল-ডাল চড়ালাম, আর উনি দুপুরবেলা এলেন তাতে ভাগ বসাতে।

মলিনাদি এবার সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন : আচ্ছা বাবা আচ্ছা, খুব হয়েছে। আর রাগ করতে হবে না। আমার ভাগের অর্ধেক খিচুড়ি আপনাকে দিয়ে দোব। তাহলে হবে তো?

ছবিদা এবার চোখ নাচিয়ে বলে উঠলেন : আমার যে আদ্ধেকে রুচি নেই, পুরোটা না পেলে তৃপ্তি পাই না, সেটা কি মলিনা দাসীর আজও অজানা আছে নাকি?

মলিনাদি একবার চোখ ফিরিয়ে অদূরে উপবিষ্ট আমার দিকে চট্ করে একপলক দেখে নিয়ে কৃত্রিম কোপের সঙ্গে ছবিদাকে বললেন : আঃ, কী হচ্ছে কী! এখানে সব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেপুলেরা বসে আছে না! আপনার মুখের কোন রাখঢাক নেই দেখছি!

ছবিদা এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন : ওহে মাস্টার, এখানে বসে বসে বড়দের রঙ্গ-তামাশা না শুনে একবার উঠে গিয়ে দেখোনা রান্নার কতদূর কী হল। পেটের মধ্যে ছুঁচোর দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে গেছে যে!

মলিনাদি ছবিদাকে কৃত্রিম ধমক দিয়ে বলে উঠলেন : অ্যাই দেখো, এবারে আমাকে ছেড়ে একটা বাচ্চা-ছেলেকে নিয়ে পড়লেন! আচ্ছা মানুষ যা হ'ক!

ছবিদা এবার ইঙ্গিতে আমাকে কাছে ডাকলেন। কাছে যেতেই আলতো করে আমার কানটি টেনে ধরে মলিনাদির দিকে তাকিয়ে বললেন : এটি বাচ্চা ছেলে না বাচ্চার বাবা! আজ সকাল থেকে আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়েছে। দু'মিনিট অন্তর অন্তর 'ছবিদা এটা কী হবে, ওটা কী করব' এই বলে আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। একদণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে দেয়নি গো!

মলিনাদি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন : বেশ করেছে! এখানে খাটতে এসেছেন না গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে এসেছেন!

এই বলে আমার মাথার চুলে একবার বিলি কেটে দিয়ে বললেন : যাও তো খোকা, ঠাকুরের যদি রান্না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পাতা করে দিতে বলো। শুনলে তো, তোমাদের ছবিদার খুব খিদে পেয়েছে। ওঁর আবার যা খিদের বহর সে তো তোমরা জানো না!

মলিনাদির মুখে খোকা ডাক শুনে আমার সমস্ত অন্তর তখন আবেগে আপ্লুত হয়ে গেছে। ওই প্রৌঢ় আর প্রৌঢ়া শিল্পীর নকল রণক্ষেত্র থেকে একটু হেসে দূরে সরে গেলাম।

রূপাঞ্জলি পত্রিকার সেই সরস্বতী পুজোর দিন থেকে আমি মলিনাদির ভয়ানক ন্যাওটা হয়ে গেলাম। এখন যেমন সরযূবালা দেবীর ন্যাওটা। কথা নেই বার্তা নেই, সময় নেই অসময় নেই, ছুটে ছুটে যাই সরযূদির ম্যাডক্স স্কোয়ারের বাড়িতে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পগুজবে সময় কাটাই আর মিষ্টান্ন ধ্বংস করি। একটা সময়ে আমার মলিনাদির সঙ্গে সেইরকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ছুটিছাটার দিনে একটু বেলা করে গিয়ে হাজির হতাম মলিনাদির বলরাম বসু ঘাট রোডের বাড়িতে।

আর যখনই যেতাম, দেখতাম মলিনাদি একটা বিরাট পানের ডাবর সাজিয়ে বসে আছেন। নিজের হাতে পান সাজছেন আর মুখে পুরছেন। পাশে রাখা পিকদানিতে মাঝে মাঝে পিচ পিচ করে পানের পিক ফেলতেন আর নানা কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে একটা করে পান আমার দিকেও এগিয়ে দিতেন।

আমি প্রথম প্রথম পান খেতে আপত্তি করতাম। বলতাম : না না, আমার পান খাবার অভ্যেস নেই।

মলিনাদি হাসতে হাসতে বলতেন : আরে খাও খাও। মাঝে মাঝে একটা পান খেলে দোষ নেই। তোমার অমন পাতলা ফুরফুরে ঠোঁট, পানের রসে রাঙিয়ে দিলে ভারী সুন্দর দেখাবে।

মলিনাদির কথা শুনে লজ্জায় আমার দু'কান রাঙা হয়ে উঠত। আমার সেই লজ্জাবনত মুখের দিকে তাকিয়ে মলিনাদি তাঁর সেই বিখ্যাত ঠোঁট-টেপা হাসি হেসে বলতেন : ওমা, ছেলের লজ্জা দেখো। দিদির সামনে আবার লজ্জা কিসের রে?

এইভাবে অদ্ভুত স্নেহে আর মমতায় মলিনাদি যেমন লজ্জা দিতেন, তেমনি আবার লজ্জা ভেঙেও দিতেন সঙ্গে সঙ্গে। যে কারণে মলিনাদির সঙ্গে মেলামেশায় আমি কোনদিন আড়ষ্টতা বোধ করিনি।

সত্যি, কত সুন্দর ছিল আমাদের সেইসব দিনগুলি! ঠিক যেন মায়ের মতো, বড় দিদির মতো আমরা

অসঙ্কোচে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। তাঁরাও অসঙ্কোচে তাঁদের জীবনের নানা ঘটনা আমাদের শুনিয়েছেন। তাঁদের কারও কারও বাহ্যিক পরিচয়ে হয়তো মালিন্য ছিল, কিন্তু মনের মধ্যে একবিন্দু মলিনতা ছিল না। স্মৃতির সরণিতে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে সেইসব দিনগুলিতে যখন পৌঁছে যাই, তখন সেইসব হারানো দিনগুলির জন্যে সারা মন হাহাকার করে ওঠে।

মলিনাদির জন্ম ইংরিজি ১৯১৬ সালে। ছোটবেলার কথা জিজ্ঞেস করলে মলিনাদি এড়িয়ে যেতেন। বলতেন : সেসব কথা আমি তোমাকে বলব না, বলতে পারব না। শুধু এইটুকু জেনে রেখো যে পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে তোমাদের মলিনাদিকে মাত্র আট বছর বয়েসে থিয়েটারে নামতে হয়েছিল।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : সে কী! ওই অতটুকু বয়েসে থিয়েটার করতে এলেন! তাহলে লেখাপড়া?

মলিনাদি কপালে করাঘাত করে বলেছিলেন : আব লেখাপড়া! বলে পেটে যাদের ভাত জোটে না তাদেব আবার লেখাপড়া! তাছাড়া যারা থিয়েটার করে তাদের জন্যে ইস্কুল কলেজের দরজা খোলা ছিল নাকি সেই সময়ে? বাবুদের মেয়েদেব চরিত্তির খারাপ হয়ে যাবে না!

তাবপব একটু দম নিয়ে বলেছিলেন : তবে আমিও ছাড়বার পাত্তব নই। বাড়িতে বসে বসে লেখাপড়া শুরু করে দিলাম। বাংলাটা তো ভালোই শিখেছিলাম, কিছুটা ইংরেজিও শিখেছি। আর তোমার কাছে বলতে লজ্জা করে, এক সময়ে আমার লেখা মাসিক পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে।

শুনে একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম : কী লেখা মলিনাদি?

মলিনাদি একটু লজ্জারাঙা মুখে বলেছিলেন : গল্প, কবিতা, গান—এইসব আর কি। দু-একটা প্যারডিও ছাপা হয়েছিল। 'আমোদ' বলে একটা পত্রিকা ছিল, সেখানে পূর্ণিমা দাসী ছদ্মনাম দিয়ে লেখাগুলো পাঠাতাম। সঙ্গে সঙ্গে ছাপাও হয়ে যেত। তবে তা থেকে এক পয়সাও পাইনি কোনওদিন। তখনকার দিনে বোধহয় লেখা ছাপা হলে পয়সা দিত না।

আমি বললাম : তা ছদ্মনাম নিতে গেলেন কেন? আপনার নিজেব মলিনাদেবী নামটা তো কত সুন্দর! সেই নামে পাঠালেন না কেন?

মলিনাদি বললেন : তখন কি আর দেবী ছিলাম রে ভাই, তখন দাসীই ছিলাম। আর নিজের নাম ব্যবহার করিনি ভয়ে। যদি আসল নাম দিলে ধরে ফেলে যে আমি অভিনয় করি, তাহলে তো আর লেখা ছাপা হবে না। জানাজানি হয়ে গেলে ভদ্দরবাড়ির কর্তাব্যক্তিরা অন্দরমহলে সে পত্রিকা ঢুকতে দেবে না। যত সৎভাবেই থাকি না কেন, আমরা অভিনেত্রীরা সব বেজাত-কুজাত। ভদ্রসমাজে আমাদের ঠাঁই ছিল না।

কথাটা জানতাম, তবু মলিনাদির মুখে কথাটা শুনে আর ওঁর ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে খুব খারাপ লাগছিল। প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করবার জন্যে বললাম : মাত্র আট বছর বয়েসে থিয়েটার করতে গেলেন, পার্ট মুখস্থ থাকত আপনার?

আমার কথা শুনে মলিনাদি আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন : ওমা! পার্ট মুখস্ত আবার কী! করতাম তো সখির দলে নাচ। মিনার্ভা থিয়েটারে 'মিশরকুমারী', 'আত্মদর্শন' এইসব নাটক হত। নাটকের মাঝখানে মাঝখানে একদল সখি নাচতে নাচতে বেরোত। আমি সেই সখির দলে নাচতাম।

আমি বললাম : তা সে জন্যে তো নাচ শিখতে হয়েছিল আপনাকে। কার কাছে নাচ শিখেছিলেন?

মলিনাদি বাঁ দিকের গালে একটি পান ভরে নিয়ে বললেন : তাঁর নাম-ধাম জানিনে বাপু। ইয়া গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক আমাদের তবলার সঙ্গে নাচ শেখাতেন। সবাই তাঁকে নাচের মাস্টার বলত, আমিও তাই বলতাম। তখন তো প্রায় সারা রাত ধরে থিয়েটার হত। তাই আমাদেরও রাত জেগে বসে থাকতে হত, কখন নাচের সময় আসবে তার জন্যে। কী ঘুম পেত যে কী বলব! এক একদিন তো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। তারপর নাচের সময় খোঁজ খোঁজ। কোথায় কোন ড্রেসের বাক্সের ফাঁকে জড়োসড়ো হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। এইটুকুন শরীর তো! নাচের দলের অন্য মেয়েরা ঠিক খুঁজে খুঁজে বার করত। তারপর চড়-চাপড় মেরে ঘুম ভাঙিয়ে দিত। ঘুম-চোখ মুছতে মুছতে স্টেজের ওপর গিয়ে হাত-পা ঘুরিয়ে নাচতে শুরু করে দিতাম।

বলতে বলতে মলিনাদি হাসতেন, কিন্তু শুনতে শুনতে আমার বুকটা বেদনায় টন টন করে উঠত। মলিনাদির সেই আট বছর বয়সের চেহারাটা কল্পনা করে নিতাম। ওই বয়সে যখন মায়ের বুকের পাশে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোবার কথা, সেই বয়সে কেবলমাত্র জঠরজ্বালা নিবৃত্তির জন্যে একটি নাবালিকাকে ঘুম কামাই করে ছোট ছোট হাত পা ঘুরিয়ে নাট্যপ্রেমী বাবুদের মনোরঞ্জন করতে হচ্ছে। ১৯৫১ সালের আজকের এই মলিনাদির গা-ভরা গয়না, পানের রসে ঠোঁট রাঙানো সুখী পরিতৃপ্ত মুখ দেখে যাঁরা ঈর্ষাপ্রকাশ করেন, তাঁদের অনুরোধ করব সেদিনের সেই ঘুমভাঙা ঢুলু-ঢুলু চোখের নাবালিকাটির কথা স্মরণ করতে।

সেদিন কথার পিঠে কথা তুলে মলিনাদিকে বলেছিলাম : তা সেই সময়ে আপনি না হয় হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচতেন, কিন্তু তারপরে তো দারুণভাবে নাচ শিখেছিলেন। আপনার ছোটবেলাকার সেই নাচ আমি দেখিনি, দেখবার কথাও নয়, কিন্তু আমার ছোটবেলায় 'মহুয়া' ছবিতে আপনার নাচ তো দেখেছি। কী দারুণ নাচ নেচেছিলেন সে ছবিতে!

মলিনাদি বললেন : আরে ততদিনে তো আমার ভালো করে নাচ শেখা হয়ে গেছে। আমার নাচের গুরু ছিলেন ললিত গোঁসাই। ললিতমোহন গোস্বামী। দারুণ নাচ শেখাতেন। তা সে তো অনেকদিনের কথা। ১৯৩৪ সাল টাল হবে বোধহয়। অতদিনের কথা তোমার মনে আছে?

আমি বললাম · মনে থাকবার তো কথা নয়। মন বলে তখন কিছু তৈরি হয়েছে নাকি! মায়ের হাত ধরে আমাদের দেশের টেম্পোরারি সিনেমায় 'টকি' দেখতে যেতাম। আপনার নাচটাই কেবল মনে আছে। আপনার নাম তো শুনিনি তার আগে। বড়রা সবাই বলাবলি করছিল 'মলিনা দারুণ নাচ নেচেছে।' তাই তো আপনার নামটা জানা হয়ে গেল।

মলিনাদি বললেন . হ্যাঁ ভাই, নিউ থিয়েটার্সের ওই ছবিতে আমার নাচের খুব প্রশংসা হয়েছিল। আর হবে নাই বা কেন। ছবির ডিরেক্টার ছিলেন হীরেন বসু। তিনি নাচ জানতেন, গান জানতেন, অ্যাকটিং জানতেন। একেবারে চৌখশ লোক। আমার সঙ্গে ওই ছবিতে দুগ্গাবাবু (দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন, অহীনবাবু (অহীন্দ্র চৌধুরি) ছিলেন। ছবিটা চলেওছিল অনেকদিন। মাস তিন-চারেক তো বটেই।

এইভাবে মাঝে মাঝে গল্প করতে করতে আর পান খেতে মলিনাদির জীবনের নানা ঘটনা একটু একটু করে জানতে পেরেছিলাম। মলিনাদির কল্যাণে তখন আমার পানের নেশা ধরে গেছে। দিনে গোটা দশেক তো চাইই চাই। ওই পান খেতে খেতেই জানতে পেরেছিলাম মলিনাদি একদা পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কথাটা তুলেছিলাম মহাজাতি সদনে 'মিশরকুমারী' নাটকে ওঁর আবন দেখার পর।

বোধহয় ষাটের দশকের মাঝামাঝি কাননদি, সরযূদি, মলিনাদি ইত্যাদি অনেকে মিলে 'মহিলা শিল্পী মহল' প্রতিষ্ঠা করলেন। উদ্দেশ্য দুঃস্থ মহিলা শিল্পীদের শেষ বয়সে আর্থিক সাহায্য করা। সেই কারণে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে 'মিশরকুমারী' নাটক করলেন। পুরুষ চরিত্রগুলিও মহিলারাই করলেন। ওই নাটকে আবন সেজেছিলেন মলিনাদি। মাধবী করেছিলেন নাহরিন। অন্যান্য চরিত্রে কে কী করেছিলেন এখন আর মনে নেই, তবে তাঁরা সবাই নামকরা শিল্পী।

'মিশরকুমারী' নাটকে আবন করে দারুণ নাম করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি। কিন্তু মলিনাদির আবন দেখলাম তাঁর তুলনায় কোন অংশেই খাটো নয়। মন ভরে গিয়েছিল ওঁর অভিনয় দেখে।

সেদিন শো-এর শেষে মহাজাতি সদনের গ্রিনরুমে মলিনাদির সঙ্গে আর দেখা করতে পারিনি। ওই একগুচ্ছ মহিলার বেড়া ডিঙিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। তাই পরদিন ছুটেছিলাম ওঁর বাড়িতে।

মুখোমুখি হতেই মলিনাদিকে বললাম : কাল আপনি অসাধারণ আবন করেছেন। অহীনবাবুর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। প্রচুর হাততালি পেয়েছেন।

মলিনাদি দু'কানে হাত দিয়ে বললেন : ছি ছি, অমন কথা বোলো না ভাই। কোথায় অহীনবাবু আর কোথায় আমি। উনি কতবড় অভিনেতা। আমি তো ওঁর নখের যুগ্যিও নই। ওই 'মিশরকুমারী' নাটকে অহীনবাবুর আবন যে কতবার দেখেছি! আমি ওঁকে পুরোপুরি নকল করেছি। এক সময়ে খুব ইচ্ছে ছিল অহীনবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় করব। ওই নাহরিনের রোলটাই করব। তা সিনেমার কাজের চাপে

তা আর হয়ে উঠল না। পরে যখন শিশিরবাবুর ডাকে শ্রীরঙ্গমে 'বিপ্রদাস' নাটকে বন্দনা করতে এলাম তখন তো ওসব নাটক প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে।

আমি বললাম : এই 'মিশরকুমারী' নাটকে আট বছর বয়েসে আপনি নাচের দলে হাত পা ঘোরাতেন সে কথা মনে আছে মলিনাদি? আর আজ আপনি সেই নাটকেই আবন করলেন।

মলিনাদি চোখ বড় বড় করে বললেন : মনে নেই আবার! কাল তো মহাজাতি সদনের গ্রিনরুমে সেইসব দিনের কথাই ঘুরে-ফিরে মনে আসছিল। কাকে যেন বললামও সেই কথা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তা মহিলা হয়ে পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে আপনার অসুবিধে হচ্ছিল না? কণ্ঠস্বরটাকেও তো দেখলাম বেশ ভারি করে নিয়েছিলেন।

মলিনাদি বললেন : একটু অসুবিধে হচ্ছিল না যে তা নয়। শেষ পর্যন্ত সেটা সামলে নিয়েছি। তবে এটা তো নতুন কিছু নয়। এর আগে ছোটবেলাতেই তো মেল পার্টি করেছি মনমোহন থিয়েটারে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সেটা কীরকম?

মলিনাদি বললেন : সে দুঃখের কথা আর বোলো না ভাই। টাকা-পয়সা নিয়ে আমার গার্জেনদের সঙ্গে মিনার্ভা থিয়েটারেব কর্তাদের কী গণ্ডগোল হয়েছিল কে জানে! ওঁরা আমাকে থিয়েটার থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর একদিন শুনলাম আমাকে মনমোহন থিয়েটারে অভিনয় করতে হবে। কিসের পার্ট? না ছেলের পার্ট। 'জাহাঙ্গীর' নাটকে করলাম বালক দারা আর 'কণ্ঠহার' নাটকে শ্যামল বলে একটা ক্যারেকটার। কাজেই মেল্ রোল করার অভিজ্ঞতা আমার আগেই হয়ে গেছে।

আমি বললাম · এরপরই কি সিনেমায় চান্স পেয়ে গেলেন?

মলিনাদি একটু হেসে বললেন : পাগল হয়েছো! এত সহজে? কত কাঠখড় পুড়িয়ে, কত সাধ্যসাধনা করে তবে সিনেমায় মুখ দেখাতে পেরেছি।

আমি বললাম : তাহলে দিনের পর দিন ওই ছেলে সেজে অভিনয়ই চলতে লাগল?

মলিনাদি বললেন : ছেলে কি আর বেশিদিন সাজা গেল! গায়ে-গতরে পুরুষ্টু হয়ে গেলাম যে! তাই ছেলের রোল থেকে ছাঁটাই হয়ে গেলাম।

আমি বললাম : একেবারে ছাঁটাই! কেন মেয়ের রোলে চান্স পেলেন না?

মলিনাদি বললেন : না ভাই। মনমোহনে তখন একগাদা মেয়ে। নতুন মেয়ে ঢোকার কোন সুযোগই নেই। তাই স্টার থিয়েটারে চলে গেলাম নাচিয়ের রোল করতে। আমি তখন নাচটা ভালো করে শিখে নিয়েছি। স্টারে 'শকুন্তলা' আর 'স্বয়ংবরা' এই দুটো নাটকে আমি নেচেছিলাম।

মলিনাদি সিনেমায় কবে এলেন সেটা জানবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলাম : সিনেমায় কবে এলেন?

মলিনাদি বললেন : ঠিক মনে পড়ছে না, তবে ওই ১৯২৯-৩০ সাল নাগাদ হবে। আর ওই সিনেমার কাজ খুঁজতে গিয়ে বড়ুয়া সাহেব—তোমাদের ওই প্রমথেশ বড়ুয়া গো—তাঁর সঙ্গে এমন একটা কাণ্ড করে ফেলেছিলাম যে কী বলব।

মলিনা দেবীর সঙ্গে প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার প্রথম সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটি রীতিমতো চিত্তাকর্ষক। সে এক মজার ঘটনা। যে ঘটনার লজ্জা এবং সংকোচ মলিনাদি দীর্ঘকাল কাটাতে পারেননি। আর প্রমথেশচন্দ্র? তিনিও পেরেছিলেন কি?

ঘটনাটি সেই ১৯২৯ সালের। প্রমথেশ বড়ুয়া তখনও চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হননি। সংযোগের কোনও সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি। প্রমথেশ বড়ুয়া নাটক সম্পর্কে প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন ছাত্রাবস্থা থেকে। বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের তৎকালীন নাটকগুলির তিনি ছিলেন নিয়মিত দর্শক। নিজেও অভিনয় করতেন। তবে কোনও পেশাদার মঞ্চে নয়। নিজের দেশ, আসামের গৌরীপুরে। নিজেরই পরিচালনায়। রাজবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে স্টেজ বেঁধে। বড়ুয়াসাহেব সম্পর্কে রচনায় এসব কথা সবিস্তারে লিখেছি।

প্রমথেশ বড়ুয়াকে চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি ডি জি নামে বিখ্যাত ছিলেন। ডি জি ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের পথিকৃৎদের অগ্রগণ্য। তাঁরই চেষ্টায় এবং উৎসাহে স্কুল শিক্ষক দেবকীকুমার বসু, রোটারিয়ান নীতীশচন্দ্র লাহিড়ি, সাহিত্যিক দিনেশরঞ্জন দাশ

প্রমুখ ইন্টেলেকচুয়ালরা একত্র হয়ে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্ম কোম্পানি নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। এই কোম্পানির 'পঞ্চশর' নামে একটি ছবির শুটিং দেখতে দমদমের এক বাগানবাড়িতে প্রমথেশ বড়ুয়াকে আমন্ত্রণ জানান ডি জি।

এই আমন্ত্রণের পিছনে ডি জি'র অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল। প্রমথেশ বড়ুয়ার মতো একজন ধনকুবের রাজকুমারকে সঙ্গে পেলে তাঁদের ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্ম কোম্পানির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কিন্তু তাঁর সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বড়ুয়াসাহেব ওঁদের সঙ্গে হাত মেলাননি। তবে তাঁর মনে চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহের বীজ উপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যে কারণে তিনি পরবর্তীকালে দেবকী বসুকে সঙ্গে নিয়ে বড়ুয়া পিকচার্সের পত্তন করেছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্র পেয়েছিল তাঁর সর্বকালীন এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারকে।

এ তো গেল ইতিহাস। কিন্তু এর সঙ্গে মলিনা দেবীর সম্পর্ক কোথায়? সেই কথাতেই আসছি।

মলিনাদি তখন স্টার থিয়েটারে নাচেন আর ছোটখাটো রোল-টোল করেন। সেই সঙ্গে ছবিতে কাজের সন্ধানে স্টুডিওপাড়ায় ঘুরে বেড়ান। ওইরকম কাজের সন্ধানেই সেদিন দমদমের বাগানবাড়িতে এসেছিলেন ডি জি'র সঙ্গে দেখা করতে। যদি 'পঞ্চশর' ছবিতে ছোটখাটো কোনও কাজ-টাজ পাওয়া যায়।

তা কোনও কাজ পেলেন না ওখানে। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসবার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটল। ওই বাগানবাড়ির রাস্তাগুলি ছিল মসৃণ পাথরে বাঁধানো। ফেরবার সময় শাড়িতে পা জড়িয়ে দুম্ করে মলিনাদি পড়ে গেলেন ওই পাথরে বাঁধানো রাস্তার ওপর।

বড়ুয়াসাহেব তখন শুটিং দেখছিলেন আর একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি মহিলাকে ওভাবে পড়ে যেতে দেখে দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরে টেনে তুললেন। জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কোথাও লাগে-টাগেনি তো?

একজন পুরুষমানুষ এভাবে এসে হাত ধরে টেনে তোলাতে মলিনাদি কেমন হকচকিয়ে গেলেন। একে তো এতগুলি লোকের চোখের সামনে পতনজনিত একটা লজ্জা ছিলই, ভেবেছিলেন কোনরকমে নিজেকে সামলে-সুমলে উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়বেন, তা তো হলই না, উপরন্তু একজন অচেনা মানুষ সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে তাঁকে আরও অপ্রস্তুত করে দিলেন।

ভদ্রলোকের কথা শুনে তাই রীতিমতো রেগে গেলেন মলিনাদি। রোষকষায়িত চোখে তাকিয়ে রইলেন ওই অজানা অচেনা ভদ্রলোকের দিকে।

মলিনাদিকে ওইভাবে বড়ুয়া সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন ডি জি। রীতিমতো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন : ও কি মলিনা, তুমি কার দিকে অমন করে চোখ পাকিয়ে দেখছো। জানো উনি কে? প্রিন্স অব গৌরীপুর। গৌরীপুরের রাজকুমার। যাও, শিগগির গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও।

সেদিনকার সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে মলিনাদি হেসে কুটিবাটি হচ্ছিলেন। বললেন : রাজকুমার শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। জীবনে কখনও রাজকুমার দেখিনি চর্মচক্ষে। কেবল বইয়েই পড়েছি। তা তাদের তো মাথায় মুকুট থাকে, সঙ্গে পক্ষীরাজ ঘোড়া থাকে। আর ইনি তো প্যান্টশার্ট পরা একটি লোক। আমি তো ভেবেছিলাম সিনেমা লাইনে যেসব লোকেরা মেয়েদের পেছনে ঘুর ঘুর করে, তাদেরই একজন কেউ। না হলে হঠাৎ দুম্ করে কথা নেই বার্তা নেই মেয়েমানুষের হাত ধরতে আসবে কেন। কিন্তু গাঙ্গুলিমশায়ের কথা শুনে বুঝতে পারলাম খুবই অন্যায় করেছি। ছি ছি, ভদ্রলোক আমার সম্বন্ধে কী ভাবলেন কে জানে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তারপর গিয়ে ক্ষমা চাইলেন তো?

মলিনাদি বললেন : ও মা! কার কাছে ক্ষমা চাইব! আমি তো ক্ষমা চাইবার জন্যেই গিয়েছিলাম। দু'পা এগিয়ে গিয়ে কোনরকমে তো বললাম : 'দেখুন, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি ভেবেছি কে না কে—'। তা আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন কোথায়! আমার কথা আধখানা শুনেই তিনি দেখলাম লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছেন। তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে গিয়ে একখানা বড় গাড়িতে চেপে

পগার পার। আমার আর ভালো করে ক্ষমা চাওয়াই হল না।

আমি বললাম। পরবর্তীকালে তো আপনারা দু'জনেই একসঙ্গে নিউ থিয়েটার্সে কাজ করেছেন। তখন ক্ষমা চেয়ে নিতে পারেননি?

মলিনাদি বললেন : সে চেষ্টা কি আর করিনি। কিন্তু যতবার ওঁর কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছি ততবারই উনি লজ্জায় জড়সড় হয়ে আমার কাছ থেকে সরে পড়েছেন। অথচ আমার ভয়ানক ইচ্ছে হত ওঁর সঙ্গে কাজ করি। ওঁর ছবির নায়িকা না হোক সহ-নায়িকা অন্তত হই। তোমাদের জলুদাকে বলেওছিলাম সে কথাটা।

জলুদা অর্থাৎ জলু বড়াল। মলিনাদির স্বামী। বিখ্যাত সুরকার রাইচাঁদ বড়ালের ভ্রাতা। নিউ থিয়েটার্সের একজন জাঁদরেল কর্মকর্তা। মলিনাদি যখন নিউ থিয়েটার্সে কাজ করতে এলেন তখনই ওঁদের পরিচয়। কালক্রমে প্রণয় এবং পরিণয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : জলুদা কী বললেন আপনার কথা শুনে?

মলিনাদি বললেন : আমার কথা শুনে জলুবাবু বললেন, না না, বড়ুয়াকে আমি ওসব বলতে-টলতে পারব না। ওঁর ছবির কাস্টিং উনি নিজেই করেন। মিস্টার সরকার (নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বি এন সরকার) ওঁকে সে স্বাধীনতা দিয়েছেন। উনি নিজেও কোন রিকোয়েস্ট করেন না।

আমি বললাম : তাহলে আপনার আর প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবিতে অভিনয় করা হয়ে উঠল না?

মলিনাদি চোখ কপালে তুলে বলে উঠলেন : শোনো কথা! কে বললে হয়নি। আমি ওঁর সঙ্গে 'গৃহদাহ' আর 'রজত জয়ন্তী' দু'খানা ছবিতে কাজ করেছি। তবে কোনওটারই নায়িকা নয়। 'গৃহদাহ'-তে নায়িকা ছিল যমুনা আর 'রজত জয়ন্তী'-তে নায়িকা ছিল মেনকা। আর আমি নায়িকা না হলেও দুটো ছবিতেই বড় রোল্ পেয়েছিলাম।

আমি বললাম : তাহলে ক্ষমা না চেয়ে আপনি বড়ুয়া সাহেবের কাছে কাজ পেয়ে গেলেন তো?

মলিনাদি বললেন : তা পেলাম। আমার তো মনে হয় আমার রাতদিন ঘ্যানঘ্যানানিতে বিরক্ত হয়ে তোমাদের জলুদা বোধহয় কথাটা বলেছিলেন বড়ুয়া সাহেবকে। আর আমিও সুযোগ পেয়ে গেলাম দমদমের ব্যাপারটার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেবার।

আমি বললাম : ক্ষমা চেয়েছিলেন তাহলে?

মলিনাদি বললেন : চাইব না! আর চাইবার পর আমার বুক থেকে যেন একটা পাথরের বোঝা নেমে গেল। তা আমার ক্ষমা চাওয়ার বহর দেখে বড়ুয়াসাহেবের সে কী হাসি যে কী বলব তোমাকে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম : কেন, এতে হাসবার কী আছে?

মলিনাদি বললেন : আমার কথা শুনে বড়ুয়া সাহেব কী বললেন জানো? বললেন : দ্যাখো মলিনা, সেদিনের কথা তুলে আমাকে আর লজ্জা দিও না। প্রথম অপরাধটা তো আমিই করেছিলাম তোমার হাত ধরতে গিয়ে।

বড়ুয়া সাহেবের কথা শুনে আমি বলেছিলাম : সে কী কথা! আপনি আবার অপরাধ করলেন কোথায়? আপনি তো আমার উপকারই করতে চেয়েছিলেন!

বড়ুয়া সাহেব হাসতে হাসতেই বললেন : আর উপকার! সেদিন সেই ঘটনার পর থেকে আমি আর উপযাচক হয়ে কোন মহিলার উপকার করতে যাইনি। যা চোখ রাঙা করে উঠেছিলে সেদিন!

বলতে বলতে হা হা করে সে কী হাসি বড়ুয়াসাহেবের। মানুষটা বড় ভালো ছিল গো। প্রাণ খুলে হাসতে পারতেন। ওঁর মারা যাবার খবর পেয়ে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম ভাই।

মলিনাদির সঙ্গে প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রথম পরিচয়ের কথা বলতে গিয়ে কথায় কথায় অনেকগুলি বছর এগিয়ে এসেছি। আবার ফিরে যাই চলুন মলিনাদির সেই স্ট্রাগলের দিনগুলিতে।

মলিনাদির প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় নির্বাক ছবিতে। ১৯৩০ সালে রাধা ফিল্মসের নির্বাক 'শ্রীকান্ত' ছবিতে একটি ছোট্ট ভূমিকায় তাঁর প্রথম চিত্রাবতরণ। পরের বছর ১৯৩১ সালে প্রথমে ম্যাডান থিয়েটার্সের 'দেবী চৌধুরানী' ছবিতে এবং তার পরে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফটের 'চাষার মেয়ে'

ছবিতে। দুটি ছবিতেই ওঁর ভূমিকা অনুল্লেখ্য, তবে ওই 'চাষার মেয়ে' ছবি থেকেই ওঁর ভাগ্য ফিরে গেল।

নিউ থিয়েটার্সের যিনি প্রতিষ্ঠাতা সেই বীরেন্দ্রনাথ সরকার বিলেত থেকে ফিরে আসার পর যখন ফিল্ম ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করবেন বলে ঠিক করলেন, তখন এই ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট প্রতিষ্ঠা করেন। পরে যে সমস্ত প্রতিভাকে নিউ থিয়েটার্সের মাধ্যমে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল, সেই সাহিত্যিক পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, পরিচালক প্রফুল্ল রায়, ক্যামেরাম্যান নীতিন বসু, অভিনেতা অমর মল্লিক—সবাই একত্র হলেন এই প্রতিষ্ঠানে। মলিনা দেবীর অভিনয় এবং ব্যবহার ওঁদের এত ভালো লেগে গেল যে নিউ থিয়েটার্স নাম দিয়ে যখন ওঁরা সবাক ছবির প্রযোজনা আরম্ভ করলেন তখন মলিনাদিকে ওঁরা মাসমাইনের পার্মানেন্ট আর্টিস্ট করে নিলেন।

এই নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেবার পর থেকেই মলিনাদির অভিনয় জীবনের ধারাটাই সম্পূর্ণ বদলে গেল। অমর মল্লিকের কাছে অভিনয় শিখলেন, রাইচাঁদ বড়ালের কাছে গান শিখলেন, আসগর হোসেন সাহেবের কাছে হিন্দি আর উর্দু শিখলেন। নাচ তো আগেই শেখা ছিল ললিতমোহন গোস্বামীর কাছে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' ছবিতে উনি নির্মলার চরিত্রে রূপ দিলেন। প্রচুর প্রশংসাও পেলেন। শুরু হয়ে গেল মলিনাদির অভিনয় জীবনের বিজয় বৈজয়ন্তী। আর এই নিউ থিয়েটার্সে এসেই যে জলুদার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল, সে কথা তো আগেই বলেছি।

কথায় কথায় একদিন মলিনাদিকে বলেছিলাম . আচ্ছা মলিনাদি, আপনি তো থিয়েটার থেকে সিনেমায় এসেছিলেন। তা সিনেমায় নায়িকা হবার পর বেশ কিছুকাল তো থিয়েটারকে ভুলেই গেলেন একেবারে। এটা কি ঠিক করেছেন?

মলিনাদি একটু ম্লান হেসে বললেন : তোমার কি ধারণা সত্যিই আমি স্টেজ থেকে এসেছি? স্টেজে যা করতাম সে গল্পো তো তোমার কাছে করেছি। করতাম তো নাচিয়ের কাজ। আর রোল্ যা দু-একটা পেয়েছিলাম সেগুলোকে কি রোল্ বলে! তবে হ্যাঁ, সিনেমায় নাম করার পর থিয়েটার থেকে প্রচুর অফার এসেছিল। ভালো ভালো রোল, মোটা মোটা টাকার অফার। তোমাদের জলুদাই আমাকে করতে দেননি। বলতেন, অত খাটলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। কী দরকার তোমার অত টাকার?

তা সত্যি। একটা সময়ে সিনেমায় মলিনাদির এত কাজের চাপ বেড়ে গিয়েছিল যে দু'শিফ্‌ট তিন শিফ্‌ট করে শুটিং করে সামাল দিতে হত। ওই সময়ে আমি একবার একটা মজার ব্যাপার দেখেছিলাম।

এটা সেই ১৯৫০ সালের কথা। 'বৈকুণ্ঠের উইল' বলে একটা ছবির নাইট শুটিং হচ্ছে। মলিনা দেবী মা আর জহর গাঙ্গুলি তাঁর ছেলে। তার আগে সারাদিন ওঁরা অন্য স্টুডিওতে অন্য একটা ছবিতে স্বামী-স্ত্রীর রোল করে এসেছেন। মেক-আপ নিয়ে সেটে এসে জহর গাঙ্গুলির দিকে তাকিয়ে মলিনাদি তাঁর সেই বিখ্যাত ঠোঁট-টেপা হাসি হেসে বললেন : ও সুলালবাবু, সারাদিন স্বামী-স্ত্রী সেজে 'ওগো' 'হ্যাঁগো' করার পর আজ আর আপনাকে দেখে মায়ের ফিলিংটা আনতে পারছি না যে! কী করা যায় বলুন দিকি?

জহর গাঙ্গুলি ওরফে সুলালদা ছিলেন এক নম্বরের ফাজিল আর ফোক্কড়। মলিনাদির সামনে এসে বললেন : আমাকে দেখে মায়ের ফিলিং আসছে না? তাহলে একটা কাজ করো। আমাকে কোলে শুইয়ে একটু দুদু খাইয়ে দাও। তাহলেই দেখবে মায়ের ফিলিং এসে যাবে।

সুলালদার কথা শুনে সেই সময় হাসির হট্টগোল পড়ে গেল।

মলিনাদি সারা জীবনে কত ছবিতে অভিনয় করেছেন তার কোন সঠিক হিসেব আমার কাছে নেই। তবে শ'চারেক তো বটেই, বেশি হওয়াও আশ্চর্যের নয়। আর কত বিচিত্র ধরনের রোল যে করেছেন তারও ইয়ত্তা নেই। কখনও বিদ্যুৎবর্ণা নায়িকা, কখনও বা নায়িকার মা, কখনও বা ঠাকুমা। কখনও স্নেহময়ী বৌদি আবার কখনও বা জেদি জমিদারনি। কখনও তাঁর অভিনয় দেখে চোখের জলে বুক ভেসে গেছে, আবার কখনও বা হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে। আর সে সব বাঘা বাঘা ডিরেক্টারের বাঘা বাঘা ছবি।

কলকাতায় নির্মিত অনেকগুলি হিন্দি ছবিতেও তাঁকে অভিনয় করতে দেখা গেছে। দুটি ছবির কথা তো আমার স্পষ্ট মনে আছে। একটি নিউ থিয়েটার্সের 'অভিজ্ঞান'-এর হিন্দি ভার্সান 'অভাগীন', অন্যটি

'রামের সুমতি'-র হিন্দি 'ছোটা ভাই'। এই শেষোক্ত ছবিতে রামের বৌদি নারায়ণীর চরিত্রে অনবদ্য চিত্রায়ণের জন্য বিদেশ থেকে প্রশংসাপত্র পেয়েছেন।

বাংলা ছবির সবগুলির নাম করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবে 'বড়দিদি' ছবিতে অভিনয় করে উনি ১৯৩৯ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন।

কমেডি অ্যাকটিং-এও মলিনাদির দারুণ দক্ষতা ছিল। দুটি ছবির নাম আমি উল্লেখ করছি। তার মধ্যে একটি তো অনেকেই দেখেছেন। 'সাড়ে চুয়াত্তর'। এই সেদিনও দূরদর্শনে ছবিটি দেখতে দেখতে দর্শকরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছেন। আর একটি 'ফুলু ঠাকুরমা'। এটি আমার একটি প্রিয় ছবি। সেটা শুধুমাত্র মলিনাদির অভিনয়ের কারণেই। যদি তখনও সুযোগ পান তাহলে এই ছবিটা আপনাদের দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। সত্য ব্যানার্জি এবং অনুপকুমারের মতো সুদক্ষ কমেডি অ্যাকটরদের মলিনাদি ম্লান করে দিয়েছেন ওই ছবিতে।

এর পর আছে ভক্তিমূলক ছবি। কিন্তু সে কথায় আসার আগে মলিনাদির জীবনের থিয়েটার-পর্বের কথাটা শেষ করে নিই।

ষাটের দশকের শেষদিকে মলিনাদিকে একবার আমার দেশ তমলুকে নিয়ে গিয়েছিলাম থিয়েটার করতে। ওঁদের এম জি এন্টারপ্রাইসের 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ' নাটকের তখন দারুণ চাহিদা। রামকৃষ্ণের ভূমিকায় গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এবং রানি রাসমণির ভূমিকায় মলিনা দেবী বাজার মাত করে রেখেছেন। গুরুদাসবাবুকে আমি আদর করে গুরুঠাকুর বলে ডাকতাম। গুরুদাস থেকে গুরু শব্দটা নিয়েছিলাম আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ থেকে ঠাকুর। গুরুদাসবাবু আমার ওই নামকরণটি সানন্দে উপভোগ করতেন।

তা ওই তমলুকের ব্যাপারে মলিনাদি আমাকে খুব ফেভার করেছিলেন। তমলুকের আরও দুটি পার্টি অনেক বেশি টাকার অফার দিয়েছিলেন। কিন্তু মলিনাদি তাঁদের বঞ্চিত করে আমার ক্ষেত্রে খুব কম টাকাতেই রাজি হয়েছিলেন। আমি তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে মলিনাদি বলেছিলেন : শোনো ছেলের কথা! দিদি বলে ডাকিস না? তা দিদির একটা কর্তব্য করতে হবে তো। তার জন্যে আবার এত ঘটা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দরকার কী রে?

কথাটা শুনে আমার মাথাটা লজ্জায় হেঁট হয়ে গিয়েছিল।

সেবার মলিনাদি আর গুরুদাসবাবুকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলাম অভিনেতা শমিত ভঞ্জের বাড়িতে। শমিত তখনও অভিনেতা হয়নি। পরবর্তীকালে হয়েছিল এবং তার পেছনে আমার ছোট্ট একটা ভূমিকাও ছিল। সে কাহিনী পরে এক সময়ে শোনাব। শমিতের মা শীলা ভঞ্জ আমার দূর সম্পর্কের মাসিমা হন। সম্পর্কে দূরত্ব থাকলেও আমাদের মানসিকতায় দূরত্ব ছিল না। দেশে গেলে আমার যা কিছু আবদার টাবদার সব ওই মাসিমা আর মেসোমশাই প্রীতিময় ভঞ্জের কাছে। সে সব আবদার কত মারাত্মক ধরনের হতে পারে তা মলিনাদিদের ওই বাড়িতে তোলার ক্ষেত্রেই বুঝতে পেরেছিলাম। শমিতের বোন কৃষ্ণার তখন পরীক্ষা চলছে। কিন্তু আমার সম্মান রক্ষার্থে মাসিমা আর মেসোমশাই কৃষ্ণাকে পাশের বাড়িতে পড়াশোনা করতে পাঠিয়ে মলিনাদিদের ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তমলুকে কোন ভালো হোটেল ছিল না তো, তাই মাসিমাদের ওপর বাধ্য হয়ে আবদার ফলাতে হয়েছিল।

সেবারে তমলুকে দু'দিন 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ' অভিনয় হয়েছিল। প্রথমদিন অভিনয়ের পর গভীর রাত পর্যন্ত মাসিমাদের ছাদে বসে মলিনাদির সঙ্গে আড্ডা দিয়েছিলাম। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম: মলিনাদি, আপনার কথা শুনে মনে হত থিয়েটার জগতের ওপর আপনার একটা অভিমান আছে। তাহলে আবার দীর্ঘ পনেরো বছর বাদে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থিয়েটার করতে এলেন কেন?

মলিনাদি বললেন : আসব না! বড়বাবু ডেকে পাঠালেন যে। তাঁর হুকুম অমান্য করি কী করে।

বড়বাবু মানে শিশিরকুমার ভাদুড়ি। সর্ব অর্থেই তিনি বড়। তাই তাঁকে সবাই বড়বাবু বলে ডাকতেন। সেই শিশিরকুমারের আমন্ত্রণে মলিনাদি দীর্ঘ পনেরো বছর পরে যোগ দিলেন শ্রীরঙ্গমে মঞ্চে (এখন বিশ্বরূপা)। শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' নাটকে বন্দনার চরিত্রে অভিনয় করলেন।

তারপর আরও অনেক নাটকে অভিনয় করেন ওখানে। তার মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাই তো' নাটকের কথা আমার মনে আছে। এরপরে শিশিরবাবুর থিয়েটার যখন অনিয়মিত হয়ে গেল তখন রাম

চৌধুরি মশাই মলিনাদেবীকে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় কালিকা থিয়েটার খুললেন। ওখানকার প্রথম নাটক 'ছাব্বিশে জানুয়ারি'। ধীরাজ ভট্টাচার্য ছিলেন, ফণী রায় ছিলেন ওই নাটকে। তাবপরে তো 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ' নাটকখানা এমন জমে গেল যে তার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মলিনাদি আর গুরুদাসবাবু দু'জন মিলে এম জি এন্টারপ্রাইস নাম দিয়ে একটা দল খুলে ফেললেন। 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ' নাটক করতে লাগলেন সারা বাংলাদেশ, এমন কি বাংলার বাইরেও ঘুরে ঘুরে। এম জি শব্দের অর্থ মলিনা আর গুরুদাস এই দুটি নামের আদ্যক্ষর।

ভক্তিরসাশ্রিত ছবি মলিনাদি খুব বেশি একটা করেননি। যা দু-একটা করেছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত 'রানি রাসমণি'। ওই ছবির পর থেকেই গুরুদাসবাবু রামকৃষ্ণের রূপকার হিসেবে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। যার শেষ পরিণতি ওই এম জি এন্টাবপ্রাইস।

মলিনাদি তাঁর জীবনে পুরস্কার টুরস্কার খুব বেশি একটা পাননি। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার বলতে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি প্রদত্ত সম্মান, আর গিরিশ সংসদ প্রদত্ত 'নাট্যাধিরাজ্ঞী' উপাধি। তবে দর্শকের অন্তরের সম্মান পেয়েছেন অজস্র ধারায, যার কাছে এইসব নামের শোভাবর্ধনকারী সম্মানগুলি অতি তুচ্ছ।

সত্তরের দশকে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদানের পর কাজের চাপে আমার সঙ্গে মলিনাদির দেখা-সাক্ষাৎ খুবই কমে যায়। ক্বচিৎ কখনও টেলিফোনে কথা হত বিশেষ প্রয়োজন পড়লে। তারপর ১৯৭৭ সালেব ১৩ আগস্ট মলিনাদি তো একেবারে ধরাছোঁয়াব বাইরেই চলে গেলেন।

আমার মতো এক অর্বাচীনকে বড় দিদির মতো স্নেহ দিযে মমতা দিয়ে মলিনাদি যেভাবে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তাব জন্য আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। এখন তো আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাধা নেই। এখন তো আব সে কথা বললে কেউ কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গিতে বলে উঠবেন না : দেখেছো ছেলের কাণ্ড—।

সন্তোষদা

ষাটের দশকের শেষের দিকে একটা ছবিতে উত্তমকুমারের দারুণ একটা এক্সপ্রেশন দেখলাম। ছবির নায়ক এক ভয়ানক নাটকীয় মুহূর্তে তাঁর আগামী পদক্ষেপ সম্পর্কে চিন্তা করছেন। তাঁকে এক দুর্ধর্ষ খল চরিত্রের ব্যক্তিব সঙ্গে বুদ্ধিব পাঞ্জা কষতে হবে। এক বাতে আলো-আঁধাবি পরিবেশে বসে বসে সেই বুদ্ধির খেলার ছক কষছেন। উত্তমবাবুর মুখের ওপর লাইট অ্যান্ড শেডের একটা দারুণ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে দিয়েছেন ছবির ক্যামেরাম্যান। উত্তমকুমারের মুখে তখন এক দুর্ধর্ষ এক্সপ্রেশন। ডান চোখের ওপবকার ভুরুটা প্রায় কপালেব ওপব উঠে গেছে, আর বাঁ চোখেব ভুরুটা নেমে এসেছে নাকের মাঝামাঝি।

ওই মুহূর্তে উত্তমবাবুব মুখে কোন ডায়লগ ছিল না। শুধুমাত্র ওই অভিব্যক্তিটুকু দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল তিনি একটা ভয়ঙ্কর বুদ্ধির প্যাঁচ কষতে চলেছেন খলনায়কের বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে সারা মুখে এমন একটা দৃঢ়তা যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি যেটা ভাবছেন তা ঘটিয়ে ছাড়বেন।

এটা কোন ছবির দৃশ্য সে নামটা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে নায়ক উত্তমকুমারের বিপরীতে সে ছবিতে খলনাযক ছিলেন বাংলা ছবির বিখ্যাত ভিলেন বিকাশ রায়। এবং শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির যুদ্ধে তাঁব পরাজয় ঘটেছিল উত্তমকুমারের কাছে।

উত্তমকুমাব অভিনীত ওই ছবিটির নাম ভুলে গেছি বটে, কিন্তু উত্তমবাবুর ওই দুর্দান্ত এক্সপ্রেশানের কথা আজও ভুলতে পারিনি। কোন বাঙালি অভিনেতা যে ওই জাতীয় এক্সপ্রেশান দিতে পারেন অথবা অতক্ষণ সেই এক্সপ্রেশান হোল্ড করে রাখতে পাবেন সে অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনও হয়নি। ইংরেজি ছবিতে ওই জাতীয় অভিব্যক্তি দেখেছি বটে, কিন্তু বাংলা ছবিতে নৈব নৈব চ।

জানতাম উত্তমবাবু প্রত্যহ ফেসিয়াল এক্সারসাইজ করেন। প্রতিদিন তার জন্যে ঘণ্টাখানেক করে সময় দেন। কিন্তু তার ফলাফল যে এত পারফেক্ট হতে পারে সেটা কোনওদিন কল্পনা করিনি।

ওই ছবি দেখার কয়েকদিন পরে উত্তমবাবুর সঙ্গে দেখা ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। ওই স্টুডিওটির অস্তিত্ব এখন অবশ্য নেই। টালিগঞ্জের শেষ প্রান্তে কুঁদঘাটের কাছাকাছি অবস্থিত সেই স্টুডিওর জায়গায় এখন অন্য কিছু হয়েছে কি না তাও জানি না। অনেকদিন ওদিকে যাওয়া হয় না।

উত্তমবাবুর সঙ্গে যখন দেখা হল তখন লাঞ্চব্রেক চলছে। কথা বলতে বলতে ওঁর মেক-আপ রুমে গিয়ে বসলাম। আর তখনই ওঁর ওই দারুণ এক্সপ্রেশান সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম।

আমার প্রশ্ন শুনে উত্তমবাবু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। বললেন : এক্সপ্রেশানটা আপনার ভালো লেগেছে?

বললাম : নিশ্চয়। তা না হলে আর জিগ্যেস করছি কেন? ওই জাতীয় এক্সপ্রেশান তো আপনার কাছ থেকে আর কখনও পাইনি। শুধু আপনার কাছে কেন, বাংলা ছবিতে আর কারও কাছ থেকে কোনদিন পাইনি। এটা কি আপনি কোন ইংরিজি ছবির অভিনেতার কাছ থেকে ধার নিয়েছেন?

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন : আজ্ঞে না স্যার, আমার এক্সপ্রেশানের শিক্ষাগুরু একজন সাদামাটা নিরহঙ্কারী বাঙালি অভিনেতা, আপনারা যাঁকে এক্সট্রার পর্যায়ে ফেলে রেখে দিয়েছেন।

আমি বললাম : কে বলুন তো?

উত্তমবাবু বললেন : সন্তোষদা। সন্তোষ সিংহ। সিনেমা-থিয়েটারে বাবা-কাকা চাকর-বাকর ইত্যাদি ছোট ছোট রোল করেন। কিন্তু কী অসম্ভব গুণী লোক। হাজার রকমের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশান জানেন। ভয়েস মডিলিউশনের ক্ষমতা অসাধারণ। আমাদের দেশ বলে ওঁর এই হাঁড়ির হাল। অন্য কোনও দেশ হলে ওঁকে মাথায় করে রাখত। একটা ইনস্টিটিউশনের কর্তা করে দিত।

আমি বললাম : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো সন্তোষ সিংহকে চিনি। সিনেমা-থিয়েটারে ওঁর অনেক অভিনয়

দেখেছি। উনি তো আমাদের পাড়ার লোক মশাই। প্রায় প্রতিদিন বিকেলে ওঁকে রূপবাণী সিনেমার পাশে বেলওয়ে বুকিং অফিসের বকে বসে পাড়াব বৃদ্ধদের সঙ্গে গল্পগুজব কবতে দেখি। শুনেছি উনি ওই পিছনেব ব্যারাকবাড়ির কোন একটা ফ্ল্যাটে থাকেন।

উত্তমবাবু বললেন · ওই তো, ওই রোগেই তো ঘোড়া মরেছে! কথায় আছে না, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায না। সন্তোষদার হয়েছে তাই। আপনাব পাড়াব লোক, প্রতিদিন তাঁকে রকে বসে থাকতে দেখেন, সুতরাং আপনার কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু যদি শুনতেন বম্বেতে একজন এরকম গুণী লোক আছেন তাহলে গাঁটের পয়সা খবচ করে রেলের টিকিট কেটে ইন্টারভিউ নিতে ছুটতেন। আপনাদের বলিহারি যাই মশাই।

উত্তমবাবুর কথায় লজ্জা পেয়ে গেলাম। বললাম : আপনার কথা সত্যি। এইরকম একজন গুণী মানুষের সাহচর্যে আসা অবশ্যই উচিত ছিল। কিন্তু কী কবব বলুন, ওঁর সঙ্গে আমার কোনরকম পবিচযই যে নেই।

উত্তমবাবু বললেন · পরিচয নেই তো কী হযেছে? পরিচয কববেন। আমার সঙ্গেই কি আগে পরিচয় ছিল? পবিচয় হল স্টারে 'শ্যামলী' নাটক করতে গিয়ে। আর ওই যে আমার এক্সপ্রেশানেব এত প্রশংসা করছিলেন তার সবটুকুই আমার ওই সন্তোষদার কাছ থেকে পাওয়া। তিনি আমাকে দিনের পর দিন অসীম ধৈর্যেব সঙ্গে শিখিয়েছেন ওইসব ফেসিযাল এক্সপ্রেশান। আমি তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করি, শ্রদ্ধা কবি, সম্মান করি। আমাদের এই লাইনে এখন ওঁর মতো শিক্ষক আর কেউ আছে বলে মনে করি না। শুনেছি নরেশদা (নরেশ মিত্র) নাকি একজন ভালো ট্রেনার ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে থিয়েটারে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

উত্তমবাবুর ওই কথা শোনার পর থেকে সুযোগ খুঁজছিলাম সন্তোষ সিংহের সঙ্গে আলাপ করবার। কিন্তু কোন সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এমনিতে হয়তো তাঁর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করা যেত, কিন্তু কোন অ্যাসাইনমেন্ট না নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কবতে মন সায় দিচ্ছিল না।

হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল। ১৯৬৯ সাল নাগাদ আমার পরম প্রিয় অভিনেতা জহর গাঙ্গুলি পরলোক গমন করলেন। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমাকে হুকুম দিলেন জহর গাঙ্গুলির ওপব একটি বড় লেখা লিখতে। সুলালদা অর্থাৎ অর্থাৎ জহর গাঙ্গুলির সঙ্গে আমার ইনটিমেসির কথা উনি জানতেন। উনি বললেন, লেখাটা যদি বড় হয় তাতেও ক্ষতি নেই। প্রয়োজন হলে ধারাবাহিক ভাবে বেরোবে।

সুলালদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর প্রাণের বন্ধু কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের সত্যেন ঘোষালের কাছে খবর পেলাম জহব গাঙ্গুলির অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন সন্তোষ সিংহ। ওঁরা দুজনেই বাংলা থিয়েটারের দিকপাল অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের াছে নাট্যশিক্ষা করেছেন নাট্যজীবনের শুরুতে। ওঁর কাছে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যাবে সুলালদা সম্পর্কে।

ব্যস, সুযোগ এসে গেল সন্তোষ সিংহের সঙ্গে আলাপ করবার। একদিন সকালে ওঁর রূপবাণীর ফ্ল্যাটের দরজায গিয়ে কড়া নাড়লাম।

ওঁর ঘরে প্রবেশ করবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারলাম সন্তোষ সিংহ একজন প্রকৃতই গুণী মানুষ। আধময়লা ধুতি পরে একটি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে তিনি দেখা দিলেন। পরিচয় জেনে সমাদর করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে। কথা বললেন অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে প্রাণের ভেতব থেকে। সাংবাদিক জানার পরও কোনরকম বাহুল্য কিংবা আড়ম্বর প্রদর্শনের চেষ্টা করলেন না। চা খেতে দিলেন একটি রঙচটা কাপে। মুহূর্তের মধ্যে বুঝিয়ে দিলেন আমি যেন ওঁদের পরিবারভুক্তই কোন একজন। সিনেমা-থিয়েটারের মানুষেরা যেমন সদ্যচেনা মানুষের কাছে নিজেদের চাকচিক্য প্রদর্শনের চেষ্টা করেন তেমন কোন ব্যাপারই নেই। এই ধরনের আতিথেয়তায় মনটা ভরে যায়। প্রকৃত গুণী মানুষ যাঁরা তাঁদের কোন বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শনের প্রয়োজন যে হয় না সেটা সন্তোষ সিংহকে দেখে বোঝা যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে সন্তোষ সিংহ আমার কাছে সন্তোষদা হয়ে গেলেন।

সেদিন সুলালদা সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য সন্তোষদার কাছে পেয়েছিলাম। তার ভিত্তিতে একটা

বড় লেখা 'দেশ' পত্রিকার আটটি সংখ্যা ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে সাংবাদিক সেবাব্রত গুপ্ত আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। বস্তুত সুলালদা সম্পর্কে স্মৃতিচারণার ব্যাপারটি ওঁর মাধ্যমেই প্রথম আসে।

এর পরে সন্তোষদার কাছে আরও বহুদিন গেছি। একটু একটু করে জেনেছি ওঁর জীবনের উত্থান পতনের নানা ঘটনা। সে বছরই 'আনন্দলোক' পত্রিকার প্রথম পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হয়। এখনও আনন্দলোক-এর নিয়মিত প্রকাশ শুরু হয়নি। সেটা হয়েছিল পরের বছর থেকে। সেই প্রথম পূজাবার্ষিকীতে সন্তোষদার নামে একটি লেখা আমি লিখেছিলাম। পুরনো দিনের থিয়েটারের সাজঘরের ভিতরকার নানা ঘটনা। লেখাটি পাঠকদের ভালো লেগেছিল। আনন্দবাজারের কর্তৃপক্ষও উদার হাতে সন্তোষদাকে সম্মান-দক্ষিণা দিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে ওই টাকাটা সন্তোষদার খুবই প্রয়োজনে লেগেছিল বলে উনি আমাকে জানিয়েছিলেন। দু হাত তুলে আশীর্বাদও করেছিলেন।

সন্তোষদার জন্ম ১৮৯৮ সালে উত্তর কলকাতার যে অঞ্চলে মিনার্ভা থিয়েটার আছে, ওরই কাছাকাছি ফকির চক্রবর্তী লেনে। ওঁর বাবা কালীপ্রসন্ন সিংহ ডিফেন্স অ্যাকাউন্টসে চাকরি করতেন। তাঁর দুই বিবাহ। সন্তোষদা প্রথম পক্ষের সন্তান।

১৯১৯ সালে সন্তোষদা শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সিটি কলেজে আই এস সি পড়তে ভর্তি হন বটে, কিন্তু পড়াশোনা আর বেশি দূর এগোল না। সাংসারিক প্রয়োজনে চাকরি নিতে হল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে।

সন্তোষদার যে পাড়ায় জন্ম ওটা যাত্রা-থিয়েটারের পাড়া। সুতরাং ছেলেবেলা থেকেই যাত্রা কিংবা থিয়েটার দেখার নেশা জন্মে গিয়েছিল। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার পরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে একটা নাটকের ক্লাব করে ফেললেন। নাম দিলেন দত্তপাড়া আর্য নাট্য সমাজ। ওই ক্লাবে ওঁর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন পরবর্তীকালের বিশিষ্ট অভিনেতা ধীরেন দাস।

একদিন সন্তোষদা আর ধীরেনবাবু দুজনে মিলে ঠিক করলেন আরও বড় জায়গায় নাড়া বাঁধতে হবে। সাহস সঞ্চয় করে দু'জনে হাজির হলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ির সামনে। তিনি তখন নাট্যমন্দির নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করে কর্নওয়ালিশ মঞ্চে (বর্তমানে শ্রী সিনেমা) অভিনয় করতেন।

শিশিরবাবু ওদের প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন : তোমরা যে অভিনয় করতে চাও এটা নেশার তাড়নায়, না এটাকে পেশা করতে চাও?

দু'জনেই তখন পড়লেন মহা ফঁপরে। ওঁরা যদি পেশা বলেন, তাহলে তো টাকা পয়সার প্রশ্ন এসে যাবে। আর উনি যদি উনি টাকাই দেবেন তাহলে ওদের মতো দুই অনভিজ্ঞ শিল্পীকে নেবেন কেন? পত্রপাঠ বিদায় করে দেবেন। তাই একটু ইতস্তত করে দুজনেই বললেন : আজ্ঞে অভিনয় করাটা আমাদের নেশা।

শিশিরবাবু সঙ্গে সঙ্গে একটা তর্জনী তুলে দরজার দিকে দেখিয়ে বললেন : গেট আউট । শোন হে ছোকরারা, অভিনয়টা ইয়ার্কির জিনিস নয়। শখ মেটাবার ব্যাপার নয়। এটাকে যদি পেশা করতে না পারো তবে কোনদিনই অভিনেতা হতে পারবে না। এটা কি পার্টটাইম মাস্টারি নাকি!

এক মুহূর্তের মধ্যে সন্তোষদা ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন : আজ্ঞে না স্যার, আমরা অভিনয়টাকে পেশা করতেই চাই। ভুলে মুখ দিয়ে নেশা বেরিয়ে গেছে। কী রে ধীরেন বল না, আমরা তো আসতে আসতে বলছিলাম না, নাটকটাকেই জীবনের পেশা করতে হবে?

ধীরেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন : হ্যাঁ স্যার, সত্যি বলছি, মা কালীর দিব্যি, আমরা নাটককে পেশা করবার জন্যে কতদিন ধরে ভেবেছি। তাতে যত কষ্টই হয় হোক।

শিশিরবাবু ওদের ছেলেমানুষি দেখে হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন : ঠিক আছে, তোমরা গার্জেনদের অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গে পরে দেখা কোরো।

ধীরেনবাবু বাড়ি থেকে অনুমতি পেয়েছিলেন, কিন্তু সন্তোষদা পাননি। বাবার তেমন আপত্তি ছিল না, কিন্তু মা অনুমতি দিলেন না। পরে বাবার অনুমতি পেয়ে দর্জিপাড়ার বিখ্যাত উকিল চাঁদমোহন চক্রবর্তীকে ধরে প্রবোধ গুহর স্টেজে ঢুকেছিলেন শিক্ষানবিশ হিসেবে। কিন্তু অভিনয়ের সুযোগ পাওয়া

গেল না। তাই ১৯২৫ সালের আগস্ট মাসে আর্ট থিয়েটারে যোগ দিলেন। আর্ট থিয়েটারের তখন দারুণ রমরমা। বিখ্যাত নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন আর্ট থিয়েটারের নাট্যাধ্যক্ষ। তাঁর লেখা নাটক 'কর্ণার্জুন' তখন রম রম করে চলছে। ওই নাটকের প্রায় দুশো রাত্রির অভিনয়ের পর ধৃষ্টদ্যুম্নর চরিত্রে সন্তোষদার প্রথম আত্মপ্রকাশ। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নাটকটাকে পুরোপুরি পেশা করে নিলেন সন্তোষ সিংহ।

কাজটা যে বিজ্ঞজনোচিত হয়নি এটা উপলব্ধি করলেন ১৯২৮ সালে। একটা অ্যাকসিডেন্টে বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। সমস্ত সংসারের ভরণপোষণের দায়িত্ব এসে পড়ল সন্তোষদার ঘাড়ে। বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তখন খুবই ছোট ছোট। তাদের মানুষ করার জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই শুরু হল সন্তোষ সিংহের। না, এর জন্যে উনি অন্য কোন চাকরির দ্বারস্থ হননি। রঙ্গভূমিকেই বেছে নিয়েছিলেন রণভূমি হিসেবে।

আর্ট থিয়েটাবে থাকার সময় অনেক বড় বড় শিল্পীব সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন সন্তোষদা। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের পুত্র দানীবাবু, অপরেশবাবু, দুর্গাদাস, কৃষ্ণভামিনী, নীহারবালা, সুশীলা-সুন্দরীব সঙ্গে নিয়মিত অভিনয় করতে করতে নিজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে নিতে পেরেছেন তিনি। মূলত তাঁকে অন্যান্য শিল্পীদের সাবসটিটিউট হিসেবেই ব্যবহার করা হত। কর্ণার্জুনে সহদেব কবতেন, আবার দুর্গাদাস যেদিন অ্যাবসেন্ট থাকতেন সেদিন অর্জুন কবতে হত। সব কটি পুরুষ চরিত্রের পার্ট তাঁর মুখস্থ ছিল। যেদিন দরকার হত সেদিন যে কোন চরিত্রেই নেমে যেতেন। তা সে বৃদ্ধের ভূমিকাই হোক আর যুবকের ভূমিকাই হোক। এ ক্ষমতা সকলের থাকে না।

মূল চবিত্রে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত 'ঋষির প্রেম' নাটকের প্রধান চরিত্র স্বামী অগ্নিবেশের ভূমিকায়। এছাড়া 'চণ্ডীদাস'-এ নকুড় করতেন, 'ইরানের রাণী'-তে দারা, 'চিরকুমার সভা'-য় শ্রীশ, 'রাজসিংহ' নাটকে মোবারক।

আর্ট থিয়েটার উঠে যাবার পর নাট্যনিকেতনে আসেন। এখানে শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ পান। নির্মলেন্দু লাহিড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরির সঙ্গেও। যেহেতু সন্তোষদা সব ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে পারতেন, তাই তাঁকে একদিনের জন্যেও বেকার বসে থাকতে হয়নি। সব রঙ্গমঞ্চেই তাঁর চাহিদা ছিল। এই বিশেষ গুণটির জন্য তাঁর একটা বিশেষ মর্যাদাও ছিল থিয়েটার জগতে।

১৯৩৫ সালে সন্তোষ দাস, ভূপেন চক্রবর্তী, গণেশ গোস্বামী, নাট্যকার অয়স্কান্ত বক্সী, ললিতমোহন মিত্র, মুকুন্দ সেন, পশুপতি সামন্ত, তুলসী চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে একত্রে সমবায় ভিত্তিতে একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। সন্তোষদা নাম দেন রূপমহল। এ ব্যাপারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পিতা কালীকৃষ্ণ ভদ্র মশায় ওঁকে খুব সাহায্য করেন। কিন্তু বাঙালির সমবায়ের ব্যবসা তো। কিছুদিনের মধ্যেই থিয়েটারের ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে হয়।

এরপর সন্তোষদা চিৎপুরে 'রঙ্গমহল' নামে একটি নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে শচীন সেনগুপ্তের 'আবু হাসান' নাটক অভিনীত হয়। নামভূমিকায় ছিলেন সন্তোষদা। বিখ্যাত অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই বাজারে মাসিক দুশো টাকা বেতন দিয়ে ডেকে এনে ঔরঙ্গজীবের চরিত্রে অভিনয় করান। এই রঙ্গমঞ্চের আয়ুও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

১৯৩৭ সালে সন্তোষদা রঙমহলে যোগ দেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় 'অভিষেক' নাটকে বশিষ্ঠের চরিত্রে অভিনয় করেন। এরপরে প্রলয়, ডিটেকটিভ, সংগ্রাম ও শান্তি, পি ডব্লিউ ডি এবং মহেন্দ্র গুপ্তের কঙ্কাবতীর ঘাট ও মাইকেল মধুসূদন নাটকে।

মিনার্ভা মঞ্চে করেন সীতারাম, গৈরিক পতাকা ইত্যাদি নাটকে। এবং পরবর্তীকালে স্টার থিয়েটারে মহেন্দ্র গুপ্তর পরিচালনায় বাজীরাও, নৌকাডুবি ইত্যাদি নাটকে।

স্টার থিয়েটার যখন নতুন করে তৈরি হল তখন দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় শ্যামলী, পরিণীতা ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেন, যেখানে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন উত্তমকুমার। পরবর্তীকালে বিশ্বরূপা মঞ্চে আরোগ্যনিকেতন, ক্ষুধা এবং সেতু নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন।

সিনেমায় প্রথম সুযোগ পান ১৯২৬ সালে অহীন্দ্র চৌধুরির পরিচালনায় নির্বাক 'কৃষ্ণসখা' ছবিতে

সুদামার ভূমিকায়। পরের ছবি জ্যোতিষ ব্যানার্জি পরিচালিত 'বিষবৃক্ষ'। এতে করেন সুরেনের চরিত্রে।

সন্তোষদা প্রথম সবাক ছবিতে অভিনয় করেন ১৯৩৩ সালে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি পরিচালিত 'যমুনাপুলিনে' ছবিতে আয়ান ঘোষেব চরিত্রে। ওই ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, সবিতা দেবী, আঙুরবালা, ইন্দুবালা প্রমুখ শিল্পীরা। পরের ছবি নরেশ মিত্র পরিচালিত 'সাবিত্রী'। এতে করেছিলেন অশ্বপতির চরিত্র।

এরপর সন্তোষদা অজস্র ছবিতে অভিনয় করেছেন, তার সবগুলির নাম স্মরণে আনা মুশকিল। প্রায় দু আড়াইশ ছবির নাম মনে রাখাও সম্ভব নয়। তবে সবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকা। কিন্তু প্রতিটি চবিত্রেই এত স্বাভাবিক অভিনয় করতেন যে অভিনয বলে মনেই হত না। সিনেমার অভিনয় ঠিক ওই ধরনের হওয়াই তো উচিত। তাঁব 'জিঘাংসা' ছবিতে অভিনয়ের কথা মনে আছে। ছবি দেখতে দেখতে ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম।

শেষ জীবনে সন্তোষদা রবীন্দ্রভাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন অভিনয়শিক্ষক হিসেবে। কিন্তু তরুণসম্প্রদায় তাঁর অভিনয় পদ্ধতি ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। সামনাসামনি কিছু বলতেন না বটে, কিন্তু ওঁর আড়ালে আমার সামনে যা বলতেন তাতে কানে আঙুল দিতে হত। সেইসব হাফ-ইনটেলেকচুয়াল ছাত্ররা এখন কোথায়? তাঁদের তো মঞ্চে বা ছোট বড় কোন পর্দাতেই দেখলাম না। আসলে জহর চিনতে গেলে জুহরি হতে হয। যেমন উত্তমকুমার চিনেছিলেন সন্তোষ সিংহকে, আর সন্তোষ সিংহ চিনেছিলেন উত্তমকুমাবকে।

উত্তমবাবুকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম : আচ্ছা উত্তমবাবু এই যে সন্তোষদার এত অর্থকষ্ট যাচ্ছে, এব কি কোন সুরাহা করতে পারেন না আপনারা?

শুনে উত্তমবাবু একটু উদাস হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন : শুনবেন একটা ঘটনা? শুনুন তাহলে। স্টার থিয়েটাবে অভিনয় করার সময় একবার সন্তোষদাকে কিছু টাকা দিতে গিয়েছিলাম। ওঁর হাতে একটা খামে করে টাকাটা গুঁজে দিয়ে বলেছিলাম, এটা আমার গুরুদক্ষিণা। খামটা হাতে নিয়ে উনি খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল কবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন : উত্তম, আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই কিছু শেখাই। তুমি আমার সেই ভালোবাসাকে এভাবে অপমান করলে। বলতে বলতে ছল ছল চোখে সন্তোষদা সরে গেলেন আমার সামনে থেকে। মিলিয়ে গেলেন গ্রিনরুমের আধো অন্ধকার বাঁকটিতে।

এই হলেন সন্তোষ সিংহ। মানুষটি কবে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু আজও আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে বিরাজ কবছেন। করবেনও চিরকাল।

মঞ্জু দে

ভুলটা বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরই করেছিলেন। মঞ্জু মিত্র নামক শিশুটিকে তিনি যদি এই বঙ্গদেশের বহরমপুর শহরে ভূমিষ্ঠ না করিয়ে অন্যত্র করাতেন তাহলে হয়তো এই ভূমণ্ডলে নানা অঘটন ঘটে যেতে পারত। উনি যদি ইংল্যান্ডে জন্মাতেন তাহলে হয়তো মিসেস মার্গারেট থ্যাচারের মতোই একদা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। কিংবা ইজরায়েলে জন্মালে শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার। অথবা ফিলিপিনসের পটভূমিকায় মিসেস কোরাজান আকিনো।

এগুলো হয়তো নিছকই কথার কথা। কিন্তু শ্রীমতী মঞ্জু দে-কে আমি যেভাবে দেখেছি, চিনেছি, জেনেছি, তাতে আমার স্থির বিশ্বাস উনি যদি আন্তরিকভাবে এরকম কোন কিছু চাইতেন তাহলে সেটা ঘটানোর ক্ষমতা তাঁর নিজের মধ্যেই ছিল। উনি যদি পলিটিক্সে আসতেন তাহলে কালক্রমে ছোটখাটো কোন স্টেটের মুখ্যমন্ত্রী অথবা রাজ্যপাল হয়ে গেলে আমি একটুও আশ্চর্য হতাম না। মঞ্জু দে-র জীবনের নানা ঘটনা পর্যালোচনার পর আমার এই ধারণা জন্মেছে। আমার এই দুঃসাহসিক ধারণার সমর্থনে দু-একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাবে।

সেটা বোধহয় ১৯৫৪ সাল। এখন যে প্রতিষ্ঠানটির নাম অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, তখন সেটির নাম ছিল অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল। সংক্ষেপে এ এ বি। এই এ এ বি এবং ক্যালকাটা মোটর স্পোর্টস ক্লাব উভয়ে মিলে ক্যালকাটা টু জামশেদপুর একটা মোটর র‍্যালির আয়োজন করেছিলেন সেই সময়ে। সেই মোটর দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ময়দানে মনুমেন্টের নিচে থেকে। তখনও মনুমেন্টের নাম শহিদ মিনার হয়নি এবং তার মাথায় লাল টুপিও পরানো হয়নি। এখন অবশ্য আবার টুপির রঙ বদলে গেছে।

তা সেই মোটর র‍্যালির শুরুটুকু দেখার জন্যে কলকাতার এলিট সোসাইটির অনেক মানুষ মনুমেন্টের নিচে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেটাই স্বাভাবিক। তখনকার দিনে মোটর র‍্যালির তো এত ঘনঘটা ছিল না। এই রেস নিয়ে ক'দিন ধরে কাগজপত্রে খুব লেখালেখিও হচ্ছিল। যেটা অস্বাভাবিক সেটা হল মনুমেন্টের নিচে এলিটদের পাশাপাশি বেশ কিছু সংখ্যক সাধারণ মধ্যবিত্ত বঙ্গসন্তানের উপস্থিতি। তাঁদের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু একজন মহিলা, যিনি হেমেন গুপ্তের 'বেয়াল্লিশ' ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের সূত্রে তখন ঘরে ঘরে আলোচিত। তিনি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন। তাঁর নাম মঞ্জু দে।

বলা বাহুল্য, ওই কৌতূহলাক্রান্তদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। আমার ধারণা ছিল, এটা একজন সদ্যজনপ্রিয় অভিনেত্রীর শখের খেয়াল মাত্র। শখের তাগিদে বড়জোর কোলাঘাট পর্যন্ত গিয়ে আবার ব্যাক করবেন। তাই শ্রীমতী মঞ্জু দে-র এই অভিযানকে বিশেষ গুরুত্ব দিইনি।

গুরুত্ব দিতে শুরু করলাম তরুণ মিত্রের কথা শোনার পর। তরুণবাবু আমার বন্ধু। উনি বর্তমান অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি কল্যাণ ভদ্রের ভাগনে। মোটরিং-এর ব্যাপারে একজন ওয়াকিবহাল মানুষ। তরুণবাবু বললেন : না না, মিসেস দে-কে অত আন্ডার এস্টিমেট করবেন না। বলা যায় না উনিই হয়তো ফার্স্ট হয়ে গেলেন।

তা সত্যিই সেবারে মঞ্জু দে ক্যালকাটা টু জামসেদপুর মোটর র‍্যালিতে ফার্স্ট হয়ে গেলেন আমাদের সবাইকে বিস্মিত করে। পরের দিন সকালের সংবাদপত্রে সে খবর বেরিয়েও গেল মঞ্জু দে-র হাসি-হাসি মুখের ছবি সহ।

সেই সংবাদের সূত্রেই জানতে পারলাম শ্রীমতী মঞ্জু দে নাকি অভিনয় জীবন শুরু করার পূর্বে বিভিন্ন স্পোর্টসে অনেক প্রাইজ-টাইজ পেয়েছেন। লেখাপড়াতেও দারুণ ভালো ছিলেন।

মঞ্জু দে যখন সিনেমা করতে এলেন তখন বিজ্ঞাপনে ওঁর নামের পাশে 'বি. এ.' শব্দটি ব্যবহার

করা হত। এর আগে ছবির পর্দায় তিনজন বি. এ. পাশ অভিনেত্রীকে দেখা গেছে। একজন তিরিশের দশকে। তাঁর নাম ডলি দত্ত। অভিনেত্রী হিসেবে তেমন কিছু আহামরি নয়। তবে 'তরুণী' ছবিতে একটি চুম্বনের দৃশ্যে তাঁর সাহসিক অভিনয় সেকালে খুব হইচই ফেলে দিয়েছিল। দর্শকরা তা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করতেন।

আর একজন ওঁরই প্রায় সমসাময়িক। তাঁর নাম প্রতিমা দাশগুপ্তা। তাঁর নামের পাশেও 'বি-এ' শব্দটা লেখা হত। ইনি অনেকগুলি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'গোরা'। চল্লিশের দশকে ইনি বম্বে চলে যান এবং মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিতা হন। বম্বেতে উনি দু-তিনটে ছবি পরিচালনাও করেন। এঁর ননদও ছবিতে অভিনয় করতেন। তাঁর নাম বেগম পারা। এই বেগম পারাকে নায়িকা করে পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তী একটি বাংলা ছবি করেন। ছবিটির নাম 'বাগদাদ'। এই সময়ে প্রতিমা দাশগুপ্তা কলকাতায় এসেছিলেন আবার। উনি স্টুডিওতে আসতেন ফুলস্পিডে মোটরবাইক চালিয়ে।

এই সময়কার একটি ঘটনাব কথা মনে পড়ছে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও ওই ঘটনাটা একটু বলে নিতে ইচ্ছে করছে।

সেদিন 'বাগদাদ' ছবির শুটিং হচ্ছিল ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। সেটা ছিল নায়িকা বেগম পারার স্নানের দৃশ্য। বাথটবে বেগম শুয়ে আছেন। তাঁব উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। সেই অংশটি সাবানের ঘন ফেনা দিয়ে ঢাকা। পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তীর ইচ্ছা উর্ধ্বাঙ্গের আরও কিছুটা অংশ দৃশ্যমান হোক। কিন্তু সঙ্কোচবশত তিনি সে কথা বেগম পাবাকে বলতে পারছেন না।

এমন সময় ভট্‌ভট্‌ শব্দে মোটর বাইক হাঁকিয়ে প্রতিমা দাশগুপ্তা এসে হাজির হলেন অকুস্থলে। শ্যামবাবু একটু আশার আলো দেখতে পেলেন। প্রতিমা দেবী তাঁর পূর্বপবিচিতা। শ্যামবাবু তাঁর মনের বাসনাটি প্রতিমা দেবীর কানে কানে জানালেন।

প্রতিমা দেবী সব শুনে বললেন . এই কথা! আমি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। এই বলে তিনি চিৎকাব কবে তাঁর ননদকে হিন্দিতে বললেন . বেগম, তোমাব শরীরটা বাথটাব থেকে একটু ওপরে তুলে ধর তো।

শোনামাত্র বেগম পারা তাঁর সম্পূর্ণ অনাবৃত উর্ধ্বাঙ্গ সহ বাথটবের ওপর উঠে বসলেন।

তাই দেখে শ্যামবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন : আরে না না, অতটা নয়, অতটা নয়। সেন্সারে আটকে দেবে যে!

সঙ্গে সঙ্গে বেগম পারা আবার পূর্ববস্থায় ফিরে গেলেন। সারা ফ্লোরে হাসির স্রোত বয়ে গেল। ফ্লোরে অবশ্য টেকনিশিয়ানরা ছাড়া বাইরের লোক বিশেষ কেউ ছিলেন না।

সেই প্রতিমা দাশগুপ্তা বি-এ এখন কোথায় আছেন জানি না। কী অবস্থায় আছেন জানি না। বেঁচে আছেন কি না তাও জানি না।

এরপর যে অভিনেত্রীটির নামের পাশে 'বি-এ' শব্দটি বিজ্ঞাপিত হত তাঁর নাম বিজয়া দাশ। তিনি মাত্র দুটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। প্রথমটির নাম যতদূর মনে পড়ছে 'সন্ধ্যা'। পরিচালক ছিলেন মণি ঘোষ। আর দ্বিতীয়টি হল পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা'। এই ছবির প্রযোজক ছিলেন একজন মহিলা এবং তিনিও বি-এ পাশ। তাঁর নাম প্রতিভা শাসমল। ১৯৪৪ সালে এই দুটি ছবিতে অভিনয় করার পর বিজয়া দাশের বিয়ে হয়ে যায় বিশ্ববন্দিত সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। তিনি এখন সর্বজনশ্রদ্ধেয়া বিজয়া রায়।

এরপরের 'বি-এ' বিজ্ঞাপিতা অভিনেত্রী হলেন মঞ্জু দে। ১৯৪৫ সালে তিনি যখন প্রথম ছবিতে অভিনয় করলেন তখনও তাঁর বি-এ পড়া শেষ হয়নি এবং বিবাহও হয়নি। তখন তাঁর নাম মঞ্জু মিত্র। তাঁর প্রথম সিনেমায় অভিনয় এক বিচিত্র ঘটনা। সেটা বলবার আগে ওঁর ছোটবেলার কথাটা একটু বলে নিই।

মঞ্জু মিত্রের জন্ম ১৯২৬ সালে বহরমপুরে ওঁর মামাবাড়িতে। ফুলের মতো ফুটফুটে এই মেয়েটি বাবা অমরেন্দ্রনাথ এবং মা কমলা মিত্রের বড় আদরের সন্তান। শৈশবের লেখাপড়া এই বহরমপুরে এক

মিশনারি স্কুলে। মাত্র এগারো বছর বয়সে মা মারা যাবার পর বাবার স্নেহ-মমতা অজস্র ধারায় বর্ষিত হতে লাগল মেয়ের ওপর। মঞ্জু ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট। সেইসঙ্গে খেলাধুলাতেও। যার সার্থক পরিণতি আমরা দেখেছি পরবর্তীকালে মোটর র‍্যালির ফার্স্ট হওয়ার মধ্যে।

১৯৪২ সালে বহরমপুর গার্লস কলেজ থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পরই মঞ্জুরা চলে গেলেন পাটনায়। সেখানে রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে কলকাতা চলে এলেন। এখানে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হলেন বি. এ. পড়তে। এই বি. এ. পড়তে পড়তেই দুম করে সুযোগ এসে গেল সিনেমায় অভিনয়ের।

সেটা ১৯৪৫ সাল। ওই বছর দেশপ্রিয় পার্কে নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিক মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ খান, কর্নেল জি এস ধিলোঁ, লেফটেনান্ট সাইগল এবং রানি ঝাঁসি বাহিনীর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন সহ অন্যান্য সৈনিকদের সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন করা হয়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষ তখন দেশাত্মবোধে থরথর করে কাঁপছে। কিছুদিন আগেই এইসব বীর সৈনিকরা ব্রিটিশের কারাগার লালকেল্লা থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

ওই সংবর্ধনা সভায় বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ভলান্টিয়ার কোর গঠন করা হয়েছিল। তারা সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে সামরিক কায়দায় গার্ড অব অনার দেবে আদাজ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের। সেই ভলান্টিয়ার কোরের নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়েছিল আশুতোষ কলেজের স্নাতক বিভাগের ছাত্রী মঞ্জু মিত্রের ওপর।

ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিত্রপরিচালক সুশীল মজুমদার। সুশীলদাও এক বিপ্লবী পরিবারের সন্তান। ওঁর বাবা বসন্ত মজুমদার এবং মা হেমপ্রভা মজুমদার দুজনেই স্বদেশী যুগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সুশীলদা নিজেও শান্তিনিকেতনি ভাবধারায় মানুষ।

ওই অনুষ্ঠানে সুশীলদা মঞ্জু মিত্রের স্মার্টনেস দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। সুশীলদা তখন হিন্দি ভাষায় 'সিপাহী কা সপনা' নামে একটা দেশাত্মবোধক ছবি করার তোড়জোড় করছিলেন। তিনি মঞ্জুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : ওহে বালিকা, তোমার নামটি কী?

মঞ্জু মিত্র বুক চিতিয়ে জবাব দিলেন : শুনুন মহাশয়, আমি বালিকা নই। সে বয়েসটা পেরিয়ে এসেছি। আমি এখন সাবালিকা। আমার নাম মঞ্জু মিত্র।

ওর কথা শুনে সুশীলদা হেসে ফেললেন। বললেন : আচ্ছা আচ্ছা, তাই না হয় হল। তা মঞ্জু, তোমার কি সিনেমায় অভিনয় করার ইচ্ছে আছে?

মঞ্জু মিত্র খুব স্মার্টলি জবাব দিলেন : হোয়াই নট্। আমাকে কী করতে হবে বলুন?

সুশীলদা বললেন : এক্ষুনি কিছু করতে হবে না। তুমি একবার কাল-পরশুর মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলব। তারপর দরকার হলে ভয়েস টেস্ট নিতে হবে, ক্যামেরা টেস্ট নিতে হবে। এই নাও আমার ঠিকানা।

এই বলে সুশীলদা একটা ভিজিটিং কার্ড ধরিয়ে দিলেন মঞ্জু মিত্রের হাতে।

'সিপাহী কা সপনা' ছবিতে মঞ্জু মিত্র একটা ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ছবিটা জমেনি। চলেওনি ভালো করে। সুতরাং অভিনেত্রী হিসেবে মঞ্জু মিত্রের সুনাম কি দুর্নাম কোনটাই হয়নি।

১৯৪৮ সালে মঞ্জু মিত্রের সঙ্গে দেবব্রত দে-র বিয়ে হয়ে গেল। মঞ্জু মিত্র হয়ে গেলেন মঞ্জু দে। তখন তিনি এম.এ. পড়ছিলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে। এবং বিয়ের পর পড়াটাই ছেড়ে দিলেন।

বিয়ের সূত্রে মঞ্জু দে একজন অসাধারণ শ্বশুর পেয়ে গেলেন। অধ্যাপক ক্ষেমেন্দ্রচন্দ্র দে। মঞ্জু দে-যেমন শ্বশুর-অন্ত-প্রাণ, ক্ষেমেনবাবুও তেমনি বৌমা বলতে অজ্ঞান। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

সেটা ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। মঞ্জু দে তার আগে দেবকী বসুর 'রত্নদীপ', অজয় করের 'জিঘাংসা' এবং হেমেন গুপ্তের 'বেয়াল্লিশ' ছবিতে অভিনয় করে রীতিমতো পপুলার। 'রূপাঞ্জলি' পত্রিকার উদ্যোগে প্রতি বছর দক্ষিণ কলকাতায় সরস্বতী পুজো করা হত, যে পুজোর কাজকর্ম সব শিল্পীরাই করতেন। মঞ্জু দে-ও খুব উৎসাহ সহকারে পুজোর কাজে যোগ দিতেন।

সে বছর সকাল থেকে মঞ্জু দে এলেনই না। এলেন বেলা বারোটা নাগাদ একটি ট্যাক্সি করে। ওঁকে

দেখে রূপাঞ্জলির সম্পাদক সুধাংশু বক্‌সি মশাই বলে উঠলেন : কী মঞ্জু, সকাল থেকে তো আপনার কোন পাত্তাই নেই।

মঞ্জু দে বললেন : কী করব বলুন সুধাংশুবাবু, শ্বশুরমশাইয়ের শরীরটা খুব খারাপ। আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও কাছছাড়া করতে চাইছেন না। এখন একটু ঘুমোচ্ছেন। সেই ফাঁকে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে গেলাম। আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। সেই জন্য ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়েই রেখেছি।

সুধাংশুবাবু বললেন : তা এলেন যখন তখন খাওয়া-দাওয়াটা সেরেই যান।

মঞ্জু দে বললেন . ওরে বাবা, তার কি জো আছে। ঘুম ভেঙে গেলেই বৃদ্ধটি বাচ্চা ছেলের মতো খোঁজাখুঁজি শুরু করবেন। প্লিজ কিছু মনে কববেন না।

এই বলে উপস্থিত সবাইকাব দিকে তাকিয়ে একটু হেসে হাত নাড়তে নাড়তে অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে গিয়ে বসলেন মঞ্জু দে।

তাহলেই বুঝুন কেমন শ্বশুব-অন্ত-প্রাণ ছিলেন মিসেস দে।

হ্যাঁ, আমি মঞ্জু দে-কে মিসেস দে বলেই ডাকতাম। উনি আমাকে বলতেন রবিবাবু। আমাদের দুজনের বযেসেব তফাত খুব বেশি নয়। উনি আমাব চেয়ে পনেবো মাসের বড়। অনায়াসে দুজনে দুজনকে নাম ধবে ডাকতে পাবতাম, অথবা তুমি তুমি কবতে পাবতাম। কিন্তু কেন জানি না, সেটা সম্ভব হয়নি। সাবা জীবন দুজনে দুজনকে আপনি আজ্ঞে করেই কাটিয়ে দিলাম।

অথচ মিসেস দে-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার কম ছিল তা তো নয়। শেষ বয়েসে যখন উনি অধ্যাত্ম জীবন যাপন করছেন তখন তো আমাদেব প্রায়শই দেখা হত। স্বামী শুভানন্দের শুভাশ্রমে আমরা প্রতি সপ্তাহে দু-তিনদিন কবে ঘণ্টার পব ঘণ্টা কাটিয়েছি। কত সুখ দুঃখের কথা হয়েছে। কত আনন্দ-বেদনার স্মৃতি রোমন্থন করেছি উভযে। ওঁব জীবনের নানা অলৌকিক ঘটনাব বিবরণ শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু সেসব কথা এখন থাক। ওটা পরে বলছি। তাব আগে মঞ্জু দে কীভাবে বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে এলেন সেই ঘটনাটা বলে নিই।

যাঁর সঙ্গে মঞ্জু দে-ব বিয়ে হয়েছিল তাঁর নাম দেবব্রত দে। আমবা ওঁকে ওঁর ডাকনাম লালুবাবু বলেই ডাকতাম। ভদ্রলোক একেবারে মাটির মানুষ। নিপাট ভদ্রলোক। মঞ্জু দে-র মতো এক টুকরো জ্বলন্ত আগুনের পাশে ওঁব অস্তিত্ব আছে কি না টেরই পাওয়া যেত না। ভদ্রলোক অমৃতবাজার পত্রিকায় চাকরি করতেন।

বিয়ের পর মঞ্জু দে ফিল্ করলেন ওঁর জীবন থেকে সামথিং ইজ মিসিং। কী যেন হবার কথা ছিল অথচ হওয়া হল না। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল তাঁর তো অভিনেত্রী হবার কথা ছিল। 'সিপাহি কা সপনা'-তে অভিনয় তো করেওছিলেন, কিন্তু সাক্‌সেস্ তো আসেনি। তাহলে তো এখন আবার নতুন করে ওই ব্যাপারটায় মন দিতে হয়।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ। শ্বশুরকে গিয়ে ধরলেন : বাবা, আমি অভিনয় করব। আপনি পারমিশন দিন।

ক্ষেমেনবাবু জবাব দিলেন : নিশ্চয় করবে। অভিনয় তো অতি উত্তম জিনিস। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যার অন্যতম। অভিনয় একটা শিল্প।

পারমিশান তো পেলেন, কিন্তু কোথায় অভিনয় করবেন? একদিন কোন্ এক পত্রিকায় দেখলেন পরিচালক হেমেন গুপ্ত বেয়াল্লিশ সালের বিপ্লবের উপর ছবি করছেন। ওঁর আগেকার ছবি 'ভুলি নাই' দর্শকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

একদিন প্রাতঃকালে মঞ্জু দে উপস্থিত হলেন হেমেন গুপ্তর সকাশে। বললেন : আমি আপনার ছবিতে অভিনয় করতে চাই।

হেমেন গুপ্তের কাছে তখন অভিনয়প্রার্থী অনেকের আসা-যাওয়া চলছে। উনি দু-একটা কথা বলে সবাইকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু মঞ্জু দে-কে ফেরাতে পারলেন না। এই জ্বলন্ত অগ্নিকন্যাটিকে তিনি এক মুহূর্তেই চিনে নিলেন। 'বেয়াল্লিশ' ছবির নায়িকার চরিত্রে মঞ্জু দে-ই নির্বাচিত হয়ে গেলেন।

'বেয়াল্লিশ' ছবির কাজ শেষ হয়ে গেল ১৯৪৯ সালের গোড়াতেই। কিন্তু ছবিটি মুক্তি পেল না।

তৎকালীন পুলিশ কমিশনার প্রচণ্ড আপত্তি জানালেন। তাঁর বক্তব্য এ ছবিতে পুলিশকে হেয় করা হয়েছে। তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা হল, এ ছবিতে পুলিশের যে অত্যাচার দেখানো হয়েছে সেটা তো ব্রিটিশ আমলের। তখনকার পুলিশ যে বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করতেন এটা তো ঐতিহাসিক সত্য। পুলিশ কমিশনার জবাবে বললেন, সেইসব পুলিশই তো এখন কর্মরত। এ ছবি দেখার পর পুলিশ সম্পর্কে মানুষের ঘৃণা জন্মাবে। ল অ্যান্ড অর্ডার বজায় রাখা শক্ত হয়ে উঠবে। পুলিশের মনোবল ভেঙে পড়বে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব কূটকচালি চলতে লাগল পুরো দুটি বছর ধরে। ছবি আর মুক্তি পেল না। অবশেষে অনেক কাণ্ড কারখানার পর ১৯৫১ সালের ৯ আগস্ট ১৯৪২-এর যে ঐতিহাসিক তারিখটিতে গান্ধীজির ডাকা 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনি দিয়ে এক মহান আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সেই পুণ্য দিনটিতেই 'বেয়াল্লিশ' ছবিটি মুক্তি পেল। এবং মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে প্রশংসার বন্যা। কত কত প্রশংসা। পরিচালক হেমেন গুপ্তের প্রশংসা। নতুন সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসা। বিকাশ রায়ের ভিলেন চরিত্রে অভিনয়ের প্রশংসা। আর প্রশংসা নতুন নায়িকা মঞ্জু দে-র অসাধারণ অভিনয়ের।

এই প্রশংসাটুকু পাবার জন্যে শ্রীমতী মঞ্জু দে-কে পুরো আড়াইটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু বাগানে ফুল ফুটলে তার সুবাস যেমন চাপা থাকে না, তেমনি মঞ্জু দে-র প্রতিভার সংবাদটুকু চাপা থাকেনি চলচ্চিত্র মহলে। সেন্সরের ছাড়পত্র পাবার আগেই 'বেয়াল্লিশ' ছবির প্রোজেকশান শো কয়েকবার হয়েছিল ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে। সেই সময় ছবিটি তখনকার সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় পরিচালক দেবকী বসু দেখেছিলেন। ক্যামেরাম্যান কাম ডিরেক্টার অজয় করও দেখেছিলেন। আর দেখেছিলেন 'বেয়াল্লিশ' ছবির নায়ক প্রদীপকুমার আর তাঁর দাদা কালিদাস বটব্যাল। তাই 'বেয়াল্লিশ' রিলিজ করার আগেই মঞ্জু দে উপরোক্ত তিনজনের ছবিতে কাজ পেয়ে গিয়েছিলেন। আর তিনটিই ভিন্নধর্মী চরিত্র।

দেবকী বসুর 'রত্নদীপ' ছবিতে মঞ্জু দে করেছিলেন এক বনেদি বড়লোকের বাড়ির দাসীর চরিত্র। কিন্তু কী আশ্চর্য সুন্দর তাঁর ওই চরিত্রাভিনয়। আজও ভুলতে পারিনি তাঁর স্নান সেরে উঠে আসা ভিজে কাপড়ে শীতের থর থর কাঁপুনি আর সেই সঙ্গে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠের সংলাপ। দেখে মনে হবে যেন শতখানেক ছবিতে অভিনয় করবার পর এমন সাবলীলতা, এমন পারফেকশান এসেছে। আমার তো মনে হয় মঞ্জু দে বোধহয় বর্ন অ্যাকট্রেসই ছিলেন।

অজয় করের 'জিঘাংসা' ছবির কথা পুরনো প্রজন্মের অনেকের নিশ্চয় মনে আছে। জলার পেত্নীর চরিত্রে কী দারুণ সব এক্সপ্রেশান! জলার ঘন পাতিঘাসের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে গান গাইছে একটি প্রায় অশরীরী রহস্যময়ী মহিলা। তার আকর্ষণে গভীর রাতে ছুটে আসছে নায়ক। তারপর আলো-আঁধারিতে লুকোচুরি। ভয়ে বিস্ময়ে রোমাঞ্চে বুকের ভিতর কাঁপন ধরে যেত।

আবার কালিদাস বটব্যালের 'পলাতকা' ছবিতে একেবারে আলট্রা-মডার্ন ক্যারেকটার। চলনে-বলনে কোথাও আগের দুটি ছবির সঙ্গে এতটুকু মিল নেই। একেবারে মডার্নিজমের চূড়ান্ত।

ওই ১৯৫১ সালে 'বেয়াল্লিশ' ছবিটি মুক্তি পাবার আগেই মঞ্জু দে অভিনীত এই তিনটি ছবি তাঁকে দর্শকদের মনের ভিতরে পৌঁছে দিয়েছিল। তারপর 'বেয়াল্লিশ' মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জু দে-র জনপ্রিয়তা একটা বিরাট বিস্ফোরণের আকার নিল। ওই ছবির অনেক কিছুই কালক্রমে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে, কিন্তু বিকাশ রায়ের শয়তান পুলিশ অফিসার আর মঞ্জু দে-র নির্যাতিতা বিপ্লবী গৃহবধূর কথা কোনদিনই ভোলো যাবে না।

যাঁর অভিনয় জীবনের শুরু থেকেই এত প্রাপ্তি, এবং পরবর্তীকালে যা ফুলে ফলে বিকশিত হয়েছিল, সেই সব কিছু ছেড়ে একদিন তিনি হঠাৎ কেন সাধিকার জীবন বেছে নিলেন, সেটাও তো কম রোমাঞ্চকর নয়।

আসলে মঞ্জু দে-র সারা জীবনটাই নানা রোমাঞ্চে ভরা। তার সবটুকু আমি জানি না। কিছুটা তিনি আমাকে বলেছেন আর কিছুটার ভাসা ভাসা ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বামী শুভানন্দের আশ্রমে বসে।

আমরা এখন তাঁর জীবনের সেই রোমাঞ্চকর অধ্যায়ে প্রবেশ করতে পারি।

আমার ছেচল্লিশ বছরের সাংবাদিক জীবনে অনেক অভিনেত্রীর সঙ্গে মিশেছি, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছি, কিন্তু মঞ্জু দে-র মতো এমন এক দুর্জ্ঞেয় চরিত্র আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। কথায় আছে না, 'বজ্রের মতো কঠোর আর কুসুমের মতো কোমল', মঞ্জু দে ছিলেন ঠিক তাই। যে কোনও ব্যাপারে যখন একটা ডিসিশন নিতেন তখন সেখান থেকে নড়ানোর সাধ্য কারও ছিল না। যেটা ভাববেন সেটা করে ছাড়বেনই।

চলচ্চিত্রজীবনে দুটি ঘটনা মঞ্জু দে-কে খুব আপসেট করে দিয়েছিল। একটি মানসিক, অপরটি আর্থিক। যার ফলে উনি চিত্তের শান্তি ফিরে পেতে শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় জীবনটাকেই বেছে নিয়েছিলেন। সে এক রোমাঞ্চকর বিচিত্র জীবন। কিন্তু সেখানে যাবার আগে ওঁর অভিনয়জীবন, প্রযোজকের ভূমিকা এবং পরিচালক হিসেবে উনি যে বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে আলোকপাত করা দরকার। বাঙালি মহিলা হিসেবে সম্ভবত উনিই প্রথম চিত্র পরিচালনায় ব্রতী হন। বাংলা ছবিতে আমরা ওঁর আগে আর কোনও মহিলা চিত্রপরিচালকের সাক্ষাৎ পাইনি। ওঁর পরে পেয়েছিলাম অরুন্ধতী দেবীকে।

কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। তার আগে মিসেস দে-র অভিনয়জীবনের কথা আরও কিছুটা বলে নিই। অভিনয়জীবনের প্রারম্ভেই এমন কিছু কিছু চরিত্রচিত্রণ তিনি করেছিলেন যা আজও আমার মতো অনেকের স্মৃতিতেই উজ্জ্বল হয়ে আছে। যেমন সেই ১৯৫২ সালের 'কার পাপে?' ছবিটি। কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত এম পি প্রোডাকসন্সের এই ছবিটিতে তাঁর বিস্ময়কর অভিনয় দর্শককে বিমুগ্ধ এবং বিস্মিত করে তুলেছিল। সমাজের কল্যাণের জন্য গুপ্তরোগাক্রান্ত এক মহিলা নিজের হাতে তাঁর স্বামীকে গুলি করে হত্যা করলেন। সে যে কী ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় তা যাঁরা ওই ছবি দেখেননি তাঁদের বোঝানো মুশকিল। সে সব ছবির প্রিন্ট কবেই নষ্ট হয়ে গেছে। তখন তো আমাদের দেশে চলচ্চিত্র সংরক্ষণের তেমন কোন ব্যবস্থা হয়নি। থাকলে 'কার পাপে?'-র মতো সমাজসেবামূলক একটি প্রয়োজনীয় ছবি নিশ্চয়ই সংরক্ষিত হত।

আর আশ্চর্যের ব্যাপার, ওই 'কার পাপে?' ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের পর মঞ্জু দে-কে দেখা গেল শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প অবলম্বনে নীরেন লাহিড়ি পরিচালিত 'শুভদা' চিত্রে এক অকিঞ্চিৎকর বাইজির ভূমিকায়। জমিদারের বজরায় বসে তিনি একটি গান গাইছেন। 'ওই জাদুভরা আঁখিতে যে কী মায়া দোলে, আমি জানি না-জানি না-জানি না।' কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বর্তমানে মুখোপাধ্যায়) গাওয়া ওই গানটি শ্রীমতী মঞ্জু দে-র বাইজি সুলভ ছলাকলার কারণে বেশ হিট করে গিয়েছিল।

আমার কাছে সেই সময়ে ব্যাপারটা বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। যিনি নায়িকা হিসেবে স্বল্পকালের মধ্যে এত নাম করেছেন, তিনি কী করে এমন একটি অকিঞ্চিৎকর চরিত্র অ্যাকসেপ্ট করলেন। পরে ওঁর সঙ্গে আলাপ হবার পর মনে হয়েছিল এটা স্পোর্টস উওম্যান মঞ্জু দে-র পক্ষেই সম্ভব। যে কোনও ভূমিকাকেই উনি স্পোর্টিংলি নিতেন। নায়িকা ছাড়া অন্য চরিত্রে অভিনয় করব না এমন ক্ষুদ্র মানসিকতা ওঁর ছিল না। মঞ্জু দে-র পূর্বেকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে এই ব্যাপারটি প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। অহীন্দ্র চৌধুরি, দুর্গাদাস, চন্দ্রাবতী দেবী প্রমুখ শিল্পীর মধ্যে এই স্পোর্টিং স্পিরিট ছিল। শ্রীমতী মঞ্জু দে তাঁদেরই সার্থক উত্তরসূরি।

১৯৫৪ সালে মিসেস দে অন্য একটি ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন। 'অঙ্কুশ' নামে একটি ছবির প্রযোজনার সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়লেন। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন আজকের স্বনামখ্যাত চিত্রপরিচালক তপন সিংহ। এইটিই তাঁর প্রথম ছবি।

তপন সিংহ তখন সাউন্ড রেকর্ডিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ক্রিয়েটিভ কিছু করার জন্য ছটফট করছেন। সুযোগ পাচ্ছেন না। অগত্যা নিজের সামান্য সঞ্চয় নিয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অঙ্কুশ' গল্পটি ছবির জন্যে কিনে ফেললেন। প্রচলিত বয় মিটস্ গার্ল মার্কা গল্প নয়, একটু অন্য ধরনের গল্প। আকাঙ্ক্ষা একটি বড় মাপের ছবি করার।

তপনবাবু তাঁর এই ভালো কিছু করার ভাবনাটা পরিচিত কয়েকজনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে

পেরেছিলেন। তাঁরাও এগিয়ে এলেন তাঁদের যথাশক্তি নিয়ে। এই অগ্রণী ব্যক্তিদের একজন হলেন মঞ্জু দে। তিনি তপনবাবুর অন্তরের আগুনের তাপটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই অন্যতম প্রযোজক হবার মানসিকতা নিয়ে নয়, তপন সিংহ পরিচালক হিসেবে নিজেকে প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠিত করুন, এই আকাঙক্ষা নিয়েই হাতে হাত মিলিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রচলিত প্রথার বাইরে 'অঙ্কুশ'-এর মতো একটি অন্য ধরনের ছবির রসগ্রহণের মানসিকতা তখনও বাংলা ছবির দর্শকদের সম্ভবত হয়নি। তাই ছবিটি সুপার ফ্লপ করল। কলকাতা শহরে বোধ হয় সাতদিনের বেশি চলেনি।

এতে তপনবাবু কিছুটা ভেঙে পড়েছিলেন। যাঁরা 'অঙ্কুশ'-এর সময় হাতে হাত মিলিয়েছিলেন তাঁদের দু-একজন হাত গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু মঞ্জু দে ভেঙে পড়েননি, হাত সরিয়েও নেননি। তিনি তপনবাবুকে ক্রমাগত সাহস যুগিয়ে যেতে লাগলেন। দেড় বছরের ব্যবধানে তপনবাবু আবার একটি ছবি পরিচালনা করে ফেললেন। ছবির নাম 'উপহার'। এতে উত্তমকুমার অভিনয় করেছিলেন। মঞ্জু দে রূপ দিয়েছিলেন এক সুরসিকা মমতাময়ী বৌদির চরিত্রে। ওঁদের ওই নতুন প্রোডাকশনের নাম ছিল বাণী চিত্রম্।

'উপহার' মোটামুটিভাবে সাফল্যের মুখ দেখল। তাই মাস ছয়েক পরেই এই প্রোডাকশনেব আরও একটি ছবি বাজারে মুক্তি পেল। এটি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি হাসির গল্প অবলম্বনে তৈরি। 'বরযাত্রী'-র সেই গণশা-ঘোঁতনা-গোরাচাঁদ ইত্যাদিদের আর একটি কাণ্ড। এই ছবির প্রযোজনার সঙ্গে মঞ্জু দে সক্রিয়ভাবে অবশ্যই যুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে কোনও চরিত্রে অভিনয় করেননি। একজন অভিনেত্রীর পক্ষে এই লোভ সংবরণ করা মুশকিল। কিন্তু শ্রীমতী মঞ্জু দে-ব সেই স্পিরিটটা ছিল। ছবির ভালো-মন্দের খাতিরে স্যাক্রিফাইস করবার মানসিকতা তাঁর ছিল।

মঞ্জু দে এই সময়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। একদিকে নিজেদের প্রযোজনা দেখাশোনা করতে হচ্ছে, অন্যদিকে বাইরের প্রয়োজকদের ছবিতেও অভিনয় করতে হচ্ছে। তাঁর এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত এবং কাননদেবী প্রযোজিত 'নববিধান', নীরেন লাহিড়ি পরিচালিত 'কল্যাণী', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বাংলার নারী', অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'শিবশক্তি' এবং 'পথের শেষে', অজয় কর পরিচালিত 'গৃহপ্রবেশ' এবং 'পরেশ', চিত্ত বসু পরিচালিত 'মন্ত্রশক্তি', শ্যাম দাস পরিচালিত 'বীর হাম্বির', বিদ্যাপতি ঘোষ পরিচালিত 'ছায়াসঙ্গিনী', প্রফুল্ল চক্রবর্তী পরিচালিত 'গোবিন্দদাস', বিকাশ রায় পরিচালিত 'সূর্যমুখী' ইত্যাদি। মঞ্জু দে অভিনীত ছবির কথা বলতে গিয়ে এতজন পরিচালকের নাম উল্লেখ করার একটা কারণ আছে। এই সময়কার অধিকাংশ পরিচালক তাঁদের ছবিতে মঞ্জু দে-কে ভয়ানকভাবে চাইতেন। কারণ তিনি সব ধরনের চরিত্রই করতে পারতেন। সামাজিক, ঐতিহাসিক, ধর্মমূলক, দেশাত্মবোধক—সব ধরনের চরিত্র। একজন অভিনেত্রীর এটা একটা বড় গুণ।

এই সময়ে তপন সিংহ বাইরের প্রযোজকের একটি ছবির অফার পেলেন। প্রযোজক-পরিবেশক অসিত চৌধুরি রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিকে ছবি করবার জন্য তপনবাবুকে আহ্বান জানালেন। সেটা ১৯৫৬ সাল। ওই সময়ে মঞ্জু দে-কে দেখেছিলাম 'কাবুলিওয়ালা' ছবিটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে কী প্রাণপাত পরিশ্রমই না করছেন। তিনি যেন তপনবাবুর চলচ্চিত্র-সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী।

'কাবুলিওয়ালা' ছবিতে মিনির চরিত্রে অভিনয় করেছিল টিংকু ঠাকুর। শর্মিলা ঠাকুরের বোন। শর্মিলা তখনও সিনেমায় আসেননি। ওই সময়ে আমি উল্টোরথ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। 'কাবুলিওয়ালা' ছবি রিলিজ করার পর টিংকু ঠাকুরের জয়জয়কার চারদিকে। একটি পাঁচ-ছ বছরের শিশুর কী অসাধারণ অভিনয়।

'কাবুলিওয়ালা' রিলিজ করার পর একবার টিংকু ঠাকুরদের বার্নপুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম টিংকুর সম্পর্কে একটু ভালো করে জানতে। ওর সঙ্গে একটা দিন খেলাধুলো করে ওর মানসিকতা বুঝতে। আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন ফটোগ্রাফার হেমেন মিত্র। হেমেন টিংকুর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ছবি তুলেছিল।

ওই সময়ে টিংকুর মা ইরা ঠাকুরের মুখে শুনেছিলাম টিংকুকে সঠিক অভিনয় করানোর জন্যে মঞ্জু

দে কী অসামান্য পরিশ্রম করেছিলেন। শিশুর সঙ্গে শিশুর মতো হয়ে গিয়ে ওর মেজাজ আর মানসিকতা বুঝে বুঝে কীভাবে কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন। টিংকুর বাবা গীতিন্দ্র ঠাকুরের মুখেও শুনলাম মঞ্জু দে সম্পর্কে অকুণ্ঠ প্রশংসা। গীতিনবাবু তখন বার্নপুরে ইন্ডিয়ান অক্সিজেন অ্যান্ড অ্যাসিটিলিনের জোনাল ম্যানেজার। সাহেবি কেতার মানুষ। অত্যন্ত গম্ভীর এবং রাশভারি। সেই ব্যক্তি যখন মঞ্জু দে-র প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না মিসেস দে 'কাবুলিওয়ালা'-র সেটে কী নিদারুণ কাণ্ডই না করেছিলেন।

এই সময়ে ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিতে মঞ্জু দে একটি উল্লেখযোগ্য ফিগার। দিল্লির ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আরও নানাবিধ কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। ১৯৫৮ সালে তপন সিংহ পরিচালনা করলেন 'লৌহকপাট'। সেই সময়ে আগেকার মতোই তিনি কর্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

এর কিছুদিন পরেই তপন সিংহের সঙ্গে মঞ্জু দে-র বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটে গেল। কী কারণে ঘটল তা আমি জানি না। নানা জনে নানা কথা বলে। আমি সে সব কথার কোনও গুরুত্ব দিই না। তবে মিসেস দে-র সঙ্গে পরবর্তীকালে যখন এ ব্যাপারে কথা হয়েছিল তখন জানতে পেরেছিলাম মঞ্জু দে-র অন্তরের নিদারুণ অভিমানই এর কারণ। ওই ঘটনার পর মানসিক ভাবে ভয়ানক ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। ছবিতে অভিনয়ের সংখ্যা কমিয়ে দিলেন। তারপর একদিন বিলেত পাড়ি দিলেন মনের শান্তি ফেরাতে।

বিলেত থেকে ফিরে এলেন ১৯৬০ সালে। কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করলেন। ১৯৬২ সালে দিল্লির ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এবং তারপর জাকার্তায় ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করলেন।

১৯৬৩ সালে স্টার থিয়েটারের সলিল মিত্রের কাছ থেকে আহ্বান পেলেন মঞ্চে অভিনয় করবার জন্যে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে 'তাপসী' নাটকে অনেকদিন সুনামের সঙ্গে অভিনয় করলেন। ওই প্রথম তাঁর মঞ্চাভিনয়। তারপরই চিত্র পরিচালনায় ব্রতী হলেন।

ওই সময়ে বিরাট একটা এক্সপোজার পেয়ে গেলেন মঞ্জু দে। বাংলা ছবির প্রথম মহিলা চিত্রপরিচালক। ১৯৬৬ সালে তাঁর প্রথম ছবি 'স্বর্গ হতে বিদায়' মুক্তি পেল। মোটামুটি প্রশংসা পেলেন। কিন্তু হইচই ফেলে দিলেন পরের ছবি 'অভিশপ্ত চম্বল' করে। দস্যুরানি পুতলিবাঈয়ের নাম তখন তরুণকুমার ভাদুড়ির উপন্যাসের কল্যাণে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। সবাই অপেক্ষা করে রইল পুতলির চরিত্রে মঞ্জু দে-র অভিনয় এবং তাঁর পরিচালনার দৌড় দেখবার জন্যে।

এই ছবির বেশ কিছুটা অংশের শুটিং মিসেস দে করেছিলেন মধ্যপ্রদেশের ডাকাত অধ্যুষিত চম্বলে গিয়ে। তা নিয়ে কম ফৈজত পোয়াতে হয়নি তাকে। মিসেস দে মধ্যপ্রদেশের পুলিশ প্রধানকে চিঠি লিখলেন কলকাতা থেকে চম্বলে শুটিং-এর পারমিশান চেয়ে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : পাগল হয়েছেন। কোন পুরুষ চিত্রপরিচালককে আমরা এখানে শুটিং-এর পারমিশান দিই না। তা আপনি তো আবার মহিলা।

মঞ্জু দে উত্তর দিলেন : মিসেস ইন্দিরা গান্ধীও তো মহিলা। তিনি কি কোন পুরুষের চেয়ে কোনও অংশে কম? আমাকে মহিলা বলে এতটা আন্ডার-এস্টিমেট করছেন কেন? আমার স্পোর্টস কেরিয়ার আর ফিল্ম কেরিয়ারের সম্পূর্ণ বায়োডাটা তো আপনাকে পাঠিয়েছি। সেটা ভালো করে দেখে ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাচ্ছি।

উত্তরে পুলিশ প্রধান জানালেন : আপনার বায়োডাটা তো সন্তোষজনক। কিন্তু আপনার সঙ্গে সামনাসামনি কথা না বলা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। বুঝতেই তো পারছেন, চম্বল এলাকাটা খুবই বিপদসঙ্কুল। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন আমাদের সঙ্গে দেখা করুন।

সেই সাক্ষাৎকারে পুলিশ প্রধান এতই প্রীত হয়েছিলেন যে শুটিং-এর পারমিশান তো দিয়েইছিলেন, সেই সঙ্গে পুলিশ থেকে শুরু করে মিলিটারি পর্যন্ত দিয়ে সাহায্য করেছিলেন দৃশ্যগ্রহণের কাজে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের এই বদান্যতার কথা শেষ জীবন পর্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে গেছেন মঞ্জু দে।

'অভিশপ্ত চম্বল' ছবি দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। ছবির প্রেস শো-র পর অ্যাভেন্টাইন হোটেলের পার্টিতে এই নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল মিসেস দে-র সঙ্গে। ছবি দেখতে দেখতে বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে এটা কোন মহিলার দ্বারা নির্মিত। কী ডেয়ারিং সব সিকোয়েন্স! কলাকৌশলে সমৃদ্ধ বোম্বাইয়ের ছবিকেও হার মানিয়ে দেয়। আর ওঁর অভিনীত পুতলিবাই চরিত্রের তো তুলনা হয় না। অপূর্ব তাঁর অভিনয়।

মঞ্জু দে যখন ছবি পরিচালনার কাজ করতেন তখন তাঁর একাগ্রতা এবং তন্ময়তা ছিল দেখবার মতো। একটা দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলি।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে একদিন 'অভিশপ্ত চম্বল'-এর শুটিং হচ্ছে। বম্বে থেকে মধুমতী এসেছে একটি নাচের দৃশ্যে অভিনয় করতে। সুতরাং আউটসাইডারদের সেটে ঢোকা নিষেধ। সেটা আমার জানা ছিল না। যেমন অন্যান্য দিন সেটে ঢুকতে যাই সেভাবে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলাম। দ্বাররক্ষী সবিনয়ে জানাল মিসেস দে হুকুম জারি করেছেন আর্টিস্ট আর টেকনিশিয়ান ছাড়া অন্য কেউ যেন সেটে না ঢোকে।

অগত্যা ফিরেই আসছিলাম। এমন সময় ওই ছবির সংগীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্তর সঙ্গে ইন্দ্রপুরীর গেটের সামনে দেখা। উনি স্টুডিওর বাইরে গিয়েছিলেন পান খেতে। ভদ্রলোক খুব ঘন ঘন পান খেতেন। আমাকে চলে যেতে দেখে উনি বললেন . এ কী রবিবাবু, আপনি চললেন কোথায়? আমাদের সেটে যাবেন না?

আমি একটু হেসে বললাম : আজ তো সেটে নো অ্যাডমিশান।

সুধীনবাবু আমার একটা হাত ধরে বললেন সে সব অন্য লোকের জন্যে। আপনাদের জন্যে নয়। আসুন আমার সঙ্গে।

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম তা হয় না। নিষেধ যখন করেছেন তখন সেটা আমাদের মেনে চলা উচিত।

সুধীনবাবু বললেন : প্লিজ রবিবাবু, আমার সঙ্গে আসুন। একটা মজার গান লিখেছি আর সুরটাও একটু অন্যরকম দিয়েছি। মধুমতীর মুখে থাকবে। সেটাই আজ নাচের সঙ্গে টেক্ করা হচ্ছে। আপনি গানটা শুনলে আমি আনন্দ পাব। তাছাড়া সেটা নিয়ে আলোচনাও করতে পারব।

এই গান নিয়ে আলোচনা সুধীনবাবুর সঙ্গে আমার প্রায়শই হত। ওঁর বাড়িতে কিংবা স্টুডিওতে তো বটেই, রাস্তাঘাটে দেখা হলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাংলা গানের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিয়ে আলোচনা করতাম। একবার সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর টালার বাড়িতে সুধীনবাবু তাঁর সদ্য সুর করা দুটি গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। উনি তখন সিঁথিতে থাকতেন। গান দুটি তারাশঙ্করবাবুর লেখা। অগ্রগামী পরিচালিত 'ডাকহরকরা' ছবিতে পরে ব্যবহার করা হয়েছিল। তা সেই অপূর্ব সুর করা গান দুটি নিয়ে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা হয়েছিল। সেদিন আমরা প্রায় খেতেই ভুলে গিয়েছিলাম।

সেই সুধীনবাবুর সেটে যাবার আমন্ত্রণ এড়ানো মুশকিল। তবু মনটা খুঁত খুঁত করছিল। বললাম: মিসেস দে আবার কিছু মনে করবেন না তো?

সুধীনবাবু বললেন : কিচ্ছু মনে করবেন না। উনি আমাকে বলেই রেখেছেন সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কাউকে দেখতে পেলে যেন সেটে ডেকে নিয়ে আসি। তারপর একটু চোখ নাচিয়ে রসিকতার সুরে বললেন : আপনাকে আমি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করতে পারি তো? আপনি কী বলেন?

আমি বললাম : ওসব রসিকতার কথা রাখুন। সেটের বাইরের এই গুরুত্ব সেটের ভিতরে মিসেস দে-র ভুরু কোঁচকানোর দরুন যদি লঘুত্ব পেয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার চিরকালের জন্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে।

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুধীনবাবু দু'পা এগিয়ে গিয়ে স্টুডিওর এক কোণে জমানো জঞ্জালের ওপর বেশ খানিকটা পানের পিক্ ফেললেন। তারপর ফিরে এসে ভারি গলায় বললেন : মুখ দেখাদেখি তো বন্ধ হবেই রবিবাবু। একদিন না একদিন তো আমাদের এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেউ আগে আর কেউ বা পরে। তখন তো আর মুখ দেখাদেখির কোন প্রশ্নই থাকবে না।

তা সেই সুধীন দাশগুপ্ত সত্যিই মুখ দেখাদেখির পালা সাঙ্গ করে অকালে চলে গেলেন। কলামন্দিরে তাঁর স্মৃতিবাসরে বসে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আমাদেব সেই কথোপকথনেব কথা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল আর দু'চোখ জলে ভরে যাচ্ছিল। আমার পাশে বসে ছিলেন আমাব বন্ধু চিত্রনাট্যকার প্রশান্ত দেব। তিনি আমার চোখে জল দেখে বলে উঠেছিলেন : সুধীনবাবুর মৃত্যুটা আপনাকে বড্ড আপসেট করে দিয়েছে দেখছি।

তা ওসব চোখের জলের আর দীর্ঘশ্বাসের কথা থাক। সুধীনবাবুর হাত ধরে সেদিন হাসতে হাসতে সেটের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম। সুধীনবাবুর সঙ্গে আমাকে আবার ফিবে আসতে দেখে দ্বাররক্ষীর চোখে মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল। সুধীনবাবু গম্ভীরভাবে তার দিকে না তাকিয়েই বলে দিলেন : ডিরেকটারের গেস্ট।

দ্বাররক্ষী সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল।

ভিতবে ঢুকে দেখলাম এলাহি কাণ্ড। জনৈক ডাকাতসর্দাব রূপাব বাড়িতে নাচ-গানের আসব বসেছে। ঝলমলে সেট। ততোধিক ঝলমলে পোশাকে মধুমতী নাচতে নাচতে সুধীন দাশগুপ্ত রচিত এবং সুরকৃত একখানি গান গাইছেন। গানটির কথা এই মুহূর্তে কিছুতেই মনে আসছে না। হিন্দি এবং বাংলা দুই ভাষায় রচিত বেশ মজাদার গান। সেই সময় গানটি খুব হিট্ করেছিল। রেডিওর অনুরোধের আসরে প্রায়ই বাজাত। বেশ জমকালো সুর। অত চালু একটা গানের কথা আজ আর কিছুতেই মনে পড়ছে না। এটা বোধহয় বয়সের দোষ।

শ্রীমতী মঞ্জু দে-কে দেখলাম খুবই ব্যস্ত। একবার ক্যামেরাম্যানের কাছে গিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন। আবাব মধুমতীর কাছে গিয়ে তাকে স্টেপিং-এর ব্যাপারটা দেখিয়ে দিচ্ছেন নৃত্যপরিচালককে পাশে নিয়ে। ক্যামেরার ফ্রেম সম্পর্কে বার বার সচেতন কবে দিচ্ছেন। সারা সেট তটস্থ হয়ে আছে। পান থেকে চুনটুকু খসলেই চিৎকার চ্যাঁচামেচি করছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে শিল্পী থেকে শুরু করে টেকনিশিয়ানরা পর্যন্ত ভয়ে কেঁচো হয়ে আছে।

এর মধ্যে একবার ঘুরতে ঘুরতে আমার সামনে এসে গেলেন। মাত্র দু'হাতের ব্যবধান। কিন্তু তিনি যেন আমাকে চিনতেই পারছেন না। অন্য সময়ে দশ হাত দূবে থেকেও ওঁর মুখেব মিষ্টি হাসি উপহার পাই।

তবে কি তাঁর সেটে অনধিকার প্রবেশের জন্য তিনি আমার ওপর বিরক্ত?

কাউকে কিছু না বলে সেট থেকে বেরিযে যাব কিনা ভাবতে লাগলাম।

'অভিশপ্ত চম্বল' ছবির সেটে শ্রীমতী মঞ্জু দে-র সেই আমাকে দেখেও না দেখার ব্যাপারটি আমাকে ভীষণভাবে আহত করেছিল। কাউকে কিছু না জানিয়েই সেটা পরিত্যাগ করব বলে স্থির করে ফেললাম।

আমার এই মুহূর্তের মানসিক অবস্থা বোধহয় সুধীন দাশগুপ্ত বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিই আমাকে সেটে ডেকে এনেছেন, কাজেই তাঁর একটা চোখ সবসময়েই আমার ওপর ছিল।

সুধীনবাবু সুরের জগতের মানুষ। দীর্ঘদিন সংগীতের মধ্যেই ডুবে আছেন। কাজেই কখন কোন্ মনে কোন্ রাগের খেলা চলছে তা তাঁর পক্ষে ধরে ফেলা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। সেট থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্যে আমাকে দু-এক পা এগোতে দেখেই তিনি ত্বরিতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে তিনি আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই মঞ্জু দে-র সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন : এই দেখুন, রবিবাবু এসেছেন।

মিসেস দে আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললেন : ওমা, আপনি কখন এলেন? আসুন আসুন, বসুন। ওরে, রবিবাবুকে একটা মোড়া দে বসবার জন্যে।

আমি তো অবাক। গত আধ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত বার দশেক ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে, একবার তো মাত্র হাত দুয়েকের দূরত্ব, অথচ একটিবারের জন্যেও ওঁর চোখে পরিচিতির সামান্য ঝিলিকও দেখা যায়নি। অথচ এই মুহূর্তে একবারে রাজকীয় সমাদর। এর সবটাই কি ওঁর অভিনয়?

ততক্ষণে আমাদের জন্যে দুটি আসন এসে গেছে। শ্রীমতী মঞ্জু দে-র জন্যে একখানা 'ডিরেকটার' লেখা চেয়ার আর আমার জন্যে একটি সুদৃশ্য মোড়া। পাশ ফিরে দেখলাম সুধীনবাবু নেই। আমাকে

মিসেস দে-র সামনে পেশ করেই উনি সরে পড়েছেন।

চেয়ারটায় বসতে বসতে মিসেস দে বললেন : কী খাবেন বলুন, চা না কফি?

আমি বললাম : যা হয় বলুন।

মিসেস দে ইঙ্গিতে প্রোডাকশনের একটি ছেলেকে ডাকলেন। বললেন : রবিবাবুকে কফি দে।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল : দিদি, আপনার জন্যেও বলি?

মিসেস দে বললেন : না রে বাবা, না। সকাল থেকে অনেক চা-কফি খেয়েছি। রাত্রে ঘুম হলে হয়।

ছেলেটি চলে গেল। মিসেস দে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : এক মিনিট!

এই বলে তিনি ত্রস্ত পায়ে যেখানে নতুন করে ক্যামেরা বসানো হচ্ছিল সেদিকে ছুটে গেলেন। বেশ উচ্চকণ্ঠেই বললেন : না না, ওখানে নয়, ওখানে নয়। এখানে—এই জায়গাটায় বসাও।

বলে ডান পা-টা দাপাতে দাপাতে সঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। এবং যথাস্থানে ক্যামেরা না বসা পর্যন্ত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটু পরে ফিরে এসে নিজের 'ডিরেকটার' লেখা চেয়ারটাতে শরীর এলিয়ে দিলেন শ্রীমতী মঞ্জু দে।

এই ডিরেকটারের চেয়ার সম্পর্কে আমার একটা মজার অভিজ্ঞতা আছে। একবার কোন্ একটা সেটে ঢুকে একটা চেয়ার খালি দেখে তাতে বসে পড়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে প্রচণ্ড হাততালি। ওই হাততালির উৎস খুঁজে পাবার জন্যে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় ওই ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজার এসে বললেন : রবিদা, দশটা টাকা দিন।

আমি বললাম : কেন?

প্রোডাকশন ম্যানেজার বললেন : ওই যে আপনি ডিরেকটারের চেয়ারে বসেছেন। সবাই হাততালি দিল। এদের সবাইকে রসগোল্লা খাওয়াতে হবে।

সেদিন কড়কড়ে দশটি টাকা সেলামি দিতে হয়েছিল। টাকাটা দিতে দিতে ভাবছিলাম, ডিরেকটারের চেয়ারের টিকিটের দাম মেট্রো সিনেমার ব্যালকনির সিটেরও ডবল। এই ইন্ডাস্ট্রির উন্নতি ঠ্যাকায় কে!

যাক, আবার মঞ্জু দে-র কাছেই ফিরে আসি। মিসেস দে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন : আপনার কফিটা এখনও দেয়নি! এরা যে কী করে!

আমি বললাম : কফি আসছে। তার আগে আপনি আমার একটা কথার উত্তর দিন দেখি।

মিসেস দে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন : কী বলুন?

আমি বললাম : প্রায় আধ ঘণ্টা আগে আমি আপনার সেটে এসেছি। তার মধ্যে অন্তত দশবার আপনার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। একবার তো হ্যান্ডশেক ডিসট্যান্সে আপনার মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু আপনি একটা মুহূর্তের জন্যেও আমাকে রেকগনাইজ করেননি। এর কারণটা কী? আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি, না চিনতে চাননি?

আমার কথা শুনে মিসেস দে হেসে ফেললেন। বললেন : হ্যান্ডশেক ডিসট্যান্সে ছিলাম তো হাতটা এগিয়ে দিলেন না কেন? উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যেতেন।

তারপর একটু গলাটা নামিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন : বিশ্বাস করুন রবিবাবু, আমি আপনাকে একবারের জন্যেও খেয়াল করে দেখিনি। আসলে কী জানেন, আমি যখন কাজ করি তখন সেটের ওই লাইটকরা জোনটুকু ছাড়া আর কিছুই চোখের সামনে থাকে না। সবটাই ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়। এমনকি মাঝে মাঝে নিজের শরীরের অস্তিত্বটুকুও টের পাই না। মনে হয় আমি যেন শূন্যে ভাসছি।

কথাগুলো বলতে বলতে ওঁর চোখ মুখ কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। আর আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। নিজের কাজের প্রতি এরকম ইনভলভমেন্ট তো সচরাচর দেখা যায় না। এ ভদ্রমহিলা অনেকদূর এগোবেন।

তা তিনি এগিয়েওছিলেন। অভিশপ্ত চম্বলের কাহিনী নিয়ে কী দারুণ ছবি যে তিনি বানিয়েছিলেন তা যাঁরা না দেখেছেন তাঁরা সত্যিই কিছু মিস করেছেন। জানি না এখন ওই ছবির প্রিন্ট আর আছে কিনা।

যদি থাকে তবে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব ওই ছবিটা একবার অন্তত দেখাতে। বর্তমান প্রজন্মের যে সব ছেলেপুলেরা হিন্দি ছবি নিয়ে এত নাচানাচি করেন, তাঁরা দেখতে পেতেন এই বাংলার মাটি থেকেই একজন বাঙালি মহিলা হিন্দি ছবির সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো ছবি একদা করেছিলেন।

ইতিমধ্যে আমার কফি এসে গিয়েছিল। মিসেস দে নিজে হাতে কফির কাপটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন . প্যাক-আপ হবার আগে চলে যাবেন না যেন। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

সেদিন শুটিং-এর পর মিসেস দে-র সঙ্গে ওঁর টালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়েছিলাম। এখন যে জায়গায় স্বামী শুভানন্দর শুভাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই একশো নম্বর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস রোডে আগে মঞ্জু দে-র বাড়ি ছিল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত মঞ্জু দে-র মুখ থেকে মধ্যপ্রদেশের চম্বল অঞ্চলে ওঁর ছবির শুটিং-এর নানা অভিজ্ঞতার কথা শুনেছিলাম। দুর্ধর্ষ ডাকাতরা যে ছদ্মবেশে ওঁর শুটিং দেখতে আসতেন সে কথাও জেনেছিলাম। বেশ লোমহর্ষক সে সব বিবরণ। আসবার সময় মিসেস দে 'অভিশপ্ত চম্বল' ছবির কিছু স্টিল আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছাপবার জন্যে অনুরোধ করে জানিয়েছিলেন : আমি যে এ ছবির প্রোডিউসার সেটা তো জানেনই। সেই সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউশানটাও নিজের হাতে রাখছি। অচ্যুৎবাবু নামে এক ভদ্রলোককে পেয়েছি। উনি মিস্টার আয়ারেব ডিস্ট্রিবিউশান অফিসে কাজ করতেন। ভদ্রলোক খুব এফিশিয়েন্ট। পাবলিসিটির ব্যাপারটা আপনারা একটু দেখবেন কাইন্ডলি।

মিস্টার আয়ার মানে মিস্টার ভি এ পি আয়াব। ওঁর ডিস্ট্রিবিউশান কোম্পানির নাম ছিল বোধহয় ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স। মাদ্রাজেব এ ভি এম-এর সব ছবির ওঁরাই ছিলেন পূর্বাঞ্চলের পরিবেশক। মিস্টার আয়ার ছিলেন নিপাট ভদ্রলোক। দক্ষিণ ভাবতের লোকেরা এমনিতেই খুব সজ্জন হয়। মিস্টার আয়ার ছিলেন সজ্জনতর ব্যক্তি। উনি এখন আব বেঁচে নেই। ওঁর ডিস্ট্রিবিউশান কোম্পানিও উঠে গেছে। তবে ওঁব ছেলে বাজু এখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত। রাজু 'ওরো' ফিল্ম কোম্পানির জোনাল ম্যানেজার। পার্ক সার্কাসে ওর অফিস। ঠিক বাবাব মতোই রাজুও বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মানুষদের নানাভাবে সহায়তা কবে।

'অভিশপ্ত চম্বল' রিলিজ করার পর কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, এ ছবি সুপার হিট। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ টাকা আসতে লাগল ছবির বিক্রি থেকে।

কিন্তু সে টাকার সিংহ ভাগটাই হাতছাড়া হয়ে গেল মঞ্জু দে-র। ওঁর এক পরম আত্মীয়কে উনি বসিয়েছিলেন ডিস্ট্রিবিউশান অফিসে। টাকাকড়ির লেনদেন সব তাঁর মারফতই হত। কালক্রমে দেখা গেল সে ভদ্রলোক বেশিরভাগ টাকাটাই নিজের কুক্ষিগত করে ফেলেছেন।

এ নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছিল। কিন্তু টাকাটা আর উদ্ধার করা যায়নি। ফলে শ্রীমতী মঞ্জু দে একেবারেই ভেঙে পড়লেন। শরীর এবং মন উভয় দিক থেকেই।

এর আগে তপন সিংহের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে একপ্রস্থ মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। পরে সেটা সামলে নিয়ে একটা ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু এবারের আঘাতের পর আর মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। আশির দশকের গোড়ার দিকে ওঁকে তো লাঠি নিয়ে চলাফেরা করতে হত। তারপর একদিন স্বামী শুভানন্দজির সংস্পর্শে এসে মঞ্জু দে-র জীবনে একটা মিরাকল ঘটে গেল। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে ওঁর 'শজারুর কাঁটা' ছবি পরিচালনার ঘটনাটা বলে নিই।

সত্যজিৎ রায় আর অসিত সেন ছাড়া মঞ্জু দে বাংলা ছবির প্রায় সব বড় পরিচালকের সঙ্গেই কাজ করেছিলেন। তপন সিংহের ছবির সঙ্গে তো তিনি ঘোরতরভাবে জড়িত ছিলেন। এছাড়া দেবকী বসু, হেমেন গুপ্ত, নীরেন লাহিড়ী, নরেশ মিত্র, অজয় কর প্রমুখ পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার কথা তো আগেই বলেছি। মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে তিনি কাজ করেছেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তরুণ মজুমদারের দুটি ছবিতে। প্রথমটি 'কাঁচের স্বর্গ'। সে ছবিতে মঞ্জু দে-র কী ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয়। আর দ্বিতীয় ছবি 'পথ ভোলা'। এই ছবিতে এক সহায়সম্বলহীন খ্রিস্টান মহিলার চরিত্রে তাঁর কী অসাধারণ অভিনয়। সে অভিনয়ের কথা আজও ভুলতে পারিনি। আর এটাই মঞ্জু

দে-র জীবনের সবশেষ চলচ্চিত্রাভিনয়।

১৯৬৭ সালের সেই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর মঞ্জু দে আবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন প্রচণ্ড মানসিক শক্তির জোরে। আবার দুটো একটা করে ছবিতে অভিনয় করতে লাগলেন। নিতান্ত আর্থিক প্রয়োজনেই বাধ্য হয়ে বিশ্বরূপা মঞ্চে যোগ দিলেন 'চৌরঙ্গী' নাটকে অভিনয় করতে। নতুবা সিনেমাই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। মঞ্চে অভিনয় করেছেন, যাত্রাপালায় অভিনয় করেছেন, কিন্তু সিনেমায় কাজ করার মতো মানসিক তৃপ্তি পাননি আর কোথাও।

এই সময়ে শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের লেখা অপরাধমূলক কাহিনী 'শজারুর কাঁটা' ছবি করার কথা তিনি ভাবেন। 'দেশ' পত্রিকায় যখন ধারাবাহিকভাবে 'শজারুর কাঁটা' প্রকাশিত হচ্ছিল তখন থেকেই তা মিসেস দে-র সারা মনটাকে অধিকার করে বসেছিল। এখন সেই কাহিনী ছবি করার কথা ভাবলেন এবং চিত্রনাট্যের কাজও শুরু হয়ে গেল। তারপর একদিন চিত্রনাট্য শোনাতে বসলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

শরদিন্দুবাবু তখন বোম্বাই ছেড়ে পুনেতে বসবাস করেন। মাঝে মাঝে কলকাতা আসেন। সেবারে কলকাতায় আসামাত্রই মঞ্জু দে শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

চিত্রনাট্য শুনে শরদিন্দুবাবু বলে উঠলেন মঞ্জু তুমি করেছো কী! আমি নিজে অনেকদিন অনেক চিত্রনাট্যের সঙ্গে জড়িত থেকেছি কিন্তু তোমার এই চিত্রনাট্য তো আমাকে পাগল করে দিয়েছে। আমার এই গল্পটাকে তুমি এমন অদ্ভুতভাবে পাটে পাটে বুনেছো আর শেষ পর্যন্ত পুরো সাসপেন্সটাকে বজায় রেখে যেভাবে টেনে নিয়ে গেছো তাতে তোমাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতে ইচ্ছে করছে। কাস্টিংটা ভালো কোরো, তাহলে আর তোমার এ ছবির মার নেই।

কিন্তু মঞ্জু দে-র তখন পয়সার বড়ই অভাব। সুতরাং কাস্টিংটাকে জোরালো করা গেল না। আর শুটিং হয়েছিল চূড়ান্ত দৈন্যদশার মধ্যে। খেপে খেপে, থমকে থমকে। এমনও দিন গেছে যখন দুটো শো থিয়েটার করার পর সারা রাত জেগে শুটিং করতে হয়েছে।

ফল যা হবার তাই হল। অত শক্ত বাঁধুনি সত্ত্বেও ছবি জনপ্রিয় হল না। মঞ্জু দে মানসিকভাবে একেবারেই ভেঙে পড়লেন।

মঞ্জু দে কোনওদিন ভাবেন নি, অর্থের প্রয়োজনে তাঁকে একদিন মুখে চড়া রঙ মেখে যাত্রার আসরে নামতে হবে। অর্থের প্রয়োজনে শেষ পর্যন্ত তাও করতে হল। ১৯৭৫-৭৬' এর মরসুমে নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার 'পসারিণী'তে তাঁর প্রথম যাত্রাভিনয়। সেখানে তিনি প্রচুর টাকা পেয়েছেন, সর্বক্ষণ ব্যবহারের জন্য গাড়ি পেয়েছেন, পারিপার্শ্বিকের কাছ থেকে সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা পেয়েছেন, কিন্তু যাত্রাশিল্প তাঁর মন জয় করতে পারেনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরেছিল। যাত্রায় মঞ্জু দে তাঁর জীবনের শেষ অভিনয়ে এমন একটা চরিত্র পেয়েছিলেন, যা তাঁকে আপ্লুত করে তুলেছিল। সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সেই অভিনয়ের প্রশংসা। একটা বিরাট মর্যাদায় তিনি ভূষিত হয়েছিলেন।

অথচ তার আগে পর্যন্ত যাত্রা তাঁর কাছে ছিল অর্থোপার্জনের একটি মাধ্যম মাত্র। হৃদয়ের কোনও টান সেখানে ছিল না। তার কারণ, আমার মনে হয়, যাত্রায় যোগদানের পূর্ব মুহূর্তে তিনি একজন পরাজিত মানুষ। সিনেমা ওয়ার্ল্ডে তিনি পায়ের নিচের মাটিটা পাকা করে নিতে পারেননি। তাঁর কোনও স্ব-সাম্রাজ্য তৈরি হয়নি। এই ক্ষোভ তাঁর মনটাকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পরবর্তীকালে আমার সঙ্গে কথোপকথনের সময় শ্রীমতী মঞ্জু দে এটা প্রকারান্তরে স্বীকার করেও নিয়েছিলেন।

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার 'পসারিণী' ছাড়াও মঞ্জু দে জনতা অপেরার 'ফুলন দেবী' পালায় অভিনয় করেছেন এবং ক্যালকাটা অপেরার 'অভিশপ্ত চম্বল' পালাটি পরিচালনা করেছিলেন। সিনেমায় যে অভিশপ্ত চম্বল করে খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছিলেন, যাত্রায় কিন্তু সেই জায়গায় পৌঁছোতে পারেননি।

এরপরই ঘটে গেল মঞ্জু দে-র জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি। উচ্চশিক্ষিত আলোকপ্রাপ্তা সাহেবি ভাবাপন্ন এই মহিলাটি এমন এক জীবনের সন্ধান পেলেন, যে জীবনের জন্য কয়েক জন্ম তপস্যা করতে হয়।

আজ্ঞে না, এটা আমার কথা নয়। এটা শ্রীমতী মঞ্জু দে-র নিজের মুখের কথা। ভবানীপুরে ইন্দ্র রায় রোডে পুরনো শুভাশ্রমের তিনতলায় বসে মিসেস দে এক অলস অপরাহ্নে তাঁর এই নতুন উপলব্ধির কথা আমাকে শুনিয়েছিলেন।

এটা ১৯৮১ সালের কথা। শ্রীমতী মঞ্জু দে তখন নিদারুণ রোগগ্রস্ত। চলাফেরা করতে হয় যষ্টিনির্ভর হয়ে। ওই সময়ে বড়দির এক আত্মীয়া তাঁর বাড়িতে আসতেন ব্যবসার প্রয়োজনে। বড়দি, অর্থাৎ প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী সুপ্রভা সরকার। আমরা ওঁকে বড়দি বলে ডাকতাম। বড়দির ওই আত্মীয়া কাপড়ের ব্যবসা করতেন। দামি দামি কাপড়। সেই সূত্রে তাঁর মঞ্জু দে-র বাড়িতে আসা।

ওই ভদ্রমহিলার গলায় একটি রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। অনেকটা ইন্দিরা গান্ধীর গলার রুদ্রাক্ষের মালার মতো। আকারে একটু ছোট। কিন্তু দেখতে ভারি সুন্দর। মঞ্জু দে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন . তোমার গলার মালাটি ভারি সুন্দর তো' কোথা থেকে কিনেছো?

মেয়েটি উত্তর দিলে · এটি আমার গুরুদেব আমাকে দান করেছেন।

মিসেস দে বললেন : তোমার গুরুদেব? কী নাম তাঁর? থাকেন কোথায়?

মেয়েটি বললে : নাম বললে তাঁকে চিনবেন না। ভবানীপুরের ইন্দ্র রায় রোডে একটি ছোট্ট আশ্রম করে থাকেন। তাঁর কোনও প্রচার নেই। কিন্তু সত্যিকারের একজন মহাপুরুষ বলতে যা বোঝায়, তিনি তাই।

মঞ্জু দে এই মেয়েটির অতিশয়োক্তিতে চমকালেন না। সকলেই তাঁর গুরুদেবকে মহাপুরুষ ভাবে। তবু তাঁর একটু কৌতূহল হল। বললেন . আমাকে নিয়ে যেতে পারবে তোমার গুরুর কাছে?

মেয়েটি বললে কেন পারব না। তিনি খুব মানুষ ভালোবাসেন। আজই চলুন না।

মেয়েটির সঙ্গে সেইদিনই ইন্দ্র রায় রোডের শুভাশ্রমে স্বামী শুভানন্দের কাছে গেলেন একটি ট্যাক্সি করে। যাবার একটা কারণও ছিল। গত মাস ছয়েক ধরে স্বপ্নের মধ্যে মিসেস দে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষের দর্শন পাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে যেন হাত তুলে অভয় দিচ্ছেন। তাঁর শিক্ষিত যুক্তিবাদী মন এই ব্যাপারটার কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না। একবার কি দু'বার যে কোনও স্বপ্নই মানুষ দেখতে পারে। কিন্তু একই স্বপ্ন ছ'মাস ধরে ক্রমাগত দেখে যাওয়া—এটা কেমন করে সম্ভব'

শুভাশ্রমে পা দিয়েই চমকে উঠলেন মঞ্জু দে। তাঁর স্বপ্নে দেখা জ্যোতির্ময় পুরুষটি তাঁর সামনেই বসে আছেন। তাঁর মুখে মৃদু মৃদু হাসি। তিনি বললেন : আসুন মঞ্জুদি, আসুন। আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না মিসেস দে। এতকালের আরব্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান, যুক্তি তর্ক সব কোথায় ভেসে গেল। স্বামী শুভানন্দের পায়ের ওপর আছড়ে পড়লেন তিনি।

এই গুরু-কাহিনী মিসেস দে শুধু আমার কাছেই বলেননি, কলকাতা দূরদর্শনের এক সাক্ষাৎকারেও বলেছেন। সেই সাক্ষাৎকারের তিন ভাগ জুড়ে ছিল গুরু স্বামী শুভানন্দের কথা।

এই স্বামী শুভানন্দের সঙ্গে আমার পরবর্তীকালে আলাপ হয়েছে। তাঁর সিদ্ধিলাভের ঘটনাও আমি শুনেছি। কিছু কিছু মিরাকল ঘটিয়েছেন তিনি। কিন্তু সেসব আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার সঙ্গে এই নিবন্ধের কোনও যোগ নেই।

এই শুভাশ্রমে বসে আমি শ্রীমতী মঞ্জু দে-র জীবনের নানা সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনেছি। শুনেছি তাঁর রোগমুক্তির কথা। যিনি প্রচণ্ড রোগের দাপটে লাঠি ছাড়া চলতে পারতেন না, কয়েক মাসের মধ্যে তরতর করে তিনি পাহাড়ে চড়েছেন। ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে হিমালয় পাহাড়ের তেজস্বিনী গঙ্গার বুকে ডুব দিয়ে কেমন করে শিবলিঙ্গ পেয়েছেন। ওই বছরের মার্চ মাসে তিনি দীক্ষা নিয়েছেন। সেই থেকে গুরুদেবই তাঁর জীবনের সব। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও কাজ করতেন না।

যে কারণে বর্ণপরিচয় যাত্রা সংস্থার পক্ষ থেকে যখন তাঁর কাছে 'বিশ্ববরেণ্য ইন্দিরা' পালায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে রূপ দেবার প্রস্তাব এল তখন তিনি তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন স্বামী শুভানন্দের কাছে। প্রস্তাবটি এনেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির পার্থ সেনগুপ্ত, সাহিত্যিক গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু এবং তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী শ্রীমতী সবিতা বসু। স্বামী শুভানন্দ তাঁদের বললেন : মঞ্জুদি নিশ্চয় করবেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের মা। সারা ভারতবর্ষের মা। তাঁর চরিত্র করতে পারা তো মঞ্জুদির ভাগ্যের কথা।

তা ওই চরিত্রে আসাধারণ অভিনয় করেছিলেন মঞ্জু দে। বাংলার গ্রামে গঞ্জে মহানগরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ওঁর অভিনীত ইন্দিরা চরিত্রের প্রশংসা। সুদূর দিল্লিতেও তা পৌঁছে গিয়েছিল। শ্রীমতী শীলা কল নিজে উদ্যোগী হয়ে দিল্লিতে 'বিশ্ববরেণ্য ইন্দিরা' যাত্রাপালার শো করিয়েছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামনে।

শ্রীমতী মঞ্জু দে-র সারা জীবনটাই ছিল উত্থান আর পতনে ভরা। কখনও আলো আবার কখনও অন্ধকার। ভাগ্যের হাতে ক্রমাগত মার খেতে খেতে তিনি শেষ পর্যন্ত শান্তির আশায় ঈশ্বরের চরণে শরণ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও কি শেষ পর্যন্ত তিনি স্থিতধী থাকতে পেরেছিলেন? মনে হয় না। তা যদি হবে তাহলে কেন তিনি মহাকালের আরতির সময় গুরুবন্দনার শেষে আমার কানে কানে বলেছিলেন : দেখবেন রবিবাবু, আমি আবার উঠে দাঁড়াব। আবার ছবি করব। নিদেন পক্ষে একটা টিভি সিরিয়াল। মরবার আগে আমি ছবি করবই করব।

কিন্তু সে আশা তাঁর পূর্ণ হয়নি। ধীরে ধীরে মৃত্যু এসে তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। বড় নিঃসঙ্গ, বড় করুণ সেই মৃত্যু।

এই দুঃখী মহিলাটির কথা ভাবলে সত্যিই চোখে জল এসে যায়।

নীতীশদা

ইংরেজরা যাঁকে নিয়ে হিমসিম খেত, সেই নবাব মিরকাশিমকে এই রকম একটি নোংরা সিঙাড়া কচুরির দোকানে দেখে চমকে উঠেছিলাম। প্রথমটায় ঠিক চিনতে পারিনি। মাথায় উষ্ণীশ নেই, মুখে দাড়ি নেই, শরীরে জমকালো নবাবি পোশাক নেই, চিনব কী করে। তার বদলে চাঁছাছোলা মুখ, মাথায় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী টাক, বুভুক্ষুর মতো কাঁউ কাঁউ করে তরকাবি আর হিংয়ের কচুরি খাচ্ছেন। কিন্তু ওই গোল গোল ভাঁটার মতো চোখ, ওই তীক্ষ্ণ চাউনি, ওটা যে বড্ড চেনা! কোথায় দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

হঠাৎ ভদ্রলোকের মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল : আমার ক'টা হল হে?

যে লোকটি খাদ্যাদি পরিবেশন করছিল, সে মনে মনে কিছু একটা হিসেব করে নিয়ে বলল : দশটা হয়েছে।

ভদ্রলোক আঙুলেব তরকারি চাটতে চাটতে বললেন : তাহলে আর দু'খানা দিয়ে দাও।

লোকটি বললে : দু'মিনিট বসুন বাবু। কড়ায় কচুরি ছেড়েছে। আপনার তো আবার ঠাণ্ডা হলে চলবে না।

ভদ্রলোক চোখ তুলে দোকানের দেওয়ালে টাঙানো কালিপড়া ঘড়িটার দিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বললেন : তাড়াতাড়ি কর। দেরি হলে আবার বড়বাবুর ধাতানি খেতে হবে।

ওই মেঘডাকা কণ্ঠস্বরের দৌলতেই ভদ্রলোকের মুখের ওপর থেকে অচেনার আবরণটুকু সরে গেল। আরে, ইনিই তো নীতীশ মুখার্জি। 'চন্দ্রশেখর' ছবির দাপুটে নবাব মিরকাশিম।

এটা ১৯৪৮ সালের একেবারে গোড়ার দিকের কথা। মাস দুয়েক আগে দেবকী বসু পরিচালিত 'চন্দ্রশেখর' মুক্তি পেয়েছে উত্তরা সিনেমায়। প্রথম শোতেই লাইন দিয়ে অনেক মারপিট দাঙ্গা করে ওই ছবি দেখে এসেছি। 'চন্দ্রশেখর' ছবি নিয়ে তখন সারা কলকাতায় মাতামাতি। প্রতাপ আর শৈবলিনীর চরিত্রে অশোককুমার আর কাননদেবীকে নিয়ে সারা কলকাতায় প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস। আমার বিশ বছর বয়েসের তরুণ চিত্তও সেই উচ্ছ্বাসের অংশভাগী। কিন্তু অশোককুমার আর কাননদেবীর পাশাপাশি আরও দুটি চরিত্র আমার দারুণ ভালো লেগেছিল। কিন্তু তাঁদের নিয়ে তেমন কোন উচ্ছ্বাস নেই। একজন হলেন চন্দ্রশেখরের চরিত্রে ছবি বিশ্বাস, আর একজন মিরকাশিমের চরিত্রাভিনেতা এই নীতীশ মুখার্জি। প্রথম জনের ধীর স্থির সংযত অভিনয়, আর দ্বিতীয়জনের দোর্দণ্ড দাপট। আমার এই ভালো লাগার কথাটা সেদিন কাউকে বলতে পারিনি। বললে হয়তো পাড়ার সর্বজ্ঞদের কাছে কটাক্ষ শুনতে হত : অভিনয়ের তুমি কী বোঝো হ্যা?

কিন্তু আমার ভালো লাগাটা তো আমার কাছে মিথ্যে নয়। তাই ওই কচুরির দোকানে বসে পরম কৌতূহল নিয়ে আমার ভালো লাগা মানুষটিকে দু'চোখ ভরে দেখতে লাগলাম। বলা যায় চোখ দিয়ে গিলে খেতে লাগলাম।

ভদ্রলোক তখন আঙুল দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে চাটনিতে টাখনা দিচ্ছেন। আঙুল চাটতে চাটতেই বললেন . আজকের চাটনিটা তো তেমন সুবিধের হয়নি হে।

বলতে বলতেই আবার ঘড়ির দিকে নজর পড়ল তাঁর। হুড়মুড় করে উঠে পড়লেন সিট ছেড়ে। তারপর নোংরা বেসিনটার ওপর হুমড়ি খেয়ে সশব্দে কুলকুচো করতে লাগলেন।

নীতীশ মুখার্জির এই যে তরিবত করে কচুরি খাওয়া, এটা কিন্তু একদিনকার ব্যাপার নয়। উনি তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ির শ্রীরঙ্গম মঞ্চে (এখন যার নাম বিশ্বরূপা) নিয়মিত অভিনয় করতেন। আর থিয়েটারের দিন রাজা- রাজকিষণ স্ট্রিট আর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের মোড়ের ওই বিখ্যাত কচুরির দোকান থেকে ছ'আনায় কচুরি খেতেন। তখনও পয়সায় দশমিকের হিসেব চালু হয়নি। দু'পয়সা করে দাম ছিল এক-একটা কচুরির। ছ'আনায় বারোখানা কচুরি। সেই বিগ সাইজের কচুরি জলখাবার হিসেবে বারোখানা

কী করে খেতেন নীতীশ মুখার্জি, সেটাও আমার কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। যে কোনও সাধারণ মানুষের দু'খানার বেশি তিনখানা খেতে গেলে জিব বেরিয়ে আসত। মেনে নিলাম নীতীশ মুখার্জির চেহারাখানা বিরাট। তা বলে বারোখানা কচুরি!

পরবর্তীকালে যখন সাংবাদিকতা করতে এলাম তখন এই প্রচুর পরিমাণ কচুরি খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে নীতীশদাকে প্রশ্ন করেছিলাম। আজ্ঞে না, নীতীশদার সঙ্গে আমার সেরকম ঘনিষ্ঠতা কোনকালেই হয়নি। কর্মসূত্রে দু'জনে দু'জনের কাছাকাছি এসেছিলাম—এই মাত্র। কিন্তু প্রথম আলাপেই আমি ওঁকে নীতীশদা বলে ডেকেছিলাম এবং উনি সে ডাকে বিনা দ্বিধায় সাড়াও দিয়েছিলেন। একবার শুধুমাত্র খোঁজ নিয়েছিলেন কোন্ পত্রিকা থেকে আসছি আর আমার কী নাম।

সেদিন প্রাসঙ্গিক বেশ কিছু কথার পর ওঁর ওই এক সিটিং-এ বারোখানা কচুরি খাবার প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম। শুনে নীতীশদা একটু হেসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন : আসলে তখন অফিস থেকে সোজা আসতাম তো থিয়েটার করতে। পেটে থাকত প্রচণ্ড খিদে। ভরাপেট না থাকলে আমার আবার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। আর শ্রীরঙ্গম হলের লাস্ট সিট পর্যন্ত গলার আওয়াজ না পৌঁছলে বড়বাবুর (শিশিরকুমার ভাদুড়ি) কাছে ধাতানি খাবার ভয় ছিল। তাই পেট ঠুসে কচুরি খেয়ে নিতাম। ব্যস, রাত দশটা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত।

আমি বললাম : কিন্তু আমি যতদিন আপনাকে কচুরি খেতে দেখেছি, সে ক'দিনই বারোখানা করে খেতে দেখেছি। কোনদিন দশখানাও নয় আর কোনদিন চোদ্দখানাও নয়। এর কারণটা কী?

নীতীশদা একটু হাসলেন। বললেন : বড়বাবুর শ্রীরঙ্গম থিয়েটারে পার ডে ওই ছ'আনা করে পেমেন্ট পেতাম যে! তাই হিসেব করে কচুরি খেতে হত।

আমি অবাক হয়ে বললাম : সে কী! মাত্র ছ'আনা পার ডে পেমেন্ট?

নীতীশদা কপালে চোখ তুলে বললেন : মাত্র বলছো কী। আমি তো অনেক ভাগ্যবান, তাই পার ডে ছ'আনা করে পেতাম। অনেকে তো তাও পেতেন না। ছবি বিশ্বাসের মতো আর্টিস্ট, যিনি অন্য থিয়েটারে মুখে রঙ মাখলেই পকেটে আড়াইশো-তিনশো টাকা পোরেন, তিনি বড়বাবুর কাছে পার শো কত করে পেতেন জানো?

আমি বললাম : না তো!

নীতীশদা বললেন : ওন্‌লি ফর্টি রুপিজ। আসলে বড়বাবুর কাছে আমরা তো অভিনয় করতে যেতাম না, যেতাম অভিনয় শিখতে। তা তোমরা যে কলেজে লেখাপড়া করতে যাও তার জন্যে টাকা দিতে হয় না? কিন্তু আমাদের ওই বড়বাবুর অভিনয় শেখার কলেজে পয়সা দিতে হত না। উল্টে যে ছ'আনা করে পেতাম এটা তো পরম সৌভাগ্য। আর ওই ছ'আনা কচুরি ভক্ষণ করে উড়িয়ে দিতাম।

নীতীশদা সম্পর্কে এই লেখাটা যখন এই পর্যন্ত এগিয়েছে তখন ডাকবাহিত হয়ে একটি পোস্টকার্ড এসে পৌঁছল আমার কাছে। চিঠিটি লিখেছেন প্রবীণ অভিনেতা কমল মিত্র, যাঁর বয়েস তখন প্রায় একাশি বছর। কমলদা লিখেছেন : 'তোমার মঞ্জু দে সম্বন্ধে লেখায় দেখলাম তুমি তাকে বাংলার প্রথম মহিলা পরিচালিকা বলে লিখেছো। কিন্তু আমার তো মনে হয় বাংলা ছবির প্রথম মহিলা পরিচালিকা ছিলেন মিসেস শাসমল, যিনি একটিমাত্র বাংলা ছবি পরিচালনা করেছিলেন। সে ছবির নাম ছিল 'নিবেদিতা'। সে ছবির নায়ক ছিলেন ছবিদা (বিশ্বাস) এবং ওই ছবিতে আমি, ধীরাজ ভট্টাচার্য, নরেশ মিত্র, ইন্দু মুখার্জি হরিধন মুখার্জি প্রভৃতি অভিনয় করেছিলাম। ছবিটি মুক্তিলাভও করেছিল। এইগুলি একটু ভালো করে দেখে নিও। এখনও তোমরা দু-তিন জন পুরনো সাংবাদিক আছো, যাদের লেখা আজও পড়তে ভালো লাগে। তাই এসব কথা লিখলাম। না হলে এসব কথা নিয়ে আলোচনাই করতাম না—তোমাদের ছেড়ে চলে যাবার সময়।'

কমলদার চিঠি পাওয়ামাত্র পুরনো তথ্যপঞ্জী ঘাঁটতে বসে গেলাম। খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম, ঠিকই তো। এখানে তো দেখছি স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে ১৯৪৬ সালের ১০ আগস্ট মিনার, বিজলী, ছবিঘরে 'নিবেদিতা' নামে একটি ছবি মুক্তি পেয়েছিল, যার পরিচালক ছিলেন শ্রীমতী প্রতিভা শাসমল।

কিন্তু এতবড় মারাত্মক ভুলটা হয়ে গেল কী করে। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল 'নিবেদিতা'

ছবিটি মুক্তি পাবার চারদিন পরেই ১৯৪৬ সালের ১৪ আগস্ট জিন্নাসাহেবের মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে র আহ্বানে সারা কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের বীভৎস দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছিল। চার-পাঁচটা দিন তো রক্তের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সিনেমা-থিয়েটার সব বন্ধ। দিন পনেরো লেগেছিল এই স্তব্ধতা কাটতে। তারও পরে চোরাগোপ্তা মারধর আরও বছরখানেক চলেছিল। সমাপ্তি ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হবার মুহূর্তে।

ওই টালমাটাল অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল 'নিবেদিতা' ছবিটি। সর্বসাকুল্যে দিন দশ-বারো চলেছিল হয়তো। তখন আত্মরক্ষার প্রশ্নটা এতই বড় ছিল যে ছবি টবি দেখা মাথায় উঠেছিল। কাজেই আমার আর 'নিবেদিতা' দেখা হয়ে ওঠেনি। শুধু আমি কেন, অনেকেই দেখতে পারেননি ওই ছবি। কারণ সেপ্টেম্বর মাসেই 'নিবেদিতা' উঠে গিয়ে মিনার, বিজলী, ছবিঘরে 'বন্দেমাতরম' ছবিটি দেখানো শুরু হয়ে গিয়েছিল। কাজেই 'নিবেদিতা' নিয়ে কোন আলোচনা কি সমালোচনা আমার কানে প্রবেশ করেনি।

কিন্তু যতই আত্মপক্ষে সাফাই গাই না কেন এটা যে একটা মারাত্মক ভুল সেটা তো স্বীকার করতে হবে এবং তার জন্যে পাঠকদের কাছে মার্জনা চাইতে হবে। সেটাই চাইছি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি কমলদা আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন আমাদের কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্যে। তাঁরই কল্যাণে এতবড় একটা ভুল সংশোধিত হল। নইলে ওই ভুলটাই চিরকালের মতো নথিভুক্ত হয়ে থাকত আমার রচনায়। সেই পাপকাজ থেকে বেঁচে গেলাম।

যাক, এতক্ষণ ধরে ক্ষমা চাওয়া টাওয়ার ব্যাপার তো শেষ হল। এবারে আবার ফিরে আসি নীতীশদার কথায়।

নীতীশদার জন্ম ১৯১৭ সালে। ওঁদের আদি নিবাস নদীয়া জেলার শান্তিপুরে। বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার। ওঁর ঠাকুর্দা গিরীন্দ্রনাথ মুখার্জি ছিলেন মুর্শিদাবাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ। বাবা ভূজেন্দ্রনাথ মুখার্জি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। নীতীশদার চলনে বলনে যে পুলিশি মেজাজ, সেটা মনে হয় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

১৯৩৩ সালে সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে নীতীশদা ম্যাট্রিক পাশ করেন। আই এ পাস করেন আশুতোষ কলেজ থেকে। ব্যস তারপরই পড়াশোনায় ইতি।

এই ইতির কারণ তাঁর সংগীতপ্রীতি। পাশাপাশি অভিনয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। সংগীতের দুই মহারথী তারাপদ চক্রবর্তী এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে তিনি দিনের পর দিন হাজিরা দিতেন সংগীতের প্রতি আকর্ষণে। কিন্তু সংগীত তাঁকে সাফল্যের মুখ তেমন করে দেখাতে পারেনি, যতটা পেরেছিল অভিনয়।

নীতীশদার প্রথম যে ছবি আমি দেখেছিলাম সেটির নাম 'মুক্তির বন্ধন'। পরিচালনা করেছিলেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক স্বপনবুড়ো—যাঁর আসল নাম অখিল নিয়োগী। অখিলদা ছিলেন 'সব পেয়েছির আসর'-এর প্রতিষ্ঠাতা। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৪৭ সালে। নীতীশদা ওই ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর মুখে একটি গান ছিল। 'ও বাবলা রে, ও শাপলা রে।' ওই গানের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে কিছুটা নাচের ভঙ্গিও ছিল। সেই কারণেই আরও বেশি করে মনে আছে ওই চরিত্রটির কথা।

তবে ওটা ছিল নীতীশদার অভিনয় জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। তাঁর প্রথম অভিনয় ১৯৩৯ সালে প্রফুল্ল রায় পরিচালিত 'পরশমণি' ছবিতে একটি ছোট্ট ভূমিকায়। বড় ভূমিকাগুলিতে ছিলেন দুর্গাদাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, জ্যোৎস্না গুপ্তা, রানীবালা প্রমুখ তৎকালীন নামকরা শিল্পীরা। ওই ছোট্ট ভূমিকায় নীতীশদা নামও করেননি আর দর্শকের নজরেও পড়েননি।

শুধু ওই ছবিতে কেন, তারপর নীতীশদা 'ঠিকাদার', 'অবতার'. 'জীবনসঙ্গিনী', 'কর্ণার্জুন', 'মহাকবি কালিদাস', 'পতিব্রতা' ইত্যাদি ছবিতে অভিনয় করেও তেমন নাম করতে পারেননি। 'পতিব্রতা' ছবিতে আবার তিনি গান গাইবারও সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও কপাল খোলেনি। এমন কি নরেশ মিত্র পরিচালিত 'শর্মিষ্ঠা' কিংবা শিশির ভাদুড়ি পরিচালিত 'চাণক্য' ছবিতে অভিনয় করার পরও ভাগ্য তাঁর

প্রতি সুপ্রসন্ন হয়নি। তবে শিশিরবাবুর সঙ্গে এই যোগাযোগ তাঁর সামনে মঞ্চ-জীবনের প্রবেশপথ খুলে দিয়েছিল। এই 'চাণক্য' ছবির নায়িকা ছিলেন কঙ্কাবতী দেবী, যিনি বি এ পাস করে অভিনয় জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। এর আগে আমার একটি লেখায় আমি বি এ—বিজ্ঞাপিতা তিন অভিনেত্রীর নাম উল্লেখ করেছিলাম। তাঁদের সঙ্গে কঙ্কাবতীর নামটিও যোগ করে নিতে হবে। ওঁর নামটি তখন উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

এতগুলি ছবিতে অভিনয় করার পরও যখন নীতীশদার প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল না, তখন নীতীশদা মনে বড় ব্যথা পেলেন। মনস্থ করলেন অভিনয় জীবন ছেড়েই দেবেন। করলেনও তাই। চাকরি নিলেন সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে। তিনি তখন এক পরাজিত মানুষ।

দীর্ঘ কয়েক বছর পর নীতীশদাকে আবার দেখা গেল ছবির পর্দায় ১৯৪৭ সালে। ওই বছরে মুক্তি পাওয়া 'মুক্তির বন্ধন' ছবির কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেল ওই বছরই দেবকী বসু পরিচালিত 'চন্দ্রশেখর' ছবিতে নবাব মিরকাশিমের চরিত্রে অভিনয়ের পর। ওই চরিত্রে তাঁর তেজোদৃপ্ত অভিনয় তাঁকে প্রশংসার শিখরে তুলে দিল। তারপর থেকে আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

এই যে দীর্ঘ কয়েকটা বছর নীতীশদা অভিনয়ের জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন তার কারণটা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এর উত্তরে নীতীশদা তাঁর বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন : তুমি ভাগ্য বিশ্বাস করো?

আমি বললাম ভাগ্যে কী আছে না আছে সেটা জানা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি কর্মে বিশ্বাস করি। পুরুষাকারে বিশ্বাস করি।

নীতীশদা বললেন : আমিও তাই করতাম। তাই লড়াইটা চালিতে যেতে পেরেছিলাম। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। তারপর এক বৃদ্ধ তান্ত্রিকের সঙ্গে দেখা হবার পর পাঁচটা বছর স্বেচ্ছানির্বাসনে গিয়েছিলাম।

আমি বললাম : সেটা কী ব্যাপার?

নীতীশদা বললেন . একটার পর একটা ছবিতে চান্স পাচ্ছি, প্রাণ ঢেলে অভিনয় করছি। কিন্তু তার কোন রেজাল্টই পাচ্ছি না। ওই সময় খুব মনমরা হয়ে থাকতাম। এমনই একটা সময়ে ওই বৃদ্ধ তান্ত্রিকের দেখা পেলাম আউটরাম ঘাটের কাছে এক গাছের নিচে।

ওই কথা বলতে বলতে নীতীশদা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। দু-তিন মিনিট চুপ করে বসে রইলেন।

আমার কৌতূহল তখন চরমে। জিজ্ঞাসা করলাম : তারপর?

আমার কথায় নীতীশদা যেন সেন্স ফিরে পেলেন। বললেন : সেদিন মনটা খুব খারাপ ছিল। আউটরাম ঘাটের কাছে গঙ্গার পাড়ের একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে ভাবছিলাম, এরপর কী করব? এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ডাকল। মুখ ফিরিয়ে দেখি একটা গাছের নিচে গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে আছেন টকটকে লাল রঙের কাপড় পরা এক বৃদ্ধ। আমার কোনদিন তান্ত্রিক কিংবা জ্যোতিষী-টোতিষীতে বিশ্বাস ছিল না। ভাবতাম, ওসব বুজরুকি। তাই ওই বুড়োর ডাকটাকে পাত্তাই দিলাম না। একবার দেখে নিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলাম। তখন ওই বৃদ্ধটি নিজেই উঠে এসে আমার পাশে বসলেন। পিঠে একটা হাত রেখে বললেন : ইত্না উদাস কিউ রে বেটা?

বলতে বলতে নীতীশদা আবার চুপ করে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বলতে শুরু করলেন : সেই 'বেটা' উচ্চারণটার মধ্যে এমন একটা স্নেহমাখানো ব্যাপার ছিল যে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। চোখে জল এসে গেল। বৃদ্ধটি তখন বললেন : রো মাত্ বেটা। রোনেকা ক্যা হ্যায়। তারপর আমার দুই ভুরুর মাঝখানে তাঁর নিজের বুড়ো আঙুলটা টিপে ধরে চোখ বুজে মিনিটখানেক বসে রইলেন। আমিও হিপ্নোটাইজড্ হবার মতো বসে রইলাম। একটু পরে বৃদ্ধ চোখ খুলে বললেন : ঘাবড়ানেকা কুছ নেই হ্যায়। পাঁচ বরষ বাদ তু যো মাঙতা সব কুছ হোগা। বহোৎ নাম হোগা। ইনাম ভি মিলেগা'। তারপর আর একটি কথাও না বলে উঠে দাঁড়িয়ে হন হন করে রাস্তা পেরিয়ে মাঠের দিকে চলে গেলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি আর তাঁর পিছু নিলেন না?

নীতীশদা বললেন : না, আমার তখন ওঠবার শক্তিটুকুও ছিল না। সারা শরীরটা কেমন ভারি ভারি লাগছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ওই বুড়ো লোকটি তাঁর এই ভাগ্যগণনার জন্যে আপনার কাছ থেকে পয়সাকড়ি কিছু চাননি?

নীতীশদা বললেন : এক পয়সাও নয়। আর কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখো। ঠিক পাঁচ বছর পরে লটারির প্রাইজ পাওয়ার মতো আমি ছবিতে চান্স পেতে লাগলাম। তার আগে একটা কাজ পাবার জন্যে কত মেহনত করতে হয়েছে। দেবকীবাবুর 'চন্দ্রশেখর'-এর পর ধীরেশ ঘোষের 'মহাকাল' ছবিতে কাজ পেলাম। বিখ্যাত 'হাঞ্চব্যাক অফ নোতরদাম'-এর বাংলা। প্রিস্টের রোল্‌টা আমি করেছিলাম। ওটা একটা প্রাইজ রোল্ আমার জীবনে। তারপর দেবকীবাবুর 'কবি'-তে পয়েন্টসম্যান রাজনের ক্যারেকটার। নিউ থিয়েটার্সের 'রাইকমল' ছবির হিরো। ভালো ভালো রোল সব সময় ছপ্পর ফুঁড়ে আসতে লাগল আমার কাছে।

সত্যিই তাই। পাঁচ বছর স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকার পর ছবির জগতে আবার যিনি ফিরে এলেন, তিনি যেন অন্য নীতীশ মুখার্জি।

শুধু কি সিনেমায়। থিয়েটারেও তাঁর সাফল্য গর্ব করে বলার মতো। রঙমহল, শ্রীরঙ্গম, কালিকা সব থিয়েটারে অজস্র নাটকে অভিনয় করেছেন। শিশিরবাবুর শ্রীরঙ্গম যখন রাসবিহারী সরকার মশাইয়ের আমলে বিশ্বরূপায় রূপান্তরিত হল তখন তাঁদের প্রথম প্রযোজনা তারাশঙ্করের 'সঞ্জীবন ফার্মেসী' উপন্যাস অবলম্বনে 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকের মুখ্য চরিত্র জীবনমশাইয়ের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন নীতীশদা।

আগেই বলেছি নীতীশদার সঙ্গে আমার তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। মাঝেমধ্যে দেখাসাক্ষাত হত এই মাত্র। কেবল ওই একটি দিনই তিনি মন খুলে আমার কাছে তাঁর জীবনের কিছু গুহ্য কথা প্রকাশ করেছিলেন। সেই সঙ্গে সাবধানও করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : এইসব কথা যেন কারও কাছে বলতে যেও না। লোকে বিশ্বাস করবে না। হাসাহাসি করবে।

এতদিন বলিওনি কারও কাছে। ওই হাসাহাসির ভয়টা ছিল। কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে এসে সেই ভয় কেটে গেছে। করুক না হাসাহাসি। এখন তো মানুষের জীবন জুড়ে কেবল কান্না। তার মধ্যে যদি নীতীশদার এই কাহিনী শুনে কেউ একটু হাসাহাসি করে তবে সেটাও তো কম পাওনা নয়।

রেণুদি

সালটা ঠিক মনে নেই। বোধহয় ১৯৫৮ কি '৫৯ হবে। একদিন সন্ধের মুখে মুখে কালীঘাটের প্রতাপাদিত্য রোড দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় প্রায় আমার গা ঘেঁসে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। আমি তটস্থ হয়ে ফুটপাথের ভেতর দিকে একটু সরে গেলাম। আচ্ছা বেওকুফ ড্রাইভার তো? দুটো কড়া কথা বলবার জন্যে ড্রাইভারের দিকে ফিরে তাকাতেই দেখলাম, ট্যাক্সি থেকে রেণুদি নামছেন মাথায় বেশ খানিকটা ঘোমটা টেনে।

ড্রাইভারকে যে কড়া কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা মুখেই আটকে গেল। কারণ ততক্ষণে রেণুদির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেছে। রেণুদি তাঁর সেই ঝকঝকে সুন্দর দাঁতে একমুখ হাসি ছড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : কী ব্যাপার? এই ভর সন্ধেবেলা আমাদের পাড়ায় ঘুরঘুর করছো কেন?

রেণুদির মতো এমন বিউটিফুল দাঁত আমি খুব কমই দেখেছি। ওই সুন্দর সাজানো ঝকঝকে দাঁতের হাসির টানে আমি 'শহর থেকে দূরে' ছবিটা বার চারেক দেখেছি। 'মানে না মানা' বার তিনেক। আর 'মেজদিদি' ছবিতে একবারও রেণুদির হাসি দেখতে না পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। থাকার অবিশ্যি কথাও নয়। রেণুদি তো ওই ছবিতে ভিলেন। কাজেই হাসবার তো তেমন কোনও স্কোপই নেই। দু-একবার ছিল হয়তো, তবে সেটাও দেঁতো হাসি।

তবে রেণুদির হাসি মনে যতই পুলকের শিহরন জাগাক না কেন, ওঁর কথাটার মধ্য কেমন একটা খোঁচা আছে বলে মনে হচ্ছে যেন। 'ঘুরঘুর' কথাটার মানে কী? ওটা তো অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বলে জানি। রেণুদি আমাকে সেই দলের ভাবলেন নাকি? তাহলে তো বড় বিপদের কথা!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে রেণুদি আমার দিকে দু-এক পা এগিয়ে এলেন। বললেন : কী গো সাংবাদিক মশাই, একেবারে বাক্যহারা হয়ে গেলে যে? এ পাড়ায় কি করতে ঢুকেছো বললে না তো?

আমি বললাম : কালোদার বাড়ি যাচ্ছিলাম। একটু দরকার ছিল।

রেণুদি আবার সেই মোহিনী হাসি হাসলেন। এই কথায় কথায় হাসিটা রেণুদির বোধহয় মুদ্রাদোষ। আমার তো মনে হয় রেণুদি কারও ওপর রেগে গিয়ে গালমন্দ করলেও ওইরকম হেসে হেসেই করেন। রেণুদি বললেন : তা কালোর বাড়ি যাচ্ছিলে সেটা তো ভালো কথা। কালো হল নামকরা হিরো। অসিতবরণ। কিন্তু আমিও তো একসময় হিরোইন ছিলাম সে কথা কি ভুলে গেলে তোমরা? আমার নাম না হয় কালো নয়, কিন্তু গায়ের রঙটা তো কালো! এ কালোয় তোমাদের মন বসে না বুঝি?

আমি বললাম : তোমাকে যে কালো বলে সে নিশ্চয় চোখে কম দেখে। কী ঝকঝকে রঙ তোমার!

রেণুদি হাসতে হাসতে বললেন : থাক থাক, অত আমড়াগাছি করতে হবে না। আমার গায়ের রঙ যে কালো সেটা আমি ভালো করেই জানি। শৈলজাবাবু (সাহিত্যিক পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়) তো তাঁর সেটে প্রায়ই বলতেন, ওই কেলে মেয়েটাকে ডাক দিকি। শট্‌টা দিয়ে যাক।

আমি বললাম : সে শৈলজাদা আপনাকে একটু বেশি স্নেহ করেন বলেই বলতেন।

রেণুদি বললেন : ওসব কথা থাক এখন। চলো, আমার বাড়িতে একটু চা খেয়ে যাবে চলো।

আমি বললাম : আজ থাক রেণুদি। পরে একদিন আসব। আজ কালোদার সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। অলরেডি দেরি হয়ে গেছে।

রেণুদি বললেন : কিচ্ছু দেরি হয়নি। ওই তো ক'টা বাড়ির পরেই তোমার কালোদার বাড়ি। চলো চলো চায়ের সঙ্গে পাঁপড় ভেজে খাওয়াব চলো।

আমি বললাম : আমাকে অত বোকা ঠাউরালে কী করে যে পাঁপড়ভাজা খেতে তোমার বাড়িতে ঢুকব। সুশীলদা, ফণীদা, কালীশদাদের মতো সাংবাদিকদের মুখে শুনেছি তুমি নাকি দারুণ রান্না করো।

আর তোমার সঙ্গে সাংবাদিকরা দেখা করতে এলে নাকি ভরপেট না খাইয়ে ছাড়ো না! আমার বেলায় সস্তায় কিস্তিমাৎ! শুকনো পাঁপড় ভাজার লোভ দেখানো?

আমার কথা শুনে রেণুদি কেমন থতমত খেয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন : সেদিন কি আর আছে রে ভাই! তখন হিরোইন ছিলাম, দুহাত্তা টাকা রোজগার করেছি। মন খুলে মানুষজনকে খাইয়েছি। এখন তো মা-মাসির রোল করি। কোথা থেকে আর খাওয়াব বলো?

চাপবার চেষ্টা করেও চাপতে পারলেন না রেণুদি। একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মিশে গেল প্রতাপাদিত্য রোডের এলোমেলো সান্ধ্য বাতাসের সঙ্গে। পরিবেশটা কেমন যেন ভারি হয়ে উঠল।

কথা ঘোরাবার জন্যে রেণুদিকে বললাম : আজ চলি রেণুদি। পরে একদিন আসব। দেরি হয়ে গেছে। কালোদা যদি বেরিয়ে যান তাহলে মুশকিলে পড়ব।

রেণুদি ম্লান মুখে বললেন : যাবে? যাও। তুমি তো আবার ভালো মন্দ না খাওয়ালে আসবে না। তা একদিন ফোন করে এসো। গরিব দিদির বাড়ির এক মুঠো ডাল-ভাত খেয়ে যেও। দেখবে, আমার রান্না তোমার খারাপ লাগবে না। আমার ফোন নাম্বারটা জানো তো? ফোর সিক্স টু ফাইভ সিক্স ফোর।

আমি পকেট থেকে নোটবই বার করে আগে রেণুকা রায়ের নামটা লিখে তার পাশে ফোন নাম্বারটা লিখে রাখলাম।

আমার লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত রেণুদি অপেক্ষা করলেন। তারপর 'একদিন নিশ্চয় এসো কিন্তু' বলতে বলতে আর একঝলক হাসি উপহার দিয়ে সতেরোর এ নম্বরের বাড়িটার অন্দরমহলে চলে গেলেন। আমার গন্তব্য পঁচিশ নম্বর। অসিতবরণের বাড়ি। এই তো ক'খানা বাড়ির পরেই। আমি সেইদিকেই পা বাড়ালাম।

রেণুদির জন্ম এই কলকাতা শহরে। কত সালে সেটা বলতে পারব না। রেণুদিকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর জন্ম কত সালে? উত্তরে রেণুদি ধমকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন : তুমি কী রকম ভদ্রলোক হে? মেয়েদের বয়েস কখনও জিগ্যেস করতে আছে!

আমি বলেছিলাম : বয়েসের কথা কে জিগ্যেস করছে! আমি তো শুধু জানতে চাইছি তোমার জন্ম কত সালে?

উত্তরে রেণুদি হাসতে হাসতে বলেছিলেন : আমাকে কি বোকা ঠাওরালে নাকি? জন্মসাল জেনে গেলে বয়েস জানতে আর বাকি রইল কী?

সেদিন না বললেও পরে একদিন রেণুদি কথায় কথায় জানিয়েছিলেন, উনি আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড়। আমার জন্মসন ১৯২৭। সেই হিসেবে রেণুদির জন্মের সাল সম্ভবত ১৯১৯ কিংবা ১৯২০। এটা সঠিক নাও হতে পারে। আন্দাজে আন্দাজে একটা হিসেব করলাম।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই রেণুদি অভিনয়ের জগতে আসেন। ভবানীপুরের রসা থিয়েটারে (এখন তার নাম পূর্ণ সিনেমা) ছবি দেখানোর আগে নাচ-গান হত। তখন অনেক সিনেমাতেই তা হত। এই তো পঞ্চাশের দশকেও মুনলাইট সিনেমায় ছবি দেখানোর সঙ্গে নাচ-গান হত। এখন আর হয় না। তখনকার দিনে সিনেমায় দর্শক আকর্ষণের এটা ছিল অন্যতম প্রক্রিয়া। বলা যায় ফাউ।

তা রসা থিয়েটারে সেই ব্যালে নাচের দলে রেণুদি অনেকদিন ছিলেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় পরবর্তীকালের বিখ্যাত নায়িকা উমাশশী দেবীর সঙ্গে। উমাশশী দেবী দীর্ঘকাল নিউ থিয়েটার্সের নায়িকা ছিলেন। দেবকী বসুর 'চণ্ডীদাস', নীতিন বসুর 'দেশের মাটি', 'ভাগ্যচক্র' ইত্যাদি ছবিতে অভিনয় করে উনি দারুণ প্রশংসা পেয়েছিলেন।

এই 'ভাগ্যচক্র' ছবি দেখার পর রেণুদিরও খুব ইচ্ছে হয় ছবিতে অভিনয় করার। সে কথা উমাশশী দেবীকে বলেও ছিলেন। ততদিনে 'দেবদাসী' বলে একটা ছবিতে নর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করে ফেলেছেন রেণুদি। কিন্তু সেটা তো আর অভিনয় নয়। কেবল নাচ।

শেষ পর্যন্ত উমাশশী দেবীর চেষ্টায় 'খাস দখল' ছবিতে একটা বড় ভূমিকা পান রেণুদি। ওই ছবির পরিচালক চারু দত্ত আগে নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে উমাশশী দেবীর সঙ্গে তাঁর

পরিচয় ছিল। এবং উমাশশীর অনুরোধেই তিনি রেণুদিকে তাঁর ছবিতে সুযোগ দেন। ছবিটি কিন্তু চলেনি তেমন। সেটা ছিল ১৯৩৫ সাল।

এর পরের বছরেই রেণুদি নায়িকা হিসেবে প্রথম সুযোগ পেলেন নরেশ মিত্র পরিচলিত 'মহানিশা' ছবিতে। ওই ছবিতে তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন জহর গাঙ্গুলি, যোগেশ চৌধুরি, রবি রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, চারুবালা, আশমানতারা প্রমুখ তখনকার দিনের নামকরা শিল্পী সব। সবার উপরে পরিচালক নরেশ মিত্র নিজে তো ছিলেনই।

এই নরেশ মিত্রকে রেণুদি তাঁর অভিনয় জীবনের গুরু বলে মানতেন। রেণুদি বলতেন : তার আগে অভিনয়ের 'অ-ও' জানতাম না। 'খাস দখল' ছবিতে কাজ করেছি বটে, তবে অভিনয় যাকে বলে তা তেমন করে কিছুই শেখা হয়নি। 'মহানিশা' ছবির সময় নরেশদা আমাকে মারধর দিয়ে অভিনয় শিখিয়েছেন। যাকে বলে গাধা পিটে ঘোড়া তৈরি করা। এই শেখাটা দারুণভাবে কাজে লেগেছিল 'নরনারায়ণ' কিংবা 'ঠিকাদার' ছবিতে কাজ করার সময়। যাকে বলে ফ্রি অ্যাকটিং, সেটা করতে পেরেছিলাম। 'ঠিকাদার' ছবিতে আমি নায়িকা নয়, কিন্তু নায়িকার চেয়েও বেশি সুনাম হয়েছিল আমার।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম : আরে, ওই 'ঠিকাদার' ছবি দেখেই তো আমি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম রেণুদি।

রেণুদি অবাক চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন : সে কী! তখন তোমার বয়েস কত?

আমি বললাম : বারো কি তেরো!

রেণুদি চোখ কপালে তুলে বললেন : ও মা! ওই বয়েসে প্রেম! আচ্ছা এঁচোড়ে পাকা ছেলে ছিলে তো তুমি।

আমি বললাম : শুধু কি তোমার! 'বিদ্যাপতি' ছবি দেখার পর কাননদির প্রেমেও পড়ে গিয়েছিলাম আমি। তবে তুমি যে প্রেমের কথা ভাবছো সে প্রেম নয়। প্রেমে পড়েছিলাম কাননদির সুন্দর মুখের আর তোমার হাসির।

রেণুদি বললেন : সেটা আবার কী ব্যাপার?

আমি বললাম : সেই যে এক কবি লিখেছিলেন 'কাননদেবীর আননখানিতে কী যে মাধুরিমা আছে'! সেই কবিতা পড়েই তো কাননদির আননের প্রেমে পড়ে গেলাম। আচ্ছা রেণুদি, তোমার হাসি নিয়ে কেউ কবিতা লেখেনি?

রেণুদি বললেন : কই না, আমি তো পড়িনি, কারও মুখে শুনিও নি।

আমি বললাম : তাহলে চেষ্টা করে আমিই একটা কবিতা লিখব তোমার হাসির ওপর। জানো, তুমি যখন 'ঠিকাদার' ছবিতে হাসি হাসি মুখে যা দেখছিলে তাই দেখেই বলে উঠছিলে 'কী গ্র্যান্ড', তখন যে কী গ্র্যান্ড লাগছিল কী বলব!

রেণুদি বললেন : ওই ছবির পর স্টুডিওতে আমাকে দেখলেই সবাই বলে উঠত, কী গ্র্যান্ড। কী ভালো যে লাগত সেটা শুনতে!

নরেশদা যদি রেণুদিকে অভিনেত্রী তৈরি করে থাকেন তাহলে নায়িকা হিসেবে তাঁকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন শৈলজানন্দ। ১৯৪১ সালে তখনকার বিখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রথম ছবি করেন 'নন্দিনী'। ওই ছবিতে রেণুদি ছিলেন না। কিন্তু তারপর থেকে যত ছবি করেছেন, তার মধ্যে তাঁর তোলা 'বন্দী', 'শহর থেকে দূরে', 'মানে না মানা', 'অভিনয় নয়', 'শ্রীদুর্গা' ইত্যাদি হিট ছবিগুলির নায়িকা ছিলেন রেণুদি। রেণুদি তখন শৈলজাদার নয়নের মণি। আর ওই রেণুদির জন্যেই শৈলজানন্দের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল জহর গাঙ্গুলির।

শৈলজাদার সঙ্গে সুলালদার দীর্ঘকালের পরিচয়। বয়েসের একটু তফাত সত্ত্বেও উভয়ে উভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। থাকতেন একই পাড়ায়। বাগবাজারে সুলালদা থাকতেন বৃন্দাবন পাল লেনে আর শৈলজাদা থাকতেন একটু তফাতে নন্দলাল বসু লেনে। শৈলজাদার 'বন্দী', 'শহর থেকে দূরে', 'মানে না মানা' ইত্যাদি ছবিতে সুলালদার অসামান্য অভিনয় ছবিগুলিকে হিট করানোর ব্যাপারে দারুণ সাহায্য করেছিল। সকলেই ভাবত ওঁদের এই বন্ধুত্বে কোনওদিন চিড় খাবে না।

কিন্তু 'মানে না মানা' ছবির সেটে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে শৈলজাদা এবং সুলালদার মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল।

সেদিন 'মানে না মানা' ছবির সেটে আছেন সুলালদা, অহীন্দ্র চৌধুরি এবং রেণুদি। একটি দৃশ্য তোলা হচ্ছে। দৃশ্যটির শেষাংশে আছে সুলালদা রেণুদির ঘাড়টা চেপে ধরে অহীনবাবুর পায়ে প্রণাম করাবেন। রিহার্সাল, মণিটার যথারীতি হল। ফাইনাল টেকের সময় কিন্তু বেশ জোরের সঙ্গেই রেণুদির ঘাড়টি অহীনবাবুর পায়ে চেপে ধরলেন সুলালদা। দৃশ্যগ্রহণ শেষ, কিন্তু রেণুদি আর ঘাড় তুলতে পারেন না। ঘাড় যখন তুললেন তখন সারা মুখ তাঁর যন্ত্রণায় কাতর। সোজা শৈলজানন্দের সামনে গিয়ে বললেন: আমি আর সুলালবাবুর সঙ্গে অভিনয় করব না।

তখনকার মতো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা করে রেণুদিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন শৈলজাদা। দিন সাতেক বাদে ঘাড়ের রোগ সারল, কিন্তু মনের রাগ পড়ল না। তখনও রেণুদির সেই এক কথা: আমি আর সুলালবাবুর সঙ্গে অভিনয় করব না।

সব শুনে সুলালদাও ক্ষেপে লাল। বললেন : অভিনয়ের সময় ফিলিংসের মাথায় অমন অনেক কিছুই ঘটে থাকে, তা বলে মেয়েমানুষের এত জেদ! ঠিক আছে, আমিও আর ওর সঙ্গে অভিনয় করব না।

সুলালদা আর রেণুদি উভয়েই যখন জেদ ধরে বসলেন কেউ কারও সঙ্গে অভিনয় করবেন না, তখন শৈলজাদা পড়লেন মহা ফাঁপরে। অনেক চেষ্টা করলেন ওঁদের রাগ ঠাণ্ডা করতে, কিন্তু ফল কিছুই হল না। শেষে ঠিক করলেন সুলালদাকে বাদ দিয়েই তাঁর পরের ছবি 'অভিনয় নয়' করবেন। কারণ, ব্যবসায়িক দিক থেকে রেণুকা রায়কে শৈলজাদার বেশি প্রয়োজন। তাছাড়া রেণুকে তিনি নিজে হাতে তৈরি করেছেন, পপুলার হিরোইন বানিয়েছেন। কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ রেণুকা রায় এই যুদ্ধের গরম বাজারেও তাঁর ছবিতে যে টাকা নেন, সে টাকাতে একজন চরিত্রাভিনেত্রীও পাওয়া যায় না। হিরোইন তো দূরের কথা।

সুতরাং শৈলজানন্দ আর জহর গাঙ্গুলিতে তীব্র মতবিরোধ। কিছু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। শৈলজানন্দ শাসালেন : আমি ইচ্ছে করলে তোমার মতো দশটা জহর গাঙ্গুলি তৈরি করতে পারি!

সুলালদাও রুখে উঠলেন : যান যান, আপনার মতো কয়েক ডজন পরিচালক রোজ দু'বেলা আমার দরজায় ধর্না দেয়!

অবশেষে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। রাস্তার ওপারে নন্দলাল বোস লেনে শৈলজানন্দ, আর এপারে বৃন্দাবন পাল লেনে জহর গাঙ্গুলি। মাঝখানে বাগবাজার স্ট্রিট এক অনতিক্রমনীয় দূরত্ব নিয়ে বিরাজ করতে লাগল।

সেদিনকার সেই ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রেণুদি বলে উঠলেন : জানো ভাই, সেদিন আমি একটা মস্ত বড় ভুল করে বসেছিলাম। আমার উচিত হয়নি ওরকম জিদ ধরে বসে থাকা। পরে যত ভেবেছি, তত লজ্জায় অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে মরেছি। এই জেদাজেদির ফলটা আমাদের কারও পক্ষে ভালো হয়নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন?

রেণুদি বললেন : আমার ওই অন্যায় জিদের জন্যে শৈলজাবাবু রাগ করে তাঁর 'অভিনয় নয়' ছবিতে সুলালবাবুকে নিলেন না। নিলেন অমল বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অথচ রোলটা সুলালবাবুকে ভেবেই লেখা হয়েছিল। অমলবাবুও ভালো অভিনেতা, কিন্তু সুলালবাবুর মতো পাবলিককে মাতাবার ক্ষমতা তো তাঁর ছিল না। শুটিং করতে করতেই বুঝতে পারছিলাম, কোথায় যেন একটা বেশ বড় খামতি থেকে যাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তারপর?

রেণুদি বললেন : শৈলজাবাবুর 'নন্দিনী', 'বন্দী', 'শহর থেকে দূরে', 'মানে না মানা' যেরকম হইচই করে চলেছিল, 'অভিনয় নয়' ততটা পারল না। আমার জন্যেই যে এত বড় সর্বনাশটা ঘটে গেল তার জন্যে আমি নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিলাম না।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম : শেষ পর্যন্ত কী করলেন তাহলে?

রেণুদি বললেন : যা করবার তাই করলাম। একদিন সুলালবাবুর বাগবাজারের বাড়িতে গিয়ে দু'চোখ ভরা জল নিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে বসলাম।

আমি বললাম : সুলালদা ক্ষমা করেছিলেন?

রেণুদি বললেন : শুধু ক্ষমা। আমার কান্না দেখে ওই অত বড় মানুষটা নিজেও কেঁদে আকুল। কাঁদতে কাঁদতে বললেন : দেখ রেণু, আমরা একলা একলা কেউ কিছু নয়। তুই ছাড়া আমি, আমি ছাড়া তুই অচল। কো অ্যাক্টর কিংবা অ্যাকট্রেসের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকলে, উভয়ে উভয়কে সহায়তা না করলে অ্যাকটিং ঝুলে যাবে, ছবি মরে যাবে। নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদেই আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে চলা দরকার।

বলতে বলতে রেণুদির চোখে জল এসে গিয়েছিল। বললেন : সেদিন যে কত বড় শিক্ষা আমি সুলালবাবুর কাছ থেকে পেয়েছিলাম তা এর পরে প্রতি পদে টের পেয়েছি। সুলালবাবু আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছিলেন। তাই তো আজও কাজ করে খেতে পারছি। নইলে কবে আউট হয়ে যেতাম।

রেণুদি সারাজীবনে অজস্র ছবিতে অভিনয় করেছেন। নায়িকা থেকে সহ-নায়িকা, তারপর নায়িকার মা-মাসি-পিসি। এবং সর্বত্র তিনি সফল। লাস্যময়ী নায়িকা থেকে মমতাময়ী মা, ভিলেন থেকে কমেডি-অ্যাকটিং সব ধরনের চরিত্রেই তিনি সুনামের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। আগে যেসব ছবির কথা উল্লেখ করেছি তা ছাড়াও যেসব ছবিতে উল্লেখযোগ্য কাজ তিনি করেছেন সেগুলি হল, রজনী, বিষবৃক্ষ, অবতার, সমাজ, নারী, প্রতিকার, পথের সাথী, নতুন বৌ, দুঃখে যাদের জীবন গড়া, নরনারায়ণ, কর্ণার্জুন, পোষ্যপুত্র, মিলন, পায়ের ধুলো, কলঙ্কিনী, জীবন সঙ্গিনী, নিবেদিতা, যুগের দাবি, তরুণের স্বপ্ন, মেজদিদি, স্যার শঙ্করনাথ, সমাপিকা, শেষ অংক, নীলাঙ্গুরীয় এবং আরও কত কত ছবি। নিউ থিয়েটার্সের দু'খানা ছবিতে তিনি কাজ করেছেন। 'দিকশূল' এবং 'মীনাক্ষী'। আরও প্রচুর ছবিতে রেণুদি কাজ করেছেন, তার সবগুলির নাম এই মুহূর্তে মনে আসছে না।

রেণুদি যেখানে যেতেন, যেখানে বসতেন, সেখানেই জীবনের উচ্ছলিত স্পন্দন এনে দিতে পারতেন। ওঁর সরস আড্ডাধারী মূর্তিটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে।

মৃত্যুর আগের দিনও তিনি কাজ করে গেছেন। অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিবাহ বিভ্রাট' ছবিতে। ওই শেষ তাঁর স্টুডিওর আসা। তার পরদিনই তাঁর হৃদরোগে আক্রমণ এবং মৃত্যু। তাঁর সেই মৃত মুখখানার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, তখনও যেন তিনি হাসছেন।

বিকাশদা

হাসতে হাসতে বিকাশদা বললেন : তোরা আমার সঙ্গে কেন টক্কর দিতে আসিস্ বল্ তো? জানিস তো হেরে ভূত হয়ে যাবি, তবু তোদের কেন এরকম বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার শখ হয় বল্ দিকি?

বলবার কিছুই ছিল না। সত্যিই আমরা হেরে ভূত হয়ে গেছি। শুধু আজ বলেই নয়, এরকম বহুবার হয়েছে। আমরা বহুবার বহুভাবে চেষ্টা করেছি বিকাশদাকে অন্তত একবারের জন্যেও হার স্বীকার করাতে। কিন্তু প্রত্যেকবারই আমরা রীতিমতো লজ্জাজনক ভাবে হেরে গেছি তাঁর কাছে। এবারে তো আর আমি একা নয়, আমরা দলবদ্ধভাবে চেষ্টা করেছিলাম বিকাশদাকে পরাজিত করতে। কিন্তু ফল ঘোষণার পর দেখা গেল বিকাশদা আমাদের লেংথে মেরে বেরিয়ে গেছেন।

এটা সেই ১৯৬২ সালের কথা। সেবার পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলায় প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে। শ'য়ে শ'য়ে ঘরবাড়ি ভেসে গেছে। হাজার হাজার মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাচ্ছে। অনাহারে আর নানা ব্যাধিতে তারা আক্রান্ত। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, ওষুধ-পথ্য নেই। সরকারি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, তবে তা পর্যাপ্ত নয়। অতএব সাধারণ মানুষ এগিয়ে এলেন বন্যার্ত মানুষের ত্রাণের উদ্দেশ্যে। ছায়াছবির জগতের মানুষেরাও পিছিয়ে রইলেন না। তাঁরাও বন্যাত্রাণে অংশ নেবার জন্যে এগিয়ে এলেন।

সেবার বন্যাত্রাণের জন্যে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব গোষ্ঠী একত্র হয়ে ঠিক করলেন, অর্থ সংগ্রহের জন্যে কলকাতার রাজপথে মিছিল করে বেরোবেন। কীভাবে কী করা হবে সেটা ঠিক করার দায়িত্ব পড়ল অভিনেতা বিকাশ রায়ের ওপর।

সেই পথপরিক্রমার জন্যে শিল্পীদের যে তালিকা তৈরি হল তাতে উত্তমকুমারের নাম বাদ রাখা হল। কারণ দেখানো হল, উত্তমকুমার রাস্তায় নামলে এত ভিড় হবে যে তা সামলাতে হিমশিম খেয়ে যেতে হবে। ফলে অর্থ সংগ্রহের আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

খবর পেয়ে উত্তমবাবু জিদ্ ধরলেন, তিনিও রাস্তায় নামবেন। বললেন : কেন, আমি কি পিরঠাকুর নাকি? সবাই রাস্তায় নামবে আর আমি ঘরে বসে থাকব। তা হবে না।

উত্তমবাবুকে অনেক বোঝানো হল। ওঁর সাম্প্রতিক অসুস্থতার অজুহাত দেখানো হল। কিন্তু উত্তমবাবু নাছোড়বান্দা। বিকাশ রায়ের সহকারি সুনীল রায়চৌধুরিকে উত্তমবাবু বললেন : তোমাদের মতলবটা কী বলো তো সুনুদা। আমাকে কি সবাই মিলে একঘরে করতে চাইছো নাকি?

উত্তমবাবুর ওইরকম জেদ দেখে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ওঁকে সঙ্গে নেওয়া হবে, কিন্তু রাস্তায় নামতে দেওয়া হবে না। উনি একটা লরির ওপর থাকবেন কৌটো হাতে নিয়ে। লরিতে জনা বিশেক হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিকে রাখা হবে সাধারণ মানুষের উদ্দাম ভালোবাসার হাত থেকে ওঁকে রক্ষা করবার জন্যে। এছাড়া কিছু সাদা পোশাকের পুলিশও থাকবে ওঁর লরির আশেপাশে। পুলিশ বিভাগ থেকে ইউনিফর্মধারী পুলিশ দেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিকাশদা সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : তাহলে তো হাঙ্গামার ভয়ে মানুষজন অর্থ সাহায্য করতে এগোবেই না মিছিলের দিকে।

অর্থ সংগ্রহের প্রথম দিন উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে বিডন স্ট্রিট পর্যন্ত অঞ্চলটিকে বেছে নেওয়া হল। সকাল ন'টা নাগাদ দেশবন্ধু পার্কের সামনে থেকে পরিক্রমা শুরু হবে।

নির্দিষ্ট দিনে উত্তমবাবুকে তোলা হল একটি লরিতে। আরও চার-পাঁচটি লরিতে রাখা হল মহিলা শিল্পীদের। বাকি পুরুষ শিল্পী এবং কলাকুশলীরা সবাই পদাতিক।

আমি সেই সময়ে 'উল্টোরথ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। তৎকালে ফিল্ম লাইনের যে কোনও অনুষ্ঠানেই উল্টোরথ পত্রিকার একটা সক্রিয় ভূমিকা থাকত। এদিনও তাই ছিল। আমার বন্ধু, সাহিত্যিক অসিত গুপ্ত উত্তমবাবুর লরিতে মাইক হাতে বসলেন জনগণকে মুক্ত হস্তে দান করবার আবেদন জানাতে। এ

ব্যাপারে অসিত আমার বিপরীত রাস্তায়। আমার যেমন মাইকের কাছাকাছি হলেই পা কাঁপতে থাকে, গলায় শ্লেষ্মা ভর করে, অসিতের ছিল তার উল্টো। ও এমন চমৎকার সব ভাষা দিয়ে এক্সটেম্পো বলতে পারত যে শুনে কান জুড়িয়ে যেত।

এছাড়া উল্টোরথের কর্ণধার প্রসাদ সিংহ আর তাঁর সহযোগী গিরীন্দ্র সিংহ তাঁদের কন্সাল গাড়িটা নিয়ে মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে চললেন যদি কেউ পথশ্রমে আর রোদের তাপে অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে তাঁকে গাড়িতে তুলে নেবার জন্যে।

বিশিষ্ট পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ছায়াবাণীর কর্ণধার অসিত চৌধুরি আগেই ঘোষণা করেছিলেন, এবারের এই মিছিলে যিনি সবচেয়ে বেশি কালেক্শান করতে পারবেন তাঁকে একটা দামি উপহার দেবেন। সেই কারণে মিছিলকারীদের মধ্যে একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চলছিল কে কতটা অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। আমি দেখলাম বিকাশদাকে হারাবার এই একটা সুযোগ। এর আগে দু-একটা ছোটখাট ব্যাপারে বিকাশদার সঙ্গে কম্পিটিশান করতে গেছি, কিন্তু উনি আমাদের বলে বলে হারিয়েছেন।

কিন্তু গোড়াতেই এক ধাক্কা। কালেক্শানের জন্যে আমি কোন কৌটো পেলাম না। কৌটো কম ছিল, কাজেই আমাকে আর আমার বন্ধু অভিনেতা অসীমকুমারকে দ্বৈতভাবে একখানি কৌটো মঞ্জুর করা হল। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল উত্তমবাবুই এবার হাইয়েস্ট কালেক্টার হবেন। এই যে রাস্তার দু-দিক ছাপিয়ে এত ভিড়, সে তো উত্তমকুমারকে দেখার জন্যেই। কাজেই যার যা দেয় তা তাঁর বাক্সেই দেবেন। আর সেটা হলে বিকাশদাকে একটু দুয়ো দিতে পারব।

আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গেলে বিকাশদার শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে যতটা পারা যায় আমার আর অসীমের বাক্সে আগেভাগেই আদায় করে নিতে হবে। তাই আমি আর অসীম কৌটো হাত মিছিলের একেবারে পুরোভাগে হাঁটছিলাম। পথের ধারে, কিংবা ছাদে অথবা বারান্দায় দাঁড়ানো মানুষের কাছে বন্যাপ্রপীড়িত দুর্গতদের দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র বর্ণনা করে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে নজর রাখছিলাম বিকাশদা কোথায় কীভাবে কালেক্শান করছেন। যেমন করেই হোক বিকাশদাকে হারাতেই হবে। এর আগে একটা ব্যাপারে বিকাশদা বলেছিলেন, তোদের কত মুরোদ আমার জানা আছে। অবশ্য এর সবটাই ভালোবাসার খেলা। বিকাশদার সঙ্গে আমাদের মতো সাংবাদিকদের এইরকম কৃত্রিম যুদ্ধ মাঝে মাঝেই হত।

তা বিকাশদা যে এক সময় ফুটবল খেলতেন সেটা আজকের এই মিছিলে তাঁর ঘন ঘন পজিশন চেঞ্জ করা দেখে স্থির নিশ্চিত হলাম। একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড় যেমন কখনও স্ট্রাইকার পজিশনে, কখনও মিডফিল্ডে, আবার কখনও ডিপ ডিফেন্সে উঠে-নেমে খেলেন, বিকাশদাকে দেখলাম আজকের মিছিলে তাই করতে। কখনও তিনি মিছিলের পুরোভাগে চলে আসছেন, কখনও বা রাইটে কিংবা লেফ্‌টে, আবার কখনও কখনও একেবারে মিছিলের ল্যাজের কাছে চলে যাচ্ছেন। ওঁর এই গতিবিধি কেমন রহস্যজনক মনে হল। কখনও বা একেবারেই উধাও হয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের বরাতটাই দেখছি খারাপ। পথের ধারে সার বেঁধে মানুষ এক টাকা দু'টাকার নোট হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু সেগুলো আমাদের কৌটোয় ফেলছেন না। সবারই লক্ষ্য উত্তমবাবুর কৌটো। আমাদের বরাতে জুটছে সিকি আধুলি ইত্যাদি।

হঠাৎ সেখানে যেন মাটি ফুঁড়ে বিকাশদার আবির্ভাব ঘটল। তিনি ওই দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির হাতে ধরা নোটগুলি প্রায় ছিনিয়ে নিতে নিতে বলতে লাগলেন : উত্তমের কৌটোর ভ্যালু কি ওই এক টাকা দু-টাকা নাকি? তার জন্যে পাঁচ-দশ টাকার নোট বার করুন। এগুলি সব আমার প্রাপ্য।

তারপর আমার কানের কাছে মুখটা এনে বিকাশদা বললেন : তখন থেকে দেখছি তোর দৌড়টা। মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে কম্পিটিশনে নেমেছিস্। তা ভালো কথা। উইশ ইউ গুড লাক্। তবে তার আগে কী করে কালেক্শান করতে হয় আমার কাছ থেকে শিখে নে।

এই বলে হাসতে হাসতে বিকাশদা আবার অন্য দিকে চলে গেলেন। আমি থতমত খেয়ে বোকার মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট দশ-পনেরো পরে দেখলাম বিকাশদা আবার আমার কাছে এসে গেছেন। বিকাশদা এবার

আশেপাশের বাড়ির ছাদ আর বারান্দার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলে উঠলেন : দূর থেকে বিনে পয়সায় মজা করে আর্টিস্ট দেখা হচ্ছে! দেখাচ্ছি মজা!

এই বলে বিকাশদা রাস্তা ছেড়ে একখানা পাঁচতলা বাড়িব মধ্যে ঢুকে গেলেন। আমিও কৌতূহলবশত বিকাশদার পেছনে পেছনে গেলাম তাঁকে কিছু বুঝতে না দিয়ে।

বিকাশদা দোতলার একটি দরজা নক্ কবলেন। এক ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন বিরক্ত মুখে। বিরক্ত হবারই তো কথা। বেশ নিশ্চিন্তে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর্টিস্ট দেখছিলেন, সে সময় আবার কে এল জ্বালাতে।

কিন্তু দরজা খুলে বিকাশদাকে দেখেই অবাক। এবং তাঁকে আরও অবাক করে দিয়ে বিকাশদা বলে উঠলেন : কই মাসিমা, দশ-বিশ-পঞ্চাশ কী আছে নিয়ে আসুন। আমার একদম দাঁড়াবার সময় নেই।

বিকাশদার ওই বহু পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে বারান্দা খালি করে মেয়ে-বৌরা সব হুড়মুড় করে হাজির হল দরজার সামনে। বিকাশদা তাঁদের দেখে বলে উঠলেন, বৌদি, আপনিও যা পারেন নিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি। দাদার পকেট মেরে অনেক তো জমিয়েছেন সিনেমা দেখার জন্যে। এখন সিনেমা আর্টিস্ট দেখার বাবদ তার কিছু ছাড়ুন।

দু'টি অল্পবয়সী মেয়ে ইতিমধ্যেই অটোগ্রাফ খাতা মেলে ধরেছে বিকাশদার সামনে। বিকাশদা তাই দেখে বলে উঠলেন : উঁহু, আজ বিনে পয়সায় নো অটোগ্রাফ। আজ অটোগ্রাফ নিতে গেলে পাঁচ টাকা করে দিতে হবে।

হঠাৎ আমার উপস্থিতি টের পেয়ে বিকাশদা ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখে বলে উঠলেন : এই সেরেছে। এখানেও শত্রুপক্ষের লোক হানা দিয়েছে। বৌদি কুইক্ কুইক্। দেরি হলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

, বলে আমায় টিটকিরি দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন : কী হে সাংবাদিক, অটোগ্রাফ দিয়ে কিছু কালেক্শান করার মতলব আছে নাকি? পারিস্ তো করে নে।

বিকাশদার ওই গা-জ্বালানো স্মার্টনেসের জবাবে আমিও স্মার্টলি জবাব দিলাম : আমাদের অটোগ্রাফের দাম একমাত্র মানি-লেন্ডার ছাড়া আর কে দেবে বলুন। গরিব মানুষ, মাঝে মাঝে সেরকম অটোগ্রাফ দিতে হয় বৈকি। আপনাদের মতো বরাত তো আর করে আসিনি।

আমার জবাব শুনে বিকাশদা হঠাৎ যেন কেমন ফিউজ হয়ে গেলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন : কে বললে আমাকেও মানি-লেন্ডারের কাছে ছুটতে হয় না। ফিল্ম প্রোডিউস করার মতো গুখুরি কাজ যখন করে ফেলেছি তখন মাঝে মাঝে তেমন দুষ্কর্ম করতে হয় বৈকি।

বলতে বলতে বিকাশদার গলাটা কেমন যেন কেঁপে গেল।

ততক্ষণে উপস্থিত মহিলামহলের তরফ থেকে অনুরোধ এসেছে ভিতরে গিয়ে একটু চা খাবার জন্যে। সে কথা শুনে বিকাশদা বলে উঠলেন : ওরেঃ সর্বনাশ! সে জো কি আজ আর কাছে মাসিমা। দলছুট হয়ে যাব যে। কথা দিচ্ছি আর একদিন এসে খেয়ে যাব।

এই বলে বিকাশদা ওঁদের দেওয়া পাঁচ-দশ টাকার নোটগুলো পটাপট কৌটোয় ঢুকিয়ে ফেললেন। তা সেই আমলে পাঁচ-দশ টাকার বাজারদর আজকের অনুপাতে অনেক বেশি ছিল।

এরপরে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। আজকের মিছিলের রুট ছিল দেশবন্ধু পার্ক থেকে বেরিয়ে শ্যামবাজার পাঁচমাথা, রাজবল্লভপাড়া, শোভাবাজার, দর্জিপাড়া, মিনার্ভা থিয়েটার, হেদুয়া হয়ে শেষ হবে বিডন স্ট্রিটে প্রসাদ সিংহের বাড়িতে এসে। কিন্তু শোভাবাজারে আসার আগেই দলছুট হয়ে গেলেন বিকাশদা। গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে এসে বাঁ দিকটা দেখিয়ে বললেন : ও পাড়াটাই বা বাদ যায় কেন। চল্ রবি, তোতে আর আমাতে একবার ও-পাড়াটা ঘুরে আসি।

ও-পাড়া বলতে বিকাশদা যেটাকে মিন্ করলেন সেটা হল নিষিদ্ধ পল্লী। পাছে কোন হাঙ্গামা-হুজ্জুত হয় তাই কালেক্শানের রুট থেকে ও-পাড়াটা বাদ রাখা হয়েছিল। বিকাশদার কথা শুনে আমি বলে উঠলাম : না বিকাশদা, আমি ও-পাড়ায় ঢুকছি না। যেতে হয় আপনি যান।

আমার কথা শুনে বিকাশদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন : কেন, ও-পাড়াটা কি অপরাধ করেছে

শুনি। মা লক্ষ্মীরা থাকেন বলে? তা ওরাও তো মানুষ, ওদেরও তো হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে না কি। বেশ, তুই না যেতে চাস্ তো আমি ওই শঙ্করকে নিয়ে যাচ্ছি। একাই যেতে পারতাম, তবে তোদের যা মনোবৃত্তি, হয়তো আমার চরিত্র নিয়ে পাঁক ঘাঁটতে বসবি।

বলতে বলতে বিকাশদা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের শঙ্কর বলে একটি ছেলেকে নিয়ে সোনাগাছির মধ্যে ঢুকে গেলেন।

বিকাশদা অবশ্য ও-পাড়ায় বেশিক্ষণ থাকেননি। মিনিট দশ-পনেরো পরেই বেরিয়ে এসেছিলেন। শঙ্করের মুখে শুনলাম ওইটুকু সময়ের মধ্যেই বেশ ভালো কালেক্‌শান হয়েছে। তার থেকেও বড় কথা, বিকাশদা ওখানে যা খাতির আর সম্মান পেয়েছেন সেটা নাকি অভূতপূর্ব। ও-পাড়ার মেয়েরা টপ টপ করে বিকাশদার পায়ে প্রণাম করেছেন। যেন ঈশ্বরের পায়ের ধুলো পড়েছে ওদের পাড়ায়। তবে সবার মুখেই এক কথা। উত্তমকুমার আসবেন না একবার ওদের পাড়ায়?

বেলা বারোটা নাগাদ মিছিল শেষ হল প্রসাদদার থার্টিফোর বাই ওয়ান বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে এসে। তার আগেই বেশ কিছু লোক হেদুয়ার মোড় থেকেই ধর্মতলায় ছায়াবাণীর অফিসে চলে গেলেন কৌটো জমা দিতে। উত্তমবাবু, বিকাশদা প্রমুখ বাকি কয়েকজন শিল্পী চলে এলেন প্রসাদদার বাড়িতে। এখানে একটা ভালো কালেকশানের আশা ছিল মিসেস প্রসাদ সিংহের কাছ থেকে। সেই কারণেই আসা।

ক্লান্ত ঘর্মাক্ত বিধ্বস্ত শিল্পীদের চা-জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন উল্টোরথের কর্মীরা। তারপর মিসেস প্রসাদ সিংহের তরফ থেকে পাঁচশো এক টাকা ডোনেট করা হল। আর সেটা পড়ল উত্তমকুমারের কৌটোয়।

তা দেখে বিকাশদা হাসতে হাসতে বলে উঠলেন : এটা কী হল ভাই প্রসাদ? তোমরা সবাই মিলে আমাকে এভাবে কর্নার করতে চাইছো কেন বলো দেখি? ঠিক আছে ভাই, যত পারো তেলা মাথায় তেল দাও। তবে আমিও বলে রাখছি, এভাবে আমাকে কম্‌পিটিশনে হারানো যায় না, যাবেও না।

উত্তমবাবু সব শুনে হাসতে হাসতে বললেন : ও বাবা, এর মধ্যে আবার কম্‌পিটিশন-টমপিটিশন হচ্ছে নাকি? আমি ওর মধ্যে নেই বিকাশদা।

বিকাশদা বললেন : আমিও নেই রে উত্তম। এইসব পুঁচকে জার্নালিস্টগুলো তোর আর আমার মধ্যে একটা ডিভিশনের চেষ্টা করছে। এদের থেকে একটু সাবধানে থাকিস কিন্তু।

বিকাশদার কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

বিকেলে ছায়াবাণীর অফিসে জানতে গেলাম হাইয়েস্ট কালেক্‌শান কার? এছাড়া অন্য একটা দরকারও ছিল। আমার দেশ তমলুকের কাছে ডিমারি হাইস্কুলের ডেভেলপমেন্টের জন্যে সিনেমার একটা চ্যারিটি শো কবতে চান সেখানকার হেড মাস্টারমশাই। আমার ওপরে দায়িত্ব পড়েছে একটা ফিল্ম যোগাড় করে দেবার। দেখলাম অসিতবাবু আর বিকাশদা দুজনেই আছেন। ওঁদের কাছে শুনলাম আজকের মিছিলে সব থেকে বেশি টাকা পড়েছে বিকাশদার কৌটোয়। উত্তমবাবু সেকেন্ড, আমি আর অসীম থার্ড।

বিকাশদাকে কনগ্র্যাচুলেশন জানালাম। তারপর বললাম : বিকাশদা, আপনার 'রাজা সাজা' ছবিটা একটা চ্যারিটি শোয়ের জন্যে দিতে পারেন?

বিকাশদা বললেন : কেন দিতে পারব না। আজ আমি রীতিমত চ্যারিটি মুডে আছি। কবে চাই বল্?

আমি বললাম : প্রিন্ট পাওয়া গেলে পরশু কিংবা তরসু।

বিকাশদা অসিতবাবুর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, প্রিন্ট আছে নাকি?

অসিতবাবু ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানালেন, আছে।

আমি বললাম, দক্ষিণা বাবদ কত কী দিতে-টিতে হবে?

বিকাশদা বললেন : এমনিতে আমরা চ্যারিটি শোয়ের জন্যে আড়াইশো টাকা নিই। তা তোকে তো সে কথা বলা যাবে না। বললেই তো গাল ফুলিয়ে উঠে যাবি। তুই পঁচিশটা টাকা দিস্।

আমি পকেট পঁচিশটা বার করে অসিতবাবুর দিকে এগিয়ে ধরে বললাম : আমাকে একটা রসিদ করিয়ে দিন।

বিকাশদা বললেন : না ভায়া, ওসব রসিদ-টসিদ হবে না। ও টাকা ছায়াবাণীর খাতাতেও জমা পড়বে না। ওটা জমা পড়বে আমার এই কালেক্শান বক্সে।

আমি হেসে বললাম : তাহলে ওটা উত্তমবাবুর বাক্সেই জমা দেব।

বিকাশদা হেসে বললেন : তা দাও। তবে তাতেও কিছু সুবিধে হবে না। উত্তমের সঙ্গে আমার কালেক্শানের অনেক ডিফারেন্স।

এই বলে হাসতে হাসতে বিকাশদা বললেন : তোরা আমার সঙ্গে কেন টক্কর দিতে আসিস বল্ তো? জানিস্ তো হেরে ভূত হয়ে যাবি, তবু তোদের কেন এরকম বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার শখ হয় বল্ দিকি?

সন্ধেবেলা উত্তমবাবুর সঙ্গে দেখা হতে বললাম : স্যরি উত্তমবাবু। অনেক চেষ্টা করেও আপনাকে ফার্স্ট করা গেল না।

উত্তমবাবু বললেন : সেটা আমি জানতাম। একে তো আমায় লরির ওপর তুলে দেওয়া হল, তার ওপর যা হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কি! অর্ধেক লোকের হাতের টাকা তো হাতেই রয়ে গেল। আমার কৌটো পর্যন্ত তাদের হাত এসে পৌঁছল না। একজন তো লরির চাকার নিচে যেতে যেতে কোনরকমে বেঁচে গেল।

একটু থেমে আবার বললেন : আর আপনারাও হয়েছেন তেমনি। টক্কর দিতে গেছেন বিকাশদার সঙ্গে। আপনারা কি জানেন না বিকাশদা একজন দুর্দান্ত টাইপের জিনিয়াস?

এই ঘটনার ঠিক বারো বছর পরে বিকাশদা একদিন টেলিফোন করে জানালেন : আমি বোধহয় হেরে গেলাম রে রবি!

টেলিফোনে বিকাশদার কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন কান্নার মতো শোনাল। বিকাশদার মতো সাত ঘাটের জল খাওয়া মানুষ কোনও ব্যাপারে হেরে যাবেন এটা যেন আমি ভাবতেই পারছিলাম না। টেলিফোনের এপার থেকে জিজ্ঞাসা করলাম : কী হয়েছে কী, বিকাশদা?

ফোনের ওপার থেকে বিকাশদা বললেন : সব কথা ফোনে বলা যাবে না। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তোদের অফিসে যাচ্ছি। গিয়ে সব বলব। প্রসাদ আর গিরীন অফিসে আছে তো?

আমি বললাম : গিরীনদা নেই, প্রসাদদা আছেন।

বিকাশদা বললেন : প্রসাদ থাকলেই চলবে। তুই প্রসাদকে কোথাও বেরোতে বারণ করিস। আমি এক্ষুনি রওনা দিচ্ছি। খুব জরুরি দরকার।

আমি উল্টোরথ অফিসের ভেতরের ঘরে গিয়ে প্রসাদ সিংহকে বিকাশদার খবরটা দিলাম। শুনে প্রসাদদাকেও একটু চিন্তিত মনে হল। বললেন : কী ব্যাপার : কিছু বলেছে বিকাশ?

আমি বললাম : সেসব কিছু বললেন না। বললেন, গিয়ে সব বলব।

তা একঘণ্টা নয়, বিকাশদা আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে হাজির হলেন : আমাদের উল্টোরথ অফিসে। সেই পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে কালীঘাটের সদানন্দ রোড থেকে উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে এসে পৌঁছোতে আধ ঘণ্টার বেশি কোনমতেই লাগত না। এখনকার মতো এত যানজট সেই আমলে ছিল না। কথায় কথায় রাস্তা অবরোধ তো কল্পনাই করা যেত না।

বিকাশদা একাই এলেন না। তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁর সহকারি, শুভানুধ্যায়ী এবং সর্বক্ষণের সঙ্গী সুনীল রায়চৌধুরি ওরফে সুনুদা। এই সুনুদা আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ। অকৃতদার, পরোপকারী, আড্ডাবাজ এই মানুষটিকে নিয়ে আলাদা করে আমি হয়তো কোনদিনই লিখতে পারব না, কিন্তু আমার বিভিন্ন লেখায়, বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই মানুষটির কথা বারেবারেই আসবে।

বিকাশদা ঝড়ের গতিতে এসে ঘরে ঢুকলেন। কাউকে কোনও কথা বলবার ফুরসত না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের কারও সঙ্গে অবধূতের আলাপ আছে?

অবধূত অর্থে তন্ত্রসাধক সাহিত্যিক কালিকানন্দ অবধূত। সেই পঞ্চাশের দশকে যাঁরা সাহিত্য পড়তেন তাঁদের কাছে অবধূত ছিলেন এক বিস্ময়কর মানুষ। তাঁর লেখা 'বশীকরণ', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ইত্যাদি বই নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তখন তুমুল আলোড়ন। ঘরে ঘরে তখন অবধূতের

বইয়ের সমাদর। যে কোন বিয়েবাড়িতে ক'নের হাতে অন্তত ডজনখানেক অবধূতের লেখা বই যে উপহার পড়বে সেটা অবধারিত। শুধু তাঁর লেখা সাহিত্য নিয়েই নয়, তাঁর ব্যক্তিজীবন নিয়েও তখন নানা জল্পনা কল্পনা।

তা সেই অবধূতের কোন লেখা আমরা তখন পর্যন্ত উল্টোরথে ছাপতে পারিনি। তিনি যা কিছু লিখতেন তা সজনীকান্ত দাশ সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' অথবা গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত 'কথাসাহিত্য' পত্রিকাতেই ছাপা হত। ওঁদের চাহিদা মিটিয়ে অন্য কোথাও লেখার ফুরসত পেতেন না তিনি।

পরে অবশ্য আমার সঙ্গে অবধূতের আলাপ হয়েছিল। শুধু আলাপই নয় প্রচণ্ড ঘনিষ্ঠতা। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করবাবুর বদান্যতায় আমি 'সাতরঙ' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক হতে পেরেছিলাম। সেই পত্রিকায় অবধূতকে দিয়ে অনেক লেখা লিখিয়েছিলাম। তখন প্রতি রবিবার আমার কাজই ছিল সকালে উঠে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে অবধূতের বাড়ি চলে যাওয়া। সারাদিন সেখানে প্রচুর খাওয়া আর প্রচুরতর আড্ডা দিয়ে বিকেলে খেয়া পেরিয়ে ওপারে সমরেশ বসুর নৈহাটির বাড়িতে চলে যেতাম। সেখানে সারা সন্ধ্যা আড্ডা দিয়ে পান-ভোজন সেরে ফিরে আসতাম কলকাতায়।

কিন্তু বিকাশদা যেদিন প্রশ্নটা করলেন সে সময়ে আমাদের সঙ্গে অবধূতের আলাপ ছিল না। বিকাশদার প্রশ্নের উত্তরে প্রসাদদা বললেন : না নেই। কেন, কী হয়েছে?

বিকাশদা বললেন : অবধূতের সঙ্গে আলাপ আছে এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ লোকের দরকার।

প্রসাদদা বললেন : সেটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। আমি তোমার সঙ্গে গজেনদার আলাপ করিয়ে দিতে পারি। গজেনদা অবধূতের বইয়ের পাবলিশার। কিন্তু ব্যাপারটা কী খুলে বলো দেখি।

বিকাশদা বললেন : বেশ কিছুদিন আগে আমি অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' উপন্যাসের ছবির রাইট কিনেছি। ডাইরেক্টলি ওঁর কাছ থেকে নয়। আর একজনের রাইট কেনা ছিল, তার কাছ থেকে কিনেছি। এখন শুনতে পাচ্ছি সুশীল মজুমদার নাকি ওটার ছবি করবেন। ওঁর কোন এক প্রোডিউসার নাকি স্ট্রেট অবধূতের কাছ থেকে রাইট কিনেছেন। এদিকে উত্তমকে সাইন করিয়েছি এই ছবির জন্যে। উত্তম ডেটও দিয়েছে। আমার অলরেডি অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। ওদিকে সুশীলদার সঙ্গেও আমি কোনরকম ঝগড়াঝাটিতে যেতে চাইছি না। তাই এমন একজন কাউকে খুঁজছি যাঁর কথা অবধূত শুনবেন। আমি ভদ্রভাবে একটা সেট্‌লমেন্টে আসতে চাইছি। ছবিটা আমি যাতে করতে পাই তার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এ ছবিটাকে ঘিরে আমি অনেক স্বপ্ন দেখেছি।

প্রসাদদা চুপ করে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে। আমি দেখছি কতটা কী করা যায়। একটা উপায় তো বার করতেই হবে।

এরপরে কী ঘটেছিল তা আমি ডিটেলসে বলতে পারব না। সেসব ব্যাপারে আমার সাক্ষাৎ কোন যোগাযোগ ছিল না। তবে কিছুদিন বাদে খবর পেলাম বিকাশদা 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবি করার স্বত্ব পেয়েছেন। আর সুশীলদা পেয়েছিলেন ডাবিং রাইট। সুশীলদার প্রোডিউসার আর সেই রাইটটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেননি।

অতএব বিকাশদা যে টেলিফোনে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন এবারে বোধহয় তিনি হেরে গেলেন বলে, সেটা আর ঘটল না। বিকাশদা শেষ পর্যন্ত জিতেই গেলেন।

এই ঘটনার উপসংহারে আমরা এমন একটি কাজ করে ফেলেছিলাম যার জন্য আজও মর্মবেদনা বোধ করি। 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর ব্যাপারে বিকাশদাকে বিজয়ী হতে দেখে আমরা উৎসাহের আতিশয্যে উল্টোরথের পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে একটা কার্টুন ছেপেছিলাম। কার্টুনটিতে দেখানো হয়েছিল বিকাশদা আর সুশীল মজুমদার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, তাঁদের একজনের হাতে মরুতীর্থ হিংলাজ উপন্যাসটি আর অপরজনের হাতে একটি ডাব। প্রসাদদার নির্দেশে বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট রেবতীভূষণ সম্ভবত ছবিটি এঁকেছিলেন। এ কাজটা যে ভালো করিনি সেটা আমরা কিছুদিন পরেই বুঝতে পেরেছিলাম। সুশীলদা বিভিন্ন জনের কাছে এ নিয়ে দুঃখ করেছিলেন। বলেছিলেন : ওদের কাছে আমি এটা আশা

কবিনি। ওদের আমি এত ভালোবাসি আর ওরাই কিনা আমাকে বেইজ্জত করল।

এই ব্যাপাবটা যে সুশীলদাকে কী পরিমাণ আহত করেছিল সেটা বুঝতে পেরেছিলাম ওই ঘটনার বিশ বছর পরেও সুশীলদাকে ওই ব্যাপারটা ভুলতে না দেখে। সুশীলদা তখন সর্বকর্ম থেকে অবসর নিয়ে তাঁর লেক গার্ডেনসের বাড়িতে কাল কাটাচ্ছেন। সে সময় আমি তাঁব কাছে মাঝে মাঝে যেতাম গল্প করতে। প্রথম দিনই তিনি ওই কার্টুনের কথাটা উল্লেখ করেছিলেন। শুনে লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলাম। ক্ষমা চাইবার মতো সাহসও হয়নি। অপরাধটা এতই গুরুতর। সুশীল মজুমদারের মতো একজন প্রবীণ এবং সম্মানীয় চলচ্চিত্র পরিচালককে ওইভাবে হেনস্থা করা সত্যিই আমাদের উচিত হয়নি।

যাক, আবাব ফিরে আসি বিকাশদার প্রসঙ্গে।

এই যে একটু আগে উল্লেখ করলাম বিকাশদা সাত ঘাটের জল খাওয়া মানুষ, এ কথাটা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। ফিল্মে অভিনয়ের ব্যাপাবে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করাব আগে বিকাশদা তাঁর জীবনে অনেক কিছুই করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনটাই ক্লিক করেনি।

বিকাশদার জন্ম ১৯১৬ সালে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে। মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন। পডাশোনায় ছোটবেলা থেকেই ব্রিলিয়ান্ট। বিকাশদার সাহেবী কেতায় ইংরিজি উচ্চারণ যাঁরা শুনেছেন তাঁদের বোঝানো মুশকিল ছিল যে উনি কোন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েননি। এ ব্যাপারটা তিনি আয়ত্ত কবেছিলেন হলিউডের ইংরিজি ছবি দেখে দেখে।

১৯৩২ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পাস করবার পর বিকাশদা ভর্তি হয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রেসিডেন্সিতে সেই আমলে দারুণভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ছাত্র ভর্তি করা হত। বিকাশদা নিজের যোগ্যতাতেই সে সুযোগ পেয়েছিলেন। এর জন্যে ওঁর বাবা যুগলকিশোর রায়কে কারুব দ্বারস্থ হতে হয়নি। কাউকে ধরাধরি করতে হয়নি।

প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হবার পব বিকাশদা সাহিত্য নিয়ে মাতামাতি শুরু করলেন। বাংলা সাহিত্যে নব্যধারার প্রবর্তকরা তখন রীতিমতো হই-চই ফেলে দিয়েছেন। ইয়ং বেঙ্গল তখন সেই সাহিত্য নিয়ে মাতামাতি শুরু করেছে। বিকাশদাও নিয়মিত সাহিত্য রচনায় মনযোগ দিলেন। প্রেসিডেন্সির কলেজ ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। উৎসাহের আতিশয্যে 'বেদুইন' নামে একখানি সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশ কবে ফেলেছিলেন। যদিও এই পত্রিকার আয়ুষ্কাল ছিল খুব স্বল্প।

বিকাশদাব এই সাহিত্যসাধনার খবরের বিন্দুবিসর্গও আমি জানতাম না। ওঁর সঙ্গে আলাপ হবার বছর পনেরো পবে একদিন একটি ঘটনায় আমি সাহিত্যিক বিকাশ রায়ের সন্ধান পেয়ে গেলাম হঠাৎই।

সেটা বোধহয়, ১৯৭২ কি '৭৩ সাল হবে। আমি তখন আনন্দবাজারে। 'দেশ' পত্রিকার সাব-এডিটার। একদিন বিকাশদা ফোন করলেন : এই রবি, সামনের রবিবার তুই একবার আমার বাড়িতে আসতে পারবি?

আমি বললাম : রবিবার তো আমার অফ-ডে নয়, আমার অফ-ডে বুধবার। বুধবারে গেলে চলবে?

ফোনের ও-প্রান্ত থেকে বিকাশদা বললেন : বুধবার তো আমার শুটিং আছে। তুই সাগরদাকে বলে এই রোববারটা ছুটি নিয়ে নে না ভাই। তোকে আমার বিশেষ দরকার।

আমি বললাম : দেখি চেষ্টা করে।

বিকাশদা বললেন : দেখি নয়, তোকে যেমন করে হোক আসতেই হবে। খুব সকাল সকাল চলে আসবি। ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ সব আমার এখানেই করবি। একেবারে সন্ধেবেলা ছাড়া পাবি। সন্ধের পর আর তোকে আটকাব না। আমি তো জানি সন্ধের পর তোর মৌতাতের সময়।

আমি বললাম : এই বিকাশদা, কী যা-তা বলছেন। আমি রোজ সন্ধের বুঝি ওইসব করি?

বিকাশদা বললেন : না রে না, এমনি তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। যাক, তুই রোববার আসছিস তাহলে। আমি কিন্তু কোন অজুহাত শুনব না। তোর বিকাশদার অর্ডার। বুঝলি?

আমি বললাম : যো হুকুম স্যার।

তা সেই রবিবার সকাল আটটার মধ্যেই বিকাশদার বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলাম। বিকাশদা তখন

থাকতেন যোধপুর পার্কে। ওই অত সকালে বিডন স্ট্রিট থেকে যোধপুর পার্ক পৌঁছতে আমাকে অনেক মেহনত করতে হয়েছিল।

বিকাশদা বোধহয় আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন : এসে গেছিস। আয় আয়। চটপট ব্রেকফাস্ট সেরে নে। তারপর তোকে নিয়ে একটা জরুরি কাজে বসব।

মোক্ষম একটা ব্রেকফাস্টের পর বিকাশদা আমার হাতে দু'খানা মোটা ফুলস্কেপ সাইজের খাতা ধরিয়ে দিয়ে বললেন : এই খাতা দু'খানা মন দিয়ে পড় দিকি।

আমি বললাম : এতে কী আছে?

বিকাশদা বললেন : পাতা উল্টে দেখ না কী আছে। পড়ে তোর অনেস্ট ওপিনিয়ান দিবি আমাকে। বিকাশ রায় বলে খাতির করে কথা বলবার দরকার নেই।

খাতার প্রথম পাতা উল্টে দেখলাম লেখাটার একটা নাম দেওয়া আছে। কী নাম সেটা আর এখন মনে পড়ছে না। দু-চার লাইন পড়বার পর বুঝতে পারলাম এটা বিকাশদার আত্মজীবনী। শুরু করেছেন একেবারে ওঁর ছোটবেলা থেকে।

ঝরঝরে লেখা. তরতর করে পড়ে গেলাম। ভাষার বেশ বাঁধুনি আছে। লাঞ্চের আগেই একটা খাতা শেষ করে ফেললাম। দুপুরের খাবার খেতে খেতে লেখাটা সম্পর্কে কিছু বলতে যেতেই বিকাশদা বাধা দিয়ে বলে উঠলেন : নো নো, নট্ এ সিঙ্গল ওয়ার্ড নাউ। আগে পুরো লেখাটা পড়া শেষ হবে, তারপর আলোচনা।

বিকেলের মধ্যে বাকি খাতাটাও পড়া শেষ হয়ে গেল। বললাম : এবারে কি কিছু বলা যেতে পারে?

বিকাশদা বললেন : স্বচ্ছন্দে। সেইজন্যেই তো তোকে সাধ্যসাধনা করে আনা হয়েছে।

বললাম : আপনি কি কোন একসময়ে সাহিত্য করতেন?

বিকাশদা বললেন : তা করতাম। একেবারে প্রথম যৌবনে। তা এ প্রশ্নটা তোর মনে এল কেন?

বললাম : ভাষার বাঁধুনি দেখে। ঘটনাগুলোকে সাজানোর ভঙ্গি দেখে। বর্তমান থেকে চট করে অতীতে গিয়ে আবার বর্তমানে ফিরে আসা দেখে। লেখাটার মধ্যে সাহিত্যগুণ প্রচুর।

শুনে বিকাশদার মুখটা আনন্দে ঝলমল করে উঠল। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে বিকাশদা তাঁর কলেজ জীবনের সাহিত্যচর্চার কাহিনী বলে গেলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন : এই লেখাটা ছাপার যোগ্য কিনা সেটা বল?

আমি বললাম : অবশ্যই যোগ্য। কিন্তু ছাপাবেন কোথায়?

বিকাশদা বললেন : কেন, তোদের 'দেশ' পত্রিকায় ছাপাতে পারবি না?

আমি বললাম : বিকাশদা, 'দেশ' পত্রিকায় ছাপাবার মালিক তো আমি নয়। আমাদের সম্পাদক সাগরময় ঘোষই একমাত্র সে ডিসিশন নিতে পারেন।

বিকাশদা বললেন : সাগরদা তো শুনেছি তোকে খুব স্নেহ করেন। তুই রিকোয়েস্ট করলে কি সাগরদা একবার লেখাটা পড়ে দেখবেন না?

আমি বললাম : সেটা আমি বলতে পারি। কিন্তু আল্‌টিমেটলি কী হবে সেটা আমি বলতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত যদি না ছাপা হয় তখন আবার আপনি আমায় দুষবেন না তো?

বিকাশদা বললেন : পাগল হয়েছিস্। আমি কি এত ছেলেমানুষ যে যে-ব্যাপারে তোর হাত নেই তার জন্যে তোকে দায়ী করব। আসলে সেই যে ইয়াং বয়েসে দেশ-এর পাতায় ধীরাজদার লেখা 'যখন পুলিশ ছিলাম' এবং 'যখন নায়ক ছিলাম' পড়তাম তখন থেকেই আমারও ইচ্ছে দেশ-এ আমার একটা লেখা ছাপা হোক। এখন যখন তুই বলছিস আমার লেখাটা পাতে দেবার মতো তখন একটা চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী। হয় হবে, না হয় না হবে।

তা বিকাশদার লেখাটার কথা দু-চারদিন পরে সাগরদার কাছে বলেছিলাম। সব শুনে সাগরদা বললেন : আমাদের কাগজে এখন কোনও ফিল্মস্টারের লেখা ছাপার অসুবিধে আছে।

আমি বললাম : আগে তো ছাপা হয়েছে সাগরদা। ধীরাজ ভট্টাচার্যের হয়েছে, অহীন্দ্র চৌধুরির হয়েছে।

সাগরদা বললেন : সেইজন্যেই তো ছাপা যাচ্ছে না। ওই লেখাগুলো ছাপা হবার পর বাজারে সবাই বলাবলি করতে লাগল যে দেশ পত্রিকার যা কিছু রমরমা সব ওই ফিল্মস্টারদের লেখা ছাপার দৌলতে। এ কথাটা আমার কাছে খুব প্যালেটেবল নয়। তাই আমি আর অশোক দু'জনে মিলে ঠিক করেছি ফিল্মস্টারদের লেখা আর নয়।

অশোক অর্থে স্বর্গত অশোককুমার সরকার। আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক। ওই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী।

আমি বললাম : তবু একবার আপনি বিকাশদার লেখাটা পড়ে দেখলে পারতেন।

সাগরদা বললেন : পড়ে কী করব বলো। ভালো লাগলেও যখন ছাপবার উপায় নেই তখন মিছিমিছি পড়ে লাভ কী।

কথাটা বিকাশদাকে সামনাসামনি জানাতে সংকোচ বোধ করলাম। তাই শেষ পর্যন্ত টেলিফোন করেই জানিয়ে দিলাম।

শুনে টেলিফোনের অপর প্রান্তে বিকাশদা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে। তুই আর কী করবি বল্। আমার লাক্‌টাই দেখছি খারাপ।

এর কয়েক মাস পরে একদিন বিকেলে আমি দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে বসে কাজ করছি, এমন সময় নিচে রিসেপশান থেকে শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত টেলিফোন করে জানালেন, বিকাশ রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন চিফ সিকিউরিটি অফিসার শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। সারা জীবন মিলিটারি কায়দায় তিনি চালিয়েছেন। জীবনের বেশির ভাগ সময় খেলাধুলা নিয়ে কাটিয়েছেন। জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের তিনি ছিলেন একজন উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি। কড়াভাবে নিয়মশৃঙ্খলা তিনি মানেন। খেলাধুলা নিয়ে একটু-আধটু লেখাজোখারও শখ আছে তাঁর।

আনন্দবাজারের রিসেপশানে তিনি নিয়মিত বসতেন। তাঁর কাজ ছিল অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের আটকানো। অত্যন্ত চেনামুখ ছাড়া বাকি সবাইকে তাঁর জেরার মুখে নাজেহাল হতে হত। তার ফলে আমাদের অত্যন্ত বাঞ্ছিত ব্যক্তিকেও কখনও কখনও বিরক্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে হয়েছে। একবার তো স্কটিশচার্চ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ নাট্যকার ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এইভাবে ফিরে গিয়ে আমাদের প্রবীণ সহকর্মী মনুজেন্দ্র ভঞ্জকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন : রিসেপশান শব্দের যে একটি অভিধানিক অর্থ আছে তা আপনাদের পত্রিকার রিসেপশান কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ালে ভুলে যেতে হয়।

রিসেপশান কাউন্টারে শান্তিবাবুর এহেন কড়াকড়ি নিয়ে অনেক মজার মজার গল্পো আছে। কিন্তু সেসব আলোচনার স্থান এটা নয়।

সেই শান্তিবাবু যখন রিসেপশান থেকে সেদিন দেশ পত্রিকার ঘরে টেলিফোন করে বললেন, ও রবিবাবু, আপনার সঙ্গে বিকাশ রায় দেখা করতে এসেছেন, তখন আমি তাঁর কথাটা ঠিক অনুধাবন করতে পারিনি। সেই মুহূর্তে পেজ মেক-আপের কিছু জটিলতা নিয়ে আমি বিব্রত ছিলাম। তাই শান্তিবাবুকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম : কে বিকাশ রায়?

টেলিফোনের ওপার থেকে শান্তিবাবু যেন খেঁকিয়ে উঠলেন আমার কথা শুনে। বললেন : বিকাশ রায় আবার কলকাতায় ক'জন আছে। বিকাশ রায় তো ওই একজনই। আমাদের গ্রেট সিনেমা অ্যাক্টর বিকাশ রায়।

শুনেই আমি আঁতকে উঠলাম। শান্তিবাবুর যা জিজ্ঞাসাবাদের বহর তাতে বিকাশদা আবার বিরক্ত হয়ে ফিরে না যান। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম : হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁকে ওপরে পাঠিয়ে দিন শিগ্‌গির।

আমার কথা শুনে শান্তিবাবু হাসতে হাসতে বললেন : সে কথা আর বলতে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। স্লিপ-টিপও সই করাইনি।

আমি বললাম : বেশ করেছেন। এটা একটা কাজের কাজ করেছেন। ওঁকে বেশি জেরা-টেরা করেননি তো?

শান্তিবাবু বললেন : পাগল হয়েছেন। আমি মানুষ চিনি মশাই। আমার এখান থেকে একটি আজেবাজে লোককেও গলে যেতে দেব না কোনদিন। দেখেন এতক্ষণে হয়তো বিকাশবাবু আপনার ঘরে পৌঁছে গেছেন।

সত্যিই তাই। টেলিফোনটা বাখতে না রাখতেই দেখলাম বিকাশদা হাসতে হাসতে দরজা ঠেলে আমাদের ঘরে ঢুকলেন।

আমি বললাম : আসুন বিকাশদা।

বিকাশদা বললেন . আমাকে দেখে আঁতকে উঠলি তো। ভয় নেই, আমি তোর কাছে লেখা ছাপাবার জন্যে আসিনি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম : সেটুকু জ্ঞানবুদ্ধি যে আপনার আছে সেটা আমি জানি। তা না থাকলে অ্যাকটর থেকে প্রোডিউসার, আবার প্রোডিউসার থেকে ডিরেক্টার হতে পারতেন না।

বিকাশদাও হাসতে হাসতে বললেন : খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শিখেছিস্ দেখছি। এখন শোন যে জন্যে তোর কাছ আসা। আমার এক রিলেটিভ স্টেট্‌সে থাকে। সে তোদের দেশ পত্রিকার গ্রাহক। গত দু'মাস ধরে সে কাগজ পাচ্ছে না। তাই আমায় খোঁজ নিতে বলেছে। সাবস্‌ক্রিপশানের মেয়াদ শেষ হয়ে যেতেও পারে। সেটাও খোঁজ নিতে বলেছে। যদি তা হয় তবে টাকা দিয়ে ওটা রিনিউ করে দিতে বলেছে। এখন এ ব্যাপারে কোথায় কী খোঁজ-খবর নিতে হবে সেটা নিয়ে আমার কাজটা উদ্ধার করে দে।

আমি বললাম : ওটা তো আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে হবে না, সার্কুলেশনে যেতে হবে। আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি চলুন। তার আগে চা-টা তো খান, তারপর যাচ্ছি।

বিকাশদা বললেন : না ভায়া, চা আর চলবে না। দিনে দু'বারের বেশি ডাক্তারের নিষেধ। তা তোর এখানে আসবার আগে আজকের কোটা কমপ্লিট করে এসেছি।

বলতে বলতে বিকাশদা চেস্টারফিল্ড সিগারেটের একটা প্যাকেট বার কবে তার থেকে একটা সিগারেটের আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে ঠোঁটে চেপে বললেন : তোর দেশলাইটা দে তো।

আমি পকেট থেকে দেশলাই বার করে ওঁর হাতে দিয়ে বললাম : এই যে আধখানা সিগারেট এটাও কি ডাক্তারের নির্দেশ না ব্যয়সংকোচ?

বিকাশদা জ্বলন্ত সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন : বলতে পারিস দুটোই। ডাক্তার একেবারেই সিগারেট ছেড়ে দিতে বলেছিল। সেটা পারছি না দেখে মাঝে মাঝে আধখানা করে খাবার পারমিশান দিয়েছে। তবে দিনে তিনটের বেশি কোনওক্রমেই নয়। সেটা হলে নাকি আমাকে আর বাঁচানো যাবে না।

আমি বললাম : আর একটা?

বিকাশদা একটু উদাস গলায় বললেন : ফিল্ম প্রোডিউস তো কোনওদিন করিসনি। করলে বুঝতে পারতিস, আধখানা-সিগারেট কেন, কখনও কখনও আধপেটা খেয়ে থাকতেও হতে পারে।

আমি বললাম : এটা আপনার বাড়াবাড়ি। আপনার এমন অবস্থা নিশ্চয় হয়নি যাতে আপনাকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হবে। এত ছবিতে যে কাজ করছেন তার টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায় শুনি? না কি সব বিনে পয়সায় কাজ করছেন?

বিকাশদা বললেন : না রে, ডিরেক্টার হবার পর দেখতে পাচ্ছি আমার কাজ খুব কমে গেছে। পাছে ঠিক ঠিক ডেট্ দিতে না পারি তাই অনেকে আমাকে কাস্ট করতে ভয় পাচ্ছে।

আমি বললাম : সেটা খুবই স্বাভাবিক। আপনি তো আগে নিজের ছবির ডেট দেবেন, তারপর অন্যের ছবিতে।

বিকাশদা বললেন : না ভায়া, ওইটাই আমি করি না। আমি আগে অন্যকে ডেট দিই। তারপর নিজের ছবির জন্যে ডেট রাখি। দরকার পড়লে নিজের ছবির কাজ ক্যানসেল করে অন্যকে ডেট দিই। আমি তো ওইরিজিন্যালি অ্যাক্টর, তারপর অন্য কিছু। অ্যাকটিং আমার প্রফেশান, অ্যাকটিং আমার প্যাশন। ওর থেকে বড় কিছু আমার কাছে নেই।

সেটা ঠিক কথা। অ্যাকটিং-এর ব্যাপারে বিকাশদা যে কতটা প্যাশনেট তার দু-একটি ঘটনা আমার জানা আছে। সে কথায় পরে আসছি। আপাতত বিকাশদার আমেরিকা প্রবাসী রিলেটিভের প্রবলেমটা সল্‌ভ করা দরকার।

বিকাশদাকে নিয়ে সার্কুলেশন ডিপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেলাম। বিকাশদাকে বললাম · আমাদের ঘরে এলেন, একবার সাগরদার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

বিকাশদা বললেন : যাওয়া তো উচিত। কিন্তু সাগরদা কিছু মাইন্ড করবেন না তো?

আমি বললাম : একদম না। সাগরদা সে ধরনের মানুষই নন। আপনাকে দেখলে তিনি বরং খুশিই হবেন।

বিকাশদা বললেন তাহলে চল্।

সাগরদাব ঘবে ঢুকে দেখলাম সাগরদা মনোযোগ দিয়ে একখানা পাণ্ডুলিপি পড়ছেন। একটু ইতস্তত কবলাম। ভাবলাম ধ্যান ভঙ্গ কবা উচিত হবে কিনা? ওদিকে বিকাশদাকে বড় মুখ করে ডেকে নিয়ে এসেছি। তাই মবিযা হযে বলে উঠলাম সাগরদা, বিকাশদা এসেছেন আপনাব সঙ্গে দেখা করতে।

আমাব কথায় সাগবদা মুখ তুলে তাকালেন। তারপর আমার পেছনে বিকাশদাকে দেখতে পেয়ে পাণ্ডুলিপিটাকে একপাশে সরিযে রেখে বললেন : আরে এসো এসো বিকাশ, বোসো।

বিকাশদা সাগরদাব মুখোমুখি একটা চেয়াবে বসলেন। তাবপর জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কেমন আছেন সাগরদা?

সাগরদা বললেন : আমি ভালোই আছি। তুমি কেমন আছো?

বিকাশদা বললেন : এই চলে যাচ্ছে।

সাগবদা এবার আমাব দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন বিকাশকে চা-টা খাইয়েছো তো?

আমি বললাম : বিকাশদা চা খাবেন না। ডাক্তারের বারণ।

সাগরদা এবার বিকাশদার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। বললেন · কী ব্যাপাব?

বিকাশদা বললেন · ব্যাপারটা সেই চিরাচরিত। হৃদয়ঘটিত।

সাগরদা একটু হাসলেন। বললেন : তাহলে তো সাবধান থাকাই উচিত।

বিকাশদা বললেন · যতটা পারছি থাকছি সাগরদা।

আমি মনে মনে ভয় পাচ্ছিলাম। বিকাশদা বোধহয় তাঁর সেই লেখাটার কথা তুলবেন। কিন্তু বিকাশদা সেদিক দিয়ে গেলেন না। সাগরদার দিকে তাকিয়ে বললেন : আমি একটু রবিকে সার্কুলেশন ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যাচ্ছি।

সাগরদা বললেন : হ্যাঁ যাও না। রবি, বিকাশেব কী দবকার সেটা করে দিয়ে এসো।

কী দরকার সেটা আর সাগরদা জিজ্ঞাসা করলেন না। অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করার মানুষ নন সাগরদা। সত্যিকারের কালচার্ড হলে যা হয় আর কি?

আমি বিকাশদাকে নিয়ে চারতলায় সার্কুলেশন ডিপার্টমেন্টে গেলাম। সেই সময় আনন্দবাজারের সার্কুলেশন ম্যানেজার ছিলেন মদন মিত্র। পরে তিনি আজকাল পত্রিকার ম্যানেজার, সম্পাদক। তারওপর তিনি মিত্র প্রকাশনের 'আলোকপাত' আর 'মনোরমা' পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার।

মদনবাবু বিকাশদাকে সাদরে এবং সাগ্রহে বসতে দিলেন। বিকাশদার প্রয়োজনের কথা শুনলেন। তারপর ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে যা করণীয় সেই নির্দেশ দিলেন। ইতিমধ্যে আনন্দবাজারের চারতলায় বিকাশদার আগমনবার্তা রটে গেছে। মদনবাবুর ঘরের দরজায় দু-চারজন করে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যাচ্ছেন। বিকাশদা এবং মদনবাবু দু'জনেই মনে হল ব্যাপারটা উপভোগ করছেন। কারণ কারও কপালেই বিরক্তির রেখা দেখতে পাইনি।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সব কাজ হয়ে গেল। ভদ্রলোকের চাঁদা ফুরিয়ে গিয়েছিল। বিকাশদা নতুন করে টাকা দিয়ে সাবস্ক্রিপশন রিনিউ করিয়ে নিলেন। যে দুটি সংখ্যা তিনি পাননি সেটাও পাঠিয়ে দিতে বললেন। নইলে তাঁর সেটটা নষ্ট হয়ে যাবে। প্রবাসী বাঙালিরা পুরোনো সংখ্যাগুলি সযত্নে বাঁধিয়ে রাখেন। অবসর সময়ে বার বার পড়েন। ওই বইগুলিই স্বদেশের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র।

আনন্দবাজারের চারতলা থেকে নামতে নামতে বিকাশদাকে বললাম : একবার সেবাব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

সেবাব্রতবাবু মানে সেবাব্রত গুপ্ত। উনি তখন 'আনন্দলোক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

বিকাশদা আমার কথাটা শুনে একটু থমকে গেলেন। বললেন : কী দরকার!

আমি বললাম : দরকার অন্য কিছু নয়। ওই একটা কার্টসি ভিজিট আর কি! আপনি আনন্দবাজার অফিসে এসেছেন সে কথাটা চাউর হয়ে গেছে। একবার ওঁর সঙ্গে দেখা না করে গেলে ব্যাপারটা কেমন বিচ্ছিরি দেখাবে না?

বিকাশদা বললেন : বলছিস?

আমি বললাম : হ্যাঁ তাই।

বিকাশদা কেমন যেন রহস্যময় চোখে তাকালেন। তারপর বললেন : আমাকে সেবার ঘরে নিয়ে যাবার পিছনে তোর কোন একটা উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হচ্ছে?

আমি বললাম : থাকতেও তো পারে।

বিকাশদা বললেন : গিয়ে কিছু কাজ হবে বলে মনে হয়?

আমি বললাম : হতেও তো পারে।

বিকাশদা বললেন : তবে চল।

একটা অনিচ্ছুক ঘোড়াকে যেভাবে জল খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া হয় বিকাশদাকে সেইভাবে টেনে নিয়ে গেলাম আনন্দলোকের ঘরে। কিন্তু সেবাবাবুর ঘরে ঢুকে বিকাশদা যেভাবে হই-চই করে সেবাবাবুর সঙ্গে আলাপচারিতা জুড়ে দিলেন তাতে আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। বুঝলাম, বিকাশদা সত্যিই একজন তুখোড় অভিনেতা।

বিকাশদা মিনিট দশেক সেবাবাবুর ঘরে ছিলেন। আমাকে আরও অবাক করে সেবাবাবুর অনুরোধ মতো চা পান করলেন। তারপর বেরিয়ে এসে আমার দিকে সেইরকম রহস্যময় চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কেমন দেখলি?

আমি অস্ফুটে বলে উঠলাম : আপনার জবাব নেই বিকাশদা।

তিনতলার লিফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে বিকাশদা বললেন : এটি জানবি।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে লিফ্‌ট থেকে বেরোতেই দেখলাম সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে একটু হাসলেন। আমার পিছনে বিকাশদাকে দেখে কৌতূহলের চোখে তাকালেন।

আমি ওঁদের আলাপ করিয়ে দিলাম। বললাম : বিকাশদা, উনি হচ্ছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ।

নামটা শুনেই বিকাশদা হই-চই করে উঠলেন। বুদ্ধদেববাবুর দিকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন : মাই গড। আপনি এত ইয়াং। আমি তো ভেবেছিলাম আপনি একজন বয়স্ক মানুষ। আমি মশাই আপনার লেখার দারুণ ভক্ত। আপনার 'হলুদ বসন্ত' টেরিফিক।

বুদ্ধদেববাবু লাজুক লাজুক মুখে বিকাশদার করমর্দন করলেন। বললেন : আমিও আপনার অ্যাকটিং-এর দারুণ ভক্ত। 'বেয়াল্লিশ' ছবিতে আপনার অভিনয় তো আজও ভুলতে পারিনি।

আমি পুলকিত চক্ষে ওঁদের দুজনের এই পরস্পর পৃষ্ঠকণ্ডুয়ন দেখতে লাগলাম। ওঁদের উচ্ছ্বাসের আবেগ একটু কমতেই বিকাশদাকে বললাম : বুদ্ধদেববাবুর মিসেসও খুব বিখ্যাত।

বিকাশদা বললেন : তাই নাকি?

আমি বললাম : হ্যাঁ। ঋতু গুহর রবীন্দ্রসংগীত শুনেছেন তো? তিনিই বুদ্ধদেববাবুর মিসেস।

বিকাশদা বললেন : সর্বনাশ! উনি তো আমার অত্যন্ত প্রিয় শিল্পী। বুদ্ধদেববাবু, আপনার গৃহিণীকে আমার নমস্কার জানাবেন।

বুদ্ধদেববাবু বললেন : নিশ্চয় জানাব।

বিকাশদার গাড়িটা আনন্দবাজার অফিসের সামনেই পার্ক করা ছিল। বিকাশদাকে গাড়িতে তুলে দিলাম। বিকাশদা বললেন : রবি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোকে অনেক কষ্ট দিলাম।

আমি আপ্যায়িতের হাসি হাসলাম। বললাম : এখন বাড়ি যাচ্ছেন তো?

বিকাশদা বললেন : না রে। ময়রা স্ট্রিটে উত্তমের ওখানে একবার যেতে হবে। শিল্পী সংসদের একটা প্রবলেম হয়েছে। তাই নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ওইটুকু সময়ের মধ্যেই দেখলাম বিকাশদার গাড়ির আশপাশে দু-চার জন ভক্তের ভিড় জমে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে বিকাশদা বললেন : চলি রে।

কথাটা শেষ হতে না হতেই বিকাশদার গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

সেবাবাবুর ঘরে বিকাশদার পদার্পণের একটা সুফল ফলেছিল। কয়েক সংখ্যা পরেই আনন্দলোকে বিকাশদার লেখা বেরিয়েছিল। অভিনয় জীবনের নানা টুকরো টুকরো ঘটনা পর পর বেশ কয়েকটি সংখ্যা ধরে লেখাটা চলেছিল। পরে ওটা বই হয়েও বেরিয়েছিল কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশকের ঘর থেকে।

লেখাগুলো আমার খুব ভালো লাগেনি। বই হয়ে বেরোবার পরও তেমন কোন হই-চই পড়েনি। এর থেকে অনেক ভালো লেগেছিল ওঁর জীবনকাহিনী নিয়ে যে পাণ্ডুলিপিটা ওঁর বাড়িতে বসে পড়েছিলাম।

আনন্দলোকে লেখা শুরুর পর বিকাশদার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। বোধহয় মাস চার-পাঁচেক পরে একটা ছবির মহরতে দেখা হয়ে গেল। বললাম : বিকাশদা, ভগীরথকেই ভুলে গেলেন শেষ পর্যন্ত।

বিকাশদা বললেন : তোর খোঁচাটার মানে আমি বুঝতে পারিনি তা নয়। গঙ্গাপুরাণ আমার পড়া আছে। কিন্তু এটা কি একটা জোর গলায় লোককে বলে বেড়ানোর ব্যাপার। বরাতজোরে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়েছে। কিন্তু তাতে বেড়ালের বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। শিকেটায় কিছু ছিল না।

বিকাশদার ইচ্ছে ছিল সাহিত্যিক হবেন। সাহিত্য করে নাম করবেন। 'দেশ' পত্রিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্যের লেখা আত্মজীবনী ওঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু সেটা আর হল না। দেশ-এর বদলে আনন্দলোকে ওঁর লেখা বেরোল বটে, তবে সেটা ওই দুধের বদলে পিটুলিগোলার মতো।

একদা প্রেসিডেন্সি কলেজের ম্যাগাজিনে নিয়মিত লিখতেন। সাহিত্য করার তাগিদে 'বেদুইন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্য সম্পর্কে দারুণ একটা প্যাশন জন্ম নিয়েছিল ওঁর মধ্যে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দুঃখ করে লাভ নেই। সকলের তো সব কিছু হয় না।

সাহিত্যে সাকশেসফুল হতে পারেননি বটে, কিন্তু জীবনেব অন্য ক্ষেত্রে বিকাশদা তো সাকশেসফুল হয়েছিলেন। আর সাকশেস বলে সাকশেস। তার তো তুলনা হয় না। সেই কথাতেই এবার আসছি।

আগেই বলেছি বিকাশদা সাত ঘাটের জল খাওয়া মানুষ। আর সেই সাত ঘাটের সব ক'টি ঘাটের চেহারাই বড় বিচিত্র।

১৯৩৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পাস করার পর বিকাশদা স্থির করলেন ওকালতি পড়বেন। সেই অনুযায়ী ১৯৪১ সালে ল'পাস করে বেরোলেন। তাঁর মনে তখন রাসবিহারী ঘোষ হবার স্বপ্ন। চকচকে কালো কোট আর ঝকঝকে গাউন শরীরে চাপিয়ে আলিপুর কোর্টে যাতায়াত শুরু করলেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বুঝলেন, এ বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে কিছু করা যাবে না। করলেও বেশিদূর এগোনো যাবে না।

অথচ আমার ধারণা, বিকাশদা যদি ওকালতিতে স্টিক করে থাকতে পারতেন তাহলে কালক্রমে রাসবিহারী ঘোষ না হোক, শঙ্করদাস ব্যানার্জির মতো কেউ হতে পারতেন নিশ্চয়। আমার এই ধারণার কারণ আছে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি শিল্পীদের সংগঠন অভিনেতৃ সংঘ ভেঙে দু' টুকরো হয়ে গেল। উত্তমকুমারের নেতৃত্বে বিকাশদা, জহর গাঙ্গুলি প্রমুখ শিল্পীরা প্রতিষ্ঠা করলেন শিল্পী সংসদ। কেন অভিনেতৃ সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন সেই কারণটা ব্যাখ্যা করবার জন্যে ক্যালকাটা প্রেস ক্লাবে একটা সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন ওঁরা। ওই সভায় শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবার দায়িত্ব পড়েছিল বিকাশ রায়ের ওপর।

ওই সম্মেলনে বাম মতাবলম্বী কিছু সাংবাদিক বেশ কিছু ট্যারাব্যাঁকা প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলেন।

সেদিন দেখেছিলাম বিকাশদা কী আশ্চর্য কৌশলে আর অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের সব বক্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন। শিল্পীরা সমাজবদ্ধ জীব হলেও তাঁদের পথ আর রাজনীতিকদের পথ এক নয়। অন্যায় আর অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁরা শিল্পের ভাষাতেই কথা বলবেন, স্লোগানের ভাষায় নয়। তাঁদের প্রতিবাদ হবে নাট্যমঞ্চে দাঁড়িয়ে অথবা ছবির পর্দায়। মনুমেন্টের নিচে ঝাণ্ডা ঘাড়ে করে নয়।

এইসব অদ্ভুত যুক্তিজালে বামপন্থী সাংবাদিকরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সভার উত্তাপ কমাতে বিকাশদা যেভাবে 'নো কমেন্টস্' 'নো কমেন্টস্' বলতে বলতে সভাকে শান্ত করলেন তাতে বুঝতে পারলাম চেষ্টা করলে বিকাশদা কেবল একজন ভালো আইনজ্ঞই নন, একজন ঝানু ডিপ্লোম্যাটও হতে পারতেন।

কিন্তু বিকাশদা এসব কিছুই হলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি হলেন অভিনেতা। হলেন চিত্র-প্রযোজক। হলেন চলচ্চিত্র পরিচালক। কিন্তু তারও আগে আরও কয়েকটি ঘাটের জল খাওয়া বাকি রয়ে গেছে তাঁর।

আলিপুর কোর্টে যাতায়াত কালেই বিকাশদার সঙ্গে আই সি এস ড্রুকার সাহেবের পরিচয় হয়। এই মিস্টার ড্রুকারের সহাযতায় বিকাশদা সিভিল ডিফেন্স পাবলিসিটিতে যোগ দিলেন। সেখান থেকেই ১৯৪৩ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যোগ দিলেন স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে। সেখানে তখন নানা দলাদলি। বিরক্ত হয়ে বিকাশদা ওই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে চাকরি নিলেন ডি. জে. কিমার-এর বিজ্ঞাপন বিভাগে। সেখানেও মন টিকল না। আবার ফিরে এলেন রেডিওতে। প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে।

এই রেডিওজীবনের অভিজ্ঞতা বিকাশদার পরবর্তী অভিনয় জীবনে ভয়ানকভাবে কাজে লেগেছিল। ভিলেন হিসেবে চিবিয়ে চিবিয়ে অথচ স্পষ্টভাবে সংলাপ উচ্চারণের কায়দাটা তিনি ওখান থেকেই আয়ত্ত করেছিলেন। সিনেমার বিখ্যাত সাউন্ড রেকর্ডিস্ট অবনী চ্যাটার্জিমশাই একবার কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন : বিকাশ সেটে থাকলে সাউন্ডের ব্যাপারে আমার কোন প্রবলেমই হয় না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ও চার-পাঁচ রকম ভঙ্গিতে ভয়েস্ থ্রো করতে পারে। সাউন্ড-ব্যুম নাড়াচাড়া করার কোন প্রয়োজনই হয় না।

রেডিওতে বছর দুই চাকরি করেছিলেন বিকাশদা। তারপর আর ভালো লাগল না। ১৯৪৫ সালে নতুন চাকরি নিলেন অ্যাডভার্টাইজিং সিন্ডিকেটে।

রেডিওতে কাজ করতে করতেই বিকাশদার পরিচয় হয় সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায়ের সঙ্গে। এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেটা ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হয়। জ্যোতির্ময় রায়ের তখন জমজমাট বাজার। নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে বিমল রায়ের পরিচালনায় তাঁর লেখা 'উদয়ের পথে' তখন দুর্দান্তভাবে হিট্ করেছে। প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে বই বিক্রি হচ্ছে। সিনেমার দর্শক মহলে যেমন, বাঙালি পাঠক মহলেও তেমনি জ্যোতির্ময় রায়ের নামে মাতামাতি।

জ্যোর্তিময় রায়ের কেন জানি না ধারণা হয়েছিল 'উদয়ের পথে'-র এই বিরাট সাফল্যের পুরো ক্রেডিটটা একমাত্র তারই। তাঁর লেখার। এর পেছনে নিউ থিয়েটার্সের কিংবা বিমল রায়ের বিশেষ কোনও অবদান নেই। তাই তিনি ঠিক করলেন, এবার তিনি নিজেই চিত্র পরিচালনা করবেন। এবং সেই অনুযায়ী তিনি 'অভিযাত্রী' বলে একটা ছবির কাজ শুরু করলেন।

আর এই 'অভিযাত্রী' ছবিতেই বিকাশদা প্রথম সুযোগ পেলেন পর্দায় মুখ দেখাবার। এটা ১৯৪৭ সালের কথা। কিন্তু দর্শকদের নজরে এলেন ১৯৪৮ সালে পরিচালক হেমেন গুপ্তর 'ভুলি নাই' ছবিতে কাজ করে। বিকাশদা এ ছবির নায়ক নন। নায়ক ছিলেন প্রদীপকুমার। বিকাশদা করেছিলেন মহানন্দ নামে এক বিপ্লবীর চরিত্রে। কিন্তু কী দারুণ তাঁর অভিনয়। পুলিশের লাঠি খাবার পর তাঁর বন্দেমাতরম্ বলে চেঁচিয়ে ওঠা। মনে হল যেন আওয়াজটা উঠে আসছে একজন মানুষের হৃৎপিণ্ড চৌচির করে। আবার ওই ছবির শেষ ভাগে দর্শক দেখলেন আর এক বিকাশ রায়কে। মহানন্দ তখন পুলিশের গুপ্তচর। অনুশোচনায় আর অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। নায়কের হাতে গুলি খেয়ে মরার আগে তার বাঁচার জন্য সেই তীব্র আকুতি দর্শকদের চোখকে সজল করে তুলল। বোঝা গেল বাংলার চিত্রাকাশে এক নতুন তারকা জন্ম নিল।

বিকাশদার এরপরের ছবি ওই হেমেন গুপ্তরই 'বেয়াল্লিশ'। কিন্তু নানা কারণে এবং অনেক টানাপোড়েনের পর ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৫১ সালে। ওই ছবিতে বিকাশদা পুরোপুরি ভিলেন। অত্যাচারী পুলিশ অফিসার। তাঁর সেই নির্মম অত্যাচারীব অভিনয় দেখে রাগে আর ঘৃণায় দর্শকের সারা শরীরের বক্ত টগবগ করে ফুটে উঠেছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও দর্শকের মুখে প্রশংসা আর প্রশংসা। বাংলা ছবিতে প্রচণ্ড ঘৃণার সঙ্গে এত সুখ্যাতির প্লাবন খুব কম অভিনেতার ভাগ্যেই জুটেছে।

কিন্তু ওই 'বেয়াল্লিশ' ছবি মুক্তি পাবার আগেই দর্শক দেবকী বসু পরিচালিত 'রত্নদীপ' ছবিতে এবং অজয় কর পরিচালিত 'জিঘাংসা' ছবিতে একজন সার্থক অভিনেতা হিসেবে বিকাশ রায়ের দেখা পেয়ে গেছেন। 'রত্নদীপ' ছবিতে এক সৎ, শান্ত এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত চরিত্রে বিকাশ রায়কে তাঁরা দেখেছেন ১৯৫১ সালেব ফেব্রুয়ারি মাসে। আর তার ঠিক দু'মাস পরেই অজয় করের 'জিঘাংসা' ছবিতে তাঁকে দেখেছেন পাগল প্রফেসর হিসেবে এক হত্যাকারীকে।

এই 'জিঘাংসা' ছবিতে অভিনয় প্রসঙ্গে বিকাশদাকে এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। ছবি মুক্তি পাবার সপ্তাহ দুয়েক পরে একদিন আমার সঙ্গে তৎকালীন বিশিষ্ট অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের দেখা। ধীরাজদা আমাকে বললেন : হ্যাঁরে রবি, বিকাশ যে 'জিঘাংসা' ছবিতে আমার 'কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে'-তে অভিনয়ের হুবহু কপি করে বেরিয়ে গেল, আর তোরা কেউ কিছু বললি না। একমাত্র 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার রিভিউতে এই ব্যাপারটার উল্লেখ করেছে, আর কেউ কিছু বলেনি। বিকাশ কি তোদের কিছু খাইয়েছে-টাইয়েছে না কি বল্‌ দিকি?

ধীরাজদার কথা শুনে মনে হল, হ্যাঁ, দু-একটা জায়গায় দুজনের অভিনয়ের কিছু মিল আছে বটে, তবে সেটা এমন কিছু মারাত্মক নয় যে বলা চলে হুবহু কপি করা। কিন্তু ধীরাজদার সঙ্গে এ ব্যাপারে তর্ক করলাম না। চুপ করেই রইলাম। আর ধীরাজদা ওই যে খাওয়ানো-টাওয়ানোর কথা বললেন ওটা তো একদম বাজে। কারণ তখনও পর্যন্ত বিকাশদার সঙ্গে তেমন করে আলাপই হয়নি আমার। দুজনে দুজনের মুখ চিনি, এইমাত্র।

'কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে' পরিচালনা করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এম.পি প্রোডাকশন্সের ছবি। সিরিও-কমিক ভঙ্গিতে তোলা। ওই ছবিতে ধীরাজদা একজন খেয়ালি প্রফেসরের চরিত্রে অভিনয় কবেছিলেন। 'জিঘাংসা' ছবিতে বিকাশদাও করেছিলেন এক খ্যাপাটে ধরনের প্রফেসরের রোল।

বছর চার-পাঁচ পরে যখন বিকাশদার সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, সেই সময় কথায় কথায় ধীরাজদার ওই অভিযোগের প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম। তা শুনে বিকাশদা বলেছিলেন : স্যরি রবি, আই বেগ টু ডিফার। ধীরাজদা আমার সিনিয়ার আর্টিস্ট। আমি ওঁর অভিনয়ের একজন অ্যাডমায়ারার। কিন্তু ওঁর অভিযোগটা ঠিক নয়। দুজনেই পাগলাটে মানুষের রোল্‌ করেছি। তবে উনি তো কমেডির ফর্মে অ্যাকটিং করেছেন, আর আমি সিরিয়াস ফর্মে। মিল থাকবে কী করে? তবে ওই হামলে পড়ে দাবার চালটা দেবার ব্যাপারে একটা মিল চোখে পড়তে পারে বটে। কিন্তু দাবার চাল দিতে গেলে যে কোনও মানুষের পক্ষেই ওরকম করা স্বাভাবিক। ওটাকে হুবহু কপি বলে না। ধীরাজদা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। উনি মনে দুঃখ পেলে আর মনেও কষ্ট হয়। ধীরাজদার সঙ্গে দেখা হলে বলে দিস্‌ আই অ্যাম স্যরি, এক্সট্রিমলি স্যরি। আই বেগ্‌ টু বি অ্যাপোলজাইসড।

পরের দিন সকালেই ধীরাজদার বাড়ি ছুটেছিলাম বিকাশদার ওই কথাগুলো তাঁর কানে পৌঁছে দেবার জন্যে। ধীরাজদা বাড়িতে ছিলেন না। প্রেমেনদার বাড়িতে আড্ডা দিতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েই তাঁকে ধরলাম। আমার মুখে বিকাশদার কথাগুলো শুনে ধীরাজদার সারা মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। একগাল হেসে তিনি বললেন : দ্যাখো কাণ্ড! কবে কী বলেছি না বলেছি, এত বছর বাদে তুই বিকাশের কাছে সে কথা বলতে গেছিস্‌। ছি ছি ছি। বিকাশ আমাকে কী ভাবল বল্‌ দিকি। আসলে তখন বসুমতীর সমালোচনায় ওই কথাটা লেখার পর দু-একজন খোঁচা দিতে লাগল আমাকে। তাই রাগের মাথায় কী বলতে কী বলেছি। বিকাশ তো খুবই ভালো ছেলে রে। আর কী দারুণ অ্যাকটিং করছে সব। কালে কালে দেখবি ও বিরাট একজন অ্যাক্টর হবে।

ধীরাজদার কথাগুলো শুনে খুব ভালো লাগল। তখনকার সিনেমা লাইনের চেহারাটা এই রকমই

পরিচ্ছন্ন ছিল। শিল্পীদের মধ্যে মনান্তর ছিল, মতান্তর ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্রতা আর নীচতা ছিল না। পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এসব নিয়ে কেউ তর্কযুদ্ধে নামত না।

বিকাশদা ওই 'জিঘাংসা' ছবির অন্যতম প্রযোজকও ছিলেন। উনি, অজয় কর, বীরেন নাগ আর সুবোধ দাস, চারজনে মিলে ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন। সুবোধবাবু ছিলেন কানন দেবীর সেক্রেটারি। রাজেন তরফদার পরিচালিত 'গঙ্গা' এবং আরও কিছু ছবির প্রযোজনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বীরেন নাগ ছিলেন আর্ট ডাইরেক্টর। কয়েক বছর পরে হেমন্ত মুখার্জির প্রযোজনায় এই 'জিঘাংসা' ছবির চিত্রনাট্য অবলম্বন করে, কিছু অদলবদল ঘটিয়ে হিন্দিতে 'বিশ সাল বাদ' নামে একটি ছবি করেছিলেন। বিশ্বজিৎ ছিলেন সে ছবির নায়ক। তার ওই প্রথম হিন্দি ছবিতে অভিনয়। 'জিঘাংসা'-র মতো 'বিশ সাল বাদ'- সুপার হিট করেছিল।

'জিঘাংসা'র সাফল্যে বিকাশদার মনে প্রযোজনার নেশা ধরে গেল। বিখ্যাত অভিনেত্রী সন্ধ্যারানী আর পরিচালক চিত্ত বসুকে নিয়ে তিনি এরপর যে ছবিটি প্রযোজনা করলেন তার নাম 'শুভযাত্রা'। এ ছবির আর্থিক সাফল্য তেমন মনোমত হল না। কিন্তু তার ফলে প্রযোজনার নেশা তো কাটলই না, বরং তা পূর্বাপেক্ষা ঘোরতর আকার ধারণ করল। প্রতিষ্ঠা করলেন বিকাশ রায় প্রোডাকশন। অজয় করকে পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন আর নায়িকা করলেন সুচিত্রা সেনকে। ছবির নাম 'সাজঘর'। এ ছবিতে আবার সাফল্য এল।

আর এই সাফল্যই বিকাশদাকে আরও সাহসী করে তুলল। তিনি এবারে হাত দিলেন পরিচালনায়। এই পর্যায়ে তাঁর প্রথম ছবি 'অর্ধাঙ্গিনী'। আর সে ছবি পয়সা তো পেলই, সেই সঙ্গে পরিচালনার কাজের জন্যে বিকাশদা পেলেন প্রচুর প্রশংসা।

প্রযোজক হিসেবে বিকাশদার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। নিছক বয় মিট্‌স গার্ল জাতীয় ছবি করা তিনি খুব একটা পছন্দ করতেন না। দু-একটা ছবিব নাম উল্লেখ করলেই বুঝতে পারা যাবে তিনি কী ধবনের প্রযোজক ছিলেন। যেমন 'কেরি সাহেবের মুন্সি'। প্রথমনাথ বিশীর লেখা এই উপন্যাসটির সময়কাল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগ। বাংলা ভাষা প্রসারে উদ্যোগী ইংরেজ পুরুষ উইলিয়াম কেরি এবং তাঁর দেওয়ান রামবাম বসুকে নিয়ে এই উপন্যাসটি যখন 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল তখন থেকেই বিকাশদা এই ঘটনা নিয়ে ছবি করার মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এ ছবি কিছুটা দুঃসাহসিক কাজ।

কিংবা ধরুন অবধূতের লেখা 'মরুতীর্থ হিংলাজ'। কী প্রচণ্ড পরিশ্রম বিকাশদাকে এই ছবির জন্যে করতে হয়েছিল তা তো আমি নিজে জানি। মরুভূমির পথে এই তীর্থযাত্রা নিছক ধর্মীয় ব্যাপার নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রচণ্ড মানবিকতা। উত্তমকুমার আর সাবিত্রী চ্যাটার্জিকে দিয়ে তিনি যা অভিনয় করিয়েছিলেন তা আজও আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

আবার 'বসন্ত বাহার' ছবির কথা ভাবুন। রাগ সংগীতের কী অপূর্ব ব্যবহার করেছেন বিকাশদা তাঁর এই ছবিতে। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুরে ভারতবিখ্যাত সংগীতশিল্পীরা এই ছবিতে গান গেয়েছিলেন। ছবিটি আর্থিক দিক থেকে তেমন সাফল্য পায়নি বটে, কিন্তু মন ভরে গিয়েছিল সংগীতমাধুর্যে।

পরিচালক বিকাশ রায়ের উদারতার কথাও স্মরণীয়। নিজে প্রতিষ্ঠিত পরিচালক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রযোজিত 'স্বর্গমর্ত্য' ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর প্রধান সহকারী অসীম পালের উপর। একমাত্র তপন সিংহ এবং ইদানীংকালে অঞ্জন চৌধুরি ছাড়া আর কারও মধ্যে এমন উদারতা তো আমার মনে পড়ছে না।

সারা জীবনে বিকাশদা প্রায় আড়াই-তিনশো ছবিতে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে বোধহয় ষাট-সত্তরটা ছবিতে নায়ক, বাকিগুলিতে পার্শ্ব-চরিত্রে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই বিকাশদা সফল। ১৯৬৩ সালে ওঁকে 'উত্তরফাল্গুনী' এবং ১৯৬৬ সালে 'কাঁচ কাটা হীরে' ছবিতে অভিনয়ের জন্য বি এফ জে এ পুরস্কার দিয়েছিলাম আমরা। এই পুরস্কার বিকাশদাকে কতটা সম্মানিত করেছিল তা বলতে পারব না, তবে এতদ্বারা আমরা যে নিজেদের বিচার-বিবেচনাকে সম্মানিত করেছিলাম সেটা জোর গলায় বলতে পারি।

বিকাশদাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আচ্ছা বিকাশদা, আপনি তো সারা জীবনে অজস্র চরিত্রে

অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় আপনার কোন্ ছবিতে?

বিকাশদা বললেন : এ আবার কী রকম জামাই ঠকানো প্রশ্ন তোর?

আমি বললাম : কেন, এ কথা বলছেন কেন?

বিকাশদা বললেন : আমার সব ক'টা ছবির নামই আমি বলতে পারব না তো তার সবক'টা চরিত্র মনে করে রাখা কি সম্ভব?

আমি বললাম : একটু ভেবে বলুন না?

বিকাশদা বললেন : তুই অ্যাকচুয়ালি কী শুনতে চাইছিস বল্ তো? তোরা যে দুটো ছবির জন্য আমাকে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিস সেই 'উত্তরফাল্গুনী' আর 'কাঁচ কাটা হীরে'-র নাম শুনতে চাইছিস তো?

আমি বললাম : ও মা। এ আবার কী রকম কথা? আমরা অ্যাওয়ার্ড দিলেই সেটা আপনার কাছেও বেস্ট মনে হবে এমন তো নাও হতে পারে।

বিকাশদা বললেন : বেস্ট-ফেস্ট বলতে পারব না। তবে একটা ছবিব একটা চরিত্র আমার দিনের খাওয়া আর রাতের ঘুম যে কেড়ে নিয়েছিল সেটা বলতে পারি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন্ চরিত্র?

বিকাশদা বললেন : 'আরোগ্য নিকেতন' ছবিতে জীবনমশাইয়ের চরিত্র। ওরেব্বাবা, কী সাংঘাতিক ডায়নামিক ক্যারেক্টর।

আমি বুঝলাম বিকাশদাকে ঠিক জায়গায় এনে ফেলা গেছে। তবু কপট মিথ্যা প্রকাশ করে বললাম : ওই চরিত্রটাকে আপনার এমন ডায়নামিক বলে মনে হল কেন? আমার তো মনে হয় ওর চেয়ে 'বেয়াল্লিশ'-এর ক্যারেকটারটা অনেক দুর্ধর্ষ। মানুষের মন কাঁপিয়ে দেয়।

বিকাশদা বললেন : তুই একেবারে গোমুখ্যু। কোন্ চরিত্রের সঙ্গে কোন চরিত্রের তুলনা করছিস। একবার ভাব দেখি জীবনমশাইয়ের চরিত্রটা। একটা মানুষ কবিরাজ হিসেবে যে ধন্বন্তরী, স্পষ্টবাদী, সত্যাশ্রয়ী, ট্র্যাডিশনের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। আবার মানুষের নিদান হাঁকতে তাঁর গলা কাঁপে না। মৃত্যুকে তিনি শান্তির দূত মনে করেন। বাইরে শান্ত সমাহিত, অন্তরে অগ্নিময়। বুকের ভেতর বেদনার হিমালয় বহন করে চলেছেন সর্বক্ষণ। বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করে, আবার ভয়ও পায়। নিজের স্ত্রীও তাঁকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। আধুনিকতার সঙ্গে তার কোনও বিরোধ নেই। আধুনিকতাকে তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু তার দম্ভকে সহ্য করতে পারেন না। কত আর বলব। এই চরিত্রের এতগুলো শেড যে কল্পনাই করা যায় না।

আমি বললাম : তা বেশ তো! স্বীকার করলাম ওটা একটা ভালো চরিত্র। কিন্তু আপনি তো একজন প্রফেশ্যনাল অ্যাকটর। ওই চরিত্রের জন্যে আপনার দিনের খাওয়া রাতের ঘুম নষ্ট হবে কেন?

বিকাশদা বললেন : ওরে আমি প্রফেশ্যনাল অ্যাকটর বলেই তো আমার এত ভয়। তোদের পাঁচজনের দৌলতে দর্শকদের কাছে আমার 'ব্যাড ম্যান' বলে এমন একটা সুনাম হয়ে গেছে যে কোনও গুড ম্যানের চরিত্র করতে গেলে ভয়ে বুকটা কাঁপে। তার ওপরে আবার জীবনমশাইয়ের মতো চরিত্র। আর তারাশঙ্করবাবু এঁকেছেনও বটে চরিত্রটা। তা বিজয়বাবুকে বলেছিলাম সে কথা। বলেছিলাম : হ্যাঁ, মশাই, আমাকে তো নিচ্ছেন, ব্যাপারটা একটু রিস্কি হয়ে যাচ্ছে না? বিজয়বাবু হেসে বলেছিলেন : রিস্কটা নিলাম তো গেইন্ করবার জন্যে।

বিজয়বাবু অর্থে পরিচালক বিজয় বসু। 'আরোগ্য নিকেতন' ছবি তাঁরই ডাইরেকশন দেওয়া। সিস্টার নিবেদিতা, রাজা রামমোহন, নবরাগ, বাঘিনী, সাহেব ইত্যাদি ছবি তিনি করেছেন। নিজে ভালো অভিনয়ও করতে পারতেন।

বিকাশদার কথার উত্তরে আমি বললাম : তা শেষ পর্যন্ত গেইন্ তো করেছিলেন আপনারা দুজনেই?

বিকাশদা বললেন : তা করেছিলাম। কিন্তু ওই চরিত্র করতে গিয়ে আমার শরীর আর মন দুইয়ের ওপর এমন চাপ পড়েছিল, যা আর কোন চরিত্রের ক্ষেত্রে ঘটেনি।

আমি বললাম : বিশ্বরূপায় 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকে ওই চরিত্রটা করেছিলেন নীতীশ মুখার্জি। আপনি তাঁর অভিনয় দেখেছিলেন?

বিকাশদা বললেন : না রে, ওই নাটকটা দেখা হয়নি। তাতে ভালোই হয়েছে। নইলে হয়তো ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে পড়তাম।

এই নাটকের কথায় বিকাশদার নাট্যজীবনের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর ওই জীবন উত্থানে আর পতনের নানা ঘটনা। অঙ্কের বইয়ে সেই যে বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠা-পড়ার ঘটনা আছে, অনেকটা তারই মতো।

মঞ্চাভিনেতা বিকাশ রায় সম্পর্কে কিছু বলার আগে স্নেহপ্রবণ বিকাশ রায় সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নিতে চাই।

বিকাশদা খাস পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাঁর কোনও নাড়ির টান ছিল না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক থেকে তিনি পূর্ববঙ্গের এত কাহিনী শুনেছেন তাঁর মনে পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে একটা বিরাট কৌতূহল জন্মে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে বলতেন : প্রভুর কাছে ইস্টবেঙ্গলের এত গল্প শুনেছি যে মনে হয় একবার ওখান থেকে ঘুরে আসি। কিন্তু এখন পূর্ব পাকিস্তানের যা অবস্থা তাতে তো যেতে ভরসা হয় না। নইলে আমার ছবির ছোট একটা আউটডোর ওখানে ফেলে দু-চারদিন ঘুরে আসা যেত।

বিকাশদা প্রভু বলে যাঁকে উল্লেখ করলেন তিনি হলেন বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। ফিল্ম লাইনে তাঁর অনুরাগীরা ওঁকে ভালোবেসে 'প্রভু' বলে ডাকতেন।

তা হঠাৎ বিকাশদার পূর্ববঙ্গে যাবার একটা সুযোগ এসে গেল।

সেই সবে পাকিস্তানের কবলমুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ঐতিহাসিক সভাটি করে গেছেন। এপার বাংলার আকাশ-বাতাস ওপার বাংলার জয়ধ্বনিতে মুখর। সেই সময়ে একদিন আমার বন্ধু গোপাল পাল দুই ভদ্রলোককে নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির। গোপাল তখন বি এফ জে এ-র ট্রেজারার ছিল। ওই দুই মুসলিম ভদ্রলোকের নামগুলি এখন আর আমার মনে পড়ছে না।

গোপাল বললেন : এঁরা আসছেন রাজশাহি থেকে। এই বাংলার কিছু শিল্পীকে নিয়ে ওঁরা একটি অনুষ্ঠান করতে চান। আমি অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁদের কল্পতরু গোষ্ঠী ওখানে একটা নাটক করবে। এঁরা চাইছেন এখনকার একজন নামকরা সিনেমা আর্টিস্টকে ওখানে নিয়ে যেতে। তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হবে। আপনি একজন আর্টিস্টকে ঠিক করে দিন।

আমি বললাম : দেখো ভাই, কলকাতায় হলে আমি না হয় একজন আর্টিস্টকে ঠিক করে দিতে পারতাম। কিন্তু ওখানে বিদেশ-বিভূঁয়ে কেউ কি যেতে চাইবেন কাজ ফেলে! তেমন কারও নাম মনে পড়ছে না যাঁকে বললেই কথা রাখবেন।

গোপাল বললে : রবিদা, আপনার সঙ্গে তো পাহাড়িদা (সান্যাল) আর বিকাশদার দারুণ হৃদ্যতা। ওঁদের দু'জনের মধ্যে কোন একজনকে বলে দেখুন না।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, তাই তো। বিকাশদা তো মাঝে মাঝেই পূর্ববঙ্গ দেখা হল না বলে আক্ষেপ করেন। এই প্রস্তাবটা ওঁকে দিলে কেমন হয়।

আমি বললাম : পাহাড়িদাকে বলা যাবে না। পাহাড়িদা বুড়ো মানুষ, এই বয়সে যাতায়াতের এত ধকল, তার ওপর বেশ খানিকটা রাত জেগে অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে সংবর্ধনা নেওয়া, এসব করবেন বলে মনে হয় না। উনি আবার সাহেব মানুষ, ঠিক সময় খাওয়া আর ঠিক সময়ে শুয়ে পড়ায় অভ্যস্ত। তার চেয়ে বিকাশদার কাছে কথাটা পেড়ে দেখা যেতে পারে।

গোপাল বললে : তাহলে কাল সকালেই বিকাশদার বাড়ি যাওয়া যাক।

পরদিন সকালে গোপাল আর রাজশাহির ওই দুই ভদ্রলোককে নিয়ে বিকাশদার যোধপুর পার্কের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

বিকাশদা তখন সবেমাত্র ব্রেকফাস্ট সেরে খবরের কাগজে মনযোগ দিয়েছেন। সেটা বুঝলাম টি-টেবলের ওপর ভুক্তাবিশিষ্ট খাবারের প্লেট আর অর্ধভুক্ত চায়ের কাপ দেখে। আমাদের দেখে বিকাশদার ভুরু দুটো কপালের ওপর উঠে গেল। বললেন : কী ব্যাপার! সক্কালবেলা সদলবলে হানা? কেসটা খুব জটিল বলে মনে হচ্ছে?

আমি বললাম : মোটেই জটিল নয়। একেবারে জলের মতো সোজা। আপনাকে পরশুদিন বাংলাদেশ যেতে হবে। রাজশাহিতে।

শুনে বিকাশদা আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন : একেবারে রাজশাহি! কী ব্যাপার বল দেখি।

আমি তখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম। গোপাল এবং রাজশাহির দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে বিকাশদার পরিচয় করিয়ে দিলাম।

বিকাশদা বললেন : তুই যখন এসেছিস তখন যেতে তো হবেই, তা তুই সঙ্গে যাচ্ছিস তো?

গোপাল বললে : রবিদা তো যাবেনই। ধরে নিন এটা ওঁরই ফাংশান।

বিকাশদা বললেন : তাহলে আর আমার আপত্তি করাব কী আছে! আর করলে শুনছেই বা কে? যা একখানি ছিনে জোঁককে সঙ্গে এনেছেন আপনারা?

আমি বললাম : আপনার পাশপোর্ট করা আছে তো বিকাশদা?

বিকাশদা বললেন : তা আছে। কিন্তু ভিসার কী হবে?

রাজশাহির এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন : সে দায়িত্ব আমাদের।

বিকাশদা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন : আমার শুধু একটা ব্যাপার জেনে নেবার আছে। আমাদের শিল্পী সংসদের একটা ছবি হচ্ছে। 'বনপলাশীর পদাবলী'। এ কদিনের মধ্যে আমার কোন কাজ আছে কি না সেটা উত্তমের কাছে জেনে নিতে হবে।

আমি বললাম যদি থাকে তাহলে কী হবে?

বিকাশদা বললেন : তাহলে ডেটটা একটু অদলবদল করে নিতে হবে। আমাদের ছবির শুটিং আছে আজ। চল সেখানে গিয়ে উত্তমকে ধরি। আমি তো বলবই, সেই সঙ্গে তুইও একটু বলে নে উত্তমকে। মনে তো হয় কোন অসুবিধে হবে না। দাঁড়া, তোদের জন্যে চা-টা বলি।

আমি তখন আকাশে মেঘের আভাস দেখতে পেয়েছি। তাই বললাম : না, না চা-ফায়ের দরকার নেই। আপনি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিন।

বিকাশদা বললেন : তুই একা এলে তোকে থোড়াই চা অফার করতাম। সঙ্গে বন্ধুকে এনেছিস্, দু'জন বিদেশি ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছিস। এঁদের একটু চা না খাওয়ালে বদনাম হয়ে যাবে যে।

বিকাশদার মুখের কথাটা শেষ হতে না হতে বিকাশদার ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং একান্ত সুহৃদ অসীম পাল ঘরে এসে ঢুকলেন। বললেন : আমার জন্যেও এক কাপ বলে দেবেন বিকাশদা।

অসীমবাবু বিকাশদার সারা জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার। অত্যন্ত ভালো মানুষ। বিকাশদা অসীমবাবুকে দিয়ে তাঁর প্রোডাকশনের 'স্বর্গমর্ত্য' নামে একটি ছবি ডাইরেক্টও করিয়েছেন।

চায়ের কথাটা বলে অসীমবাবু আমার দিকে তাকালেন। বললেন : সাত-সকালে সাংবাদিকদের আগমন কেন? ইন্টারভিউ টিন্টারভিউর ব্যাপার আছে নাকি?

বিকাশদা বললেন : আরে না না, রবি এসে ধরেছে পরশুদিন রাজশাহি যেতে হবে একটা অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা নিতে।

অসীমবাবু ববলেন : এ তো খুব ভালো কথা। যান, বাংলাদেশ ঘুরে আসুন। রাজশাহি খুব ভালো জায়গা। রাজশাহি কলেজের প্রিন্সিপাল আমার বন্ধু।

বিকাশদা অসীমবাবুর কথা শুনে বেশ কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন। বললেন : যাব বলছিস্?

অসীমবাবু বললেন : নিশ্চয়ই যাবেন। রবিবাবু তো সঙ্গে থাকছেন। তাহলে আর ভাববার কী আছে! রাজশাহির মানুষজন খুব ভালো। কালচার্ড। কোন অসুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না।

ইতিমধ্যে ছায়াবাণীর কর্ণধার অসিত চৌধুরি মশাই এসে গিয়েছিলেন। অসিতবাবু এই যোধপুর পার্কে বিকাশদার কাছাকাছি থাকেন। তিনিও সব শুনে বিকাশদাকে উৎসাহিত করলেন যাবার জন্যে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিকাশদার আর বাংলাদেশ যাওয়া হল না।

সেদিন বিকাশদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা সবাই মিলে স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। 'বনপলাশীর পদাবলী'র শুটিং কোন্ স্টুডিওতে হচ্ছিল এখন আর মনে নেই। বোধহয় নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে। ছবিটা পরিচালনা করছিলেন উত্তমকুমার। আমাদের সামনেই বিকাশদা

উত্তমববাবুকে সব ঘটনা বললেন। শুনে উত্তমবাবু বলে উঠলেন এই সর্বনাশ! বিকাশদা, তুমি চলে গেলে কী করে হবে! কাল রাত্রে রঞ্জিতমল টেলিফোন করে বলল, ছবি রিলিজের ডেট ফিক্সড হয়ে গেছে রূপবাণী অরুণা ভারতীতে। যা কাজ বাকি আছে তা ডে-নাইট করে শেষ করে ফেলতে হবে। এখন তো তোমাকে ছেড়ে দেওয়া একেবারে অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব। তোমার এখনও চারদিনের কাজ বাকি আছে। কী করে যে কী হবে আমি ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না। এরপর তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো।

উত্তমবাবুর কথা শুনে বিকাশদা অসহায়ভাবে আমাদের দিকে তাকালেন। তারপর আমাকে চোখের ইশারা করে দিলেন উত্তমবাবুর সঙ্গে কথা বলতে।

আমি উত্তমবাবুকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম : বিকাশদাকে স্পেয়ার করা কি একেবারেই অসম্ভব?

উত্তমবাবু আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন : বললাম না অসম্ভবের চেয়ে অসম্ভব। রিলিজের ডেটটা যদি ফিক্স না হত তাহলে না হয় একটা কথা ছিল। এখন এই ডেটটা যদি আমরা মিস করি তাহলে এক বছরের আগে আর ডেট পাওয়া যাবে না। আমি তো এ ছবিতে শুধু অ্যাকটিং করছি আর ডিরেকশান দিচ্ছি, কিন্তু বিকাশদা অ্যাকটিং ছাড়াও বিজনেস সাইডটা দেখছে। রঞ্জিতমলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে, রূপবাণীর মালিক অমর নানের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বিকাশদার এখন কত দায়িত্ব! ওঁকে কি এখন ছাড়া চলে? আপনিই বলুন?

আমি বললাম : তাহলে আর কী হবে। আমি দেখছি কী করা যায়। বিকাশদার জায়গায় অন্য কাউকে পাঠানো যায় কি না দেখি!

ফ্লোর থেকে বেরিয়ে দেখলাম বিকাশদা গোপাল আর রাজশাহির দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। বললেন : রবি, আই অ্যাম ভেরি স্যরি। আমার স্টেশন লিভ না করার গুরুত্বটা তুই নিশ্চয় বুঝতে পারছিস। অনেক কষ্ট করে আমরা ছবিটা করছি রে! কাজে গাফিলতি হলে শিল্পী সংসদের মেম্বারদের কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। আমি এঁদের সব বুঝিয়ে বলেছি। ওঁরাও আমার অসহায় অবস্থাটার কথা বুঝতে পেরেছেন। খারাপ লাগছে তোর কথা ভেবে। তুই ওঁদের বড় মুখ করে আমার কাছে এনেছিলি। যাক এ নিয়ে আবার মান অভিমান করে বসে থাকিস না যেন।

এই হলেন বিকাশ রায়। একদিকে যেমন স্নেহপ্রবণ অন্যদিকে তেমনি দায়িত্বশীল। এইসব গুণগুলি যাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায় থাকে তিনিই জীবনে বড় হতে পারেন। বিকাশদাও পেরেছিলেন।

এবারে বিকাশদার থিয়েটার জীবনের কথায় আসি। বিকাশদাকে আমি প্রথম মঞ্চে দেখি রঙমহল থিয়েটারে একটি কম্বিনেশন নাইটে। 'পথের দাবী' নাটকে উনি অপূর্বর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ওঁর পার্ট আমার ভালো লাগেনি।

পরে বিকাশদার সঙ্গে যখন আলাপ হল, তখন আমি বলেওছিলাম সে কথা। শুনে বিকাশদা বলেছিলেন : তোদের এই নাটকের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমি আমার মতো অভিনয় করি। একটা চরিত্র ঠিক যেমনি হওয়া উচিত তেমনি নর্মাল করার চেষ্টা করি। কিন্তু দেখি কি আমার সঙ্গে যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁরা গলা চড়িয়ে অভিনয় করে ক্ল্যাপ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন আর আমি পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি। তাই তোর ভালো লাগেনি।

কিন্তু বিকাশদার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল স্টেজেও তিনি স্কোর করবেন। সেই জন্যেই বোধ হয় ১৯৫২ সালে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে শিশিরবাবুর কাছে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন 'চিরকুমার সভা' নাটকে। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন থাকা হয়নি। সে সম্পর্কে একটা মজার ঘটনা শুনেছিলাম বিকাশদার মুখে।

বিকাশদা বললেন : শিশিরবাবুর ওখানে তখন ডেলি পেমেন্টের সিস্টেম ছিল। প্রথমদিন অভিনয় করার পর ওঁর ভাই তারাকুমার আমার হাতে পাঁচিশটি টাকা ধরিয়ে দিলেন। দেখে তো আমার চোখ ছানাবড়া। আমি আপত্তি জানাতে তিনি বললেন, আমার ওপরে যা হুকুম আছে আমি তাই করেছি। এরপরে যদি কিছু বলবার থাকে তো বড়বাবুর কাছে গিয়ে বলুন। আমি সটান চলে গেলাম শিশিরবাবুর

কাছে। বললাম, বড়বাবু, আমাকে সদানন্দ রোড থেকে ট্যাক্সি করে আসা-যাওয়া করতে হয়। এই মাত্র পঁচিশটা টাকায় আমার কী হবে? শুনে শিশির ভাদুড়ি মশাই কী বললেন জানিস। বললেন, দেখো হে বাপু, তুমি সদানন্দ রোড থেকে ট্যাক্সি করে আসবে কি এরোপ্লেনে করে আসবে সেটা তোমার ব্যাপার। আমাব কথা হল, তোমাকে পঁচিশ টাকার বেশি দিলে আমার লোকসান। তা এই কথাটা আমি ছবিদাকেও (বিশ্বাস) বলেছিলাম। শুনে ছবিদা বললেন, তুই তো অনেক পেয়েছিল রে বিকাশ। বড়বাবুর ওখানে আমি কত পাই জানিস? উনি পার শো আমার সঙ্গে পঞ্চাশ টাকার কড়ার কবেন, কিন্তু চল্লিশ টাকার বেশি কোনওদিন হাতে পাই না। দশটা করে টাকা চিরকালই বাকির খাতায় লেখা থাকে। তবু বড়বাবুর ডাক ফেরাতে পারি না। কেন জানিস? অভিনয়টা ভালো করে শিখতে পাব বলে। ওটা তো আর অন্য কোন স্টেজে আর কারও কাছে পাওয়া যাবে না।

বিকাশদার কথা শুনে আমি বললাম : ছবিদা তো ঠিক কথাই বলেছেন। আপনি তো অভিনয় শেখার ইচ্ছে নিয়েই শিশিরবাবুর স্টেজে গিয়েছিলেন। তাহলে আর টাকার অ্যামাউন্ট নিয়ে অত খুঁতখুঁতুনি কেন?

বিকাশদা বললেন : সে জ্ঞানটা আমার ছিল না নাকি! খুবই ছিল। কিন্তু ট্যাক্সি ছাড়া যাওয়া আসার উপায় ছিল না। তখন আমার তিন-চারখানা ছবি রিলিজ করে গেছে। বাজারে একটু নাম-ধামও হয়েছে। ট্রামে-বাসে চড়তে পারি না। বিশেষ করে 'বেয়াল্লিশ' ছবিটা রিলিজ করার পর। ট্রামে-বাসে উঠলে লোকে আঙুল দেখায়। অযথা গায়ে পড়তে আসে। চ্যাংড়ারা হিরোইনের নাম ধরে টিটকিরি দেয়। কাজেই ট্যাক্সি ছাড়া নান্যপন্থা। এদিকে আমার তখন অন্নচিন্তা চমৎকারা। সিনেমায় কাজ পাচ্ছি, কিন্তু সে অনুপাতে পয়সা পাচ্ছি না। অথচ ঠাট বাট সব বজায় রাখতে হচ্ছে। তবু দাঁতে দাঁত চেপে ট্যাক্সি বিলাসটা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলাম না। ডিরেকটাররা থিয়েটারে আছি শুনলে মুখ ব্যাজার করে বেস্পতি শনিবাবে সকাল সকাল ছেড়ে দিতে হবে বলে। খুব দোটানায় পড়ে গেলাম। শ্যাম রাখি না কুল রাখি। শেষ পর্যন্ত থিয়েটারকে গুডবাই করে সিনেমা নিয়েই পড়ে রইলাম। বুঝলাম, ইহজীবনে আর থিয়েটার করা হবে না।

শেষ পর্যন্ত বিকাশদার আবার থিয়েটার করতে আসতে হল ১৯৭১ সালে। বিশ্বরূপায়। শংকরের 'চৌরঙ্গী' নাটকে। বিকাশদা স্যাটা বোসের রোল করেছিলেন। যে চরিত্রটা উত্তমকুমার করেছিলেন 'চৌরঙ্গী' ছবিতে। ওই ১৯৭১ সালে বিকাশদার তখন ছবির সংখ্যা অনেক কমে গেছে। ডিরেকশান দেবার সুযোগও পাচ্ছেন না। তাছাড়া বিশ্বরূপার মোটা টাকার অফার।

স্যাটা বোসের চরিত্রে বিকাশদা খুব স্টাইলিশ অ্যাকটিং করেছিলেন। বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষও প্রচুর বিজ্ঞাপন টিজ্ঞাপন দিয়ে বিকাশদার একটা ক্রেজ তৈরি করে দিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন তখন বিশ্বরূপার সামনে হাউসফুল বোর্ড ঝুলতে দেখা গেছে।

বিশ্বরূপা ছাড়ার পর বিকাশদা শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চে 'বিষ' নাটকে অভিনয় করতে গেলেন। কালচারাল সেমিনার নামে একটি গোষ্ঠী ওই নাটকটা মঞ্চস্থ করেছিলেন। ওই গোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ সমর মুখার্জি। ওঁদের 'ডানাভাঙা পাখি' নাটকটা আমি তার আগে দেখেছি। খুবই ভালো প্রযোজনা। কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চের নাম শুনে। উত্তর কলকাতায় টালা ব্রিজের নিচে রেল কলোনির ভিতর একটি অতি অকিঞ্চিৎকর প্রেক্ষাগৃহ।

কিন্তু নাটক দেখে মন ভরে গেল। বিকাশদা চুটিয়ে অভিনয় করেছিলেন ওই নাটকে। বিকাশদাই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন নাটক দেখতে। 'দেশ' পত্রিকায় আমি ওই নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সমালোচনা লিখেছিলাম। সমর মুখার্জির ডাইরেকশনে রীতিমতো বৈচিত্র্য ছিল।

বিকাশদার জীবনের শেষ নাটক 'নহবত'। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় আর তরুণকুমারদের কল্পতরু গোষ্ঠী তপন থিয়েটার ওই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন বিশ্বরূপার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার পর। তারও আগে সত্যবাবুর লেখা এই নাটকটি রঙমহল থিয়েটারে বেশ সুনামের সঙ্গে চলেছিল। জামশেদপুরের মেয়ে আরতি ভট্টাচার্য প্রথম এই নাটকে অভিনয় করবার জন্যেই কলকাতায় এসেছিলেন। তপন থিয়েটারে ওই রোলটি করতেন রত্না ঘোষাল। বিকাশদাও ওই কল্পতরু গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।

তপন থিয়েটারে নাটকটি ভালো হওয়া সত্ত্বেও তেমন ভাবে দর্শকের আনুকূল্য পাচ্ছিল না। সত্যবাবু একটু লাজুক প্রকৃতির। কাজেই বিকাশদার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল খবরের কাগজের লোকদের টেনে নিয়ে গিয়ে নাটক দেখানোর, রিভিউ লেখানোর। বিকাশদা যে সে কাজে সাকসেসফুল হয়েছিলেন তার প্রমাণ ওই নাটকের দীর্ঘকালীন প্রদর্শন। ঠিক মনে পড়ছে না তবু মনে হয় নহবত নাটকের রেকর্ড বোধহয় কেউ এখনও ভাঙতে পারেনি।

বিকাশদা যখন মারা যান তখন আমি কলকাতায় ছিলাম না। বোম্বাইয়ে চার্চগেট স্টেশন থেকে পরের দিন খবরের কাগজখানা কিনেই বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল। দু চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়েছিল। যিনি আমায় এত ভালোবাসতেন তাঁর শেষ যাত্রায় সঙ্গী হতে পারিনি বলে বিরাট একটা আক্ষেপ থেকে গেছে চিরকালের জন্য।

রাজলক্ষ্মীদি

না জীবনে বড় কিংবা ছোট কোনও পুরস্কারই তিনি পাননি। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী'-র জন্যে তাঁর নাম বিবেচনা করা হয়নি। সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির কাছে তাঁর সম্মাননার জন্য কেউ কোনওদিন সুপারিশ করতে যাননি। কত রামা শ্যামা শিল্পীও তো কলকাতা থেকে বি এফ জে এ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে সেটুকুও জোটেনি। তাঁর মৃতদেহে ফুলের মালা দেবার জন্যে কোনও মন্ত্রী অথবা রাজপুরুষের পদার্পণ ঘটেনি।

অথচ তাঁর নামের পাশে চিরকাল শোভা পেয়েছে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে 'বড়' শব্দটি। না, তাঁর প্রতিভাকে বড় করে দেখানোর জন্যে 'বড়' শব্দটি ব্যবহার করা হত না। যেহেতু ওই নামের আর একজন শিল্পী ছিলেন, এবং যেহেতু তিনি অপরজনের থেকে বয়সে বড়, তাই কেবলমাত্র সঠিক মানুষটিকে চিহ্নিতকরণের জন্যে 'বড়' শব্দটি ব্যবহার করা হত।

যাঁর সম্পর্কে এই উক্তিগুলি করতে হল, তাঁর নাম শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী। প্রথা অনুযায়ী রাজলক্ষ্মী দেবী বলা উচিত ছিল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে এই পোড়া দেশে তিনি কোনদিন 'দেবী' হিসেবে উল্লেখিত হননি। চিরকালই তিনি রাজলক্ষ্মী (বড়)। কেবল কয়েকজন অনুরাগীর কাছে তিনি 'রাজলক্ষ্মীদি'। বাকি সকলের কাছেই 'বড় রাজলক্ষ্মী'।

এ নিয়ে কি রাজলক্ষ্মীদির মনে কোনও রাগ বা অভিমান ছিল? একদম না। তিনি ছিলেন এসবের অনেক উর্ধ্বে একজন প্রকৃত অর্থে ক্ষমতাময়ী বড় মাপের অভিনেত্রী। আর মানুষ হিসেবে তার চেয়ে অনেক, অনেক বড়। সে পরিচয় আর ক'জন পেয়েছেন তা আমি জানি না। তবে আমি পেয়েছি। এবং একটু বেশি মাত্রাতেই পেয়েছি।

আমার সঙ্গে অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা ১৯৫০ সালের পর থেকে। রূপাঞ্জলি পত্রিকায় কাজে যোগ দেবার পর। কিন্তু রাজলক্ষ্মীদির সঙ্গে আলাপ আরও ছ'বছর আগে। ১৯৪৪ সালে। সে এক মজাদার ঘটনা।

তখন আমি একটি ছাপাখানায় কম্পোজিটরি করি। প্রেসটা ছিল বিবেকানন্দ রোড এবং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (বর্তমানে বিধান সরণি) মোড়ের কাছাকাছি। থাকতাম সেই প্রেসের একটি ঘরে। একা নয়, আরও দু-একজন থাকতেন আমার সঙ্গে। তাঁরাও কম্পোজিটর।

সকাল ছ'টায় উঠে এক কাপ চা আর একটা বিস্কুট খেয়ে কাজে যোগ দিতাম। বেলা আটটা নাগাদ টিফিন করতে বেরোতাম। আমার একটি পছন্দের দোকান ছিল হেদুয়ার কাছে রামদুলাল সরকার স্ট্রিটে। ওটাকে সিমলেপাড়া বলা হত।

তা সেই দোকানের কচুরি ছিল খুব বিখ্যাত। বেলা ন'টা-দশটা পর্যন্ত শুধু কচুরিই ভাজা হত। ভাজা কচুরির গন্ধে দোকানের আশপাশটা ম ম করত। দোকানটা ছিল সিমলা স্ট্রিট আর রামদুলাল সরকার স্ট্রিটের মোড়ে প্রাক্তন মেয়র গোবিন্দচন্দ্র দে-র বাড়ির পাশে একটি গলির মুখে। এক একটা কচুরি তখনকার পয়সায় দু পয়সা করে। চারখানা কচুরি খেতাম, কিন্তু সেটি হাতে পাবার জন্যে মিনিট পনেরো তো অপেক্ষা করতেই হত। এত ভিড়।

তা একদিন ওই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি কচুরি হাতে পাবার অপেক্ষায়। এমন সময়ে ওই দোকানের ওপরকার একটি ঘরের বারান্দা থেকে এক ভদ্রমহিলা একটু উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন : এই যে খোকা, শুনছো!

আমি ওপর দিকে তাকালাম একটু বিস্মিত হয়ে। অজানা-অচেনা কোনও ভদ্রমহিলা হঠাৎ আমাকে ডাকতে যাবেন কেন! ভাবলাম অন্য কাউকে ডাকছেন। তাই আমি একবার মাত্র তাঁর দিকে তাকিয়ে পরক্ষণে আমার আশেপাশে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলাম কাকে ডাকছেন ওই ভদ্রমহিলা?

ভদ্রমহিলা আমাকে ওইভাবে আশেপাশে তাকাতে দেখে আবার বলে উঠলেন : তোমাকেই বলছি গো খোকা!

আমার তখন সতেরো বছর বয়েস। খোকা সাজার বয়েস তখন পেরিয়ে এসেছি। তবু ওই ডাক শুনেই আবার ভদ্রমহিলার দিকে তাকালাম। মুখটা যেন কেমন চেনা-চেনা মনে হল।

ভদ্রমহিলা আমাকে তাকাতে দেখে বলে উঠলেন : দোকান থেকে আমাকে চার আনার কচুরি কিনে দিয়ে যাও না ভাই। ওই পাশেই দরজা আছে। ওখান দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি পাবে।

এই বলে ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাক করে একটি সিকি ফেলে দিলেন দোতলার বারান্দা থেকে। সিকিটি আমার পাশে রাস্তার ওপর পড়ল। হাতে করে তুলে নিয়ে দেখি ভদ্রমহিলা ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছেন।

মিনিট পাঁচ-সাত অপেক্ষা করতে হল ভদ্রমহিলার কচুরির জন্যে। ততক্ষণে আমি ভাবছিলাম, এঁর মুখটা আমার চেনা-চেনা মনে হল কেন? আমি কি এঁকে আগে কোথাও দেখেছি?

কিন্তু না। কিছুতেই মন করতে পারলাম না। এ পাড়ায় তো আমার চেনাশোনা কেউ নেই যে তাদের সূত্রে পরিচয় হবে! তাহলে এত চেনা লাগছে কেন?

কচুরি হাতে দোতলায় গিয়ে দেখলাম ঘরের দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তে ভেতরে থেকে আওয়াজ এল : দরজা ভেজানো আছে। ভেতরে এসো।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, ছিমছাম সাজানো-গোছানো ঘরের মেঝেতে বেশ পুরু করে গদি পাতা। তাতে তিন-চারখানা ছোট ছোট তাকিয়া বালিশ। অনেকটা বড়বাজারে মারোয়াড়িদের গদিঘরের মতো। ঘরময় ঠাকুর-দেবতার বাঁধানো ছবি টাঙানো। দু-তিনটি ক্যালেন্ডার ঝুলছে, তাতেও সব ঠাকুরের ছবি।

আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন : দাঁড়িয়ে কেন? বোসো না।

এই বলে আমার হাত থেকে কচুরির ঠোঙা নিতে নিতে বললেন : একটু বোসো, দু'খানা কচুরি খেয়ে যাও।

ততক্ষণে ভদ্রমহিলাকে চিনতে পেরে গেছি। রাজলক্ষ্মী (বড়)-কে না চেনার কোনও কারণ নেই। শৈশব থেকে বায়স্কোপের পর্দায় এই মুখখানা দেখে আসছি। অধিকাংশ ছবিতে দজ্জাল ভূমিকা করেন। সেসব অভিনয় দেখে রাগে গা জ্বলে যায়।

কিন্তু সেই মুখে এখন কী মিষ্টি কথাবার্তা। ভদ্রমহিলা রীতিমতো স্থূলকায়া। তবে মুখখানা বেশ গোলগাল। মিষ্টি মিষ্টি। ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে।

আমার মনে তখন আর এক চিন্তা। ভদ্রমহিলা আমাকে দু'খানা কচুরি খেয়ে যাবার কথা বলছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে আমি এতে লাভবান। আমার এক আনা পয়সা বেঁচে যাবে। কিন্তু ভদ্রমহিলা যে অভিনেত্রী। এর আগে রাস্তাঘাটে দু-চারজন অভিনেতা দেখেছি। জহর গাঙ্গুলি, মিহির ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। কিন্তু কোন অভিনেত্রীকে রাস্তায় দেখিনি। একবার চন্দ্রাবতী দেবীকে দেখেছিলাম টকি শো হাউসের বারান্দায়। তাও অনেক দূর থেকে। আজকের মতো এত কাছে থেকে কোন অভিনেত্রীকে দেখিনি। কথা বলা তো দূরের কথা। ফলে আমার আড়ষ্টতা এত বেড়ে গেছে যে কী করা উচিত ভেবেই পাচ্ছিলাম না।

ততক্ষণে ভদ্রমহিলা একটা রেকাবে করে দু'খানা কচুরি আর একখানা কড়া পাকের সন্দেশ এগিয়ে ধরেছেন আমার দিকে। সিমলের কড়াপাকের সন্দেশ খুব বিখ্যাত। চিরকাল নামই শুনে এসেছি। কোনওদিন জিভে ছোঁয়াতে পারিনি।

কচুরির সঙ্গে সন্দেশ দেখে আমার আড়ষ্টতা আরও বেড়ে গেল। বলে উঠলাম : এসবের কী দরকার ছিল! আমি তো এখনই নিয়ে গিয়ে কচুরি খেতাম।

রাজলক্ষ্মী বললেন : সে খেয়োখন। আমার জন্যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কচুরি ভাজিয়ে আনলে। না খেয়ে গেলে কষ্ট হবে। অন্যদিন কাজের লোকটা এনে দেয়। আজ সেই যে বাজারে গেছে, ফেরার নামটি নেই। আর কচুরির দোকানটাও হয়েছে তেমনি। ন'টা বাজল কি কচুরি ভাজা বন্ধ করে দিয়ে

সিঙাড়া ভাজতে বসে যাবে।

ততক্ষণে আমার কচুরিতে কামড় দেবার পর্ব শুরু হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলার ব্যবহার এত সুন্দর আর কথাবার্তা এত মিষ্টি যে এখন আর সঙ্কোচ হচ্ছে না। খেতে খেতে বললাম . আপনাকে আমি বায়স্কোপে দেখেছি।

ভদ্রমহিলা বললেন : তাই নাকি! তাহলে তো আমার ওপরে তোমার রাগ হচ্ছে নিশ্চয়। আমি সব ঝগড়াটে পার্ট করি তো?

বললাম : না না, আপনি খুব ভালো। কী সুন্দর দেখতে আপনাকে।

আমার কথা শুনে ভদ্রমহিলা অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী (বড়) হেসে ফেললেন। বললেন : তাই নাকি! তা তুমিও তো দেখতে ভালো! কী ঢলঢলে মুখখানা তোমার! তোমার নামটি কি বাবা?

নাম বললাম। শুনে রাজলক্ষ্মী (বড়) বললেন ও, তুমি কায়েতের ছেলে! তোমাদের বাড়ি কোথায়?

আমি বললাম . আমার বাড়ি তো এখানে নয়। মেদিনীপুর জেলার তমলুকে। এখানে একটা প্রেসে কাজ করি, সেখানেই থাকি।

ভদ্রমহিলা বললেন : বাড়িতে বাবা-মা সবাই আছেন তো?

আমি বললাম : বাবা আছেন। মা নেই। আমার যখন চোদ্দো বছর বয়েস তখন মা মারা গেছেন।

বলতে বলতে গলাটা আমার বোধ হয় একটু ভারি হয়ে এসেছিল। সেটা লক্ষ করে ভদ্রমহিলা মুখ দিয়ে একটা চুক্ চুক্ শব্দ করলেন। বললেন : মা না থাকা বড় কষ্টের। সেটা আমি বুঝি বাবা।

ততক্ষণে আমার কচুরি আর সন্দেশ ভক্ষণ শেষ। জলের গ্লাসে চুমুক দিয়েছি। আমার হাত থেকে গ্লাসটা ফেরত নিতে নিতে ভদ্রমহিলা বললেন : আজ আর তোমাকে আটকাব না। ইদিকে এলে দেখা করে যেও।

গদি ছেড়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার নামটা তো আমার জানা, কিন্তু কী বলে আপনাকে ডাকব সেটা ঠিক করতে পারছি না।

ভদ্রমহিলা হাসলেন। বললেন : তোমার কী বলতে ইচ্ছে করছে?

আমি একটু মাথা নিচু করে বললাম : আমার মাসিমা বলতে ইচ্ছে করছে।

ভদ্রমহিলার হাসিটা আর একটু আয়ত হল। বললেন : সেটাই আন্দাজ করেছিলাম। তোমার মা নেই তো, তাই মায়ের সাধ মাসিতে মেটাতে চাইছ। কিন্তু বাবা, আমাদের উত্তর কলকাতার একটা অঞ্চলে মাসি ডাকটা খুব সম্মানের নয়। অনেক খারাপ মেয়েকে মাসি ডাকা হয়। সেক্ষেত্রে মাসি ডাক আমার ভালো লাগবে না। তুমি আমায় দিদি বলে ডেকো।

সেই থেকে রাজলক্ষ্মী (বড়) আমার কাছে রাজলক্ষ্মীদি।

তা সেই বয়েসে আমার মাঝে মাঝেই রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু যেতে পারতাম না। খুব সঙ্কোচ হত। মনে হত গেলেই হয়তো ভাববেন, কচুরি খাবার লোভে ছুটে এসেছে। পাছে দেখা হয়ে যায় তাই জলখাবারের জন্যে কচুরির দোকানটাও বদলে নিয়েছিলাম। হাতে সময় কম থাকলে শ্রীমানি বাজারের কোণে আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে যেতাম। আর একটু বেশি সময় পেলে চলে যেতাম রঙমহলের পাশে নামহীন কচুরির দোকানটায়, যে দোকানে অভিনেতা নীতীশ মুখার্জি নিয়মিত কচুরি খেতে যেতেন।

১৯৫০ সালে সাংবাদিকতা করতে ঢোকার আগে আরও বার পাঁচেক রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে গেছি। একবার সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে। আর বার তিনেক গেছি বিজয়া দশমীতে প্রণাম করতে। আর প্রতিবারই রাজলক্ষ্মীদি অনুযোগ করতেন : কী গো ভাই, তুমি তো আর আসই না। অমন করে ভালোবেসে দিদি বলে ডাকলে আর তাকেই ভুলে গেলে।

কিন্তু পঞ্চম বারে রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে গিয়ে এমন একটি ঘটনার মুখোমুখি হলাম যাতে ঠিক করেই নিয়েছিলাম যে জীবনে আর কোনদিন রাজলক্ষ্মীদির বাড়িমুখো হব না।

সেই ঘটনাটা যেদিন ঘটে সেদিন সন্ধেবেলা আমি রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে গিয়েছিলাম। ঠিক তার আগের দিন চিত্রা সিনেমায় নিউ থিয়েটার্সের 'রামের সুমতি' ছবিখানা দেখে এসেছি। রামের বৌদির

চরিত্রে মলিনা দেবী অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম ওই মলিনা দেবীর মায়েব চরিত্রে রাজলক্ষ্মীদির অভিনয় দেখে। অবশ্যই মুগ্ধ হবার মতো চরিত্র সেটা নয়। এক কুচক্রী বিধবা রমণীর চরিত্র। জামাইয়ের সংসারে এসে তাদের সোনার সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

এই চরিত্রে রাজলক্ষ্মীদি এমন মারাত্মক অভিনয় করেছিলেন যে হলসুদ্ধ লোক তাঁর ওপরে রেগে গালাগালি দিচ্ছিল। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, কেন এই গালাগালি! উনি নরম মনের স্নেহশীল মহিলা। ওঁকে যদি বায়স্কোপওয়ালারা ওরকম দজ্জালের পার্ট করতে দেয়, তাহলে ওঁর কী দোষ?

একবার মনে হল আমার পাশের সিটের দু-চার জনকে বলি যে, ওঁকে কেন ওরকম করে গালাগালি দিচ্ছেন? উনি মোটেই ওরকম বাজে মহিলা নন। উনি খুব ভালো। মনটা খুব ভালো। প্রথম আলাপেই আমাকে কচুরি-সন্দেশ খাইয়েছেন।

তারপরে ভাবলাম, এসব কথা না বলাই ভালো। কেউ বিশ্বাস করবে না। উলটে তাচ্ছিল্য করবে। ভাববে এইরকম একটা গরিব-গরিব চেহারার ছেলের সঙ্গে নাকি আবার বায়স্কোপের আর্টিস্টের এত আলাপ আছে!

হলের মধ্যে কোনও কথা না বলে চুপ করেই রইলাম। রাজলক্ষ্মীদির উদ্দেশে যত গালাগালি বর্ষিত হচ্ছিল, তা আমার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কোনও প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। মনে মনে ঠিক করে নিলাম রাজলক্ষ্মীদিকে বলতে হবে উনি যেন এরপর থেকে আর বদমাইশের পার্ট না করেন।

সেই মতলব নিয়েই পরের দিন সন্ধেবেলা রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে গিয়ে হজির হলাম। দিনের বেলা যাবার উপায় ছিল না। সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত তো প্রেসের ডিউটি করতে হয়েছিল। কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাত ধুয়ে ছুটেছিলাম রামদুলাল সরকার স্ট্রিটে। খুব খিদে খিদে পাচ্ছিল, কিন্তু কিছু খেলাম না। জানি তো একটু পরেই রাজলক্ষ্মীদির দেওয়া কচুরি আর নকুড়ের সন্দেশ খেতে পাব।

রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে কোনদিন সন্ধেবেলা আসিনি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময় তাই কিছুটা সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে সঙ্কোচটাকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। যাচ্ছি তো দিদির বাড়ি, তার আবার সকাল-সন্ধে কী?

রাজলক্ষ্মীদির ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সেটা খুলে ধরেই অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মেঝেতে পাতা গদির ওপর ছোট্ট একটা তাকিয়া কোলে নিয়ে আয়েস করে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর মুখে লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়ি। রাজলক্ষ্মীদি তাঁর পাশে বসে হেসে হেসে কী যেন বলছেন।

আমাকে দরজা ঠেলে ঢুকতে দেখে রাজলক্ষ্মীদির চোখ দুটো কুঁচকে গেল। বেশ খরখরে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন : কে? কী চাই এখানে?

ঠিক যেন সেই 'রামের সুমতি'-র দজ্জাল চরিত্রের কণ্ঠস্বর। আমার মনে হল রাজলক্ষ্মীদি বোধ হয় আমাকে সন্ধের আলো-আঁধারিতে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারেননি। তাই একগাল হেসে বললাম : দিদি, আমি। আমি রবি।

রাজলক্ষ্মীদি তেমনি খরখরে গলায় বললেন : রবি তো কী হয়েছে! দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয় তাও জানো না। যাও, বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।

বলতে বলতে রাজলক্ষ্মীদি উঠে এলেন গদি ছেড়ে। আমাকে ঠেলে দরজার বাইরে বার করে দিলেন। তারপর নিজেও বেরিয়ে এলেন। বেরিয়েই দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন : কী চাও কী?

লজ্জায় অপমানে আমার সারা শরীর তখন অবশ। কোনরকমে বললাম : একটা কথা বলতে এসেছিলাম আপনাকে।

রাজলক্ষ্মীদি বললেন : এইটে কি কথা বলার সময়। সকালের দিকে আসতে পারে না। এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে।

রাজলক্ষ্মীদি যে ওরকম ঝাঁঝালো কণ্ঠে আমার সঙ্গে কথা বলবেন, আমাকে এভাবে ঘাড়ধাক্কা

দেবার মতো করে বার করে দেবেন, সেটা আমি কল্পনাও করিনি। আমার দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কোনরকমে চোখের জল রোধ করে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

সিঁড়ির দু-চারটে ধাপ নেমেছি, এমন সময় পেছন থেকে রাজলক্ষ্মীদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল : এদিকে শোনো!

থমকে দাঁড়ালাম। অপমানের আরও কিছু বাকি আছে নাকি? ফিরে যাওয়া উচিত হবে কি না সেটাই ভাবছিলাম।

পুনরায় রাজলক্ষ্মীদির ডাক শোনা গেল : অ্যাই রবি, তোমাকে ডাকছি না!

এবারে রাজলক্ষ্মীদির কণ্ঠস্বর রীতিমতো কোমল। আগেকার সেই ঝাঁঝের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। ফিরে এসে দাঁড়ালাম রাজলক্ষ্মীদির সামনে। মাথাটা নিচু করে।

রাজলক্ষ্মীদি বললেন : আমার দিকে তাকাও।

তাকালাম। দেখলাম, তাঁরও দুটো চোখ ছলছল করছে। বললেন : আমার এখানে কোনওদিন সন্ধেবেলা আসবে না। সন্ধের সময় আমি পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করি। ওই সময় আমার এখানে তোমার মতো অল্পবয়সী ছেলেদের আসতে নেই। বুঝলে?

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাজলক্ষ্মীদি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করতেই পারেন। তাতে দোষের কী আছে? আমি তো তাঁকে কোন অশালীন অবস্থায় দেখিনি। তাঁদের সামনে তো কোনওরকম পানীয়ের গ্লাস-টাসও ছিল না যে তিনি লজ্জায় পড়তে পারেন। তাহলে হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন আমার রাজলক্ষ্মীদি।

রাজলক্ষ্মীদি পুনরায় বললেন : আমার কাছে ভাই হিসেবে আসতে গেলে দিনের বেলায় আসবে। বুঝতে পারলে?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

রাজলক্ষ্মীদি বললেন : এখন তুমি যাও।

জড়িত পায়ে রাজলক্ষ্মীদির ঘরের দরজার সামনে থেকে চলে এসেছিলাম। রাস্তায় নেমে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কোনদিন রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে আসব না। কোনও কারণেই না।

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি। ১৯৫১ সালে আবার রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে আসতে হয়েছিল। বলা যায় আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। শুধু আমি একাই নয়, আমার সঙ্গে একজন গোয়েন্দাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল জোর করে।

রাজলক্ষ্মীদি কত সালে জন্মেছিলেন তা নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। রাজলক্ষ্মীদি মাঝে মাঝে আক্ষেপ করতেন তাঁর জন্ম সাল নিয়ে। বলতেন : ইস্, আর যদি একটা বছর আগে জন্মাতাম তাহলে ধন্য হয়ে যেতাম।

আমি জিজ্ঞাসা করতাম : কেন রাজলক্ষ্মীদি, এ কথা বলছেন কেন?

রাজলক্ষ্মীদি বলতেন : আমার জন্ম তো ১৯০০ সালে, কাজেই আমি তোমাদের বিংশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু আর একটা বছর আগে জন্মালে আমি বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—এঁদের আমলের মানুষ হয়ে যেতাম। সেটা আমার কাছে তখন কত বড় একটা গর্বের ব্যাপার হত বল দিকি!

রাজলক্ষ্মীদির এহেন আবিষ্কারের কথা শুনে আমি হাসতাম।

আমার হাসি দেখে রাজলক্ষ্মীদি বলতেন : না না, হেসো না, হেসো না। এটা হাসির কথা নয়। ভেবে দেখো দিকি, যত সব মহা মহা পুরুষ সব ওই ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন। আর এই বিংশ শতাব্দীতে? যত সব ট্যারা-ব্যাঁকা লোকের জন্ম। যত দিন যাবে, পৃথিবীতে এইরকম ধুরন্ধর লোকের জন্ম ততই বাড়বে। আমি বলছি না যে এই শতাব্দীতেও ভালো লোক কিছুই জন্মাচ্ছে না। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম।

কিন্তু ১৯৭২ সালে রাজলক্ষ্মীদি মারা যাবার পর কেউ লিখলেন তাঁর জন্ম ১৯০২ সালে। অথচ রাজলক্ষ্মীদি আমাকে বলেছিলেন তাঁর জন্ম ১৯০০ সালে। কাজেই তাঁর জন্মসন নিয়ে একটা মতদ্বৈধতা থেকেই গেল।

রাজলক্ষ্মীদি জন্মসূত্রে বাঙালি। তাঁর কর্মক্ষেত্র এই বাংলাদেশ। কিন্তু তাঁর জন্ম উত্তরপ্রদেশের মিরাটে। যে কারণে হিন্দি আর উর্দু ভাষাটা রাজলক্ষ্মীদি জলের মতো বলতে পারতেন। এর ফলে নিউ থিয়েটার্সের পুরনো আমলের হিন্দি ছবিতে যখন অনেক বাঙালি শিল্পীর কণ্ঠস্বর অন্যকে দিয়ে ডাব্ করাতে হয়েছে তখন রাজলক্ষ্মীদি কিন্তু নিজের সংলাপগুলি স্বকণ্ঠেই উচ্চারণ করতেন।

এর জন্যে একটা এক্সট্রা বেনিফিট রাজলক্ষ্মীদি নিশ্চয়ই পেতেন। নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি ছবি ছাড়াও তিনি বম্বের অনেক হিন্দি ছবিতে চান্স পেয়েছেন হিন্দি সংলাপে দক্ষতার কারণে। বড় কারণটা অবশ্যই ছিল তাঁর অভিনয়দক্ষতা। বম্বের বিখ্যাত পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় যখন প্রথম ছবি করার সুযোগ পেলেন, তখন তিনি কলকাতা থেকে রাজলক্ষ্মীদিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ওই 'মুসাফির' ছবিতে একটি টাইপ চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে। আর রাজলক্ষ্মীদিও মারাত্মক অভিনয় করেছিলেন ওই চরিত্রে। যাঁরা ছবিটি দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয় মনে আছে, নতুন ভাড়াটেদের বাড়িতে তাঁদের সুহৃদ হিসেবে ঢুকে কী ভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করবার চেষ্টা করেছিলেন রাজলক্ষ্মীদি। ছোট চরিত্র, কিন্তু তার ব্যঞ্জনাটা অনেক বড়।

রাজলক্ষ্মীদি অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন একটু বেশি বয়সে। তিনি গান জানতেন, নাচ জানতেন। অভিনয় করতে যে জানতেন, এবং বেশ ভালোরকমই জানতেন, সেটা পরে বোঝা গেছে।

রাজলক্ষ্মীদির প্রথম অভিনয় রঙ্গমঞ্চে। ১৯৩০ সালে। অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স তিরিশ। এর আগে রাজলক্ষ্মীদি কী করতেন তা আমি জানি না। মিরাট থেকে কবে এবং কেন রাজলক্ষ্মীদি কলকাতায় এসেছিলেন সে সম্পর্কে কোনরকম আলোকপাত তিনি করেননি। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন : কেন, সে সব জেনে তুমি কী করবে? ওসব কথা আমাকে কোনদিন জিজ্ঞাসা কোরো না।

আমিও আর কৌতূহল দেখাতাম না। সত্যিই তো, সব মানুষের জীবনেই কোনও না কোনও গোপন অধ্যায় থাকে। কারও যদি আপত্তি থাকে তবে কি তা জানতে চাওয়া উচিত?

রাজলক্ষ্মীদির প্রথম অভিনয় স্টার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে। সেই ১৯৩০ সালে আর্ট থিয়েটার নাম দিয়ে একদল সংস্কৃতিম্মন্য মানুষ তখন স্টার থিয়েটার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। তখন তো থিয়েটারে কর্ণার্জুন, মিশরকুমারী, কেদার রায় ইত্যাদি পাবলিক পসন্দ্ নাটকের রমরমা। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাটক একটু ব্যতিক্রম বৈকি। শুধু ব্যতিক্রমই নয়, সাহসিকতার ব্যাপারও বটে।

তা সেই 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে রাজলক্ষ্মীদি দেখা দিলেন ভিখারিনীর চরিত্রে। এই চরিত্রে গান ছিল, অভিনয়ের সুযোগও ছিল। রাজলক্ষ্মীদি দুটোতেই মাত করে দিলেন দর্শকদের। তখনকার দিনে থিয়েটার করতে হলে মহিলাদের গান জানা আবশ্যিক ছিল। রাজলক্ষ্মীদিও সেই যোগ্যতার সুযোগ পেয়েছিলেন 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে ভিখারিনীর চরিত্রে। কিন্তু তাঁর অভিনয়টা এতই ভালো হল যে এরপর থেকে তিনি অভিনয়ের যোগ্যতাতেই কাজ পেতে লাগলেন। 'গৃহপ্রবেশ'-এর পর তিনি রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে আরও নাটকে অভিনয় করেছেন। সেটা অবশ্য নাট্যনিকেতন (বর্তমানে বিশ্বরূপা) মঞ্চে। ওখানে 'গোরা' নাটকে তিনি করেছিলেন গোরার মা আনন্দময়ীর চরিত্রে, যেখানে একটিও গান ছিল না। থাকলেও সমবেত কণ্ঠে ব্রহ্মসংগীত। ওই চরিত্রে রাজলক্ষ্মীদির অভিনয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিল।

রাজলক্ষ্মীদি অবশ্য সরাসরি রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে এই প্রশংসাবাণী শুনতে পাননি। অন্যের মারফত রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা এবং আশীর্বাদ তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছিল।

গৃহপ্রবেশ আর গোরা ছাড়া আরও একটি রবীন্দ্র-নাটকে রাজলক্ষ্মীদি অভিনয় করেছেন। সেটি হল 'চিরকুমার সভা'।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রাজলক্ষ্মীদির অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। প্রায়ই বলতেন : দেখো ভাই, আমি লেখাপড়া বিশেষ শিখিনি। অন্য কেউ হলে সটান বলে দিতাম আই এ বি এ পাস করেছি। কিন্তু তোমার কাছে তো মিথ্যে কথা বলতে পারব না। লেখাপড়া শেখার আমার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল, কিন্তু বার বার তাতে বাধা পড়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কিসের বাধা?

রাজলক্ষ্মীদি বললেন : সেটা বলা যাবে না। তবে রবীন্দ্রনাথের লেখা আমি অনেক পড়েছি। রবিবাবুর গান, রবিবাবুর গল্প-উপন্যাস আমার কাছে গীতা আর মহাভারতের মতো। ওঁর অন্য সব বিষয়ের ওপর লেখা পড়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভালো করে মানে বুঝতে পারিনি। লেখাপড়া না জানা যে কী কষ্টের তা তোমাকে বোঝাতে পারব না।

তিরিশ আর চল্লিশ এই দুই দশক ধরে রাজলক্ষ্মীদি অজস্র নাটকে অভিনয় করেছেন। গান গেয়েছেন। নেচেছেনও। কবে অভিনয় করেছেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই, কিন্তু বুড়ো বয়েস পর্যন্ত তাঁর অনেক নাটকের পার্ট মুখস্ত ছিল। চেপে ধরলে তিনি মাঝে মাঝে সেগুলি অভিনয় করে দেখাতেন। মজার মজার গানও শোনাতেন। থিয়েটারের গান। সেইসব সময়ে রাজলক্ষ্মীদিকে ভারি অপূর্ব দেখাত।

গান গাইতে গাইতে রাজলক্ষ্মীদি হঠাৎ থেমে যেতেন। বলতেন : এককালে যখন গানের গলা ছিল, কত গেয়েছি। এখন তো আর চর্চা নেই। গলাটাও হেঁড়ে হয়ে গেছে। এই হেঁড়ে গলার গান তোমাদের ভালো লাগবে না।

সত্যিই ভালো লাগত না। গলা থেকে সুর বিদায় নিয়েছিল রাজলক্ষ্মীর। কিন্তু মুখের সামনে সে কথা বলা যেত না। শুনলে কষ্ট পাবেন যে! তাই সেই সব ভালো-না-লাগা গানেরও উচ্ছ্বসিত তারিফ করতাম। সেই প্রশংসা শুনে রাজলক্ষ্মীদির মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কেমন যেন লাজুক-লাজুক চোখে তাকিয়ে থাকতেন।

রাজলক্ষ্মীদি দজ্জাল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত হলেও বড় সরল মনের মানুষ ছিলেন। বড় নরম মনের মানুষ।

১৯৩০ থেকে শুরু করে পরবর্তী বিশ-বাইশ বছরে রাজলক্ষ্মীদি প্রচুর নাটকে অভিনয় করেছেন। সব নাটকের নাম আমি বলতে পারব না। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক হল : সাজাহান, শ্রীকৃষ্ণ, রাজসিংহ, ঋষির প্রেম, মহানিশা, মেঘমুক্তি, স্বামী-স্ত্রী, প্রফুল্ল, বঙ্গেবর্গী, প্রতাপাদিত্য, শর্মিষ্ঠা, বাঙালি, কারাগার, দুই পুরুষ, বলিদান, রিহার্সাল, সংগ্রাম ও শান্তি প্রভৃতি। এর মধ্যে 'প্রফুল্ল' নাটকে মাতালনির চরিত্রে অভিনয় করে রাজলক্ষ্মীদি ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিলেন।

পঞ্চাশের দশক থেকে সিনেমায় রাজলক্ষ্মীদির কাজ প্রচুর বেড়ে যায়। তাই নিয়মিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা সম্ভব হত না। তবে মাঝে মাঝে কম্বিনেশন নাইটে তাঁকে অভিনয় করতে দেখা যেত।

এই পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে আবার আমাকে যেতে হল রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে। তার আগে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের এক সন্ধ্যায় রাজলক্ষ্মীদি তাঁর বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে আর কখনও রাজলক্ষ্মীদির বাড়িমুখো হব না।

তার পর থেকে তিনটি বছর রাজলক্ষ্মীদিকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণটা হাঁকুপাকু করেছে। কিন্তু প্রবল অভিমানে আর তাঁর কাছে যাইনি। সিনেমার পর্দায় রাজলক্ষ্মীদিকে দেখতাম আর বুকটা হু হু করে উঠত। আমার মতো মফস্বলের একটি মাতৃহীন ছেলেকে রাজলক্ষ্মীদি যেভাবে স্নেহ আর মমতার সঙ্গে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তেমন করে তো আর কেউ নেয়নি এই ইঁট-কাঠের পাষাণ শহর কলকাতায়।

১৯৫০ সাল নাগাদ আমি 'রূপাঞ্জলি' পত্রিকায় যোগদান করলাম সাংবাদিকতার কজে। ওইসময় বোধহয় কথায় কথায় অফিসের কাকে যেন বলেছিলাম আমার সঙ্গে বড় রাজলক্ষ্মীদির ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। যে কারণে পরের বছর ১৯৫১ সালে রূপাঞ্জলি পত্রিকার বাৎসরিক উৎসবের আগে ওই পত্রিকার সম্পাদক সুধাংশু বক্‌সি মশাই আমাকে বললেন : রবি, রাজলক্ষ্মী দেবীর ইনভিটেশন কার্ডটা তুমিই পৌঁছে দিও।

আমি মাথা নিচু করে জবাব দিলাম : আমার পক্ষে রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়।

সুধাংশুবাবু একটু অবাক হলেন। বললেন : কেন, সম্ভব নয় কেন?

আমি তেমনি মাথা নিচু করেই বললাম : সেটা বলার অসুবিধে আছে।

ওই সময় রূপাঞ্জলি অফিসে সিনিয়ার সাংবাদিকরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সুধাংশুবাবু আমাকে একটু বেশি স্নেহ করতেন বলে তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আমি চক্ষুশূল ছিলাম। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল : দেখুন, রাজলক্ষ্মী দেবীর ওখান থেকে টাকা-পয়সা ধার করে পালিয়ে এসেছে কিনা!

সুধাংশুবাবু আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : তাই নাকি? কত টাকা?

আমি বললাম : টাকা-পয়সার ব্যাপার নয়। এটা অন্য ব্যাপার।

সুধাংশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তাহলে কী ব্যাপার?

আমি বললাম : সেটা বলা যাবে না।

আমার ওই রহস্যময় কথা শুনে সুধাংশুবাবু অবাক হলেন। তাঁর মনে বোধহয় অন্য কোনও কুৎসিত সন্দেহ উঁকি দিল। যেহেতু আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন তাই এ ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করবার জন্য তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন। বললেন : ইনভিটেশন কার্ড নিয়ে রাজলক্ষ্মী দেবীর বাড়িতে তোমাকেই যেতে হবে। তোমার সঙ্গে শিবুও যাবে। যদি কোনও গোলমাল হয়ে থাকে তাহলে ও মিটিয়ে দিয়ে আসবে।

শিবু অর্থে শিবনাথ মুখখার্জি। তিনি আমাদের অফিসের কেউ না। সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের একটু উচ্চ পদে চাকরি করেন। আমরা তাঁকে ডাকতাম শিবুদা বলে।

শিবুদাকে রূপাঞ্জলি অফিসে নিয়ে এসেছিলেন আমার ভগ্নিপতি পঞ্চানন দত্ত। এখন যে শ্রীপঞ্চানন নামে চলচ্চিত্রের প্রচার সচিব হিসেবে বিখ্যাত। পঞ্চাননও সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে চাকরি করত। চাকরির অবসর সময়ে সে বিজ্ঞাপনের কাজকর্ম করত। রূপাঞ্জলি পত্রিকায় যোগ দিয়েছিল বিজ্ঞাপন-সচিব হিসেবে। অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিটা অটুট রেখে। ওদের নাকি কী সব নিয়মকানুন আছে, পারমিশান নিয়ে বাইরেও কাজ-টাজ করা যায়।

পত্রিকার জগতে পঞ্চানন আদিতে ছিল বিজ্ঞাপন-সচিব। পরে সাংবাদিক। সবশেষে শ্রীপঞ্চানন নামে চলচ্চিত্রের প্রচার উপদেষ্টা। আমরা একত্রে বহুদিন কাজ করেছি। উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ পত্রিকাতে ও আমার সঙ্গে ছিল।

ওই পঞ্চাননকে ধরেই শিবুদা রূপাঞ্জলি অফিসে এসেছিলেন স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা নিয়ে। শিবুদার একটু সিনেমা-আর্টিস্টদের সঙ্গে মেলামেশার শখ ছিল। রূপাঞ্জলির ফাংশানের আগে কটি দিন উনি আমন্ত্রণপত্র নিয়ে শিল্পীদের বাড়িতে যেতেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতেন। ফাংশান শেষ হলে শিবুদা উধাও হয়ে যেতেন। পরের বছর আবার ঠিক ফাংশনের আগে আগে এসে হাজির হতেন।

তা সেই শিবুদাকে সুধাংশুবাবু আমার সঙ্গে জুড়ে দিলেন রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে যাবার জন্যে। বলা যায় শিবুদাকে রহস্য-সন্ধানে নিযুক্ত করলেন রূপাঞ্জলির সম্পাদক সুধাংশু বক্সি।

রূপাঞ্জলি অফিসে ওইসব কথাবার্তা যখন হচ্ছিল তখন প্রায় ছ'টা বাজে। শীতকালের বেলা। সন্ধ্যা হয় হয় প্রায়। শিবুদা হাতের ঘড়িটা দেখে বলে উঠলেন : তাহলে আমরা এখনি বেরিয়ে পড়ি।

সুধাংশুবাবু বললেন : তাই যাও না। বেশিদূর তো নয়। এই তো হেদোর ওপারে।

রূপাঞ্জলি পত্রিকার অফিস তখন ছিল কাশী বসু লেনে। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (বর্তমানে বিধান সরণি) ওপরে স্কটিশচার্চ কলেজের মেয়েদের যে হস্টেলটা আছে, যার নাম ডান্ডাস হস্টেল, তারই উল্টোদিকের গলিটার নামই কাশি বোস লেন। এখন তো কাশি বোস লেন দুর্গাপূজার জন্যে বিখ্যাত। ওখানকার পুজো আর প্যান্ডেল দর্শনীয় বস্তু। একবার না দু'বার পুরস্কার পেয়েছে।

কাশি বোস লেন থেকে রাজলক্ষ্মীদির বাড়ির রাস্তা রামদুলাল সরকার স্ট্রিটে হাঁটাপথে পাঁচ মিনিটের দূরত্ব। কিন্তু যেহেতু সন্ধে হয়ে গেছে তাই আমি আর সেদিন যেতে রাজি হলাম না। বললাম : আজ নয়, কাল যাব। আর সন্ধেবেলা নয়, দিনের বেলায় যাব।

শিবুদা বললেন : এখন গেলেই তো হত। কাল দিনের বেলা গেলে আমাকে আবার অফিস করতে হবে।

আমি বললাম : তা করতে হয় করবেন। কিন্তু আমি সন্ধেবেলা রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে যেতে পারব না। অসুবিধা আছে।

শিবুদা তো এখন গোয়েন্দা, তাই আমার কথা শুনে তাঁর চোখ দুটো রহস্যময় হয়ে উঠল। গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : সন্ধেবেলায় যেতে অসুবিধে আছে বলছ কেন, পাড়াটা খারাপ নাকি?

আমি বললাম : খারাপ পাড়া হতে যাবে কেন? ওখানে কত বনেদি মানুষের বাস জানেন? পাশেই

গোবিন্দ দে-র বাড়ি (গোবিন্দবাবু তখনও কলকাতার মেয়র হযনি), তার একটু পাশেই গাযক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র বাড়ি, আবার তারই পাশে ছায়া দেবীর বাড়ি। আবার তার একটু দূরেই অ্যালজেব্রার বিখ্যাত লেখক কে পি বসুর বাড়ি। পাড়াটা খারাপ হলে কি আর এইসব বিখ্যাত মানুষ ওখানে থাকতেন?

শিবুদা বললেন : তাহলে আর সন্ধেবেলা যেতে আপত্তি করছ কেন? চলো না, নেমন্তন্নের ব্যাপারটা এখনই সেরে আসি।

আমি বললাম : আজ থাক শিববুদা। কালকেই যাব। প্লিজ।

শিবুদাকে তো আর বলতে পারি না, রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে সন্ধেবেলা যাওয়া নিষেধ। একদিন গিয়েছিলাম বলে উনি আমাকে দূব দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ওঁর এখন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করার সময়।

শিবুদা বললেন : তাহলে থাক। কালকেই যাওয়া যাবে। আমার একটা ক্যাজুয়াল লিভ যাবে আর কি!

পরের দিন বেলা এগারোটা নাগাদ শিবুদাকে নিয়ে রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে গেলাম। বাড়ির সামনে গিয়ে আমি একটু ইতস্তত করলাম। বললাম : আপনি ওপরে গিয়ে চিঠিটা দিয়ে আসুন শিবুদা, আমি রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি।

শিবুদা তো তখন গোযেন্দা। কাজেই আমার প্রস্তাবে রাজি হবেন কেন। আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে দোতালায় নিয়ে গেলেন।

রাজলক্ষ্মীদির দরজা বন্ধ ছিল বাইরে থেকে। শিবুদা টোকা দিতে ভেতর থেকে রাজলক্ষ্মীদির গম্ভীর গলার আওআজ শোনা গেল : কে?

ওইরকম গম্ভীর আওয়াজ শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। না জানি আজ আবার বরাতে কত হেনস্থা আছে। আমি নিজে কোন কথা না বলে শিবুদাকে ইশারা করলাম কথা বলতে।

শিবুদা বললেন . একটু বাইরে আসবেন দিদি! আমরা রূপাঞ্জলি পত্রিকা থেকে আসছি।

একটু পরেই দরজা খুলে রাজলক্ষ্মীদি দেখা দিলেন। এবং আমাকে দেখেই চমকে উঠে বললেন: কী ব্যাপার। তোমার আবার কী দরকার?

স্পষ্ট বোঝা গেল রাজলক্ষ্মীদির কণ্ঠস্বরে অভিমানেব সুর।

শিবুদা বললেন : ও আমার সঙ্গে এসেছে।

রাজলক্ষ্মী পেছন ফিরে বলে উঠলেন : ভেতরে এসো।

আমরা ভেতরে গিয়ে মেঝের ওপর পাতা গদিটাতেই সলাম। শিবুদা আমাদের আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে ওঁর হাতে ইনভিটেশন কার্ডটা ধরিয়ে দিলেন।

রাজলক্ষ্মীদি কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে। আমি যাব। কখন গাড়ি পাঠাবে বলো। আমি তৈরি থাকব।

রাজলক্ষ্মীদির এই কথার উত্তরে আমি বলে উঠলাম : আমরা কোন আর্টিস্টকে গাড়ি পাঠাচ্ছি না। সকলেই নিজে থেকে আসছেন।

আমার কথা শুনে রাজলক্ষ্মীদি ধমকে উঠলেন : তুমি চুপ করো। তোমার সঙ্গে কথা বলছি না।

তারপর শিবুদার দিকে তাকিয়ে বললেন : গাড়ি কেন পাঠাবে না ভাই। দরকারটা তোমাদের। তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ তোমাদের ফাংশানের গ্ল্যামার বাড়াবে বলে। সেখানে আমি গাঁটের পয়সা খরচ করে যেতে যাব কেন?

শিবুদা বললেন : আপনার কথাটা খুবই যুক্তিপূর্ণ। তবে আমাদের ফাংশান তো রঙমহল থিয়েটারে। এইটুকু রাস্তার জন্যে কি গাড়ি পাঠানোর দরকার?

রাজলক্ষ্মীদি আবার একবার কার্ডটা খুলে দেখতে দেখতে বললেন : রঙমহল থিয়েটারে বুঝি? ও, তাহলে আর গাড়ি পাঠাতে হবে না। আমি একটা রিক্শা করেই চলে যাব।

এবারে রাজলক্ষ্মীদি আমার দিকে ফিরলেন। বেশ খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখলেন। তারপর বললেন : বাবুর মান ভাঙল তাহলে! শেষ পর্যন্ত আবার মাথা মুড়িয়ে দিদির বাড়িতে আসতে

তো হল।

আমি কোনও কথা না বলে মাথা নিচু করে বসে রইলাম।

শিবুদা এবার বললেন : আচ্ছা দিদি, রবির সঙ্গে আপনার কী হয়েছে বলুন তো? ও কিছুতেই আপনার এখানে আসতে চাইছিল না।

রাজলক্ষ্মীদি বললেন : হবে আবার কী। উনি একদিন সন্ধেবেলা আমার এখানে এসেছিলেন। আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেই থেকে বাবুর রাগ হয়েছে!

শিবুদা ববললেন : সন্ধেবেলা এল তো কী হয়েছে?

রাজলক্ষ্মীদি বললেন · কী হয়েছে! তুমিও তো দেখছি তেমনি! সন্ধের সময় কোনও অভিনেত্রীর বাড়িতে যাওয়া কি উচিত? অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে যে! আমার কথা বাদ দাও। আমি বুড়ি মাগি। কিন্তু আমাদের এ লাইনে তো খাবাপ মেয়ের অভাব নেই। ও একটা মা-মরা ছেলে। এখানে দেখাশোনা করবার কেউ নেই। কোন্‌দিন কোন্ বাজে মেয়ের পাল্লায় পড়ে জীবনটা বরবাদ করে ফেলবে। আমাকে দিদি বলে ডেকেছে। ওকে সাবধান করা কি আমার কর্তব্য নয়। তা বাবু আমাকে ভুল বুঝলেন। আমার এখানে আসা বন্ধ করে দিলেন। বেইমান কোথাকার। স্নেহ ভালোবাসার মর্ম ও বোঝে।

এই কথা শোনার পর আর চোখের জল আটকে রাখা যায়? ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম রাজলক্ষ্মীদির বাড়ির ওই গদির ওপরে বসে।

তা সেবার রূপাঞ্জলির ফাংশানের দিন আবার এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হল রাজলক্ষ্মীদিকে নিয়ে। সে কথায় একটু পরেই আসছি।

রাজলক্ষ্মীদি প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয কবেন ১৯৩২ সালে। নিউ থিয়েটার্সের 'পল্লীসমাজ' ছবিতে। শরৎচন্দ্রের এই কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছিলেন তদানীন্তন মঞ্চ সম্রাট শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

বাজলক্ষ্মীদি যখন ছবি করতে এলেন তখন তাঁর বত্রিশ বছর বয়েস। ওই বয়েসে তো নায়িকা করার কথা নয়। সহ-নায়িকাও নয। সুতরাং ছবির জগতে রাজলক্ষ্মীদি প্রথম থেকেই পার্শ্বচরিত্রে। তবে একেবারে বুড়ি বয়সে তিনি একটি ছবির নায়িকা হয়েছিলেন। সে কথায় পরে আসছি।

ছবিতে যখন এলেন তার আগে দু'বছর থিয়েটারে কেটে গেছে রাজলক্ষ্মীদির। একটু-আধটু সুনাম টুনামও হয়েছে। তখন তাঁর আলাপ হয় শিশিরবাবুর সঙ্গে। এবং শিশিরবাবুই তাঁকে নিউ থিয়েটার্সে নিয়ে আসেন ছবি করতে।

'পল্লীসমাজ' ছবি হিসেবে তেমন ভালো চলেনি। শিশিরবাবুর সঙ্গে যুক্ত থিয়েটারের শিল্পীরাই এ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। যেমন শিশিরবাবু নিজে, তাঁর ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, প্রভা দেবী, কঙ্কাবতী, যোগেশ চৌধুরি ইত্যাদি। ছবিটি চিত্রা সিনেমায় মাত্র সাত সপ্তাহ চলেছিল। তখনকার দিনে একটিমাত্র হাউসে ছবি রিলিজ করত। সে কারণে অন্তত বারো সপ্তাহ না চললে কোন ছবিকে বক্স-অফিস হিট বলা যেত না। সে হিসেবে 'পল্লীসমাজ' ছবিতে নিউ থিয়েটার্সের সম্ভবত আর্থিক লোকসানই হয়েছিল।

কিন্তু ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, রাজলক্ষ্মীদির ভাগ্য খুলে গেল ওই একটি ছবিতে অভিনয় করেই। তাঁর অভিনয় কর্তৃপক্ষের ভালো লেগেছিল। এবং তাঁকে নিউ থিয়েটার্সের বাঁধা মাইনের শিল্পী করে নেওয়া হল।

এই নির্বাচনের মর্যাদা রাজলক্ষ্মীদি রেখেছিলেন। এরপর থেকে নিউ থিয়েটার্সের ছবিগুলিতে ছোট বড় যে ভূমিকাই তিনি পেয়েছেন, তার প্রত্যেকটিতেই দর্শকের প্রশংসা আদায় করে নিতে পেরেছেন। শুধু সিরিয়াস রোলেই নয়, কমেডি রোলেও রাজলক্ষ্মীদির অভিনয়ে হাসির চোটে দর্শকের পেটের ভাত উগরে আসতে চাইত।

রাজলক্ষ্মীদির কমেডি-অভিনয়ে দক্ষতার প্রমাণ প্রথম পাওয়া গেল ডি-জি অর্থাৎ ধীরেন গাঙ্গুলি পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের তিন রিলের 'মাসতুতো ভাই' ছবিতে। এই ছবিতে রাজলক্ষ্মীদি জনৈক মেমসাহেবের রোল্ করেছিলেন। আর সে কী অভিনয়। সারা প্রেক্ষাগৃহে হাসির তুফান ছুটিয়ে দিয়েছিল তাঁর সেই অভিনয়। তখন আমার মাত্র সাত বছর বয়েস। কিন্তু আজও মনে আছে সেই 'মাসতুতো ভাই' ছবিতে রাজলক্ষ্মীদির অভিনয় দেখে কী পরিমাণ হেসেছিলাম। তমলুকের সেই তাঁবু খাটানো অস্থায়ী

সিনেমা হলের মধ্যে সকলের হাসি থামলেও আমার হাসি আর থামতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত মায়ের হাতের মৃদু একটি গাঁট্টা আমার মাথার ওপর পড়তে তবে আমার হাসি থেমেছিল।

আমার সেই গাঁট্টা খাওয়ার কাহিনী ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার পর রাজলক্ষ্মীদিকে একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম। শুনে রাজলক্ষ্মীদির সে কী হাসি! রাজলক্ষ্মীদির মুখে হাসি দেখা মানে এক বিরল সৌভাগ্য। স্টুডিওতে যখন যেতেন তখন রীতিমতো গম্ভীর হয়ে থাকতেন। প্রয়োজনে কদাচিৎ হাসতেন, তবে সে হাসির কোন আওয়াজ ছিল না। ধপধপে ফর্সা গোলগাল মুখের মাঝখানে এক চিলতে হাসি দেখা দিয়ে আবার বিদ্যুতের মতো মিলিয়ে যেত।

তাই আমার কথা শুনে রাজলক্ষ্মীদিকে ওভাবে আকাশ-ফাটানো হাসি হাসতে দেখে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম : এই সামান্য কথায় আপনি এত হাসছেন কেন রাজলক্ষ্মীদি?

আমার এই প্রশ্নের জবাব রাজলক্ষ্মীদি সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারেননি। ধাপে ধাপে হাসির দমকটা কমিয়েছিলেন। খানিকটা জল পান করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন . হাসব না! এটা সামান্য কথা হল? সারা হলে আর কেউ হাসছে না, কেবল একটা বাচ্চা ছেলে হো হো করে হাসছে। তোমাকে যে কেউ পাগল বলে ঘা কতক দেয়নি, সেটা তোমার ভাগ্যি।

আমি বলেছিলাম · তা আমি কী কবব। আপনাব পার্ট দেখতে দেখতে বড্ড হাসি পাচ্ছিল যে। মাঝে মাঝে যে ভাবে মুখের ভঙ্গি করছিলেন তাতে না হেসে পারা যায়।

বাজলক্ষ্মীদি বলেছিলেন . আমাদেব তাই করতে হয় রে ভাই। মানুষকে হাসানো আর কাঁদানো যে আমাদের পেশা। পৃথিবীতে এসে ভালো কাজ তো কিছু করতে পারলাম না। তবু যদি এই দুঃখের পৃথিবীতে কারও মুখে একটু হাসি এনে দিয়ে থাকতে পারি তাতেও মনে খানিকটা তৃপ্তি পাই।

নিউ থিয়েটার্সের হয়ে রাজলক্ষ্মীদি এর পব থেকে একের পর এক ছবি করে যেতে থাকলেন। শুধু বাংলাই নয়, হিন্দি ছবিও করতে লাগলেন। নিউ থিয়েটার্স তখন বাংলার পাশাপাশি হিন্দি ছবিরও প্রযোজনা কবত। বাংলা থেকে যে সব ছবি হিন্দিতে রূপান্তবিত হত তাতে হিন্দি ভার্সানের সময় অনেক আর্টিস্ট বদলে যেত। কিন্তু বাজলক্ষ্মীদি তাঁর নিজের চরিত্রেই থাকতেন। কারণ তিনি তো উত্তরপ্রদেশের মেয়ে, হিন্দি ভাষায় অনায়াস দখল ছিল তাঁর। একটা ছবির কথা মনে আছে। বাংলা ছবিটির নাম ছিল 'অভিজ্ঞান'। যখন হিন্দি হল তখন তার নাম হল 'অভাগিন্'। নিউ থিয়েটার্সের এই ছবিটি ১৯৩৮ সালের। পরিচালনা করেছিলেন প্রফুল্ল রায়। বাংলা ভার্সানে অভিনয় করেছিলেন জীবন গাঙ্গুলি, ভানু ব্যানার্জি (বড়), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মলিনা দেবী, মেনকা দেবী এবং রাজলক্ষ্মীদি। নায়িকার শাশুড়ির রোল করেছিলেন রাজলক্ষ্মীদি। হিন্দি ভার্সানের সময় অনেক আর্টিস্ট বদলে গেল, কিন্তু রাজলক্ষ্মীদি তাঁর নিজের ভূমিকাতেই থাকলেন। সবচেয়ে মজার কথা, রাজলক্ষ্মীদি বাংলা ভার্সানে যা অভিনয় করেছিলেন হিন্দী ভার্সানে তার চেয়ে অনেক ভালো অভিনয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দি ডায়লগ যেভাবে বলেছিলেন তা এখনও আমার কানে ভাসছে।

তবে রাজলক্ষ্মীদির প্রথম হিন্দি ছবিতে অভিনয় দেবকী বসুর কাছে। দেবকীবাবু ওই তিরিশের দশকে 'পুরাণ ভকত্' নামে একটি হিন্দি ছবি করেন। তাতে রাজলক্ষ্মীদিকে অভিনয় করা ছাড়াও গান গাইতে হয়েছিল। ওই ছবিতে রাজলক্ষ্মীদির নিখুঁত হিন্দি উচ্চারণ শুনে নিউ থিয়েটার্সের কর্তারা মনস্থ করেছিলেন তাঁদের হিন্দি ছবিগুলিতেও রাজলক্ষ্মীদিকে অভিনয় করাবেন।

ওঁর এই হিন্দি ভাষায় দক্ষতার জন্যেই নিউ থিয়েটার্সের বিখ্যাত পরিচালক বিমল রায় যখন বম্বেতে গেলেন 'দো বিঘা জমিন্' ছবি করতে, তখন রাজলক্ষ্মীদিকে কলকাতা থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। বম্বেতে ওই সময়ে রাজলক্ষ্মীদি অনেকগুলি হিন্দি ছবি করেন। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'মুসাফির' ছবির কথা তো আগেই বলেছি।

শুধু হিন্দিই নয়, উর্দু, ওড়িয়া এবং অসমিয়া ভাষাতেও রাজলক্ষ্মীদি অনেক ছবি করেছেন। সেখানেও নিজের চরিত্রের সংলাপ নিজেই বলতেন। কোনদিন ডাব্ করতে দেননি। বাংলা হিন্দি আর উর্দুতে তো তাঁর দখল ছিলই, সেই সঙ্গে প্রয়োজনবোধে ওড়িয়া এবং অসমিয়ার কথ্য ভাষাও তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

রাজলক্ষ্মীদিকে বলেছিলাম : অত খাটুনি খাটতে যেতেন কেন? ওই ভাষার যে কোনও মহিলাকে দিয়ে আপনার ডায়লগ ডাব্ করিয়ে নিলেই তো ঝঞ্ঝাট মিটে যেত।

রাজলক্ষ্মীদি বলতেন : পরের হাতে তামাক খাবার দরকার কী ভাই! আমি প্রাণ দিয়ে অভিনয় করলাম আর একজন এমন করে ডায়লগ বলল যে চরিত্রটাই মার খেয়ে গেল! অভিনয়ের সময় হাত-পা নাড়াটাই তো বড় কথা নয়, কণ্ঠস্বরের অভিনয়টাও জরুরি। অন্য ভাষায় যারা কথা বলে তারাও তো মানুষ। তারা যদি সে ভাষায় কথা বলতে পারে তবে একজন মানুষ হিসেবে আমিই বা পারব না কেন? কয়েকটা দিন খাটুনি হত এই যা।

রাজলক্ষ্মীদির কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেতাম। ভদ্রমহিলা বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেননি ভাগ্যের দোষে। কিন্তু যে কোন ভাষাকে আয়ত্ত করার ব্যাপারে পেছপাও ছিলেন না। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন না। কী আশ্চর্য নিষ্ঠায় নিজেকে তৈরি করে নিতেন সব অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্যে। এইসব শোনার সময় রাজলক্ষ্মীদির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথাটা নিচু হয়ে আসত।

রাজলক্ষ্মীদির নামে পাশে 'বড়' শব্দটি কীভাবে ব্যবহৃত হল সে সম্পর্কে একটি মজার ঘটনা আছে। সেই ঘটনার কাহিনী আমি শুনেছিলাম আমাদের অগ্রজ সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় এন-কে-জি অর্থাৎ নির্মলকুমার ঘোষের মুখ থেকে। নির্মলদা দীর্ঘকাল অমৃতবাজার পত্রিকার সিনেমা এডিটার হিসেবে কাজ করেছেন দাপটের সঙ্গে। তিনি তুষারকান্তি ঘোষের সেক্রেটারিও ছিলেন অনেকদিন। এখন পাম অ্যাভিনিউর নিজের বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করছেন। বৌদি মারা যাবার পর থেকে তাঁর শরীর আর মন দুটোই একেবারে ভেঙে গেছে। নিজের গণ্ডির বাইরে আর বেরোন-টেরোন না।

নির্মলদার সঙ্গে যখন আমরা পান-ভোজনে বসতাম, তখন নির্মলদা মাঝে মাঝে কিছু আদিরসাত্মক ঘটনা শোনাতেন। রাজলক্ষ্মীদির 'বড়' হয়ে ওঠার পেছনেও কিঞ্চিৎ আদিরসের ছোঁয়া ছিল। ঘটনাটির সত্য মিথ্যার দায়ভাগ আমার নয়। সবটাই নির্মলদার।

রাজলক্ষ্মীদি যখন ওই তিরিশের দশকে একের পর এক নিউ থিয়েটার্সের ছবিতে কাজ করছেন সেই সময়ে আর একজন রাজলক্ষ্মী দেবীকে ছবির পর্দায় দেখা গেল। তিনি অবশ্য বেশ কিছুদিন থেকেই থিয়েটারে অভিনয় করছিলেন। সেই রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল। থাকতেন শোভাবাজার অঞ্চলে। তাঁর মেয়ে গীতশ্রী দেবী পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছিলেন থিয়েটারে এবং সিনেমায় অভিনয় করে। এম পি প্রোডাকসন্সের একটা ছবিতে তিনি উত্তমকুমারের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন। ছবিটির নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। বোধহয় 'কার পাপে'?

তা সেই রাজলক্ষ্মী দেবী ছবিতে অভিনয় করতে আসার পর দর্শকদের কাছে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় সঠিক মানুষটিকে চিহ্নিতকরণের প্রয়োজন দেখা দিল। তখন নিউ থিয়েটার্সের ছবিগুলির পাবলিসিটি করতেন হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক। অত্যন্ত শিক্ষিত এবং অমায়িক মানুষ এই হেমন্তবাবু। পরবর্তীকালে তিনি সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত' ছবিতে অভিনয় করেছেন।

হেমন্তবাবুই প্রথম নিউ থিয়েটার্সের একটি ছবির বিজ্ঞাপনে রাজলক্ষ্মীদির নামে পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে 'বড়' শব্দটি ব্যবহার করলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সিনেমার বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় সেই বিজ্ঞাপনটি দেখবার পর রাজলক্ষ্মীদি কাউকে কিছু না বলে সটান হাজির হলেন হেমন্তবাবুর কাছে। বললেন : হ্যাঁ ভাই হেমন্তবাবু, আপনি কি কোনওদিন রাত্রের দিকে আমার বাড়িতে গেছেন?

রাজলক্ষ্মীদির এই প্রশ্নে হেমন্তবাবু চমকে উঠলেন। বললেন : না, যাইনি তো। শুধু আপনার বাড়িতে কেন, কোনও অভিনেত্রীর বাড়িতেই আমি যাই না।

হেমন্তবাবুর এই থতমত ভঙ্গি দেখে রাজলক্ষ্মীদি একটু ঠোঁট টিপে হাসলেন। তারপর বললেন : তাই তো বলি, আপনার মতো একজন সাধুপুরুষ এই খবরটা পেলেন কোথা থেকে?

হেমন্তবাবু আরও অবাক হলেন রাজলক্ষ্মীদির কথা শুনে। বললেন : কোন খবরের কথা বলছেন বলুন তো?

রাজলক্ষ্মীদি বললেন : ওই যে আমার নামের পাশে 'বড়' কথাটা বসিয়েছেন, সেই খবরটা কোথা থেকে পেলেন?

হেমন্তবাবু বললেন : এর আবার খবর পাওয়াপায়ির কী আছে। দু'জন রাজলক্ষ্মীর মধ্যে কোন্ রাজলক্ষ্মী আমাদের ছবিতে আছেন, সেটা তো পাবলিককে বোঝাতে হবে? আর যেহেতু আপনি দু'জনের মধ্যে বয়সে বড়, তাই আপনার নামের পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে 'বড়' শব্দটা বসিয়েছি।

রাজলক্ষ্মীদি গম্ভীর হয়ে বললেন : তাই বলুন। আমি তো ভাবলাম হেমন্তবাবু কবে না কবে আমার বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন। না হলে আমার যে বুক থেকে শুরু করে কোমরের নিচে পর্যন্ত সব কিছু বড়-বড় তা উনি জানলেন কেমন করে!

কথাটার মধ্যে মারাত্মক আদিরসের খোঁচা ছিল। সেই খোঁচায় হেমন্তবাবুর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন : ঠিক আছে। আপনি যখন আপত্তি করছেন তখন আপনার নামের পাশ থেকে 'বড়' শব্দটা না হয় তুলেই দেব।

রাজলক্ষ্মীদি এবার স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন : না না, তুলে দেবার কথা হচ্ছে না। আপনি যখন মাথা খাটিয়ে শব্দটা বার করেছেন, তখন তুলে দেবেন কেন? ওটা যেমন আছে থাক। তবে কী জানেন ভাই, নামের পাশে 'বড়' বসালেই তো আর মানুষ বড় হয়ে যায় না। বড় হতে গেলে অনেক গুণ থাকতে হয়। আমার তো আর সেসব গুণ নেই। তাই কেমন একটা সংকোচ হচ্ছিল আর কি।

এই হলেন রাজলক্ষ্মীদি। তাঁর মেজাজের অন্ত পাওয়া ভার। কখনও প্রাণান্তকারী ক্ষুরজিহ্ব, কখনও বা অনন্ত রসময়ী। এই রূপের দেখা কতজন পেয়েছেন জানি না। কিন্তু আমি পেয়েছি। এবং পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি।

এবারে রূপাঞ্জলি পত্রিকার ফাংশানে ওই ক্ষুরজিহ্ব রাজলক্ষ্মীদির একটা ঘটনার প্রসঙ্গে আসি।

সেবারে রূপাঞ্জলির ফাংশান হয়েছিল রঙমহলে। সকাল ন'টায় ফাংশান শুরু। সাড়ে আটটা থেকেই আমন্ত্রিত শিল্পীরা আসতে শুরু করেছিলেন। রাজলক্ষ্মীদি এলেন পৌনে ন'টা নাগাদ। একটা রিকশা করে। তাঁর রিকশা এল একেবারে রঙমহলে বটতলার সামনেটায়। আগে বুঝিনি কেন এতটা ভেতর পর্যন্ত রিকশাটা ঢুকিয়ে নিয়ে এলেন রাজলক্ষ্মীদি। সবাই তো রাস্তার ওপরেই গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন। বাজলক্ষ্মীদির আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম একটু পরে।

রিক্শা থেকে রাজলক্ষ্মীদি নামলেন সবাইকে নমস্কার জানাতে জানাতে। বললেন : এই যে বাবারা, সবাইকে আমার নমস্কার।

তারপব একটু গলা নামিয়ে আমাকে বললেন : রিক্শাভাড়াটা দিয়ে দিও।

বলে হন হন করে ঢুকে গেলেন হলের ভেতরে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ কী কাণ্ড! আমরা তো কারুরই গাড়িভাড়া দিচ্ছি না। হঠাৎ এই অবস্থায় সুধাংশুবাবুর কাছে গাড়িভাড়া চাই কেমন করে!

কী আর করা! অগত্যা নিজের পকেট থেকেই চার আনা পয়সা রিক্শাভাড়া দিতে হল। বেশ গায়ে লাগছিল পয়সাটা দিতে। কিন্তু কী করব? রাজলক্ষ্মীদি তো আমারই ক্যান্ডিডেট।

ভাড়া মিটিয়ে হলের ভেতরে গিয়ে দেখলাম রাজলক্ষ্মীদি সামনের সারিতেই বসেছেন। যা রাগী মহিলা! হয়তো ভালো-মন্দ সিট নিয়েই ঝামেলা করে বসবেন!

তবে ঝামেলা একটা ঘটল। এবং সেটা কয়েক মুহূর্ত পরেই। রাজলক্ষ্মীদি যে সিটে বসেছিলেন তার সামনে গিয়ে একজন ফটোগ্রাফার ক্যামেরা তাক করছিলেন। সেটা দেখে রাজলক্ষ্মীদি বেশ একটা হাসি হাসি মুখের এক্সপ্রেশান দিচ্ছিলেন। হঠাৎ হলের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম শ্রীমতী সন্ধ্যারানী হলে ঢুকছেন। তাঁকে কয়েকজন অভ্যর্থনা সহকারে এগিয়ে নিয়ে আসছেন।

সন্ধ্যারানী তখন ইয়ং বেঙ্গলের হার্ট থ্রব। প্রতি বছর অন্তত দশ-বারোখানা ছবিতে তাঁকে দেখা যায়। কলকাতার দর্শকরা হই হই করতে করতে তাঁর ছবি দেখতে ছোটেন।

এদিকে হয়েছে কী, সন্ধ্যারানীকে হলে ঢুকতে দেখে যে ফটোগ্রাফারটি রাজলক্ষ্মীদির ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরায় চোখ রেখেছিলেন তিনি আর ছবি না তুলেই ছুটলেন সন্ধ্যারানীর ছবি তুলতে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল রাজলক্ষ্মীদির। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটি কথাও না বলে হল্ থেকে তীরবেগে বেরিয়ে গেলেন।

আমি বিপদ বুঝে রাজলক্ষ্মীদির পেছন পেছন ছুটলাম। কত অনুনয়-বিনয় করলাম। কিন্তু তিনি কোন কথাই কানে তুললেন না। একেবারে রাস্তার ওপর এসে একখানা রিক্‌শায় উঠে বসলেন। রিক্‌শার ওপরের আচ্ছাদনটা সজোরে তুলে দিয়ে হুকুম করলেন : অ্যাই রিক্‌শা, জোরসে চালাও।

সমস্ত ঘটনাটা কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটে গেল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই মুহূর্তে পত্রিকার কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের মধ্যে কাউকে কিছু বলতে পারছি না। তাঁদের মাথায় এখন অনেক দায়িত্ব। রাজলক্ষ্মীদি না থাকাতে ফাংশানের গ্ল্যামারের কিছুমাত্র হেরফের ঘটবে না। কাজেই কেউ তেমন উদ্বিগ্ন হয়ে রাজলক্ষ্মীদির বাড়ি ছুটবেন তাঁর মানভঞ্জন করাতে, তেমনটা ভাবাই ভুল।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। রাজলক্ষ্মীদি আমার আমন্ত্রণেই এখানে এসেছেন। তাঁর ওই অপমানে নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমার তো কিছু করার ছিল না। হলে ফিরে এসে সেই ফটোগ্রাফারটিকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পেলাম না। পাব কী করে! তার মুখটাও তো ভালো করে দেখিনি। অত ফটোগ্রাফারের মধ্যে কোন্ জন যে অপরাধী তা খুঁজে বার করতে পারলাম না।

মনে মনে ভাবতে লাগলাম, ক্ষতি যা হবার তা আমারই হয়ে গেল। এর পরে তো আর রাজলক্ষ্মীদির কাছে মুখ দেখানো যাবে না। একজন মমতাময়ী মহিলার স্নেহ থেকে বোধহয় চিরকালের জন্যে বঞ্চিত হলাম।

যাব কি যাব না করতে করতেও সেদিনই বিকেলে রাজলক্ষ্মীদির বাড়িতে হাজির হলাম। জানতাম আমার জন্যে অনেক কটু কথা অপেক্ষা করে আছে। মনে মনে তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম তাতে তো আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড়।

আমাকে দেখেই রাজলক্ষ্মীদি একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে এলেন। বললেন : আমি জানতাম তুমি আসবে। সেইজন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। এত দেরি করে এলে কেন? এখন খানিকটা সন্দেশ দিচ্ছি, খাও। আজ রাত্রে আমার এখানে খেয়ে তবে বাড়ি যাবে।

আমি তো অবাক। বললাম : এ আবার আপনার কেমন লীলাখেলা! আমি তো এসেছি আপনার গালাগালি শুনতে। তখন যেভাবে ফাংশান থেকে চলে এলেন!

রাজলক্ষ্মীদি বললেন : তাতে তোমার কী দোষ বলো! সব জায়গাতেই ওরকম মুখ্যু উজবুক মানুষ কিছু থাকে। তবে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি ভাই। পুরনো দিনের শিল্পীদের সব সময় মর্যাদা দেবে। তা তাদের গ্ল্যামার থাক আর নাই থাক। তোমাদের বাবা-মা বুড়ো হলেও যে সম্মান পান সেই সম্মান দিতে চেষ্টা করবে। তাতে ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন। দিদির এই কথাটা মনে রেখো।

তাই রেখেছি। রাজলক্ষ্মীদির সেই উপদেশ আমি জীবনে কখনও ভুলিনি। বোধহয় তারই ফলশ্রুতিতে আজকের এই স্মৃতির সরণিতে।

সারা জীবনে রাজলক্ষ্মীদি প্রায় আড়াইশো ছবিতে অভিনয় করেছেন। গোটা পঞ্চাশেক নাটকে। যেমন ধরনের রোলই হোক, কোনদিন তিনি ব্যর্থ হননি। ১৯৫৫ সালে বংশী আশ পরিচালিত 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে' ছবির তিনিই ছিলেন নায়িকা। ভানু আর জহরের সঙ্গে তাঁর অভিনয় সেখানে অতুলনীয়। কমেডি অভিনয় কাকে বলে তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।

১৯৭১ সালে রাজলক্ষ্মীদি একটা মোটর দুর্ঘটনায় দারুণভাবে আহত হন। চিকিৎসিত হন হাসপাতালে। কিছুকাল পরে সুস্থ হয়ে উঠলেও আনুষঙ্গিক নানা ব্যাধি দেখা দিতে থাকে। বিশেষ করে রক্তাল্পতা এবং সেইভাবেই বেশ কিছুদিন বিছানায় পড়ে থাকেন।

অবশেষে ১৯৭২ সালে মে মাসের শেষের দিকে রাজলক্ষ্মীদি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমার হিসেবে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর। ওই বয়সটাকে পরিণত বয়সই বলা চলে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অকথ্য যন্ত্রণাভোগ করার থেকে মৃত্যুই হয়তো তাঁর কাছে বেশি কাম্য ছিল। অবশেষে তিনি মুক্তি পেলেন। কিন্তু রেখে গেলেন আমার মতো একটি মানুষের মনে চিরকালীন যন্ত্রণা।

প্রেমাংশুবাবু

একবুক অভিমান নিয়ে উত্তর কলকাতার টালা পার্কের উত্তর-পশ্চিম কোণে এক নম্বর তারাশঙ্কর সরণির নীচের তলার একটি ঘরে প্রতিদিন যে মানুষটি শবরীর প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষমান, বয়স যাঁর সর্বাঙ্গে আঁকিবুকি কেটে গেলেও কণ্ঠস্বর যে কোনও তরুণের থেকেও সতেজ, চোখের দু'টি তারায় এই আটষট্টি বছর বয়সেও যৌবন দেদীপ্যমান, প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত অভিনয় জীবনের পরও ক্লান্তি যাঁকে এতটুকু আচ্ছন্ন করতে পারেনি, সুঠাম নায়কোচিত চেহারা থাকা সত্ত্বেও যিনি কোনওদিন নায়ক হয়ে ওঠার সুযোগ পাননি, অথচ বাংলা ছবি ও নাটকের দর্শকেরা যাঁকে একডাকে চেনেন, তাঁরই নাম প্রেমাংশু বসু।

প্রেমাংশুবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে স্টার থিয়েটারে। তার আগে আমরা দু'জন দু'জনকে চোখে-চোখে চিনতাম। স্টুডিওর শুটিংয়ে দেখেছি, তৎকালীন গ্রুপ থিয়েটারের নাটকেও দেখেছি। কিন্তু বাক্যালাপ হয়নি। তার প্রধান কারণ প্রেমাংশুবাবু চিরকালই মিতবাক্। তিনি বরাবরই উজ্জ্বল কিন্তু কোনদিনই উচ্ছল নন। আমার মনে হত এই মানুষটির সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সুখ পাওয়া যাবে না। আর যেখানে সে সুখ নেই সেখানে আমি সময় নষ্ট করতে রাজি নই।

আমার সেই ধারণাটা ভেঙে গেল স্টার থিয়েটারের গ্রিনরুমে ঢুকে। ওখানে একটি মেক্-আপ রুমে পাশাপাশি বসতেন হয়াদা মানে শ্যাম লাহা, তখনকার দিনের আর একটি শক্তিমান নট চাঁদুবাবু মানে চন্দ্রশেখর দে। চাঁদুবাবু পরে যাত্রার আসরও কাঁপিয়েছেন। আমি একবার একটি যাত্রার দল করেছিলাম, তাতে চাঁদুবাববুকে তাঁর তালতলার বাড়ি থেকে জোর করে ধরে এনে আমার দলে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তাছাড়া আরও একবার একটি বালখিল্য ব্যাপার করেছিলাম তাঁকে নিয়ে। আমি, অশোক ঘোষাল এবং অসিত গুপ্ত উল্টোরথ পত্রিকার এই তিন সাংবাদিক একবার ঠিক করলাম আমরা নিজেরাই একটি নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা করব। সেই সময়ে আমরা তিনজনে ছিলাম এক বৃন্তে তিনটি ফুলের মতো। সেই অশোক পরবর্তীকালে বম্বে চলে গেল হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে চিত্র-পরিচালনায় যুক্ত হতে। অসিতবাবু পরে মহাশ্বেতা দেবীকে বিবাহ করে সিনেমার সঙ্গে সবরকম সংস্রব বর্জন করেন এবং বিশুদ্ধ সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকেন। এখন তিনি কী করছেন তা জানি না। তৎকালীন তিনজন গ্ল্যামারাস তরুণ নায়ককে আমরা প্রধান তিনটি ভূমিকা দিয়েছিলাম। তাঁরা হলেন আশিসকুমার, অসীমকুমার এবং বিশ্বজিৎ। অসীমকুমারের সেই প্রথম মঞ্চাভিনয়। বিশ্বজিৎ রঙমহল থিয়েটারে একটি অকিঞ্চিৎকর ভূমিকায় অভিনয় করত। তবে আশিসকুমার ছিল স্টার থিয়েটারের নায়ক। পরে ও বম্বে চলে যায়। নায়িকা করেছিলেন তৎকালীন বহু ছবির নায়িকা তপতী ঘোষ, নায়িকার মা হয়েছিলেন অপুদি মানে অপর্ণা দেবী, আর নায়িকার বাবা চাঁদুবাবু মানে চন্দ্রশেখর দে। তিনদিন রিহার্সালের পরেই বুঝে গিয়েছিলাম আমাদের এলেম কতটা। তখন চাঁদুবাবুকে হাতে-পায়ে ধরে রাজি করিয়েছিলাম পরিচালনার দায়িত্ব নিতে। উনি তা করেছিলেন। বুকলেটে অবশ্য পরিচালক হিসেবে আমাদের তিনজনের নামই ছিল। অভিনয় হয়েছিল আমার দেশ তমলুকে।

তা স্টার থিয়েটারের সেই মেক্-আপ রুমে চাঁদুবাবু আর হয়াদার সঙ্গে প্রেমাংশুবাবুও বসতেন। আরও কে কে যেন সেই ঘরে বসতেন মনে নেই। তবে অনুপকুমার পাশের ঘর থেকে মেক্-আপটা নিয়েই ওই ঘরে চলে আসতেন আড্ডা জমাতে। ওঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা গম গম করে জমে উঠত। সে আড্ডায় আলোচ্য বিষয়বস্তুর কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। প্রকৃতির আবহাওয়া থেকে রাজনীতিক ভণ্ডামি, নাট্যাভিনয় থেকে শুরু করে চোট্টামির প্রকারভেদ, দার্শনিক তত্ত্বের পাশাপাশি নর-নারীর শরীরতত্ত্ব কিছুই বাদ যেত না। মাঝে মাঝে রসিক চূড়ামণি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাক দিতাম ওই আড্ডায় যোগ দিতে। কিন্তু ভানুদা বলতেন : আপনাদের ওই আড্ডায় মন্ত্রী কিংবা কোটাল সাজনের

ইচ্ছা আমাব নাই। অনুপের সঙ্গে কম্‌পিটিশনের প্রবৃত্তিও নাই। আমার ঘবের আড্ডায় আসেন। দেখেন ওইখানে আমি কেমন সম্রাট হইয়া বইসা আছি।

তা ভানুদার সঙ্গে আড্ডা দিতে যেতাম মাঝে মাঝে। তবে তাঁর ঘরে নয়। ভানুদার সঙ্গে আমার আড্ডা বসত গ্রিনরুমের ফাঁকা জায়গায় রাখা চেয়ারগুলোর এক কোণে। সে আড্ডায় ছ্যাবলামির কোনও ব্যাপাব থাকত না। আমরা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করতাম।

ওই হুয়াদার ঘরের আড্ডাতেই আমি প্রেমাংশুবাবুকে তাঁর স্বরূপে আবিষ্কার করলাম। আমারই মতো তিনি ওই আড্ডার একজন মনযোগী এবং নির্বাক শ্রোতা। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এক একখানি মন্তব্য করতেন যাতে হাসির হিল্লোল বয়ে যেত। বুঝলাম ভদ্রলোক একটি বর্ণচোরা আম। ওপর থেকে বোঝবার উপায় নেই, কিন্তু ভেতরে পেকে টুস টুস করছেন। আর রীতিমত সুস্বাদু।

সেই থেকে জমে গেলাম প্রেমাংশুবাবুর সঙ্গে। স্টার থিয়েটারের ওই আড্ডা আমার কাছে নেশার মতো হয়ে উঠল। থিয়েটার ডে-তে সকাল সকাল কাজকর্ম সেরে আড্ডায় গিয়ে না বসা পর্যন্ত অস্বস্তিতে ছটফট করতাম। যেদিন যেতে পারতাম না সেদিন রাত্রে ঘুম আসতে চাইত না।

এই আড্ডার মধ্যে দিয়েই আমি প্রেমাংশুবাবুর ভেতরের মানুষটিকে আবিষ্কার করি। শুধু স্টার থিয়েটারের আড্ডাতেই নয়, প্রেমাংশুবাবু যখন বিশ্বরূপা থিয়েটারে অভিনয় করতেন তখন সেখানেও আড্ডা দিতে গেছি। রবিদা অর্থাৎ রবীন মজুমদার আর প্রেমাংশুবাবু একই মেক্‌-আম রুমে বসতেন। ওখানকার আড্ডায় অতীতের স্মৃতিচারণাই বেশি হত। এই সব আড্ডার মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করতাম প্রেমাংশুবাবুর ভেতবে একটি দুঃখী মানুষ বসবাস করছে। মুখের ওপর সব সময়ই যেন একটা বিষাদের ছাপ মাখানো থাকত। কেমন একটা মেলাংকোলির ভাব।

কেবল একবার একটা আড্ডায় প্রেমাংশুবাবুকে একটু অন্য চেহারায় দেখেছিলাম। সেটা আমাদের বন্ধু প্রভাত বসুর স্পেন্সেস হোটেলের আড্ডায় ডালহাউসি স্কোয়ারে সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের উল্টোদিকে এক সময়ে অবস্থিত ছিল স্পেন্সেস্‌ হোটেল। গ্র্যান্ড আর গ্রেট ইস্টার্নের পরেই ওই হোটেলের খ্যাতি ছিল। এখন হোটেলটি উঠে গেছে। প্রভাত ছিল ওই হোটেলের পার্মানেন্ট বোর্ডার। একটি সুইট বারো মাসের জন্যে রাখা ছিল তার।

প্রভাত এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। ওরকম আড্ডাবাজ আর হৃদয়বান মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। রাস্তাঘাটে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আর নিস্তার ছিল না। জোর করে টেনে নিতে যেন তার হোটেলের আড্ডায়। তারপর পান আর ভোজনের মহোৎসব। সেই আড্ডায় তৎকালীন কলকাতার আড্ডাবাজ মানুষদের মধ্যে কে যে যোগ দেননি তা বলতে গেলে গবেষণায় বসতে হয়।

প্রভাতের অপটিক্যালস্‌ ম্যানুফ্যাকচারিং-এর বড় ব্যবসা ছিল। ওটা তার পেশা। কিন্তু তার নেশা ছিল নাটক। রঙমহল থিয়েটার বিল্ডিং-এ যে রূপচক্র গোষ্ঠী নামে যে ক্লাবটি আছে, প্রভাত ছিল ওই গোষ্ঠীর প্রেসিডেন্ট। নিজে বেশ ভালো অভিনয় করত।

প্রভাত একবার প্রেমাংশুবাবুর ডাইরেকশনে একটা নাটক নামানো মনস্থ করল। সেই নাটকের মহরত এবং আলোচনার জন্যে সে একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করল স্পেন্সেস্‌ হোটেলে। আমন্ত্রিত, রবাহুত আর আনাহূত মিলিয়ে প্রায় শ'খানেক মানুষের সমাবেশ। মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে নাটক সংক্রান্ত কথাবার্তা শেষ। তারপরে প্রায় ঘণ্টা চারেক পান-ভোজন আর আড্ডা। ওই আড্ডায় ওই একটি দিনই আমি প্রেমাংশুবাবুকে উচ্ছল আর সরব হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। তারপরই বোধহয় তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

তারপর থেকে যতবার যত আড্ডায় প্রেমাংশুবাবুকে মিট্‌ করেছি, কোনদিনই আর সেদিনকার সেই স্পেন্সেস্‌ হোটেলের মেজাজে ফিরে পাইনি। তা সে ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের পরিচালক নবেন্দু চ্যাটার্জির বাড়ির বিখ্যাত আড্ডাতেই হোক, কিংবা বৌবাজারের মোড়ে কে এল কাপুরদের নিউ সেন্ট্রাল হোটেলের আড্ডাতেই হোক, অথবা বোলপুরে আউটডোর করতে গিয়ে ট্যুরিস্ট লজের আড্ডাতেই হোক।

এই যে প্রেমাংশুবাবুর একবার নিজেকে প্রকাশ করেই তারপর আবার গুটিয়ে নেওয়া, সেটার একটা

ব্যাখ্যা আমি করেছি। সেটা পরে বলছি।

প্রেমাংশুবাবু জন্মেছেন এই টালাতেই। তবে এখন যে বাড়িতে থাকেন, সেখানে নয়। তারই কাছাকাছি ছ'নম্বর খেলাতবাবু লেনে। ঠিক তার পাশেই সাত নম্বব বাড়িতে তখন থাকতেন নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী।

প্রেমাংশুবাবুর জন্ম ১৯২৫ সালে। বাবা ছিলেন ডাক্তার। ডাঃ নাবায়ণচন্দ্র বসু। তিনি ডানহ্যাম হোমিওপ্যাথিক কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন। ভদ্রলোক ডাক্তারি করলে কী হবে, দুর্দান্ত নাট্যরসিক ছিলেন। নিজে নাটক লিখতেন। তাঁর লেখা তিনটি নাটক আছে। 'কুরুক্ষেত্র', 'হাম্বির' এবং কমেডি-নাটক 'নেকনজর'। এর মধ্যে কুরুক্ষেত্র নাটকটি স্টার থিয়েটাবে অভিনীত হয়েছে। শুধু নাটক লেখাই নয়, নারায়ণবাবু অভিনযও করতেন। বছরে একবার কবে। ওঁদেব হোমিওপ্যাথিক কলেজের যখন বার্ষিক উৎসব হত, সেই সময়ে।

সেই কাবণেই প্রেমাংশুবাবু স্বীকার করেন নাটক তাঁর বক্তের মধ্যে আছে। না হলে যখন কোনও কিছু বোঝবার বয়স হয়নি, তখন থেকেই পাড়ার থিয়েটারের রিহার্সালের সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানলা ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে ওইসব পার্ট পড়ানো তন্ময় হয়ে শুনতেন কেন? শুধু তাই নয়, যেদিন থিয়েটার হত সেদিন কুশীলবদেব মেক্-আপ তোলার পর উদ্বৃত্ত লাল-কালো-সাদা রঙ নিয়ে নিজের গালে মেখে বিচিত্র সাজে সাজতে ইচ্ছে করতে কেন?

ওই রক্তের নেশাটাই প্রেমাংশুবাবুর যখন মাত্র বারো-তেরো বছর বয়েস, সেই তখনই তাঁকে সত্যিকারের মুখে রঙ মেখে ঝলমলে পোশাক পরে পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল। সেবারে ওঁদের পাড়ায় ছোটদের দিয়ে একটা নাটক করানো হয়েছিল। 'প্রতাপাদিত্য'। প্রেমাংশুবাবু সেই নাটকে প্রতাপেব চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। নাটক শেষ হবার পর সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। সঙ্গে বাড়তি কয়েকটা মেডেল।

পড়ার সেই সুনাম অন্য পাড়াতেও ছড়িয়ে পড়ল। ও-পাড়া সে-পাড়া থেকে ডাক আসতে লাগল অভিনয় করবার জন্যে। প্রেমাংশুবাবুর চেহারাটা তো তখন বেশ লালটু লালটু মার্কা ছিল, তাই ফিমেল পার্ট করবার জন্যে ডাকটা আসত বেশি। ওই চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সে অনেক ফিমেল পার্ট করেছেন প্রেমাংশুবাবু। 'সাজাহান' নাটকে জাহানারা, 'দুই পুরুষ'-এ কল্যাণী ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর ভালো করে গোঁফ গজিয়ে যাবার পর আর ফিমেল পার্ট করেননি।

১৯৪৩ সাল থেকে প্রেমাংশুবাবু গ্রুপ থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয শুরু করেন। তখনকার দিনে কলকাতা শহরে কয়েকটি বিখ্যাত গ্রুপ থিয়েটার ছিল। তখন সেগুলিকে বলা হত অ্যামেচার থিয়েটার। যেমন। সাধন সরকারকে এখন তেমন কেউ চিনবেন না। কিন্তু তখন তাঁর খুব নামডাক ছিল। সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন। বেশির ভাগই অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'সন্দীপন পাঠশালা' ছবি করেছিলেন অর্ধেন্দুবাবু। সে ছবির নায়ক ছিলেন সাধন সরকার। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, ওই ছবি মুক্তি পাবার পর হাওড়ায় এক জনসভা শেষ করে ফিরে আসার পথে তারাশঙ্করবাবুর গাড়ি আক্রান্ত হয়েছিল মাহিষ্য-সমাজের কিছু উচ্ছৃঙ্খল মানুষের দ্বারা। এ নিয়ে কাগজে খুব লেখালেখি হয়। পরে মাহিষ্য সমাজের পক্ষ থেকে তারাশঙ্করবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয়। ওইসব দুর্বৃত্তদের দুষ্কর্মের নিন্দাও করা হয়।

সাধন সরকার দু'টি ছবির ডাইরেকশানও দিয়েছিলেন। দু'টিই কমেডি ছবি। প্রথমটি 'জয় মা কালী বোর্ডিং' আর দ্বিতীয়টি 'ফুলু ঠাকুরমা'। দু'টি ছবিই সুপার-হিট। এরপর সাধনবাবু আর কোনও ছবি করেছেন কি না তা আমার মনে পড়ছে না।

সাধন সরকারের 'রঙ্গশ্রী' ছাড়া ঠাকুরদাস মিত্রের একটি গ্রুপ ছিল। সেটির নাম 'রঙ্গনাট্যম'। এটিও নামকরা গ্রুপ। আর সেই সময়ে এইসব গ্রুপগুলির এমন রমরমা ছিল যে প্রফেশ্যনাল থিয়েটারের শিল্পীদের নিয়ে যেমন কম্বিনেশন নাইট হত, তেমনি এইসব গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীদের একত্র করে কম্বিনেশন নাইট হত। এইসব কম্বিনেশনে অভিনয় করতেন ঠাকুরদাস মিত্র, সাধন সরকার, অনিল মিত্র, গীতা দে, মমতা ব্যানার্জি প্রমুখ শক্তিমান শিল্পীরা। এঁদের নামে বড় বড় অক্ষরে রাস্তায় পোস্টারও পড়ত।

প্রেমাংশুবাবু প্রথমে রঙ্গশ্রী গ্রুপের সঙ্গে ছিলেন। তারপর আসেন রঙ্গনাট্যমে। এরপর নিজেই একটা গ্রুপ করেন ১৯৪৭ সালে। নাম দেন 'শ্রীমঞ্চ'। ওঁর সঙ্গে আরও অনেকেই ছিলেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রভারতী ও রঙ্গনা থিয়েটারের গণেশ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। পরে তরুণকুমার, কেতকী দত্ত, গীতা দে, মমতা ব্যানার্জি প্রমুখ এই গ্রুপে যোগ দেন। সত্যি কথা বলতে কি, ক্ষমতাময়ী অভিনেত্রী গীতা দে-র উত্থান এই শ্রীমঞ্চ থেকেই। শ্রীমঞ্চের প্রথম প্রযোজনা ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পবিপ্রেক্ষিতে রচিত 'হল না কো যার প্রতিকার'। গ্রুপেরই একটি ছেলে এই সময়োচিত নাটকটি লিখেছিলেন। পরিচালনা করেছিলেন প্রেমাংশু বসু।

প্রেমাংশুবাবু নাট্য দর্শকদের বিশেষ ভাবে নজরে পড়েন ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কেরানীর জীবন' নাটকে পটলার চরিত্রে অভিনয় করে। নাটকটি অভিনীত হয়েছিল ঠাকুরদাস মিত্রের রঙ্গনাট্যমের ব্যানারে। যদিও তখন প্রেমাংশুবাবুদের শ্রীমঞ্চ-র প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, এবং প্রেমাংশুবাবু ওই দলের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদেরই একজন, তা সত্ত্বেও উনি রঙ্গনাট্যমের 'কেরানীর জীবন' নাটকে অভিনয় করতেন। তখনকার দিনে অ্যামেচার ক্লাবগুলির মধ্যে দলগত ঈর্ষা একটু কমই ছিল। এক গ্রুপের শিল্পী অন্য গ্রুপে অভিনয় করার উদারতা দেখাতে পারতেন। তাছাড়া ঠাকুরদাসবাবুর সঙ্গে প্রেমাংশুবাবুর একটা ঘোরতর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ঠাকুরদাসবাবু নিজেও একজন পাওয়ারফুল অভিনেতা। অহীন্দ্র চৌধুরির পর 'সাজাহান' নাটকে সাজাহানের চরিত্রে তিনি যত ভালো অভিনয় করতে পারতেন, তেমনটি বোধহয় আর কেউ পারতেন না। পরবর্তীকালে তিনি প্রফেশ্যনাল বোর্ডে নিয়মিত অভিনয় করেছেন, সিনেমাতে অভিনয় করেছেন, বেশ দাপটের সঙ্গে যাত্রাতেও অভিনয় করেছেন। তাঁর বরানগরের বাড়িতে আমি অনেকবার গেছি। মানুষটি বড় ভাল ছিলেন।

আমার সঙ্গে ঠাকুরদাসবাবুর শেষ দেখা বক্রেশ্বরে। বোলপুরে 'আজ কাল পরশুর গল্প'-র আউটডোর শুটিং সেরে আমি বক্রেশ্বরে গিয়েছিলাম ক'দিন বেড়াতে এবং হটস্প্রিং-এ স্নান করতে। সেই সময়ে আমাদের পুরনো বান্ধবী তপতী ঘোষও ওখানে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামী মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার বদ্রু ব্যানার্জিকে নিয়ে। ঠিক ওই সময়ে ঠাকুরদাসবাবুও ওখানে গিয়েছিলেন বেড়াতে। কাছাকাছি কোথায় যেন ওঁদের দলের যাত্রা ছিল। সেখান থেকে দু' দিন ছুটি পেয়েছেন। তাই হট্স্প্রিং-এ স্নানের লোভে ছুটে এসেছেন এখানে। আবার ঠিক ওই একই সময়ে উৎপলেন্দু চক্রবর্তীও তাঁব প্রথম ছবি 'ময়না তদন্ত'-এ শুটিং করবার জন্যে বক্রেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে বক্রেশ্বরটা ওই ক'দিন কলকাতা হয়ে উঠেছিল আমাদের কাছে। ঠাকুরদাসবাবুর সঙ্গে ওই আমার শেষ দেখা। তারপর হঠাৎ একদিন খবর পেলাম উনি আর ইহলোকে নেই। শুনে সত্যিই মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

সাধন সরকার আর ঠাকুরদাস মিত্রের দল ছাড়াও সুধীর মুস্তাফি আর পরিমল সেনদের একটি গ্রুপ ছিল। তার নাম 'শিল্পশ্রী'। প্রেমাংশুবাবু ওঁদের দলে অভিনয় করেছিলেন কি না আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

ঠাকুরদাসবাবুরা 'কেরানীর জীবন' নাটকের রিহার্সাল করতেন মির্জাপুর স্ট্রিটের একটি ঘরে। ওখানে রিহার্সাল দেখতে আসতেন মাধব ঘোষাল নামে এক ভদ্রলোক। মাধব ঘোষাল ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের এক বিরাট এবং বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। আমরা ওঁকে মাধুদা বলে ডাকতাম। মাধুদা এখনও বেঁচে আছেন তবে তাঁর সে দাপট এখন আর নেই। উনি দীর্ঘকাল রাধা ফিল্ম স্টুডিওর মালিক ছিলেন। অনেকগুলি ছবি প্রযোজনা করেছেন।

এই ঘোষাল ফ্যামিলির সকলেই অল্পবিস্তর সিনেমার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওঁর দাদা মোহন ঘোষাল কয়েকটি ছবিতে নায়ক করেছেন। ওঁর ভাই কানাই ঘোষালও চিত্র প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মোহনবাবুর কন্যা শ্যামশ্রীর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র সুমিতেন্দ্রনাথ বিয়ে হয়। শ্যামশ্রীও এখন চিত্র প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত। তবে ওঁরা ডকুমেন্টারি ছবি করেন। বিখ্যাত ভাস্কর চিন্তামণি করের জীবন ও কর্মের ওপর তোলা ওঁদের 'গ্র্যাভেন ইমেজ' ছবিটি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছে। সুমিতেন্দ্রনাথের ওরফে বাদশা ঠাকুরও সেই প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত। বাদশা এবং শ্যামশ্রী দু'জনেই খুব চমৎকার মানুষ।

আর্ট অ্যান্ড কাল্চারের ওপর নির্ভবশীল ওঁদের বাড়ির সান্ধ্য আড্ডাটি আমার কাছে খুব লোভনীয়। বিশেষ করে সেই আড্ডায় যদি চিন্তামণি কর স্বয়ং উপস্থিত থাকেন।

ইদানীং কানাঘুষায় শুনছি মাধুদা নাকি আবার রাধা ফিল্ম স্টুডিওর স্বত্ব ফিরে পাবেন। স্টুডিওটি ওঁর হাতছাড়া হয়ে প্রথমে কলকাতাব টি ভি সেন্টার হয়। এখন সেন্সার বোর্ডের অফিস। মাধুদা যদি স্বত্ব ফিরে পান তাহলে হয়তো আবার ছবি করতে পারবেন। তাতে বাংলা চলচ্চিত্রের কিছুটা উপকার হবে সন্দেহ নেই।

কথায় কথায় মূল বক্তব্য থেকে সরে গেছি। আবার স্বস্থানে ফিরে আসা যাক।

'কেরানীর জীবন' রিহার্সালের সময় মাধুদা নাটকের গঠন এবং অভিনয়ের ব্যাপারটা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিযে লক্ষ করতেন। তখনও রাধা ফিল্ম স্টুডিওর মালিকানা ওঁর হাতে আসেনি। কিন্তু তখন থেকেই বোধহয মাধুদা ওটি ছবি করার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন।

'কেরানীর জীবন' নাটকটি মঞ্চস্থ হল। চারিদিকে দারুণ প্রশংসা। আর নাটকের চেয়েও বেশি প্রশংসা প্রেমাংশু বসু অভিনীত পটলা চরিত্রের।

মাধুদা রাধা ফিল্ম স্টুডিও হাতে পেয়েই ঘোষণা করলেন তিনি 'কেরানীর জীবন' ছবি করবেন? পবিচালনা করবেন দিলীপ মুখার্জি। দিলীপবাবু তার আগে সাহিত্যিক পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সহকারি ছিলেন। পরেও দু-একটি ছবি করেছেন। সেগুলি তেমন চলেনি।

'কেরানীর জীবন' ছবি হচ্ছে সে কথা প্রেমাংশুবাবুও শুনলেন। কিন্তু বেল পাকলে কাকের কী? তিনি তো আর ছবিতে চান্স পাবেন না। সিনেমা বলে কথা। সেখানে চান্স পাওয়া এত সোজা নাকি। একবাব অর্দ্ধেন্দু মুখার্জিকে ধরে-কবে তাঁর 'পাত্রী চাই' ছবিতে এক ভিড়ের দৃশ্যে মুখ দেখিয়েছিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু তখন এই টালা-পাইকপাড়া অঞ্চলেই থাকতেন। কিন্তু এত ভিড় যে ছবি রিলিজ করার পর নিজের মুখটাই ভালো করে চিনতে পারেননি। ওসব সিনেমার পার্ট-টার্ট অহীন্দ্র চৌধুরি, ছবি বিশ্বাস, ধীবাজ ভট্টাচার্য ইত্যাদি নামকবা অভিনেতাদের ভাগ্যেই জোটে। প্রেমাংশু বোস তাদের কাছে কোন্ ছাব। তিনি যেমন অফিস আর অ্যামেচার নিয়ে আছেন সেটাই যথেষ্ট।

প্রেমাংশুবাবু তখন চাকরি করছেন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে। ভিক্টোরিয়া হাউসে বসেন ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে। আধা-সাহেব কোম্পানি। মাইনেপত্র ভালোই। বেশ মজায় আছেন অফিস আর থিয়েটার নিয়ে।

'কেরানীর জীবন' ছবি হবে হবে শোনেন, কিন্তু কাজ আর শুরু হয় না। হঠাৎ ১৯৫২ সাল নাগাদ শোনা গেল ছবির কাজ এবার সত্যিই শুরু হবে। পটলার রোলে সিলেক্টেড হয়েছেন ঠাকুরদাস মিত্র। কয়েকদিন পরে শুনলেন ঠাকুরদাস বাতিল। ওঁর চেহারা নাকি ক্যারেকটারের সঙ্গে মিলছে না। ওঁর জায়গায় বিকাশ রায় করছেন। খুব ভালো কথা। বিকাশ রায়ের মতো গুণী অভিনেতারই তো ওই রোল পাওয়া উচিত।

একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে শ্রীমঞ্চ ক্লাবে আসতেই একটি ছেলে বলে উঠল : এই যে প্রেমাংশুদা, মাধববাবু এসেছিলেন তোমার কাছে।

প্রেমাংশুবাবু চিনতে পারলেন না। বললেন : কে মাধববাবু?

ছেলেটি বললে : মাধব ঘোষাল গো। চিনতে পারছ না?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : ও—মাধুদা। তা কেন এসেছিলেন কিছু বললেন?

ছেলেটি বললে : মাধববাবু তোমার বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে না পেয়ে ক্লাবে এসে খবর দিয়ে গেছেন। তোমাকে কাল রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওতে যেতে বলেছেন। তাঁদের ছবিতে পটলার রোল করতে হবে তোমাকে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কানের মধ্যে জলতরঙ্গ আর চোখের সামনে সর্ষেফুল। প্রেমাংশুবাবু নিজের হাতে একটা চিমটি কেটে দেখে নিলেন তিনি সজ্ঞানে আছেন তো?

সিনেমায় যে চান্স পাবেন এমন আকাশকুসুম কল্পনা কোনওদিনই ছিল না প্রেমাংশু বসুর। তিনি বরং মনে মনে কামনা করতেন রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোর নিচে নিজেকে দেখবার।

সেইজন্যেই মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন শ্রীমঞ্চ প্রযোজিত নাটকগুলির পিছনে। যদিও ওটা অ্যামেচার থিয়েটার, দর্শকসংখ্যা সীমিত, তা সত্ত্বেও ভাবতেন একদিন তাঁর গুণের কদর হবেই হবে বাংলার পেশাদার নাট্যমঞ্চে।

সেই আশা নিয়েই তিনি হাজির হয়েছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির কাছে। যদিও শিশিরকুমারের তখন পড়তি অবস্থা। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে (এখনকার বিশ্বরূপা) তাঁর নাটকগুলি তখন মাছি তাড়াচ্ছে। নতুন কোনও নাটকের প্রযোজনা করছেন না তিনি মূলত অর্থাভাবে। ষোড়শী, আলমগীর, মাইকেল মধুসূদন ইত্যাদি বহুবার অভিনীত নাটকগুলিই তখন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মঞ্চস্থ হচ্ছে। কিন্তু সেসব নাটক দর্শকদের এতবার দেখা যে তাঁরা নতুন করে আগ্রহ বোধ করছেন না ওইসব নাটক দেখার। আব কুশীলবের তালিকায় তেমন নামকরা কেউ নেই। শিশিরবাবু নিজে আছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁব পাশে যাঁরা আছেন তাঁদের প্রতিভা থাকলেও তেমন গ্ল্যামার নেই। যেমন নিভাননী, বেবা দেবী, বাজলক্ষ্মী (ছোট), মণি শ্রীমানী, পুরু মল্লিক, বাণীব্রত মুখার্জি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই বাণীব্রত মুখার্জি ছিলেন আমার দেশ তমলুকেরই ছেলে। বাংলার বিখ্যাত বীর বিপ্লবী, আমাদেব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখার্জির তিনি ভাইপো। অজয়দা পুরোপুরি রাজনীতির মানুষ। উনিশশো বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি তমলুকে বৃটিশ শাসিত ভারতেই তাম্রলিপ্ত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সেসব কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই বছর আগস্ট আন্দোলনেব পঞ্চাশ বছব পূর্তিতে সেই কথা আবাব নতুন কবে স্মরণ করছে সাবা দেশেব মানুষ।

অজয়দা নাটক-টাটক তেমন পছন্দ করতেন না। তা বলে একেবারে যে বিপক্ষেও ছিলেন তা নয। আমি একবার তমলুকে উত্তমকুমারকে সংবর্ধনা দেবার জন্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। অজয়দা তখন মুখ্যমন্ত্রী। অজস্র কাজের মাঝখানেও তিনি সময় করে নিয়েছিলেন ওই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার। সেখানে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সেসব কথা এখন থাক। পরে যখন উত্তমকুমার প্রসঙ্গে লিখব তখন সেসব ঘটনা সবিস্তারে আলোচনা করা যাবে।

অজয়দার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর পরিবারের বৃহৎ অংশকে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি। ব্যতিক্রম তাঁর ছোট ভাই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ভ্রাতৃবধূ গীতা মুখোপাধ্যায়। তবে তাঁরাও তাঁর নিজের দল কংগ্রেসে আসেনি। যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় বিশ্বনাথদা ওরফে দামুদা মন্ত্রীও হয়েছিলেন। আর গীতা মুখার্জি তো দু-তিনবার সংসদ সদস্যা হয়েছেন। এখনও তিনি পার্লামেন্টের মেম্বাব। বিশ্বনাথদা মারা গেছেন। একমাত্র গীতাদিই তাঁদের পরিবারের রাজনৈতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন।

বাণীব্রতদা কিন্তু কোনদিনই রাজনীতির দিকে ঝোঁকেননি। হ্যামিল্টন স্কুলে পড়বার সময় থেকেই দেখেছি তাঁর নাটকের প্রতি অনুরাগ। আমাদের ছাত্রাবস্থায় আমরা ওই রূপবান পুরুষটির দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতাম। ভাবতাম উনি চান্স পেলে কালক্রমে সিনেমার নায়ক হবেন। কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। বাণীব্রতদা লাগাতার বেশ কয়েক বছর শিশির ভাদুড়ির কাছে থেকেছেন, চার-পাঁচটি ছবিতেও মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন, কিন্তু ফিল্ম কিংবা স্টেজে কেরিয়ার তৈরি করতে পারেননি। এক বিখ্যাত মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে অফিসার হয়ে তাঁকে কাল কাটাতে হয়েছে।

যাক, যে কথা বলছিলাম। শিশিরবাবুর ওই ভাঙাহাটেই প্রেমাংশুবাবু নিজেকে যুক্ত করবার জন্যে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। তখনও অভিনয়টাকে প্রফেশ্যনালি নেবার অভিলাষ হয়নি প্রেমাংশুবাবুর। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর অ্যাকটিং প্রতিভাকে উজ্জ্বল করে তুলতে। জনমানসে নিজের একটা ইম্প্রেশন তৈরি করতে। সেদিক থেকে শিশিরবাবু ছাড়া উপযুক্ত ব্যক্তি আর কে হতে পারেন।

কিন্তু শিশিরবাবুর ওখানে ঢোকা তো চাট্টিখানি কথা নয়। প্রেমাংশুবাবু ভাবলেন, এর জন্যে একজন মুরুব্বি ধরতে পারলে ভালো হত। শুনেছেন শিশিরবাবুর ওখানে একটি বিখ্যাত আড্ডা আছে। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা শিশিরবাবুর ওখানে প্রায়শই আড্ডা দিতে আসেন। ওঁদের যে কোন একজনকে ধরে শিশিরবাবুর কাছে যাবার পাশপোর্ট

আদায় করতে পারলে কেমন হয়? কিন্তু চিরকালের মুখচোরা প্রেমাংশুবাবুর পক্ষে সে কাজটা করাও তো মুশকিল। জীবনে কোনদিন নিজের কথা সাতকাহন করে বলতে তো পারেনইনি, উপরন্তু নিজের যথার্থ প্রাপ্যটুকুও বুঝে নিতে শেখেননি। তার জন্যে সারা জীবন তাঁকে অনেক দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। সবার অলক্ষে চোখের জলে বুক ভাসাতে হয়েছে। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক। সে কথায় পরে আসছি।

শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাটা দিনের পর দিন প্রবল হয়ে উঠতে লাগল প্রেমাংশুবাবুর মনে। অফিস থেকে ফিরে প্রায়ই ঘুর ঘুর করতে লাগলেন শ্রীরঙ্গম মঞ্চের আশেপাশে। প্রথম প্রথম রাজা রাজাকিষণ স্ট্রিটের ওপর। পরে একটু সাহস বাড়িয়ে শ্রীরঙ্গমের বুকিং অফিসের সামনে। শ্রীরঙ্গমের বুকিং অফিসটা ছিল রাস্তার ধারে। তারপরে খানিকটা ফাঁকা জমি। তাতে কয়েকটা ফুলের গাছ টাছ লাগানো। তারপরে মূল প্রেক্ষাগৃহ। সেই বাড়িরই দোতলায় শিশিরবাবুর নিবাস। ওই বুকিং অফিসের সামনে, আবার কখনও বা বাগানের ভেতর পায়চারি করতে করতে প্রেমাংশুবাবু সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতেন দোতলার দিকে। ঈশ্বর কি একবার ওই ঘরটিতে শিশিরবাবুর সামনে তাঁকে পৌঁছে দিতে পারেন না?

শিশিরবাবুর ভাই হৃষীকেশ ভাদুড়ি শ্রীরঙ্গমে বুকিং-এ বসতেন। সঙ্গে থাকতেন শিশিরবাবুর পুত্র অশোক ভাদুড়ি। প্রেমাংশুবাবু যে পর পর ক'দিন বিকেলের দিকে এখানে ঘোরাঘুরি করছেন সেটা হৃষীবাবুর নজরে পড়ল। প্রথমে ভেবেছিলেন একজন উৎসাহী থিয়েটার-দর্শক। এখনও মনস্থির করতে পারছে না টিকিট কাটবে কি কাটবে না। তাই কিছু বলছিলেন না। পরে তাঁর কেমন সন্দেহ হল। তাই একদিন প্রেমাংশুবাবুকে ডাক দিলেন : ওহে ছোকরা, এদিকে শোন।

ডাক শুনে প্রেমাংশুবাবু থতমত খেয়ে গেলেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন বুকিং অফিসের সামনে। বললেন : আমায় কিছু বলছেন?

হৃষীবাবু বললেন : ক'দিন থেকে দেখছি তুমি এখানে ঘুর ঘুর করছ। মতলবটা কী বলো দেখি?

প্রেমাশুবাবু বললেন : মতলব কিছু নেই স্যার। এমনিই এখানে ঘুরে বেড়াই।

হৃষীবাবু বললেন : উঁহু, তা তো মনে হচ্ছে না। এমনি এমনি এক-আধদিন ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু এরকম দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ায় না। তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। আসল উদ্দেশ্যটা আমার কাছে খুলে বলো দেখি।

হৃষীবাবুর কথায় প্রেমাংশুবাবু একটু সাহস পেলেন যেন। বললেন : তাহলে আপনাকে সব খুলে বলি স্যার। আমার নাম প্রেমাংশু বসু। আমি অ্যামেচারে অভিনয় করি। আমার খুব ইচ্ছে শিশিরবাবুর পায়ের নিচে বসে অভিনয় শিখি। সেইজন্যে দিনের পর দিন এখানে ঘুরে বেড়াই যদি বরাতক্রমে কোনদিন ভাদুড়িমশাইয়ের দেখা পেয়ে যাই। তাহলে আমার মনের কথাটা তাঁর কাছে খুলে বলতে পারি।

প্রেমাংশুবাবুর কথা শুনে হৃষীবাবু ধমকে উঠলেন : অ্যাই ছোকরা, শিশিরবাবু কি তোমার ইয়ার-দোস্ত যে তাঁকে ভাদুড়িমশাই বলছ। এখানে সবাই তাঁকে বড়বাবু বলে। তোমার সঙ্গে যদি তাঁর দেখা হয় তবে তুমিও তাই বলে ডাকবে। বুঝলে?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : তাই হবে স্যার। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কী করে? আপনি যদি দয়া করে একটু ব্যবস্থা করে দ্যান তবে বড় ভালো হয়।

হৃষীবাবু তীক্ষ্ণ চোখে প্রেমাংশুবাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে। তুমি একবার পরশুদিন আমার সঙ্গে দেখা কোরো। আমি এর মধ্যে বড়দার সঙ্গে কথা বলে রাখব। তিনি যদি রাজি হন তবে আমি তোমাকে সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ জানিয়ে দেব।

তিনদিন পরে সুখবর পাওয়া গেল। শিশিরকুমার রাজি হয়েছেন প্রেমাংশু বসু নামক যুবকটির সঙ্গে দেখা করতে। আরও তিনদিন পরে তিনি সময় দিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারের সময় সকাল ন'টা।

ওই তিনটে দিন প্রেমাংশুবাবু যেন একটা ঘোরের মধ্যে কাটালেন। দিনে খেতে পারছেন না। রাত্রে ঘুমোতে পারছেন না। তাঁর সযত্নলালিত একটি স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মুখোমুখি হবেন তিনি।

নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে হাজির হলেন শ্রীরঙ্গম প্রেক্ষাগৃহে। হৃষীবাবু বুকিং-এ ছিলেন. প্রেমাংশুবাবুকে দেখে উঠে এলেন। তাঁর পিছনে পিছনে প্রেমাংশুবাবু এলেন শিশিরকুমারের সামনে।

একটি দামি সিল্কের লুঙ্গি পরে বসে আছেন শিশিরকুমার। উর্ধ্বাঙ্গে কাজ করা বেনিয়ান। তাঁর কাছে আরও তিনজন ভদ্রলোক বসে আছেন। প্রেমাংশুবাবু তাঁদের তখন চিনতেন না। পরে তাঁদের নাম জেনেছেন। তাঁরা হলেন পুরু মল্লিক, আদিত্য ঘোষ এবং রামকুমার মল্লিক। এঁরা তিনজনই শ্রীরঙ্গমে অভিনয় করতেন।

প্রেমাংশুবাবু শিশিরকুমারের সামনাসামনি হওয়ার পর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। পুরু চশমার কাচের মধ্যে দিয়ে শিশিববাবু তাকালেন প্রেমাংশুবাবুর দিকে। ডান হাতটি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে সামান্য একটু উঁচু করে তুলে ধরলেন। ক্ষণিকের বিরতি। তারপরে মেঘমন্দ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : কী করা হয়?

প্রেমাংশুবাবু উত্তর দিলেন . ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে চাকরি করি।

পুনর্বার প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতা জানা আছে?

প্রেমাংশুবাবু ইতিপূর্বে পাড়ার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'সাজাহান' কবিতাটি আবৃত্তি করে প্রশংসা পেয়েছিলেন। শিশিরবাবুব প্রশ্নের উত্তরে সেই কথাটিই তিনি জানালেন।

শিশিরবাবু বললেন : তাহলে ওই কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাও দেখি। ওহে অদ্বৈত, তোমরা সব হলের একেবারে শেষে গিয়ে বসো। এর কণ্ঠের রেঞ্জটা একবার যাচাই করে নিই।

অদ্বৈত অর্থে আদিত্য ঘোষ। শিশিরবাবুর কেন যে ওঁকে অদ্বৈত বলে ডাকতেন তা প্রেমাংশুবাবু দশ বছর ধরে শিশিরবাবুর কাছে থেকেও আবিষ্কার করতে পারেননি।

যাই হোক. শিশিরবাবুর নির্দেশে ওঁবা সবাই হল ঘরের পেছন দিকে চলে গেলেন। শিশিরবাবু বললেন : তোমার আবৃত্তি শুরু করো।

প্রেমাংশুবাবু আবৃত্তি শুরু করতে গিয়েই হোঁচট খেলেন। প্রথম লাইনটা কিছুতেই মনে আসছে না। অথচ এই কবিতাটা অন্তত কুড়ি-পঁচিশবার আবৃত্তি করেছেন নানা উপলক্ষে।

প্রেমাংশুবাবুকে ঢোক গিলতে দেখে শিশিরবাবু তাড়া দিলেন : কই. শুরু করো। নার্ভাস হলে তো চলবে না বাপু। এখানে তো আমরা মাত্র চারজন। অভিনয় করার সময় তো হলভর্তি দর্শক থাকবে। তখন তো এরকম খাবি খেলে চলবে না।

শিশিরবাবুর এই করাঘাতের মতো বাক্যবাণটি কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে 'সাজাহান' কবিতাটি প্রথম লাইনটা মনে পড়ে গেল প্রেমাংশুবাবুর। গলাটা একটু ঝেড়ে নিযে শুরু করলেন : এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর সাজাহান/কালস্রোতে ভেসে যায জীবন যৌবন ধন মান...।

ঠিক দুটি ছত্র আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে শিশিরবাবু হাত তুলে নিরস্ত হতে বললেন। তারপর শ্রোতা তিনজনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কী হে অদ্বৈত, তোমরা এর গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছ তো?

ওঁরা তিনজনই সমস্বরে বললেন : আজ্ঞে হ্যাঁ, পেয়েছি।

শিশিরবাবু এবারে প্রেমাংশুবাবুর দিকে তাকালেন। বললেন : কপালের ঘামটা মুছে নিয়ে আমার সামনে এসে বসো।

শিশিরবাবু কথায় প্রেমাংশুবাবু চমকে উঠলেন। কপালে হাত দিয়ে দেখলেন সত্যিই সেখানে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে। আরক্ত মুখে পকেট থেকে রুমালটা বার করে কপালের ঘাম মুছলেন। তারপর ভয়ানক জড়সড় হয়ে বসলেন শিশিরবাবুর সামনে।

শিশিরবাবু বললেন : তোমার কণ্ঠস্বরটা মন্দ নয়। তেজ আছে। তবে উচ্চারণের অনেক ত্রুটি আছে। সেগুলো শুধরে নিতে হবে।

প্রেমাংশুবাবু বললেন : আপনি যদি দয়া করে দেখিয়ে দেন তাহলে শুধরে নিতে পারব বড়বাবু।

শিশিরবাবু এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। যেন কথাটা তাঁর কানেই যায়নি। তিনি একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বললেন : আমি যদি তোমাকে আমার এখানে নিই তাহলে তোমার চাকরির কোনও অসুবিধে হবে না?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : অফিসে আমার ডিউটি তো পাঁচটা পর্যন্ত। তারপরই এখানে চলে আসব।

শিশিরবাবু বললেন : কিন্তু কখনও কখনও তো দিনের বেলাতেও রিহার্সাল পড়বে। তখন কী করবে?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : তখন ছুটি নিয়ে নেব। আমার অনেক ছুটি পাওনা আছে।

শিশিরবাবু বললেন : বেশ। তোমাকে আমার এখানে নিতে পারি, তবে একটা শর্তে।

প্রেমাংশুবাবু বললেন : আপনি যে শর্ত বলবেন তাতেই আমি রাজি।

শিশিরবাবু বললেন : শর্তটা না শুনেই রাজি হয়ে গেলে?

প্রেমাংশুবাবু একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন কথাটা শুনে। নিচু গলায় বললেন : কী শর্ত বলুন।

শিশিরবাবু বললেন . আমার এখানে কাজ করলে তিনটে 'পি' তুমি পাবে না।

প্রেমাংশুবাবু কথাটার মানে বুঝতে পারলেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন শিশিববাবু .মুখের দিকে।

শিশিরবাবু বললেন . বুঝতে পারলে না তো?

প্রেমাংশুবাবু ঘাড় নেড়ে জানালেন : আজ্ঞে না।

শিশিরবাবু বললেন : তিনটে 'পি'-এর অর্থ হল পার্ট, পয়সা আর পাবলিসিটি। আমাব এখানে কাজ করতে হলে এই তিনটে 'প'-এর আশা ত্যাগ করতে হবে। এবারে ভেবে বলো তুমি এখানে আসতে চাও কি না।

প্রেমাংশুবাবু চমকে উঠলেন কথাটা শুনে। পয়সা যে শিশিরবাবু দিতে পারবেন না সেটা তিনি ভালো করেই জানেন। দেবেন কোত্থেকে? প্রেমাংশুবাবু তো থিয়েটার ডে-তে হলে ঢুকে দেখেছেন সর্বসাকুল্যে জনা পঞ্চাশেক দর্শক হয় কি না সন্দেহ। তারও আবার অর্ধেক কমপ্লিমেন্টারি পাস। আর পাবলিসিটি তো আরও দূরের কথা, খবরের কাগজে সামান্য এক ইঞ্চি বিজ্ঞাপনও থাকে কি না সন্দেহ। অন্য থিয়েটারের যেখানে দেয়ালজোড়া পোস্টার পড়ে সেখানে শ্রীরঙ্গমের ছোট ছোট পোস্টারগুলি নজরেই আসে না। কাজেই পাবলিসিটি যে পাবেন না সেটাও জানা কথা। তবে পার্ট পাবেন না সেটা ভাবেননি। ওঁর কাছে যদি একাগ্র চিত্তে অভিনয় শেখেন তাহলেও পার্ট পাওয়া যাবে না, এটা কি হতে পারে? উনি নিশ্চয় পরীক্ষা করে দেখছেন ছেলেটা লোভী কি না। ঠিক আছে, সে পরীক্ষায় প্রেমাংশুবাবুকে পাস করতেই হবে।

সুতরাং প্রেমাংশুবাবু বললেন : আপনার সব ক'টি শর্তেই আমি রাজি।

প্রেমাংশুবাবুর কথা শুনে শিশিরবাবু তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। একটু পরে বললেন : ভালো করে ভেবেচিন্তে উত্তর দাও। আমি কিন্তু এক কথার মানুষ। এখন রাজি হয়ে গিয়ে তারপরে যেন ঘ্যানঘ্যান কোরো না।

প্রেমাংশুবাবু বললেন : আমি ভেবেচিন্তেই উত্তর দিয়েছি।

ওই শর্তে রাজি হয়ে শিশিরবাবুর কাছে শিক্ষানবিশ হয়ে ঢুকে পড়লেন প্রেমাংশুবাবু। তা শিশিরবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন। দীর্ঘ দশটি বছর শিক্ষানবিশি করার পরও একটি দিনের জন্যেও কোনও নাটকে পার্ট করতে দেননি প্রেমাংশুবাবুকে। না, কোন চরিত্রের সাবসটিটিউট হিসেবেও নয়।

তবে পার্ট না পেলেও শিশিরবাবুর কাছ থেকে যা পেয়েছেন প্রেমাংশুবাবু তার তুলনা নেই। দিনের পর দিন শিশিরবাবুর অভিনয় দেখে দেখে নিজের অভিনয়ের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে পেরেছেন। কোনও ডায়ালগ ছাড়াই সাইলেন্ট অ্যাকটিংও যে কতটা বাঙ্ময় করে তোলা যায় সেটা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর নাট্য পরিচালনা দেখতে দেখতে এক-একটি চরিত্রে কত রকম ব্যঞ্জনা দেওয়া যায় সেটা বুঝতে শিখেছেন। নাটকীয়তা আর অতিনাটকীয়তার মধ্যে তফাত যে কত যোজন সেটাও তো শিশিরবাবুকে দেখেই শেখা।

এই যে অদ্যাবধি তিনি শ্রীমঞ্চের সব কটি নাটকেরই পরিচালক সেটাও তো শিশিরবাবুর শিক্ষকতার গুণেই। শ্রীমঞ্চের সদস্যরা একটি রেজোলিউশন পাস করিয়ে নিয়েছেন যে যতদিন প্রেমাংশুবাবু জীবিত থাকবেন এবং কর্মক্ষম থাকবেন ততদিন তিনি ছাড়া ওই গ্রুপে আর কেউ নাট্য পরিচালনা করতে

পারবেন না। ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বছর ধরে প্রেমাংশুবাবু সেই সম্মান ভোগ করে আসছেন। এই সম্মান আর কোন গ্রুপ থিয়েটারে আর কেউ পেয়েছেন কি না তা আমার জানা নেই।

যে কথা বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলাম সেই সিনেমার প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি।

মাধব ঘোষাল প্রেমাংশুবাবুর খোঁজ করছেন এটা জানার পরদিনই অফিস কামাই করে প্রেমাংশুবাবু টালিগঞ্জের রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে হাজির হলেন। দেখা করলেন মাধুদার সঙ্গে। মাধুদা বললেন : তুমি এসে গেছ, ভালই হল। নাহলে আমাকে আজ আবার তোমার বাড়িতে ছুটতে হত। পরশু থেকে তোমার শুটিং শুরু হবে। ওই ওপাশের ঘরে কানাইবাবু আছে, ওঁর কাছ থেকে জেনে নাও সব কিছু। আর দেখ ভাই প্রেমাংশু, অনেকে নিষেধ করেছিল কিন্তু আমি শুনিনি। পটলার চরিত্রে তোমাকেই সিলেক্ট করেছি। তুমি কিন্তু আমার মুখটা রেখো। চুটিয়ে অভিনয় করে দেখিয়ে দাও তোমার ক্ষমতাটা।

প্রেমাংশুবাবু বললেন : সে চেষ্টা তো আমাকে করতেই হবে। এখন আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদ ভরসা।

দুটো ঘরের পরেই বসেন কানাই ঘোষাল। তিনি বললেন : পরশুদিন সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে স্টুডিওতে চলে এসো। কস্টিউম কী হবে বলো দিকি। আজকের মধ্যেই মাপ দিয়ে তৈরি করতে হবে।

'কেরানীর জীবন' নাটকে পটলা খুব সাদামাটা পোশাক পরেছিল। নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়ির বেকার ছেলে, তার আবার কস্টিউম কী?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : পটলার' কস্টিউম আমার আছে। ওগুলো আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসব। আচ্ছা, কাজটা কতদিন হবে বলুন দেখি। অফিস থেকে তো ছুটি নিতে হবে।

কানাইবাবু বললেন · তা মাস তিনেক ধরে তো চলবে শুটিং।

প্রেমাংশুবাবু বললেন : সে কী। অফিস তো অতদিনের ছুটি দেবে না। তাহলে আমার আর সিনেমা করা হল না।

কানাইবাবু বললেন : আরে না না, তোমাকে অতদিন ছুটি নিতে হবে কেন। তোমার এই ধরো প্রতি মাসে পাঁচ-ছ'দিন করে ছুটি নিলেই চলবে। সে আমি তোমাকে খাতা দেখে বলে দেব পরে।

প্রেমাংশুবাবু এবার মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন : টাকা-পয়সা কিছু পাওয়া যাবে কি?

কানাইবাবু বললেন : সেসব আমি বলতে পারব না। ওটা তুমি মাধববাবুর কাছ থেকে জেনে নাও।

মাধবাবুর কাছে কথাটা পড়তেই মাধুদা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন : তোমাকে আমি পুরো কাজটার জন্যে পাঁচশো টাকা দিতে পারি। ওর মধ্যেই তোমার গাড়িভাড়া-টাড়া সব কিছু।

ওই অ্যামাউন্টেই রাজি হয়ে গেলেন প্রেমাংশুবাবু। কিছু না দিলেও রাজি হতেন। তবে তখন আবার খরচ চালাবার জন্যে টাকার জোগাড় করতে হত। এখন সমস্যা হল অফিসে ছুটি পাওয়ার। সেটা কী ভাবে ম্যানেজ করা যায়?

পরদিন অফিসে এসে ঘণ্টাখানেক কাজ করার পরই পেটের যন্ত্রণায় বেঁকে ধনুক হয়ে যেতে লাগলেন প্রেমাংশুবাবু। সহকর্মীরা হন্তদন্ত হয়ে ভিক্টোরিয়া বিল্ডিংয়ের ওপরতলায় কোম্পানির ডাক্তারের যে চেম্বার আছে সেখানে নিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু বয়স্ক মানুষ। থাকেন বাগবাজারে নন্দলাল বসুর বাড়ির পাশে। প্রেমাংশুবাবু তাঁর মুখচেনা। শ্যামবাজারের মোড়ে প্রায়ই দেখা হয়। বললেন : দেখি কোথায় যন্ত্রণা! কী খেয়েছিলে আজ?

প্রেমাংশুবাবু যন্ত্রণায় ককাতে ককাতে উত্তর দিলেন : অন্য কিছু তো খাইনি। যেমন ভাত-ডাল-মাছ-তরকারি।

ডাক্তারবাবু তখন প্রেমাংশুবাবুকে শুইয়ে ফেলে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পেটের যেখানেই হাত দিলেন সেখানেই যেন প্রচণ্ড ব্যথা। হাত দিতে না দিতেই প্রেমাংশুবাবু চিৎকার করে ওঠেন।

ডাক্তারবাবু বললেন : ব্যাপারটা সুবিধের নয় বলে মনে হচ্ছে। আপাতত একটা প্রেসক্রিপশন দিচ্ছি, ওষুধগুলো কিনে নিয়ে খাবে। তাতেও যদি না সারে তাহলে হয়তো অপারেশন করতে হবে। আপাতত সাতদিন কমপ্লিট রেস্ট।

প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিয়ে যন্ত্রণায় ককাতে ককাতে একটা ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরে এলেন

প্রেমাংশুবাবু। ঘরে পা দিয়েই দমফাটা হাসি। যাক বাবা, কাল থেকে নিশ্চিন্তে শুটিং করা যাবে।

কিন্তু পরের দিন শুটিং করতে বেরিয়ে যাবার পরই যে ডাক্তারবাবু বাড়িতে এসে হানা দেবেন সেটা কে জানত!

পেটের যন্ত্রণার দোহাই দিয়ে অফিস থেকে কায়দা করে সাতদিনের ছুটি ম্যানেজ করে পরের দিনই জীবনের প্রথম শুটিং করতে ছুটলেন প্রেমাংশু বসু। ওঁর যাওয়ার কথা সকাল ন'টায়। কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে সকাল সাতটার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে যখন পৌঁছলেন তখন হাতের ঘড়িতে আটটাও বাজেনি। বলতে গেলে রাধা ফিল্মস স্টুডিওব তখনও যেন ঘুমই ভাঙেনি। আর্টিস্ট আর টেকনিশিয়ানরা কেউই তখনও হাজির হননি। দু-চারজন স্টুডিওর কর্মী আছেন বটে, কিন্তু তাঁরাও কেউ কোনও কাজ করছেন না। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে একটা জায়গায় বসে বসে আড্ডা দিচ্ছেন। ওঁদের কাউকে প্রেমাংশুবাবু চেনেন না। ওঁরাও তাঁকে চেনেন না।

এই পরিস্থিতিতে কী করবেন প্রেমাংশুবাবু বুঝে উঠতে পারলেন না। উদ্দেশ্যহীনভাবে এধার ওধার ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করল, কিন্তু সাহস পেলেন না। স্টুডিওর নিয়মকানুন তো কিছু জানেন না। হয়তো এখানে ধূমপান নিষেধ। সিগারেট ধরাতে দেখলে হয়তো কেউ হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে। বলা যায় না স্টুডিও থেকে বারও করে দিতে পারে। কিংবা কর্তৃপক্ষের কাছে এমন কমপ্লেন করতে পারে যাতে সদ্য-পাওয়া সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যাবে। 'কেরানীর জীবন' ছবিতে পটলা করার আশা চিরদিনের মতো বিলীন হয়ে যাবে।

সাড়ে আটটা নাগাদ নরেশ দত্ত মশাই স্টুডিওতে এসে হাজির হলেন। উনি অর্গানাইজারদের একজন। দুদিন আগে যখন স্টুডিওতে এসেছিলেন তখন কানাইবাবু ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক খুব ভালো ব্যবহার করেছিলেন তাঁর সঙ্গে।

নরেশবাবুকে আসতে দেখে বুকে বল পেলেন প্রেমাংশুবাবু। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ওঁকে নমস্কার জানালেন। নরেশবাবু ওঁকে দেখে অবাক হলেন। বললেন : কী ব্যাপার' এত তাড়াতাড়ি যে?

নরেশবাবুর কথা শুনে প্রেমাংশুবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন তাডাতাড়ি আসাটাও বোধহয় স্টুডিওর আইনে নিয়মভাঙার পর্যায়ে পড়ে। তাই বলে উঠলেন : সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে কালীঘাটে গিয়েছিলাম তো! ভেবেছিলাম পুজো দিতে দেরি হবে। তা ওটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। তাই আর কোথাও না গিয়ে স্টুডিওতেই চলে এলাম।

এই নির্জলা মিথ্যা কথাটা বলতে প্রেমাংশুবাবুর বুকটা কাঁপছিল। কিন্তু এছাড়া আর কোনও বিশ্বাসযোগ্য অজুহাত খাড়া করা যাচ্ছিল না যে! মনে মনে মা কালীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন এ-হেন নির্জলা মিথ্যাচারণের জন্যে।

প্রেমাংশুবাবুর কথায় নরেশবাবু খুশি হলেন। বললেন . বাঃ বাঃ' তোমার তো দেখছি দেবদ্বিজে বেশ ভক্তি আছে। আজকালকার ইয়াংম্যানদের মধ্যে আবার এই জিনিসটা তেমন দেখা যায় না। খুব ভাল করেছ। প্রথম দিনের কাজ তো! মায়ের পায়ে ফুল ছুঁইয়ে শুরু করাটাই ভালো। তা পুজো দিলে তো কপালে সিঁদুরের ফোঁটা নেই কেন?

এই রে! প্রেমাংশুবাবু ভাবলেন, এবারে বুঝি ধরা পড়ে গেলেন। সত্যিই তো, পুজো দিলে তো সিঁদুরের ফোঁটা থাকা উচিত। সেটা কেন নেই তার কী সদুত্তর দেওয়া যায়?

অগত্যা আরও একটি মিথ্যাচারণের আশ্রয় নিতে হলো তাঁকে। বললেন : সিঁদুরের ফোঁটা ছিল তো আমার কপালে। কিন্তু স্টুডিওতে নতুন আসছি তো! এখানকার মানুষজন কে কেমন তা তো জানি না। পাছে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেখে কেউ কিছু বলাবলি করে, তাই মায়ের মন্দির থেকে বেরিয়েই সেটা মুছে নিয়েছি।

নরেশবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন প্রেমাংশুবাবুর কথা শুনে। বললেন : এই তো তোমাদের দোষ! পাছে কেউ কিছু বলে তাই সিঁদুরের ফোঁটা মুছে ফেললে? আরে, লোকের বলাবলিতে কী যায়-আসে! তুমি ভক্তিভরে মায়ের পুজো দিয়েছ কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরেছ, তাতেও কোনও অর্বাচীন যদি কিছু বলে তাতে তোমার কী। শোনো হে বাপু, তোমাকে একটা সার কথা বলি। জীবনে যদি বড় হতে চাও

তাহলে লোকের বলাবলির ধার ধারবে না। নিজের মন থেকে যেটা ভালো বুঝবে সেটা করে যাবে। নইলে লোকের ভয়ে জুজু হয়ে থাকলে জীবনে কোন বড় কাজ করতে পারবে না।

তা নরেশবাবুর এই কথাটা প্রেমাংশুবাবু অদ্যাপি মনে রেখেছেন। লোকের বলাবলির তোয়াক্কা উনি কোনওদিনই করেননি। এই যে তিনি সারাটা জীবন বিয়ে-থা করলেন না, চিরকুমার থেকে গেলেন, এই নিয়ে লোকে কত কথা বলেছে, তাঁর চরিত্র নিয়ে কত রকম সন্দেহ প্রকাশ করেছে, কিন্তু সেসব তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন প্রচণ্ড মানসিকতার জোরে। একটা দিনের জন্যেও মন খারাপ করে বসে থাকেননি। হয়তো মনের মধ্যে প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে তা সহ্য করেছেন। কোনওদিন তা নিয়ে কারও সঙ্গে কোন বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে যাননি। এই দৃঢ়তাটা তিনি পেয়েছিলেন সেই ১৯৫২ সালে বাধা ফিল্মস্ স্টুডিওতে নরেশ দত্তর ওই উপদেশ শোনার পর থেকেই।

আবার সেদিনের শুটিং পর্বের কথাতেই ফিরে আসি। প্রেমাংশুবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই নরেশবাবু একবার তাঁর হাতের ঘড়িটা দেখে নিলেন। বললেন : পৌনে ন'টা বাজে। এখনই সব এসে পড়বে। মেক-আপ রুমটা বোধহয় খুলে দিয়েছে। তুমি বরং ওখানে গিয়েই বোসো। আমার হাতে এখন অনেক কাজ। আমি সেগুলো সারি গে যাই।

এই বলে নরেশবাবু আঙুল তুলে মেক-আপ রুমের দরজাটা দেখিয়ে চলে গেলেন। প্রেমাংশুবাবু সেই ঘরটায় গিয়ে বসলেন। একা। থিয়েটারের মেক-আপ রুমের সঙ্গে স্টুডিওর মেক-আপ রুমের অনেক তফাত। থিয়েটারে যেমন একটা ঘেঁষাঘেঁষির ব্যাপার থাকে, এখানে তেমন নয়। অনেক খোলামেলা। মেক্-আপের তফাতও অনেক। থিয়েটারে হেভি মেক-আপ করতে হয়। এখানে হালকা-হালকা। হেভি মেক-আপ করলে ক্যামেরার চোখে যে বীভৎস দেখাবে, সে অভিজ্ঞতা সেদিনই প্রথম হল প্রেমাংশুবাবুর।

ফ্লোরে এসে যখন দাঁড়ালেন তখন সেখানেও দেখলেন থিয়েটারের সঙ্গে আশমান-জমিন তফাত। 'কেরানীর জীবন' বইটার এখান থেকে ওখান থেকে বিক্ষিপ্তভাবে দৃশ্যগুলি নেওয়া হচ্ছে। আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে। কিন্তু পর্দায় তো দেখেন গোড়া থেকে শেষ পর্যন্তই থাকে ছবিতে। কী করে যে সেসব করেন এঁরা তা ঈশ্বরই জানেন।

অভিনয় করতে গিয়েও প্রেমাংশুবাবু দেখলেন, অনেক বিধি-নিষেধ। মাটির ওপর চকের দাগ দেওয়া। তার মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে হচ্ছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই আলোর বৃত্তের বাইরে চলে যেতে হবে। আর থিয়েটারে যেমন গলা ফাটিয়ে অ্যাকটিং, এখানে তা নয়। সব কিছুই নর্মাল করতে হচ্ছে। সিনেমার অ্যাকটিং যে এত শক্ত তা আগে জানা ছিল না প্রেমাংশুবাবুর। ভেবেছিলেন পটলার রোল তা অনেকবার করা, ধরবেন আর ফাটিয়ে ছাড়বেন। এতো তা নয়। শুটিং-এর সময় সব দেখেশুনে বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরে গেল প্রেমাংশুবাবুর। এত ধরাবাঁধার মধ্যে অভিনয় করে পারবেন তো ডিরেক্টারকে খুশি করতে?

প্রথম দিন শুটিং ছিল জহর গাঙ্গুলির সঙ্গে। বেশ ভয় ভয় করছিল। প্রথম শটটা দেবার পর পরিচালক দিলীপবাবু যখন পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন : বাঃ, বেশ ভালো হয়েছে। প্রথম দিন বলে হালকা কাজ দিয়েছি। এরপরে নাটকীয় ঘটনা আসবে। তখন কিন্তু আরও ভালো করতে হবে। মনে হচ্ছে তুমি তা পারবে।

কথাগুলো শুনে ভয়টা কেটে গিয়েছিল অনেকখানি। সারা মনে একটা খুশি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন প্রেমাংশুবাবু।

বাড়িতে এসে যা শুনলেন তাতে মাথা ঘুরে গেল প্রেমাংশুবাবুর। বিকেল চারটে নাগাদ নাকি অফিস থেকে ডাক্তারবাবু এসেছিলেন তাঁর খোঁজ নিতে। না পেয়ে খুব রাগারাগি করে গেছেন। শুটিং করতে যাওয়ার কথা অবশ্য বাড়ির কেউ ডাক্তারবাবুকে বলেননি। বলবেন কী করে? তাঁরাও তো জানেন না শুটিং করার কথা। প্রেমাংশুবাবু বাড়ির কাউকে খবরটা জানাননি। সারপ্রাইজ দেবেন বলে চেপে রেখেছেন।

কিন্তু ডাক্তারবাবু আসার ব্যাপারটা সব গোলমাল করে দিল। অফিসে জানাজানি হলে তো মুশকিল।

চাকরি চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন ডাক্তারবাবুর বাগবাজারের বাড়িতে।

প্রেমাংশুবাবুকে দেখে ডাক্তারবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন। বললেন : অত বড় একটা অসুখ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলে কোথায়? আমি কোথায় কাল থেকে হ্যানটান করছি। ওষুধ খেয়ে কেমন আছ তা জানবার জন্যে ছটফট করছি। পেটের যেখানেই হাত দি. সেখানেই ব্যথা। এমন সাংঘাতিক কেস জীবনে খুব কমই দেখেছি। অপারেশন করতে হবে কি না, করলে আজ-কালের মধ্যেই করা দরকার কি না, এসব ভেবে আমার রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, আর উনি গিয়েছেন কি না হাওয়া খেতে। তা হাওয়া খেতে যদি যেতে পার তাহলে অফিসই বা করতে পারবে না কেন? ছুটি ক্যানসেল করে দিচ্ছি। কাল থেকেই আবার কাজে জয়েন করবো।

এই মরেছে! ছুটি ক্যানসেল করে দিলে তো সমূহ সর্বনাশ। শুটিং-এর দফা গয়া। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন : না না, ডাক্তারবাবু, হাওয়া খেতে যাইনি। কাল সারা রাত যন্ত্রণায় ছটফট করেছি। দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি। আপনার ওষুধ খেয়ে সকাল থেকে ব্যথাটা একটু কমেছে। তা সারাদিন শুয়ে শুয়ে কি ভালো লাগে? তাই বিকেলের দিকে একটু টালা পার্কে গিয়ে বসেছিলাম। আমিও বেরিয়েছি আর আপনিও আমাদের বাড়িতে গেছেন। পার্ক থেকে ফিরেই খবরটা পেয়ে ছুটতে ছুটতে আপনার কাছে আসছি। এই দেখুন না, এতটা ছোটা-হাঁটা করে এখন আবার পেটের যন্ত্রণাটা কেমন বেড়ে গেল বলে মনে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু বললেন . তাই নাকি? তাহলে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও। গিয়ে ওষুধটা খেয়ে শুয়ে পড়। ওঠা-হাঁটা চলা-ফেরা একদম করবে না। আমার এখানেও আসবার দরকার নেই। তুমি সেরে না ওঠা পর্যন্ত আমি প্রত্যেকদিন বিকেলে অফিস-ফেরত তোমার বাড়িতে গিয়ে দেখে আসব।

প্রেমাংশুবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন : না না ডাক্তারবাবু, আপনি খামোকা অত কষ্ট করতে যাবেন কেন? আপনার ওষুধে একদিনেই যা কাজ হয়েছে তাতে সাতদিনও খাবার দরকার হবে বলে মনে হয় না। এ তো আর যার-তার দেওয়া ওষুধ নয়, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরির প্রেসক্রিপশন করা ওষুধ। দিন সাতেকের মধ্যেই চাঙ্গা হয়ে উঠব। আপনার যাবার দরকার নেই। সেরে উঠলে আমিই আপনার কাছে এসে ফিট সার্টিফিকেট নিয়ে যাব।

প্রেমাংশুবাবুর কথা শুনে ডাক্তারবাবু বেশ খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন : আমি যদি রোজ একবার তোমাদের বাড়িতে যাই তাতে তোমার অসুবিধা আছে নাকি?

প্রেমাংশুবাবু এক গাল হেসে বললেন : না না, অসুবিধের কী আছে! আপনি আমাদের বাড়িতে যাবেন সে তো আমাদের সৌভাগ্য। তবে সারাদিন অফিসের খাটাখাটুনির পর আবার আমাদের বাড়ি ছোটা! আমার নিজেরই কেমন খারাপ লাগে। তাই বলছিলাম আর কি!

ডাক্তারবাবু আরও খানিকটা এগিয়ে এলেন প্রেমাংশুবাবুর দিকে। চোখ দুটি আরও একটু তীক্ষ্ণ করে দেখলেন তাঁকে। তারপর বললেন : আমার জন্য তোমার খুব দরদ দেখছি। খুব ভালো। মানুষের জন্যে মানুষের দরদ থাকা তো উচিত। সেখানেই তো তার মনুষ্যত্বের পরিচয়। কিন্তু বেশি মিথ্যে কথা বললে পেটের যন্ত্রণা যে আরও বাড়ে সেটা কি তুমি জানো না?

প্রেমাংশুবাবু অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তারবাবুর কথা শুনে। বললেন : আপনি কী বলছেন তা তো বুঝতে পারছি না!

ডাক্তারবাবু বললেন : আমি যে ধন্বন্তরী ডাক্তার সেটা তুমি বিশ্বাস করো তো?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : তা তো করিই। একটু আগেই তো সে কথা আপনাকে বললাম।

প্রেমাংশুবাবু বললেন : কিন্তু আমার চোখ দুটোও যে ধন্বন্তরীর চোখ সেটা তুমি জানো কি?

প্রেমাংশুবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন ডাক্তারবাবুর কথা শুনে। কেমন একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে উঠল তাঁর মনে। বললেন : আপনি কী বলতে চাইছেন খোলসা করে বলুন দেখি।

ডাক্তারবাবু বললেন : আজকাল কি দিনের বেলাও থিয়েটার হয় নাকি?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : তার মানে?

ডাক্তারবাবু বললেন : তুমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে যে থিয়েটার করে বেড়াচ্ছ, সেটা কি অস্বীকার করতে পার?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : বিশ্বাস করুন আমি থিয়েটার করতে যাইনি। আর থিয়েটার করলে তো অফিসের পরই করা যায়।

ডাক্তারবাবু বললেন : তাহলে তোমার কানের পাশে এখনও যে মেক্-আপের রঙ লেগে আছে সেটা সম্পর্কে কী বলবে?

প্রেমাংশুবাবু ঝটিতি নিজের কানের পেছনে হাত দিয়ে দেখতে গেলেন সত্যিই সেখানে রঙ লেগে আছে কি না? থাকতেও পারে। স্টুডিওতে তাড়াহুড়ো করে মেক্-আপ তুলেছেন। বাড়ি ফিরেও ভালো করে মুখ-হাত ধোবার সময় পাননি।

ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন প্রেমাংশুবাবুর কাণ্ড দেখে। বললেন : ভয় নেই। আমার কাছে সব খুলে বলো। কলেজে পড়বার সময় আমারও একটু-আধটু থিয়েটারের নেশা ছিল। অভিনেতা হবার খুব শখ ছিল। ডাক্তারি পড়তে গিয়ে সে ইচ্ছেটা পূর্ণ হয়নি। কী জন্যে পেটের ব্যথার দোহাই দিয়ে ছুটি নিলে সেটা আমায় খুলে বলো। আমি তো তোমায় সাহায্যও করতে পারি।

প্রেমাংশুবাবু তখন তাঁর সিনেমায় চান্স পাওয়ার ব্যাপারটা সব খুলে বললেন। আজ যে শুটিং করে এসেছেন সেটাও বললেন।

ডাক্তারবাবু শুনে বললেন : তাই নাকি? একেবারে সিনেমা! ঠিক আছে। এবারে তো সাতদিন ছুটি নিয়েইছো। এরপরে যখন ছুটির দরকার হবে আমাকে দু-চারদিন আগে জানিও। আমি ছুটির ব্যবস্থা করে দেব। তোমার ছবি রিলিজ করলে আমাকে কিন্তু পাশ দিতে হবে। দেবে তো?

প্রেমাংশু বললেন : কী যে বলছেন স্যার। পাশ তো পাশ, দরকার হলে আমার শরীরের রক্তও আপনাকে দিয়ে দিতে পারি। আপনি আমার যা উপকার করলেন তার জন্যে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

এরপর প্রেমাংশুবাবু নিরুপদ্রবে 'কেরানীর জীবন' ছবির শুটিং করতে লাগলেন। প্রথম প্রথম একটু আড়ষ্ট ছিলেন বটে, তবে পরে তা কাটিয়ে উঠেছিলেন। স্টেজ-অ্যাকটিং আর ফিল্ম-অ্যাকটিংয়ের তফাতটা ততদিনে বুঝে নিয়েছেন তিনি।

আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পরিধি খুব ছোট। এখানে কোন জিনিস গোপন থাকে না। একটি নতুন ছেলে রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে দারুণ ভালো অভিনয় করছে এ কথাটা ইন্ডাস্ট্রিতে চাউর হয়ে যেতে বেশি সময় লাগল না। সে খবরটা পেয়ে নিউ থিয়েটার্সের বীরেন দাশ মশাই একদিন প্রেমাংশুবাবুর শুটিং দেখতে এলেন।

নিউ থিয়েটার্সের আর্টিস্ট রিক্রুটমেন্টের দায়িত্ব ছিল বীরেনবাবুর ওপর। শুটিং দেখার পর তিনি প্রেমাংশুবাবুকে যত শিগগির সম্ভব একদিন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করবার কথা বলে গেলেন।

দিন তিনেক পরে একদিন দুপুরে প্রেমাংশুবাবু এন টি স্টুডিওতে গিয়ে বীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। চলচ্চিত্র জগতের বহু রথী মহারথীর স্মৃতি বিজড়িত এই নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে পা দিয়ে রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করলেন প্রেমাংশুবাবু। বিশেষ করে বিখ্যাত গোল ঘরটিতে পা দিয়ে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ এসে বসতেন, যখন তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নিউ থিয়েটার্সের 'নটীর পূজা' ছবির শুটিং করতে আসতেন। এসব কথা প্রেমাংশুবাবুর জানা ছিল।

বীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি বললেন : শোনো ভাই, আমরা প্রবোধ সান্যালের লেখা উপন্যাস 'বনহংসী' ছবি করছি। তাতে তোমার উপযোগী একটা রোল আছে। রাধা ফিল্মসে 'কেরানীর জীবন' ছবিতে তোমার শুটিং আমি দেখেছি। তোমার কাজ আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আমার পছন্দই তো আর শেষ কথা নয়। যিনি এ ছবি ডাইরেক্ট করবেন তাঁর পছন্দ হওয়া চাই। তিনি একটু পরেই এসে পড়বেন। তুমি একটু বোসো। তিনি এলে তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দেব। তারপরে তোমার লাক্।

প্রেমাংশুবাবু একটু মুষড়ে পড়লেন। আবার পরীক্ষা দিতে হবে? 'বনহংসী' কে ডাইরেক্ট করবেন

কে জানে! নামটা জানতে পারলে ভালো হল।

শেষ পর্যন্ত আর কৌতূহলটা চেপে রাখতে পারলেন না। বীরেনবাবুকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : 'বনহংসী' কে ডাইরেক্ট করবেন স্যার?

বীরেনবাবু উত্তর দিলেন : কার্তিকবাবু। কার্তিক চট্টোপাধ্যায়।

নামটা শুনেই বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল প্রেমাংশুবাবুর। ওরে বাবা। তিনি তো মস্ত লোক। 'রামের সুমতি' করেছেন, 'মহাপ্রস্থানের পথে' করেছেন। মহাপ্রস্থানের পথে তো অসাধারণ ছবি। চিত্রা সিনেমায় বার চারেক দেখেছেন ছবিটা। ইনি সেই কার্তিক চট্টোপাধ্যায় তো? না কি ওই নামে অন্য কেউ আছেন।

জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হচ্ছিল, তবু শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন : আজ্ঞে ইনি কি সেই কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, যিনি 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিটা পরিচালনা করেছিলেন?

বীরেনবাবু বললেন : তুমি ঠিকই ধরেছ। ইনিই সেই কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। তুমি একটু বোসো। উনি এক্ষুনি এসে পড়বেন।

আর বসা! কার্তিকবাবু জবরদস্ত ডাইরেক্টর। 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবি করে তিনি এখন সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত। তিনি কি আমার মতো একজন নতুন আর্টিস্টকে পছন্দ করবেন?

তারপরে হঠাৎ মনে পড়ল 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে উনি তো নতুন আর্টিস্টই নিয়েছিলেন। বসন্ত চৌধুরি আর অরুন্ধতী মুখার্জি। একটা ছবিতে কাজ করেই তাঁরা ফেমাস হয়ে গেছেন। কথাটা ভাবতেই মনের মধ্যে একটু আশার আলো দেখতে পেলেন প্রেমাংশুবাবু।

মিনিট দশেকের মধ্যেই এক ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই বীরেনবাবু বলে উঠলেন : এই যে কার্তিকবাবু, যে ছেলেটির কথা আপনাকে বলেছিলাম এই সেই প্রেমাংশু বোস। এবারে দেখুন আপনার পছন্দ হয় কি না।

কার্তিকবাবুকে দেখে মনের মধ্যে একটা হোঁচট খেলেন প্রেমাংশুবাবু। 'মহাপ্রস্থানের পথে'-র সেই ভারত বিখ্যাত ডিরেক্টারের এই রকম আন্ইমপ্রেসিভ চেহারা। একেবারে যেন মধ্যবিত্ত বাড়ির কোনও ঘরোয়া মানুষ। বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই যে ইনি একজন ফিল্ম ডিরেক্টার। অন্যান্য ডিরেক্টাররা কী রকম ফাঁটে থাকেন। হাতে ফাইল, ঠোঁটে বিদেশি সিগারেট। চলনে-বলনে কেমন একটা ডোন্টকেয়ার ভাব। আর ইনি একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর।

কিন্তু কার্তিকবাবুর সঙ্গে কথা বলে প্রেমাংশুবাবু বুঝলেন, ভদ্রলোকের মধ্যে মাল আছে। কিন্তু কথায় বার্তায় অত্যন্ত অমায়িক। একেবারে নিপাট ভদ্রলোক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কার্তিকবাবুর অনুরাগী হয়ে পড়লেন তিনি।

প্রেমাংশুবাবুর সঙ্গে কথা বলে কার্তিকবাবুরও খুব ভালো লাগল। বীরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন : প্রেমাংশুকে আমার পছন্দ হয়েছে। ওর সঙ্গে আপনি কন্ট্রাক্টের কাজটা সেরে নিতে পারেন।

প্রেমাংশুবাবুর সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সের তিনটি ছবির চুক্তি হল। একটি তো কার্তিকবাবুর 'বনহংসী'। দ্বিতীয়টি চিত্ত বসুর 'নদ ও নদী'। তৃতীয় ছবিটির নাম তখনও ঠিক হয়নি। সেটা পরিচালনা করবেন হেমচন্দ্র চন্দ্র। তিনজনেই নামকরা পরিচালক। এই অভাবিত সৌভাগ্যে প্রেমাংশুবাবু অভিভূত হয়ে পড়লেন। সকলের অলক্ষে দুহাত তুলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানালেন।

সই-টই হয়ে যাবার পর বীরেনবাবু প্রেমাংশুবাবুকে আর এক কার্তিকের হাতে সমর্পণ করলেন। এই কার্তিক নিউ থিয়েটার্সের ড্রেসার। ওড়িশার লোক। সে প্রেমাংশুবাবুকে নিয়ে গেল যে ঘরে পুরনো পোশাকপত্তর রাখা আছে সেই ঘরে। আর দশদিন পরেই 'বনহংসী'-র শুটিং। পুরনো শার্ট প্যান্ট যা আছে তা যদি প্রেমাংশুবাবুর মাপে হয় তো ভালো, নতুবা ড্রেস করাতে হবে।

দু-তিনটে শার্ট প্রেমাংশুবাবুর শরীরে ফিট করে গেল। কিন্তু প্যান্ট আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজে একটি প্যান্ট পাওয়া গেল তাঁর মাপের। কার্তিক ড্রেসার বললে : ওটা কার প্যান্ট জানেন? বড়ুয়া সাহেবের।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল প্রেমাংশুবাবুর।

নিউ থিয়েটার্সের পোশাক-ঘরে সবে প্যান্টটিতে পা গলিয়েছেন, এমন সময় ওই প্যান্টটি যে প্রমথেশ বড়ুয়ার, সেটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল প্রেমাংশু বসুর।

এই তো মাস ছয়েক হল বড়ুয়াসাহেব লোকান্তরিত হয়েছেন। এখনও তাঁর স্মৃতি টকটকে তাজা। মাত্র দিন সাতেক আগে সংবাদপত্রে দেখছিলেন কোথায় যেন তাঁর স্মরণ সভা আজও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাঁর ছবিগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন চিত্রগৃহে। কে জানে, হয়তো এই প্যান্ট পরেই তিনি তাঁর বিখ্যাত ছবি 'শেষ উত্তর'-এ অভিনয় করেছিলেন। 'দেবদাস'-এও এটা পরেছিলেন কি? না না, ওই ছবিতে তিনি তো ধুতি পরেছিলেন। তাহলে 'মুক্তি' কিংবা 'উত্তরায়ণ' অথবা 'শাপমুক্তি' ছবিতে হয়তো এই প্যান্টটিই পরেছিলেন!

প্যান্টটা খুলে নিজের বুকে চেপে ধরলেন প্রেমাংশুবাবু। একবার ঘ্রাণ নিলেন। অনেকবার কাচানো হয়েছে নিশ্চয়। তবু কি বড়ুয়া সাহেবের শরীরের গন্ধ একটুও পাওয়া যাবে না এই প্যান্ট থেকে?

এইসব ভাবনার মধ্যেই বার বার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল প্রেমাংশুবাবুর। জীবনে তাঁকে বার কয়েক সশরীরে দেখেছেন বেশ কিছুটা দূরত্ব থেকে। একবার, মাত্র একবারই কয়েক মিনিটের জন্যে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হয়েছিল প্রেমাংশুবাবুর। সেদিনও ঠিক এমনি করেই সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল তাঁর। রাত্রে ভালো করে ঘুমোতে পারেননি। সেই অসাধারণ মুখচ্ছবি, সেই অপরূপ কথা বলার ভঙ্গি বার বার ভেসে উঠছিল মনের পর্দায়।

এটা সেই ১৯৪০ সালের কথা। আগেই বলেছি প্রেমাংশুবাবুরা তখন থাকতেন টালা পার্কের পাশে ছ'নম্বর খেলাতবাবু লেনে। ঠিক তার পাশেই সাত নম্বর বাড়িতে থাকতেন নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী। ওই বাড়িটার সামনে একটা ছোটখাটো খেলার মাঠ ছিল। প্রতিদিন বিকেলে প্রেমাংশুবাবুরা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সেই মাঠে বল খেলতেন। আর প্রায় প্রতিদিনই দেখতেন খেলা শেষ হবার মুখে মুখে সাত নম্বর বাড়িটার সামনে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াত। সেই গাড়ি থেকে নামতেন রাজকুমার প্রমথেশ বড়ুয়া। গাড়ি থেকে নেমে, কোনদিকে না তাকিয়ে, গট গট করে ঢুকে পড়তেন সাত নম্বর বাড়ির অন্দরমহলে।

প্রমথেশ বড়ুয়া তখন বাংলার মানুষের কাছে রোমান্টিকতার প্রতিমূর্তি। তাঁর সঙ্গে কাননবালার নাম জড়িয়ে মানুষের মুখে কত কথা, কত জল্পনা-কল্পনা। সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ প্রেমাংশুবাবুরা খেলা থামিয়ে সেই রোমান্টিক পুরুষটির দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতেন।

সেবার সরস্বতী পুজোর আগে বন্ধুবান্ধবরা সবাই মিলে ঠিক করলেন বড়ুয়ার কাছে চাঁদা চাইতে হবে। হ্যাঁ, ওঁরা সকলেই প্রমথেশ বড়ুয়াকে কেবল 'বড়ুয়া' বলেই জানতেন। বাড়িতে কিংবা রাস্তাঘাটে সবাই ওঁর উদ্দেশ্যে 'বড়ুয়া' শব্দটিই ব্যবহার করেন। প্রেমাংশুবাবুরাও ওঁকে জানতেন 'বড়ুয়া' বলে। শুধু তাই নয়, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেও ওঁর পুরো নামটি কদাচিৎ ব্যবহৃত হতো। বড়ুয়া-কানন কিংবা বড়ুয়া-যমুনা এইভাবেই তিনি উল্লেখিত হতেন। জওহরলাল নেহরু যেমন শুধুই 'নেহরু', অথবা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কেবল শুধুই 'গান্ধীজি'। ওঁর আসল নাম যে প্রমথেশচন্দ্র অর্থাৎ শিব সেটা যেন কোথায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। তবে জনসাধারণের ডাকা 'বড়ুয়া' শব্দটির মধ্যে কোথাও কোন অশ্রদ্ধার ভাব ছিল না। বরং একটা ভালোবাসারই প্রকাশ ছিল।

বড়ুয়ার কাছে সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে হবে এটা মনস্থ করে বন্ধুরা বললে : প্রেমা, আমাদের মধ্যে তুই তো বেশ বলিয়ে-কইয়ে আছিস, পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটার-টিয়েটার করিস, বড়ুয়ার কাছে চাঁদাটা তুইই চাইবি কিন্তু।

প্রেমাংশুবাবু বললেন : ঠিক আছে। আগে তো আসতে দে ওঁকে!

তা সেদিন শেষ বিকেলে যথারীতি প্রমথেশচন্দ্র এলেন। গাড়ি থেকে নামলেন। দুরু দুরু বুকে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন প্রেমাংশুবাবু। পেছনে বন্ধুর দল।

ওদের একযোগে এগিয়ে আসতে দেখে প্রমথেশচন্দ্র বিস্মিত চোখে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন: কি ব্যাপার?

প্রেমাংশুবাবু একটা ঢোক গিলে বললেন : আমাদের সরস্বতী পুজোর চাঁদা দেবেন স্যার?

প্রমথেশচন্দ্র প্রেমাংশুবাবুর হাতের খোলা বিল বইটার দিকে তাকালেন। বললেন : তোমাদের কোন

পাড়া?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : আমরা এই পাড়াতেই থাকি। এই পাড়ারই পুজো।

প্রমথেশচন্দ্র বললেন : তাহলে তোমাদের চাঁদাটা সরযুর কাছ থেকেই নিয়ে নিও। আমি তো তোমাদের চিনি না। সরযুকে বলা থাকবে। তোমরা তার কাছ থেকেই আমার চাঁদা পেয়ে যাবে।

বলেই তিনি অন্যান্য দিনের মতো গট গট করে ঢুকে গেলেন সরযূবালার বাড়িতে।

প্রমথেশ বড়ুয়ার সেদিনের সেই চলন বলন আজ এই আটষট্টি বছর বয়সেও বুকের মাঝখানে নিখুঁতভাবে এঁকে রেখেছেন প্রেমাংশু বসু।

প্রেমাংশুবাবু যখন নিউ থিয়েটার্সে কাজ করতে এলেন তখন নিউ থিয়েটার্সের অবস্থা খুবই নড়বড়ে। তার সেই পূর্বগরিমা নেই। ওদের প্রোডাকশনগুলি তখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যানারে তোলা হচ্ছে। কখনও নিউ থিয়েটার্সের নামে, কখনও নিউ থিয়েটার্স ইস্টার্ন ডিস্ট্রিবিউটার্সের নামে। এই যে 'বনহংসী' এটা তোলা হয়েছিল কে. সি. প্রোডাকসন্সের নামে। এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সন্ধ্যারানী, নীতীশ মুখার্জি, শোভা সেন, বিকাশ রায়, সলিল দত্ত, ছবি রায়, মায়া মুখার্জি প্রমুখ তখনকার নামকরা সব শিল্পী। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। এই যে শিল্পীদের নাম বললাম, এঁদের মধ্যে ছবি রায়ের একটা আলাদা পরিচিতি আছে। উত্তমকুমার প্রথম যে ছবির নায়ক করেন, সেই 'কামনা' ছবিতে ইনি ছিলেন তাঁর নায়িকা। ভদ্রমহিলার ব্যবহার ছিল অপূর্ব। গ্রে স্ট্রিট আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর মোড়ে মিত্র কাফে নামে বিখ্যাত একটি রেস্টুরেন্ট আছে, যেখানকার খাবার-দাবারের স্বাদ এখনও নাকি রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রতাপকুমার রায়, সমর বসুদের মতো ইন্টেলেকচুয়ালদের মুখে লেগে আছে। সেই রেস্টুরেন্টের ওপরতলার একটি ঘরে ছবিদি থাকতেন। ওঁর সঙ্গে যখনই দেখা করতে যেতাম তখনই মিত্র কাফে থেকে গরম গরম কাটলেট এনে খাওয়াতেন। ছবিদি অভিনয়ের জগতে তুঙ্গে উঠতে পারেননি। কিন্তু ওঁর অপূর্ব ব্যবহারের জন্যে আমার কাছে অবিস্মরণীয়া হয়ে আছেন।

আর ওই যে মায়া মুখার্জির কথা বললাম, তিনিও খুব পাওয়ারফুল অ্যাকট্রেস ছিলেন। মায়াদি প্রথম অভিনয় করেন নিউ থিয়েটার্সের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে। দারুণ প্রশংসা পেয়েছিলেন সে ছবিতে অভিনয় করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, নিউ থিয়েটার্সের কয়েকটি মাত্র ছবিতে অভিনয় করার পর তাঁকে আর দেখা গেল না। নিউ থিয়েটার্সের বাইরে দু-একটি ছবিতে বোধহয় অভিনয় করেছেন তিনি। সম্ভবত 'লেডিজ সিট' ছবিতে ছিলেন। তারপর আর তাঁকে দেখতে পাইনি। ভদ্রমহিলা সামনাসামনি দেখতে তত সুন্দর নন, কিন্তু তাঁর ছিল দুর্দান্ত ফটোজিনিক ফেস। ছবির পর্দায় তাঁকে অপূর্ব দেখাত। দারুণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি ফিল্ম লাইন পরিত্যাগ করলেন তা আজও বুঝে উঠতে পারি না।

যাক, যে কথা বলছিলাম, সেই প্রেমাংশুবাবুর কথাতেই ফিরে আসি। ওঁর সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সের তিনটি ছবিতে অভিনয়ের চুক্তি হয়েছিল। প্রথমটি 'বনহংসী', যার কথা এতক্ষণ বললাম। দ্বিতীয়টি ছিল 'নদ ও নদী'। চিত্ত বসুর পরিচালনা। প্রবোধ সান্যালের কাহিনী। এ ছবিটি নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারেই হয়েছিল। প্রেমাংশুবাবুর সঙ্গে এ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অরুন্ধতী মুখার্জি। 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে অরুন্ধতী দেবী দারুণ প্রশংসা পেয়েছিলেন দর্শক আর সমালোচকের। তারপর এটিই সম্ভবত তাঁর দ্বিতীয় ছবি। এছাড়া ছিলেন সন্ধ্যারানী, ভারতী দেবী, বিকাশ রায়, অমর মল্লিক, নীতীশ মুখার্জি, জীবেন বসু, রাজলক্ষ্মী (বড়), রেবা বসু, সুদীপ্তা রায় প্রমুখ শিল্পী।

নিউ থিয়েটার্সের হয়ে প্রেমাংশুবাবুর তৃতীয় ছবিটিতে অভিনয় করার কথা ছিল হেমচন্দ্র চন্দ্রের পরিচালনায়। ওই ছবিটির ওপর প্রেমাংশুবাবুর অনেক আশা ছিল। ইতিমধ্যে 'কেরানীর জীবন' মুক্তি পেয়ে গেছে। পটলার চরিত্রে অভিনয় করে তিনি চতুর্দিকে হই-চই ফেলে দিয়েছেন। সাংবাদিকরাও তাঁর সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু 'বনহংসী' কিংবা 'নদ ও নদী'-তে প্রেমাংশুবাবু তেমন প্রশংসা পেলেন না। দর্শকের গালাগালি খেতে হয়নি, কিন্তু তাঁরা প্রেমাংশুবাবুকে নিয়ে হই-চইও করেননি। দুটি ছবিই তেমন ভালো চলেনি। মনে হয় ওই ছবি দুটিতে নিউ থিয়েটার্সের বেশ খানিকটা আর্থিক লোকসান হয়েছিল।

ফলে তৃতীয় ছবি নির্মাণের প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। এতে প্রেমাংশুবাবু মনে বেশ খানিকটা আঘাত পেলেন। এর আগে তিনি হেমচন্দ্র চন্দ্রের 'প্রতিশ্রুতি ছবি দেখে মুগ্ধতার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী দেবী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলির অভিনয় তাঁকে পাগল করে দিয়েছিল। ছবিটা বার ছয়েক দেখেছেন। অসিতবরণ ওই ছবিতে প্রথম অভিনয় করতে আসেন। ভারতী দেবী ছিলেন তাঁর নায়িকা। ১৯৪২ সালে ওই 'প্রতিশ্রুতি' ছবিটি বছরের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের স্বীকৃতি পেয়েছিল বি এফ জে এ-র কাছ থেকে।

বেশ কয়েক বছর পরে অবশ্য প্রেমাংশুবাবু হেমচন্দ্র চন্দ্রের পরিচালনায় একটি ছবিতে অভিনয় করেন নিউ থিয়েটার্সের বাইরে। ছবিটির নাম 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। নায়ক-নায়িকা ছিলেন উত্তমকুমার আর অরুন্ধতী মুখার্জি। প্রেমাংশুবাবু করেছিলেন নায়কের কলেজের এক বন্ধুর রোল। চরিত্রটি খুবই অকিঞ্চিৎকর। তাতে করবার বিশেষ কিছু ছিল না। তবে মনে মনে হেমচন্দ্র চন্দ্রের ছবিতে কাজ করার যে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল সেটা পূরণ হয়েছিল।

ওই 'নদ ও নদী' ছবির পর থেকে প্রেমাংশুবাবুর কাছে প্রচুর ছবির অফার আসতে লাগল, আর উনিও দু'হাতে সই করতে লাগলেন। প্রায় প্রতিদিনই কাজ। কাজেই বাধ্য হয়ে চাকরিটি ছাড়তে হল। ডাক্তারবাবু যতই সহায় থাকুন না কেন, এভাবে দিনের পর দিন ছুটি নেওয়া তো সম্ভব নয়। এত ভালো একটা চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য বাড়িতেও কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সবাই ওঁর অদূরদর্শিতার নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু প্রেমাংশুবাবুর চোখে আর মনে তখন বড় অভিনেতা হবার স্বপ্ন। হাতে টাকাও আসছে প্রচুর। উনি কারও কথায় কান দিলেন না।

পরে একটা সময়ে প্রেমাংশুবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম : ওইরকম একটা ভালো চাকরি ছাড়ার জন্যে পরবর্তী কালে আপনার কোনও আক্ষেপ হয়নি।

প্রেমাংশুবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন : একদম না। আমি তো একা মানুষ। আমার বেশি টাকার দরকার কি? আমি চেয়েছিলাম একজন জনপ্রিয় অভিনেতা হতে। হতে যে পারিনি, সেটা আমার ভাগ্যের দোষ। কপাল বলে একটা কথা আছে তো। তবে আমি একদিক থেকে ভাগ্যবান। যত ছোট রোলই করি না কেন আমার অভিনয়ের কেউ নিন্দা করতে পারেননি কোনওদিন।

ওঁর কথার পিঠে আবার প্রশ্ন করেছিলাম : এই যে সারা জীবনে বিশেষ কোনও ভালো রোল পেলেন না, এর জন্যে ডিরেক্টারদের ওপর আপনার রাগ হয় না?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : একদম না। তাঁরা যদি দেখেন কোনও নায়ক যদি তাঁদের ছবিতে যে কোনও ছোট চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য রাজি হয়ে যান, তবে তাঁরা আমাকে নিতে যাবেন কেন? কোনও নায়ক যদি তাঁদের ছবিতে ক্যারেকটার রোল করেন তাতে তো তাঁদের ছবির গ্ল্যামার বাড়বে। তাঁরা তাই করতেন। এতে আমি তাঁদের কোনও দোষ দেখি না।

আমি বলেছিলাম : ওইসব নায়কদের ওপরে আপনার রাগ হত না?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : না, হত না। আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় কথা হল 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা।' ওইসব হিরোদের ঠাট-বাট বজায় রাখবার জন্যে আমার চেয়ে অনেক বেশি টাকার দরকার। আত্মরক্ষার তাগিদে তাঁরা সব হামলে পড়তেন ওইসব ক্যারেকটার রোলগুলোর ওপর। কত দুঃখে যে তাঁরা ওই কাজ করতেন সেটা তো বুঝতে পারি। তাই তাঁদের ওপর কোনও রাগ হত না।

কিন্তু ছবিতে যতই কাজ পান না কেন, প্রেমাংশুবাবুর মনটা সব সময় হাহাকার করে উঠত নাটকে অভিনয়ের জন্যে। তিনি নাটক পাগল মানুষ, নাটক ছাড়া তাঁর জীবন 'জল-বিন মছলি'-র মতো। যে কারণে দীর্ঘ দশটি বছর তিনি কোনও নাটকে অভিনয়ের সুযোগ না পেয়েও শিশির ভাদুড়ির কাছে পড়েছিলেন। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে শিশিরবাবুর অভিনয় দেখাও তো একটা ভাগ্যের কথা। শেষের দিকে শিশিরবাবু নিজে আর অভিনয় করতে নামতেন না। সুতরাং প্রেমাংশুবাবুর শ্রীরঙ্গমে যাওয়াও অনিয়মিত হয়ে পড়ল।

ওই সময়ে শিশিরবাবু তাঁকে একদিন পাকড়াও করলেন। বললেন : কি হে প্রেমাংশু, অশোক বলছিল তুমি নাকি রেগুলার আসছো-টাসছো না?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : কী করতে আর আসব বলুন বড়বাবু! আপনি তা আমাকে আর অ্যাকটিং-এর সুযোগ দিলেন না। একমাত্র প্রাপ্তি ছিল আপনার অভিনয় দেখা। তো সেটাও তো ইদানীং আপনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। মাঝে মাঝে এক-আধদিন কম্বিনেশন নাইটে অভিনয় করেন। মিছিমিছি আর এসে কী করব।

সেটা সত্যি কথা! শ্রীরঙ্গমে তখন যে সব নাটক অভিনীত হতো তাতে শিশিরবাবু তেমন নামতেন না। নতুন নাটকগুলিতে তাঁর ছিল প্রয়োগ-প্রধানের ভূমিকা। মাঝে মাঝে কম্বিনেশন নাইটে তিনি নামতেন। 'আলমগীর' যখন হত তখন তিনি অন্য থিয়েটার থেকে ছবি বিশ্বাস আর রানীবালাকে ডেকে আনতেন। ছবিদা করতেন রাজসিংহ আর রানীবালা করতেন উদিপুরি। রানীবালা তখন রঙমহলে 'রিজিয়া' নাটকে রিজিয়া করতেন। বক্তিয়ার করতেন অহীন্দ্র চৌধুরি। কিন্তু শিশিরবাবু যখন 'রিজিয়া' নাটক করতেন তখন সেখানে রিজিয়া করতেন রেবা বসু। শিশিরবাবু ওই নাটকে দুটি চরিত্র করতেন। বক্তিয়ার আর ঘাতক।

প্রেমাংশুবাবু বললেন : আমি অহীনবাবু আর শিশিরবাবু দু'জনেরই বক্তিয়ার দেখেছি। অহীনবাবু খুব হাততালি পেতেন। কিন্তু শিশিরবাবুর বক্তিয়ার বুদ্ধিমান দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। আহা, সে কি অভিনয়! এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। একালের দর্শকের কতবড় দুর্ভাগ্য, তাঁরা শিশিরবাবুর অভিনয় দেখতে পেলেন না। সেদিক থেকে আমরা খুব ভাগ্যবান।

আবার সেই পুরনো কথায় ফিরে যাই। প্রেমাংশুবাবুর কথা শুনে শিশিরবাবু বললেন : না না, থিয়েটারে আসা বন্ধ করো না। থিয়েটার হল মন্দিরের মতো। দেবতার কাছে কিছু পাও আর না পাও মন্দিরে আসার অভ্যেসটা রেখো।

এই বলে চুরুটে টান দিতে দিতে শিশিরবাবু অন্যদিকে চলে গেলেন।

তা প্রেমাংশুবাবু তার পরও শ্রীরঙ্গম নাট্যমন্দিরে আসা-যাওয়া বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু দেবতার কাছে মাথা ঠুকতে ঠুকতে শেষ পর্যন্ত কপালটাই ফুলে গেল। আর কোনও লাভ হল না। বিরক্ত হয়ে একদিন শ্রীরঙ্গম ছেড়ে দিলেন।

তারপর একদিন খবর পেলেন মহেন্দ্র গুপ্ত স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন। প্রযোজক সলিল মিত্র থিয়েটার চালাবার জন্যে শিশির মল্লিক আর যামিনী মিত্রকে আনাচ্ছেন। নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' নাটক হবে। নাট্যরূপ দিয়েছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত।

যামিনী মিত্র মশাই প্রেমাংশুবাবুদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। খবরটা পাবার পরই প্রেমাংশুবাবু ছুটলেন যামিনীবাবুর কাছে। প্রার্থনা জানালেন তাঁদের থিয়েটারে অভিনয় করার।

যামিনীবাবু বললেন : তুমি তো বড্ড দেরি করে ফেলেছো। আমাদের তো কাস্টিং কমপ্লিট। জহর গাঙ্গুলি উত্তমকুমারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। ও রাজিও হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে সাবিত্রী আছে, সরযূবালা আছে। ছোটখাটো সব রোল ডিস্ট্রিবিউট করা হয়ে গেছে। তুমি যদি হপ্তাখানেক আগেও আমার কাছে আসতে! যাই হোক, তুমি একবার কাল সন্ধেবেলা আমার সঙ্গে স্টার থিয়েটারে দেখা কোরো। আমি একবার সলিলবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখি কি করা যায়!

পরের দিন সন্ধেবেলা স্টার থিয়েটারের যামিনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন : তোমাকে তো আগেই বলেছি আমাদের সব রোল ডিস্ট্রিবিউট করা হয়ে গেছে। আর কাউকে একবার রোল দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া তো উচিত নয়। আমরা তা পারবও না। তবে তুমি যদি সাবস্টিটিউট হিসেবে থাকতে চাও তো থাকতে পারো। থিয়েটার-ডে'তে রেগুলার আসতে হবে। কেউ অ্যাবসেন্ট থাকলে তার রোলে নামতে হবে। এর জন্যে মাসে মাসে মাইনে পাবে। তবে পরের নাটকে তোমাকে যে রোল দেওয়া হবে সেটা সিওর। এখন তুমি কি করবে সেটা ঠিক কর।

মনটা একটু খারাপ হল ঠিকই। তবে সঙ্গে সঙ্গে যামিনীবাবুর ওই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন প্রেমাংশুবাবু। দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মতো আর কি!

আর ওই যে স্টার থিয়েটারে ঢুকলেন, সেই থেকে দীর্ঘ একুশটি বছর স্টার ছাড়া অন্য কোনও থিয়েটারের দিকে পা বাড়াননি প্রেমাংশুবাবু। ওই থিয়েটারই তাঁর ঘরবাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সলিলবাবু

আর দেবনারায়ণবাবুর এমন অপূর্ব ব্যবহার যে একদিনের জন্যেও মনে হয়নি তিনি ওখানে চাকরি করছেন।

ওই একুশ বছরে স্টার থিয়েটারে অভিনীত সবগুলি নাটকেই প্রেমাংশুবাবু অভিনয় করেছেন। 'শ্যামলী'-তে সাবস্টিটিউট। কিন্তু পরবর্তী নাটক 'পরিণীতা' থেকে শুরু করে শ্রীকান্ত, দাবী, সীমা, শ্রেয়সী এবং অন্যান্য যতগুলি নাটক হয়েছে সব নাটকেই অভিনয় করেছেন। কখনও ছোট রোল আর কখনও বড় রোল। স্টারে প্রেমাংশুবাবুর শেষ নাটক 'জনপদবধূ'। ওই নাটক চলতে চলতেই সলিল মিত্র মশাই স্টার থিয়েটার বিক্রি করে দেন রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়াকে। রঞ্জিতবাবু নতুন নাটক করবার সময় শিল্পীদের সামনে যে সব শর্ত রেখেছিলেন তাতে প্রেমাংশুবাবু রাজি হতে পারেননি। বিদায় নেবার দিন হাতিবাগানের উল্টো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে স্টার থিয়েটার বিল্ডিংটার দিকে তাকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন প্রেমাংশুবাবু। যেদিন স্টার থিয়েটার পুড়ে গেল সেদিনও কেঁদে ফেলেছিলেন। এত মায়া মাখানো হাতিবাগানের ওই স্টার থিয়েটারে।

স্টার ছাড়বার পর মিনার্ভায় 'প্রজাপতি' নাটকে অভিনয় করেছেন। তারপর বিশ্বরূপায় পরস্ত্রী, সাহেব বিবি গোলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম, দেনা পাওনা ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেছেন। শ্যামবাজারের বাসুদেব মঞ্চেও কিছুদিন দেখা গেছে তাঁকে। আজও, দুর্দান্ত অভিনয়ের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করছেন। প্রতীক্ষায় রয়েছেন নতুন করে কবে আবার ডাক আসবে।

ফিল্মের ডিরেক্টারদের মধ্যে প্রেমাংশুবাবু সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ মধু বসু আর তপন সিংহের কাছে। ওঁরা দু'জনে ডেকে ডেকে তাঁদের ছবিতে কাজ দিয়েছেন প্রেমাংশুবাবুকে। মধুবাবু আজ আর নেই, কিন্তু তপনবাবু সেই ট্র্যাডিশন আজও বজায় রেখেছেন।

প্রেমাংশুবাবুকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম : 'কেরানীর জীবন' ছাড়া ফিল্মের আর কোন চরিত্রে অভিনয় করে আপনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছেন?

জবাব দেবার জন্যে প্রেমাংশুবাবু একটা মুহূর্তও সময় নেননি। বলেছিলেন : নায়ক।

সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবিতে প্রেমাংশুবাবু উত্তমকুমারের এক বাল্যবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন লিডার। ধর্মঘটী শ্রমিকদের সামনে নায়ক যখন গাড়ি থেকে নামতে অস্বীকার করলেন সেই মুহূর্তে প্রেমাংশুবাবুর অভিনয় অপূর্ব। যেমন ন্যাচারাল, তেমনি মর্মস্পর্শী।

প্রেমাংশুবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম : সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হল কী ভাবে?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : ওঁর সঙ্গে আমার অনেক আগে থেকেই আলাপ ছিল। তখন উনি ফিল্ম-টিল্ম শুরু করেননি। ডি. জে. কিমারে কাজ করতেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন বিখ্যাত আর্টিস্ট অন্নদা মুন্‌সি। মুনসিদা আমাদের পাড়ার লোক। আমাদের বাড়িতে প্রায় আসতেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। অফিসে মুন্‌সিদা ছিলেন মানিকদা অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়ের বস।

আমি বললাম : আপনি কি ওঁদের অফিসে গিয়েছিলেন আলাপ করতে?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : না। ওঁরাই বরং রোজ দুপুরে আমার দোকানে আসতেন। আমার একটা রাবার গুড্‌সের দোকান ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট আর বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে। অফিস থেকে রোজ দুপুরে মানিকদা আর মুনসিদা আমার দোকানে আসতেন। ওখান থেকে আমরা তিনজনে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর কফি হাউসে ঘন্টাখানেকের জন্যে গিয়ে বসতাম।

আমি বললাম : কফি হাউসে ফিল্ম সম্পর্কে কথাবার্তা হত নিশ্চয়?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : একদম না। আলোচনা হত কমার্শিয়াল আর্ট নিয়ে। কখনও কখনও অল্পস্বল্প রাজনীতি। ফিল্মের ব্যাপারটা তখনও বোধহয় মানিকদার মাথায় আসেনি। তার অনেক পরে উনি ফিল্ম করলেন। বিশ্ববিখ্যাত হলেন। ওই সময় একদিন মানিকদার সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সে স্টুডিওতে দেখা। বললাম : কই মানিকদা, আপনি তো আমাকে ডাকলেন না আপনার ছবিতে?

মানিকদা বললেন : আমি কি কাজ করা ছেড়ে দিয়েছি নাকি? ঠিক সময়মতো ডাকব।

এর কিছুদিনের মধ্যেই মানিকদা ভানু রায়কে দিয়ে খবর পাঠালেন। গেলাম দেখা করতে। মানিকদা বললেন : 'নায়ক' ছবিতে দুটো রোল আছে। একটা নায়কের সেক্রেটারি, আর একটা ট্রেড ইউনিয়ন

লিডার। তুমি কোনটা করতে চাও বল।

আমি কিছু বলবার আগেই মানিকদা বললেন : আমার ইচ্ছে তুমি ট্রেড ইউনিয়ন লিডারই কর।

প্রেমাংশুবাবুর কথায় বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি ট্রেড ইউনিয়ন করতেন নাকি?

প্রেমাংশুবাবু বললেন : পাগল হয়েছেন। জীবনে পেটের দায়ে ট্রেড হয়তো করেছি। কিন্তু ইউনিয়ন? ওসব ব্যাপার থেকে আমি শতহস্ত দূরে।

আজ এই মুহূর্তে অভিনয় করতে না পাওয়ার বেদনা ছাড়া আর কোনও বেদনা নেই প্রেমাশুংবাবুর। রেডিও-টিভির বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং শ্রুতিনাটকের উদ্‌গাতা জগন্নাথ বসু ওঁর ভাইপো। জগন্নাথবাবুর ভাই গৌতম বসু, যাঁর ডাক নাম ছিল বলরাম, তিনিও রেডিওর একজন জনপ্রিয় সংবাদ-পাঠক ছিলেন। একদিন বাড়ি ফেরার সময় বাস দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। আর এক ভাইপো জয়াদিত্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কেব ম্যানেজার। জগন্নাথবাবুর স্ত্রী উর্মিমালা আর জয়াদিত্যর স্ত্রী সবসময় বাড়িতে প্রেমাংশুবাবুর সর্ববিধ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। ওঁদের ছেলেমেয়েদের কাছে প্রেমাংশুবাবু তাঁদের আদরের 'কাকুদাদু'। ওই নামেই এখন প্রেমাংশুবাবুর পাড়াময় পরিচিতি। আর তাতেই তিনি তৃপ্ত।

হুয়াদা

অভিনেতা শ্যাম লাহার ডাকনাম যে 'হুয়া', সেটা আমি প্রথম জানতে পারি পুরনো 'ভগ্নদূত' পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা থেকে। সেই পত্রিকায় শ্যাম লাহার একটি ছবি ছাপা হয়েছিল, তার নিচে ক্যাপশন দেওয়া ছিল 'হুয়া'। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, হুয়া কি কোন ছবির নাম, অথবা ছবিতে ছাপা ওই মানুষটিরই নাম। কিন্তু ছবির মুখটি তো আমার চেনা। বায়স্কোপের পর্দায় ওই মুখ তো বেশ কয়েকবার দেখেছি। এবং যতদূর জানি, ওঁর নাম শ্যাম লাহা।

এটা সেই ১৯৪২ সালের কথা। আমি তখনও স্কুলজীবন অতিক্রম করিনি। তমলুকের হ্যামিল্টন হাই স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্র। গরমের ছুটিতে কলকাতায় মামার কাছে এসেছি বেড়াতে। মামা থাকতেন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে চিত্রলেখা সিনেমার (বর্তমানে লিবার্টি) উল্টোদিকের গলির মধ্যে একটা মেসে। এই মেসেরই এক বোর্ডারের কাছে 'ভগ্নদূত' পত্রিকার একটি পুরনো সংখ্যায় শ্যাম লাহার ছবিটি দেখেছিলাম, যার নিচে ক্যাপশন দেওয়া ছিল 'হুয়া'।

ওই ছবিটি যে অভিনেতা শ্যাম লাহার, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কারণ ঠিক তার দুদিন আগে 'গরমিল' ছবিতে ওঁকে দেখে এসেছি। দারুণ ইন্টারেস্টিং একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন উনি। এক ঠগবাজ চরিত্র। কী অদ্ভুত কৌশলে রসগোল্লার হাঁড়ির বিনিময়ে উনি একটি জুয়েলারির দোকান থেকে মূল্যবান নেকলেস ঠকিয়ে নিয়ে গেলেন, তা দেখতে দেখতে প্রাণভরে হেসেছিলাম। দারুণ উপভোগ করেছিলাম ওঁর অভিনয়।

কিন্তু সেই ভদ্রলোকের ছবির নিচে 'হুয়া' শব্দটি লেখা কেন? কৌতূহল চাপতে না পেরে মামার বন্ধু সেই মেসের বোর্ডারটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই 'হুয়া' নামক ধাঁধাটি সম্পর্কে।

মামার বন্ধুটি বয়সে আমার থেকে অনেক বড়। কোনও এক আপিসে চাকরি করতেন। কাজেই আমার মতো এক কিশোরের বায়স্কোপ সম্পর্কে কৌতূহলের জবাবে অনায়াসেই একটি ধমক দিয়ে পত্রিকাটি আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ তিনি ততদিনে মামার মারফত জেনে গেছেন যে, আমি একখানি বায়স্কোপের পোকা। তাই স্নেহমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন : আসলে হুয়া হল শ্যাম লাহার ডাকনাম। বায়স্কোপের পর্দায় যখন নাম দেখানো হয় তখন দেখবে ওঁর নাম শ্যাম লাহার পাশে ব্র্যাকেটে 'হুয়া' কথাটা লেখা থাকে।

তাই নাকি? এটা খেয়াল করিনি তো! আর খেয়াল করবই বা কী করে! ওঁর মতো ছোট ছোট পার্ট যাঁরা করেন তাঁদের নামগুলো এত ছোট হরফে থাকে, আর এত তাড়াতাড়ি চোখের সামনে থেকে সরে যায় যে, ভালো করে পড়বার অবকাশই পাওয়া যায় না।

কিন্তু এ আবার কীরকম ডাকনাম! আমাদের পাড়ায় একটি ছেলে থাকে যার ডাকনাম হলো। কিন্তু হুয়া বলে কোন নাম তো কখনও শুনিনি। নামটা শুনলেই শেয়ালের হুক্কাহুয়ার কথা মনে পড়ে যায়।

এর প্রায় পনেরো বছর পরে যখন হুয়াদার সঙ্গে আমার জমজমাট ঘনিষ্ঠতা, সেই সময় একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আচ্ছা হুয়াদা, আপনার এরকম একটা অদ্ভুত ডাকনাম কে রেখেছেন? আপনার বাবা না আপনার মা?

হুয়াদা হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন : ওটা আমি নিজেই রেখেছিলাম।

আমি বললাম : ধ্যাৎ, তাই হয় নাকি! একদম শিশুবয়েসে কেউ কখনও নিজের ডাকনাম রাখতে পারে নাকি! ওটা তো অভিভাবকরাই রাখেন। বড় হয়ে কেউ কেউ এফিডেভিট করে নিজের নতুন নামকরণ করে বলে শুনেছি। কিন্তু ডাকনামটা তো ছোটবেলাতেই রাখা হয়।

হুয়াদা বলেছিলেন : না রবিদা, আমার ডাকনাম আমি নিজেই রেখেছিলাম, আর সেটা আমার সেই তিন-চার বছর বয়সেই।

আমি বললাম : ভারি ইন্টারেস্টিং তো! ব্যাপারটা কী বলুন দেখি!

হুয়াদা বললেন : একেবারে ছোটবেলায় আমার নির্দিষ্ট কোন ডাকনাম ছিল না। শুনেছি যে যা পারত তাই বলেই ডাকত। তবে যেমন আর পাঁচটা বাচ্চার ক্ষেত্রে হয়, সেই 'খোকা' ডাকটাই ছিল বেশির ভাগ লোকের মুখে। তা আমি যে সময়ে যেখানে জন্মেছিলাম, সেই বৌবাজারের প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে তখন রাত্তিরের দিকে শেয়াল ডাকত। শেয়ালদের ওই হুক্কাহুয়া ডাকটায় আমি সেই শিশুকালে খুব মজা পেতাম। দিনের বেলায় খেলতে খেলতে মাঝে-মাঝেই হুয়া-হুয়া বলে ডাক ছাড়তাম।

তা একদিন হয়েছে কী, আমাদের বাড়িতে এক ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসে আমাকে দেখে বললেন: বাঃ, বেশ নাদুস-নুদুস ছেলেটি তো। কত চুল দেখ মাথায়!

বলে আমাকে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার নাম কী খোকা?

আমি নাকি তখন তাঁকে বলেছিলাম : আমার নাম হুয়া।

শুনে ভদ্রমহিলা নাকি হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন : কী বলছে শোনো! এর নাম নাকি হুয়া। এ আবার কীরকম নাম গো!

তখন আমার মা নাকি তাঁকে বলেছিলেন . ও রোজ রাত্তির শেয়ালের ডাক শোনে তো। তাই দিন রাত্তির খেলতে খেলতে হুয়া হুয়া করে। তা সেইটাই এখন বলেছে।

তখন নাকি ভদ্রমহিলা বলেছিলেন : তা ও যখন নিজের ডাকনাম নিজেই ঠিক করেছে তখন ওই হুয়া নামটাই রেখে দাও না দিদি।

সেই থেকেই আমার হুয়া নামটা চালু হয়ে গেছে। এখন বলো রবিদা, আমার ডাকনাম আমি নিজেই রেখেছি কি না?

নামকরণের এই অদ্ভুত প্রক্রিয়া শুনে আমারও খুব হাসি পেয়ে গিয়েছিল। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম · আপনি বলছেন আপনার জন্মের সময় বৌবাজারে শেয়াল ডাকত। তা সেটা কি জব চার্নকের আমল নাকি? কোন সালে আপনি জন্মেছিলেন?

হুয়াদা বললেন : আমার জন্মের সালটা আমার কাছে একটা গর্বের ব্যাপার। ওটা একটা ঐতিহাসিক বছর। যে বছর গোরাদের হারিয়ে মোহনবাগান আই এফ এ শিল্ড পেল সেই ১৯১১ সালে আমার জন্ম।

আমি বললাম : হ্যাঁ, সেটা একটা গর্বের বছর বটে। তা তখন তো কলকাতা শহর জমজমাট। ওই সময়ে বৌবাজারের মতো জায়গায় শেয়াল আসবে কী করে!

হুয়াদা বললেন : তোমার দেখছি কলকাতা সম্বন্ধে কোন আইডিয়াই নেই রবিদা। তুমি কলকাতার কোন অঞ্চলে জন্মেছ বল দিকি?

আমি বললাম : আমি তো কলকাতায় জন্মাইনি। আমার জন্ম মফস্বলে। মিড়নাপুর ডিস্ট্রিক্টের তমলুকে।

হুয়াদা বললেন : তাই এ কথা বলছ। আমার জ্ঞান হবার পরও আমি দেখেছি আমাদের ওই প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটটার কেমন পাড়াগাঁ পাড়াগাঁ চেহারা। মেডিক্যাল কলেজটা তখন এত বড় ছিল না। কলেজের ভেতরে এখন যেখানে বড় বড় বাড়ি, তখন সেখানে ছিল আগাছায় ভরা বন-জঙ্গল। ধোপাদের কাপড় শুকোতে দেবার মাঠ। আমাদের প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে তখন গ্যাসের আলো জ্বলত। মোড়ের মাথায় রাইচাঁদ বড়ালের বাবা লালচাঁদ বড়ালদের বাড়িটাই যা বড় ছিল। বাকি সব ছোট ছোট বাড়ি। হাড়কাটা গলির দিকটাতে খানিকটা খোলার বস্তি, বাকিটা বন-জঙ্গল। সেখানে রাত্রে কেরোসিনের কুপি জ্বলত। তা যেখানে ঝোপ-জঙ্গল থাকে, সেখানে তো শেয়াল থাকবেই। এই যে হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারে আমার সঙ্গে বসে কথা বলছ, এখানেও তো এককালে জঙ্গল-টঙ্গল ছিল বলে শুনেছি।

হ্যাঁ, ওই স্টার থিয়েটারের গ্রিনরুমেই হুয়াদার সঙ্গে আমার আড্ডাটা জমত বেশি। ওই ঘরে তখন প্রেমাংশু বসু, চন্দ্রশেখর দে ইত্যাদিরা বসতেন। অন্য সময় আড্ডা দিতে যেতাম ওঁর বৌবাজারের শশীভূষণ দে স্ট্রিটের বাড়িতে। সেখানে হুয়াদার এক বন্ধুর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত। ফর্সা, লম্বা, দোহারা চেহারা। তা সেই ভদ্রলোকের মুখে একদিন একটা অদ্ভুত কথা শুনেছিলাম। ভদ্রলোকের নামটা আমি ভুলে গেছি। তাঁর মুখে হুয়াদা সম্পর্কে যে কথা শুনেছিলাম, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনই বিচিত্র।

কথাটা কিন্তু তিনি হুয়াদার সামনে বলেননি। ওঁর আড়ালে আমাকে বলেছিলেন।

একদিন বিকেলে আমার কর্মস্থল আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রিটের দিকে যাচ্ছিলাম পদব্রজে। ফকির দে লেনের মুখে হুয়াদার সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন : কী রবিবাবু, কোথায় চললেন?

আমি বললাম : এই একটু কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় যাব। এখন পিক্ আওয়ার্স তো! ট্রামে-বাসে যা ভিড়, ওঠাই যায় না। তাই পায়দল চলেছি। একটু বেড়ানোও হবে, পয়সাও বাঁচবে।

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন . বেশ করেছেন মশাই। একটু হাঁটাহাঁটি করলে শরীরটাও ভালো থাকে। তা আমাদের পাড়ায় এলেন, এক কাপ চা খেয়ে যাবেন না?

আমি সম্মতি জানাতে ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে সার্পেন্টিইন লেনের একটা চায়ের দোকানে বসলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি যে হুয়ার সঙ্গে এত ঘন ঘন আড্ডা দিতে আসেন, ওকে নিয়ে কিছু লিখবেন-টিখবেন নাকি?

আমি বললাম : সে রকম কিছু তো ভাবিনি। পরে হয়তো লিখব। তবে তার জন্যে আড্ডা দিতে আসি না। হুয়াদার সঙ্গে আমারে গল্প করতে খুব ভালো লাগে, তাই মাঝে মাঝে আসি আর কি!

হুয়াদার বন্ধুটি বললেন · হ্যাঁ, হুয়া খুব আড্ডাবাজ মানুষ। ওর সঙ্গে গল্প করে মজা আছে। ওকে তো সেই স্কুল-লাইফ থেকে দেখে আসছি। ও বরাবরই এরকম মজাদার মানুষ। তবে ওর সম্পর্কে যদি লেখেন তো আমাকে বলবেন। আমি অনেক মেটিরিয়ালস্ দিতে পারব আপনাকে।

আমি বললাম . কী রকম? সেরকম ঘটনা কিছু বলুন না!

ভদ্রলোক এবারে চুপ করে গেলেন। কী যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন : একটা ঘটনা আপনাকে বলছি। কিন্তু কথাটা যে আমার মুখ থেকে শুনেছেন, সেটা কোনওদিন হুয়াকে বলবেন না।

আমি বললাম : সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমাদের সাংবাদিকদের ধর্ম হল সোর্স গোপন করা। আপনার মনের কথা অনায়াসে আমার কাছে বলতে পারেন।

ভদ্রলোক তার পরও একটু যেন ইতস্তত করলেন। তারপর চায়ের কাপটা নিয়ে আমার প্রায় কানের কাছে ঝুঁকে এসে বললেন : হুয়ার আসল নাম কিন্তু শ্যাম লাহা নয়।

শুনে আমি চমকে উঠলাম। বললাম : সে কী! সিনেমায় নামার জন্যে অনেকে নতুন নাম নেয় বটে। কিন্তু সেসব তো কুমার-টুমার জাতীয় রোম্যান্টিক ধরনের নাম। কিন্তু এরকম রাম-শ্যাম জাতীয় ছদ্মনাম কেউ নিয়েছেন বলে তো শুনিনি। এতে হুয়াদার লাভ কী?

হুয়াদার বন্ধু বললেন : না না, এটা ওসব রোম্যান্টিক টোম্যান্টিক কোনও ব্যাপারই নয়। এটা একেবারে আইনগত ব্যাপার।

আমি বললাম : তার মানে?

ভদ্রলোক বললেন : হুয়ার আসল নাম কি জানেন! ওর আসল নাম নিতাইচাঁদ শীল।

শুনে আমি থ বনে গেলাম। বললাম : শীল থেকে লাহা! সেটা কিরকম ব্যাপার?

হুয়াদার বন্ধু বললেন : হুয়ার মামাবাড়ি শ্যামপুকুরের বিখ্যাত লাহাবাড়ি। ওর দাদামশাইয়ের নাম যদুনাথ লাহা। ভদ্রলোক মারা গেছেন। তিনি ছোটবেলায় হুয়াকে দত্তক নেন। ওঁদের গৃহদেবতা শ্যামচাঁদের নামে হুয়ার নতুন নামকরণ করেন শ্যামচাঁদ লাহা। একেবারে আইনগতভাবে উনি হুয়াকে দত্তক নিয়েছিলেন।

আমি বললাম : হঠাৎ হুয়াদাকে যদুনাথবাবু দত্তক নিতে গেলেন কেন? ওঁর কি কোন ছেলেপুলে ছিল না?

ভদ্রলোক বললেন : এর বেশি আমি আর বলতে পারব না। এরপরে যা জানবার হুয়ার কাছ থেকে কায়দা করে জেনে নেবেন। তবে ওর কাছে খবর্দার আমার নাম করবেন না যেন।

তা কায়দা করে একদিন হুয়াদার কাছ থেকে ওই দত্তক নেওয়ার নেপথ্যের ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা করেছিলাম। একবার ভেবেছিলাম, এসব জানাজানির চেষ্টা থাক। হুয়াদা যখন নিজে থেকে এ ঘটনা প্রকাশ করেননি তখন এর পিছনে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। সেটা প্রকাশ পেলে হুয়াদার অস্বস্তির কারণ

ঘটতে পারে।

কিন্তু কৌতূহল জিনিসটা বড় মারাত্মক। সেটা সুনীতি দুর্নীতির ধার ধারে না। তাই দত্তক নেওয়ার নেপথ্যের ব্যাপারটা জানবার জন্যে একদিন কায়দা করে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার পুরো নামটা কী হুয়াদা।

হুয়াদা অবাক হয়ে বললেন : কেন! শ্যাম লাহা। এটা তো সবাই জানে।

আমি বললাম : শুধু শ্যাম তো আর হতে পারে না। শ্যামের সঙ্গে নিশ্চয় একটা কিছু ছিল। যেমন শ্যামাচরণ কী শ্যামমোহন। তা আপনার শ্যামের সঙ্গে লেজুড়টা কী ছিল?

এবারে হুয়াদা একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন : ওটা শুনলে হাসবে। আমার পুরো নামটা হল শ্যামচাঁদ লাহা।

আমি বললাম : বাঃ, বেশ সুন্দর নাম। বেশ কাব্যিক নাম! শ্যামচাঁদ! তা হঠাৎ চাঁদটা বর্জন করতে গেলেন কেন?

হুয়াদা বললেন : ছবিতে যখন কাজ করতে এলাম তখন খুব ইচ্ছে ছিল চলচ্চিত্র জগতের তারকা হবার। কিন্তু ডুডু আর তামাক যেমন এক সঙ্গে খাওয়া যায় না, তেমনি তারাও হব আবার চাঁদও থাকব, সেটা তো সম্ভব নয়। তাই চাঁদটাকে ছেঁটে ফেলে দিলাম। হয়ে গেলাম শুধুই শ্যাম লাহা। তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। সেটা বড় দুঃখের।

আমি বললাম : সেই কারণটা কী?

হুয়াদা বললেন : প্রথম যখন নিউ থিয়েটার্সে বড়ুয়া সাহেবের 'দেবদাস' ছবিতে একটা ছোট্ট কাজ পেলাম তখন আমার শ্যামচাঁদ নামটা শুনে অনেকের কী হাসি। ঠাট্টা করে কেউ ডাকত নদেরচাঁদ। কেউ বলত ফটিকচাঁদ। ওইসব ঠাট্টার ঠ্যালায় পড়ে চাঁদটাকে একদিন অস্তাচলে পাঠিয়ে দিলাম।

আমি বললাম : আপনার সিনেমায় নামার গপ্পো পরে শুনব। তার আগে আপনার ছোটবেলার গপ্পো বলুন। আপনার কাছে যেটুকু শুনেছি তাতে তো মনে হয় আপনার ছোটবেলাটা খুব ইন্টারেস্টিং।

কথাটা বলে মনে মনে একটা আনন্দ অনুভব করলাম। হুয়াদাকে যদি একবার ছোটবেলার কাহিনীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলে অবধারিতভাবে দত্তক নেবার ঘটনাটাও এসে যাবে।

কিন্তু হুয়াদা সে ধার দিয়েও গেলেন না। বললেন : ছোটবেলার কথা আর কী বলব ভাই। খুব দুষ্টু ছিলাম ছোটবেলায়। পড়াশোনা করতে একদম ভালো লাগত না। ঘুড়ি ওড়াতে ভালো লাগত। মারপিট করতে ভালো লাগত। আর ভালো লাগত গান শুনতে। গান শিখে গাইবারও ইচ্ছে করত। কেবল পড়াশোনার নাম শুনলেই গায়ে জ্বর আসত। তাই বাবা আমাকে ছোটবেলাতেই তাঁর কাছে দিল্লিতে নিয়ে চলে যান।

জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার বাবা কি দিল্লিতে থাকতেন নাকি? কী করতেন ওখানে?

হুয়াদা বললেন : বাবা দিল্লিতে ভাইসরয়ের দফতরে চাকরি করতেন। তাই দিল্লিতেই থাকতে হত তাঁকে। গরমের সময় তিনমাস সিমলায় থাকতে হত। ওই সময়ে ভাইসরয়ের অফিস সিমলায় চলে যেত। দিল্লিতে তো গ্রীষ্মের সময় ভারি গরম। দুপুরের দিকে লু চলত। সাহেবদের আবার গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবার ভয় ছিল কিনা, তাই গরমের সময়টা সিমলায় গিয়ে কাটাতেন।

হুয়াদার বাবা চাকরি করতেন শুনে মনে একটা খটকা লাগল। কলকাতায় সেই আমলে লাহারা চাকরি করতেন বলে শুনিনি। তাঁদের বড় বড় লাল রঙের বাড়ি থাকত। কেউ ব্যবসা করতেন, কারও বা বেনিয়ানশিপ ছিল। সেই খটকা মেটাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার বাবার নাম কী হুয়াদা?

হুয়াদা বিন্দুমাত্র সময় না নিয়ে বললেন : আমার বাবার নাম যদুনাথ লাহা। উনি মারা গেছেন।

তাই তো। এ তো বড় রহস্য! হুয়াদার বন্ধুর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে হুয়াদার বাবার পদবি তো শীল হওয়া উচিত। কিন্তু হুয়াদা বললেন, যদুনাথ লাহা! তাহলে কি হুয়াদার সেই বন্ধু আমার সঙ্গে রসিকতা করলেন! একটা কাল্পনিক গপ্পো বানিয়ে আমাকে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিতে চেয়েছেন। অথবা এই প্রসঙ্গ তুলে যাতে আমাকে হুয়াদার বিরাগভাজন হতে হয় তারই চেষ্টা করেছেন। হবেও বা। পরশ্রীকাতর কিছু কিছু মানুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

যাই হোক, হুয়াদার কথা শোনবার পর আমি আমার মন থেকে সব রহস্যের মূলোৎপাটন করে দিলাম। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম · তাহলে সেই ছোটবেলা থেকেই আপনি দিল্লিবাসী?

হুয়াদা বললেন : তা যদি হত তাহলে তো বেঁচে যেতাম। সিনেমাপাড়ায় পেছন নাচিয়ে খেতে হত না। দিল্লিতে গিয়েও তো চরিত্রের পরিবর্তন হল না। বাবা সেখানে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু মা সরস্বতীর সঙ্গে যার আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক তার আর লেখাপড়া হবে কী করে! বাবা প্রথম প্রথম অনেক চেষ্টা করতেন, শাসন-টাসনও করতেন। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন। আমি তখন আবার ব্যাক টু.প্যাভিলিয়ন।

আমি বললাম : তার মানে?

হুয়াদা বললেন . আবার কলকাতায় ফিরে এলাম। বাবা দিল্লির ইস্কুল থেকে ট্রানসফার নিইয়ে আমাকে আমাদের পাড়ার বঙ্গবাসী ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

আমি বললাম : তার মানে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেন?

হুয়াদা বললেন : ঠিক তাই। তবে দিল্লিতে যে ক'বছর ছিলাম তাতে আমার জীবনের একটা মস্তবড় উপকার হয়েছে।

আমি বললাম : সেটা কী?

হুয়াদা বললেন : হিন্দি আর উর্দু ভাষায় কথা বলাটা ভালো করে শিখে গিয়েছিলাম যেটা পরবর্তীকালে আমার প্রচুর কাজে লেগেছে। যে ক'টা হিন্দি ছবিতে কাজ পেয়েছি সেটা ওই ফ্লুয়েন্টলি হিন্দি বলার দৌলতেই। ওটা ছিল আমার অ্যাডেড কোয়ালিফিকেশন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম . আসল ব্যাপারটা কেন চেপে যাচ্ছেন হুয়াদা?

হুয়াদা চোখ কপালে তুলে বললেন : আসল ব্যাপার আবার কোনটা?

আমি বললাম : শেয়ালের ব্যাপার। দিল্লিতে তো শেয়াল নেই, তাই হুয়া হুয়া করতে পারছিলেন না। সেই জন্যেই কলকাতায় ফিরে এলেন।

হুয়াদা বললেন : কে বললে দিল্লিতে শেয়াল নেই। ছিল তো। ছিল কেন, এখনও আছে। যে কোন পুরনো মনুমেন্টের কাছে গেলে এখনও দু-চারটে শেয়াল দেখা যায়। এই তো সেদিন তাজমহল দেখতে গিয়ে যমুনার ধারে দেখলাম দুটো শেয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তারপর একটু হেসে বললেন : এখন তো আবার দিল্লিতে হিউম্যান শেয়াল প্রচুর। যে কোনও সরকারি দফতরে গেলে দেখা যাবে শেয়ালে শেয়ালে ছয়লাপ। শেয়ালের মতোই সব ধূর্ত-ধূর্ত চোখ নিয়ে টেবিল-চেয়ার আলো করে বসে আছে।

আমি বললাম : তা যা বলেছেন। যাক গে, তারপর কী হল বলুন। বঙ্গবাসী ইস্কুলে তো ভর্তি হলেন। তারপর?

হুয়াদা বললেন . তারপরে আর কী! গড়িয়ে গড়িয়ে ম্যাট্রিক পাশ করলাম। ওই বঙ্গবাসী কলেজেই ভর্তি হলাম আই এ পড়তে। আর ঠিক সেই সময়ে এমন একটা ব্যাপার ঘটল, যাতে আমার জীবনের ধরনটাই একদম বদলে গেল। সুরের আকাশের সন্ধান পেয়ে গেলাম আমি।

অভিনেতা শ্যাম লাহা অর্থাৎ হুয়াদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা স্টার থিয়েটারের গ্রিনরুম থেকে। তার আগে হুয়াদার সঙ্গে আমার তেমন কোন আলাপই ছিল না। ওঁকে স্টুডিওতে দেখতাম, কিন্তু কথাবার্তা বলার কোন সুযোগই ঘটেনি।

শ্যাম লাহাকে আমি প্রথম দেখি প্রমথেশ বড়ুয়ার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে। সেটা বোধহয় ১৯৪৮ সাল। তখনও আমার সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয়নি। কালীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রূপমঞ্চ' পত্রিকার আমি গ্রাহক ছিলাম। সেই সূত্রে কালীশদার হাতিবাগানের অফিসঘরে আমি মাঝে মাঝে যেতাম। প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে। কালীশদা আমাকে একটু স্নেহ করতেন। তাই আমার অপ্রয়োজনে ওখানে যাওয়াটাও গর্হিত কর্ম বলে গণ্য হত না।

কালীশদার অফিসে ঘন ঘন যাবার প্রধান আকর্ষণ ছিল, ওখানে সিনেমা-থিয়েটারের শিল্পীদের দেখা যেত। তাছাড়া কালীশদা মাঝে মাঝে আমাকে দু-একটা ফাই-ফরমাশ করতেন, আর আমি সেগুলি

সানন্দে তামিল করতাম। পরবর্তীকালে কালীশদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছিল। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ দ্বিগুণ নয়, একেবারে চতুর্গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

তা সেবারে একদিন সকালে কালীশদাকে দেখলাম প্রমথেশ বড়ুয়ার বাড়িতে টেলিফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করছেন বড়ুয়া সাহেবের এক সহকারীর সঙ্গে যিনি কালীশদার বিশেষ স্নেহভাজন। ভদ্রলোকের নামটা আমি জানতাম। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ও হয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

টেলিফোনে বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া হচ্ছে শুনে আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। প্রমথেশ বড়ুয়া তখন আমার স্বপ্নের পুরুষ। কিছুদিন আগে শুনেছিলাম তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইউরোপ গেছেন চিকিৎসা করাতে। দিন তিনেক আগে খবরের কাগজে দেখলাম তিনি ইউরোপ থেকে ফিরে এসেছেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে।

কালীশদা বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন শুনে আমি কালীশদাকে ধরে পড়লাম আমাকে সঙ্গে নেবার জন্যে। ওঁদের সঙ্গে গিয়ে প্রমথেশচন্দ্রকে একবার সামনাসামনি দেখব শুধু। তাহলেই আমার জীবনের একটা বড় সাধ মিটে যাবে।

আমার কাতর আবেদনে কালীশদার মনে বোধহয় একটু দয়া হল। বললেন : ঠিক আছে। তুমি কাল এখানে চলে এসো। গাড়িতে যদি জায়গা হয় তাহলে তোমাকে আমাদের সঙ্গে নেব। নতুবা তোমাকে বাসে করে বড়ুয়ার বাড়ি যেতে হবে।

তা সেবারে কালীশদা আর মণিদীপা বৌদির সঙ্গে প্রমথেশ বড়ুয়ার বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওঁরা বড়ুয়া সাহেব আর যমুনা দেবীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন আর আমি একটু দূরত্বে বসে আমার স্বপ্নের নায়ককে দেখছিলাম। ছবিতে যে চেহারা দেখেছি তার থেকে কত রোগা হয়ে গেছেন। কিন্তু চোখ দুটি কী উজ্জ্বল। ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট ভারত যেদিন স্বাধীন হয়, প্রমথেশচন্দ্র সে সময় লন্ডনে ছিলেন। ইন্ডিয়া হাউসে কী কী ঘটনা ঘটেছিল সেদিন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিচ্ছিলেন কালীশদাদের কছে।

বড়ুয়া সাহেবের বাড়ি থেকে আমরা যখন বেরোচ্ছি সেই সময়ে শ্যাম লাহা একটি গাড়ি চেপে বড়ুয়া সাহেবের বাড়ির সামনে এলেন। গাড়িটা তিনি নিজেই চালাচ্ছিলেন। তাঁকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে কালীশদা হাসতে হাসতে বলে উঠলেন : কী ব্যাপার ছয়া। তুমি এখানে যে? বড়ুয়া তো এখন কোনও ছবি-টবি করছেন না।

শ্যামবাবুও হাসতে হাসতে জবাব দিলেন : বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি শুধুই লেনদেনের কালীশদা। ওঁর কাছে আমায় চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। উনি সিনেমায় চান্স না দিলে শ্যাম লাহাকে আজ কে চিনত বলুন। আপনাদের মতো নামকরা সম্পাদক মশাইদের সঙ্গে আলাপই বা হত কী করে।

কালীশদা পুনর্বার হাসতে হাসতে বলেছিলেন : বেশ খোঁচাটা দিলে যা হোক। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বলো!

এই বলে সদলবলে ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছিলেন কালীশদা।

প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতি ছয়াদার এই যে কৃতজ্ঞতা, এটা কোনও সাজানো ব্যাপার নয়। এটা ছয়াদার অন্তরের ব্যাপার। কথায় কথায় ছয়াদা প্রায়ই বলতেন : জানো রবিদা, বড়ুয়া সাহেবের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কোনও দিনই শোধ হবার নয়। পাহাড়ীদার একটা চিঠিতেই তিনি আমাকে 'দেবদাস' ছবিতে চান্স দিয়েছিলেন। যত ছোট রোলই হোক, সিনেমায় ওই একটুখানি চান্স পাওয়া মানে তখন আমার কাছে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া।

ছয়াদা যাঁকে পাহাড়ীদা বলে উল্লেখ করলেন, সেই পাহাড়ীদা হলেন পাহাড়ী সান্যাল। কিন্তু পাহাড়ীদার সঙ্গে ছয়াদার আলাপ হল কী করে?

সেটা বলতে গেলে তিমিরবরণের কথা বলতে হয়। আবার তিমিরবরণের সঙ্গেই বা পরিচয় হল কেমন করে?

সেটা বলতে গেলে তিমিরবরণের দাদা মিহিরকিরণ ভট্টাচার্যের কথা বলতে হয়। সে আর এক ইতিহাস।

বঙ্গবাসী কলেজে পড়তে পড়তেই মা সরস্বতীকে গুডবাই করে দিয়েছিলেন হুয়াদা। মেতে উঠেছিলেন গান-বাজনা আর কুস্তির আখড়া নিয়ে। কুস্তিগীরের কেরামতি দেখাতে গিয়েই তো মিহিরবাবুর সঙ্গে আলাপ।

একদিন সকালে হুয়াদা পূরবী সিনেমার কাছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। স্কুলের মেয়েরা সেই সকালে ড্রেস-ট্রেস করে স্কুলের দিকে যাচ্ছিল। পার্কের রেলিং ধরে কয়েকটি ছেলে মেয়েদেব দিকে তাকিয়ে নানারকম অশ্লীল ইঙ্গিত করছিল। মেয়েরা অস্বস্তিবোধ করছিল, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করতে পারছিল না। ব্যাপারটা দেখে হুয়াদার মাথা গরম হয়ে গেল। ছেলেদের সামনে গিয়ে বললেন: এই, তোমবা এবকম করে মেয়েদের বিরক্ত করছ কেন?

হুয়াদার কথা শুনে যে তিন-চারটে ছেলে মেয়েদেব টিজ করছিল, তাদের মধ্যে একটি ছেলে বলে উঠল হেই মশাই, আপনি আমাদের ব্যাপারে ফুট কাটতে এসেছেন কেন? যান তো মশাই, নিজের কাজে যান।

কথাটা শুনে কুস্তিগীর শ্যাম লাহার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। খুব শান্ত গলায় বললেন: এই যে যাচ্ছি।

এই বলে ছেলেটিকে মাথার ওপর তুলে ধরে দু'পাক ঘুরিয়ে পার্কের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তা দেখে বাকি ছেলেগুলো চোঁ-চাঁ দৌড়। সেই সঙ্গে পার্কের মধ্যে আছাড়ে দেওয়া ছেলেটিও ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে দৌড়ে পালাল।

স্কুলযাত্রী মেয়েরা অবাক হয়ে হুয়াদার এই কাণ্ড দেখে। দু'চোখ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে যার স্কুলের পথে চলে গেল।

হুয়াদা পকেট থেকে রুমাল বার করে নিজের হাত দুটো আর মুখটা মুছে নিয়ে নিজের গন্তব্যের দিকে এগোতে গিয়েই বাধা পেলেন। পেছন থেকে কে যেন বলে উঠলেন : এই যে ভাই শোনো।

হুয়াদা পেছন ফিরে দেখলেন, একজন সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক তাঁর দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন। হুয়াদাকে ফিরে তাকাতে দেখে তিনি বলে উঠলেন : তুমি বুঝি কুস্তি করো?

হুয়াদা বললেন : ওই একটু-আধটু।

ভদ্রলোক বললেন : আমার নাম মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার সাহসী কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। আমার সঙ্গে দু-একজন বড় দরের কুস্তিগীরের আলাপ আছে। তুমি যদি ভালো করে কুস্তি শিখতে চাও তাহলে তাঁদের আখড়ায় তোমাকে ভর্তি করে দিতে পারি।

হুয়াদা বললেন : আমি কুস্তির প্র্যাকটিস করি বটে, তবে আমার আসল ন্যাক গান-বাজনায়।

মিহিরবাবু বললেন : বাঃ, সেটা তো খুব ভালো কথা। তোমার নামটি কী ভাই?

হুয়াদা বললেন : আজ্ঞে আমার নাম শ্যামচাঁদ লাহা।

মিহিরবাবু বললেন : বাঃ, বেশ সুন্দর নাম। তা শ্যামচাঁদ, আমি তো তোমার গান শেখার ব্যাপারে কোন হেল্প করতে পারব না ভাই। তবে বাজনা শেখার ব্যবস্থা করে দিতে পারি আমার ভাইয়ের কাছে।

হুয়াদা জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার ভাই? তাঁর নাম কি?

মিহিরবাবু বললেন, তিমিরবরণ। তিমিরবরণ ভট্টাচার্য।

নামটা শুনে লাফিয়ে উঠলেন হুয়াদা। বললেন : ওরে ব্বাবা। তিনি তো বিখ্যাত ব্যক্তি। বাজনার রাজা। আপনার পায়ে পড়ছি মিহিরদা, আপনি আমায় তিমিরদার কাছে নিয়ে চলুন। তাঁর পায়ের কাছে বসে আমি বাজনার তালিম নিতে চাই।

তা মিহিরবাবুর হাত ধরে তিমিরবরণের কাছে গিয়েছিলেন হুয়াদা। আর তিমিবরণ তাঁকে হাতে ধরে বাজনা তালিম দিয়েছিলেন। সব রকমের বাদ্যযন্ত্রে। তিমিরবরণের সঙ্গে সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছেন হুয়াদা। আর সেই সূত্রেই হুয়াদা লখনৌয়ের এক কন্‌ফারেন্সে ম্যারিস কলেজের শাস্ত্রীয় সংগীতের ছাত্র পাহাড়ী সান্যালের গানের সঙ্গে তবলা বাজাতে বসেছিলেন।

পাহাড়ী সান্যালের সঙ্গে বাংলার চলচ্চিত্র জগতের যোগাযোগ তখন সবে শুরু হয়েছে। প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁকে পছন্দ করে রেখেছেন। নিউ থিয়েটার্সের অন্যান্য কর্তারাও। নানা কারণে অভিনয় করার ব্যাপারটা পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে কেবল।

সেই পাহাড়ী সান্যালের ভালো লেগে গেল শ্যামচাঁদ লাহাকে। ভালো লাগার কারণ সংগীতের তালে তালে হুয়াদার আশ্চর্য সব এক্সপ্রেশন। গান গাইতে গাইতে সেই সব এক্সপ্রেশনগুলি অবাক হয়ে দেখছিলেন পাহাড়ীদা।

গান শেষ হবার পর পাহাড়ীদা বলে উঠেছিলেন ও শ্যামচাঁদবাবু, আপনি মশাই সিনেমা-থিয়েটারে অভিনয় করেন না কেন?

হুয়াদা জবাব দিয়েছিলেন : সে কী! আমি অভিনয় করব কী করে! আমি অভিনয়ের কী জানি!

পাহাড়ীদা বলেছিলেন : আপনি কতটা কী জানেন তা তো আমি জানি না। তবে আপনার মুখে যে ভাবে এক্সপ্রেশন খেলা করে তাতে তো মনে হয় আপনি অভিনয় করলে নাম করতে পারবেন।

কথাটা হুয়াদার মনে ধরল। বললেন : আপনার কি সিনেমা লাইনে সেরকম চেনাশোনা কিছু আছে?

পাহাড়ীদা জবাব দিলেন : সিনেমা লাইনের সঙ্গে জানাশোনা নেই, তবে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আছে। তাঁর নাম প্রমথেশ বড়ুয়া। আপনি যদি চান তাহলে তাঁকে একটা চিঠি লিখে দিতে পারি।

তা সেই চিঠি নিয়ে হুয়াদা নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং কার্যসিদ্ধি হয়েছিল। 'দেবদাস'-এর কাস্টিং তখন কমপ্লিট। বড়ুয়া সাহেব হুয়াদাকে দু' সিনের একটা মাতালের রোল্ দিয়েছিলেন।

হুয়াদা তাঁর ব্যবহার এবং কর্মদক্ষতায় নিউ থিয়েটার্সের সকলের মন জয় করেছিলেন, যে কারণে দেবকী বসুর হিন্দি 'চণ্ডীদাস' ছবিতে একটা ভূমিকা পেয়েছিলেন। তাঁর নিখুঁত হিন্দি উচ্চারণ সকলকে বিস্মিত করেছিল। ফলে 'ডাকু মনসুর' ছবিতেও চান্স পেয়ে গেলেন।

বাংলা ছবিতে হুয়াদা বড় রোল পেলেন নীতিন বসু পরিচালিত 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে একজন গোয়েন্দার ভূমিকায়। ওই ছবির নায়ক ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল। নায়িকা উমাশশী। অন্ধ সুরদাসের চরিত্রে বিস্ময়কর অভিনয় করেছিলেন অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। এ ছবির ভিলেন চরিত্রে ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ির ভাই বিখ্যাত অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ি।

এরপর থেকে হুয়াদাকে আর একবারের জন্যেও থেমে থাকতে হয়নি। পরের পর ছবিতে অভিনয় করে যেতে থাকলেন। কিছু ছবিতে কমিক্ রোল, কিছু ছবিতে বোকা-বোকা চরিত্র। অধিকাংশ ছবিতে নিপাট ভালোমানুষ। দু-একটি ছবিতে ভিলেন। 'মানিকজোড়' ইত্যাদি দু-তিনটি ছবিতে তিনি আবার নায়ক। হিন্দি, বাংলা, উর্দু ইত্যাদি কলকাতা এবং বম্বের নানা ভাষার ছবিতে হুয়াদা সুনামের সঙ্গে অভিনয় করে যেতে লাগলেন। জনসাধারণের যে তাঁর অভিনয় ভালো লাগল, সে কথা বলার আবশ্যক বোধ হয় নেই।

অভিনয় ছাড়া সিনেমার সঙ্গে আরও একটি সম্পর্ক ছিল হুয়াদার। ছায়াছবির ব্যবস্থাপক হিসেবেও তিনি বেশ নাম করেছিলেন। 'গরমিল' ছবি থেকে তাঁর ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু। পরে আরও বহু ছবিতে হুয়াদা ওই দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

হুয়াদা দু'খানি ছবি প্রযোজনাও করেছিলেন। ছবি দুটির নাম 'ভুলের শেষে' এবং 'ভোলা মাস্টার'। আর্থিক দিক থেকে ছবি দুটি তেমন সাফল্য পায়নি। এজন্যে হুয়াদা দীর্ঘকাল আক্ষেপ করতেন।

ব্যবস্থাপক হিসেবে হুয়াদা একবার আমার দারুণ উপকার করেছিলেন। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে হুয়াদার জীবনের দুটি মজার ঘটনা বলি।

একটি ব্যাপারে আমি হুয়াদাকে বরাবর অ্যাভয়েড করতে চেয়েছি। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে বার বার ওঁর খপ্পরে আমাকে পড়তে হয়েছে। সেটা হচ্ছে ওঁর গাড়ি চালানোর ব্যাপারে।

আগেই বলেছি আমি প্রায়ই স্টার থিয়েটারে আড্ডা দিতে যেতাম। সন্ধের পর ঢুকতাম, আর বেরোতাম ড্রপসিন পড়ার মুখে মুখে।

একবার ওইরকম আড্ডা দিয়ে বেরোচ্ছি, দেখলাম হুয়াদাও মেক-আপ টেক-আপ তুলে

বেরোচ্ছেন। আমাকে বেরোতে দেখে হুয়াদা বললেন : তুমি কোন্ দিকে যাবে রবিদা?

আমাকে 'রবিদা' বলা নিয়ে হুয়াদার সঙ্গে আমার মাঝে-মাঝেই তর্ক-বিতর্ক হত। আমি হুয়াদাকে বলতাম : হুয়াদা, আপনি আমার থেকে ষোলো বছরের বড়। তা সত্ত্বেও আপনি আমাকে রবিদা বলে ডাকেন কেন?

হুয়াদা বলতেন : এর কি কোন উত্তর আছে। আমার ভালো লাগে তাই রবিদা বলি।

আমি বললাম : কিন্তু আমার যে এতে অস্বস্তি হয় সেটা বোঝেন না কেন?

হুয়াদা বললেন . কেন, অস্বস্তির কী আছে। আমি মশাই ওরকম ভদ্রতা করে তোমাকে বাবু-টাবু বলতে পারব না। তোমাকে আমার বন্ধু বলে মনে করি, তাই রবিদা বলে ডাকি।

আমি বললাম : সে তো আপনি শুধু রবি বলেই ডাকলে পারেন। কমলদা (কমল মিত্র) তো তাই ডাকেন, অনুপবাবুও (অনুপকুমার) আমাকে শুধু রবি বলেই ডাকেন। আপনার অসুবিধে কি?

হুয়াদা বললেন : অসুবিধে আছে। আমি সব সময়ে মধ্যপন্থায় বিশ্বাস করি। তোমাকে বাবু ডেকে দূরে সরিয়েও দিতে পারব না, আবার শুধু রবি বলে ডেকে দাদাগিরি ফলাতে পারব না। আমাকে আমার মতো ডাকতে দাও।

ওই কথা শোনার পর আর হুয়াদার কাছে 'রবিদা' বলে ডাকার প্রসঙ্গটা কোনদিন তুলিনি।

তা সেদিন যখন হুয়াদা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোন্ দিকে যাব, তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, যে আমি আমার বাড়ির দিকে যাব।

হুয়াদা বললেন : বাড়ি যাবে তা তো জানি। তুমি যা গুডবয়, তাতে নিজের বাড়ি ছাড়া এত রাতে অন্য কোনও বাড়িতে যাবে তা তো ভাবতে পারি না। কিন্তু তোমার বাড়িটা কোন্ দিকে।

আমি বললাম : এই তো হেদোর ধারে বিডন স্ট্রিটের ওপর।

হুয়াদা বললেন : আমিও তো ওই দিকেই যাচ্ছি। চলো তোমাকে নামিয়ে দিই।

আমি বললাম . কী দরকার! এই তো পাঁচ মিনিটের রাস্তা। এতটুকু রাস্তার জন্যে গাড়িতে ওঠা-নামার মেহনত পোষাবে না।

হুয়াদা বললেন : তা হোক, তুমি আমার গাড়িতেই চলো। এই বলে হুয়াদা প্রায় টানতে টানতে আমাকে তাঁর গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেন। হুয়াদার গাড়িটা খুব ছোট। দু'জনের বেশি তিনজন বসার উপায় নেই।

তা স্টার থিয়েটার থেকে বিডন স্ট্রিট হাঁটাপথে ওই পাঁচ মিনিটেব রাস্তা সেদিন হুয়াদার গাড়িতে অতিক্রম করতে কতক্ষণ লেগেছিল জানেন? পাক্কা পঁচিশ মিনিট।

কী করে? তাহলে মজার কথাটা শুনুন। বিধান সরণির ওপর দিয়ে তখন ট্রাম-বাস ট্যাক্সি ছাড়াও রিক্‌শা এবং ঠ্যালাগাড়িও চলত। হুয়াদা এমন পাকা ড্রাইভার যে রিক্‌শা আর ঠ্যালাও তাঁর গাড়ি ওভারটেক্ করে চলে যাচ্ছিল। হুয়াদা তাঁদের সাইড দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তারা শুধু ওভারটেকই করছিল না, সেই সঙ্গে হুয়াদার গাড়ির স্পিডের বহর দেখে সচিৎকারে গালাগাল দিয়েই যাচ্ছিলেন।

সেই থেকে হুয়াদা লিফট দিতে চাইলেও আমি মিথ্যে কথা বলে তাঁর সঙ্গ অ্যাভয়েড করতাম। যদি উত্তরে যাবার দরকার থাকত তো অম্লানবদনে বলে দিতাম দক্ষিণে যাব। তার আগে কায়দা করে জেনে নিতাম হুয়াদা কোনদিকে যাচ্ছেন।

শুধু আমাকেই নয়, হুয়াদা গাড়ি চালাবার সময় সর্বদাই একজন সঙ্গী খুঁজতেন। কারণটা পরে জানতে পেরেছিলাম। হুয়াদার গাড়িটা চলতে চলতে মাঝে মাঝে ব্যাগড়বাই করত। সেইজন্যে গাড়ি ঠেলবার জন্যে একজন কাউকে দরকার হত। হুয়াদা তাই ড্রাইভ করার সময় একজন সঙ্গীর অনুসন্ধান করতেন।

হুয়াদার হাত দিয়ে নাকি জল গলত না, বাজারে তেমন একটা বদনাম চালু ছিল। সেই হুয়াদার ঘাড় ভেঙে আমি একবার পুরো আধসের মাংস খেয়েছিলাম। পরে এ ব্যাপারে আমার নিজের মনেই অনুশোচনা এসেছিল।

একদিন বেলা এগারোটা নগাদ হুয়াদার শশীভূষণ দে স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, মাংসের গন্ধে সারা বাড়িটা ভুর ভুর করছে। হুয়াদা খালি গায়ে ভুঁড়ির নিচে লুঙ্গিটা কষে বেঁধে নামিয়ে ঘর্মাক্ত শরীরে

মাংস রান্না করছেন। তাই দেখে একটা মতলব খেলে গেল মাথায়। বললাম : হুয়াদা, শুনেছি আপনার রান্নার হাত নাকি দারুণ। কখনও টেস্ট করিনি। আজ আপনার হাতের রান্না মাংস খাব।

শুনে হুয়াদার মুখটা কেমন ম্লান হয়ে গেল। মুখে বললেন : তাতে কী হয়েছে। খাও না খানিকটা মাংস।

খানিকক্ষণ পরে মাংসের হাঁড়ি উনুন থেকে নামালেন হুয়াদা। একথা সেকথা নানান কথা বলছেন, কিন্তু মাংস দেবার নামটি করছেন না।

একটু পরে আমি বললাম . কই হুয়াদা দিন, মাংস দিন।

হুয়াদা থমমত খেয়ে বললেন : সত্যি খাবে?

আমি বললাম · সত্যি নয় তো কি মিথ্যে। থাক, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি নিজেই নিয়ে নিচ্ছি।

এই বলে আমি একটি বড় বাটি হাতে নিয়ে হাঁড়ি থেকে মাংস তুলে তুলে খেতে লাগলাম।

মিনিট কুড়ি পরে দেখলাম হাঁড়িতে আর মাংস নেই। সবটাই আমার উদরস্থ হয়ে গেছে।

হুয়াদা কাঁদো কাঁদো মুখে দেঁতো হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন : রান্নাটা কেমন হয়েছে?

আমি বললাম : খুব ভালো। চলি হুয়াদা। আপনার এই অপূর্ব মাংসের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

হুয়াদা করুণ মুখে জিজ্ঞাসা করলেন : আমি এখন কী খাব?

আমি বললাম : বাজার থেকে রান্না মাংস আনিয়ে খেয়ে নিন। কী আর করবেন বলুন। কপালে দুর্ভোগ ছিল আজ।

রাস্তায় বেরিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কৃপণ হুয়াদাকে টাইট দেবার জন্যে এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও পারতাম।

এবারে হুয়াদার অন্য একটা রূপের পরিচয় দিই। হুয়াদা ছিলেন প্রফেশ্যনাল ব্যবস্থাপক। টাকা পয়সা নিয়ে উনি স্টেজ-শো অর্গানাইজ করতেন। আমি একবার আমার দেশ তমলুকে একটা স্টেজ-শো অর্গানাইজ করবার দায়িত্ব দিয়েছিলাম হুয়াদাকে।

নাটক হয়েছিল 'চন্দ্রনাথ'। ওই নাটকে কৈলাস খুড়ো করেছিলেন জহর গাঙ্গুলি, নবকুমার করেছিলেন চন্দ্রনাথ, আর তখনকার দিনের নামকরা নায়িকা দীপিকা দাশ করেছিলেন সরযূ। ওই কম্বিনেশনের মধ্যে আমি জোর করে নৃপতি চট্টোপাধ্যায়কে ঢুকিয়েছিলাম।

রাত ন'টায় শো আরম্ভ। পৌনে ন'টা নাগাদ হুয়াদা বললেন : কই রবিদা, একটা বছর পাঁচ-ছয়েকের ছেলে এনে দাও। চন্দ্রনাথের ছেলে যে করবে।

আমি বললাম : সে কী! আপনার কলকাতা থেকে ছেলে আনেননি?

হুয়াদা বললেন : তাই আবার আনা যায় নাকি। কলকাতা থেকে একটা ছেলে আনতে গেলে তার বাবা-মাকেও সঙ্গে আনতে হয়। অনেক খরচ পড়ে যায়। তুমি এখান থেকে একটা ছেলে জোগাড় করে দাও।

আমি বললাম : এত রাত্রে আমি ছেলে পাব কোথায়? বাচ্চা ছেলেরা তো সব এখন খেয়ে-দেয়ে ঘুমোচ্ছে। এগুলো আগে থেকে বলে রাখবেন তো!

হুয়াদা বললেন : একদম ভুলে গেছি রবিদা। এখন যা হয় একটা ব্যবস্থা করো।

আমার ছেলে শ্রীমান অশোক সেই সন্ধে থেকেই আমার পাশে ঘুর ঘুর করছিল। ওর বয়েস তখন সাত কি আট হবে। তাকে দেখতে পেয়ে হুয়াদা বলে উঠলেন : এই তো, তোমার ছেলেই তো আছে। দাও দাও, ওকেই দাও। মেক্-আপটা করিয়ে দিই।

আমি বললাম : না দাদা, ও কী অভিনয় করবে। ওকে আমি অভিনয় করতে দেব না।

শুনে হুয়াদার দুটো চোখ জ্বলে উঠল। তীব্র কণ্ঠে বললেন : কেন, তাতে ওর জাত যাবে নাকি? অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তুমি মানুষ বলে মনে কর না। তাদের মনে মনে ঘেন্না করো?

আমি বললাম : ও আবার কী কথা! আমি বলতে চাইছিলাম অশোক কি পারবে এত সব নামকরা

শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে।

হয়াদা বললেন : খুব পারবে।

এই বলে অশোকের হাত ধরে·গ্রিনরুমের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলেন : চলো তো বাবা তোমাকে একটু সাজুগুজু করিয়ে দিই।

একটু পরে অশোককে মালকোচা মেরে ধুতি আব পাঞ্জাবি পরিয়ে নিয়ে এলেন হয়াদা। নৃপতিদার পাশে বসিয়ে বললেন : তোমার এই নৃপতিদাদুর পাশে বসো তো বাবা। সিনের সময় তোমাকে ডাকব।

অশোক খুব স্মার্টলি উত্তর দিলে : উনি আমার দাদু হবেন কেন! বাপি ওঁকে দাদা বলে না! উনি তো আমার জ্যেঠু।

শুনে হয়াদা আর নৃপতিদা দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

হয়াদা বললেন : তোমার ছেলে কী বলে গো রবিদা। এ যে দেখছি তোমার ওপরে যাবে।

তা ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেদিন অশোককে নিয়ে কোন প্রবলেম হয়নি। সিন শেষ করার পর দীপিকা দাস এসে বললেন · কী বিচ্ছু ছেলেরে বাবা আপনার! একদম নার্ভাস হল না। আমাদের সঙ্গে সমান তালে অ্যাকটিং করে গেল!

হয়াদা বললেন : তুমি আর কী খেলা দেখিয়েছ রবিদা, তোমার ছেলে তোমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাবে।

সেদিন অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়া মিটে যাবার পর হয়াদা আমার হাতে একটা লম্বা ফর্দ আর কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন : তোমার সব হিসেবপত্তর এতে লেখা আছে। ভালো করে দেখে নিয়ে আমায় ছুটি দাও। কাল ভোরে আবাব ট্রেন ধরতে হবে।

আমি ফর্দটা আর টাকা কটা এক পকেটে পুরে আর এক পকেট থেকে কিছু টাকা বার করে হয়াদাব দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম : শো অর্গানাইজ করতে গিযে আপনি তো একটা রোল পর্যন্ত করলেন না। এই টাকাটা আপনি রাখুন।

হয়াদা রীতিমত ব্যথিত দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন : তুমি একটা নীচ চরিত্রের মানুষ। আমি প্রফেশ্যনাল, সেটা ঠিক কথা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য নিয়ে কি তোমাব শো অর্গানাইজ করতে এসেছি। ভালোবাসার মর্যাদা দিতে তুমি জানো না। ওই টাকা যদি আমায় হাত পেতে নিতে হয় তাহলে এখন থেকে তোমাকে রবিবাবু বলে ডাকব। তুমি কি তাই চাও?

কথাটা শুনে আমার চোখে জল এসে গেল। হয়াদার ওই গাঁট্টাগোট্টা চেহারাটার মধ্যে এত মমতা লুকানো আছে!

অনেকদিন আগেই হয়াদা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আজও যখনই ওঁর সেদিনের সেই কথাগুলি ভাবি, দু'চোখ জলে ভরে যায়।

জহরদা

পটুয়াটোলা লেনের 'অমিয় নিবাস' বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে মির্জাপুর স্ট্রিটের ওপর যে পানের দোকানটা আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে জহরদা, মানে বিখ্যাত কমেডি-অভিনেতা জহর রায় বেশ আয়েস করে একখানা পান খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে ডাক দিলেন : অ্যাই রবি, ইদিকে কোথায় যাচ্ছিস র‍্যা?

জহরদার গলার আওয়াজ পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এ যে মেঘ না চাইতেই জল! আমি তো জহরদার সঙ্গে দেখা করতেই ওঁর অমিয় নিবাস বোর্ডিংয়ে যাচ্ছিলাম। জহরদার প্রশ্নের উত্তরে বললাম : আমি তো তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আসছি। তা তুমি এই ভর দুপুরবেলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছ যে। তোমার মেসের ঘরটায় আজ খুব গরম বুঝি?

জহরদা বললেন : অ্যাই মরেছে! আমার পান খাওয়াটাও নজরে পড়ে গেছে? তাহলে তো আমার হয়েই গেল। এর পরের সংখ্যার 'বহুরূপীর দপ্তরে' হয়তো বেরিয়ে যাবে জহর রায় আদেখলের মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান চিবোচ্ছে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম : আমাদের কাগজের স্পেস এত সস্তা নয় যে তোমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে পান খাওয়াটাও একটা নিউজ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের পত্রিকায় 'বহুরূপীর দপ্তর' তো আমি লিখি না। সেটা লেখে তোমার বন্ধু শৈলেশ দে।

জহরদা বললেন : সে যেই লিখুক, তোদের উল্টোরথের সব্বাইকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। যত সব উল্টোপাল্টা খবর তৈরিতে তোদের জুড়ি নেই। নিউ ক্যাথেতে বসে আমার পান করা নিয়ে যখন তোরা লিখতে পারিস, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার পান খাওয়া নিয়ে যে তোরা লিখবি না তার নিশ্চয়তা কী!

কথাটা সত্যি। গ্র্যান্ড হোটেলের নিচে নিউ ক্যাথে রেস্টুরেন্টে জহরদার একটা মদ্যপানের আড্ডা ছিল। আমাদের উল্টোরথ পত্রিকায় তা নিয়ে একবার কিছু রঙ্গতামাশা করা হয়েছিল। ওই পান পর্ব নিয়ে ভাষার নানারকম কারিকুরি করে কিছু পানিং আর কি। তবে সেটা জহরদার দোষ ধরার জন্যে নয়। মদ্যপানের পর জহরদা কীরকম মুক্ত মনের মানুষ হয়ে যান, কত সুন্দর সুন্দর তামাশা করেন, সেইসব আলোচনাই ছিল লেখাটার মধ্যে। জহরদা তো আর বাইরে সতীপনা দেখিয়ে আড়ালে ঢুক ঢুক মদ্যপান করতেন না। যা করতেন, বুক ফুলিয়েই করতেন। যা বলতেন, সোজাসুজি সামনাসামনি বলতেন। এটা ছিল জহরদার চরিত্রের একটা মস্ত গুণ। যে কারণে আমরা সবাই ওঁকে ভয়ানক ভালোবাসতাম।

এই মদ্যপানের আসরে বসেই জহরদা তাঁর কত বিখ্যাত কমিক-স্কেচের যে জন্ম দিয়েছিলেন তা কী বলব। তাঁর বিখ্যাত স্কেচ 'টাঙাওয়ালা', কিংবা 'ন্যাপাসুর বধ' এইরকম মদ্যপানের আসরে বসেই মুখে মুখে তৈরি করেছিলেন। পরে সুস্থ মস্তিষ্কে সেইসব স্কেচগুলিকে ইমপ্রোভাইজ করছেন। কিন্তু মূল আইডিয়াটা জন্ম নিয়েছিল পানপর্বের সময়েই।

কাজেই জহরদার মদ খাওয়াটাকে আমরা কোনওদিনই দোষ হিসেবে ধরতাম না। তবে অতিরিক্ত পানের পর যেদিন বে-আব্রু হয়ে যেতেন, সেদিনকার কথা স্বতন্ত্র। সেদিন জহরদাকে সামলাতে আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যেত। তবে এরকম ঘটনা জহরদার জীবনে খুব কালেভদ্রেই ঘটত।

তা যে কথা বলছিলাম। আমাদের উল্টোরথ পত্রিকার ওপর একপ্রস্থ ঝাল ঝেড়ে জহরদা ফুটপাথের ধারে সরে গিয়ে পিচ করে পানের পিক ফেললেন। তারপর পকেট থেকে রুমালটা বার করে মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করলেন : আমার কাছে যাচ্ছিলি কেন? কিছু দরকার ছিল?

আমি বললাম : হ্যাঁ। একটা ফাংশানের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতাম।

শুনে জহরদা বললেন : অ্যাই মরেছে। তোর আবার ফাংশান কিসের? দ্যাখ না, একটা ফাংশানের

ঠ্যালায় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আছি।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম : ফাংশানের ঠ্যালায় রাস্তায়! সেটা আবার কী ব্যাপার?

জহরদা বললেন : আর বলিস কেন! আজ তিনটে ফাংশান আছে। প্রথমটা গোবরডাঙায়। গোবরডাঙার পার্টি বলেছিল তিনটের সময় গাড়ি নিয়ে আসবে। তা এখন চারটে বাজতে চলল, তাদের দেখা নেই। পরের পার্টিকে গোবরডাঙায় গাড়ি নিয়ে আসতে বলেছি সাড়ে সাতটায়। তা এরা যদি আসতেই এত দেরি করে তাহলে ওদের প্রোগ্রাম সেরে আটটার মধ্যে বেরুব কী করে। যেতে তো ঘণ্টা তিনেক লাগবেই। ওদের জন্যেই রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আছি। গাড়িটা এলেই টপাক করে উঠে পড়ব। তা তোর ফাংশানটা কবে রে?

আমি মাসখানেক পরের একটা ডেট বললাম। তা শুনে জহরদা বললেন : আমার ডাইরিটা তো সঙ্গে নেই। কাল সকালে একবার বোর্ডিং-এ আসিস। ডাইরিটা দেখে ডেটটা কনফার্ম করব। তা তোর ফাংশানটা কোথায়? নর্থ ক্যালকাতায় না সাউথ ক্যালকাটায়?

আমি বললাম : নর্থ সাউথ কোনও ক্যালকাটাতেই নয়। একেবারে সাউথ বেঙ্গলে। আমার দেশ তমলুকে।

জহরদা বললেন : ওরে ব্বাবা। সে তো অনেক দূর রে! গাড়িতে করে নিয়ে যাবি তো?

আমি বললাম : পাগল হয়েছ! গাড়ি করার রেস্ত কোথায়? ট্রেনে যাব মেচেদা পর্যন্ত। সেখান থেকে বাসে তমলুক। বাস থেকে নেমে রিক্‌শা করে আবাসবাড়িতে মাতঙ্গিনী হাজরার স্তম্ভের পাশে একটা বাড়িতে। তবে অনুষ্ঠানটা হবে একটা সিনেমা হাউসে। রূপশ্রী সিনেমায়।

জহরদা বললেন : ট্রেনে যাওয়ার বড় ঝামেলা যে রে! আমাকে দেখলেই পাবলিক এমন খ্যা খ্যা করে দাঁত বার করে হাসে যে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। আমি যেন একটা হাসির লাড্ডু! ট্রেনে যদি যেতেই হয় তাহলে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট করিস। তবু খানিকটা নিরিবিলি পাওয়া যাবে।

আমি বললাম : জহরদা, তোমার মাথাটা দেখছি একদম খারাপ হয়ে গেছে! ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়াই যদি জোগাড় করতে পারব, তাহলে তার সঙ্গে আর কিছু দিয়ে একটা গাড়িই তো ভাড়া করতে পারতাম। আমরা ইন্টার ক্লাসে যাব। আমাদের তিন-চারটে ছেলে আগে ট্রেনে উঠে সিট দখল করে রাখবে। তোমরা বসেই যেতে পারবে। তাছাড়া লোকাল ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসের আলাদা কোনও ইজ্জত নেই। যে যেখানে পারে উঠে পড়ে। এমন কি উইদাউট টিকিটে যারা যায় তারাও ফার্স্ট ক্লাসে ওঠে। মাত্র দু ঘণ্টার তো রাস্তা। দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।

জহরদা বললেন : বেশ বাঁশটি দিলি যা হোক। তা আর কে কে যাচ্ছে রে?

আমি বললাম : হাওড়া থেকে যাচ্ছে আমার বন্ধু বিনয় অধিকারী আর তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে বিশ্বশ্রী মনতোষ রায় আর তাঁর গ্রুপ। ওরা মাসল-টাস্‌লের খেলা দেখাবে, দাঁত দিয়ে লোহার রড বাঁকাবে। কমিকের জন্য তুমি। আর গান গাইবে উৎপলা সেনের দিদি সাবিত্রী ঘোষ, যার সেই বিখ্যাত গান 'কাঙালের অশ্রুতে যে রক্ত ঝরে'। আর যাচ্ছে অপরেশদা, মানে অপরেশ লাহিড়ি, বাঁশরী লাহিড়ি আর ওদের ছ'বছরের বাচ্চা ছেলে বাপি। বাপি তবলা বাজাবে।

জহরদা বললেন : সে কী রে। ছ'বছরের ছেলে তবলা বাজাবে কী রে! তার তো তবলার মাথায় হাতই পৌঁছোবে না!

আমি বললাম : না গো জহরদা! বাপির তবলা আমি শুনেছি। দারুণ তবলা বাজায়। তেহাইয়ের মাথায় অপরেশদা পাশে বসে ওর কোমরটা একটু উঁচু করে তুলে ধরেন। তবে বেশিক্ষণ একটানা বাজাতে পারে না। বড় জোর মিনিট পাঁচ-সাত।

জহরদা বললেন : তাহলে তো ওর তবলা শুনতেই হবে। তবে এইসব ইয়াং ট্যালেন্টদের ভাগ্যে কী ঘটে জানিস! তোদের মতো ফচকে সাংবাদিকরা এদের পাবলিসিটি দিয়ে দিয়ে এমন মাথায় তুলে দেয় যে আলটিমেটলি এরা গেঁজে যায়। অপরেশদাকে বলতে হবে ছেলেটার ওপর কেয়ার নিতে। যাতে তোরা ওর মাথাটা ঘোরাতে না পারিস।

আমি বললাম : সব কথায় আমাকে এমন করে টানো কেন বলো দেখি জহরদা? তুমি দেখছি আমাকে একদম ভালোবাস না।

জহরদা বললেন : তুই যা মাল তাতে ভালো না বেসে উপায় আছে! তোকে যদি ভালো না বাসতাম তাহলে কারও বাবার ক্ষমতা ছিল না আমাকে ট্রেনের ইন্টার ক্লাসে নিয়ে যায়! অন্যান্য ফাংশান-পার্টিদের জিগ্যেস করিস তাদের কাছে জহর রায়ের কী রোয়াব?

আমি বললাম : তা আর জানি না। একে তো তুমি একজন গ্রেট কমেডিয়ান, তার ওপর আবার ফিল্ম স্টার। তোমার রোয়াব হবে না তো কার হবে!

জহরদা বললেন : ওসব আমড়াগাছির কথা ছাড় দিকি! এখন টাকা-পয়সা কীরকম কি দিবি-থুবি বল। তুই যখন রোদে রোদে তেতেপুড়ে ঘামতে ঘামতে এসেছিস তখন এ ফাংশানটা যে 'খেপ' নয়, সেটা বুঝতে পারছি। বাকি রইল 'সংক্ষেপ' আর 'আক্ষেপ'। এর মধ্যে কোন্‌টা ভেবে এসেছিস?

এই 'খেপ', 'সংক্ষেপ' আর 'আক্ষেপ' হল ফাংশান-জগতের কোড ল্যাংগোয়েজ। 'খেপ' হল ভালো টাকার কনট্রাক্ট। 'সংক্ষেপ' হল কিছুটা কম টাকা, অনুরোধ উপরোধে যা গিলতে হয়। আর 'আক্ষেপ'-এর অর্থ হল একটি পয়সাও নয়। যেমন পাড়ার মাস্তানরা কোনও ফাংশান করলে সেটা আক্ষেপের পর্যায়ে পড়ে। অথবা শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে কোনও অনুরোধ এলে সেটাও 'আক্ষেপ'।

তা জহরদার কথার উত্তরে আমি বললাম : আমার এটা ঠিক 'সংক্ষেপ' নয়, আবার 'আক্ষেপ'ও নয়। ওই সংক্ষেপ আর আক্ষেপের মাঝামাঝি। তার মানে আমি হাতে তুলে যা দেব তাই নিতে হবে।

জহরদা বললেন : অগত্যা। পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। কিন্তু তোর ফাংশানে যে অনেক লোক হয়ে যাবে রে! তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে ফাংশান ম্যানেজ করবি কী করে? রাত দুপুর পর্যন্ত ফাংশান চালাবি নাকি? আমি কিন্তু বেশি রাত পর্যন্ত জাগতে পারব না তা বলে দিচ্ছি।

আমি বললাম : না না, বেশি রাত হবে কেন! ভয় ওই মনতোষবাবুদের গ্রুপটাকে নিয়ে। অন্যান্য জায়গায় ওঁরা একাই দু আড়াই ঘণ্টা নিয়ে নেন। আমার ওখানে ওঁদের এক ঘণ্টার মধ্যে সেরে নিতে বলেছি। তবে জহরদা, তোমার প্রোগ্রাম কিন্তু একেবারে লাস্টে দেব। তুমি হলে আমাদের ফাংশানের মেইন্‌ অ্যাট্রাকশান। তোমার প্রোগ্রাম আগে হয়ে গেলে তারপর আর গান শোনার জন্যে কেউ বসে থাকবে না। হল্‌ ফাঁকা হয়ে যাবে একেবারে।

জহরদা বললেন : তা দিস্‌খন। রাতটা তো তোদের ওখানেই কাটাতে হবে।

তারপর ইঙ্গিতে হাতের ইশারায় জানতে চাইলেন . ওটার ব্যবস্থা থাকবে তো?

আমি বললাম : চলো তো আগে, তারপর দেখা যাবে। আমি কাল সকালে বোর্ডিং-এ এসে ডেট্‌টা কনফার্ম করে যাব। তুমি যেন শেষ পর্যন্ত আমায় ডুবিওনা জহরদা। তুমি ফেল করলে আমার কিন্তু বদনাম হয়ে যাবে তমলুকে।

এবারে জহরদা আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। বেশ রাগত কণ্ঠেই বললেন : দ্যাখ রবি, নেহাত শয্যাশায়ী হয়ে না পড়লে আমি ফাংশান মিস্‌ করি না কখনও। ফাংশান আমার কাছে পুজোর মতোই পবিত্র জিনিস। আজ না হয় আমার নাম-ধাম হয়েছে, ছবির পর ছবি করছি, নাটকের পর নাটক করছি। দু-পয়সা ঘরে আসছে। কিন্তু তার আগে এই ফাংশানই আমার অন্ন জুগিয়েছে। আমার বৌয়ের মুখের ভাত, আমার বাচ্চাদের মুখে দু-টুকরো মাখন, আর আমার মুখে এক পাত্তর মদ এই ফাংশানই জুগিয়েছে। ফাংশান আমার লক্ষ্মী। তাকে অবহেলা করলে ধম্মে সইবে না যে রে!

জহরদার মুখের কথা শেষ হতে না হতে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ফুটপাথের গা ঘেঁষে। গাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে দুটো ছেলে নেমে এল। তারা হাত-মুখ নেড়ে জহরদাকে কী যেন বলতে গেল। কিন্তু জহরদা তাদের কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। ছেলে দুটো সামনের সিটে। বোঝা গেল জহরদার গোবরডাঙার ফাংশান পার্টি এসে গেছে।

গাড়ি স্টার্ট নেবার মুহূর্তে জহরদা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন : কাল সকালে মেসে আসিস। ডেটটা কনফার্ম করে দেব। তাছাড়া সমারসেট মমের একসেট নতুন বই কিনেছি, সেগুলো তোকে দেখাব।

জহরদার কথা শেষ হতেই গাড়িটা একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এই যে নতুন বই কেনার কথা জহরদা বললেন, এটা জহরদার নেশা। শুধু কেনাই নয়, প্রতিটি বই মনযোগ দিয়ে পড়েন। বোর্ডিং-এর দুখানা ঘর জুড়ে জহরদার বইয়ের আলমারিগুলো দেখার মতো। বিভিন্ন সাবজেক্টের ওপর কত বই যে সেখানে আছে! ১৯৭৭ সালে জহরদার মৃত্যুর এত বছর পরেও সে সব বই যত্ন করে কমলাবৌদি রেখে দিয়েছেন জহরদার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। তবে আগে দুটি ঘর জুড়ে যত আলমারি ছিল বৌদি এখন সেগুলি একটি ঘরে স্থানান্তরিত করেছেন। ঘর দুটো জোড়া করে রাখায় বোর্ডিং-এর মালিকের অবশ্য আপত্তি ছিল না। তাঁর 'অমিয় নিবাস'-এর এই যে এত খ্যাতি, এত পরিচিতি, সবই জহরদার দৌলতে। সুতরাং জহরদার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু বৌদি ভেবে দেখলেন যে দুখানা ঘর দখল করে থাকলে বোর্ডিং-এর মালিকের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। তাই বৌদি স্বেচ্ছায় একটি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন।

জহরদার এই যে বইয়ের প্রতি ভালোবাসা, বই পড়াব প্রবণতা, এর পিছনে অন্য কারণ আছে বলে আমার ধারণা। সংসারের দায়-দায়িত্বের চাপে জীবনে তিনি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাননি। পাটনার কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরই তাঁকে মাত্র কুড়ি টাকা মাইনেতে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রুফ রিডারের চাকরি নিতে হয়েছিল সংসারের অভাবের কারণে। পরবর্তীকালে যখন হাতে পয়সা এসেছে, তখন একের পর এক বই কিনে সেসব পড়ে নিজের পঠনতৃষ্ণা মিটিয়েছেন।

জহরদা মাঝে মাঝেই বলতেন : শিল্পীদের পক্ষে সাহিত্যপাঠ খুব জরুরি ব্যাপার। সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় কতরকম চরিত্র আঁকেন। পড়ে পড়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের সময় সেইসব চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাতে হয়। দেশি হোক আর বিদেশি হোক সব সাহিত্যিকের লেখা বইই শিল্পীদের পড়া উচিত।

আমি একবার জহরদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আচ্ছা জহরদা, এই যে আপনার বই পড়ার নেশা, এটা কোথা থেকে জন্মাল?

জহরদা বলেছিলেন : নেশাটা ধরিয়েছিলেন অহীনবাবা। মানে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরি। আমরা সবাই ওঁকে অহীনবাবা বলে ডাকতাম। ওঁর ছিল প্রচণ্ড বই পড়ার নেশা। তুই কোনওদিন ওঁর গোপালনগরের বাড়িতে গেছিস? ওঁর বইয়ের কালেকশান দেখেছিস?

আমি বললাম : হ্যাঁ, দেখেছি তো। বিরাট লাইব্রেরি করেছেন। অসম্ভব ভালো কালেকশান ওঁর। হেন সাবজেক্ট নেই, যার ওপর লেখা বই ওঁর লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে না। তবে একখানা বইও উনি হাতছাড়া করেন না কখনও। দেখতে চাও দেখো, দু-চার পাতা উল্টে পড়তেও পারো, কিন্তু যদি বলো একখানা বই দিন, বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়ব, তাহলে উনি বই তো দেবেনই না, উল্টে ওই বাড়ির দরজা তার জন্যে চিরকালের মতো বন্ধ। বইয়ের ব্যাপারে উনি ভয়ানক সতর্ক।

জহরদা বললেন : তাহলেই দ্যাখ, বইকে উনি কত ভালোবাসতেন। বই হল ওঁর প্রাণ। সেই অহীনবাবা আমাকে বলতেন, জহর, বই পড়ো, বই পড়ো। যে লাইনে এসেছ সেখানে পৃথিবীর অন্য দরজাগুলো তোমার জন্যে বন্ধ। কিন্তু বই পড়া তো তোমার কেউ আটকাতে পারবে না। বই পড়তে পড়তে দেখবে পৃথিবীর অন্য সব বন্ধ দরজাগুলো তোমার সামনে খুলে গেছে।

আমি বললাম : তাহলে অহীনবাবুর উপদেশেই আপনি বই পড়া ধরেছিলেন?

জহরদা বললেন : খানিকটা তাই বটে। তবে আমার নিজেরও ভেতর থেকে একটা তাগিদ ছিল। বেশি লেখাপড়া শেখার সুযোগ তো পাইনি। সংসারের জোয়াল তার আগেই কাঁধে চেপে গেল। তাই নিয়ে মনে আক্ষেপ ছিল, দুঃখ ছিল। সেই দুঃখ ভোলোবার জন্যে বই পড়ার তাগিদটা আরও বেশি করে অনুভব করতাম।

আমি বললাম : তার জন্যে প্রতি মাসে এত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে বই কেনার দরকারটা কী? যে কোনও লাইব্রেরির মেম্বার হয়ে গেলেই তো তুমি তোমার ইচ্ছে মতো বই পড়তে পারতে?

জহরদা বললেন : এই যে বই কিনি, এটাও অহীনবাবার উপদেশে। এমনিতে অহীনবাবা ছিলেন খুব গম্ভীর, ভারিক্কি ধরনের মানুষ। তবে মাঝে মাঝে তিনি আমাদের মতো জুনিয়ারদের সঙ্গেও

রঙ্গরসিকতা করতেন। অহীনবাবা বলতেন, বই আর বউ দুটোকেই সর্বদা নিজের তাঁবে রাখবে। কখনও কাছছাড়া করবে না। পুরোপুরি মালিক না হতে পারলে তৃপ্তি আসবে না। তোমার বউয়ের যেমন তুমি মালিক, তোমার নির্দেশেই তিনি নিযন্ত্রিত হবেন, তোমার বইও তেমনি। সর্বদা নিজের হাতের কাছে থাকবে, নিজের আলমারিতে থাকবে। ইচ্ছেমতো পড়বে। পড়তে পড়তে ভালো না লাগলে আর একটা বই ধরবে। তা তুমি যদি বাপু বই না কেনো তাহলে তার মালিকটি হতে পারছ কী করে? তাই বই কেনাটা জরুরি। দরকার হলে নিজে আধপেটা খেয়ে থাকবে, কিন্তু বইটি কেনা চাইই। এমন এমন বই আছে যা তোমার খিদে-তেষ্টা সব মিটিয়ে দেবে।

আমি বললাম : অহীনবাবুর উপদেশ মতোই তুমি তাহলে বই কেনা ধরলে।

জহরদা বললেন : ঠিক তাই। আগে লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে পড়তাম। কিন্তু বই কিনতে শুরু করাব পব দেখতে পেলাম, আমার পড়ার নেশাটা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। সত্যিই বই আমার খিদে-তেষ্টা ভুলিয়ে দিত। কতদিন এমন হয়েছে, রাত দশটার পর একটা বই খুলে বসেছি, তারপর সেই বইয়ের মধ্যে এমন মজে গেছি যে ঘড়িতে রাত দুটোর ঘণ্টা শুনে হুঁশ ফিরে এল। তখন আর খাবার ইচ্ছেই করত না। দু-খানা বিস্কুট আর এক গ্লাস জল খেয়ে কাটিয়ে দিতাম রাতটা। তবে আমার খিদেটা আবার একটু বেশি তো? সকালবেলা উঠে বেশ করে চর্বচোষ্য খেয়ে নিতাম।

কথাগুলো বলতে বলতে জহরদা থেমে গেলেন। বোধহয় তাঁর অতীন জীবনে এক পলকের জন্যে ফিরে গেলেন। তারপর বললেন : প্রথম প্রথম যা রোজগার করতাম তাতে সংসারের খরচ চালানোই দুর্ঘট ছিল, তা বই কিনব কী। তবু তার মধ্যে থেকেই একটি দুটি করে বই কিনেছি। কেনা বইটা হাতে নিয়ে বুকটা ফুলে উঠত। এটা আমাব বই। আমিই এর মালিক। নতুন বইয়ের একটা চমৎকার গন্ধ থাকে তো। প্রাণভরে সেই গন্ধ নাকে নিতাম। সাবা বুকটা তৃপ্তিতে ভরে যেত। কত কষ্ট করে, সাংসারকে বঞ্চিত করে টাকা দিয়ে বই কিনতে হয়েছে, সে কথাটা আমাকে ভুলিয়ে দিত নতুন বইয়ের গন্ধ।

জহরদার ওই নতুন বইয়ের গন্ধ শোঁকার অভ্যাসটা আর কোনওদিনই যায়নি। আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, গল্প করছেন হয়তো, কিন্তু তারই মাঝখানে দেখতাম একখানা বই নাকের কাছে ধরে মাঝে মাঝে আঘ্রাণ নিচ্ছেন।

জহরদাকে যেমন অত্যন্ত কষ্ট করে করে একটি একটি করে বই কিনতে হয়েছে, তেমন সারাজীবন সংগ্রাম করে করে জীবনের একটি একটি করে ধাপ এগোতে হয়েছে। সেই সংগ্রামের স্বরূপটি জানতে হলে ফিরে যেতে হবে জহরদার প্রথম জীবনে।

অভিনেতা জহর রায়ের জন্ম পূর্ববঙ্গের বরিশালে। ১৯১৯ সালে। কিন্তু জহরদা গড়গড়িয়ে বাঙাল ভাষা বলতে পারতেন না। আমরা তাই নিয়ে হাসাহাসি করতাম। বলতাম : জহরদা, তুমি তোমার মাতৃভাষাটাও তো ঠিক ঠিক বলতে পারো না।

শুনে জহরদা হাসতেন। বলতেন : সেটা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে রে। আমি গড়গড়িয়ে বাঙাল ভাষা বলতে পারলে ভানুর ভাত মারা যেত। ওকে আর করে খেতে হত না।

ভানু অর্থে বিখ্যাত কমেডি অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বাঙাল ভাষার অভিনয়ে তিনি ছিলেন স্পেশ্যালিস্ট। অথচ পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও অঞ্চলের কথ্য ভাষায় ভানুদার অনায়াস দখল ছিল।

এই জহরদা আর ভানুদার মধ্যে ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। দুজনেই কমেডি-অভিনয় করতেন, কিন্তু ওঁদের মধ্যে কোনওরকম প্রফেশ্যনাল জেলাসি কোনদিন দেখিনি। সামনাসামনি হলে দুজনের মধ্যে কথার মারপ্যাচ কিছু কিছু চলত বটে। যাকে বলে লেগপুলিং আর কি। কিন্তু দুজনেরই ছিল নির্মলহৃদয়।

ষাটের দশকে পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় ভানুদা আর জহরদাকে নিয়ে লরেল-হার্ডির আদলে একটি কমেডি ছবি করেছিলেন। ছবির নাম 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট'। ওই ছবির সেটে গিয়ে দেখেছি দুজনেই কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে ছবিটা কী করে রসোত্তীর্ণ করে তোলা যায় তার চিন্তা করছেন। ভানুদার কমেডি ছিল তাঁর বাচনভঙ্গির মধ্যে, এক্সপ্রেশনের মধ্যে। আর জহরদার কমেডি ছিল তাঁর শারীরিক কসরতের মধ্যে, কথার পানিং-এর মধ্যে। সেটে দাঁড়িয়ে দুজনে দুজনকে সেগুলি প্রদর্শনের

সুযোগ করে দিচ্ছেন। কেউ আগ বাড়িয়ে নিজেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার কোনও অন্যায় সুযোগ নিচ্ছেন না। এমনই ছিল ওঁদের শিল্পীর প্রতি ভালোবাসা। শিল্পের প্রতি ভালোবাসা।

ভানুদা আর জহরদা যে কোনদিন প্রফেশ্যনাল জেলাসিতে ভোগেননি, সে সম্পর্কে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই।

১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে জহরদা মারা যাবার পর আকাশবাণী কলকাতার অন্যতম প্রযোজক জগন্নাথ বসু-র (যিনি কলকাতা দূরদর্শনের অন্যতম এ এস ডি) ইচ্ছে হল জহরদাকে নিয়ে একটি স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান করার। তার জন্যে স্টেশন ডিরেক্টরের অনুমোদন প্রয়োজন। উনি তখন যিনি আকাশবাণীর কেন্দ্র অধিকর্তা ছিলেন, তাঁর কাছে প্রস্তাবটা পেশ করলেন।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করলেন প্রস্তাবটা শুনে। মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন, একজন কমেডিয়ানকে নিয়ে স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান সঙ্গত হবে কি? এসব অনুষ্ঠান তো সাধারণত বিখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই হয়। জগন্নাথবাবু তখন তাঁকে বোঝালেন যে জহর রায়ও অভিনেতা হিসেবে খুবই বিখ্যাত। উনি, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবি ঘোষ তিনজনে মিলে বাংলা ছবি কিংবা নাটকের কমেডির নামে ভাঁড়ামোকে শিল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছেন। যে কারণে সত্যজিৎ রায়ের মতন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকারও তাঁর 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে বিরাট বড় একটি দুরূহ চরিত্রে জহর রায়কে দিযে অভিনয় করিয়েছেন। এবং জহর রায় তাঁর প্রতি ন্যস্ত বিশ্বাসের ষোল আনা মর্যাদা রেখেছেন।

সব শুনে স্টেশন ডিরেক্টার মশাই সম্মতি দিলেন স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের। সেই সঙ্গে প্রশ্ন রাখলেন: স্মৃতিচারণ করবেন কে?

জগন্নাথবাবু বললেন : জহর রায়ের স্মৃতিচারণ করার উপযুক্ত ব্যক্তি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আব কে হতে পারেন!

অতএব যোগাযোগ করা হল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ভানুদা রাজিও হলেন। আকাশবাণীর স্টুডিওতে বসলেন স্মৃতিচারণ করবার জন্যে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

অনেক কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত সেদিন ভানুদাকে দিয়ে জহব রায়ের স্মৃতিচারণ প্রচার করা সম্ভব হয়েছিল তাঁর সেই কান্নার আবেগকে প্রশমিত করে। কিন্তু ভানুদার ওই চোখের জল সেদিন প্রকাশ করে দিয়েছিল বাংলা ছবির শিল্পীদের পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতার চেহারাটা। বাংলা ছবির শিল্পীদের মধ্যে এখনও সেই জিনিসটা আছে। তার প্রমাণ আমরা দূরদর্শনের দু-একটি স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ করেছি। মানুষ এখনও পাষাণ হয়ে যায়নি।

অথচ বাজারে কত রকম গুজব চালু ছিল যে ভানু আর জহর নাকি পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পারে না। এসব কথা দিয়ে ভানুদা আর জহরদাকে আলাদা করে প্রশ্ন করলে বড় বিচিত্র রকমের উত্তর পেতাম। ভানুদা বলতেন : লোকের কথায় কী আসে যায় কও। আমি কী সেটা জহর ভালো কইরাই জানে, আর জহর কী সেটা আমিও জানি।

তারপর ছাপার অযোগ্য একটি খিস্তি করে বলতেন : ওসব অমুক জায়গার কথা অমুক জায়গায় ফালাইয়া দাও তো।

আর জহরদাকে প্রশ্ন করলে আরও বিচিত্র উত্তর পেতাম। উনি বলতেন : যারা ওইসব কথা রটাচ্ছে তাদের মুখের মতো জবাব দেবার জন্যে একবার বাথরুমে যাবার দরকার। মানেটা বুঝতে পারলি তো? তাদের কথার উত্তর ওইখানে দাঁড়িয়েই দিতে হয়।

এইসব কথাবার্তা শুনলেই বুঝতে পারা যেত ভানুদা আর জহরদার পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা কত গভীর ছিল।

আমার ধারণা ছিল জহরদার অভিনয়স্পৃহাটা তাঁর বাবার কাছ থেকেই এসেছিল। কিন্তু জহরদাই একদিন কথায় কথায় সে ভুলটা ভেঙে দিলেন।

জহরদার বাবা সতু রায় এককালে অভিনয়জগতের মানুষ ছিলেন। বাংলা নির্বাক ছবির যুগে তিনি ধীরেন গাঙ্গুলি (ডি জি) পরিচালিত 'ফ্লেমস্ অব ফ্লেশ', দেবকী বসু পরিচালিত 'পঞ্চশর' ইত্যাদি ছবিতে

অভিনয় করেছেন। তাঁর আধখানা জীবন ছবি আর নাটক করেই কেটেছে। কিন্তু সংসারের চাপে তিনি পুরোপুরি অভিনয়ে আত্মনিয়োগ করতে পারেননি।

জহরদা বলতেন : বাবা তো আর আমার মতো কমেডি অভিনয় কবতেন না। তিনি সিরিয়াস টাইপের চরিত্রে অভিনয় করতেন। তিনি খুব একটা খারাপ অভিনেতা ছিলেন না। কিন্তু সংসার সংসার করেই তাঁর অভিনয়ের প্রতিভাটা চাপা পড়ে গেল। আমি যে এই অভিনয় করছি তার প্রেরণাটা বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি বটে, কিন্তু আমার অভিনয়ের গুরু তিনি নন।

আমি বললাম : তাহলে কে? কার কাছে অভিনয় শিখেছ তুমি।

জহরদা বললেন : একজন সাহেবের কাছে।

আমি বললাম : বল কী জহরদা! সাহেবের কাছে! তা আমাদের দেশে তো সাহেব অভিনয়শিক্ষক এক ডিরোজিও ছাড়া আর কারও নাম শুনিনি। তুমি কি সেই ডিরোজিওর আমলের লোক নাকি?

জহরদা বললেন : কেন ডিরোজিও ছাড়া তোর আর কোনও সাহেবের নাম মনে পড়ছে না, যার কাছ থেকে অভিনয় শেখা যায়?

আমি খানিকক্ষণ আকাশ-পাতাল ভেবে উত্তর দিলাম : কই, আর কারও নাম তো মনে পড়ছে না।

জহরদা বললেন : আমি যাঁর কাছে অভিনয় শিখেছি তাঁর নাম চার্লস চ্যাপলিন। তিনিই আমার গুরু। আমি তাঁর একলব্য শিষ্য।

এতক্ষণে আমার ধড়ে প্রাণ এল। বললাম : তাই বলো! তুমি চার্লি চ্যাপলিনের ছবি দেখে দেখে অভিনয় শিখেছ!

জহরদা বললেন : শিখেছি মানে! পাগলের মতো চ্যাপলিনের ছবি দেখতাম। এক একটা ছবি আটবার দশবার করে। তাঁর অভিনয়ের প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি মুভমেন্ট গুলে গুলে খেতাম। আর ওই চ্যাপলিনকে ভাঙিয়েই তো প্রথম ছবিতে অভিনয়ের চান্স পেয়েছিলাম। তুই আমার প্রথম ছবি 'পূর্বরাগ' দেখিসনি?

আমি বললাম : কেন দেখব না। ওটা তো ছিল অর্ধেন্দুদা, মানে অর্ধেন্দু মুখার্জির ছবি। সে তো সেই ১৯৪৭ সালে। রূপবাণী সিনেমায় রিলিজ করেছিল।

জহরদা বললেন : হ্যাঁ, ওই 'পূর্বরাগ'-ই আমার প্রথম ছবি। তার আগে পাটনায় অ্যামেচার থিয়েটারে কিছু অভিনয় করেছি। বাবা চাকরি উপলক্ষে পাটনায় চলে যাবার পর ওখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করলেন। আমিও ম্যাট্রিক পাস করে পাটনার বি এন কলেজে ভর্তি হলাম। ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম। তারপর সংসারের চাপে বি এ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি নিতে হল। প্রথমে পাটনা ইউনিভার্সিটিতে প্রুফ রিডারের চাকরি। তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালসের মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। সবশেষে দিলাম একটা দর্জির দোকান।

আমি বললাম : তার মানে তুমি সেলাই মেশিনও চালাতে পারো?

জহরদা বললেন : পারি বৈকি। নিজের হাতে শার্ট-প্যান্ট কাটতেও পারি। এক মুসলমান দর্জির কাছে হাতে-কলমে কাজও শিখেছি।

আমি বললাম : দর্জির দোকান থেকে সিনেমা-থিয়েটারে অভিনয়। ভারি ইন্টারেস্টিং তো!

জহরদা বললেন : দর্জির দোকানটা বেশ ভালোই চলছিল রে। দু-পয়সা হাতেও আসছিল। কিন্তু সব গোলমাল করে দিলেন ওই চ্যাপলিন সাহেব। একে তো বাবার সূত্রে অভিনয়ের ব্যাপারটা রক্তের মধ্যে ছিল। সেটা মাঝে মাঝে ধাক্কা মারছিল। বিভিন্ন অ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় করে দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছিলাম। কিন্তু চ্যাপলিনের ছবি দেখার পর মনে হল সিনেমায় অভিনয় করতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। তো ভেবে দেখলাম এই ছাতুর দেশে বসে তো আর সিনেমায় অভিনয় করা যাবে না। তাই একদিন দোকান-টোকান তুলে দিয়ে কলকাতা চলে এলাম।

আমি বললাম : অমন চালু দোকানটা তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে এলে সিনেমায় অভিনয় করতে? ভাগ্যক্রমে সিনেমায় চান্স পেয়ে গিয়েছিলে তাই। নাও তো পেতে পারতে। ওরকম রিস্ক কেউ নেয়। বিশেষ করে সিনেমা লাইনে যখন চেনাশোনা কেউ নেই।

জহরদা বললেন : একদম চেনাশোনা ছিল না তা নয়। কালাচাঁদদার সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল।

আমি বললাম · কালাচাঁদদাটি আবার কে? সিনেমার লাইনে তো ওই নামে কেউ আছেন বলে কখনও শুনিনি।

জহরদা বললেন . কালাচাঁদদার নাম শুনিসনি? অর্ধেন্দুদা রে! অর্ধেন্দু মুখার্জি। ওঁর ডাকনাম কালাচাঁদ। কালাচাঁদদাও আমাদের বিহারের লোক। ভাগলপুরের। ১৯৪৪ সালে কালাচাঁদদা একবার পাটনায় গিয়েছিলেন থিয়েটাব করতে। সেই সময়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওঁকে বলেছিলাম সিনেমায় একটা চান্সেব কথা। তা উনি বলেছিলেন, এখান থেকে কী করে চান্স দেব তোমাকে। কলকাতায় এলে চেষ্টা কবে দেখতে পারি। তা বলে যেন হুট করে কলকাতা চলে যেও না। গেলেই যে চান্স পেয়ে যাবে তার কোন স্থিরতা নেই। কলকাতায় থাকতে হয়, ঘোরাঘুরি করতে হয়, তারপরে একদিন হয়তো বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। চান্স না পাবার সম্ভাবনাটাই বেশি।

আমি বললাম · অর্ধেন্দুদা তো ঠিক কথাই বলেছিলেন। তার পরও তুমি রিস্ক নিলে কী বলে?

জহরদা বললেন · নিজেকে যে আর সামলাতে পারছিলাম না রে! তাইতো একদিন দোকান-টোকান তুলে সামান্য কিছু পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার উদ্দেশে। আমার পরিচিত একজন কলকাতায় বিয়ে করতে আসছিল। তাদেরই বরযাত্রীর দলে ভিড়ে গেলাম। পাটনা টু ক্যালকাটা রেলভাড়াটা বেঁচে গেল।

আমি বললাম : তারপর?

জহরদা বললেন তারপর খুঁজে খুঁজে কালাচাঁদদাকে ধবলাম। চ্যাপলিনের 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটার' ছবির একটা দৃশ্য অ্যাকটিং করে দেখালাম। সেটা দেখে কালাচাঁদদার খুব ভালো লেগে গেল। তিনি তখন 'পূর্বরাগ' ছবি তোলার তোড়জোড় করছিলেন। তাতে একটা চান্স পেয়ে গেলাম। কালাচাঁদদা তাঁব ছবিতেও গ্রেট ডিক্টেটারের ওই অংশটা একটুখানি রেখেছিলেন।

আমি বললাম : হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে। 'পূর্বরাগ' ছবিতে ওইরকম একটা দৃশ্য ছিল বটে। তবে তোমার ওই ছবির একটা ডায়লগ আমার এখনও মনে আছে।

জহরদা জিজ্ঞাসা করলেন : কোন ডায়লগটা বল দিকি।

আমি বললাম : সেই যে একটা দৃশ্যে প্রাকৃতিক বর্ণনা দিতে গিয়ে তুমি বলছো 'ফুর ফুর করে একটা নারকেল গাছ আকাশের দিকে উঠে গেছে'—ওই ডায়লগটা। নারকেল গাছ সম্পর্কে ওরকম উপমা আগে কখনও শুনি নি তো! তাই ওটা মনে আছে।

জহরদা হাসতে হাসতে বললেন . তোর তো দারুণ স্মরণশক্তি! ঠিক বলেছিস। ওই ডায়লগটা 'পূর্বরাগ' ছবিতে ছিল বটে। তবে ওই ডায়লগটা কিন্তু স্ক্রিপ্টে ছিল না। ওটা আমার মাথা থেকে বেরিয়েছিল। শট্ দেবার সময় এক্সটেম্পো দিয়ে দিয়েছিলাম। কালাচাঁদদা ওটা রেখে দিয়েছিলেন।

আমি বললাম : তোমার তো ভারি সাহস! প্রথম ছবিতে চান্স পেয়েই তুমি এক্সটেম্পো দিয়েছ! আর এখন তো অনর্গল দিয়ে যাচ্ছ। তোমার এক্সটেম্পোর ঠ্যালায় নাটক এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে থাকে। তোমার কোন হুঁশও থাকে না!

জহরদা বললেন : নাটক হয়তো থেমে থাকে কিন্তু লোকে কিরকম এন্‌জয় করে বল্!

আমি বললাম : তা হয়তো করে। কিন্তু তা বলে তোমার ছ'লাইনের ডায়লগ এক্সটেম্পোর ঠ্যালায় ছত্রিশ লাইন হয়ে যাবে! এটা কিন্তু অন্যায়।

আমি ভেবেছিলাম আমার এইরকম কাঠ কাঠ কথা শুনে জহরদা রেগে যাবেন। কিন্তু সেটা ঘটল না। জহরদা আমার কথা শুনে খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললেন : ব্যাপারটা যে আমি বুঝি না তা নয়। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি না যে। অ্যাকটিং করতে করতে আমার মুখ থেকে কেমন করে যে এত সব আগডম-বাগডম কথা বেরিয়ে আসে সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারি না। আসলে এটা অতিরিক্ত ফাংশান করার ফল। ফাংশানের সময় স্টেজে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক নানা ঘটনা নিয়ে এক্সটেম্পো বলে বলে এমন বদ অভ্যেস হয়ে গেছে যে নাটক করার সময়েও সেই জাতীয় কথা মুখ থেকে হড়হড় করে বেরিয়ে আসে।

অতিরিক্ত ফাংশান করার এটা একটা কুফল।

জহরদা যে অতিরিক্ত ফাংশান করতেন, এটা খুব খাঁটি কথা। সেই পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে জহর রায়কে ছাড়া ফাংশানের কথা কল্পনাই করা যেত না। ছোট-বড় মাঝারি সব ধরনের ফাংশানেই জহরদাকে দেখা যেত। কোন বাছবিচার ছিল না। দিনে দুটো, তিনটে, চারটে করেও ফাংশান করেছেন জহরদা।

প্রথম দিকে জহরদার এত ফাংশানে ডিমান্ড ছিল না। সেই সময়ে ওঁর কমেডিয়ান বন্ধু অজিত চাটুজ্যে ওঁকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। নিজের পাওয়া ফাংশানও জহরদাকে ধরিয়ে দিয়েছেন অজিতবাবু। সে সব কথা অজিত চাটুজ্যে সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এই স্মৃতির সরণিতেই আমি লিখেছি সবিস্তারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আমি বলে নিই। অজিতবাবু সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমি লিখেছিলাম, শেষ জীবনে জহরদার সঙ্গে অজিতবাবুর কিঞ্চিৎ মনান্তর ঘটেছিল। শুনলাম আমার এই উক্তিতে জহরদাব জামাতা নাকি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। উনি একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন বর্তমান পত্রিকার অফিসে। চিঠিটি আমার হাতে আসেনি, তবে চিঠির সারাংশ আমাকে জানানো হয়েছে।

জহরদার জামাতা বাবাজীবন অজিতবাবুর সঙ্গে কতখানি ঘনিষ্ঠ ছিলেন তা আমি জানি না। ওঁদের উভয়ের মধ্যে মনের কথার আদানপ্রদান হত কি না তাও আমার জানা নেই। তবে অজিতবাবুর সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি আমার কাছে তাঁব মনের সুখ-দুঃখের সব কথা বলতেন। সেই সূত্রেই অজিতবাবু একাধিকবার বলেছেন যে, জহর আমাকে আজকাল খুব নেগলেক্ট করছে। রঙমহলের নাটকে আমাকে কোন ভালো পার্ট-টার্ট দেয় না।

জহরদা তখন রঙমহল মঞ্চের সর্বেসর্বা। শিল্পীরা নিজের দায়িত্বে ওই মঞ্চ চালাচ্ছেন। মঞ্চ পরিচালনার দায়িত্ব তখন জহর রায় আর সরযূবালা দেবীর ওপর। সবযূদি যদিও বয়েস প্রবীণ, তা সত্ত্বেও পরিশ্রমশক্তি এবং জনপ্রিয়তার নিরিখে রঙমহলের রথের রশি জহরদারই হাতে।

তা অজিতবাবুর এই মনের দুঃখের কথাটি আমি একদিন জহরদাকে জানিয়েছিলাম। সেটা ছিল থিয়েটার ডে। অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে জহরদা তখন রঙমহল মঞ্চের পিছন দিকে যে খানিকটা খোলা জায়গা আছে, সেখানে বসে বিশ্রাম নিতেন। সেদিনও সেইরকম বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময়ই আমি অজিতবাবুর মনের দুঃখের কথাটি জহরদার কানে তুলেছিলাম।

জহরদা তখন একটা ইজিচেয়ারের ওপর আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন। আমার কথা শুনে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বললেন : দ্যাখ রবি, অজিত আমার বন্ধু, ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওরকম উপকারী বন্ধু আমার জীবনে খুব কমই আছে। কিন্তু ইদানীং ওর অ্যাকটিং ফ্লেক্সিবিলিটিটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আমার হাজার ইচ্ছে থাকলেও ওকে ভালো পার্ট দেওয়া যাচ্ছে না। নতুন নাটকে পার্টের ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় আমি চেষ্টা করেছি ওকে ভালো পার্ট দেবার জন্যে। কিন্তু অন্য অনেকে আপত্তি তুলেছে। আমাদের স্টেজ চালাচ্ছে রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠী। আমাকে সবাইকার মত নিয়ে চলতে হয়। আমার একার মতে তো সব কিছু করা যায় না।

কথাগুলো বলতে বলতে জহরদা চুপ করে গেলেন। খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপরে বললেন : অজিতের দুঃখটা আমি বুঝি। সেইজন্যেই বন্ধু হিসেবে ওকে বলেছি, তুই যদি অন্য কোনও স্টেজে ভালো চান্স পাস তাহলে চলে যাস। আমি কিছু মনে করব না। আমরা চিরকাল বন্ধু আছি, বন্ধুই থাকব। তা ও যে অন্য কোথও যায়নি, অথবা যাবার সুযোগ পায়নি, তা তো দেখতেই পাচ্ছিস্। এক্ষেত্রে আমার আর করবার কী আছে বল্ দিকি।

এক্ষেত্রে আমারও কিছু বলার ছিল না, করারও ছিল না। সুতরাং জহরদার কথা শুনে চুপচাপ উঠে এসেছিলাম।

আমার এই দৌত্যের কথা অজিতবাবুর কাছে বলতে পারিনি। ওঁর অ্যাকটিং ফ্লেক্সিবিলিটি যে নষ্ট হয়ে গেছে সেটা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সে কথা তো অজিতবাবুর মুখের সামনে বলা যায় না। শুনলে উনি নিশ্চয় দুঃখ পেতেন, তাই বলিনি।

অজিত-জহর সম্পর্কিত পুরো ব্যাপারটি আপনাদের জানালাম। সেই সঙ্গে জহরদার জামাতাকেও।

আশা করি এব পরে জামাইবাবুর মনে আর কোন ক্ষোভ থাকবে না।

যাক গে এসব কথা। আবার জহরদার ফাংশানের কথাতেই ফিরে আসি। সিনেমা আর নাটক যেমন, তেমনি ফাংশানটাও জহরদার জীবনের একটা বড় অধ্যায়।

যে 'ন্যাপাসুর বধ' স্কেচটিকে আমি জহরদার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমিক-স্কেচ বলে মনে করি, তাব আইডিয়াটা জহরদা পেয়েছিলেন অদ্ভুত ভাবে।

সেবার বিশ্বকর্মা পুজোর দিন দুয়েক আগে বিকেলবেলা কুমোরটুলি থেকে লরি করে কোন এক বড় কারখানার একদল কর্মী একটি বিরাট বড় বিশ্বকর্মা ঠাকুর নিয়ে আসছিল। আনতে আনতে হাতির শুঁড়টি ভেঙে গেছে। কর্মীরা সেই ভাঙা শুঁড় মাথার ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লরির ওপর নাচতে নাচতে চলে গেল। ঘটনাটি দেখে ভারি অদ্ভুত লেগেছিল জহরদার।

সেদিন সন্ধ্যায় নিউ ক্যাথে রেস্টুরেন্টে পানপাত্রের সামনে বসে হঠাৎ আইডিয়াটা মাথায় এসে গেল জহরদার।

অভিনেতা জহর রায় চার্লি চ্যাপলিনের একলব্য শিষ্য ছিলেন ঠিকই, কিন্তু চার্লিকে তিনি সর্বাংশে অনুসরণ করতেন না। চার্লির অভিনয় জীবন এবং ব্যক্তি জীবন দুটো ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। অভিনয় জীবনে চার্লি চ্যাপলিন রসের সাগর। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন গভীর, গম্ভীর, ভয়ঙ্কর রকমের চুপচাপ। যে কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা তাঁর জীবনে একধিকবার ঘটেছে। যাঁরা চার্লিকে বিয়ে করে ব্যক্তিজীবনে রসের সাগরে নিমজ্জিত হতে চেয়েছিলেন, তাঁবা ব্যর্থমনোরথ হয়ে চার্লির জীবন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন।

চার্লি চ্যাপলিনের ছায়াশিষ্য জহর রায়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু তা ছিল না। জহরদার ঘরে বাইরে উভয়তই চেহারাটা এক। বাইরে যেমন তিনি রসের খনি, সর্বক্ষণ হই-হল্লোড় আর আনন্দে ভবপুর, সংসারের ক্ষেত্রেও তাই।

আসলে জহরদা তাঁর সংসারটাকে খুব ভালোবাসতেন। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। স্ত্রী কমলা বৌদিকে যেমন চোখে হারাতেন, ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। সেটা বোঝা যেত কাজকর্ম সেরে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে ছেলে সব্যসাচীকে আদরের বহর দেখলে। ওড়িয়া ভাষায় গান গেয়ে গেয়ে, ছড়া কেটে কেটে ছেলেকে যখন আদর করতেন, তখন সেটা ছিল একটা দেখার মতো ব্যাপার।

ওই ওড়িয়া ভাষায় গান এবং ছড়াগুলি জহরদা কালেকশান করেছিলেন আমিয় নিবাস বোর্ডিং-এর চাকর-বাকরদের কাছ থেকে। ওদের অধিকাংশই ছিল ওড়িশা প্রদেশের লোক। আর তারা সকলেই ছিল জহরদার বন্ধু। তাদের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে জহরদা সব সময়েই তাদের সঙ্গে থাকতেন। জহরদা যে অনেক ছবিতে কিংবা নাটকে এক্সটেম্পো ওড়িয়া ডায়লগ দিয়েছেন, সে সব ওঁর মেসের ওই ওড়িয়া বন্ধুদের অবদান।

আসলে জহরদা ছিলেন এক সদানন্দময় পুরুষ। কথায় কথায় হিউমার করতেন। হিউমার ছিল তাঁর কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। তাঁর এই হিউমারের ঠ্যালায় আমরা মাঝে মাঝে কী নাজেহাল যে হতাম!

একদিন সন্ধেবেলা রঙমহল থিয়েটারে বসে জহরদার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ জহরদা জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যাঁ রে রবি, তুই কখনও সত্যজিৎ রায়ের আলজিভ দেখেছিস্?

প্রশ্নটা শুনে আমি তো হতভম্ব! এ আবার কীরকম রসিকতা। সত্যজিৎ রায়ের আলজিভ কি ইচ্ছে করলেই দেখা যায় নাকি? সেটা তাঁর ডাক্তাররা দেখলেও দেখতে পারেন। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের আলজিভ কি সাধারণ মানুষের দেখার বস্তু নাকি?

ওই হতভম্ব অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করলাম : তার মানে?

জহরদা খেঁকিয়ে উঠলেন আমার কথা শুনে। বললেন : ন্যাকা চৈতন! আলজিভ মানে জানিস না? টনসিল টনসিল।

আমি বললাম : সেটা তো জানি! কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের টনসিল মানেটা কী? তপন সিংহের টনসিল হলেও না হয় বুঝতাম। উনি 'টনসিল' বলে একটা ছবি করেছিলেন। তুমি সেই ছবিটা আমাকে দেখিয়ে বলতে পারতে, এই দ্যাখ তোকে তপন সিংহের টনসিল দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তো ওই

নামের কোন ছবি করেন নি। তাহলে তুমি সত্যজিৎ রায়ের আলজিভ দেখাবে কী করে?

জহরদা বললেন : অত ভ্যাড়র ভ্যাড়র করছিস কেন? সত্যজিৎ রায়ের টনসিল যদি দেখতে চাস তো কাল সকালে আমার মেসে চলে আয়। আমি তোকে সত্যজিৎ রায়ের আলজিভ দেখাব।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেমন করে দেখাবে? তুমি কি আমাকে নিয়ে লেক টেম্পল রোডে ওঁর বাড়িতে গিয়ে বলবে, মানিকদা, আপনি একটু বড় করে হাঁ করুন তো! রবি আপনার আলজিভ দেখতে এসেছে। আর তারপর উনি যখন আমার গালে একখানা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় ঝাড়বেন, তখন সেটা সামলাবে কে?

যে সময়কার কথা বলছি সে সময়ে সত্যজিৎবাবু তিন নম্বর লেক টেম্পল রোড থাকতেন। পরবর্তীকালে উঠে আসেন ওয়ান বাই ওয়ান বিশপ লেফ্রয় রোডে।

আমার কথা শুনে জহরদা বললেন : তোকে নিয়ে আর পারা গেল না! তখন থেকে কেবল উকিলের মতো জেরাই কেটে চলেছিস। সত্যজিৎ রায়ের আলজিভ দেখার ইচ্ছে যদি থাকে তাহলে কাল সকালবেলা আমার মেসে চলে আয়। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার সুযোগ আর কখনও পাবি না।

তা পরের দিন খুব সকাল সকাল হাজির হয়েছিলাম জহরদার মেসে। জহরদা চা খাওয়ালেন, টোস্ট খাওয়ালেন, নানারকম গল্প করতে লাগলেন, কিন্তু যে কারণে আসা সেই সত্যজিৎ রায়ের আলজিভের ধার-কাছ দিয়েও গেলেন না। অবশেষে একটা সময়ে বলেই ফেললাম : জহরদা, তুমি যে কাল সন্ধেবেলা আমাকে ডেকেছিলে একটা জিনিস দেখাবার জন্যে, কই সেটা তো দেখালে না?

আমার কথা শুনে জহরদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন : কী দেখাব বলেছিলাম বল্ দিকি? আমার তো কই কিছু মনে পড়ছে না!

দ্যাখো কাণ্ড! কাল সন্ধেবেলা যে ব্যাপার নিয়ে অতক্ষণ কথা হল, সেটা একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছেন! ধন্যি মানুষ বটে। এদিকে আসল কথাটা আমি মুখ ফুটে বলতে পারছি না। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষের আলজিভ দেখতে এসেছি, এটা কি মুখ ফুটে বলা যায়? অথচ কৌতূহলের ঠ্যালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাই শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম : সেই যে সত্যজিৎ রায়ের আলজিভ না কী যেন—

জহরদা বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে! সেই জন্যেই তো তোকে ডেকেছিলাম। তা সে কথাটা মনে করিয়ে দিবি তো! তা নয়, তখন থেকে কেবল চা আর টোস্ট ধ্বংস করেই যাচ্ছিস!

এই বলে উঠে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা খামের মধ্যে থেকে একখানা ফুল সাইজ ফটোগ্রাফ বার করে এনে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম সত্যজিৎ রায়ের মুখের বিগ ক্লোজ-আপ। হা হা করে হাসছেন। হাসির দমকে তাঁর হাঁ-মুখটা এতো বড় হয়ে গেছে যে মুখের ভেতরকার আলজিভটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ও হরি! এরই জন্যে কাল থেকে জহরদার এত নাটক করা! সত্যিই জহরদার হিউমারের তুলনা হয় না। অতি সাধারণ একটা ব্যাপারকে অতি-নাটকীয় করে তোলার অসীম ক্ষমতা তাঁর।

ছবিটা জহরদার হাতে ফেরত দিতে দিতে বললাম : তুমি দেখালে যা হোক। এই ব্যাপারটা নিয়ে কাল থেকে এমন কাণ্ড করলে যে মনে হচ্ছিল কী নাই কী একখানা ম্যাজিক দেখাবে! শেষ পর্যন্ত পর্বতের মূষিক প্রসব!

জহরদা বললেন : তোকে বলেছিলাম সত্যজিৎ রায়ের আলজিভ দেখাব, তা সেটা তো দেখিয়েছি। বল্ দেখিয়েছি কি না?

আমি বললাম : হ্যাঁ, সেটা স্বীকার করতেই হবে। তবে ফটোটা কিন্তু দারুণ তুলেছে! অসাধারণ ফটোগ্রাফ। কে তুলেছে বল তো?

জহরদা বললেন : সে যেই তুলুক, তাতে তোর দরকার কী। তবে কী দেখে মানিকদা এত হাসছেন সেটা যদি বলতে পারিস তবে তোকে এক্ষুনি চারটে রসগোল্লা খাওয়াব।

আমি বললাম : সেটা কী করে বলব।

জহরদা বললেন : ধরতে পারলি না তো! ফটোটা তোদের উল্টোরথ ফাংশানে তোলা। আমার

কমিক শুনে মানিকদা যখন হাসছিলেন তখনই এই ছবিটা তোলা। চারটে রসগোল্লা মিস্ করলি তো!

তারপর একটু থেমে জহর্‌দা বললেন · গ্রেট ম্যানরাই এবকম প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে। মানিকদা যে গ্রেট ম্যান, এই হাসিই তার প্রমাণ।

আমি বললাম : এটা তুমি বোধহয় ঠিক বললে না জহরদা। রবীন্দ্রনাথ কি এরকম হাসি হাসতেন? তাঁর এরকম দাঁত বার করে হাসির ছবি তুমি কখনও দেখেছ? অত যে হাসির গল্প লিখেছেন পরশুরাম, সেই রাজশেখর বসুকে আমি কখনও হাসতে দেখিনি। 'বরযাত্রী' উপন্যাসের স্রষ্টা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, যাঁর লেখা পড়ে ছেলে-বুড়ো সবাই হেসে কুটিপাটি হয়, আমি তো তাঁকেও কখনও হাসতে দেখিনি। তা বলে তাঁরা গ্রেট ম্যান নন?

জহরদা খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন : ওইখানেই তো ভুল করলি। কেউ বাইরে হাসে, আর কেউ হাসে ভেতরে। কাবও হাসি দেখা যায়, কারও দেখা যায় না। হাসতে না জানলে ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট হওয়া যায় না। যে হাসতে জানে না সে মানুষ মৃত। তুই কখনও কোন মরা মানুষের মুখে হাসি দেখেছিস?

আমি বললাম : অনেক দেখেছি। বিডন স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে নিমতলাগামী কত মড়াকে দাঁত বার করা অবস্থায় ফুলের মালা গলায় দিয়ে যেতে দেখেছি।

জহরদা বললেন : ওটা হাসি নয়, দাঁত খিঁচুনি। পৃথিবীর ধান্দাবাজ মানুষদের উদ্দেশ্যে দাঁত খিঁচুনি। ওই দাঁত দেখিয়ে ওরা বলতে চাইছে, হে অকরুণ পৃথিবী, সারা জীবন তোমরা আমাকে এতটুকু শান্তিতে থাকতে দাও নি। একটু নিশ্চিন্তে থাকতে দাও নি। আজ শেষ বেলায় তোমাদের উদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ দাঁত খিঁচুনি উপহাব বেখে যাচ্ছি।

জহরদার এই কথাটা শুনে আমার হেসে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু কেন জানি না হাসতে পারলাম না।

যাক গে, এখন এ সব তত্ত্বকথা থাক। আবার ফিরে যাই জহরদার ফাংশান জীবনের কথায়।

উল্টোরথের পুরস্কার বিতরণী উৎসবে জহর রায়ের যে কমিক স্কেচটি শুনে সত্যজিৎ রায় একদা আকাশ ফাটানো হাসি হেসেছিলেন, সেটি ছিল 'ন্যাপাসুর বধ'। আর যার আইডিয়া জহরদা পেয়েছিলেন বিশ্বকর্মা ঠাকুরের হাতির ভাঙা মুণ্ডু নিয়ে কারখানার কর্মীদের প্রলয় নাচন দেখে। ওই দৃশ্যটি মাথার মধ্যে ঘুর ঘুর করছিল। অবশেষে নিউ ক্যাথে বার-এ একপাত্র চুমুক দেবার পর একটা সম্পূর্ণ স্কেচের আইডিয়া এসে গেল।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। সেই দুর্গা প্রতিমাকে কেন্দ্র করে বারোয়ারি পুজোর ওপর একটা স্কেচ করলে কেমন হয়? বাড়ি ফিরে সেদিন রাত্রেই জহরদা লিখে ফেললেন 'ন্যাপাসুর বধ'।

স্কেচের শুরু বিজয়া দশমীতে ঠাকুর বিসর্জনের পরের দিন সকালবেলা। পাড়ার পার্মানেন্ট বেকার নেপাল চন্দ্র ওরফে ন্যাপা সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে পাড়ার চায়ের দোকানে বসে আছে। তার মুখ থেকেই শোনা গেল গত চারদিনে পূজামণ্ডপে তার দুর্ভোগের কাহিনী, তাঁর পরিণতিতে আজ সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ।

ষষ্ঠীর দিন সন্ধেবেলা বারোয়ারি পুজোর প্রতিমা আনবার সময় অসুরটি ভেঙে যায়। কুমোরটুলি থেকে নতুন করে অসুর বানিয়ে আনবার সময় আর তখন নেই। তাই সবাই মিলে ঠিক করল এই চারদিন ন্যাপা মা দুর্গার পায়ের কাছে অসুর সেজে প্রক্সি দেবে।

ন্যাপার এ ব্যাপারে প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। সবাই যখন পুজোর চারদিন ভলান্টিয়ার হয়ে পাড়ার মেয়েদের সামনে রোম্যান্টিক পোজ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তখন কিনা ন্যাপাকে অসুর সেজে দুর্গার পায়ের কাছে দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে থাকতে হবে? না না, তার দ্বারা এতটা স্যাক্রিফাইস সম্ভব না।

কিন্তু যেহেতু ন্যাপার গায়ের রঙ কালোকোলো এবং মুখের চেহারাটাও অসুরের প্যাটার্নের, তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে ন্যাপার অসুর সাজার ব্যাপারটা পাকাপাকি হয়ে গেল। সবাই তাকে বোঝাল, মাত্র তো চারটে দিন, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ন্যাপার ঘন ঘন ধূমপানের নেশা আছে, তার কী হবে? হ্যাঁ, সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। যে সিংহটা অসুরকে হাঁ করে কামড়াতে আসছে, তার সেই হাঁ-মুখের মধ্যে বিড়ি দেশলাই রাখা থাকবে। ন্যাপার যখন ধূমপানের ইচ্ছে হবে তখন ঠাকুরমশার বেশি করে ধুনো দিয়ে মণ্ডপ অন্ধকার করে দেবেন। ন্যাপা নিশ্চিন্তে ধূমপান করতে পারবে। পাড়ার সম্মানের

কথা ভেবে, তাদের বারেয়ারি পুজোর এতদিনের ঐতিহ্যের কথা ভেবে, ন্যাপার অসুর সাজতে আর আপত্তি করা উচিত নয়। অতএব ন্যাপাকে রাজি হতে হল।

সঙ্গে সঙ্গে ন্যাপাকে অসুরের মেক্-আপ দিয়ে দেওয়া হল পাড়াব যাত্রা পার্টির মেক-আপ ম্যানকে দিয়ে। সবাই মিলে 'ন্যাপাসুর কী জয়' ধ্বনি দিতে দিতে ন্যাপাকে চ্যাংদোলা করে মা দুর্গার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে দিলে।

ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বরে কী অপূর্ব ভঙ্গিতে জহরদা যে 'ন্যাপাসুর বধ'-এর এই প্রস্তাবনার অংশটি অভিনয় করে দেখাতেন, তার তুলনা নেই। শ্রোতাদের সামনে মূর্ত হয়ে উঠত চ্যাংড়া ছোকরাদেব উদ্যোগে আয়োজিত বারোয়ারি পুজোর প্রস্তুতিপর্ব। অথচ স্রষ্টার একটি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিও জড়িয়ে থাকত এইসব ভদ্রজন-অবহেলিত বেকার যুবকদের ওপর।

ওরপর শুরু হত পুজোব চারদিনের নানা ঘটনা। সপ্তমীর দিন একদিকে বাইবে মাইকে হিন্দি গান চলছে, আর অন্যদিকে দুর্গা প্রতিমার শরীরের সঙ্গে লেপটে থাকা ন্যাপাসুরের সেই গানের সঙ্গে শরীর দুলিয়ে তাল দেওয়া। তারই ফাঁকে পুরোহিতের চাপা সাবধানবাণী—সব মিলিয়ে হাসতে হাসতে শ্রোতাদের পেটের ভাত উগরে আসার যোগাড়।

অষ্টমীর দিন ভুল করে ন্যাপাসুরের দিক পরিবর্তন। আগের দিন তার মুখ ছিল ডানদিকে। এদিন হয়ে গেল বাঁ দিকে। তাই দেখে পাড়ার দর্শনার্থী কয়েকজন প্রবীণাব আক্ষেপ : ঘোর কলি, ঘোর কলি! আগেকার দিনে শুনতাম ঠাকুর-দেবতাই জাগ্রত হয়। আজকাল দেখছি অসুরও জাগ্রত হয়। হবে না! এখন যে অসুরদেরই যুগ।

নবমীর দিন ন্যাপা বেঁকে বসল। ওইভাবে দুদিন একভাবে আধশোয়া হয়ে থেকে থেকে তার সারা বুকে পিঠে ব্যথা। অতএব সে আজ আর অসুর সাজবে না। হাতে-পায়ে ধরে অনেক সাধাসাধি করে, আজকের পুজোর নৈবেদ্যে যত সন্দেশ পড়বে তাব অর্ধেক ন্যাপাকে দেওয়া হবে এই কবুল করে তবে তাকে ন্যাপাসুর সাজানো গেল। এবং সেই দিনটি মোটামুটি ভালোয় ভালোয় কাটল।

বিপত্তি ঘটল দশমীর দিন। লরিতে যখন ঠাকুর তোলা হচ্ছে তখন আর ন্যাপা অসুর সেজে গঙ্গা পর্যন্ত যেতে রাজি নয়। কিন্তু আজ পাড়ার ছেলেদের অন্য মূর্তি। তাদের কেউ সিদ্ধি খেয়েছে, কেউ বা গাঁজা, কেউ বা তার থেকেও বড় কিছু। ন্যাপাকে ধমকে তারা গাড়িতে তুলল। বলতে লাগল : চালাকি পেয়েছ! মা কি অসুরকে ছাড়াই কৈলাসে ফিরে যাবে নাকি! চল শালা।

লরির ওপর শুরু হল উদ্দাম ধুনুচি নৃত্য। সবাই নেশাগ্রস্ত। তাদের ধুনুচি থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে ছিটকে ন্যাপার শরীরের ওপর পড়তে লাগল। তার শরীরের নানা স্থানে ফোস্কা পড়ে গেল। ন্যাপা মাঝে মাঝে আর্ত চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু কে শোনে তার কথা! তার আর্ত চিৎকার ঢাকা পড়ে গেল উদ্দাম বৃন্দবাদ্যের আড়ালে।

এখানেই শেষ নয়। প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাপাকেও গঙ্গার বুকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। ন্যাপা সাঁতার জানত। সে যতবার সাঁতরে পাড়ে আসতে চাইল ততবারই পাড় থেকে ইট বৃষ্টি হতে লাগল তার উদ্দেশ্যে। চালাকি নাকি! মা চলে যাবে কৈলাসে আর অসুর ফিরে আসবে কলকাতায়। তাই আবার হতে দেওয়া যায় নাকি?

অবশেষে ওদের চোখ এড়িয়ে ন্যাপা কোনরকমে বাগবাজারের ঘাটে গিয়ে পাড়ে উঠেছে। সেখান থেকে সোজা হাসপাতালে গিয়ে আদ্যোপান্ত ব্যান্ডেজ জড়িয়ে বাড়ি ফিরতে পেরেছে।

সংক্ষেপে এই হল 'ন্যাপাসুর বধ'-এর কাহিনী। সেবার পুজোয় জহরদার এই স্কেচটা রেকর্ড হয়েছিল। বিক্রিও হয়েছিল দারুণ। তার থেকেও বড় কথা, জহরদার ঘরানায় সেই সময়ে অনু দত্ত প্রমুখ একদল তরুণ কৌতুক শিল্পীর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, যারা ছোটখাটো ফাংশানে এই 'ন্যাপাসুর বধ' করে দেখাত আর প্রচুর হাততালি পেত। এই রেকর্ডটি এক সময়ে আমার সংগ্রহে ছিল। জহরদাই উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি যে কোথায় হারিয়ে গেছে তার হদিস পাচ্ছি না।

স্কেচটি পরিবেশন করবার সময় জহরদা যে কত রকম ভঙ্গিতে নিজেকে মূর্ত করে তুলতেন তার ইয়ত্তা নেই। কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে কখনও তিনি বৃদ্ধ, কখনও বৃদ্ধা। কখনও রকবাজ, কখনও ধড়িবাজ।

কখনও প্রেমিক, কখনও বা প্রেমিকা। সেই সঙ্গে মুখে মুখে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, নাচ ও গান। এইরকম কমিক স্কেচ শুনে সত্যজিৎ রায় যে আকাশ ফাটানো হাসি হাসবেন তাতে আর আশ্চর্য কী!

কোনও ফাংশানে নয়, আরও একবার এইরকম হাসি হেসেছিলেন সত্যজিৎ রায় স্টুডিওর সেটে দাঁড়িয়ে। তখন 'পরশ পাথর' ছবির শ্যুটিং চলছে। জহরদা ওই ছবিতে তুলসী চক্রবর্তীর চাকরের ছোট্ট একটা রোল করেছিলেন।

সেদিন শ্যুটিং-এর ব্রেকে কার কত বয়েস তার একটা হিসেব হচ্ছিল। দেখা গেল জহরদা সত্যজিৎবাবুর থেকে দু বছরের বড়। জহরদার জন্ম ১৯১৯ সালে, আর সত্যজিৎবাবুর ১৯২১ সালে। তাই শুনে সত্যজিৎবাবু বলে উঠলেন : সে কী জহরবাবু, আপনি তো দেখছি আমার চেয়ে দু বছরের বড়। তাহলে আমাকে মানিকদা বলে ডাকেন কেন?

জহরদা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন : ঠিক কথা। আমি আপনাব থেকে এজ-এ বড়। কিন্তু আপনি যে আমার থেকে ইমেজ-এ অনেক অনেক বড়। তাই তো আপনাকে মানিকদা বলে ডাকি।

জহরদাব মুখ থেকে ওইরকম এজ আর ইমেজ-এর পানিং শুনে সত্যজিৎবাবু হা হা করে আকাশ ফাটানো হাসি হেসেও উঠেছিলেন।

এই ঘটনাটির সত্যতা কতখানি তা আমি বলতে পারব না। কারণ ওই সময়ে আমি সেটে উপস্থিত ছিলাম না। কাহিনীটি শুনেছিলাম জহরদার মুখ থেকেই। তিনি নিশ্চয় আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেন নি।

শুধু বাংলা ভাষাতেই নয়, জহরদা হিন্দি ভাষাতেও কমিক করতে পারতেন। বহুদিন পাটনায় কাটিয়েছেন তো, তাই হিন্দি ভাষাতেও তাঁর স্বচ্ছন্দ দখল ছিল। শুধু বলাই নয়, হিন্দি লিখতে ও পড়তেও পারতেন। প্রেমচন্দ্, কিষেণচন্দ্ প্রমুখ বিখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিকদের অনেক উপন্যাস আমি পড়তে দেখেছি জহরদাকে।

আমি মাঝে মাঝে জহরদাকে বলতাম : জহরদা, তুমি এত ভালো হিন্দি বলতে পার, বম্বে চলে যাচ্ছ না কেন হিন্দি ছবিতে অভিনয় করতে?

জহরদা বললেন : বম্বে গেলে কী হত?

আমি বললাম : ইন্ডিয়া ফেমাস্ হয়ে যেতে পারতে।

জহরদা হেসে বললেন : বেঙ্গল ফেমাসই হতে পারলাম না তো ইন্ডিয়া ফেমাস্! পাগল হয়েছিস নাকি তুই?

এটা জহরদার বিনয়ের কথা। বেঙ্গল ফেমাস্ তো তিনি নিশ্চয়ই। তা ওই ব্যাপারটি নিয়ে আরও চাপাচাপি করার পর আসল ব্যাপারটা জানা গিয়েছিল।

জহরদা বলেছিলেন : আসলে কী জানিস্, তোর বৌদির ওপর একটা সময়ে অনেক অত্যাচার করেছি তো। তাই এখন আর তাকে কাছছাড়া করতে চাইছি না।

আমি বললাম : সে কী! বৌদির ওপরে তুমি অত্যাচার করতে নাকি?

জহরদা বললেন : অত্যাচার নয়? বিয়ের পর বছরের পর বছর তোর বৌদি পড়ে থেকেছে পাটনায়, আর আমি রইলাম কলকাতায়। এটাকে অত্যাচার ছাড়া আর কী বলব বল্।

বোঝা যেত জহরদা খুব সংসারপ্রেমিক মানুষ। বৌ আর ছেলেমেয়েদের তিনি এত ভালোবাসতেন যে তাদের ছেড়ে হাজার হাতছানিতেও তিনি বম্বে যাবার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পেরেছেন।

জহরদা যে কীরকম ঘরকুনো মানুষ ছিলেন তার একটা ঘটনা বলি।

সেবারে জহরদা আমাদের সঙ্গে তমলুকে গিয়েছিলেন 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকে অভিনয় করবার জন্যে। ওই নাটকে জহর রায় অভিনয় করেছিলেন মতি চাকরের চরিত্রে। হাজারি ঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য।

পরবর্তীকালে ওই 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটক রঙমহলে নিয়মিত অভিনীত হয়েছিল বহুদিন ধরে। তখন ওই নাটকে হাজারি ঠাকুর করতেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। জহরদা তাঁর পুরনো মতি চাকরের চরিত্রেই করতেন। ওই চরিত্রে এমনিতে কোন হিলারিয়াস কমেডির ব্যাপার ছিল না। কিন্তু জহরদার হাতে পড়ে

ওই চরিত্রটা হয়ে উঠেছিল হাসির ছোটখাটো একটা অ্যাটম বোমা।

একটা দৃশ্যের কথা বলি।

তার আগে সত্যবাবুর প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখি। শিশিরবাবু, অহীনবাবু, নির্মলেন্দু, দুর্গাদাস, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলিদের পরবর্তী যুগে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন বাংলা কমার্শিয়াল থিয়েটারের একজন বিখ্যাত অভিনেতা। কী সিরিয়াস আর কী কমেডি রোলে অভিনয় করে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবার ক্ষমতা সত্যবাবুর আছে। কিন্তু ওঁর একটি মহৎ দোষ, উনি হাসি চেপে রাখতে পারেন না কিছুতেই। যে কারণে রঙমহল মঞ্চে জহর রায়ের সঙ্গে অভিনয়ের সময় ওঁকে মাঝে মাঝেই বিপদে পড়তে হত। জহরদার নানা অঙ্গভঙ্গির কারণে ওঁর পক্ষে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে উঠত। অনেক কষ্টে কোন রকম করে উনি দৃশ্যগুলি সামাল দিতেন।

সেদিনও ওই রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকের একটি দৃশ্যে হাজারি ঠাকুর মতিকে ডাকবেন। মতি হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি স্টেজে ঢুকে বলবে : কেন ডাকতিছ গো ঠাকুর।

তা সেদিনও সত্যবাবু 'মতি মতি' করে ডেকেছেন। কিন্তু জহরদা আর স্টেজে ঢুকছেন না। সত্যবাবু ভাবলেন, কী হল, জহর কি সিন্ ফেল করবে নাকি? তাই বেশ জোর দিয়েই ডেকে উঠলেন : অ্যাই মতি।

সঙ্গে সঙ্গে জহরদার স্টেজে প্রবেশ কিম্ভুত কিমাকার রূপে। মাথার চুল থেকে গলা পর্যন্ত সাদা ময়দায় ঢাকা। শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে আছে। তার মধ্যে দিয়ে জ্বল জ্বল করে তাকাচ্ছে জহরদা। আর ঢোকার রকমটা ছিল পা ঘষে ঘষে।

সত্যবাবু তো হকচকিয়ে গেছেন। এই মূর্তিতে তো জহরের ঢোকবার কথা নয়। তার ওপরে আবার গরুচোরের মতো জুল জুল করে তাকাচ্ছে। তা দেখে সত্যবাবুর ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল। কোন রকমে নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করলেন : এ কী রে মতি? এ কী চেহারা হয়েছে তোর?

জহরদা আধো আধো ভাষায় উত্তর দিলেন : কী করব বলো! আমি সবে গামলায় ময়দাটা ঢেইলেছি মাখব বলে, এমন সময় তুমি এমন জোরে মতি বলে ডাইকলে যে আমি ওই এক গামলা ময়দার উপর মুখ থুইবড়ে পইড়ে গেলুম।

এসব ডায়লগ, এই ময়দামাখা চেহারা কোনটাই নাটকে ছিল না। সবটাই জহরদার বানানো। কাজেই সত্যবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। তার ওপর ওই ময়দামাখা মূর্তিমান চেহারাটা যখন ঘন ঘন চোখ পিট পিট করে তাকাতে লাগল তখন সত্যবাবুর পেটের মধ্যে হাসি কলকলিয়ে উঠতে লাগল। এই অবস্থাটাকে কাটিয়ে ওঠার জন্যে সত্যবাবু বলে উঠলেন : হতভাগা! যা দূর হ, মুখ হাত পরিষ্কার করে আয়গে যা!

ভাবলেন এরপর নিশ্চয় জহর স্টেজ থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু জহর রায় সেই পাত্তর নাকি! সে যখন বুঝতে পেরেছে সত্যর পেটের ভেতর হাসি কলকলিয়ে উঠছে তখন এত সহজে যায় নাকি! তাই জহরদা পাল্টা ডায়লগ দিলেন : তুমি মিছামিছি রাগ কইরতিছ। আমি কি ইচ্ছা করে ময়দার উপর পইড়েছি নাকি! এখন কেন ডাইকছিলে তাই বলো?

সত্যবাবুর তখন পেটের হাসি গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে। কথা বলার সামর্থ্য নেই। বলতে গেলেই হেসে ফেলবেন। তাই আত্মরক্ষার তাগিদেই জহরদাকে প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে স্টেজ থেকে বার করে দিলেন। বললেন : যা, আগে তুই পরিষ্কার হয়ে আয়, তারপর যা বলার বলব।

জহরদাকে স্টেজ থেকে ঠেলে বার করে দিয়ে কাঁধের গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন সত্যবাবু। ভাবলেন আপদ চুকল। কিন্তু আপদ যে তখনও চোকেনি তা বোঝা গেল দু' সেকেন্ড পরেই। জহরদাকে উইংসের গায়ে ঠেলে দিয়ে সত্যবাবু পিছু ফিরতে না ফিরতেই জহরদার পুনঃপ্রবেশ। মতিরূপী জহর রায় বলে উঠল : ও ঠাকুর, তুমি কেন ডাইকতেছিলে বলো না। তোমার কথাটা শুনে তারপর হাত মুখ সাফ করব।

সত্যবাবু এবারে আর সামলাতে পারলেন না। 'তবে রে!' বলে তেড়ে গেলেন জহরদার দিকে।

জহরদাও বুঝলেন আর বেশিক্ষণ থাকাটা সমীচীন হবে না। তাই ল্যাং ব্যাং করতে করতে পালিয়ে গেলেন স্টেজ থেকে। যাবার আগে এক টুকবো ফিচেল হাসি উপহার দিয়ে গেলেন দর্শকদের।

সারা প্রেক্ষাগৃহে তখন তুমুল হাস্যরোল।

সত্যবাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললেন : দেখুন মশাইরা, এইসব লোক নিয়ে আমাকে হোটেল চালাতে হচ্ছে।

পরবর্তীকালে কথা প্রসঙ্গে সত্যবাবু মাঝে মাঝেই হাসতে হাসতে বলতেন : জহর মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ডকারখানা করে না, যে সামলাতে প্রাণ বেরিয়ে যায় মশাই!

শুধু স্টেজে দাঁড়িয়েই নয়, স্টুডিওর সেটের মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড করতেন জহরদা, যাতে রীতিমত হইচই পড়ে যেত।

একটা ঘটনার কথা বলি।

বিখ্যাত অভিনেতা নরেশ মিত্রর নাম আপনারা সকলেই জানেন। সেই নির্বাক যুগ থেকে শুরু করে ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত তিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপে বাংলা ফিল্ম এবং স্টেজে তাঁর ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। অথচ অভিনেতা হিসেবে নরেশদার অনেকগুলি প্রতিবন্ধকতা ছিল। তিনি দেখতে সুদর্শন নন। শারীরিক উচ্চতাও কম। কণ্ঠস্বর ছিল কিঞ্চিৎ অনুনাসিক। কিন্তু অভিনেতা হিসেবে এত পাওয়ারফুল ছিলেন যে এতগুলি প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

তবে অভিনেতা হিসেবে নরেশদার যা স্বীকৃতি, তার থেকে অনেক বেশি স্বীকৃতি তিনি পেয়েছিলেন চলচ্চিত্রের পরিচালক হিসেবে। নির্বাক যুগ থেকে শুরু করে সবাক যুগের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিনি অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁর পরিচালিত 'গোরা' ছবিটি শুরুর আগে আমরা দেখতে পাই, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে ছবির স্ক্রিপ্ট নরেশ মিত্রের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করছেন। এই দুর্লভ সম্মান আর কোন চিত্রপরিচালক পাননি।

নরেশদার উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির কথা আজকের পাঠকদের আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'স্বয়ংসিদ্ধা'র চিত্ররূপ তিনি দিয়েছিলেন একেবারে আনকোরা নতুন শিল্পী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দীপ্তি রায়কে নিয়ে। সে ছ.ব সুপার হিট করেছিল। ধীরাজ ভট্টাচার্য এবং মলয়া সরকারকে নিয়ে তোলা 'কঙ্কাল' ক্রাইম ছবি হিসেবে রীতিমত ভয়ের তুফান তুলেছিল। উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেনকে নিয়ে তোলা 'অন্নপূর্ণাব মন্দির' এখনও টিভির পর্দায় দেখে দর্শকরা লাফিয়ে ওঠেন। এমনি আরও কত নাম করা যায়।

সেই নরেশদার অনুনাসিক কণ্ঠস্বরটি জহরদা হুবহু নকল করতে পারতেন। জহরদা প্রায় প্রতিটি কমিক স্কেচেই কোন না কোনও চরিত্রে নরেশদার কণ্ঠস্বরে কথা বলতেন।

এই নকল কণ্ঠস্বরের সুযোগ নিয়ে জরদা একদিন নরেশদাকে ভয়ানক বিপদে ফেলে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি একই সঙ্গে হাসির এবং দুঃখের।

সেদিন নরেশদার একটা ছবির শুটিং হচ্ছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। যথারীতি আলো-টালো ব া হয়ে গেছে। যথাস্থানে শিল্পীদের দাঁড় করিয়ে মনিটারও হয়ে গেছে। এবারে ফাইনালে টেক। নরেশদা তাঁর অনুনাসিক কণ্ঠে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলেন : স্টার্ট ক্যামেরা। তারপর আর্টিস্টদের দিকে তাকিয়ে বললেন : অ্যাকশন।

দৃশ্যটি একটু বড় ছিল। প্রায় দেড়-দু মিনিটের। শিল্পীরা বেশ জমিয়ে দরদ দিয়ে অভিনয় করছেন। অকস্মাৎ দৃশ্যটির মাঝপথে অনুনাসিক কণ্ঠ শোনা গেল : কাট্।

কাট্ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা থেমে গেল। বড় বড় লাইটগুলি নিভে গিয়ে সেট লাইট জ্বলে উঠল। ফুল স্পিডে ঘুরতে শুরু করল সেটের প্রপেলার ফ্যানটি।

এইসব দেখে নরেশদা হকচকিয়ে গেলেন। চিৎকার করে উঠলেন : আমি তো কাট্ করতে বলিনি! তোমরা কাটলে কেন?

ক্যামেরাম্যান থেকে শুরু করে শিল্পীরা সকলেই বিস্মিত। তাঁরা তো নরেশদার কণ্ঠস্বরেই 'কাট' শব্দটি শুনেছেন। এ কণ্ঠস্বর তো সকলের অতি পরিচিত। ভুল হবার কথা নয়। অথচ নরেশদা বলছেন তিনি কাটতে বলেননি। তাহলে কে বললে?

নরেশদা ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গেছেন। পুনরায় চিৎকার করে উঠলেন : এ নিশ্চয় সেই হতভাগা জহরটার কাণ্ড। আমার গলা নকল করে কমিক করে বেড়ায়। কোথায় গেল সেই হতভাগা! খুঁজে বের কর তাকে।

আর খুঁজে বের করা! জহরদা তখন আর সে তল্লাটে থাকেন! ঘটনাটি ঘটিয়েই সঙ্গে সঙ্গে পগার পার।

জহরদাকে খুঁজে না পেয়ে নিজের মনেই গজগজ করতে লাগলেন নরেশদা। বললেন : আমার সঙ্গে রসিকতা। দাঁড়াও তোমায় মজা দেখাচ্ছি। এ ছবিতে ওর বারো দিনের কাজ ছিল। ওকে ক্যানসেল করে অন্য আর্টিস্ট নিয়ে কাজ করব। যে দুদিনের কাজ হয়েছে ওর, সেটা ফেলে দেব।

পরের দিন খুব সক্কালবেলা জহরদা গিয়ে হাজির নরেশদার বেলতলা রোডের বাড়িতে। নরেশদা তখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। জহরদা নিচের ঘরে বসে রইলেন। নরেশদা ঘুম ভাঙার পর নিচে নেমে দেখতে পেলেন জহর দাঁড়িয়ে আছে দু'কানে হাত দিয়ে।

জহরদাকে সামনে পেয়ে নরেশদা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। যাচ্ছেতাই করে গালাগালি করতে লাগলেন। তার উত্তরে জহরদা টুঁ শব্দটি না করে একইভাবে কানে হাত দিয়ে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রায় মিনিট পনেরো অনর্গল গালগালি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন নরেশদা। দেখলেন জহর তখনও কানে হাত দিয়ে রামভক্ত হনুমানের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

এই দৃশ্য দেখে শেষ পর্যন্ত নরেশদার মতো গম্ভীর মানুষও হেসে ফেললেন। বললেন : আর কখনও এমন কাণ্ড করিস না। যা, এখন দূর হ আমার সামনে থেকে। কাল পরশু করে অফিসে গিয়ে জেনে নিস তোর কবে কবে শুটিং আছে।

জহরদা কান থেকে হাত নামিয়ে বললেন : তথাস্তু। তবে যদি অনুমতি দেন তো যাবার আগে একটা কথা বলতে চাই।

নরেশদা বললেন : কী বলবি বল্।

জহরদা বললেন : আমরা তো ভালো-মন্দ যা কিছু সব বড়দের কাছ থেকেই শিখি। শুনেছি আপনি নাকি স্টেজে এক সময় দানীবাবুকে এই রকম জ্বালাতন করতেন। তাই একবার শখ হল পদ্ধতিটা আপনার ওপর প্রয়োগ করে দেখতে।

নরেশদা হাসতে হাসতে বললেন : ওরে হতভাগা! তোর পেটে পেটে এত!

এবারে জহরদার সেই তমলুকে থিয়েটার করার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

সেদিন 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটক শুরু হবার কথা ছিল সন্ধে সাতটায়। কিন্তু রাত আটটা-সাড়ে আটটার আগে স্ক্রিন তোলা সম্ভব হল না। ধীরাজদা তাঁর গ্রুপ নিয়ে একটু দেরি করেই পৌঁছেছিলেন। জহরদা গিয়েছিলেন আরও পরে। উনি সেদিন কলকাতায় হাফ ডে শুটিং করে তারপর তমলুক রওনা দিয়েছিলেন। ওঁর পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল।

জহরদা না পৌঁছনো পর্যন্ত আমি খুব টেনশন ভোগ করছিলাম। জহরদাকে দেখে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। তবে ওরা দেরি করে পৌঁছনোয় আমাদের খানিকটা সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। এমনিতেই হাউস ফুল ছিল। আর্টিস্টরা গিয়ে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে টিকেটের ডিমান্ড দারুণভাবে বেড়ে গেল। আমরা শ'পাঁচেক অতিরিক্ত স্ট্যান্ডিং টিকেট বিক্রি করেছিলাম। মানে হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাটক দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। হাজার খানেক টাকা আমাদের অতিরিক্ত আয় হয়ে গেল।

থিয়েটার শুরু হবার ঘণ্টাখানেক পরে জহরদা আমাকে একটু আড়ালে ডেকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করলেন : ওটার ব্যবস্থা রেখেছিস তো?

আমি বললাম : স্যরি জহরদা, তোমাদের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমার এমন টেনশন হচ্ছিল যে ড্রিংকস কেনার কথা ভুলেই গেছি।

জহরদা বললেন : সে কী রে। তাহলে সারা রাত কাটাব কেমন করে। তোদের এখানে যা বড় বড় মশা! ঘুমের তো কোনও আশাই দেখছি না। ওটা থাকলে খেয়ে দেয়ে মরার মতো পড়ে থাকতাম।

আমি বললাম : কী আর করবে বলো! যাই হোক করে রাতটা কাটিয়ে নাও। এখন তো আবগারি দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে। পেছনের দরজা দিয়ে যে কিনতে পাঠাব তারও উপায় নেই। এখানকার এক্সসাইজ ইন্‌সপেক্টর বড কড়া মানুষ। আমি বরং তোমার জন্যে একটা ভালো দেখে মশারির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে যাবে।

জহরদা বললেন : দূঃর্‌! কিসে আর কিসে। নিদেনপক্ষে একটু সিদ্ধির ব্যবস্থাই করে দে না হয়। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই।

আমি বললাম : ওই দেখো! তোমাকে কী বললাম এতক্ষণ। ওটাও তো আবগারি দোকানের জিনিস। সেই কখন রাত আটটায় দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

জহরদা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন।

তবে ড্রিংকসের ব্যাপারে জহরদাকে আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম। এখানকার ইয়ং গ্রুপকে আমি একবার মুখ ফুটে কথাটা বললে ওরা রাত দুপুরেও দোকান খুলিয়ে ড্রিংকস আনিয়ে দিতে পারত। কিন্তু জহরদার শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আমি চাইনি জহরদা এই মফঃস্বল শহরে এসে ড্রিঙ্ক করে তাঁর ইমেজ নষ্ট করুন। তাই এই মিথ্যাচারণ।

রাত বারোটা নাগাদ নাটক শেষ হল। জহরদা কোনও রকমে মেক-আপ তুলে এসেই আমাকে বললেন : রবি, আমি শুনেছি রাত দুটো নাগাদ পাঁশকুড়ো স্টেশনে হাওড়া যাবার একটা মেল ট্রেন থামে। তুই আমাকে ওই ট্রেনে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করে দে।

আমি বললাম : তুমি কি পাগল হয়ে গেছ নাকি জহরদা। রাত দুটোয় নয়, আড়াইটের সময় একটা মেল ট্রেন আধ মিনিটের জন্যে পাঁশকুড়া স্টেশনে দাঁড়ায়। কিন্তু সে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কিংবা স্লিপার ক্লাসের দরজা কোনওদিনই খোলা পাওয়া যায় না। ভেতর থেকে লক্‌ করা থাকে। আর থার্ড ক্লাসে পিঁপড়ে গলবারও জায়গা থাকে না। তাছাড়া তুমি রাত চারটের সময় হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সি পর্যন্ত পাবে না। এখন খেয়েদেয়ে একটু রেস্ট নিয়ে নাও। আমি তোমাকে ভোর পাঁচটায় ফার্স্ট লোকাল ধরিয়ে দেব। বেলা আটটার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাবে।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলাম : আমি তোমার ড্রিংকসের ব্যবস্থা করতে পারিনি বলে তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ জহরদা? না হলে তুমি এই মাঝরাতে চলে যেতে চাইছ কেন?

জহরদা একটু হেসে বললেন : আরে না না। তোর ওপরে রাগ করিনি। আসলে কী জানিস, তোর বৌদি আর ছেলেমেয়েদের জন্যে বড্ড মন কেমন করছে। তাই যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে যেতে চাইছি।

বুঝলাম গৃহগতপ্রাণ জহরদার মনটা বাড়ি ফেরার জন্যে ছটফট করছে। না করার তো কোনও কারণ নেই। বাড়িতে যাঁর অমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো সুন্দর বৌ, ডল পুতুলের মতো সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়ে, সেই বাড়ির জন্যে জহরদার মন তো একশোবার কাঁদতেই পারে।

জহরদার স্ত্রী কমলাবৌদি যৌবনকালে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। তাঁর ওই লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো রূপ দেখেই জহরদার বাবা সত্যবাবু ওঁকে প্রথম দর্শনেই ছেলের বৌ হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। সত্যবাবু কমলাবৌদিকে দেখেছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের অফিস ক্লাবের অভিনয়ে। কমলাবৌদি সেদিন থিয়েটার দেখতে এসেছিলেন।

কমলাবৌদিদের আদি বাড়ি চট্টগ্রামে। কলকাতায় ওঁরা থাকতেন বরানগরে। চিত্রপরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত ওঁর জামাইবাবু। সুকুমারদা সত্যবাবু আর জহরদাকে ভালো করেই চিনতেন। কাজেই উভয় পক্ষের সম্মতিতে ১৯৫০ সালে জহরদা কমলাবৌদির পাণিগ্রহণ করলেন। আর বিয়ের পরে পরেই চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি পাটনায়।

দীর্ঘ বারোটা বছর বৌদির পাটনায় কেটেছে। তারপর জহরদা যখন কলকাতায় বাসা করলেন তখন বৌদি চলে এলেন এখানে।

কমলাবৌদি যে এককালে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন তা এখনও তাঁকে দেখলে বোঝা যায়। বয়েস

তো কম হল না, কিন্তু এখনও তিনি রূপসী। ঠিক মা লক্ষ্মীর মতো রূপ। দেখলেই প্রাণে ভক্তির ভাব আসে।

কমলাবৌদির এই অসাধারণ সৌন্দর্য নিয়ে একবার জহরদার সঙ্গে উত্তমকুমারের ছোট্ট একটা লেগ পুলিং-এর ঘটনা ঘটেছিল।

বৌদি সাধারণত ফিল্মের কোনও ফাংশানে যেতেন না। মাঝে মাঝে জহরদার থিয়েটার দেখতে যেতেন বটে, কিন্তু গ্রিনরুমে কদাপি নয়।

তা সেবার মিনার্ভা থিয়েটারে শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে 'চরিত্রহীন' নাটক করা হয়েছিল। জহরদা কেন জানি না সেবার বৌদিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। শিল্পী সংসদের সভাপতি হিসেবে উত্তমবাবুও সেদিন থিয়েটারে উপস্থিত ছিলেন। জহরদা বৌদির সঙ্গে উত্তমবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

জহরদার স্ত্রী যে খুব সুন্দরী এটা সিনেমা আর থিয়েটার লাইনের অনেকেরই জানা ছিল। যদিও বৌদিকে অনেকেই চোখে দেখেননি। বৌদির রূপের খ্যাতি উত্তমবাবুর কানেও গিয়েছিল। আলাপ হবার পর উত্তমবাবু বৌদিকে নমস্কার করে পাশে বসালেন। জহরদাও বসলেন।

হঠাৎ উত্তমবাবুব জহরদার পেছনে একটু লাগবার ইচ্ছে হল। বললেন : জহরদা, রামায়ণে পড়েছি বটে, কিন্তু সেই ঘটনাটা যে কোনওদিন সত্যি দেখব তা কিন্তু ভাবিনি।

উত্তমবাবুর কথা শুনে জহরদা অবাক। বললেন : রামায়ণের কোন ঘটনার কথা বলছিস বল দিকি?

উত্তমবাবু মুখ টিপে বললেন : সেই যে কার গলায় যেন মুক্তোর মালা। এতদিন সেটা পড়া ছিল। ভাবতাম ওটা কথার কথা। এখন বৌদির পাশে তোমাকে দেখে কথাটার সত্যতা খুঁজে পেলাম।

বৌদির সামনে উত্তমবাবুর মুখে এই কথা শুনে জহরদার চোখ-মুখ তো লজ্জায় লাল। তবে ঝানু কমেডিয়ান জহর রায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলেন। উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে বললেন : তোর রামায়ণ পড়া সার্থক রে উত্তম। তুই যার কথা বলছিস সে তো তোরই পূর্বপুরুষ রে! তবে তার সঙ্গে আমার একটু তফাৎ আছে। তুই যার কথা বলছিস সে হনুমান। আর আমি হনু Man। সে সীতারামের ভক্ত, আর আমি Rosa Rum-এর ভক্ত। তফাৎটা বুঝলি?

জহবদার কথা শুনে উত্তমবাবু হেসে কুটিপাটি। বললেন : সত্যি জহরদা, তোমার তুলনা নেই। রিটার্নটা তুমি দারুণ দিলে বটে।

আজ আর সেই উত্তমবাবুও নেই, সেই জহরদাও নেই। স্টুডিও চত্বর আর থিয়েটারের গ্রিনরুম থেকে হাস্য পরিহাসের পরিবেশটাও ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে।

জহরদার আরও একটি মহৎ গুণ ছিল। সহশিল্পীদের প্রতি তাঁর সহযোগিতার মনোভাব। তেমন একটা ঘটনা বলি।

ষাটের দশকটা বাংলা কমেডি ছবির স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে জহর রায় আর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্যাণে। বাংলা ছবিতে উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেন যেমন একটা রোম্যান্টিক যুগের সূচনা করেছিলেন, জহরদা আর ভানুদা তেমনি কমেডি যুগের সূচনা করেছিলেন। তারই সঙ্গে ছিলেন রবি ঘোষ। এ বলে আমায় দ্যাখ, আর ও বলে আমায় দ্যাখ। রবিবাবু অবশ্য তখনও অভিনয় করছেন, কিন্তু সেই ফুল্লমেজাজি হাসির যুগটা উধাও হয়ে গেছে জহরদা আর ভানুদার লোকান্তরের পর। এখন চলেছে বোম্বাই ছবির উচ্ছিষ্টভোজীদের নর্তন-কুর্দন।

জহরদা আর ভানুদা একটা সময়ে এতই পপুলার ছিলেন যে ওঁদের নায়ক করে বেশ কয়েকটি বাংলা ছবি হয়েছে। জহরদার নামটা ভানুদার আগে বসালাম বলে কেউ আবার অন্য কিছু ভেবে বসবেন না যেন। ওঁরা দুজনেই শক্তিমান অভিনেতা ছিলেন। কিন্তু যেহেতু জহরদা ভানুদার আগেই ফিল্মের জগতে এসেছেন, তাই জ্যেষ্ঠের অধিকারে তাঁর নামটা আগেই উল্লেখ করছি।

জহরদা আর ভানুদাকে যুগ্ম নায়ক করে যেমন অনেকগুলি ছবি হয়েছে, তেমনি জহরদাকে নায়ক করেও অনেক ছবি হয়েছে। ভানুদাকে নিয়ে তো হয়েইছে। শুধু নায়ক করেই নয়, জহরদার নামেই একটি ছবির নামকরণ করেছিলেন পরিচালক কনক মুখার্জি। সে ছবির নাম 'এ জহর সে জহর নয়'। এছাড়া 'হাসি শুধু হাসি নয়' এবং 'নারদের সংসার' ছবির নায়ক ছিলেন জহরদা। ওঁকে নায়ক করে

আরও দু-একটি ছবি হয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে সেগুলির নাম মনে আসছে না।

১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ তিরিশ বছরে জহরদা তিনশোরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, অজয় কর, হরিদাস ভট্টাচার্য, অগ্রদূত, অগ্রগামী, তরুণ মজুমদার ইত্যাদি প্রায় সব নামকরা পরিচালকের ছবিতেই তিনি অভিনয় করেছেন। কোথাও ছোট রোল, আর কোথাও বড় রোল। সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে তাঁর কমেডি মিশ্রিত ষড়যন্ত্রী মন্ত্রীর ভিলেন চরিত্রের স্মৃতি দর্শকের কাছে আজও অমলিন। এখন তো বোম্বাইতে অনুপম খের ওই প্যাটার্নের অভিনয় করে প্রচুর হাততালি পাচ্ছেন।

শুধু ছবিতেই নয়, নাটকের ক্ষেত্রেও জহরদার কমেডির শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। প্রায় দুটি দশক জুড়ে তিনি ছিলেন রঙমহল মঞ্চের মুখ্য আকর্ষণ। যেমন ছিলেন স্টার থিয়েটারে ভানুদা আর কাশী বিশ্বনাথ এবং রঙ্গনা মঞ্চে অনুপকুমার। ওঁদের কমেডি নাটকগুলি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে একটা সময়ে কলকাতার চার পাঁচটি মঞ্চে একই সময়ে ছিল কমেডি নাটকের জয়জয়কার। এই তো সেদিন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘটক বিদায়' নাটক পর্যন্ত তারই জের চলেছে। সেইসব নির্ভেজাল হাসির দিনগুলি এখন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। এই যে দুর্দান্ত পপুলারিটি, এর আস্বাদ কিন্তু জহরদা এত সহজে পাননি। তার জন্যে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে, অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে। একদিন আধদিন নয়, দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর।

আগেই বলেছি অর্ধেন্দু মুখার্জি পরিচালিত 'পূর্বরাগ' ছিল জহরদার প্রথম ছবি। কিন্তু ওই ছবিতে দারুণ অভিনয় করার পরও জহরদা বেশ কিছুদিন অন্য কোনও ছবিতে চান্স পাননি। দীর্ঘ একটি বছর তাঁকে দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়েছে কাজের সন্ধানে। অবশেষে ১৯৪৮ সালে নিউ থিয়েটার্সের 'অঞ্জনগড়' ছবিতে ছোট্ট একটা সুযোগ পেলেন পরিচালক বিমল রায়ের অনুগ্রহেই বলা চলে।

কথায় কথায় জহরদা একদিন বলেছিলেন : ওই সময়ে কলকাতা শহরে কী ভাবে যে কাটিয়েছি তা চিন্তাও করতে পারবি না। একবেলা খাওয়া জুটেছে তো আর একবেলা জোটেনি। একটা সময়ে এমনও মনে হয়েছিল যে, আবার বোধহয় পাটনাতেই ফিরে যেতে হবে দর্জিগিরি করতে। ফিরেও হয়তো যেতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নরেনদার ভরসাতে থেকে গেলাম কলকাতায়।

আমি বললাম : নরেনবাবু কে?

জহরদা বললেন : নরেনদা তেমন কোনও নামকরা মানুষ নয় যে একডাকে চিনতে পারবি। ভদ্রলোক কাজ করতেন এ জি বেঙ্গলে। অবসর সময়ে জ্যোতিষচর্চা করতেন। ওঁর সঙ্গে এই মির্জাপুর স্ট্রিটের চায়ের দোকানে হঠাৎ আলাপ। উনি আমার বিমর্ষ ভাব দেখে নিজে থেকেই যেচে এসে হাতটা দেখতে চাইলেন। জ্যোতিষ-টোতিষে আমার কোনদিনই তেমন বিশ্বাস ছিল না। যারা ওইসব নিয়ে হইচই করত তাদের একটু করুণার চোখেই দেখতাম। তবু ভদ্রলোক যখন নিজে থেকে হাতটা দেখতে চাইলেন, তখন একবার দেখাতে ক্ষতি কী!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : হাত দেখে কী বললেন তিনি?

জহরদা বললেন : অনেকক্ষণ ধরে খুব মনযোগ দিয়ে নরেনদা আমার হাতটা উল্টেপাল্টে দেখলেন। তারপর বললেন, আপনার তো সাংঘাতিক হাত মশাই। আপনার ঠিকুজি কোষ্ঠী কিছু আছে? তা আমি বললাম, না, সেসব কিছু নেই। তখন নরেনদা বললেন, জন্মের সাল তারিখ মনে আছে? আমি বললাম, সেটা আছে। তখন উনি আমাকে হাতিবাগানের একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন, ওখান থেকে একটা কোষ্ঠী তৈরি করে নিন।

আমি বললাম : তৈরি করিয়েছিলেন নাকি?

জহরদা বললেন : করলাম বৈকি। নগদ পাঁচ টাকা খরচ করে কোষ্ঠী তৈরি করিয়েছিলাম।

আমি বললাম : সেই আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ সালে পাঁচ টাকায় তো অনেক দাম জহরদা?

জহরদা একটু হেসে বললেন : তা দাম ছিল বৈকি। তখন দশ টাকায় একটা হোটেলে মাসফুরণ খাওয়া যেত। আমার পনেরো দিনের খোরাকি চলে গিয়েছিল কোষ্ঠী তৈরি করাতে।

আমি বললাম : কোষ্ঠী বিচার করে কী বললেন নরেনবাবু?

জহরদা বললেন : কোষ্ঠী দেখে চমকে উঠলেন নরেনদা। আপনি থেকে একেবারে তুমিতে নেমে এলেন। বললেন, চায়ের দোকানে বসে তো কোষ্ঠী বিচার করতে পারব না। তুমি আমার সঙ্গে একবার আমার বাড়িতে যেতে পারবে?

তা নরেনদা একজন বুড়ো মানুষ। তিনি যখন নিজে থেকে এত আগ্রহ দেখাচ্ছেন তখন ওঁর বাড়িতে না যাবার কী আছে।

সেদিন প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে নরেনদা আমার কোষ্ঠী বিচার করলেন। তারপর বললেন : পাটনা ফিরে যাবার চিন্তা ছেড়ে দাও। এই কলকাতা শহরেই তোমাকে নিয়ে প্রচণ্ড মাতামাতি হবে। টাকা রাখবার জায়গা পাবে না।

জহরদা বললেন : কথাটা শুনে সেদিন ভীষণ হাসি পেয়েছিল। মনে হয়েছিল সবটাই বুজরুকি। আজ রাতে যার পকেটে খাবার পয়সা নেই, সে নাকি টাকা রাখবার জায়গা পাবে না!

আমি বললাম : নরেনবাবু তো ঠিকই ফোরকাস্ট করেছিলেন। ভদ্রলোকের ঠিকানাটা দাও না জহরদা। আমি একবার আমার হাতটা দেখিয়ে আসি।

কথাটা শুনে জহরদার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। বললেন : মাস ছয়েকের মধ্যে দুতিনটে ছবিতে কাজ পেয়ে গেলাম। হাতে কিছু পয়সাও এসে গেল। তাই একদিন দশ টাকার মিষ্টি কিনে নরেনদার বাড়িতে গিয়ে কী শুনলাম জানিস?

আমি বললাম : কী?

জহরদা বললেন : মাস দুয়েক আগে নরেনদা ধর্মতলা স্ট্রিটের ওপর একটা ট্রামের নিচে চাপা পড়ে মারা গেছেন। ওঁর পরিবারের সবাই ও-বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে তা কেউ বলতে পারল না।

বলতে বলতে জহরদার চোখ দিয়ে টপ টপ করে দু'ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

জহরদার ওই চোখের জল দেখে বুঝতে পারলাম, জহরদার ওপরটা আপাতদৃষ্টে একটু কঠিন দেখালেও ভেতরে একটি নরম মনের মানুষ লুকিয়ে আছে।

জহরদার এইরকম কান্নার আরও একটা ঘটনা আমি জানি। সেদিন ভরা দুপুরে জহরদা তাঁর 'বড়মা'র কোলে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে উঠেছিলেন। সে কথায় পরে আসছি।

জহরদা তাঁর সম পেশার জুনিয়ার কৌতুকশিল্পীদের প্রতি খুব সহানুভতিশীল ছিলেন। এটা তেমনই একটা ঘটনা। এটা শুনেছি হাসির গানের বিখ্যাত শিল্পী দীপেন মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকে। এটা দীপেনবাবুর জবানিতে বলতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু তাতে অনেকটা জায়গা লেগে যাবে বলে সংক্ষেপেই বলছি।

জহরদার সমকালে ফাংশান জমাতে পারতেন সেইরকম একজন বিখ্যাত কমেডিয়ান ছিলেন। তাঁর নাম শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দেখতে তেমন সুশ্রী ছিলেন না। তা নিয়ে দর্শকরা তাঁকে আদর করে 'ঘোড়ামুখো শেতল' বলে ডাকতেন। শীতলবাবু তাতে রাগ করতেন না, বরং উপভোগ করতেন। নিজের চেহারার কুশ্রিতা নিয়ে তিনি নিজেই কমিক করতেন। যেমন শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন : আমার চেহারা আর শ্যামল মিত্রের চেহারার মধ্যে তফাৎটা কী আছে মশাই? ওমলেটের এ পিঠ আর ও পিঠ। আমার পিঠে ভগবান দুটো কাঁচা লঙ্কা বেশি করে ফেলে দিয়েছেন, এই যা।

শীতলবাবু শুধু যে দারুণভাবে ফাংশান জমাতে পারতেন তাই নয়। তিনি একজন ভালো অভিনেতাও ছিলেন। অনেক ছবিতেই তাঁকে ছোট্ট অথচ মনে রাখার মতো ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গেছে। পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের 'পাশের বাড়ি' কিংবা সত্যেন বসুর 'বরযাত্রী' ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকদের দারুণ ভালো লেগেছিল। তাঁর একটি বিখ্যাত ডায়লগ 'কাক ছড়ালে ভাতের অভাব' দীর্ঘদিন লোকের মুখে মুখে ফিরত।

একবার মফস্বলের একটি অনুষ্ঠানে জহরদা শীতলবাবুর একটা কমিক স্কেচ শুনলেন। স্কেচটি ভারি মজার। একটি ছেলে একটি মেয়েকে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি কথা বলবে বলে। কিন্তু কথাটা কিছুতেই বলে উঠতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত একদিন পড়ন্ত বিকেলে আউটরাম ঘাটে গঙ্গার পাড়ে বসে যে কথাটি মেয়েটিকে শোনাল ছেলেটি, তা হল : আমি তোমায় ভালোবাসি।

এই ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলবার জন্যে সারা কলকাতা পরিক্রমার সময় ছেলেটির সেই প্রাণান্তকর প্রয়াস শীতলবাবুর বাক্য বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিত।

মফস্বলের সেই অনুষ্ঠানে জহরদা মন দিয়ে শীতলবাবুর এই কমিক-স্কেচটি শুনলেন। তার পরদিন সকালে তাঁকে ডেকে পাঠালেন নিজের মেসবাড়িতে।

শীতলবাবু আসতে জহরদা বললেন শেতল, তোব কালকের স্কেচটা আমার তো ভালোই লেগেছে। তবে ওটাকে আরও ভালো কবা যেত।

শীতলবাবু বললেন : তা এ সম্বন্ধে-একটু সাজেশান দাও না গুরু।

জহবদা বললেন : তোব স্কেচের ক্লাইম্যাক্সটা ঠিক জমল না। তোর ছেলেটি মেয়েটিকে যে ভালোবাসার কথা বলবে, সেটা শ্রোতাবা আগেই ধরতে পেরে গেছে। ওখানে তুই একটা কাজ কবতে পারিস।

শীতলবাবু বললেন : কী কাজ?

জহরদা বললেন . ক্লাইম্যাক্সে ছেলেটি মেয়েটিকে বলুক, তুমি হয়তো ভাবছ আমি তোমায় আমাকে ভালোবাসার কথা বলব। কিন্তু তা নয়, আমাকে ভালোবাসার দবকার নেই, স্বামী বিবেকানন্দেব আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তুমি সারা ভাবতবর্ষের মানুষকে ভালোবাসো। দেশকে ভালোবাসো। দেখবি ব্যাপারটা জমে যাবে।

শীতলবাবু বললেন . এটা তো তুমি ভালো বলেছ গুরু। স্কেচটা তাহলে অন্য একটা মাত্রা পায়।

জহরদা বললেন : এখানেই শেষ নাকি! দর্শক যখন হাততালি দেবে তখন সেই হাততালি থামিয়ে দিয়ে তোব ছেলেটি তার প্রেমিকাকে বলবে · আর সেই ভারতের মানুষ হিসেবে তুমি আমাকে একটু বেশি করে ভালোবেসো। দেখবি, হাততালির চোটে প্যান্ডেলে পায়বা উড়ে যাবে।

শীতলবাবু ঝট কবে নিচু হযে জহরদাব পাযেব ধুলো মাথায নিযে বললেন তোমার জবাব নেই গুরু।

হ্যাঁ, এইভাবেই জহরদা তাঁর সমশিল্পীদের পথ নির্দেশ করেছেন বার বার।

এবারে জহরদার সেই 'বড়মা'-র কোলে রেখে কান্নার ঘটনাটা বলি।

ষাটের দশকের শেষ ভাগে রঙমহল থিয়েটারের মালিকরা ঠিক কবেছিলেন থিয়েটার হলটাকে বিক্রি করে দেবেন। শিল্পীরা আব কর্মীরা সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক আবেদন নিবেদনেও যখন কোনও ফল ফলল না, তখন সবাই মিলে 'বঙমহল শিল্পীগোষ্ঠী' নামে একটা সংস্থা তৈরি করে আন্দোলনে নামলেন। আন্দোলনের সেই দীর্ঘ ইতিহাসে আমি যাচ্ছি না। তবে শেষ পর্যন্ত রঙমহল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন শিল্পীদের হাতে পরিচালন ভার তুলে দিতে। সংস্থার ডিরেকটার হিসেবে নির্বাচিত হলেন সরযূবালা দেবী এবং জহর রায়। মুখ্যত জহরদাই সব কিছু চালাতেন আর সরযূদি তাঁকে উপদেশ দিতেন।

বেশ কিছুদিন এইভাবে কাটল। কিন্তু তারপর জহরদার কী জানি কেমন মতিভ্রম ঘটে গেল। নানা বিষয়ে সরযূদির সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটতে লাগল। একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ নেপথ্যে থেকে জহরদাকে উৎসাহ যোগাতে লাগলেন। জহরদাও সরযূদির ওপর চাপ দিতে লাগলেন যাতে তিনি ডিরেক্টরশিপ ছেড়ে দেন।

কিন্তু সরযূদিও খুব দৃঢ় চরিত্রের মহিলা। শিল্পী ও কর্মীদের ক্ষতি হবে, এমন কোনও প্রস্তাবে মত দিতে তিনি রাজি নন। তিনি থিয়েটারে আসা বন্ধ করে দিলেন এবং বাড়িতে বসেই রঙমহল মঞ্চের দেখভাল করতে লাগলেন। জহরদার সঙ্গে সরযূদির মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধই হয়ে গেল।

এইভাবে কয়েক বছর কেটে যাবার পর একদিন গ্রীষ্মের এক ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে সরযূদির ডাঃ শ্যামাদাস রোডের বাড়ির কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দিতে ঘরে ঢুকলেন জহরদা। কোনও কথা না বলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সরযূদির কোলের উপরে। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন : বড়মা, আমার বড়মা কই! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও বড়মা।

জহরদা প্রথম যে নাটকে সরযূদির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তাতে সরযূদি বড়মা-র রোল

করেছিলেন। সেই থেকে জহরদা চিরকাল সরযূদিকে বড়মা বলে ডেকে এসেছেন।

জহরদার কান্না দেখে সরযূদি প্রথমে খানিকটা থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে জহরদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন : জহর, ওঠ বাবা! এমন করে কাঁদে না। তোর জন্যে আমারও যে বড় কষ্ট রে!

জহরদা কান্নাভেজা মুখ তুলে বললেন : আমার বড্ড খিদে পেয়েছে বড়মা!

সেই দুপুরে নিজের হাতে দুধ চিঁড়ে কলা সন্দেশ মেখে মা যেমন করে শিশুকে খাওয়ায় তেমনি করে জহরদাকে খাইয়ে দিয়েছিলেন সরযূদি। সব মান অভিমানের ইতি ঘটেছিল সেইদিন থেকে।

জহরদা জীবনে আর একটি বড় ব্লাণ্ডার করেছিলেন। তিনি একটি ছবি প্রযোজনা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অভিনয় করা এক জিনিস আর প্রযোজনা অন্য জিনিস। প্রযোজক হতে গেলে অনেক চতুর হতে হয়, অনেক কিছু ঘাঁতঘোঁত জানতে হয়। জহরদার সেরকম কোনও যোগ্যতাই ছিল না। তাই ছবি করতে গিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। কত কষ্ট করে তিল তিল করে জমানো টাকা সব শেষ হয়ে গেল। উলটে পঁচাত্তর হাজার টাকা দেনা ঘাড়ে চেপে গেল। সেই ষাটের দশকে পঁচাত্তর হাজার টাকার দাম কত সেটা কল্পনা করুন একবার।

সেই দেনা শোধ করতে জহরদাকে ফাংশানের মাত্রা বাড়াতে হয়েছিল। সেই সঙ্গে বেড়েছিল মদ্যপানেব মাত্রা। আমরা অনেকে চেষ্টা করেছিলাম ওই মাত্রাটা কমাতে। কিন্তু সক্ষম হইনি।

জহরদা একবার আমাকে বলেছিলেন : আমার মদ খাওয়াটা যে তুই পছন্দ করিস না, সেটা আমি বুঝি রে রবি। কিন্তু এক পাত্তর মদ পেটে না পড়লে আমার মাথায় যে কোনও আইডিয়া আসে না। সুস্থ অবস্থায় যেসব ভাবনা চিন্তা করি, সেসব মোটেই ভালো করে দানা বাঁধে না মদ না পেটে পড়া পর্যন্ত। আমার নিজের একজিসটেন্সটাকে টিকিয়ে রাখবার জন্যেই আমার মদ খাওয়া প্রয়োজন হয়। তার জন্যে আমার অনেক ফাংশান দরকাব। নতুন নতুন স্কেচের দরকার। আমার যে অনেক টাকার প্রয়োজন। জীবনে অনেক দারিদ্র্য ভোগ করেছি। এখন আমি দারিদ্র্যকে বড় ভয় পাই।

আমি জহরদাকে বলেছিলাম : কিন্তু এই মদ যে তোমার শবীরটাকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে সেটা কি তুমি বুঝতে পারছ না।

জহরদা বললেন : খুব বুঝতে পারছি। এরই মধ্যে শরীরে অনেক গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। তবে একটা কথা কী জানিস : মানুষ মরার জন্যে বিষ পান করে, আর আমাকে বিষ পান করতে হচ্ছে বেঁচে থাকবার জন্যে। এই তরল কালনাগিনীর ছোবল থেকে আমার মুক্তি নেই রে, মুক্তি নেই!

বলতে বলতে জহরদার চোখ দুটো জলে ভরে উঠত। আর তখন জহরদার ওই অসহায় মুখখানার দিকে তাকিয়ে আমার চোখেও জল এসে যেত।

এই মদ্যপানের প্রায়শ্চিত্ত জহরদা তাঁর নিজের জীবন দিয়েই করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। নানাবিধ রোগ তাঁর শরীবে আশ্রয় নিয়ে ফেলেছে। কী সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা ছিল তাঁর। শেষ পর্যন্ত সেই শরীর শুকিয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছিল। এবং পরিণত বয়সেব আগেই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

শেষ জীবনে জহরদাকে আমি একটা বড়সড় দুঃখ দিয়েছি। তাঁর রঙমহলের শেষ নাটকে তিনি স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। নাটক থামিয়ে রেখে তিনি প্রচুর এক্সটেম্পো ডায়লগ দিয়ে দিয়ে স্টেজটাকে ফাংশান পার্টির ডায়াসের চেহারা দিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যান্য শিল্পীরা তখন অসহায়ের মতো স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতেন।

'দেশ' পত্রিকায় আমি ওই নাটকের কঠোর সমালোচনা করেছিলাম। শেষ লাইনে জহরদাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলাম : কী বিরাট প্রতিভার কী শোচনীয় অপব্যয়।

সমালোচনা বেরোবার পর জহরদার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। লোকমুখে শুনেছিলাম, তিনি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। বিশেষ করে লেখাটা আমার কলম থেকে বেরিয়েছে বলে।

তার মাসখানেকের মধ্যেই জহরদা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। আমার তখন আর দুঃখ রাখবার জায়গা ছিল না। ক্ষমা চাওয়ারও আর উপায় নেই তখন!

মেডিকেল কলেজ থেকে জহরদার মৃতদেহ নিয়ে শোকমিছিল এগিয়ে চলেছে বিধান সরণি ধরে। বেথুন কলেজের সামনে এসে থেমে গেল শোককমিছিল। একটু দূরে থেমে থাকা একটি গাড়ি থেকে নামলেন শ্রীমতী সুচিত্রা সেন। ধীর পায়ে হেঁটে এসে লরিতে উঠলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন জহরদার মৃত মুখখানার দিকে। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন : তুমি চলে গেলে চার্লি!

তারপর ধীরে ধীরে নিচু হয়ে মৃতের কপালে ছোট্ট একটি চুম্বন এঁকে দিলেন।

আমি জানি না, প্রকাশ্য রাজপথে আর কোনও মৃত মানুষের প্রতি শ্রীমতী সুচিত্রা সেন এমন করে সম্মান জানিয়েছেন কি না?

অজিতবাবু

একটি চড়। হ্যাঁ, ওই একটি চড়ের দৌলতেই প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেলেন অভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। দিনের পর দিন কঠোর অনুশীলনের পরও যা আয়ত্ত করা যাচ্ছিল না, ওই একটি চড় আর কয়েক ফোঁটা চোখের জলের সুবাদে সেটি পেয়ে গেলেন তিনি।

কিন্তু সেই ঘটনাটি বলার আগে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় কে এবং কী, সেই সম্পর্কে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করছি। সারা জীবনে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে উনসত্তরটি নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। তাব মধ্যে অন্তত এক তৃতীয়াংশের তিনি নায়ক অথবা সহ-নায়ক। অদ্যাবধি পঞ্চাশখানি ছায়াচিত্রের তিনি কুশীলব। তারও এক-তৃতীয়াংশের বিশিষ্ট চরিত্রের রূপকার তিনি। পাঁচ-ছখানি ছবিতে তো নায়কই। দূরদর্শনে পাঁচটি নাটক এবং পাঁচখানি ধারাবাহিকে অভিনয় করার কৃতিত্ব আছে তাঁর। আর কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ১৯৪০ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রচাবিত প্রায় তিনশোটি নাটক অজিতবাবুর অভিনয়ে সমৃদ্ধ। অথচ অজিতবাবুর এমনই দুর্ভাগ্য যে কোনদিনই তাঁকে নিয়ে তেমন কোনও হইচই হয়নি। জীবনের একেবারে শেষ পর্বে সত্যজিৎ রায়ের কল্যাণে তাঁর 'শাখা-প্রশাখা' ছবিতে ন্যায়নিষ্ঠ পিতার চরিত্রে অভিনয় করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কিছুটা আস্বাদ পেয়েছেন। সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায়ের 'গুপী বাঘা ফিরে এলো' ছবিতে ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করে সারা ভারতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন। সত্যজিতের সর্বশেষ 'আগন্তুক' ছবিতেও ছোট্ট একটি ভূমিকায় তাঁর সাবলীল, সংযত, চরিত্রোচিত অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে।

এই শেষ বয়সে সত্যজিৎ তাঁকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন। অজিতবাবুকে দিয়ে বড় কিছু করাবার বাসনা ছিল তাঁর। সেটা অজিতবাবুর কাছে প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু অজিতবাবুর এমনই দুর্ভাগ্য যে সত্যজিৎ রায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সত্যজিতের প্রয়াণে ভারতীয় চলচ্চিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হল, বাংলা সংগীত ক্ষতিগ্রস্ত হল, বাংলা সাহিত্যেরও বেশ খানিকটা ক্ষতি হল, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কতটা ক্ষতি হল তা তিনি নিজেই জানেন। এর জন্য প্রায় প্রতিদিনই আক্ষেপ করতে হয় তাঁকে।

এই দুর্ভাগ্য নামক বস্তুটি শুধু আজ বলে নয়, সারা জীবনই অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী। নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কারণেই নবেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'আলেয়া' ছবিতে অজিতবাবুকে নায়ক করে মহরত করার পরও ছবি থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল তাঁকে। এটা সেই ১৯৪২ সালের ঘটনা।

অজিতবাবু তখন হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ড কোম্পানিতে স্টেনোগ্রাফারের চাকরি করেন। সেখানে মূলত তাঁরই উদ্যোগে এইচ এম ভি রিক্রিয়েশন ক্লাবের পত্তন হয়। অফিস ছুটির পর প্রায় প্রত্যহই তাঁদের রিহার্সাল হয়। সেবারে তাঁদের নাটক ছিল 'সিরাজদৌল্লা'। অজিতবাবুর ডিরেকশান। সিরাজের চরিত্রে উনিই অভিনয় করছিলেন।

ওই রিহার্সালেই অজিতবাবুর সঙ্গে এক ভদ্রলোকের আলাপ হয়ে গেল। তাঁর নাম সুধীর গুহ। সুধীরবাবু ছিলেন কে সি দে অ্যান্ড সন্সের ম্যানেজার। কে সি দে অ্যান্ড সন্সের দোকানটা ছিল হ্যারিসন রোড আর চিৎপুর রোডের মোড়ে। এখনকার নামানুসারে মহাত্মা গান্ধী রোড আর রবীন্দ্র সরণির সংযোগস্থলে। কে সি দে-র দোকানটি এখনও আছে। ওঁরা ছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানি অর্থাৎ এইচ এম ভি'র রেকর্ডের একজন বড় ডিলার।

তা একদিন ছুটির পর অজিতবাবুরা যখন পুরোদমে 'সিরাজদৌল্লা'র রিহার্সাল দিচ্ছেন, সেই সময় সুধীর গুহ মশাই গ্রামোফোন কোম্পানির যশোর রোডের অফিসে এলেন রেকর্ড কেনাবেচা সংক্রান্ত কী একটা জরুরি কাজে। কিন্তু তখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে। কাজেই যে কাজে আসা সেটা আর হল না।

গ্রামোফোন কোম্পানির অফিসে মুনশিজি বলে এক ভদ্রলোক কাজ করতেন। খুব দিলদরিয়া মানুষ ছিলেন তিনি। কোনও কাজ হল না দেখে সুধীরবাবু যখন ফিরে আসছেন, তখন মুনশিজিই তাঁকে বললেন : কাজ যখন হল না, তখন আমাদের ছেলেদের রিহার্সাল দেখে যান একটু।

সুধীরবাবু বললেন : তাই নাকি! আপনারা আজকাল গান-বাজনার ব্যাপার ছেড়ে নাটক-টাটকও করছেন নাকি?

মুনশিজি বললেন : ও কথা বলছেন কেন? আমরা তো গানের পাশাপাশি নাটকও রেকর্ড করি। আপনাদের দোকান থেকেই তো শ'য়ে শ'য়ে নাটকের রেকর্ড বিক্রি করেছেন আপনারা।

সুধীরবাবু বললেন : সে তো মশাই পেশাদার শিল্পীদের নাটক। এখন থেকে কি আপনারা অফিসের কর্মচারীদের করা নাটকও রেকর্ড করাবেন নাকি? সে সব নাটকের সেলের গ্যারান্টি দিতে পারব না কিন্তু।

মুনশিজি হাসতে হাসতে বললেন : গ্যারান্টি দিতে হবে না আপনাকে। ও নাটক রেকর্ডই হবে না তো গ্যারান্টির কথা উঠছে কেন! ওটা আমাদের রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাটক। তারই রিহার্সাল চলছে।

সুধীরবাবু অবাক হয়ে বললেন : তাই নাকি! আপনাদের এখানে রিক্রিয়েশন ক্লাব আছে নাকি? কই, আগে তো কখনও শুনিনি!

মুনশিজি বললেন : শুনবেন কোথা থেকে! এ বছরই নতুন করা হয়েছে ক্লাবটা। এর আগে দু-চারবার রিক্রিয়েশন ক্লাব তৈরির চেষ্টা করেছিলাম আমরা। কিন্তু কারও কোনও উৎসাহ নেই দেখে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। এবারে অজিত বলে একটি ছেলে, আমাদের এখানে স্টেনোর কাজ করে, সেই উদ্যোগ-আয়োজন করে ক্লাবটাকে খাড়া করেছে। ছেলেটি বেশ ভালো অভিনয় করে। অজিত নিজেই ডিরেকশান দিচ্ছে। চলুন না, খানিকক্ষণ বসে রিহার্সাল দেখে যাবেন।

সুধীরবাবু মুনশিজির অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। ভেবেছিলেন মিনিট দশ-পনেরো রিহার্সাল শুনে আবার চিৎপুরে ফিরে যাবেন। কিন্তু রিহার্সাল দেখতে বসে আটকে গেলেন। বাঃ, দারুণ অ্যাকটিং করছে তো অজিত নামের ওই ছেলেটি। ডিরেকশানও দিচ্ছে বাংলা থিয়েটারের পাকা ডিরেক্টাররে মতো।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন রিহার্সাল ভাঙল তখন মুনশিজিকে দিয়ে অজিতবাবুকে কাছে ডাকলেন সুধীরবাবু। বললেন : তোমার কণ্ঠস্বরটি তো বড় ভালো হে! চেহারাটিও বেশ সুঠাম। তুমি সিনেমায় অভিনয় করবে?

সুধীরবাবুর কথা শুনে হেসে ফেললেন অজিতবাবু। বললেন : অভিনয় করার আমার খুব শখ। তবে সিনেমায় অভিনয় করব এত বড় আশা আমি করি না। আর আশা করলেই বা আমাকে সুযোগ দিচ্ছে কে?

সুধীরবাবু বললেন : তুমি যদি রাজি থাকো তাহলে আমি একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি। সিনেমার কিছু কিছু ডিরেক্টারের সঙ্গে আমার চেনা আছে। তাদের বলে দেখতে পারি। মনস্থির করে কাল-পরশু নাগাদ আমার সঙ্গে আমাদের দোকানে দেখা কোরো। আমাদের দোকানটা কোথায় সেটা মুনশিজির কাছ থেকে জেনে নিও।

অজিতবাবু বললেন : আমি আপনাকে চিনি, আপনাদের দোকানটাও জানি। আপনি আমাদের একজন বড় ডিলার। কতদিন আপনাকে আমাদের অফিসে দেখেছি।

তার পরের দিনই অজিতবাবু কে সি দে অ্যান্ড সন্সে গিয়ে সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু সে ঘটনায় যাবার আগে মুনশিজির জীবনের সর্বশেষ ঘটনাটার কথা একটু বলে নিই। যে ঘটনাটা বলতে গিয়ে আজ এই চুরাশি বছর বয়সেও অজিতবাবু চোখের জল ফেলেন।

এইচ এম ভি রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রথম বছরের নাটক হয়েছিল 'সিরাজদ্দৌলা'। সে নাটক বেশ সাকসেসফুল হয়েছিল। পরের বছরের নাটক নির্বাচিত হয়েছিল 'প্রতাপাদিত্য'। বলা বাহুল্য এবারেও নাটকের পরিচালক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান চরিত্র প্রতাপের ভূমিকাতেও তিনি। কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ করবার আগে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিল। সঙ্কট মোচনের জন্য নানা চেষ্টা করেছিলেন অজিতবাবু। ড্রেস

ভাড়া দেবার ক্ষমতা ছিল না বলে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি ড্রেস ভাড়া নিয়েছিলেন মাত্র। বাকি সব ড্রেস এর বাড়ি ওর বাড়ির পুরনো শাড়িটাড়ি যোগাড় করে রাতের পর রাত জেগে নিজের হাতে সেলাই করেছিলেন।

কিন্তু এত করেও বোধহয় শেষ রক্ষা হয় না। আর্থিক অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছল যে শেষ পর্যন্ত নাটক বন্ধ করে দেবার কথা চিন্তা করতে হল অজিতবাবুদের।

অবশেষে মুশকিল আশান করতে এগিয়ে এলেন মুনশিজি। অজিতবাবুকে আড়ালে ডেকে বললেন : শোনো অজিত, নাটক বন্ধ করা চলবে না। আমি তোমাকে দু-একদিনের মধ্যে আড়াইশোটা টাকা দেব। আশা করি তাতেই তোমার ঘাটতি পুষিয়ে যাবে। আর এই টাকা দেবার ব্যাপারটা একদম যেন পাঁচকান না হয়। শুধু তুমি জানবে আর আমি জানব।

কথাটা শুনে কেঁপে উঠলেন অজিতবাবু। কী সর্বনাশ! এতগুলো টাকা দেবেন মুনশিজি! আড়াইশো টাকা যে তাঁর চার মাসের মাইনের সমান! নিজের আবেগটাকে আর চেপে রাখতে পারলেন না। চোখে জল এসে গেল অজিতবাবুর।

ওঁর চোখে জল দেখে মুনশিজি সস্নেহে অজিতবাবুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন : এত তুচ্ছ কারণে ইমোশনাল হলে চলে! তোমার সামনে এখন অনেক কাজ। আর মাসখানেক বাদে স্টেজ শো। এখন অন্য কোনও ব্যাপারে মনটাকে অস্থির কোরো না।

পরের দিন মুনশিজি অফিসে এলেন না। খবর এল উনি খুব অসুস্থ। আর তার দিন চারেক পরেই মারা গেলেন মুনশিজি।

খবরটা শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল অজিতবাবুর। একদিকে মুনশিজির মতো অমন স্নেহপ্রবণ মানুষের মৃত্যুর দুঃখ, অপরদিকে 'প্রতাপাদিত্য' নাটক মঞ্চস্থ করতে পারবেন কিনা সেই চিন্তা। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ঠিক করলেন নাটক বন্ধ করে দেবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটক বন্ধ হল না। কোম্পানির সাহেবরা ঘাটতির টাকাটা মিটিয়ে দিলেন। তাঁরা নাটক বন্ধ হতে দিলেন না দুটি কারণে। প্রথমত এত তোড়জোড়ের পর নাটক বন্ধ হয়ে গেলে কোম্পানির বদনাম। দ্বিতীয়ত, নাটকের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা আশাহত হয়ে পড়বেন। তাঁদের মনোবল ভেঙে যাবে। এটা কোম্পানির পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং ঠিক হল নির্দিষ্ট দিনেই রঙমহল মঞ্চে এইচ এম ভি রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক 'প্রতাপাদিত্য' নাটক মঞ্চস্থ হবে।

কিন্তু ওই নাটক অভিনীত হবার আগে আরও একটি নাটক ঘটে গেল।

মুনশিজি মারা যাবার দিন পাঁচেক পরে অফিসের সাহেবরা তাঁর বাড়িতে গেলেন মুনশিজির বিধবা পত্নীকে সমবেদনা জানাবার জন্যে। যথারীতি সমবেদনা পর্বের পর মুনশিজির স্ত্রী বললেন : আপনাদের মধ্যে অজিতবাবু কে?

সাহেবরা থতমত খেয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে তো অজিতবাবু বলে কেউ নেই। হঠাৎ একজনের মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের অফিসে অজিত ব্যানার্জি বলে একজন আছে। সে আমাদের স্টেনো। কিন্তু সে তো আমাদের সঙ্গে আসেনি। অনেক জুনিয়ার তো! আমাদের সঙ্গে আসতে লজ্জা পায়। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো? অজিতের কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

মুনশিজির স্ত্রী বললেন : আমার স্বামী অসুস্থ অবস্থায় ঘোরের মধ্যে বার বার অজিতবাবুর নাম করতেন। কেবলই বলতেন : দেখো অজিত, নাটক যেন বন্ধ না হয়।

এই বলে মুনশিজির স্ত্রী ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন আড়াইশোটা টাকা নিয়ে। সেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন : মৃত্যুর আগে উনি বলে গেছেন এই টাকাটা অজিতবাবুর হাতে পৌঁছে দিতে। আপনারা দয়া করে এই টাকাটা ওঁর কাছে পৌঁছে দেবেন।

টাকাটা হাতে পেয়ে অজিতবাবু ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। মুনশিজির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওই নাট্যপাগল মানুষটির মনে এত স্নেহ জমা হয়ে ছিল তাঁর জন্যে। মরবার সময় মানুষ ঈশ্বরের নাম করে। আর মুনশিজি করেছেন নাটকের নাম। এই ভালোবাসার তুলনা হয়?

শেষ পর্যন্ত অনেক শলা-পরামর্শের পর স্থির হল, ওই টাকা দিয়ে মুনশিজির স্মৃতিতে একটা পুরস্কার

ঘোষণা করা হবে। 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে সেই পুরস্কারটি দেওয়া হবে।

তিনজন বিশিষ্ট নাট্যবোদ্ধাকে নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা সব ব্যস্ত মানুষ। একটি অ্যামেচার নাটকের পেছনে তাঁদের দেবার মতো অতো সময় নেই। তাই ঠিক হল নাটকের প্রথম অঙ্কের পর সেই মধ্যপর্বেই তাঁরা পুরস্কারপ্রাপকের নাম ঘোষণা করে দেবেন।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটল উল্টো। বিচারকরা একেবারে শেষ পর্যন্ত নাটকটি দেখলেন মনোযোগ দিয়ে। তারপর ওঁদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি মঞ্চে উঠে ঘোষণা করলেন : কথা ছিল আমরা নাটক চলাকালীনই পুরস্কার ঘোষণা করব। কিন্তু নাটকটি এত ভালো হচ্ছিল এবং প্রতিটি অভিনেতাই এত ভালো অভিনয় করছিলেন যে আমরা ঠিক করতে পারছিলাম না কাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার দেব। এবং এখনও পর্যন্ত আমরা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি যে কে এই নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। সুতরাং আমরা এই নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে কোনও পুরস্কাব দিচ্ছি না।

এই কথা শোনার পর হলের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। দর্শকরা একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। এ আবার কেমনধারা বিচার! তাহলে কি ওঁরা কাউকেই পুরস্কার না দিয়ে চলে যাবেন।

দর্শকদের মনের কথা সম্ভবত বুঝতে পারলেন বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। তাই তিনি গলাটাকে একটু ঝেড়ে নিয়ে বললেন : আপনারা হয়তো ভাবছেন আমরা কাউকে পুরস্কার না দিয়ে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু তা নয়। আমরা অনেক আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রায় প্রতিটি শিল্পীর কাছ থেকে এমন অপূর্ব অভিনয় আদায় করে নিয়েছেন, সেই নাট্যপরিচালক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারে ভূষিত করছি।

ঘোষণাটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রেক্ষাগৃহে তুমুল হাততালি। ওই করতালিধ্বনির মধ্যে মঞ্চে এসে পুরস্কারটি নিতে গিয়ে আরও একবার কেঁদে ফেলেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেদিনের সেই ঘটনাটির কথা বলতে গিয়ে আজও চোখে জল এসে গেল অজিতবাবুর। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন : জানো ভাই রবি, সেদিন মুনশিজির স্মৃতিবিজড়িত পুরস্কারটা হাতে পেয়ে যে ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, জীবনে আর কখনও সেরকম অভিভূত হইনি। এমন কি ১৯৮৮ সালে বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তিতে 'স্টার' থিয়েটারের রুপোর মেডেলটা গলায় ঝুলিয়েও তেমন রোমাঞ্চিত হইনি, যেটা আমাকে দেওয়া হয়েছিল আমার সারা জীবনের নাট্যাভিনয়ের কৃতিত্বের জন্যে।

যাই হোক, এখন আমরা ফিরে যাই চলুন চিৎপুরের কে সি দাস অ্যান্ড সন্সের দোকানে, যেখানে অজিতবাবু দেখা করতে গেছেন সুধীর গুহ মশাইয়ের সঙ্গে।

পরের দিন নয়, তার পরের দিন অজিতবাবু সুধীরবাবুর দোকানে এলেন। ওঁকে দেখে সুধীরবাবু বললেন : তোমার ব্যাপারে আমি নবেন্দুবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি 'আলেয়া' বলে একটা ছবি করতে চলেছেন। নতুন নায়ক খুঁজছিলেন। তাঁকে আমি তোমার কথা বলেছি। তুমি একবার পরশুদিন সন্ধেবেলা আমাদের দোকানে এসো। নবেন্দুবাবুও আসবেন। তিনি তোমার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলবেন।

অজিতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : তাহলে কি আমি অফিসে চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিয়ে দেব?

সুধীরবাবু হাসতে হাসতে বললেন : আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, কোথায় কী তার ঠিক নেই আর তুমি এখন থেকেই চাকরি ছাড়তে চাইছ! তোমার দেখছি গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল। দাঁড়াও, আগে নবেন্দুবাবু তোমাকে পছন্দ করুন, টাকা-পয়সার কথাবার্তা পাকা হোক, তারপর দেখতে হবে চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে শুটিং করা যায় কিনা। সেটা যদি সম্ভব না হয় তখন তো চাকরি ছাড়তেই হবে। তবে আমার মনে হয় দুম্ করে চাকরি ছাড়াটা ঠিক হবে না। যুদ্ধের বাজারে এখন অবশ্য চাকরির ছড়াছড়ি। কিন্তু সে সব চাকরির স্থায়িত্ব তো বেশিদিন নয়। যুদ্ধ ফুরোলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাতে বিল্বপত্র ধরিয়ে দেবে। গ্রামোফোন কোম্পানির মতো একটা কোম্পানির চাকরি ছাড়বার আগে অনেক সাত পাঁচ ভাবতে হবে। তুমি একবার পরশুদিন সন্ধেবেলা দোকানে চলে এসো।

নবেন্দুবাবু একবার দেখেই পছন্দ করে ফেললেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বললেন : তোমার হাইটটা ভালো, ফেস্ কাটিংও ভালো। উচ্চারণ বেশ স্পষ্ট। তোমার আর স্ক্রিন-টেস্ট নেব না। 'আলেয়া' ছবির নায়ক হিসেবে তোমাকে আমি সিলেক্ট করলাম। মহালয়ার দিন তোমাকে নিয়েই মহরত করব।

নবেন্দুসুন্দরের কথা শুনে অজিতবাবু আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলেন। অ্যামেচার থিয়েটার থেকে একেবারে সিনেমার হিরো! ভাবা যায়।

কিন্তু পুরোটা আনন্দ যেন পেয়েও পাচ্ছিলেন না অজিতবাবু। মাইনেপত্রের কথা তো কিছু বলছেন না! চাকরি ছাড়তে হবে কিনা তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। শুনেছেন ফিল্মের হিরোদের সঙ্গে নাকি কন্ট্রাক্ট সই হয়। কই, তাঁর বেলা তো তেমন কিছু হচ্ছে না।

নবেন্দুবাবু যেন মনের কথাটা বুঝতে পারলেন অজিতবাবুর। বললেন : টাকা-পয়সার ব্যাপারে সুধীরবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে। সেটা ওঁর কাছ থেকে শুনে নিও। তবে ইমিডিয়েটলি যেন চাকরি ছেড়ো না। ফিল্মের হিরো হিসেবে তুমি দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না সেটা তো ছবি রিলিজের আগে বোঝা যাবে না। সেরকম যদি ডিমান্ড তৈরি হয় তোমার, তখন তো চাকরি ছাড়তেই হবে। আপাতত ছুটি নিয়ে নিয়ে আমার ছবির শুটিং কোরো। আমি তোমার সঙ্গে ডেট অ্যাডজাস্ট করব।

ব্যস্ ওই এক সিটিংএই 'আলেয়া' ছবির নায়ক নির্বাচিত হয়ে গেলেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, ওই পরিচালক নবেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ই উত্তমকুমারকে প্রথম নায়ক হবার সুযোগ দিয়েছিলেন তাঁর 'কামনা' ছবিতে।

নির্দিষ্ট দিনটিতে ধুমধাম করে মহরত হয়ে গেল 'আলেয়া' ছবির। ক্যামেরার সামনে প্রথম দাঁড়ালেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সারা মনে প্রচণ্ড উত্তেজনা। মনে মনে ঈশ্বরকে প্রণাম জানালেন এই সৌভাগ্যের জন্যে।

কিন্তু ঈশ্বরের মনে যে অন্য ভাবনা খেলা করছিল তা কি অজিতবাবু জানতেন? সেদিন রাত্রে প্রচণ্ড জ্বর এসে গেল অজিতবাবুর। খবর পেয়ে পরের দিন ওঁদের বাড়িতে ছুটে এলেন সুধীরবাবু আর নবেন্দুবাবু। পরের দিনের শুটিং ক্যানসেল করে দিলেন তাঁরা। সে জ্বর কিন্তু পরের দিনও ছাড়ল না। বরং বাড়তেই লাগল।

পরিচালক নবেন্দুবাবু পড়ে গেলেন মহা ফাঁপরে। স্টুডিওতে তাঁর সেট তৈরি হয়ে পড়ে আছে। শুটিং না করতে পারলে সেট ভেঙে দিতে হবে। তাতে অনেক টাকা জলে চলে যাবে। তা সত্ত্বেও অজিতবাবুর রোগমুক্তির আশায় আরও দুটো দিন অপেক্ষা করলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে নতুন নায়ক নিয়েই শুটিং শুরু করতে হল। যে 'আলেয়া' ছবির নায়ক হবার কথা ছিল অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের, শেষ পর্যন্ত সে ছবির নায়ক হলেন প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়।

ঘটনাটা শুনতে শুনতে আমি বলে উঠলাম : প্রথম ছবির বেলায় এইভাবেই তাহলে ভাগ্যের হাতে মার খেতে হল আপনাকে?

অজিতবাবু বললেন : শুধু কি ওই একবার! সারা জীবনে কতবার যে আমাকে ভাগ্যের হাতে মার খেতে হয়েছে তার কোন ঠিক ঠিকানা আছে নাকি! পরের ছবির বেলাতেও তো তাই হল। তবে এবারে আর ভাগ্যের হাতে নয়, মার খেতে হল ভারত সরকারের হাতে। সে কথায় পরে আসছি।

আর দুটো বছর গেলেই অভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেশাদার অভিনয় জীবনের হীরক জয়ন্তী, অর্থাৎ ষাট বছর পূর্ণ হবে। এই দীর্ঘ অভিনয় জীবনের প্রথম পর্বে তিনি পেয়েছেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক শিশিরকুমার ভাদুড়ির সস্নেহ সাহচর্য, আর শেষ পর্বে পেয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের চিরকালীন বিস্ময় সত্যজিৎ রায়ের সাগ্রহ সহযোগিতা। এর কোনটাই কিন্তু দয়ার দাক্ষিণ্য নয়। এগুলি হল অজিতবাবুর অনুশীলনলব্ধ অভিনয় নৈপুণ্যের যথার্থ স্বীকৃতি।

এই যে দুই যুগের দুই যুগন্ধর প্রতিভার সমর্থন অজিতবাবু পেয়েছিলেন, তার পেছনের আসল কারণটা কী? আমার মনে হয়, সেটা হল নর্মাল অ্যাকটিং-এর দিকে অজিতবাবুর প্রবণতা। কি থিয়েটার কি সিনেমা, সর্বত্রই তাঁর অ্যাকটিং ছিল স্বাভাবিক। ভয়ানকভাবে স্বাভাবিক। সেই চল্লিশের দশকে স্টার থিয়েটারের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে অজিতবাবুর অভিনয় আমি দেখেছি। মফস্বলের দর্শকদের মুখের দিকে তাকিয়ে স্টার থিয়েটারে তখন একটু চড়া সুরে অভিনয় করা হত। কিন্তু অজিতবাবু কখনও সে রাস্তা ধরে হাঁটেননি। তিনি তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়ই করে গেছেন ওইসব নাটকে।

মফস্বলের দর্শকদের কথা উঠতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। গ্রাম বাংলার দর্শকরা যে কোনও

কারণেই হোক স্টার থিয়েটারকে তখন বেশি পছন্দ করতেন। শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমার ভাদুড়ি, রঙমহলে অহীন্দ্র চৌধুরী, মিনার্ভা মঞ্চে নির্মলেন্দু লাহিড়ি, কিংবা নাট্যভারতীতে ছবি বিশ্বাসের প্রতি মফস্বলের দর্শকদের যতটা না আগ্রহ ছিল, তার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি ছিল স্টার থিয়েটারে মহেন্দ্র গুপ্তর প্রতি। সেটা ঐতিহাসিক নাটকের কারণে হতে পারে, আবার অভিনয়ের ভঙ্গির জন্যেও হতে পারে। আর স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষও মফস্বলেব দর্শকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। মূল প্রেক্ষাগৃহের বাঁদিকে নিচের তলার একটি বড় ঘরে স্ত্রী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের বিশ্রাম নেবার জন্য বিশেষ রকম ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানে শোওয়া বসা, এমন কি শৌচকর্মের জন্যও বন্দোবস্ত ছিল।

এটাই সব নয়। গ্রাম বাংলার দর্শকদের জন্য স্টার কর্তৃপক্ষ হলের পেছনের দিকের দুটি রো-তে স্বল্পমূল্যের টিকিটের ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। এই সুযোগ-সুবিধা অন্য কোনও প্রেক্ষাগৃহে ছিল না। এই স্বল্পমূল্যে থিয়েটাব দেখার ব্যবস্থা বহুদিন বলবত ছিল। স্টার থিয়েটারকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করার পর বোধহয় এই ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটে।

সেই যুগে স্টাব থিয়েটারে মহেন্দ্র গুপ্তর মতন একজন উচ্চশিক্ষিত নাট্যকার পরিচালক অভিনেতাকেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত চড়া সুরে অভিনয় করতে দেখেছি গ্রাম বাংলার দর্শকের মুখ চেয়ে। কিন্তু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে কদাপি নয়। যার পুরস্কার অজিতবাবু পেয়েছিলেন পরবর্তীকালে। প্রবীণ শিশিরকুমার ভাদুড়ি থেকে শুরু করে নবীন নাট্যপরিচালক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়েব কাছেও অজিতবাবু একই ভাবে গ্রহণীয় ছিলেন কালের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও। যাঁরা শ্রীরঙ্গম মঞ্চে শিশিরকুমারের সঙ্গে 'বিপ্রদাস' নাটকে অজিতবাবুর অভিনয় এবং রঙমহল মঞ্চে সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে 'নীলকণ্ঠ' নাটকে অজিতবাবুর অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা আমার এই উক্তির যাথার্থ্য খুঁজে পাবেন। উভয় ক্ষেত্রেই সম্ভবত স্বাভাবিকতার ব্যাপারটি ছিল একমাত্র বিচার্য।

কোনও অবস্থাতে এবং কোনও প্রলোভনেই এই স্বাভাবিকতা বিসর্জন দিতে অজিতবাবু রাজি হননি? তাঁর কাছে যাত্রাজগৎ থেকে একাধিকবার আহ্বান এসেছিল। অজিতবাবু সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তা নিয়ে একটা মজাব ঘটনা আছে। একবার অজিতবাবুর এক স্নেহভাজন অভিনেতা তাঁব কাছে এসেছিলেন যাত্রায় যোগদানের অফার নিয়ে। তিনি তখন যাত্রা জগতের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর সঙ্গে ওই দলের মালিকও ছিলেন। বেশ মোটা টাকার অফার দিলেন তাঁরা অজিতবাবুকে। অজিতবাবু ধীর স্থিরভাবে তাঁদের সব কথা শুনলেন। তারপর বললেন . না ভাই, আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

অভিনেতাটি বললেন · কেন দাদা? টাকার অঙ্কটা কী আপনার পছন্দ হচ্ছে না?

অজিতবাবু বললেন · না না, তা কেন। তোমরা তো অনেক টাকাই দিতে চাইছ। আমি থিয়েটার থেকেও কখনো এত টাকা পাইনি।

অভিনেতাটি বললেন তাহলে?

অজিতবাবু বললেন : তোমাদের ওখানে যে ধরনের অভিনয় করতে হবে, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দলের মালিক বললেন : এ আপনি কী বলছেন দাদা। আপনার মতো একজন বড় মাপের অ্যাক্টর যাত্রায় অভিনয় করতে পারবেন না, এটা বিশ্বাস করি না। আমরা অনেক ভেবে-চিন্তেই আপনার কাছে এসেছি। আপনি রাজি হয়ে যান। টাকার অঙ্কটা যদি পছন্দ না হয় তাহলে খোলাখুলি বলতে পারেন। আমরা টাকাটা আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিতে রাজি আছি।

অজিতবাবু বললেন : তোমরা একদম ভুল ভাবছ। কথাটা টাকার নয়। কথাটা প্রিন্সিপ্যালের। আমি যে ধরনের অভিনয় করি সেটা তোমাদের যাত্রায় চলবে না। জোর করে যদি নামাতে চাও তাহলে আসরে দাঁড়িয়ে আমাকে ঢিল খেতে হবে। তাতে আমার রক্ত ঝরবে আর তোমাদের সাজের বাক্স পুড়বে।

অভিনেতাটি বললেন : এবার আপনি হাসালেন দাদা। আপনার হাত ধরে যারা অভিনয় শিখেছে, তারা পর্যন্ত যাত্রায় গিয়ে ফাটাচ্ছে, আর আপনি কিনা ঢিল খাবেন! এটা বিশ্বাস করতে হবে?

অজিতবাবু বললেন : আবার ভুল করছ। তোমাদের টিপিক্যাল যাত্রার অভিনয় যে আমি করতে পারি না তা নয়। কিন্তু করব না। এক-একজন মানুষের এক-এক রকম প্রিন্সিপ্যাল থাকে তো! আমি

তার বাইরে যেতে রাজি নই। তাতে তোমরা আমাকে যত টাকাই দাও না কেন।

যাত্রার মালিক আর তরুণ অভিনেতাটি বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একজন অভিনেতাব কথা মনে পড়ছে। তিনি হলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। অত্যন্ত শক্তিমান অভিনেতা ছিলেন তিনি। তাঁর ট্যালেন্টের প্রতি আমি অসম্ভব শ্রদ্ধা পোষণ করি। তিনিও বছর দু-তিন যাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় এই ঘটনাটি একদিন তাঁর বাড়িতে বসে তাঁর কাছ থেকে শুনেছি। ঘটনাটি খুব ইন্টারেস্টিং।

অজিতেশবাবু প্রথম যে বছর যাত্রায় যান, সে বছর তাঁকে 'রাবণ' বলে একটি পালায় রাবণের চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছিল। যাত্রায় অভিনয় করলেও অজিতেশবাবু তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেননি। তিনি তাঁর নিজের মতো করেই রাবণের চরিত্রে অভিনয় করতেন।

একবার মেদিনীপুর জেলার এক গঞ্জে অভিনয় করতে গেছে অজিতেশবাবুর দল। ওই 'রাবণ' পালা অভিনয হচ্ছে সেখানে। পালা শেষ হয়ে গেছে। রাত তখন বারোটা। অজিতেশবাবু সাজঘরে বসে মেক-আপ তুলছেন। এমন সময় এক ভদ্রলোক এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোককে দেখে মনে হয় প্রৌঢ়ত্বের সীমা সবে পেরিয়েছেন। তিনি সাজঘরে ঢুকে অজিতেশবাবুর কাছে এসে বললেন : আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

অজিতেশবাবু আয়নার দিকে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বললেন : নিশ্চয় বলতে পারেন। তা আপনি দাঁড়িয়ে কেন!

এই বলে একটি পোশাকেব ট্রাঙ্ক দেখিয়ে ভদ্রলোককে বললেন : ওই বাক্সটার ওপর বসুন।

ভদ্রলোক বসলেন।

অজিতেশবাবু বললেন : এবার বলুন কী বলতে চান। একটু সংক্ষেপে বলবেন কিন্তু। আমাকে আবার এক্ষুনি কলকাতা ফিরতে হবে। কাল আমার শুটিং আছে সকাল ন'টা থেকে। তার আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে।

ভদ্রলোক বললেন : আপনার 'রাবণ' দেখলাম।

ভদ্রলোকের কথা শুনে অজিতেশবাবু মনে মনে পুলকিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিও বোধ করলেন। এখনই তো ভদ্রলোক ওঁর অভিনয়ের প্রশংসা শুরু করবেন। কিন্তু সামনাসামনি বসে প্রশংসা পরিপাক করা তো সহজ কথা নয়। অজিতেশবাবু এ ব্যাপারে ভয়ানক লাজুক। তবু ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন : কেমন লাগল আমাদের পালা?

ভদ্রলোক বললেন : যাচ্ছেতাই।

চমকে উঠলেন অজিতেশবাবু। একেবারে মুখের ওপর এমন নির্মম সমালোচনা কখনও শোনেননি।

ভদ্রলোক তখনও বলেই চলেছেন : এই কী পৌরাণিক পালার ছিরি? আপনার উচিত মোহনবাবুর কাছে অ্যাকটিং শিখে আসা।

অজিতেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : মোহনব্যবু কে?

ভদ্রলোক শ্লেষের সঙ্গে বললেন : যাত্রা করতে নেমেছেন আর মোহন চ্যাটার্জীকে চেনেন না। পৌরাণিক পালার গুরুদেব মশাই। আসরে দাঁড়িয়ে এক-একখানি হাসি যা দেন তার দাপটে সারা গ্রাম কেঁপে কেঁপে ওঠে।

অজিতেশবাবু বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, মোহন চ্যাটার্জির নাম শুনেছি বইকি! উনি তো যাত্রার একজন বড় দরের অভিনেতা। খুব গুণী মানুষ।

ভদ্রলোক বললেন : হ্যাঁ। তার পায়ের কাছে বসে দু'বছর অভিনয় করা শিখুন, তারপর যাত্রার আসরে নামবেন।

ভদ্রলোকের কথায় অজিতেশবাবু একদম চটলেন না। বেশ ঠাণ্ডা মাথাতেই বললেন : আচ্ছা, আপনি রাবণের চরিত্রে কি রকম হাসি পছন্দ করেন বলুন তো? এই রকম কি?

এই বলে অজিতেশবাবু ভদ্রলোকের সামনে কখনও উড়নতুবড়ি হাসি, কখনও পায়রাওড়ানো হাসি, কখনও অন্ধকূপ হাসি, কখনও ফোয়ারা হাসি, কখনও ঢেউখেলানো হাসি ইত্যাদি প্রায় দশ-বারো

রকমেব হাসি হেসে দেখিয়ে বললেন : এইবকম হাসি হলে চলবে আপনার?

ভদ্রলোক অজিতেশবাবুর মুখ থেকে এই ধবনের নানা প্রকার হাসি শুনতে শুনতে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন : আপনার স্টকে এত রকমের হাসি থাকতে আসরে তার একটাও দেখালেন না! কী ব্যাপার বলুন তো!

অজিতেশবাবু বললেন : এসব ম্যাজিক আমি জানি। কিন্তু করবো না। আমি যাত্রায় এসেছি যাত্রার অভিনয়ের ধারাটাকে বদলে দেবার জন্যে। সুতরাং আমি আমার মতোই অভিনয় করবো।

ভদ্রলোক বললেন : কিন্তু অভিনয়ের ধারা বদলাবার দরকার হচ্ছে কেন?

অজিতেশবাবু বললেন দরকার হচ্ছে, কাবণ পৃথিবীটা বদলে যাচ্ছে বলে। আপনি একশো বছর আগের পোশাক আজ আর পরেন না কেন? চুলেব টেড়িব ধরন বদলে ফেলেছেন কেন? খড়ম কিংবা ক্বেডস ছেড়ে চটি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? যে ভাষায়, যে সুরে যাত্রার আসরে ডায়লগ শোনেন, সেই ভাষায় বাড়িতে ছেলে কিংবা বউমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? আপনি নিজের জীবনে স্বাভাবিক আচবণ করবেন, অথচ যাত্রার অভিনেতাদের কাছে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে চাইবেন কেন? এর জবাব দিন তো আমাকে।

ভদ্রলোক আর অজিতেশবাবুব কথার উত্তব দিতে পারেননি। কেমন ঘোর লাগা একটি মানুষের মতো উঠে গিয়েছিলেন সেখান থেকে।

তা অজিতবাবু আর অজিতেশবাবু দুই অজিতই অভিনযের ব্যাপাবে একই মানসিকতার মানুষ। যে কারণে অজিতেশবাবু যাত্রার জগতে খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি। আবার নিজের জায়গায় ফিবে এসেছিলেন, যেখানে তিনি সম্রাট। আব অজিত বন্দ্যোপাধ্যায তো ওই পথ মাড়ালেনই না।

কিন্তু এসব অভিনয়ের তত্ত্বকথা এখন থাক। আমরা বরং আবার ফিরে যাই অজিতবাবুর পেশাদার অভিনয় জীবনের সামনে যেসব পাহাড়প্রমাণ বাধা এসে দাঁড়িয়েছিল, তারই কথায়।

তবে তার আগে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটবেলার কথাটা ছোট্ট কবে বলে নিই। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৯ সালের সাতাশে সেপ্টেম্বর। উত্তর চব্বিশ পরগণার পানিহাটিতে। বাবার নাম আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা কাজ করতেন মিলিটারির অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে অফিসার্স র‍্যাঙ্কে। কাজেই অজিতবাবুর ছোটবেলাটা কেটেছে শৈলশহর সিমলায়। পরে ওঁর বাবা যখন কলকাতায় ট্রান্সফার হয়ে এলেন তখন থেকে বসবাস শুরু হল মানিকতলা অঞ্চলে যুগীপাড়ায়। লেখাপড়া শুরু হল আমহার্স্ট স্ট্রিটের (এখন রাজা রামমোহন সরণি) ক্যালকাটা অ্যাকাডেমিতে। তার পরে গড়পারের এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশনে। ওখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হলেন সায়েন্স নিয়ে। ওখান থেকে আই এস সি পাশ করে বেরোবার পর তিন বছর স্টেনোগ্রাফি শিখে ইন্ডো-বার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানিতে চাকরিজীবন শুরু করেন। সেখান থেকে আসেন হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানিতে—যে কথা আগেই বলেছি।

এই বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময়েই অজিতবাবুর অ্যামেচার থিয়েটার জীবন শুরু হয়। হাতেখড়ি গড়পার ছাত্র সম্মিলনী বলে একটা ক্লাবে। পরে এটি নাম পাল্টে হয় মিতালী সম্মিলনী। সেখানকার একটি ঘটনা আজও অজিতবাবুর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। সে কথা পরে বলছি।

এবারে শুনুন সেই পর্বতপ্রমাণ বাধার কথা।

'আলেয়া' ছবিতে নায়ক হিসেবে মহরত করেও যখন অসুস্থতার কারণে নায়ক করতে পারলেন না, তখন মনের দিক থেকে একেবারে ভেঙে পড়লেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন এই ঘটনায়। তবে ওঁর থেকেও বেশি আঘাত পেয়েছিলেন কে সি দে অ্যান্ড সন্সের ম্যানেজার সুধীর গুহমশাই। তার আবিষ্কারকে ছবির পর্দায় দেখানো গেল না বলে তিনি মর্মাহত হয়ে পড়লেন। অজিতবাবুকে নানা স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন তিনি। কিন্তু নিজের মনটাকে সান্ত্বনা দেবেন কিভাবে।

চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই সুধীরবাবু মনস্থির করে ফেললেন, তিনি নিজেই ছবি প্রোডিউস করবেন, আর সে ছবির নায়ক করবেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এটা ধরুন ১৯৪৩ সালের কথা।

সুধীরবাবুর তো নিজের ছবি করার মতো অত টাকা ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড ইনফ্লুয়েন্স ছিল। মাস খানেকের মধ্যেই তিনি একটা ছবি কমপ্লিট করার মতো টাকা যোগাড় করে ফেললেন। এখানেই থেমে থাকলেন না। আরও টাকা সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে লাগলেন। পরপর তিনখানি ছবি করবেন তিনি। আর তার সবগুলিরই নায়ক করবেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রথম ছবিটায় অজিতবাবুর বিপরীতে নায়িকা সিলেক্ট করলেন পদ্মা দেবীকে। পদ্মা দেবী তখন বাংলা ছবির উদ্ভিন্নযৌবনা নায়িকা।

সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর সুধীরবাবু অজিতবাবুকে বললেন : এবাবে তুমি এইচ এম ভি-র চাকরি ছেড়ে দাও। পরপর তিনখানা ছবিতে তোমাকে কাজ করতে হবে। ছুটি নিয়ে নিয়ে এত দিনের শুটিং সামলানো যাবে না। এখন থেকে ফিল্ম অ্যাকটিংই তোমার কেরিযার। তিনটে ছবি তো হাতে রইলই। ইতিমধ্যে কোন না আব দু-একখানা ছবির অফার এসে যাবে।

সুধীরবাবুর কথামতো এইচ এম ভি-র চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিলেন অজিতবাবু। না, অগ্রপশ্চাৎ তেমন কিছু বিবেচনা কবলেন না। তিনিও তখন অ্যাডভেঞ্চারিস্ট।

সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবার পব যেদিন ছবির মহরত হবার কথা, ঠিক তার আগের দিন স্টেটসম্যান পত্রিকায় খবর বেরোলো, ভারত সরকার যুদ্ধের কারণে কাঁচা ফিল্ম আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। যার ফলে যাঁরা নতুন ছবি তৈবি করতে চান তাঁদের কোন ফিল্মেব কোটা দেওয়া হবে না।

সর্বনাশ! খবরটা পড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন সুধীর গুহ। আর চোখে সর্ষেফুল দেখলেন বাংলা ফিল্মের হবু নায়ক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে মনে বললেন : এমন কিছু যে ঘটবে তা আমি জানতাম। আমার ভাগ্যে ঈশ্বর যে ফিল্ম অ্যাকটিং করা লেখেননি, সেটা তো জানা কথাই। মাঝখান থেকে অমন ভালো চাকরিটা চলে গেল। এখন আমি কি করি! চারদিকে মুখ দেখাব কি করে?

সুধীববাবু অবশ্য প্রচুর ছোটাছুটি করলেন। সরকারি দপ্তরে একে ধরলেন তাকে ধরলেন, কিন্তু কোনও কিছু সুরাহা করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বম্বে ছুটলেন। সেখানে যদি রেগুলার প্রোডিউসারদের কারও কাছে কোন স্টক থাকে! লোন হিসেবেও যদি ফিল্ম পাওয়া যায়! কিন্তু ওই ঘোষণার পর কেউ আর হাতের কাঁচা ফিল্ম ছাড়ে! বম্বে থেকেও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন তিনি। এতদিনকার এত পরিশ্রম, এত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সব কিছুই গেল

শেষ পর্যন্ত সুধীরবাবু অপরাধীর মতো এসে দাঁড়ালেন অজিতবাবুর সামনে। বললেন : অজিত, আমার জন্যেই তোমাকে অত ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিতে হল। কী করব বলো, এতে তো আমার কোন হাত নেই। সবটাই ভাগ্যের পরিহাস। তোমার যা ক্ষতি হয়েছে তা তো অন্য কোন ভাবে কমপেনসেট করতে পারব না। তুমি আমায় ক্ষমা করো ভাই।

অজিতবাবু বললেন : না না, আপনার আর কী দোষ বলুন। আমার ভাগ্যে যা লেখা আছে তা তো ঘটবেই। সেটা কে খণ্ডাবে বলুন। আপনি এর জন্যে মনে কষ্ট পাবেন না।

সুধীরবাবু বললেন : তুমি বললেই তো আমার মনের কষ্ট চলে যাবে না। সেটা আমাকে ভোগ করতেই হবে। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার চাকরির কথা। যতদিন না সেরকম কোন চাকরি খুঁজে পাচ্ছি ততদিন তুমি আমাদের পাইওনিয়ার রেকর্ড কোম্পানিতে চাকরি কর। মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থাটা তো আপাতত হোক।

পাইওনিয়ার রেকর্ড কোম্পানির ক্ষমতা ছিল না নতুন লোক পোষার। তবু অজিতবাবুকে সুধীরবাবু অত্যন্ত ভালোবাসতেন বলে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও এ কাজটা দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা অজিতবাবুর কাছে খুবই অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। তাই তিনি ভেতরে ভেতরে অন্য একটা চাকরির সন্ধান করছিলেন।

এবং পেয়েও গেলেন মাস তিনেকের মধ্যে। এটাও টাইপিস্ট কাম স্টেনোগ্রাফারের চাকরি।

তখন পুরোপুরি যুদ্ধের মরসুম। এখন যেটা ধর্মতলার এল আই সি বিল্ডিং, তখন সেটা বিখ্যাত ছিল হিন্দুস্থান বিল্ডিং নামে। ওখানে তখন যুদ্ধের অফিস। অজিতবাবু শুনতে পেলেন ওখানে লোক নেওয়া হচ্ছে। তিনি একটা দরখাস্ত ছেড়ে দিলেন এবং ক'দিন বাদে ইন্টারভিউর ডাকও পেয়ে গেলেন। একজন লালমুখো অ্যামেরিকান সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অজিতবাবুর টাইপের স্পিড দেখলেন। খুশি হয়ে হাতে-হাতেই অ্যাপয়েন্ট লেটার ধরিয়ে দিলেন। মাইনে মাসে আড়াইশো টাকা। তিন মাস

অন্তর পঞ্চাশ টাকা ইনক্রিমেন্ট। এত টাকা মাইনের কথা তো স্বপ্নেও ভাবেননি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেশ মনের সুখে দিন কাটছিল। এমন সময় আবার একটা ওলট-পালট ঘটে গেল অজিতবাবুর জীবনে। আবার সিনেমার হাতছানি। কিন্তু এবারে কী বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে?

শেষ পর্যন্ত বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় অবশেষে ছায়াছবির নায়ক হলেন। তবে তাঁর এই মনোনয়ন অত সহজে ঘটে নি। এর আগের দু'বার সুযোগ যেভাবে তাঁর কাছে এগিয়ে এসেছিল, এবারে তাঁকেই এগিয়ে যেতে হল সুযোগের দিকে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ভাগ্য অজিতবাবুর প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছিল।

এটা ১৯৪৫ সালের কথা। অজিতবাবু তখন মনের সুখে হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর ওয়ার অফিসে কাজ করছেন। এমন সময় একদিন চাং-ওয়া রেস্টুরেন্টের সামনে তাঁর এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোকের নাম দিলীপ মুখার্জি। ইনি সিনেমা লাইনে কাজ করেন। সাহিত্যিক-পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট। পরে দিলীপবাবু পরিচালক হয়েছিলেন। বেশ কয়েকটি ছবিও করেছেন। ওঁর তোলা ছোটদের ছবি 'জন্মতিথি' আমার বেশ ভালো লেগেছিল। ইনি কিন্তু 'যাত্রিক' গোষ্ঠীর দিলীপ মুখার্জি নন। তিনি আলাদা ব্যক্তি।

অজিতবাবুকে দেখতে পেয়ে দিলীপবাবু বলে উঠলেন : ও মশাই, আপনি নাকি কোন একটা ছবির হিরো হয়েছিলেন। সে ছবির খবর কী? আপনাকে তো স্টুডিওপাড়াতেও দেখি-টেখি না!

অজিতবাবু নিজের কপালে টোকা মেরে বললেন : বরাতে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কী?

এই বলে তিনি তাঁর দু-দুটি প্রয়াসের ব্যর্থতার বিষয়ে যাবতীয় কথা দিলীপবাবুকে বললেন।

শুনে দিলীপবাবু বলে উঠলেন : ইস্, এইভাবে লাক আপনাকে বিট্রে করল। কিন্তু তা বলে চুপচাপ বসে থাকা তো উচিত নয়। আপনার এত সুন্দর চেহারা, এত চমৎকার উচ্চারণ, আপনার অন্য জায়গায় চেষ্টা করা উচিত।

অজিতবাবু বললেন : কোথায় চেষ্টা করব? ফিল্ম লাইনে কি আমি কাউকে চিনি!

দিলীপবাবু দু'মিনিট কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন : আপনি মাধববাবুর সঙ্গে দেখা করুন না!

অজিতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : কে মাধববাবু?

দিলীপবাবু বললেন : মাধব ঘোষাল। খুব বনেদিবাড়ির ছেলে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ওঁদের আত্মীয়তা আছে। মাধববাবুর দাদা মোহন ঘোষাল দু'তিনটে ছবিতে নায়কের পার্ট করেছেন এক সময়ে। মাধববাবু রাধা ফিল্ম স্টুডিও কিনেছেন। নিজেরা ছবি করবেন। নতুন ছেলে খুঁজছেন বলে শুনেছি।

অজিতবাবু বললেন : আপনার সঙ্গে আলাপ আছে নাকি মাধববাবুর?

দিলীপবাবু বললেন : আছে অল্পস্বল্প। ঠিক আছে। আপনি কাল, না না, কাল নয়, কাল আমার একটা কাজ আছে, পরশুদিন এই বেলা একটা নাগাদ অফিস থেকে ছুটি নিতে পারবেন?

অজিতবাবু বললেন : তা পারব।

দিলীপবাবু বললেন : তাহলে ঠিক একটার সময় আমি এইখানে, এই চাং-ওয়ার সামনে আপনাকে মিট করব। মাধববাবুর অফিসে নিয়ে যাব আপনাকে। বেশি দূরে নয়, এই কাছেই মিশন রো-তে ওঁদেব ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টের অফিস। সেখানে আপনার সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব মাধববাবুর। তারপর আপনার লাক।

তা অজিতবাবুর সঙ্গে কথা বলে মাধববাবুর পছন্দ হল। তিনি বললেন : তবে এক্ষুনি তো ফাইনাল করতে পারছি না আপনার সঙ্গে। আগে আপনার স্ক্রিন টেস্ট হবে। সেখানে উৎরে গেলে তারপর পাকা কথা বলব।

অজিতবাবুর স্ক্রিন টেস্ট হয়েছিল ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। টেস্ট নিয়েছিলেন চিত্রপরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শৈলজাদার তখন দারুণ গরম বাজার। পর পর 'নন্দিনী', 'বন্দী' আর 'শহর থেকে দূরে' ছবিগুলো হিট করেছে। 'মানে না মানা' বলে একটা ছবি রিলিজ করার মুখে। এবারে ধরেছেন একটা মাইথোলজিক্যাল ছবি। 'শ্রীদুর্গা'। এই পুজোর আগে যাতে সেটাও রিলিজ হয় তার জন্যে রাতদিন

খাটছেন। এই 'শ্রীদুর্গা' ছবির শুটিং করার এক ফাঁকে শৈলজাদা অজিতবাবুর স্ক্রিন টেস্ট নেবেন।

তা ওই ইন্দ্রপুরীতে স্ক্রিন-টেস্ট দিতে গিয়ে ছবিদার সঙ্গে দেখা অজিতবাবুর। ছবিদা মানে ছবি বিশ্বাস। তিনি ওই 'শ্রীদুর্গা' ছবিতে রাম করছেন। ছবিদা আবার অজিতবাবুর এক বন্ধুর ভায়রাভাই। সেই সূত্রে আগে থেকে পরিচয় ছিল। অজিতবাবুকে দেখে ছবিদা বলে উঠলেন : কী রে অজিত, তুই এখানে কী করছিস?

অজিতবাবু লজ্জিত ভাবে বললেন : আজকে আমার স্ক্রিন-টেস্ট হবে।

ছবিদা বললেন : তাই নাকি! উইশ ইউ গুড লাক্। তবে লাইনটা তা ভালো নয়। একটু বুঝে-সমঝে চলিস্!

শৈলজাদা বেশ অনেকক্ষণ ধরে টেস্ট নিলেন অজিতবাবুর। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ক্যামেরায় ছবি নিলেন। সাউন্ড টেস্ট করলেন। তারপর মাধববাবুকে আড়ালে ডেকে বললেন : ছেলেটির অসম্ভব ভালো ভয়েস। চমৎকার উচ্চারণ। ক্যামেরায় ছবি কেমন আসবে তা প্রিন্ট করার আগে বলতে পারব না। তবে আমার চোখ-ক্যামেরা বলছে সেখানেও ও উৎরে যাবে। যদি পারো আজই কন্ট্রাক্ট সাইন করিয়ে নাও। না হলে পরে মালটি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। আমি দু'একজন অন্য প্রোডিউসারের টাউটকে ওর আশেপাশে ঘুর ঘুর করতে দেখেছি।

তা শৈলজাদার পরামর্শে মাধববাবু সেদিনই অজিতবাবুকে কন্ট্রাক্ট সই করিয়ে নিয়েছিলেন। দু'বছরের চুক্তি। রেডিও ছাড়া অন্য কোথাও অভিনয় করতে পারবেন না। কোনও ছবিতে না, কোনও নাটকে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম . রেডিওটাই বা কন্ট্রাক্টের আওতার বাইরে রাখলেন কেন ওঁরা?

অজিতবাবু বললেন : সেটা আমিই বলেছিলাম। রেডিওতে বেতার-নাটকে ১৯৪০ সাল থেকে অভিনয় করে আসছি। ওটা ছাড়তে আমার আপত্তি ছিল। তাছাড়া রেডিওতে তো আর মানুষের চেহারা দেখা যায় না। তাতে তো ওঁদের ক্ষতি হবার কথা নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এখনও তো অভিনয় করেন রেডিও নাটকে? আজ পর্যন্ত কত নাটক করলেন তার কোনও হিসেব রেখেছেন?

অজিতবাবু বললেন : হ্যাঁ ভাই, এখনও রেডিওতে অভিনয় করি। ক্ষমতায় কুলোলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করে যাব। আর বেতার-নাটকের হিসেবের কথা বলছ? তা প্রায় শ'তিনেক তো হবেই। তার মধ্যে আবার এক একটা নাটক তো তিন চারবার করে হয়েছে।

আমি বললাম : দু'একটা উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম বলুন না।

অজিতবাবু বললেন : সব নাটকের নাম কি আর মনে আছে রে ভাই! কত নাটকই তো করলাম। বিদ্যাসাগর, তটিনীর বিচার, সপ্তপদী, ঘরে বাইরে, নষ্টনীড়—এমনই কত নাটক।

আমি বললাম : তা মাধববাবুদের সঙ্গে যে কন্ট্রাক্ট করলেন, মাইনে-টাইনে কত ঠিক হয়েছিল?

অজিতবাবু বললেন : দুশো টাকা মাসে। তবে পেমেন্টটা বড় ইররেগুলার ছিল। শেষের দিকে দু'তিন মাসের তো টাকা পেলামই না। তবে তার জন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই। ওঁরা ওঁদের ছবিতে তো আমাকে চান্স দিয়েছিলেন, যার জন্যে আমি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পেরেছি। এছাড়া আর একটা বড় উপকার ওঁরা করেছিলেন আমার।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সেটা কি?

অজিতবাবু বললেন : শিশির ভাদুড়ি মশাই যখন আমাকে তাঁর স্টেজে নিতে রাজি হলেন, তখন ওঁরা আমাকে কন্ট্রাক্ট থাকা সত্ত্বেও থিয়েটার করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

আমি বললাম : স্টেজের কথায় পরে আসছি। তার আগে আপনার প্রথম ছবির কথা বলুন। তখনকার অনুভূতির কথা বলুন।

অজিতবাবু বললেন : মাধববাবুদের ওখানে আমার প্রথম ছবির নাম ছিল 'শান্তি'। ডিরেক্টর ছিলেন বিনয় বাঁড়ুজ্যে বলে এক ভদ্রলোক। বেশ ভালো ডিরেক্টার। অনেক ছবি করেছেন তখন। আমার ওই ছবিটা রিলিজ করেছিল নাইনটিন ফর্টিসিক্সে। তুমি দেখেছ নাকি ছবিটা?

আমি বললাম : হ্যাঁ দেখেছি। মিনার বিজলী ছবিঘরে রিলিজ করেছিল। আমি মিনারে দেখেছি।

অজিতবাবু বললেন : তবে তো তুমি নিজেই বলতে পারবে আমি কেমন অভিনয় করেছিলাম।

আমি বললাম : বেশ ভালো। নিউকামাব হিসেবে রীতিমত ভালো অভিনয় করেছিলেন। তবে আপনাকে আমার বেশি ভালো লেগেছিল 'স্যার শঙ্করনাথ' ছবিতে। ফাটাফাটি অভিনয় করেছিলেন সেখানে।

অজিতবাবু বললেন : আরে সে ছবির ডিরেক্টার কে ছিল দেখতে হবে তো! দেবকী বসু। ওঁর ছবিতে তো মরা মানুষও ভালো অ্যাকটিং করে। ওটা নাইটিন ফর্টি এইটের ছবি। মাধববাবুদের সঙ্গে দু'বছরের কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে যাবাব পর দেবকীবাবুর ছবিতে সুযোগ পেয়েছিলাম। পরে ওঁর 'নবজন্ম' ছবিতেও কাজ করেছি।

আমি বললাম : তবে ওই পিরিয়ডে আর একটা ছবিতে আপনার অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম একেবারে। আপনি সে ছবির নায়ক ছিলেন।

অজিতবাবু বললেন : ও, তুমি 'পণ্ডিতমশাই' ছবিটার কথা বলছ? শরৎবাবুর লেখা বৃন্দাবনের ক্যারেকটারটাই তো অসাধারণ। খুব শক্ত রোল। বুকের ভেতর আবেগ আর অভিমান থই থই করছে, অথচ বাইরে তার প্রকাশ নেই। ওই ছবির ডিরেকটার যিনি ছিলেন, সেই নরেশ মিত্র মশাই আমার মধ্যে বৃন্দাবনের ক্যারেকটারটাকে একেবারে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ রবি, নরেশদা নিজে নাটকের লোক, কিন্তু ছবিটা করার সময় তিনি আমাকে এতটুকুও ওভার অ্যাকটিং করতে দেননি।

আমি বললাম : আমি ওই ছবিটার হিন্দি ভার্সান দেখেছি। 'খুসবু'। আপনার রোলটা করেছিলেন জিতেন্দ্র। পুরোপুরি আপনার ধাঁচে অভিনয় করে গেলেন। ছবিটা দেখতে দেখতে আপনার কথাই বার বার মনে হচ্ছিল।

অজিতবাবু বললেন : আমিও দেখেছি ছবিটা। আমি কোনও তুলনায় যাচ্ছি না, তবে জিতেন্দ্র সত্যিই ভালো অভিনয় করেছে। আমার তো ভয় ছিল লাউড না করে ফেলে। হিন্দি ছবিতে ওরা তো একটু লাউড অ্যাকটিং করতেই অভ্যস্ত। তা দেখলাম, না। আমি বাংলাতে যেভাবে করেছিলাম জিতেন্দ্র ঠিক সেই প্যাটার্নেই অভিনয় করেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : নরেশদার আর কোনও ছবিতে অভিনয় করেননি?

অজিতবাবু বললেন : হ্যাঁ করেছি। 'নিয়তি' ছবিতে করেছি। শুধু নরেশদা কেন, বাংলাদেশের প্রায় সব ডিরেকটারের ছবিতেই অভিনয় করেছি। সেই পুরনো আমল থেকে হাল আমল পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই কাজ করেছি। সত্যজিৎ রায়ের 'শাখা প্রশাখা' আর 'আগন্তুক' ছবিতে যে কাজ করেছি' সেটা তো তোমরা সবাই জান। মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে করেছি। তরুণ মজুমদারের 'ঠগিনী'- তে কবেছি। অপর্ণা সেনের 'সতী'-তে করেছি। আর সত্যজিতের ছেলে বাবুর (সন্দীপ রায়) 'গুপী বাঘা ফিরে এলো' ছবিতে আমার অভিনয় দেখে তোমরা, মানে সাংবাদিকরা তো মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছ।

আমি বললাম : ঋত্বিক ঘটকের কোনও ছবিতে কাজ করেননি?

অজিতবাবু বললেন : করেছি বৈকি। ঋত্বিকের প্রথম ছবি 'নাগরিক'-এ কাজ করেছি আমি। ওই এক পাগল মানুষ। প্রথম ছবিতে ওর কাজ দেখেই বুঝেছিলাম, হ্যাঁ, একখানা প্রতিভা বটে। কী দারুণ স্পার্ক!

বললাম : এখন কোন ছবিতে করছেন?

অজিতবাবু বললেন : রাজা সেনের 'আরোগ্য নিকেতন' ছবিতে করছি। এখন তো বয়স হয়ে গেছে। চুরাশি বছর হয়ে গেল। এখন তো আর স্টুডিওপাড়ার দিকে যেতে পারি না। কারও সঙ্গে যোগাযোগও নেই তেমন। আমাদের এই লাইনের ব্যাপার-স্যাপার জান তো! চোখের আড়াল হয়ে গেলেই মনের আড়াল হয়ে যায়। সত্যজিৎ রায় আর ক'জন আছেন। উনি আমায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কাজ দিয়েছিলেন। উনি চলে গিয়েই তো আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। বেঁচে থাকলে আরও অনেক কাজ আমাকে দিয়ে করাতেন। সেইরকম কথাও দিয়েছিলেন। সবই আমার ভাগ্য।

আমি বললাম : এবারে থিয়েটারের কথা কিছু বলুন।

অজিতবাবু বললেন : আমি যে অ্যামেচার থিয়েটারে অ্যাকটিং করতাম সেটা তো তোমাকে আগেই বলেছি। সেই সময় থেকেই মনের মধ্যে ইচ্ছে ছিল শিশির ভাদুড়ির কাছে কাজ করার। কিন্তু ভয়ে ভয়ে ওদিক মাড়াইনি। তারপর সিনেমায় যখন চান্স পেলাম তখন মনে হল আমি একজন কেষ্টবিষ্টু হয়ে গেছি। সাহস করে হাজির হলাম বড়বাবুর সামনে। নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা নিবেদন করলাম। শিশিরবাবু আমার অদ্যোপান্ত একবার দেখলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন : কী করা হয়?

আমি বললাম : আজ্ঞে আমি সিনেমায় অভিনয় করি।

সিনেমার কথা শুনে শিশিরবাবু একবার মুখটা একটু কুঁচকে বললেন : ও—সিনেমা!

বুঝলাম সিনেমার অভিনয় সম্পর্কে ওঁর একটা বিতৃষ্ণা আছে। কারণটা বুঝলাম না। উনি তো নিজেও কত সিনেমা করেছেন। এই তো সেদিনও 'পোষ্যপুত্র' ছবিতে ওঁর অভিনয় দেখলাম।

শিশিরবাবু আমাকে তারপরই প্রশ্ন করলেন : থিয়েটার করতে চাও ভালো কথা। তবে এখানে পারমানেন্টলি আসছ তো?

আমি কথাটার মানে বুঝতে পারলাম না। বললাম : আজ্ঞে?

শিশিরবাবু বললেন : প্রফেশনাল বোর্ডে অ্যাকটিং করতে গেলে থিয়েটারের হোল টাইমার হতে হবে। আর যদি শখের ব্যাপার হয় তাহলে অ্যামেচার স্টেজে যাও। প্রফেশনাল বোর্ডটা শখ মেটাবার জায়গা নয়।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম : আমি পারমানেন্টলি আসতে চাই।

শিশিরবাবু বললেন : উত্তম কথা। আমাদের এখানে প্রতিদিন সন্ধে সাড়ে ছ'টা থেকে রিহার্সাল হয়। তোমাকে প্রতিদিন আসতে হবে। পারবে তো?

আমি বললাম : নিশ্চয় পারব।

মনে খুব আনন্দ। শিশিরবাবুর নাটকে চান্স পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল রাধা ফিল্মসের সঙ্গে কন্ট্রাক্টের কথা। ওঁরা যদি অনুমতি না দেন তাহলে তো থিয়েটার করা হবে না।

পরের দিন স্টুডিওতে মাধববাবুকে সব কথা বললাম। উনি বললেন : বেশ তো, থিয়েটার করবেন। আমরা আপনাকে পারমিশন করে চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। অন্য কোথাও হলে আপনাকে না বলতাম। কিন্তু যেখানে শিশিরবাবুর মতো মানুষের কাছে চান্স পাচ্ছেন, সেখানে আপনাকে আটকে রাখা উচিত নয়।

সেইদিন সন্ধেবেলায় শ্রীরঙ্গমে রিহার্সালে চলে এলাম। আমি আবার কায়দা করে শিশিরবাবুর মুখোমুখি একটা চেয়ার দখল করে বসলাম যাতে তাঁর নজরে পড়তে পারি ভালো করে। কিন্তু ওই বসাই সার। দিনের পর দিন রিহার্সাল অ্যাটেন্ড করি, কিন্তু শিশিরবাবু আমার দিকে ফিরেও তাকান না। পার্ট দেওয়া তো দূরের কথা! ক'দিনের মধ্যেই খুব মনমরা হয়ে পড়লাম। শিশিরবাবুর স্টেজের সঙ্গে তখন মহর্ষি যুক্ত ছিলেন। উনি—

আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : মহর্ষি মানে বিখ্যাত অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য?

অজিতবাবু বললেন : হ্যাঁ উনিই। সবাই ওঁকে মহর্ষি বলে ডাকতেন। কেন ডাকতেন তা জানি না। তবে উনি ওই নামেই পরিচিত ছিলেন। কী কারণে জানি না, আমাকে ওঁর ভালো লেগে গিয়েছিল। মাসখানেক ওইভাবে রিহার্সালে চুপচাপ বসে থাকার পর মহর্ষি একদিন আমার সামনেই শিশিরবাবুকে বললেন : ছেলেটি রোজ এসে বসে থাকে। ওর দিকে একটু দেখুন-টেখুন।

মহর্ষির কথা শুনে শিশিরবাবু একবার আড়চোখে আমার দিকে দেখলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন : দেখবার সময় হলেই দেখব।

শুনে তো আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আর কবে দেখবার সময় হবে?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল। আর যে ভাবে হল সেটাও একটা নাটক। শিশিরবাবুর শ্রীরঙ্গমে তখন রেগুলার 'রিজিয়া' নাটক হচ্ছে। হঠাৎ একটা বৃহস্পতিবার নাটকের শেষে শিশিরবাবু ওঁর ভাই তারাকুমার ভাদুড়িকে ডেকে বললেন : তারাকুমার, এই শনি আর রবিবার 'প্রফুল্ল' নাটক হবে।

তারাকুমার একটু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন : তা না হয় হলো। কিন্তু সুরেশ করবে কে? ভবানী করতো। কিন্তু সে তো এখন অসুস্থ। তাহলে?

ভবানী অর্থে শিশিরকুমারের অনুজ ভবানীপ্রসাদ ভাদুড়ি। খুব ভাল অভিনেতা ছিলেন।

শিশিরবাবু বললেন : ও ঠিক আছে। তোমাকে ভাবতে হবে না।

তারপর ওখানে যিনি প্রম্পট করতেন সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বড়বাবু বললেন : ডাক্তার, প্রফুল্লর স্ক্রিপ্টটা পাড় তো?

ওই প্রম্পটার ভদ্রলোককে সবাই ডাক্তার বলে ডাকতেন। ওঁর নামটা আমি ভুলে গেছি। তবে প্রম্পটার হিসেবে তুখোড়। আমি তো কালীবাবু, মনি এইসব অনেক প্রম্পটারেব সঙ্গে কাজ করেছি। তবে ডাক্তারের তুলনা হয় না।

তা ডাক্তার তো ধুলো-টুলো ঝেড়ে 'প্রফুল্ল' নাটকেব স্ক্রিপটা পেড়ে নিয়ে এলেন। শিশিরবাবু সেটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন : কালকের দিনটা সময় পাচ্ছ। এই নাটকটা ভালো করে পড়ে নেবে। শনিবার তোমাকে সুরেশ করতে হবে। শুধু তোমার পার্টটা নয়, পুরো নাটকটা পড়বে। তাতে তোমার চরিত্রের অগ্রপশ্চাৎ জানতে সুবিধে হবে।

এই বলে শিশিরবাবু চলে গেলেন। আমি তো স্ক্রিপ্ট হাতে নিয়ে থ। জীবনে কখনও 'প্রফুল্ল' নাটক করিনি অ্যামেচার স্টেজে। নাটক দেখিওনি। একদিনের মধ্যে নিজেকে তৈরি করব কী করে?

ডাক্তার আমাকে ওই অবস্থায় দেখে বললেন : ঘাবড়াবার কিছু নেই। সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড। বড়বাবুর কারবারই অমনি। সেদিন তোমার অগ্নিপরীক্ষা। আমি তোমাকে পজিশন-টজিশন বুঝিয়ে স্টেজে ঢুকিয়ে দেব। তারপর কোথায় দাঁড়াবে কী করবে—সে দায়িত্ব তোমার।

তা সেদিন সেই অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টেজের ওপর কাউকে গার্ড না করে, কারও আলোর অবস্ট্রাকশান না ঘটিয়ে ঠিক ঠিক পজিশন নিয়ে নাটক শেষ করেছিলেন অজিতবাবু। দু-একবার হাততালিও পেলেন।

শুধু এই একবারই নয়, অজিতবাবুকে আরও একবার এর চেয়েও বড় অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। একদিন বেলা তখন চারটে কী সাড়ে চারটে হবে, শিশিরবাবু ডেকে পাঠালেন অজিতবাবুকে। তাঁর হাতে 'মাইকেল মধুসূদন' নাটকের স্ক্রিপ্ট। ওর থেকে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টটা দু'বার পড়ে শোনালেন শিশিরবাবু। তারপর বললেন : যাও, মেক-আপ নিয়ে নাও। আজ সন্ধ্যায় তুমি রেভারেন্ডের পার্ট করবে।

সেই পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন অজিতবাবু। এবং একটু বেশি পরিমাণেই। শো শেষ হবার পর শিশিরবাবু অজিতবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর মেক আপ রুমে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিশিরবাবুর বন্ধু এবং নট ও নাট্যরসিক কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কান্তিবাবু হলেন সালকিয়ার একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। ওঁরই ছেলে বিখ্যাত গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। কান্তিবাবু সেদিন শিশিরবাবুর সামনেই অজিতবাবুকে বলেছিলেন : এতদিনে মাইকেল নাটকে সত্যিকারের রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনকে পেলাম।

সবাই চলে যাবার পর শিশিরবাবু অজিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা অজিত, তুমি কার কাছে অভিনয় শিখেছ বল তো? আমার কাছে তো অ্যামেচার থেকে অনেকেই এসেছে, কিন্তু তোমার মতো এমন পারফেক্ট উচ্চারণ তো কারও কাছে পাইনি।

অজিতবাবু উত্তর দিলেন : আজ্ঞে আমি যাঁর কাছে অভিনয় শিখেছি তাঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শিশিরবাবু বললেন : তিনি কি একজন অভিনেতা? কোথাও অভিনয় করেন তিনি?

অজিতবাবু বললেন : তিনি অ্যামেচারে অভিনয় করতেন। এখন তাঁর দেশ তমলুকে থাকেন। ওকালতি করেন।

শিশিরবাবু বললেন : দেন্ আই মাস্ট সে, হি ইজ এ ভেরি গুড কোচ।

যাঁকে শিশির ভাদুড়ি মশাই এতবড় সার্টিফিকেট দিলেন সেই বঙ্কিমবাবু আমার আবাল্য পরিচিত। আমরা তাঁকে ডাকতাম বঙ্কুদা বলে। তমলুকের উকিল হিসেবে নয়, বঙ্কুদাকে আমরা শ্রদ্ধা করতাম তমলুক শহরে আমাদের আগে সংস্কৃতির প্রদীপটি উনি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন বলে। কলকাতা থেকে ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলি, প্রভা দেবী, সরযূবালা দেবী প্রমুখকে উনি প্রায়ই তমলুকে নিয়ে যেতেন।

ওঁদের সঙ্গে একত্রে অভিনয় করতেন। বঙ্কুদা ছিলেন আমাদের তমলুকেব গর্ব।

১৯৪৬ সালে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়েব পেশাদার অভিনয় জীবনের শুরু। ওখানে তিনি তেরোটি নাটকে অভিনয় করেছেন। ওঁর সঙ্গে যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁবা হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভা দেবীর মতো দিকপাল শিল্পীরা।

এর পরে গিয়েছিলেন স্টার থিয়েটারে। সেখানে মহেন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে তাঁব পরিচালনায় আটটি নাটকে অভিনয় করেন।

তারপরে মিনার্ভায়। এখানে তেইশটি নাটক। ওখানে যাঁদের সঙ্গে অভিনয় করতেন, তাঁরা হলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ি, ছবি বিশ্বাস, ভূমেন রায়, জহর গাঙ্গুলি, রবি রায়, সরযূবালা দেবী, রানীবালা, শান্তি গুপ্তা প্রমুখ শিল্পীরা। পরিচালক হিসেবে পেয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস এবং সতু সেনকে।

রঙমহলে করেছেন ছটি নাটক, যার শেষটি হল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত 'নীলকণ্ঠ'।

স্টার থিয়েটারে দ্বিতীয় পর্যায়ে পনেরোটি নাটকে অভিনয় করছেন অজিতবাবু। ওখানে নাট্যকার এবং পরিচালক হিসেবে পেয়েছেন দেবনারায়ণ গুপ্তকে। এই পর্বে অভিনয়ের সময়ই অজিতবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। প্রায় প্রতিটি শোয়ের সন্ধ্যাতেই স্টার থিয়েটারের গ্রিনরুমের সেন্ট্রাল হলে আমাদের আড্ডা এবং আলাপচারিতা চলতো।

এছাড়া অজিতবাবু বিশ্বরূপায় দুটি এবং সারকারিনা এবং রঙ্গনায় একটি করে নাটকে অভিনয় করেছেন। এখন পর্যন্ত তাঁর শেষ পেশাদার অভিনয় ওই রঙ্গনাতেই। গণেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'কি বিভ্রাট' নাটকে।

হঠাৎ অজিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম : আচ্ছা, সেই যে কী একটা চড়ের কথা বলেছিলেন, যেটা নাকি আপনার অভিনয় জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট, সেটার কথা তো আর বললেন না?

অজিতবাবু হাসতে হাসতে বললেন : হ্যাঁ, সেটা তো বলতেই হবে। ওটা সত্যিই আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। তখন আমরা গড়পার মিতালী সম্মিলনীতে 'সীতা' নাটক করছি বঙ্কুদার ডিরেকশানে। ওতে আমার একটা ডায়লগ ছিল 'পারিব না পারিব না প্রভু আজ্ঞা তব লহ ফিরাইয়া।' কিন্তু এই সামান্য ডায়লগটাও আমি ঠিকমত বলতে পারছিলাম না। বঙ্কুদা আটবার দশবার ধরে আমাকে ঠিকমত বলাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত বঙ্কুদা আমার গালে ঠাস করে সপাটে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন : যা তোকে আর পার্ট বলতে হবে না। ওই কোণে গিয়ে বসে থাকগে যা। তোর দ্বারা অভিনয় হবে না।

ওই একঘর লোকের মাঝখানে চড়টা খেয়ে আমার তো অপমানের চূড়ান্ত। লজ্জায় কারও দিকে তাকাতে পারলাম না। এক কোণে গিয়ে বসে রইলাম। টস টস করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

ঘণ্টা দুই পরে রিহার্সাল শেষ হবার মুখে বঙ্কুদা আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন : এইবার একবার ডায়লগটা বল দিকি।

আর আশ্চর্য, তখন একদম ঠিক ঠিক ডায়লগটা বেরিয়ে এল। বঙ্কুদা যে ভাবে চাইছিলেন, ঠিক সেইভাবে। বঙ্কুদা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন : এই তো ঠিক পেরেছিস। বলে আমার গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন : চড়টা খুব জোরে লেগেছিল, না রে? খুব অপমান বোধ করেছিলি? কিন্তু এটার যে দরকার ছিল। দেখবি জীবনে আর কখনও ভুল উচ্চারণ করবি না।

তা বঙ্কুদার সেদিনের কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। শিশিরবাবু যে সেদিন আমার উচ্চারণের অত প্রশংসা করেছিলেন, সেটা বঙ্কুদার ওই একটা চড়েরই অবদান। বঙ্কুদা আমাকে উচ্চারণ শিখিয়েছেন, আর শিশিরবাবু শিখিয়েছেন নর্মাল অ্যাকটিং। এই দু'জনেই আমার প্রণম্য গুরু। দুজনেই আজ পরলোকে।

বলতে বলতে অজিতবাবু দু'হাত তুলে নমস্কার জানালেন। কাকে কে জানে। হয়তো বঙ্কুদা আর শিশিরকুমারকে। অথবা তাঁর জীবন দেবতাকে।

সন্ধ্যারানী

বৌবাজারের মোড়ে রূপম সিনেমার পাশে ছানাপট্টির লাগোয়া যে চারতলা বাড়িখানা আছে, সেই বাড়িটার তিনতলার একটি ফ্ল্যাটের দিকে আঙুল উঁচিয়ে পাঁচুবাবু বলেছিলেন : ওই বাড়িটায় কে থাকে জানিস?

পাঁচুবাবু ছিলেন আমাদের শৈলেন প্রেসের কম্পোজ ডিপার্টমেন্টের একজন সিনিয়ার কম্পোজিটার। ভদ্রলোকের যেমন অনেক বয়েস তেমনি অনেক রকমের অভিজ্ঞতা। আমার থেকে অন্তত পঁচিশ তিরিশ বছরের বড় তিনি। ১৯১৯ সালে কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে মানে এখনকার শ্রী সিনেমায় 'বিল্বমঙ্গল' নামে প্রথম যে নির্বাক চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেয়েছিল, সেটি তিনি দেখেছেন। রঙ্গমঞ্চে রসরাজ অমৃতলাল বসুর অভিনয আব গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র দানীবাবুর অভিনয় দেখেছেন বাল্যবয়সে। গড়ের মাঠে গোরা টিমের সঙ্গে মোহনবাগানের গোষ্ঠ পাল, উমাপতি কুমাবদেব ফুটবল খেলা দেখেছেন। একটুর জন্যে ১৯১১ সালে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক শিল্ড বিজয় স্বচক্ষে দেখতে পাননি বলে আমৃত্যু আক্ষেপ করে গেছেন।

পাঁচুবাবুর মুখ থেকে তাঁর সেইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আমরা খুব আগ্রহভরে শুনতাম। বিশেষ করে সিনেমা-থিয়েটারের জগতেব নানা মুখরোচক গপ্পো। সেসব গল্পে আদিবসের ঝাঁঝালো গন্ধ থাকত। শুনতে শুনতে আমাদেব কান-টান গরম হয়ে উঠত। কিন্তু পাঁচুবাবুর সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপ থাকত না। যা দেখেছেন আর যা শুনেছেন তা অনাযাসে বিবৃত করে যেতেন তাঁর প্রায় ছেলের বয়সী আমাদের সামনে।

সেই পাঁচুবাবু যখন আমাকে বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে তিনতলার একটি নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তখন আমি ভাবতে লাগলাম ওই বাড়িতে কে থাকতে পারেন? কোন অভিনেতা, কিংবা অভিনেত্রী অথবা ফুটবল খেলোয়াড়?

পাঁচুবাবুর দেওয়া প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজতে গোয়েন্দার চোখ নিয়ে তিনতলার ফ্ল্যাটটার দিকে তাকালাম। ফ্ল্যাটের বারান্দাটা একেবারেই শূন্য। শাড়ি-জামা অথবা ফুটবলারের জার্সি, কিছুই ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম না।

হতাশ হয়ে পাঁচুবাবুর দিকে ফিরে বললাম : নাঃ, বলতে পারছি না।

পাঁচুবাবু একটু সবজান্তার হাসি হেসে বললেন : জানতাম পারবি না। ওরে হাঁদারাম, ওটা হল তারই বাড়ি, যে নায়িকাটির ছবি এলে সব্বার আগে ছ' আনার লাইনে দাঁড়াতে ছুটিস।

এই তো পাঁচুবাবু মাথাটা গুলিয়ে দিলেন। সেই চল্লিশের দশকের মধ্যভাগের অনেক নায়িকাই তো আমার প্রিয়। কানন দেবী তো বটেই, তার সঙ্গে রয়েছেন মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, সুনন্দা দেবী, ভারতী দেবী, রেণুকা রায় এবং আরও কত কত নাযিকা। তবে তাঁরা তো শুনেছি সব দক্ষিণ কলকাতায় থাকেন। এই বৌবাজারের ছানাপট্টির ঘিঞ্জি অঞ্চলে যে কোনও নায়িকা থাকতে পারেন তা তো কল্পনাই করা যায় না। অনেক ভেবেচিন্তেও এতদ্ অঞ্চলের অধিবাসী হিসেবে আমার প্রিয় কোনও নায়িকাকেই বৌবাজারের ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হিসেবে ভাবতে পারলাম না। হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম : না পাঁচুদা, আমার প্রিয় কোনও নায়িকাই এখানে থাকতে পারেন না। তুমি আমার কাছে গুল দিচ্ছ।

পাঁচুবাবু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন : থাকে রে থাকে। নামটা বললে তুই এক্ষুনি লাফিয়ে উঠবি।

আমি কাতর স্বরে বললাম : দোহাই পাঁচুদা, আর ধাঁধার মধ্যে রেখো না। ওখানে কে থাকে বলো না গো।

পাঁচুবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন : ওই ফ্ল্যাটে যে থাকে তার নাম সন্ধ্যারানী।

নামটা শুনে সত্যিই লাফিয়ে ওঠার মতো অবস্থা আমার। সন্ধ্যারানী তখনও অনেক ছবি করেননি।

কিন্তু যে দু-চারটি করেছেন তাতেই আমাদের যুবক মহলে আলোড়ন পড়ে গেছে। ওঁর 'অরক্ষণীয়া' দেখেছি। 'পরিণীতা' দেখেছি। কী অপূর্ব শান্ত সৌন্দর্য। কী অসাধারণ দুখানা চোখ। মেলে দেওয়া পাখির ডানার মতো দুটো চোখের পাতা। ওই শান্ত রূপ বুকের মধ্যে তুফান হয়তো তোলে না, কিন্তু একটা বিরাট স্নিগ্ধতায় মনটা ভরিয়ে দেয়। ছোটবেলায় আমার স্বর্গতা মাতৃদেবী 'টুকটুকে বউ' এনে দেবার লোভ দেখিয়ে আমাকে খাওয়াতেন-দাওয়াতেন, ঘুম পাড়াতেন। সন্ধ্যারানী বোধহয় সেই দলেরই কেউ হবেন। নইলে ওঁকে ছবির পর্দায় দেখে মনটা এত উচাটন হয় কেন? কেনই বা এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে আমার সকল সত্তাকে।

চল্লিশের দশকের সেই সব চপল ভাবনার কথা ভাবলে আজ নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়ে পড়ি। কিন্তু তখন ওসব লজ্জা-সরমের বালাই ছিল না। পৃথিবীটাকে তখন সোজা চোখেই দেখতাম। যা ভালো লাগত তা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করতাম।

কিন্তু সন্ধ্যারানীর মতো একজন নায়িকা এই বৌবাজারপাড়ায় থাকতে যাবেন কেন? যাঁর অত রূপ তাঁর কি এসব জায়গায় থাকা মানায়? তাঁদের জন্যে বালিগঞ্জ কিংবা আলিপুরই তো উৎকৃষ্ট জায়গা। নিউ আলিপুরের তখনও পত্তন হয়নি। তাহলে সেখানকার কথাই ভাবতাম। সল্টলেক তো হয়েছে আরও অনেক পরে।

পাঁচুবাবুর কথাটা ঠিক বিশ্বাস হল না। তাই বললাম : বাচ্চা ছেলে পেয়ে তুমি আমার কাছে গুল ঝাড়ছ পাঁচুদা। সন্ধ্যারানীর মতো নায়িকা কখনই এখানে থাকতে পারেন না।

আমার কথা শুনে পাঁচুবাবু রেগে গেলেন। বললেন : বেশ তো, আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে সোজা তিনতলায় উঠে যা। কড়া নেড়ে জিজ্ঞেস করে আয়, এখানে সন্ধ্যারানী থাকেন কি না!

না বাবা। অতটা বুকের পাটা নেই আমার। যদি না থাকেন তাহলে ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দার কাছে আমাকে কটু কথা শুনতে হবে। আর যদি থাকেন তাহলে কী কৈফিয়ত দেব দরজায় কড়া নাড়ার। তা ছাড়া একজন জলজ্যান্ত নায়িকার মুখোমুখি দাঁড়াতে গেলে যতটা কল্জের জোর দরকার, তা আমার আছে বলে মনে হয় না। একবার রঙমহল থিয়েটারের পাশে সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের মোড়ে জহর গাঙ্গুলিকে দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছিলাম। জহর গাঙ্গুলি তাঁর দিকে ওইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ধমক দিয়ে উঠেছিলেন : এ্যাই খোকা, অমন করে তাকিয়ে দেখছ কেন? কী চাই কী তোমার?

জহর গাঙ্গুলির ধমক খেয়ে লজ্জায় ঘেমে নেয়ে একশেষ। ছুটে পালাতে পথ পাই না। আর কখনও ওই কাজ করি! ন্যাড়া বেলতলায় ক'বার যায়!

তা শেষ পর্যন্ত সেই বেলতলাতেই যেতে হল। তবে সেটা বছর ছয়েক পরে। তখন আমি মুদ্রণশিল্পকে গুডবাই করে রূপাঞ্জলি পত্রিকায় সাংবাদিকতার শিক্ষানবিশি শুরু করেছি। আমাদের ওই রূপাঞ্জলি পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতি বছর ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো হত। চলচ্চিত্র ও মঞ্চের শিল্পী ও কল্যাকুশলীরা সেই পুজোয় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতেন। এই সুযোগে শ্রীমতী সন্ধ্যারানীকে আমন্ত্রণ জানাবার সুযোগটা আমি এরকম জোর করেই চেয়ে নিলাম আমাদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাংশু বক্‌সির কাছ থেকে। উদ্দেশ্যটা অন্য কিছু নয়। একবার শ্রীমতী সন্ধ্যারানীর মুখোমুখি হওয়া। তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলা।

আমি সে বছর রূপাঞ্জলিতে আনকোরা নতুন। শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তখনও হয়নি। স্টুডিওতে যাবার ছাড়পত্র পাইনি। ইনডোরে বসে প্রুফ দেখা এবং সাব-এডিটরের অন্যান্য কাজকর্ম করতে হয়। সরস্বতী পুজোর আমন্ত্রণপত্রটা হাতে পেয়ে মনটা খুশিতে নেচে উঠল। এতদিনে আমার মনের সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। আমার প্রিয়তমা নায়িকা সন্ধ্যারানীর মুখোমুখি হতে পারা যাবে এই সুবাদে।

পাঁচুবাবু ঠিকই বলেছিলেন। সন্ধ্যারানী তখন থাকতেন বৌবাজারের মোড়ে রূপম সিনেমার পাশে ছানাপট্টির লাগোয়া চারতলা বাড়িটির তিন তলায়। সেই রূপম্ সিনেমা এখন আর নেই। দীর্ঘকাল বন্ধ পড়ে থাকার পর কলকাতার নতুন নায়ক প্রমোটারদের কল্যাণে একটি বহুতল বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে।

বাড়িটিতে ঢুকে মনটা খারাপ হয়ে গেল? নিচের তলাটা অন্ধকার অন্ধকার। কেমন একটা দম বন্ধ

করা পরিবেশ। এইরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সন্ধ্যারানীর কি থাকা উচিত। আমার যদি কোনদিন টাকা-পয়সা হয় তাহলে একখানা বড় দেখে বাড়ি তৈরি করে সেখানে সন্ধ্যারানীকে থাকতে বলব। এইরকম পরিবেশে ওঁকে মোটেই মানায় না।

পরবর্তীকালে অবশ্য সন্ধ্যারানী নতুন বাড়ি করে উঠে গেছেন দক্ষিণ কলকাতার ল্যান্সডাউনে। সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম সেই বাড়ি নিয়েও ভাড়াটেদের সঙ্গে আইন-আদালত সংক্রান্ত ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছেন তিনি।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে দেখলাম একটি ফ্ল্যাটের দরজায় সংগীত পরিচালক অনিল বাগচির নেমপ্লেট লাগানো আছে। ভেতর থেকে গান-বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। অনিল বাগচি তখন সংগীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ওঁর কালজয়ী সৃষ্টি তারাশঙ্করের 'কবি' ছবির সুরসৃষ্টি তখনও করেননি। আর এক কালজয়ী সৃষ্টি 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'র গানের সুর তো তারও পরে করেছেন। কিন্তু আমি যে সময়কার কথা বলছি তখনই অনিল বাগচি মশাই গুণীজনের তালিকায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পেরেছেন।

সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠলাম। শ্রীমতী সন্ধ্যারানীর দরজার সামনে গিয়ে বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে গেল। আগের দিন রাত্রে মনে মনে একটা রিহার্সাল দিয়ে রেখেছিলাম, কী ভাবে কথা বলব নায়িকার সঙ্গে। কী ভাবে বললে আমার বক্তব্য কনভিন্সিং হবে তা নিয়ে আমার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। প্রায় মিনিট দুয়েক ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম মানসিক শক্তি সংগ্রহের জন্য।

দরজার সামনেটা অন্ধকার অন্ধকার। সিঁড়ির মাথায় একটা বাল্‌ব ঝুলছে দেখতে পেলাম। কিন্তু সেটা জ্বলছে না। না, লোডশেডিং-এর কথা মাথায় আসেনি। তখনকার দিনে লোডশেডিং কী বস্তু তা আমরা জানতাম না। মনে হয় সারা দিন জায়গাটা নিষ্প্রদীপ থাকে। সন্ধ্যার পর বোধহয় আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ওই আধো অন্ধকারে দরজার মাথায় হাতড়ে দেখলাম। না, ডোরবেলের কোন সুইচ হাতে পেলাম না। অগত্যা দরজার কড়া ধরে নাড়া দিলাম।

আমার তখনকার মানসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কড়া নাড়াটা বোধহয় খুব আস্তে হয়ে গিয়েছিল। কারণ মিনিটখানেক কেটে যাবার পরও দরজা খোলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সুতরাং আরও একবার কড়া নাড়তে হল। এবং বেশ জোরের সঙ্গেই। কান দুটো উৎকর্ণই ছিল। মনে হল দরজার ওপারে মৃদু পদশব্দ শোনা যাচ্ছে।

দরজা খুলে যিনি এসে দাঁড়ালেন, তিনি স্বয়ং সন্ধ্যারানী। আমার স্বপ্নের নায়িকা রক্তমাংসের শরীর নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার তখন এমন অবস্থা যে মুখ দিয়ে কোন কথাই সরছে না।

প্রায় মিনিটখানেক আমাকে ওইভাবে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্ধ্যারানীর চোখেমুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল। মৃদুকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কাকে চাই?

জলতরঙ্গের আওয়াজ তার আগে শুনেছি। তবে তা বাদ্যশিল্পীর হাতে। কোন মানুষের মুখ থেকে জলতরঙ্গের আওয়াজ তার আগে কখনও শুনিনি। ওই প্রথম।

আমার উত্তরের অপেক্ষায় শ্রীমতী সন্ধ্যারানীকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেই লজ্জায় পড়ে গেলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করলাম। পুজোর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রটি তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলাম যথাদিনে যথাসময়ে উপস্থিত থাকবার জন্য।

আমার হাত থেকে আমন্ত্রণপত্রটি নিয়ে সন্ধ্যারানী বললেন : ঠিক আছে ভাই। আমি খুব চেষ্টা করব তোমাদের অনুষ্ঠানে যাবার জন্যে। সুধাংশুবাবুকে আমার নমস্কার আর ধন্যবাদ জানিও।

এইবারে আমি পকেট থেকে একটি কাগজ বার করলাম। তাতে আমন্ত্রণপত্রটির প্রাপ্তিস্বীকার করে স্বাক্ষর করার ব্যবস্থা রাখা ছিল। সেই কাগজটি সন্ধ্যারানীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম : এটাতে একটা সই করে দিন দয়া করে।

আমার কথা শুনে সন্ধ্যারানীর দুই ভুরুতে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল। মুখে বললেন : ওটা কী?

আমি বললাম : আপনি যে ইনভিটেশন কার্ডটা পেলেন তার প্রাপ্তিস্বীকার। আমরা সবাইকার কাছ

থেকে এইরকম একটা কাগজে সই করিয়ে নিচ্ছি।

এটা একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। রূপাঞ্জলি পত্রিকার তরফ থেকে এরকম কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আমার নিজেরই একটা অটোগ্রাফ দরকার ছিল শ্রীমতী সন্ধ্যারানীর। সাংবাদিক হিসেবে তো অটোগ্রাফ চাইতে পারি না কারুর। সেটা নাকি মর্যাদাহানিকর। তাই গতকাল রাত্রে আমিই মাথা খাটিয়ে এই বুদ্ধিটি বার করেছিলাম সই নেবার।

সন্ধ্যারানী আমার হাত থেকে কাগজটা নিলেন। ভালো করে পড়লেন সেটা। তারপর আপত্তিকর কিছু নেই দেখে সই দেবার জন্যে পা বাড়ালেন বাড়ির ভিতরের দিকে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম : আমার কাছে কলম আছে।

আমার হাত থেকে কলমটি নিয়ে দরজার একটি পাল্লার গায়ে কাগজটি রেখে তাতে গোটা গোটা অক্ষরে সই দিলেন : সন্ধ্যারানী চ্যাটার্জি।

সন্ধ্যারানীর হাতের লেখাটি মনোমুগ্ধকর নয়। অক্ষরগুলি খাকিটা আঁকাবাঁকা। কিন্তু আমার কাছে সেটাই তখন সাত রাজার ধন এক মানিক।

সেই স্বাক্ষরটি আমি দীর্ঘকাল আমার সঞ্চয়ে রেখে দিয়েছিলাম। ওটি আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকত। পাঞ্জাবির ভিতরের পকেটে। একেবারে বুকের কাছে। ওই স্বাক্ষরের মাধ্যমেই ওঁর সঙ্গে একটা নৈকট্য অনুভব করতাম। তারপর একদিন ভুল করে বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রিতে জামাটা কাচতে দিয়েছিলাম স্বাক্ষরিত প্রাপ্তিপত্রটি বার না করেই। এইভাবে প্রথম যৌবনের একটি মহামূল্যবান জিনিস আমি হারিয়ে ফেলেছি।

যেদিন ওই স্বাক্ষরটি সংগ্রহ করে সন্ধ্যারানীর বৌবাজারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে আমার অন্তর্জগতে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত উনি ছিলেন আমার কাছে স্বপ্নরাজ্যের রানি। কিন্তু যেই মুহূর্তে উনি আমাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করলেন, তখন থেকেই আমি ওঁকে দিদির আসনে বসিয়ে দিলাম। বয়সে উনি আমার থেকে খুব বেশি বড় নন। মাত্র দু'বছরের। ওঁর জন্ম ১৯২৫ সালে আর আমার জন্ম ১৯২৭-এ। কিন্তু সেদিন থেকে আমি ওঁকে বড় দিদির সম্মান দিতে শুরু করেছি। উনি এখন আমার সন্ধ্যাদি।

এরপর থেকে সন্ধ্যাদির সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে। স্টুডিওতে, স্টুডিওর বাইরে। তাঁকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। বয়সের বিভিন্ন স্তরে তিনি নব নব রূপে আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছেন। তাঁর সেই প্রতিটি রূপেই আমি মুগ্ধ হয়েছি। আর এখন মাথাভরা রজতশুভ্র কেশরাশিতে তাঁকে তো অপূর্ব দেখায়। যেন এক শুভ্রকেশী মমতার প্রতিমূর্তি।

দীর্ঘকাল পরে স্মৃতির সরণির প্রয়োজনে ওঁর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। তার আগে ওঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা বিশিষ্ট অভিনেতা-পরিচালক এবং ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা সুখেন দাসের হাজরা রোডের বাড়িতে তার জন্মদিনে। সেদিন আমার সঙ্গে ছিলেন আমার সহধর্মিনী এবং কনিষ্ঠা কন্যা মিঠু। ওরা সবাই সন্ধ্যাদির সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। এমন সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যাতে সন্ধ্যাদির একটা নতুন রূপ আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। সেই ঘটনা বলার আগে আপনাদের কাছে আঙুরের কথাটা বলে নিই।

সন্ধ্যারানীর আদি নাম যে আঙুর, সেটা আমি জানতাম না। জানতে পেরেছিলাম নরেশদার সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে করতে। নরেশদা মানে বিশিষ্ট অভিনেতা এবং চিত্রপরিচালক নরেশ মিত্র।

নরেশদা তখন আমাদের 'সাতরঙ' পত্রিকায় তাঁর আত্মজীবনী 'স্মৃতির সুরভি' লিখছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বেলতলা রোডের বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতে হত। নরেশদা একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির বন্ধু। নিজে একজন বিশিষ্ট অভিনেতা। সেই সঙ্গে একজন খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালক। সত্যজিৎ রায় কিংবা তরুণ মজুমদার যেমন নতুন নতুন ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের সুযোগ দেবার সাহস দেখান, সেকালে নরেশ মিত্রও তাই করতেন।

একদিন সকালে সেই প্রসঙ্গেই নরেশদার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : নরেশদা, আপনি কোন্ কোন্ শিল্পীকে প্রথম সুযোগ দিয়েছিলেন, যাঁরা পরে খুব নাম করেছেন?

নরেশদা বললেন : সে তো অনেককেই সুযোগ দিয়েছি। তাদের সকলের নাম কী আর মনে আছে।

আমি বললাম : তবু দু-চার জনের নাম করুন না।

নরেশদা খানিকক্ষণ ভাববার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন : ১৯৩৮ সালে আমি যখন রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস নিয়ে ছবি করেছিলাম, তখন তাতে প্রতিমা দাশগুপ্তা নামে একটি মেয়েকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলাম। প্রতিমা পরে অনেক ছবিতে কাজ করে সুনামের সঙ্গে। তারপর বম্বে চলে যায়। 'স্বয়ংসিদ্ধা' ছবির নায়িকা হিসেবে দীপ্তি রায়কে আমিই প্রথম সুযোগ দিই। মলয়া সরকার বলে একটি মেয়েকে 'কঙ্কাল' ছবিতে প্রথম অভিনয় করাই। এরা সবাই পরে নামকরা অভিনেত্রী হয়।

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, এইভাবে বলে উঠলেন : আঙুরও প্রথম আমার ছবিতেই নাম করে। আজ তো ও খুব পপুলার হিরোইন।

আমি বললাম : আঙুর মানে আঙুরবালা? যিনি খুব ভাল গান করেন? উনি আপনার কোন্ ছবির নায়িকা হয়েছিলেন?

নরেশদা বললেন আরে না না, সে আঙুর নয়। আমি বলছি তোমাদের ওই সন্ধ্যারানীর কথা। ও নাইনটিন থার্টি এইটে 'বেকার নাশন' বলে একটা ছবিতে নাচিয়ে হিসেবে অভিনয় করেছিল। ওর তখন বারো-তেরো বছর বয়েস। আমিও সেই ছবিতে অভিনয় করেছিলাম। তখনই ওকে দেখে আমার ভালো লেগেছিল। শামলা শামলা গায়ের রঙ। চোখ দুটো খুব সুন্দর। ওর রোলটা ছিল ছোট। কিন্তু খুব সাবলীল অভিনয় করেছিল। নাইনটিন থার্টি নাইনেব শেষের দিকে আমি যখন 'বাংলার মেয়ে' ছবি করলাম তখন আঙুরকে বীথির চরিত্রটা কবতে দিলাম। প্রকৃত অর্থে সেটাই ছবিতে ওব প্রথম চরিত্র পাওয়া। আমরা ওর আঙুর নাম বদলে সন্ধ্যারানী করে দিলাম। ওর চেহারা আর চরিত্রেব মধ্যে একটা সন্ধ্যাবেলার নম্র ভাব আছে। ওই ছবিতে সন্ধ্যাবানী বেশ নাম-টাম করেছিল। এখন তো ও টপ হিরোইনদের একজন।

এই 'বাংলার মেয়ে' ছবিতে অভিনয করার আগে সন্ধ্যাদিকে অনেক স্ট্রাগল কবতে হয়েছে। একেবারে পাথরচাপা কপাল ছিল তাঁর। 'বাংলার মেয়ে'তে সেই পাথরটা একটু সরে গিয়েছিল মাত্র। তার আগে একেবারে বাচ্চা বয়স থেকে দুটো অর্থোপার্জনের জন্যে তাঁকে মঞ্চে মঞ্চে নাচ করতে হয়েছে সেই শৈশবকাল থেকেই।

সে এক ভয়ঙ্কর দুঃখের দিন গেছে পরবর্তীকালের বিখ্যাত নায়িকা সন্ধ্যারানীর। সে কথায় পরে আসছি।

আমার প্রিয় অভিনেত্রী সন্ধ্যারানী দেবীর বয়স এখন প্রায় বাহাত্তর ছুঁতে চলেছে। ১৯২৫ সালের আগস্ট মাসে তাঁর জন্ম। সেদিন টেলিফোনে সন্ধ্যাদিকে বলছিলাম : আপনি শতায়ু হোন। এটাই আমার প্রার্থনা।

কথাটা শুনে সন্ধ্যাদি টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে আঁতকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন : না ভাই, ওই আশীর্বাদটি আর করবেন না। এ জীবনে অনেক শিক্ষা হয়ে গেছে। এখন ভালোয় ভালোয় যেতে পারলে হয়।

এটা নিশ্চয় সন্ধ্যাদির অভিমানের বহিঃপ্রকাশ। অভিমান তো হতেই পারে। শিল্পের সেবা করে সারা জীবনে কী পেয়েছেন তার হিসেব-নিকেশ তো করতেই পারেন। আর সেটা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে না পেয়েছেন একটা বড়সড় পুরস্কার। না পেয়েছেন সেই পরিমাণ অর্থ যা নিয়ে অনায়াসে গর্ব করা চলে।

কথাটা মিথ্যে নয়। ওঁরা যে সময়ে নায়িকা ছিলেন তখন তো আজকের মতো এমন করে টাকার হরিলুট শুরু হয়নি। ওঁরা যে টাকায় এক-একটি ছবিতে কাজ করেছেন, আজকাল একজন তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্রাভিনেত্রীও তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা উপার্জন করেন।

কিন্তু সেদিন তো সন্ধ্যাদির মতো শিল্পীরা টাকাটাকে বড় করে দেখেননি। তাঁদের চোখের সামনে একটা বড় আদর্শ ছিল। সেটা কেতাবি শিক্ষা থেকে আহৃত কোনও আদর্শ নয়। তাঁরা আদর্শের পাঠ নিয়েছিলেন জীবন থেকে। ঐতিহ্য থেকে। অতীত দিনের শিল্পীদের নিষ্ঠা থেকে। তাঁদের আদর্শ ছিলেন গিরীশ ঘোষ, বিনোদিনী, অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর প্রমুখ দিকপালেরা। অভিনয়কে ভালোবেসে যে

কোনও কৃচ্ছ্রসাধনে তাঁরা পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

শ্রীমতী সন্ধ্যারানীর জীবন তো তেমনই একটা জীবন। অভিনয়ের মাধ্যমে অর্থোপার্জন তিনি নিশ্চয় করেছেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অর্থের প্রয়োজন ছিল বৈকি। কিন্তু যখনই কোনও দুঃস্থ প্রযোজক তাঁর দ্বারস্থ হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নামমাত্র অর্থ নিয়ে ছবিতে কাজ করে দিয়েছেন।

আর ছিল পরিচালকদেব প্রতি শ্রদ্ধা। স্টুডিওর প্রাঙ্গণ ছিল তাঁদের কাছে মন্দিরের মতো। সেই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হলেন পরিচালক। সন্ধ্যাদিকে দেখেছি পরিচালকদের কী দারুণ সম্মান করতেন। তাঁদের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষবে অক্ষরে পালন কবতেন। পরিচালক ছিলেন তাঁর কাছে গুরুর মতো। শিক্ষকের মতো।

এই প্রসঙ্গে একটা ছবির শুটিং-এর কথা মনে পড়ছে। ১৯৫৩ সালে 'বনহংসী' নামে একটি ছবি হয়েছিল নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও থেকে। ছবিটি যদিও নিউ থিয়েটার্সেরই, কিন্তু নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে হয়নি। হয়েছিল কে সি. প্রডাকসন্সের ব্যানারে। নিউ থিযেটার্সের নামে ছবি করাব বোধহয় কিছু অসুবিধা ছিল। এই কে সি. হলেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। তিনিই ছবির পরিচালক। কার্তিকদা তার আগে 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবি কবে প্রচণ্ড সুনাম কিনেছেন।

সেই 'বনহংসী' ছবির শুটিং দেখতে আমি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে গিয়েছিলাম। সেদিন সেটে একমাত্র শিল্পী ছিলেন সন্ধ্যারানী। একটি বিছানা পাতা। তাতে শুয়ে শুয়ে সন্ধ্যাদিকে অভিনয় করতে হবে। ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন অমূল্য মুখার্জি। কার্তিকদা আর অমূল্যদার মধ্যে চমৎকার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আবার মাঝে মাঝে দু'জনের মধ্যে খটাখটিও লাগত। তেমন একটা ঘটনা ছোট্ট করে বলে নিই।

কার্তিকদা সন্ধ্যাদিকে নির্দেশ দিলেন, তুমি এইভাবে শুয়ে থাকবে, তারপর শোয়া থেকে এইভাবে একটুখানি ঘাড় তুলে তাকাবে। তোমার দু'চোখে গভীর বেদনা। তোমাকে বেষ্টন করে ক্যামেরা যখন আর একটু এগিয়ে যাবে তখন তোমার বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসবে।

এইভাবে নির্দেশ দিয়ে কার্তিকদা বললেন : সন্ধ্যা, যেভাবে বললাম, সেইভাবে একবার করে দেখাও। আমি একটা মনিটার নেব।

তারপর অমূল্যদার দিকে ফিরে বললেন : ক্যামেরা রেডি ফর মনিটার।

এই নির্দেশ পাবার পর অমূল্যদার ক্যামেরা মুভ করানোর কথা। কিন্তু অমূল্যদা সেসব কিছু না করে চুপ করে বসে রইলেন।

কার্তিকদা তাই দেখে তাড়া লাগালেন : কই, কী হল?

অমূল্যদা গম্ভীরভাবে বললেন : কে-সি, আমার ক্যামেরা ওটা চাইছে না।

অমূল্যদা কার্তিকদাকে কে-সি বলে ডাকতেন। কার্তিক চ্যাটার্জির সংক্ষিপ্ত রূপ আর কি!

কার্তিকদা অমূল্যদার ওই কথা শুনে বললেন : চাইবে চাইবে। ক্যামেরাকে একটু বুঝিয়ে বল না বাবা!

অমূল্যদা বললেন : অসম্ভব। আমার ক্যামেরা ওরকম বেহিসেবি কাজ করতে রাজিই হবে না।

কার্তিকদা বললেন : সে কী! বেহিসেবি বলছিস্ কেন?

অমূল্যদা তখন সন্ধ্যারানী যেখানে বিছানায় শুয়ে আছে সেখানে গিয়ে হাত-পা নেড়ে কার্তিকদাকে কী যেন বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। বোধহয় ক্যামেরা চালনায় কোনও টেকনিক্যাল অসুবিধার কথা বললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কার্তিকদা ক্যামেরার মুভমেন্টটা চেঞ্জ করে অমূল্যদার মনোমত ব্যাপারটা করে নিলেন। কী চমৎকার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এখন যেমন কোনও কোনও পরিচালক গোঁ ধরে বসে থাকেন, তিনি ঠিক যেভাবে চাইছেন সেইভাবেই করতে হবে, তাতে টেকনিক্যাল অসুবিধা যাই ঘটুক না কেন, তখনকার দিনে কিন্তু সে রকমটা ছিল না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতামতকে শ্রদ্ধা করতেন। প্রয়োজনে ভুল শুধরে নিতেন।

যাই হোক, ক্যামেরার প্রবলেম মেটাবার পর কার্তিকদা সন্ধ্যাদিকে বললেন : এবারে যেভাবে বলেছি

সেইভাবে অ্যাকটিংটা করো দেখি।

কার্তিকদা যেভাবে দেখিয়েছিলেন, সন্ধ্যাদি ঠিক সেইভাবে অ্যাকটিং করলেন। আমার তো বেশ ভালোই লাগল। শুধু আমার কেন, সেখানে আরও যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু-চারজন মৃদুকণ্ঠে 'বাঃ বাঃ' করে উঠলেন সন্ধ্যাদির ওই সাইলেন্ট অ্যাকটিং দেখে।

কিন্তু সন্ধ্যাদির অত ভালো অভিনয়ও কার্তিকদার পছন্দ হল না। তিনি বললেন : ব্যাপারটা ঠিক জমছে না। তুমি আর একবার করো তো।

সন্ধ্যাদি আবার করলেন। এবারও কার্তিকদার পছন্দ হল না। আমি মনে মনে ভাবলাম, সর্বনাশ। এই বুঝি সন্ধ্যাদি ফোঁস করে উঠলেন। সন্ধ্যারানী তো তখন অভিনেত্রী হিসেবে বেশ নাম করে গেছেন। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'পরিণীতা' আর 'অরক্ষণীয়া' ছবিতে দারুণ অভিনয় করেছেন। চিত্ত বসুর 'বিন্দুর ছেলে' আর 'পুরবী' ছবিতে তাঁর অভিনয়ে প্রশংসার বান ডেকে গেছে। এমন কি তরুণ পরিচালক শ্রীবিমল রায়ের 'নীলদর্পণ' ছবিতে সন্ধ্যাদির অভিনয় এখনও মনের মধ্যে জ্বল জ্বল করছে। সেই সন্ধ্যারানীর অভিনয় কি না কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের পছন্দ হচ্ছে না! সন্ধ্যাদি আবার রেগেমেগে সেট থেকে বেরিয়ে না যান।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, আমি যে বিমল রায়ের কথা বললাম, ইনি কিন্তু নিউ থিয়েটার্স কিংবা পরবর্তীকালের ভারতবিখ্যাত পরিচালক বিমল রায় নন। এই বিমল রায় বয়সে তরুণ। 'নীলদর্পণ'-এর আগে 'রোশেনারা' এবং 'ঘরোয়া' নামে দু'খানা ছবি করেছেন। পরবর্তীকালে আরও বহু ছবি উনি করেছেন। এখনও করছেন। প্রবীণ বিমল রায় যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন ইনি নামের আগে 'শ্রী' ব্যবহার করেতেন। অনেকটা তারাশঙ্কর আর শ্রীতারাশঙ্করের মতো। বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন খ্যাতির তুঙ্গে। উনি তখনও নামের আগে 'শ্রী' ব্যবহার করতেন। সেই সময়ে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আরও একজন সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর 'অমানিতা মানবী' এবং আরও কী কী বই যেন বাজারে বেরোয়। তাই নিয়ে পাঠকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটতে থাকে। এই নিয়ে দুই সাহিত্যিকের মধ্যে বোধহয় কিছু উত্তপ্ত পত্র-বিনিময়ও ঘটেছিল সেই সময়ে। কিন্তু দ্বিতীয় তারাশঙ্কর তাঁর পিতৃদত্ত নামের মধ্যে কোনরকম পরিবর্তন ঘটাতে রাজি হলেন না। অগত্যা প্রথম তারাশঙ্কর তাঁর নামের আগেকার 'শ্রী' অক্ষরটি চিরকালের মতো বর্জন করলেন। উভয় সাহিত্যিকের মধ্যে একটা মানসিক ব্যবধান ঘটেই রইল।

পরবর্তীকালে এই দুই তারাশঙ্করেরই মনের মেঘ কেটে যায়। দ্বিতীয় তারাশঙ্কর তাঁর পদবি বন্দ্যোপাধ্যায় বর্জন করে কেবল 'শ্রীতারাশঙ্কর' নামে চলচ্চিত্র পরিচালনায় ব্রতী হন। প্রথম তারাশঙ্করের বিখ্যাত 'না' গল্পটির তিনি চিত্ররূপ দেন। সেই ছবির নায়িকা ছিলেন সন্ধ্যারানী এবং তিনি অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। বিশেষ করে ছবির শেষে আদালতের কাঠগড়ায় তাঁর অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব।

যাই হোক, আবার নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে 'বনহংসী' ছবির সেটে ফিরে আসি। পরপর তিন-চারবার সেই দৃশ্যটিতে অভিনয় করেও যখন কার্তিকদাকে খুশি করতে পারলেন না সন্ধ্যাদি, তখন বিনীত কণ্ঠে বললেন : আমার ঠিক আসছে না কার্তিকদা। আপনি দয়া করে একটু দেখিয়ে দেবেন?

সন্ধ্যাদির এইরকম বিনীত ভঙ্গি আর নরম সুরে কথা শুনে আমি তো অভিভূত। তখন আমার বয়স কত কম। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু সন্ধ্যাদির সেই বিনীত ভঙ্গি আজও চোখের সামনে ভাসছে। সেই নরম সুরেলা কণ্ঠস্বর আজও কানে লেগে আছে।

আর সন্ধ্যাদির এই কথা শুনে কার্তিকদা যা করলেন সেটা আরও ইন্টারেস্টিং। কার্তিকদা পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে মাথায় জড়িয়ে নিলেন। একজন মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করে দেখাতে হবে তো। এটা তারই প্রস্তুতি। ওই রুমালটা তাঁর মাথার ঘোমটা। তারপর বিছানার ওপর শুয়ে একজন মহিলা যেমনটি করেন সেইভাবে দৃশ্যটি করে দেখালেন সন্ধ্যাদিকে।

কার্তিদার এই মহিলাসুলভ ব্যবহার উপস্থিত সকলের মনেই যে কৌতূকের সৃষ্টি করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অনেককেই দেখলাম মুখ টিপে টিপে হাসছেন। কিন্তু কার্তিকদার সেসব দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি সিরিয়াস ভঙ্গিতে মহিলার চরিত্রে অভিনয় করে গেলেন। আর সেটা সর্বাংশে

নিখুঁত। 'মহাপ্রস্থানেব পথে'-র ভাবত বিখ্যাত পরিচালকের কাছ থেকে এই জাতীয় ব্যাপার ভাবা যায়! আজকের দিনের কোনও পবিচালক লোকলজ্জা বর্জন করে এমন কাণ্ড করতে পারেন কিনা সে ব্যাপারে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

মহিলা চরিত্রে কার্তিকদার নিখুঁত অভিনয় দেখে সেদিন অবাক হয়েছিলাম। এই কিছুদিন আগে বসন্ত চৌধুরিব কাছে শুনলাম কার্তিকদা নাকি তরুণ বয়সে নাটকের দলে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন। ওঁদের যৌবনকালে তো মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে অভিনয় হত না। পুরুষরাই মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন। কৌতুকাভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায় মহিলা চরিত্র করতেন। ছবি বিশ্বাসও নাকি করতেন বলে শুনেছি।

কার্তিকদার সেদিনকার ওই কাণ্ড দেখে আমরা ঠোঁট টিপে হাসলেও সন্ধ্যাদি কিন্তু আদ্যন্ত সিরিয়াস ছিলেন। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কার্তিকদার অভিনয় দেখলেন। তারপর যা করলেন সেটা একেবারে নিখুঁত। এক টেকেই ও-কে। আগেকার অভিনয়ের মধ্যে ত্রুটিটা কোথায় ছিল সেটা এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

আগেকার দিনে ছিল পরিচালক সম্পর্কে শিল্পীদের এইরকম শ্রদ্ধা। এইরকম নির্ভরতা যত বড় শিল্পীই হোন না কেন, পরিচালককে গুরুর মতোই দেখতেন। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। শ্রীমতী সন্ধ্যারানী তো সেই যুগের মানুষ। সেইরকম পরিবেশের মধ্যে কাজ করে এসেছেন। তাই আজও তাঁর অভিনয়ের মধ্যে আন্তরিকতার ছাপ দেখা যায়।

বিয়ের আগে সন্ধ্যারানীর পদবি ছিল ঘোষ। বিয়ের পর চ্যাটার্জি হয়েছিলেন। সন্ধ্যাদির জন্ম যে ১৯২৫ সালে, সেটা তো আগেই বলেছি। জন্মেছিলেন এই কলকাতা শহরে, চুনাপুকুর লেনে। এখন তিনি দক্ষিণ কলকাতার শবৎ বসু রোডের বাসিন্দা।

চুনাপুকুরের সেই গলি থেকে শরৎ বসু রোডের এই রাজপথে পৌঁছোতে সন্ধ্যাদিকে প্রচুর স্ট্রাগল করতে হয়েছে। এই পরিণত বয়সে তাই ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। ছোটবেলায় লেখাপড়ায় বেশিদূর এগোতে পারেননি। পরবর্তীকালে কিছু লেখাপড়া করতে হয়েছে প্রয়োজন এবং পরিবেশের তাগিদে। তবে স্কুল-কলেজের শিক্ষার বাইরে জীবন থেকে যে শিক্ষালাভ করেছেন তার মূল্য প্রচুর।

খুব ছোটবেলাতেই সন্ধ্যাদিকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাচের দলে নাম লেখাতে হয়েছিল। অবশ্যই আর্থিক কারণে। রঙমহলে মঞ্চে 'মহানিশা' নাটকে তাঁর সাবলীল নৃত্যভঙ্গি দেখে ভালো লেগে গিয়েছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক বিরাট প্রতিভা শ্রীযুক্ত সতু সেনের। সতুবাবু বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁর অধিতব্য বিষয় ছিল স্টেজ-ক্রাফট। রঙমহল মঞ্চে তিনিই প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ অর্থাৎ রিভলভিং স্টেজের প্রবর্তন করেন বিদেশ থেকে এসে। বলতে গেলে আধুনিক মঞ্চস্থাপত্যের তিনিই পথিকৃৎ।

সেই সতুবাবু ১৯৩৭ সালে তাঁর পরিচালিত 'সর্বজনীন বিবাহ উৎসব' ছবিতে একটি নাচের দৃশ্যে সন্ধ্যাদিকে সুযোগ দিলেন। পরে ওই বছরই জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালতি 'বেকার নাশন' ছবিতে আরও একবার নাচের সুযোগ পেলেন সন্ধ্যারানী। তখন উনি 'আঙুর' নামে পরিচিত। অভিনয় করার প্রথম সুযোগ পেলেন নরেশ মিত্র পরিচালিত 'বাংলার মেয়ে' ছবিতে বীথির চরিত্রে। এ ছবিটি ১৯৪১ সালে রূপবাণী সিনেমায় মুক্তি পেয়েছিল। আঙুর-এর নতুন নামকরণ হল সন্ধ্যারানী। প্রকৃত অর্থে ওই 'বাংলার মেয়ে' ছবি থেকেই শ্রীমতী সন্ধ্যারানীর অভিনেত্রী জীবন শুরু।

অনেকের ধারণা শ্রীমতী সন্ধ্যারানীকে মমতাময়ীর চরিত্র ছাড়া মানায় না। কান্নাকাটির দৃশ্য থাকলে উনি একেবারে ফাটিয়ে ছাড়েন। কথাটা খুব একটা মিথ্যে নয়। ওঁর সারা জীবনে অভিনীত চরিত্রগুলি দেখলে এই কথাটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু উনি যে চপল চঞ্চল ভূমিকায় একেবারেই অভিনয় করেননি, সে কথাটা ঠিক নয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাত বারোটার সময় আমি সন্ধ্যারানীর সেই ধরনের অভিনয় দেখেছিলাম উত্তর কলকাতার উত্তরা সিনেমায় অগ্রদূত পরিচালিত এম পি প্রোডাকসন্সের 'স্বপ্ন ও সাধনা' ছবিতে। সন্ধ্যাদির বিপরীতে ওই ছবির নায়ক ছিলেন সুদর্শন নট পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই ছবিতে সুপ্রভা সরকারের একটি ভারি সুন্দর গান ছিল সন্ধ্যাদির লিপে। সুর করেছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। যেমন

চমৎকার গাওয়া তেমনি চমৎকার সন্ধ্যারানীর অভিনয়। ওই দুটি গুণের কারণে গানখানি সুপার হিট করেছিল।

'স্বপ্ন ও সাধনা' মুক্তি পায় একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাত বারোটায় দুশো বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে ছায়াছবির ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য এম পি প্রোডাকসন্স আর ডি-ল্যুক্স পিকচার্সের দুই কর্ণধার মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় এবং দীপচাঁদ কাংকারিয়া উভয়ে মিলে ঠিক করলেন, রাত ঠিক বারোটার সময় যখন স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দিল্লির লালকেল্লায় বৃটিশের ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করবেন, সেই মুহূর্তটিতে 'স্বপ্ন ও সাধনা' ছবিটিও প্রথম প্রদর্শিত হবে। তৎকালীন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, বিখ্যাত আইনজীবী শ্রীযুক্ত সুধীর রায়চৌধুরি ওই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন। আজকের কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজা তখন সুধীরদার জুনিয়ার ছিলেন। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের আমিও একজন প্রত্যক্ষদর্শী। এব জন্য আমি গর্ববোধ করি।

সন্ধ্যারানীর ওই চপল চঞ্চল অভিনয়ের ব্যাপার নিয়ে একবার প্রবীণ চিত্র পরিচালক চিত্ত বসুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। সন্ধ্যাদি চিত্তদার প্রিয় শিল্পী। ওঁর অনেক ছবিতে সন্ধ্যাদি অভিনয় করেছেন। তবে তার বেশির ভাগই নরম-সরম ভক্তিমতী অথবা মমতাময়ী চরিত্র।

চিত্তদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম . আচ্ছা চিত্তদা, আপনারা সবাই মিলে সন্ধ্যারানীকে দুঃখী দুঃখী কান্নাকাটির রোলে সিলেক্ট করেন কেন? ওঁকে দিয়ে কি একটু চপল-সপল চরিত্রে অভিনয় করানো যায় না?

চিত্তদা বলেছিলেন . কেন যাবে না। সন্ধ্যা খুব ফ্লেক্সিব্‌ল্ আর্টিস্ট। ওকে দিয়ে যে কোনও ধরনের রোল করানো যায়। তবে যেহেতু ওকে ইমোশ্যনাল রোলে দর্শক বেশি পছন্দ করে, তাই আমিও ওই ধরনের রোল ওকে দিয়ে করাতে ভালোবাসি। ওই ধরনের চরিত্রে ও এত ইজি যে ভাবাই যায় না। মনে হয় সব সময় বুকের মধ্যে প্রচণ্ড দুঃখ আর একরাশ মমতা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। একটু ইমোশ্যনাল করে দিলেই সেগুলি হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসে। স্ক্রিপ্টে ওই ধরনের চরিত্র পেলে সবার আগে সন্ধ্যার কথাই মনে আসে। এটাকে আমার এক ধরনের দুর্বলতাও বলতে পারো।

সন্ধ্যাদিকে নিয়ে একবার উত্তমকুমারের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলাম। সন্ধ্যারানীর বিপরীতে উত্তমকুমার 'মন্ত্রশক্তি', 'ব্রতচারিণী' ইত্যাদি অনেকগুলি ছবিতে অভিনয় করেছেন। 'মন্ত্রশক্তি' ছবিতে তো সন্ধ্যাদি রীতিমত ব্যক্তিত্ব নিয়ে অভিনয় করেছিলেন।

উত্তমবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : সন্ধ্যারানীর সঙ্গে অভিনয় করতে আপনার কেমন লাগে?

উত্তমবাবু বলেছিলেন : বেশ ভালোই তো লাগে! একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

আমি বললাম : অন্যান্য হিরোইনদের এগেইনস্টে আপনাকে যেমন চিয়ারফুল লাগে, সন্ধ্যারানীর বিপরীতে তেমনটা লাগে না তো! তাই জিজ্ঞাসা করছি!

উত্তমবাবু বললেন : সেটা মনে হয় বয়সের ডিফারেন্সের জন্য। অঙ্কের হিসেবে আমাদের বয়সের তফাতটা হয়তো তেমন বেশি নয়। কিন্তু ছবির পর্দায় সন্ধ্যারানীর স্ক্রিন এইজটা একটু বেশি লাগে। ওঁর সঙ্গে কোনরকম রোম্যান্টিক সিকোয়েন্সে আমি যেতে চাই না। সেটা বেমানান লাগবে। তাই আমি একটু প্যাসিভ ধরনের অ্যাকটিং করি। ওঁকে কান্নাকাটি করার সুযোগটা একটু বেশিই দিই।

উত্তমবাবু সন্ধ্যারানীকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। একটা ব্যাপারে তার প্রমাণ পেয়েছিলাম। আজকাল যাঁরা অন্য ধরনের ছবি করেন, তেমন একজন পরিচালক তাঁর মিউজিক টেকিং-এর সেট থেকে সন্ধ্যাদিকে বার করে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যাদি মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে সেট থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। উত্তমবাবু খবরটা পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছিলেন। সেই পরিচালককে বাধ্য করেছিলেন ক্ষমা চাইতে। বলেছিলেন: আপনি করেছেন কী মশাই। সন্ধ্যারানী হলেন আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লক্ষ্মী। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলে ইন্ডাস্ট্রির সর্বনাশ হয়ে যাবে যে।

উত্তমবাবুর মুখে ওই 'লক্ষ্মী' কথাটা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম উনি সন্ধ্যারানী দেবীকে কতটা শ্রদ্ধা

করেন। কতটা সম্মান করেন।

এবারে শ্রীমতী সন্ধ্যারানীর আর একটি রূপের পরিচয় দিয়ে এই প্রতিবেদন শেষ করব। ঘটনাটি ঘটেছিল আজ থেকে কয়েক বছর আগে হাজরা রোডে অভিনেতা-পরিচালক সুখেন দাসের বাড়িতে তার পঞ্চাশতম জন্মদিনে। ওইদিন সুখেন আমাকে সপরিবারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমার স্ত্রী এবং কনিষ্ঠা কন্যা মিঠুকে নিয়ে সকালবেলাই চলে গিয়েছিলাম সুখেনের বাড়িতে। মূল গেট-টোগেদারটি ছিল সন্ধেবেলা ক্যাথিড্রাল চার্চের প্যারিস হলে। তার আগে সুখেন তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে ডেকেছিল সারাদিন ধরে একটু হইচই করবার জন্যে।

সন্ধ্যাদিও ওই সকালবেলাতেই এসেছিলেন সুখেনকে শুভেচ্ছা জানাতে। শুভ্র কেশ আর শুভ্র শাড়িতে তাঁকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। সিনেমায় যেমন দেখা যায় তার চেয়েও অনেক বেশি মমতাময়ী মনে হচ্ছিল তাঁকে। আমার স্ত্রী ও কন্যা তাঁদের প্রিয়তম শিল্পীকে দেখে একেবারে তাঁর শরীরের সঙ্গে লেপটে বসে নানা কৌতূহল মেটাচ্ছিল।

এমন সময় সুখেনের বাগানবাড়ি থেকে কিছু টাটকা সব্জি এসে গেল। বাগানবাড়ি বলতে যে একটা বসালো ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সুখেনের বাগানবাড়িটি তা নয়। কলকাতার উপকণ্ঠে খানিকটা জমির ওপর ওর একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। তার সংলগ্ন বাগানে কিছু ফল-ফুলুরির গাছ আছে। আর খানিকটা জমিতে সব্জির চাষ হয়। ওই বাড়ির যিনি কেয়ারটেকার তিনি মাঝে মাঝে কিছু সবজি দিয়ে যান। সেদিনও তাই এসেছিল।

ওইসব টাটকা সবজি দেখে সুখেন বলে উঠল : এগুলো আবার আজ আনতে গেলে কেন! আজ তো আমাদের অরন্ধন। রবিদার মেয়ে মিঠু চাইনিজ খেতে চেয়েছে। তাই শঙ্করকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়েছি চাইনিজ খাবার আনতে। আজ তো সবজিগুলো শুকোবে।

হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে সন্ধ্যাদি ছেলেমানুষের মতো বলে উঠলেন : না না, শুকোবে কেন! এই রকম টাটকা টাটকা ঝিঙে ভাতে দিয়ে খেতে আমার খুব ভালো লাগে। আমি বাবা কয়েকটা ঝিঙে নিয়ে যাচ্ছি।

এই বলে তিনি হ্যান্ডব্যাগের মুখটা খুলে তার মধ্যে নরম ছনছনে তিন-চারটে ঝিঙে ঢুকিয়ে নিলেন। শিল্পীদের মধ্যে সাধারণত যে একটা নাক-উঁচু ব্যাপার থাকে, সন্ধ্যাদির চরিত্রের মধ্যে তার লেশমাত্র নেই। একেবারে সহজ সরল একটি মহিলা। ঠিক আমাদের সাধারণ গৃহস্থবাড়ির মা-মাসীদের মতোই তাঁর এই ব্যবহার।

এই সহজতা আর সরলতাই সন্ধ্যারানী দেবীকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সকলের আপনজন করে তুলেছে। তাঁকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। মমতাময়ী সন্ধ্যারানীর ওই রূপটি আমি কোনদিন ভুলবো না।

সন্ধ্যাদি আমার কাছে শিল্পী হিসেবে যত বড়, মানুষ হিসেবে তার চেয়ে অনেক বড়। সন্ধ্যাদি হয়তো আবার আঁতকে উঠবেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি পুনরায় তাঁর শতায়ু কামনা করছি। তাঁকে আমার অন্তরের প্রণাম নিবেদন করি।

ভানুদা

এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমে আমি কখনও যাইনি। শুনেছি সেখানে নাকি তিনটি নদীর জল একত্রে মিলিত হলেও প্রতিটি নদীকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় জলের রঙ দেখে। সর্বকালের সেরা রঙ্গ রসাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখলে আমার ওই ত্রিবেণী সঙ্গমের কথাই মনে পড়ে যেত। প্রথমত রসশিল্পী, দ্বিতীয়ত সমাজসচেতন রাজনীতিক, আর তৃতীয়ত একজন পরোপকারী মানুষ হলেন ভানুদা। এতগুলি গুণের একত্র সমাহার আমাদের দেশের আর কোনও শিল্পীর মধ্যে আছে কি না আমার জানা নেই। হয়তো আছে, কিন্তু তিনি আমার কাছে এখনও প্রকাশিত নন। এই তিনটি গুণের একত্রে সমাবেশের কারণেই ভানুদাকে দেখলেই আমার ত্রিবেণী সঙ্গমের কথা মনে পড়ে যেত।

আমার এই উপলব্ধির কথাটা ভানুদাকে বললে ভানুদা রীতিমত গম্ভীর হয়ে যেতেন। তারপর আমাদের চুক্তির রীতিনীতি ভেঙে বিশুদ্ধ বাঙাল ভাষায় বলে উঠতেন : তুই শুধু আমার তিনটা গুণই দ্যাখছস্। আমার যে তিনটা দোষও আছে হেইডা তো খেয়াল কইরা দেখস নাই।

আমি বললাম : এটা কী হল ভানুদা। আমি কাঠ ঘটি বলে তুমি না বলেছিলে আমার সঙ্গে বাঙাল ভাষায় কথা বলবে না। বিশুদ্ধ কলকাতার ভাষায় বাক্যালাপ করবে। তা সে চুক্তিটা ভাঙলে যে বড়?

হ্যাঁ, এই রকম একটা চুক্তি আমার সঙ্গে ভানুদার হয়েছিল সেই ১৯৫২ সালে সরস্বতী পুজোর দিন। সে এক মজার ঘটনা। সে কথায় পরে আসছি।

তা আমার মুখে চুক্তিভঙ্গের কথাটা শুনে ভানুদা জিভ কেটে বললেন : ভেরি স্যরি রবিকুমার। ইমোশ্যনাল হয়ে গেলে চুক্তি-টুক্তির কথা আমার মনে থাকে না। মনে করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ।

এবারের কথাগুলি ভানুদা একেবারে বিশুদ্ধ কলকাতার ভাষায় বললেন। ভানুদা যখন কলকাতার ভাষায় কথা বলতেন তখন তার মধ্যে এক বিন্দু বাঙাল টান খুঁজে পাওয়া যেত না। অন্তত আমি তো পাইনি। বোধহয় খাস ঘটিরাও অত শুদ্ধ কলকাতার ভাষায় কথা বলতে পারে না। আমি মেদিনীপুরের ঘটি। আমার কথার মধ্যে 'স'-এর টান আছে। খাস কলকাতার লোক লেপকে বলে নেপ, লুচিকে বলে নুচি, লেবুকে নেবু। দুই চব্বিশ পরগনার ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন টান। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা কিংবা বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ইত্যাদি প্রত্যেকটি জেলার মানুষের কথার টান আলাদা। হাওড়া জেলার অনেক মানুষ যে আমকে আঁব বলেন, সেটা আমি লক্ষ করেছি। তবে এদের মধ্যে অনেকে যে শুদ্ধ কলকাতার ভাষায় কথা বলেন সেটাও অস্বীকার করছি না। আমি সাধারণভাবে কথাটা বললাম। কেউ যেন আবার এটা নিয়ে রাগ-টাগ করে বসবেন না দয়া করে। সেটা করলে সত্যিই কষ্ট পাব।

যাক, যে কথা বলছিলাম। ভানুদা যখন নিজের মুখে তিনটি দোষের কথা কবুল করলেন তখন সেটা তো জেনে নেওয়া দরকার। বললাম : বল কী ভানুদা! তোমার আবার তিনটে দোষও আছে? তাহলে তুমি দেখছি ডবল ত্রিবেণী সঙ্গম। তা সেই তিনটে দোষ কী কী?

ভানুদা বললেন : আমি কাউকে টাকা ধার দিয়ে আদায়ের জন্যে তাগাদা করতে পারি না।

আমি বললাম : এটা কি একটা দোষ হল নাকি! এটা তো গুণ!

ভানুদা বললেন : সেটা তুমি মনে করতে পারো। কিন্তু আমি এটাকে আমার দোষ বলেই মনে করি। একবার ধার দিলে সে টাকা তো আদায় হয়ই না, উল্টে সে মানুষটা আমাকে এড়িয়ে চলে। তাগাদা না দিলেও বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যায়। এটা যদি আমার দোষ না হয় তাহলে দোষ কাকে বলবে বলো।

আমি বললাম : ঠিক আছে। তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। এবারে দ্বিতীয় দোষটা কী?

ভানুদা বললেন : দ্বিতীয় দোষ, আমি নিজের জন্যে কারও কাছে কিছু চাইতে পারি না। নিজের জন্যে চাইব বলে গিয়েও অন্যের জন্যে উমেদারি করি।

এটা ভানুদা একদম খাঁটি কথাই বলেছেন। এটা ভানুদার একটা মস্ত গুণ। ভানুদার এই গুণের কথা

আমি শুনেছিলাম কংগ্রেসের নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে। কথায় কথায় সুব্রতবাবু একদিন বলেছিলেন : আমি যখন পশ্চিমবঙ্গের তথ্যমন্ত্রী ছিলাম, তখন সিনেমা লাইনের বহু লোক আমার কাছ থেকে অনেক অ্যাডভান্টেজ নিয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি আমার কাছে অনেকবার এসেছেন, অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়ে গেছেন, কিন্তু তার একটাও নিজের জন্যে নয়। সব কটাই অন্যের জন্যে। যে কারণে ভানুবাবুকে আমি খুব রেসপেক্ট করতাম। একজন জেনুইন মানুষ।

ভানুদার দ্বিতীয় দোষের কথা শুনে বললাম : এটাও কি একটা দোষ হল নাকি ভানুদা! এটাও তো গুণ! তুমি দোষের কথা বলতে গিয়ে নিজের খুব পাবলিসিটি করে নিচ্ছ।

ভানুদা বললেন · তাই নাকি! তাহলে তো আমি এতদিনে লায়েক হয়ে গেছি দেখছি। আমি তো এতদিন জানতাম, নিজের পাবলিসিটি পেতে গেলে তোমাদের মতো খবরের কাগজের ফালতু সাংবাদিকদের তেল দিতে হয়। সেটা পারিনি তো কোনদিন। তা তেল না দিয়েও যে পাবলিসিটি পাওয়া যায় সেটা এই প্রথম তোমার মুখ থেকে শুনলাম।

আমি বললাম : সেটা সত্যি কথা। তোমার মতো দাম্ভিক আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। স্টেজ আর ফিল্মের আর্টিস্টরা আমাদের কত খাতির করে তা জানো! কত কী খাওয়ায়-দাওয়ায়। তুমি তো জীবনে কোনও দিন এক কাপ চা-ও খাওয়ালে না। উল্টে খ্যাচ খ্যাচ করো। খবরের কাগজের ক্রিটিকদের তো তুমি মানুষ বলেই গণ্য করো না।

ভানুদা বললেন : তাই নাকি! তাহলে তো আমি ঠিক রাস্তাতেই চলেছি। তোমরা ক্রিটিকরা সব এক-একটি চিজ্। তোমরা যদি কারও প্রশংসা করো তাহলে বুঝতে পারি তার বারোটা বাজবার সময় হয়ে এসেছে।

আমি বললাম : তাহলে তোমার যে খবরের কাগজে এত প্রশংসা বেরোয় সেটাকে তুমি কী বলবে? তোমার তো বারোটা বেজে যায়নি।

ভানুদা বললেন : এইটাই তো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। এত খেচাখেচিব পরও তোমাদের কলমে আমার সম্বন্ধে ভালো ভালো কথা আসে কী করে সেইটাই তো বুঝতে পারি না।

আমি বললাম : যাক গে ওসব কথা। এবারে তোমার তৃতীয় দোষটির কথা বলে ফেলো দেখি।

ভানুদা বললেন : তৃতীয় দোষ আমি কারও অন্যায় কথাবার্তা সহ্য করতে পারি না। সে রকম কথা শুনলে মাথায় আগুন জ্বলে যায়। মারধর পর্যন্ত দিয়ে ফেলি।

এটাও একদম খাঁটি কথা। সেরকম একটা ঘটনা আমি নিজের চোখেই দেখেছি। একবার একটি পত্রিকার একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফারকে ভানুদা একেবারে চোরের মার মেরেছিলেন। সেটা বসুশ্রী সিনেমায় মন্টু বসুর ঘরে। তাঁরই চোখের সামনে। অমন বেধড়ক মার রাস্তার পকেটমারকেও লোকে মারে না। এমন মার দিয়েছিলেন ভানুদা যে নিজের হাতের ব্যথা কমাবার জন্যে তাঁকে তিনদিন ওষুধ খেতে হয়েছিল। আর সেই ফটোগ্রাফার তো প্রায় হপ্তাখানেক শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন।

আমি বললাম : এই এতক্ষণে তোমার মুখ থেকে সত্যিই একটা দোষের কথা শুনতে পেলাম। রাগলে তুমি একেবারে চণ্ডাল হয়ে যাও। কোনওদিন দেখবে রাগের দাপটে তোমার সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়ে যাবে।

ভানুদা বললেন : যায় যাবে! তা বলে অন্যায় কথাবার্তা সহ্য করতে পারব না। রাগের যথেষ্ট কারণ থাকে বলেই তো রাগ হয়। আমি হলাম গিয়ে খাঁটি বাঙাল বাচ্চা। তার যদি রাগ না থাকে তো কার থাকবে।

এই হলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। টক মিষ্টি ঝালের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব চরিত্র। ওঁর এই চারিত্রিক বৈচিত্র্যের জন্যেই ওঁকে আমার এত ভালো লাগত। দিনের পর দিন স্টার থিয়েটারের গ্রিনরুমে ওঁর কাছে গিয়ে বসে থাকতাম। ওখানে আরও অনেকের সঙ্গেই আড্ডা দিতে যেতাম। কিন্তু আমার কাছে স্টার থিয়েটারের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন ভানুদা।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে। সেটা বোধহয়

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। সরস্বতী পুজোর দিন। এর আগে বিভিন্ন লেখায় আমি উল্লেখ করেছি যে, আমি তখন যে পত্রিকায় কর্মরত, সেই রূপাঞ্জলি পত্রিকাব তরফ থেকে প্রতি বছর ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো হত। মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের শিল্পীরা সেই পুজোর কাজে অংশ নিতেন। কায়িক পরিশ্রম করতেন। রূপাঞ্জলি পত্রিকা উদ্যোক্তা মাত্র।

তা সে বছর পুজোর মূল দায়িত্বে ছিলেন ছবি বিশ্বাস। সকাল থেকে তিনি উপস্থিত ছিলেন আমাদের দক্ষিণ কলকাতার পূজামণ্ডপে। নিষ্ঠা সহকাবে পুজোর কাজ সমাপন হয়েছে। সবাই ভক্তিভরে অঞ্জলি দিয়ে দুপুরে খিচুড়ি ভোগ খেয়েছেন। সন্ধেবেলা একটু গান-বাজনার আয়োজন করা হয়েছে। ছবিদা বিকেলের দিকে একবার তাঁব বাঁশদ্রোনীর বাড়িতে গেছেন সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আগে সাজগোজ করে আসতে।

সন্ধে হতে না হতে একে একে শিল্পীরা আসতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ সোজা প্যান্ডেলে চলে যাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার অফিস ঘরে বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। এমনই একটি আড্ডায় একত্র হয়েছেন সংগীতশিল্পী অপরেশ লাহিড়ি, তাঁর স্ত্রী বাঁশরী লাহিড়ি। অপরেশদা আর বাঁশরীদিকে এই প্রজন্মের অনেকেই হয়তো চিনতে পারবেন না। বম্বের বিখ্যাত সংগীত পরিচালক বাপী লাহিড়ীর বাবা-মা বললে হয়তো চিনতে সুবিধে হবে।

তা সেই আড্ডায় আরও যাঁরা হাজির ছিলেন তাঁরা হলেন সুমনা ভট্টাচার্য এবং তাঁর দিদি স্বাগতা চক্রবর্তী ও তাঁর স্বামী ডাক্তার চক্রবর্তী। পরবর্তীকালের বিখ্যাত 'গঙ্গা' ছবির প্রযোজিকা এবং অভিনেত্রী সুমনা ভট্টাচার্য তখন সদ্য নবাগতা। মাসখানেক আগে তিনি শরৎচন্দ্রের 'পথনির্দেশ' ছবির নায়িকা হিসেবে রূপালী পর্দায় হাজির হয়েছেন। তাঁর নায়ক ছিলেন বীবেন চ্যাটার্জি। তিনিও নবাগত। সুমনাদিব দিদি স্বাগত চক্রবর্তীও তখন অনেক ছবিতে পার্শ্বচরিত্রে কাজ করেছেন। এঁদের সবাইকে নিয়ে আড্ডা তখন বেশ জমে উঠেছে।

এমন সময় সেই আড্ডায় এসে হাজির হলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভানুদার 'পাশের বাড়ি' আর 'বসু পরিবার' ছবি তখন রিলিজ করে গেছে। ওই দুটি ছবির কল্যাণে তিনি তখন প্রায় স্টার হয়ে গেছেন। লোকের মুখে মুখে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে 'পাশের বাড়ি' ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত বিশেষণ, 'খ্যাংরাকাঠির ওপর আলুর দম'। তা ভানুদার চেহারা তখন অনেকটা ওইরকমই ছিল। রোগা লিকলিকে শরীর, তার ওপর একটা হেঁড়ে মাথা। এছাড়া 'বসু পরিবার' ছবিতে ভানুদার নিজস্ব ডায়লগও তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। সেই যেখানে আদালতে সাক্ষী দিতে এসে নিজেকে ঢাকার বিক্রমপুরের বিখ্যাত পাল বংশের সন্তান হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন। বলছেন, 'না না, ব্যবসায়ী পাল নয়, রাজা মহীপাল আছিল, তাঁরই...' এইটুকু বলেই ক্লোজ-আপে বড় বড় চোখ দুটো আরও আয়ত করে সংলাপের বাকি অংশটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে।

তা ভানুদাকে দেখে আড্ডায় একটা গুঞ্জন উঠল। সকলেরই ঝকঝকে দাঁতের সারি একই সঙ্গে দেখা গেল। মিনিট দশেকের মধ্যেই দেখলাম ভানুদা আসরের মধ্যমণি হয়ে গিয়েছেন।

নানারকম আলোচনা হচ্ছে, হঠাৎ ভানুদা বাঁশরীদির দিকে তাকিয়ে বললেন : বাঁশরীদি, আপনি দুই আঙুলে তুড়ি দিতে পারেন?

ভানুদার এই প্রস্তাবে সকলে হকচকিয়ে গেলেন। বাঁশরীদি বললেন : কেন, তুড়ি দিতে পারলে কী হবে?

ভানুদা বললেন : কিছুই হবে না। আপনি তুড়ি দিতে পারেন কিনা তাই জিগাইতাছি। যদি পারেন তো দিয়া ফেলান।

এবার বাঁশরীদির কেমন একটা সন্দেহ হল। বললেন : না বাবা, আমি তুড়ি দেব না। তোমার নিশ্চয় কিছু একটা মতলব আছে।

ভানুদা বললেন : ওই দ্যাখেন, সামান্য একটা তুড়ি দিবেন, তার মধ্যে মতলবের কী দ্যাখলেন আমার। ঠিক আছে। আপনারে তুড়ি দিতে হইব না।

এই বলে ভানুদা সুমনাদির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনে পারেন?

সুমনাদি খুব স্মার্ট মহিলা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দু'আঙুলের টোকা দিয়ে একটা তুড়ি দিয়ে ফেললেন। বেশ জোরেই মট্ করে একটা শব্দ হল।

ভানুদা বললেন : ফাইন! এই তো কেমন চমৎকার তুড়ি দিলেন আপনে। বাঁশরীদি শুধু শুধু ভয় পাইতাছে। ভাবতাছে উনি একটা তুড়ি দিলে কী না কী হইব।

সুমনাদির তুড়ি দেওয়া দেখে বাঁশরীদি এবারে সাহস পেয়ে গেছেন। বললেন : ওবকম তুড়ি আমিও দিতে পারি।

এই বলে টক্ করে দু'আঙুলের ঘর্ষণের দ্বারা একটা তুড়ি দিয়ে দিলেন।

এইভাবে ভানুদা একে একে সবাইকে দিয়ে তুড়ি দেওয়ালেন। স্বাগতাদিও দিলেন। কেবল স্বাগতাদির স্বামী ডাক্তারবাবু বললেন : আমাব তুড়ি দেওযা আসে না। যখনি দিতে যাই আঙুল পিছলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ভানুদা বলে উঠলেন . এই তো আমার দলে একজনকে পাইয়া গেছি। এখানে এতজনের মধ্যে আমি আর ডাক্তারবাবু হইলাম গিয়া ঘি-দুধ খাওয়া মানুষ। তুড়ি দিতে গেলে আমাদের আঙুল পিছলাইয়া যায়।

ভানুদার কথায় আর বলার ভঙ্গিতে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি ওদের আসরের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার হাসির আওয়াজটা বোধহয় সবথেকে জোরে হয়েছিল।

সেই হাসির আওয়াজে ভানুদার দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট হল। বললেন : তোমার মনটা দ্যাখতাছি এখনও সাদা আছে। তাই হাসির আওয়াজে এত ত্যাজ। তা তুমি এমন পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করতাছ কেন?

ওঁর কথাটা আমাব বোধগম্য হল না। জিজ্ঞাসা করলাম : তার মানে?

ভানুদা বললেন : তার মানে ওরকম একপাশে খাড়াইয়া আছ ক্যান? তোমার নামটি কী ভাই?

আমি বললাম : রবি বসু।

ভানুদা বলে উঠলেন : খাস ঘটি মনে হইতাছে। যা 'স'-এর উচ্চারণ। তোমার সঙ্গে আর বাঙাল ভাষায় কথা কমু না। কইলকাত্তাইয়া ভাষায় কমু।

আমি বললাম : অতি উত্তম। তা কথাটা মনে থাকবে তো?

ভানুদা বললেন : প্রমিস! প্রমিস! প্রমিস!

তারপর একটু হেসে বললেন : রবির পরে আর কিছু নেই কেন? চরণ কিংবা কুমার? নাকি আমার যেমন ভানু, তোমারও তেমনি রবিটা ডাকনাম নাকি?

আমি বললাম : না, আমার নামের পরে একটা নাথ ছিল।

ভানুদা বললেন : তা অনাথ হলে কেমন করে?

আমি বললাম : বাবা-মায়ের বোধহয় মনে মনে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্রটি কালক্রমে আর একজন 'কবিগুরু' হয়ে উঠবে। কিন্তু তার যে 'কপিগুরু' হবার যোগ্যতাও নেই সেটা তো তাঁরা বুঝতে পারেননি। আমি যেদিন সেটা বুঝতে পারলাম, সেদিন স্যারেদের খোশামোদ করে ইশকুলের খাতা থেকে নামের পাশের নাথ-টা বাদ দিয়ে দিইয়েছিলাম।

ভানুদা বললেন : বাঃ, তোমার তো বেশ পানিং-এ দক্ষতা আছে। তোমার সঙ্গে আমার জমবে ভালো। মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ কোরো কিন্তু রবিকুমার।

আমি বললাম : আবার কুমার কেন! অনেকদিন আগেই আমার কৌমার্য ভঙ্গ হয়ে গেছে; অলরেডি একটি পুত্র সন্তানের জনক আমি। আমাকে শুধু রবি বলেই ডাকবেন।

ভানুদা হাসতে হাসতে বললেন : তবু ভালো যে 'রবিবাবু' বলতে হুকুম করেননি। আজকালকার ইয়াং জেনারেশানের উঠতি মস্তানদের আবার বাবু বলে না ডাকলে গোঁসা হয়।

এই যে ডায়লগটি ভানুদা দিলেন সেটা লিখতে গিয়ে খুব ফ্ল্যাট হয়ে গেল। এরমধ্যে আদৌ হাসির খোরাক নেই। কিন্তু ভানুদা এই সংলাপটিই এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বললেন যে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড়।

ভানুদার অভিনীত বিভিন্ন ছবিতেও এই জিনিসটা দেখেছি। অতি সাধারণ কথা, তার মধ্যে হাস্যরসের লেশমাত্রও নেই, কিন্তু ভানুদা সেই কথাটিকেই এমন রসিয়ে বলতেন যে প্রেক্ষাগৃহে হাসির তুফান ছুটত। একটি অতি সামান্য ব্যাপারকেও অসামান্য করে তোলবার ক্ষমতা ভানুদার ছিল।

আসলে ভানুদা ছিলেন একজন শক্তিমান অভিনেতা। হাস্যরসের ভূমিকা ছাড়াও তিনি যেসব সিরিয়াস চরিত্রে রূপদান করেছেন তার মধ্যে দিয়েই ভানুদার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে কোনওদিন লোক হাসিয়ে বেড়াবেন, সেটা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না।

ভানুদা যে প্রথম যৌবনেই সিরিয়াস চরিত্রে কত ভালো অভিনয় করতে পারতেন, সে কথা শুনেছি সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মুখ থেকে। হরিনারায়ণবাবু পানুদার পাড়ার লোক। উনিও টালিগঞ্জের চারু অ্যাভিনিউতে থাকতেন, যেখানে ভানুদারও বসবাস।

ভানুদার সঙ্গে হরিনারায়ণবাবুর খুব হৃদ্যতা ছিল। হরিনারায়ণবাবু একটি জীবনবীমা কোম্পানির উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তবে ওটা হল ওঁর জীবিকা। ওঁর আসল জীবন হল সাহিত্য। কী মিষ্টি ছিল ওঁর লেখা। ভদ্রলোক বর্মায় মানুষ। সেখানকার জীবন নিয়ে উনি 'ইরাবতী' নামে একটি চমৎকার উপন্যাস লিখেছিলেন। ঠিক ভানুদার মতোই ওঁর সঙ্গেও আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওঁকে দিয়ে আমি একটি আত্মজীবনীমূলক রচনা লিখিয়েছিলাম। লেখাটির নাম 'নক্ষত্রের জাল'। সিনেমা জগৎ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই লেখাটি ওঁর যে কোন উপন্যাসের থেকেও মনোজ্ঞ।

এই হরিনারায়ণবাবু মাঝে মাঝেই উল্টোরথ অফিসে আসতেন। ওঁর কাছ থেকেই ভানুদার খবব নিয়মিত পেতাম। আমার কোন বক্তব্য থাকলে সেটাও হরিনারায়ণবাবুর মারফত ভানুদার কাছে পৌঁছে দিতাম। উনি সানন্দে সেইসব দূতিয়ালির কাজ করতেন।

এই হরিনারায়ণবাবুর কাছেই শুনেছিলাম ওঁদের পাড়ায় 'চন্দ্রগুপ্ত' নাট্যাভিনযের কথা। ওই নাটকে ভানুদা করেছিলেন চাণক্য, আর হরিনারায়ণবাবু চন্দ্রগুপ্ত। ভানুদাব সেই অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন হরিনারায়ণবাবু। উনি বলেছিলেন : তখনকার দিনে সাধারণত কেউ চাণক্যর ভূমিকায় অভিনয় করলে শিশিরকুমাব ভাদুড়িকেই অনুকরণ করতেন। কিন্তু ভানুবাবু একদম তা করেননি। উনি চরিত্রটাকে নতুনভাবে ইন্টারপ্রেট করেছিলেন। খুব কম লোকই এমন করতে সাহস পায়।

সেইরকম সিরিয়াস অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ লোক হাসানোর কাজে অমন মেতে গেলেন কেন? সেটাও আর এক ইতিহাস।

আমাদের এই বাংলাদেশের বহু শিল্পীই আমার কাছে শ্রদ্ধেয়। তাঁদের মধ্যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান আবার প্রথম সারিতে। অমন পরোপকারী, অমন উদার মনের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। একটা ঘটনার কথা বললে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়টায় খ্যাতির মধ্যগগনে। কী স্টেজে আর কী ফিল্মে, ভানু ছাড়া গীত নাই। ভানু বলতে লোকে পাগল। ওঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা প্রবল রসালো মাদকতা ছিল। সেই মাদকতাটাকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানি। এককালে সোনেলা এবং অন্যান্য রেকর্ডে নবদ্বীপ হালদারের কমিক বাংলার মানুষকে মাতিয়ে দিয়েছিল। ঘরে ঘরে তাঁর রেকর্ড বাজত। কিন্তু পরবর্তীকালে নবাদাকে নিয়ে সেরকম ক্রেজ ছিল না। ওঁর গলায় বয়সের ছোঁয়া এসে যাওয়ার কমিক স্কেচগুলো দর্শকদের তেমন করে মাতিয়ে তুলতে পারছিল না।

অভিনেতা হিসাবে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় পপুলার হবার পর গ্রামাফোন কোম্পানি আবার সেই কমিক স্কেচের যুগটাকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। জহর রায় তখন কমিক স্কেচের রেকর্ড করছেন বটে, কিন্তু তাঁর স্কেচের দুটি তিনটি ছাড়া বাকিগুলি শ্রোতাদের কাছে তেমন করে আদর পেল না। এটা ঠিক জহরদার দোষ নয়। ক্রটিটা অন্য জায়গায়। জহরদার বাচিক ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট নয়। কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে যেত। এ ক্রটিটা স্টেজে কিংবা ফাশোনে ধরা পড়ত না। উনি এমন অসাধারণ সব অঙ্গভঙ্গি করতেন যাতে দর্শক হেসে কুটিপাটি হয়ে যেতেন। উচ্চারণের ত্রুটিগুলি কান এড়িয়ে যেত। কিন্তু গ্রামোফোনের রেকর্ডে উচ্চারণটাই তো সব। সেখানে তো আর শিল্পীকে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে

না।

এদিক থেকে ভানুদার বাচনভঙ্গি এবং শব্দের উচ্চারণ গ্রামোফোন রেকর্ডের পক্ষে ইউনিক। অভিনেত্রী গীতা দেকে সঙ্গে নিয়ে ভানুদা যে সব কমিক স্কেচের রেকর্ড করেছেন, তার প্রচণ্ড পপুলারিটিই তার প্রমাণ। নবদ্বীপ হালদারদের সময়ে কমিক স্কেচের যা পপুলারিটি তার তিনগুণ কী চারগুণ বেশি। সুতরাং প্রতি পুজোতেই ভানুদার কমিক স্কেচের রেকর্ড বেবোতে লাগল এইচ এম ভি থেকে। সেসব রেকর্ড হুইহুই করে বিক্রি হতে লাগল বাজারে।

তা একবার পুজোর রেকর্ড হবার ঠিক আগে আগে ভানুদা হঠাৎ গ্রামাফোন কোম্পানিকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেন, এবার পুজোয় তিনি আর রেকর্ড করবেন না, যতক্ষণ না তাঁর একটি শর্ত মেনে নেন গ্রামোফোন কর্তৃপক্ষ।

কী সেই শর্ত?

সে ঘটনাটাও বড় অদ্ভুত। একটি মানুষ যে কত বড মাপেব মানুষ হতে পারেন তা ভানুদাব সেই শর্তটা শুনলে বুঝতে পারা যাবে।

সুশীল চক্রবর্তী নামে একজন তরুণ কমেডিয়ান সেই সময় কলকাতার বিভিন্ন ফাংশানে খুব পপুলার ছিলেন। সুশীলবাবু এখনও কমিক করেন, এবং পপুলারও বটে। তিনি তাঁর স্কেচগুলি করতেন নবদ্বীপ হালদারের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে। সেই তরুণ বয়সে ফাংশানে অত পপুলারিটি পাবার পর তাঁর ইচ্ছে হল গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে তাঁর কমিক স্কেচের রেকর্ড করেন। তিনি এই ব্যাপারে গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কর্তা অর্থে তখন যিনি রেকর্ডিং অধিকর্তা ছিলেন তাঁর সঙ্গে। তিনি সুশীলবাবুর কমিক শুনলেন এবং তার প্রশংসা করলেন। আশ্বাস দিলেন যে তাঁর রেকর্ড করা হবে।

কিন্তু দিনের পর দিন যায়, জুতোর পর জুতো পালটাতে হয়, কিন্তু সুশীলবাবুর রেকর্ড আর হয় না। অবশেষে একদিন শুনলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিকের রেকর্ড এত বেশি চলছে যে নতুন কোনও শিল্পীর কমিক স্কেচ রেকর্ড করার কথা তাঁরা এই মুহূর্তে ভাবতে পারছেন না। তবে যোগাযোগ রাখতে বললেন। ভবিষ্যতে কখনও রেকর্ড হলেও হতে পারে।

কথাটা শুনে খুব মুষড়ে পড়লেন সুশীল চক্রবর্তী। কী করবেন ঠিক করে উঠতে পারলেন না। অবশেষে একদিন সকালে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের টালিগঞ্জের চারু অ্যাভিনিউর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন।

অত সকালে তাঁর বৈঠকখানায় সুশীলবাবুকে দেখে ভানুদা একটু অবাক হলেন। বললেন : কী খবর সুশীল। তোমার মুখখান অমন শুকনা দ্যাখাইতাছে ক্যান?

সুশীলবাবু বললেন : আমার কপাল খারাপ ভানুদা। গ্রামোফোন কোম্পানিতে আমার আর রেকর্ড করা হল না বোধহয়।

ভানুদা বললেন : ক্যান? রেকর্ড হইব না ক্যান? তুমি তো কইছিলা খুব শীগগির তোমার রেকর্ড হইব।

সুশীলবাবু বললেন : ওঁরা তো তাই বলেছিলেন। এখন বলছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অমন পপুলার আর্টিস্ট থাকতে আমরা নতুন শিল্পীর রেকর্ড করতে যাব কোন দুঃখে। আপনি পরে দেখা করবেন।

ভানুদা বললেন : তাই নাকি। হেই কথা কইসে? এই বলে টেলিফোনটার দিকে ইংগিত করে বললেন : ঘুরা তো, ঘুরা।

অর্থাৎ টেলিফোনে ডায়াল করে লাইনটা ধরে দে তো।

ভানুদার কথা শুনে সুশীলবাবু গ্রামোফোন কোম্পানির নম্বরটা ডায়াল করে রিসিভারটা ধরিয়ে দিলেন ভানুদার হাতে।

ওপার থেকে সাড়া পেয়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন : শোনেন, আমি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কইতাছি। এবার পুজায় আমি আপনাদের ওখান থিক্যা রেকর্ড করুম না।

ওপারে যিনি ছিলেন তিনি কী বললেন তা জানা গেল না। তবে ভানুদা বললেন : না না, সে ব্যাপার নয়। আমি অন্য কোনও কোম্পানির অফার পাই নাই। পাইলেও লইতাম না। আমি রেকর্ড করুম না অন্য কারণে।

ওপারের ভদ্রলোক বোধহয় কারণটা জানতে চাইলেন। তার উত্তরে ভানুদা বললেন : আপনারা জুনিয়ার আর্টিস্টদের লগে দুর্ব্যবহার করেন। হেইটাই একমাত্র কারণ।

টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে ভদ্রলোক বোধহয় কার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে সেটা জানতে চাইলেন।

ভানুদা বললেন : সুশীল চক্রবর্তী নামে একজন জুনিয়ার আর্টিস্টরে আপনারা কথা দিছিলেন তার রেকর্ড করবেন। অখন কইতাছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ড যখন অ্যাকসেপ্টেড হইতাছে তখন আর জুনিয়ার আর্টিস্টের প্রয়োজন নাই। হেইডা কী ধরনের কথা হইল। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর কী দ্যাশ থিকা কমেডি উইঠা যাইব নাকি?

ভানুদার এইরকম চোখা চোখা কথার উত্তরে অপর প্রান্তের ভদ্রলোক বোধহয় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু বলেছিলেন। ভানুদা তার উত্তরে বললেন : না না, হেইডা রাগের কথা না। হেইডা হইল এথিকসের প্রশ্ন। সবাই আমারে কইব ওই বুড়া ভানু বাঁড়ুজ্যে জুনিয়ার আর্টিস্টদের রাস্তা আগলাইয়া বইয়া রইছে। হেইসব কথা আমি শুনতে রাজি নই। আমার শর্ত যদি আপনারা মানেন তবে পূজায় রেকর্ড করুম, নয়তো গুডবাই।

ভদ্রলোক আবার কী যেন বললেন। কারণ তার উত্তরে ভানুদা সুশীলবাবুর দিকে একটা চোখ টিপে ইংগিত করে বলে উঠলেন : আমি চাই ইমিডিয়েটলি আপনাদের কোম্পানি থিকা সুশীলের একখান রেকর্ড বাইর হউক।

ফোনের ওপ্রান্ত থেকে ভদ্রলোক যা বললেন, তা শুনে ভানুদার মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন : ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আজই সুশীলরে পাঠাইয়া দিতাছি। ও রেকর্ড কইরা স্যাম্পেল কপি আমারে দেখাবে, তারপর আমি আপনাগো স্টুডিওতে পূজার রেকর্ড করতে যামু।

এই বলে ভানুদা রিসিভারটা রেখে সুশীল চক্রবর্তীকে বললেন : শোন সুশীল, তুই আজই এইচ এম ভি-তে চইলা যা। মনে হয় কাল পরশুই তোর রেকর্ড অইব। তোর স্কেচ টেচ সব রেডি আছে তো?

সুশীলবাবু বললেন : তা তো আছে ভানুদা। কিন্তু ব্যাপারটা কী ভালো হল?

ভানুদা বললেন : ক্যান? খারাপডা হইব ক্যান?

সুশীলবাবু বললেন : অন্য কিছু নয়। আমি ভাবছি এর ফলে আপনার সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির রিলেশানটা যদি খারাপ হয়। আপনার যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায়?

সুশীলবাবুর কথা শুনে ভানুদা হেসে ফেললেন। তারপর বললেন : যদির কথা নদীতে ফালাইয়া দাও দিকি। আমার ক্ষতি করণের ক্ষমতা মাইনষের নাই। সেটা আছে একমাত্র ঈশ্বরের। তা সেইটা ভাবনের প্রয়োজন তর নাই। তুই এক্ষুনি দমদম চইলা যা। কী হল না হল তা টেলিফোন কইরা জানাইয়া দিস। আজই।

ভানুদার সেদিনের সেই মানবিক উদারতার কথা স্মরণ করে আজও সুশীলবাবু কেঁদে ফ্যালেন। বলেন : ভানুদার মতো মানুষ না থাকলে আমি বোধহয় কোনদিনই লাইমলাইটে আসতে পারতাম না রবিবাবু। তিনি আমার কাছে মানুষ নন, দেবতা।

খুব সত্যি কথা। ভানুদার মতো ওইরকম সহজ মনের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। কত মানুষের জন্যে কত কী যে করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। যে কমেডিয়ান অজিত চ্যাটার্জী সকলের জন্যে সারা জীবন ধরে উপকার করে শেষ জীবনে সকলের কাছ থেকে অবহেলা কুড়োচ্ছিলেন, সেই অজিতবাবুকে শেষ জীবনে শেল্টার দিয়েছিলেন এই ভানুদাই। সেসব কথা অজিতবাবুর প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে আমি জানিয়েছি। সুতরাং পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

আমার জীবনের সঙ্গে ভানুদার মহত্ত্বের এইরকম একটা ঘটনা জড়িয়ে আছে। সেদিন ভানুদার

ব্যবহারে আমার চোখ দিয়ে হু হু করে জল গড়িয়ে পড়েছিল। সেটা বলার আগে আর একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলে নিই।

আমি যে একদা 'সাতরঙ' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতাম, সেটা পাঠকদের অজানা নয়। সেই সময়ে আমি নিয়মিত ভানুদার সঙ্গে আড্ডা দিতে যেতাম স্টার থিয়েটারে। তা ভানুদা একদিন বললেন আমার একটা উপকার করতে পাববে ববিকুমার।

ভানুদার কথা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। বললাম : এ কী বলছেন ভানুদা। পরোপকার করা যাঁর জীবনের ব্রত সেই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কী না তাঁর উপকার করবার জন্যে বলছেন! আর তাও কী না আমার মতো একজন অভাজনকে। আপনার কী মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

ভানুদা বললেন : না না, ঠাট্টার কথা নয়। এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার।

ভানুদা যেমন সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথাটা বললেন, তাতে আমিও সিরিয়াস হয়ে উঠলাম। বললাম : কী করতে হবে বলুন।

স্টার থিয়েটারের গ্রীনরুমের মাঝের ঘরে আমরা যেখানে বসে কথা বলছিলাম, সেখানে তখন আরও অনেক শিল্পী ছিলেন। ভানুদা তাঁদের দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখে আমার হাতটা ধরে বললেন একটু বাইরে চলো।

আমরা গ্রীনরুমের বাইরের উঠোনটায় এসে দাঁড়ালাম। ভানুদা আমাকে নিয়ে একেবারে স্টার লেনের পিছনের দরজার কাছাকাছি চলে গেলেন। তারপর একটি বেশ মোটাসোটা এক্সারসাইজ বুক আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন : এতে আমি কিছু হাস্যারসাত্মক চুটকি লিখে রেখেছি। এগুলো তোমার 'সাতরঙ' কাগজে ছাপতে চাই। তুমি রাজি আছো?

আমি বললাম : এ তো দারুণ ব্যাপার। আপনার লেখা চুটকি লোকে তো হৈ হৈ করে পড়বে। রাজি হব না মানে!

ভানুদা বললেন : তবে একটা কথা আছে। আমার ভাষা ভালো না। আমি যখন যা মনে এসেছে, সেই ভাষায় লিখেছি। ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে গেলে সেগুলো সংস্কার করা দরকার। সেটা তোমাকে করে নিতে হবে! পারবে তো?

আমি বললাম : কতটা কী পারব জানি না। তবে সাধ্যমতো চেষ্টা করব। তবে একটা কথা আছে ভানুদা।

ভানুদা বললেন : কী কথা?

আমি বললাম : আমাদের কাগজ বার করে লাভ টাভ বিশেষ কিছু হয় না। সেই কথা ভেবে আপনাকে পয়সাকড়ি কিরকম কী দিতে হবে বলুন।

ভানুদা বললেন : এক পয়সাও দিতে হবে না। লেখা ছেপে পয়সা রোজগার করতে হলে তো অনেক বড় কাগজ আমার হাতে ছিল। আমি সেখানে না দিয়ে তোমাকে দিতে চাইলাম কেন বল তো?

আমি বললাম : তা তো জানি না।

ভানুদা বললেন : তোমাকে তো দীর্ঘদিন ধরে দেখছি। কাগজ বার করাটা তোমার একটা প্যাশন। তার জন্যে তুমি অনেক কিছু ত্যাগ করতে রাজি। এই ব্যাপারটা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার সেই স্ট্রাগলের আমিও অংশীদার হতে চাই। আমার লেখা ছেপে তোমার যদি দুজন গ্রাহকও বাড়ে তাতেই আমি খুশি। আমার কোনও পয়সাকড়ির দরকার নেই।

ভানুদার কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেলাম। আবেগে চোখে জল এসে গেল। সেটা সামলে নিয়ে কোনরকমে উচ্চারণ করলাম : থ্যাংক ইউ ভানুদা।

রাত্রে বাড়িতে বসে চুটকিগুলো পড়লাম। খুবই ইন্টারেস্টিং। তবে সত্যিই ভাষার কিছু সংস্কার করার প্রয়োজন আছে।

সেই লেখা ধারাবাহিক ভাবে সাতরঙ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। পাঠকদের তা দারুণ ভালো লেগেছিল। বিক্রির সংখ্যাও বেশ বেড়েছিল আমাদের পত্রিকার। প্রচুর প্রশংসাসূচক চিঠিপত্রও পেতাম পাঠকদের। ভানুদার লেখার অল্প একটু নমুনা দিই।

এক বন্ধু তার আর এক বন্ধুকে তার বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করেছে। আমন্ত্রণকারী বন্ধুর অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। তাই তাব স্ত্রী তাঁকে সাবধান করে দিলেন, দ্যাখো, তুমি তো মাত্র এক পো (এখনকার হিসেবে আড়াইশো গ্রাম) কাটা পোনা কিনে এনেছো। খেতে বসে আবার তোমার বন্ধুকে যেন বলে বসো না যে, আর দুখানা মাছ নাও ভাই।

স্বামী বললেন, পাগল হয়েছো। তাই কখনও বলি। আমি কী জানি না যে তোমার হেঁসেলে কখানা মাছ আছে। বেশি করে মাছ খেতে বললে তুমি যোগাবে কোথা থেকে। আমার বন্ধুর সামনে আমি কী আমার স্ত্রীকে ছোট করতে পারি।

খেতে বসে স্বামীটি কিন্তু তার স্ত্রীর সাবধানবাণীর কথা একদম ভুলে মেরে দিলেন। খেতে খেতে বন্ধুকে বললেন, এ কী' তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না ভাই। আমি কী তোমার পর যে এরকম করে খাচ্ছ। আর দুখানা মাছ নাও, ভালো কবে ভাত ভেঙে খাও।

তার কথা শেষ হতে না হতে আমন্ত্রিত বন্ধুটি যেন আঁতকে উঠলেন। কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাওয়ার মতো বলে উঠলেন, না না। থাক ভাই। আর মাছ খেতে পারব না।

আমন্ত্রণকারী বন্ধুটির তখন স্ত্রীর সাবধানবাণীর কথা একেবারে খেয়াল নেই। আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, তাই বললে কি চলে ভাই। তুমি কতদিন পরে, কতদিন পরেই বা বলি কেন, এই প্রথম আমার বাড়িতে খেতে এসেছো। তোমাকে আর দুখানা মাছ খাওয়াতে না পারলে আমার আত্মার যে তৃপ্তি হচ্ছে না ভাই। তোমাকে আর দুটো মাছ নিতেই হবে।

এই বলে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, কই গো, তুমি তো রবিকে ভালো করে খেতে বলছো না। আর দুখানা মাছ দাও ওকে।

বন্ধুর স্ত্রী হাসি হাসি মুখে বললেন, তুমিই তো বলছো। তোমার বলা আর আমার বলা কী আলাদা নাকি' নিন ভাই ঠাকুরপো, আপনি আব দুখানা মাছ নিন।

আমন্ত্রিত বন্ধুটি পুলকিত চিত্তে সম্মতি জানাতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেলেন। আগের মতোই আঁতকে উঠে বললেন, না না বউদি, আমার আর মাছের দরকার নেই।

আমন্ত্রণকারী বন্ধু বললেন, এ তোমার বড় অন্যায় ভাই রবি। আমি বলছি, তোমার বউদি এত করে বলছে, তবু তুমি দুখানা মাছ নিতে পারছো না। গরিব বলে আমাকে এত অবহেলা করা কী তোমার উচিত। তোমাকে আর দুখানা মাছ নিতেই হবে। না নিলে আমার মাথা খাবে।

এবারে আমন্ত্রণকারী বন্ধুর কণ্ঠে যেন আর্তনাদ ফুটে উঠল। তিনি করুণ কণ্ঠে বললেন, বিশ্বাস কর ভাই, আমার পেটে আর এক বিন্দুও জায়গা নেই। তোমাদের এখানে এসে যা খেলাম তা আমি সারা জীবনেও ভুলব না। আমাকে মাফ কর ভাই।

বলতে বলতে তড়িঘড়ি উঠে পড়ে কোনরকমে হাত মুখটা ধুয়েই বিদায় নিয়ে যেন পালিয়ে বাঁচলেন বন্ধুর সংসার থেকে।

আমন্ত্রিত বন্ধুটি অন্তর্হিত হবার পর স্ত্রী রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামীর ওপর। বললেন, তোমাকে পই পই করে বারণ করলাম যে তুমি আর মাছ নেবার জন্যে বলবে না। তা তুমি আমার কথা শুনলেই না। তার ওপর এতবার টেবিলের তলা দিয়ে তোমার পায়ের ওপর লাথি মেরে মেরে ইশারা করলাম, তাও তুমি পাত্তা দিলে না। ভাগ্যিস তোমার বন্ধু আর মাছ নিতে চাইলো না। চাইলে কী হত বল তো। আমি তো আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতাম না।

স্ত্রীর কথা শুনে স্বামী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, এ তুমি কী বলছ গো! তুমি আবার আমার পায়ে কখন লাথি মারলে?

স্ত্রী বললেন, তুমি যতবার মাছ নেবার কথা বলেছ ততবারই লাথি মেরেছি। কেন, তুমি বুঝতে পারনি? তোমার গায়ের চামড়া কী গণ্ডারের নাকি?

স্বামী বললেন, এই সেরেছে। তোমার একটা লাথিও আমার পায়ে লাগেনি। সব কটাই বোধহয় রবির পায়ের ওপরেই পড়েছে। তাই বেচারা ওর কম আঁতকে আঁতকে উঠছিল আর মাছ নেবার কথায় না না করছিল। দ্যাখো কাণ্ড।

ঠিক এইরকম অজস্র চুটকি ছিল ভানুদার খাতায়। হয়ত এইসব হিউমারেব উৎস বিদেশি জোকসের বই। কিন্তু ভানুদা সেগুলোর এমনভাবে বঙ্গীয়করণ করেছিলেন যা এক কথায় অতুলনীয়।

ভানুদার ওইসব জোকসগুলির জন্যে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। ভানুদা ইচ্ছে করলে এগুলি কোনও বড় পত্রিকায় অনেক অর্থের বিনিময়ে প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি আমাকেই অনুগ্রহ করেছিলেন। তাঁর এই উদারতার তুলনা নেই। আজও চোখে জল এসে যায় সেইসব কথা ভাবলে।

তবে সত্যিই একদিন আমার চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল ঝরিয়েছিলেন ভানুদা। কলকাতা থেকে অনেক দূরে তমলুক শহরে একদিন গভীর রাতে ভানুদার কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছিলাম তাতে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত ভানুদাই তাঁর রুমাল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছিলেন।

সে কথায় পরে আসছি।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এরকম দৃঢ়চেতা, এরকম অকুতোভয় মানুষ আমি ফিল্ম লাইনে খুব কমই দেখেছি। অত্যন্ত তেজি চরিত্রের মানুষ। কঠোরে কোমলে মিশ্রিত একটি চরিত্র। রেগে গেলে দুর্বাসা। আবার যখন শান্ত থাকতেন তখন যেন একখানা ঠাণ্ডা জলের টলটলে দিঘি। কেউ বিপদে পড়লে তাব পাশে এসে দাঁড়াতেন সর্বশক্তি নিয়ে। আর হিপোক্রেসিকে ঘেন্না করতেন মনপ্রাণ দিয়ে। হিপোক্রিটদের ভানুদা একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না।

চরিত্রের এই তেজ আর দৃঢ়তা ভানুদা সম্ভবত জন্মসূত্রেই লাভ করেছিলেন। ভানুদার জন্ম ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে। এই আগস্ট মাসে জন্ম নিয়ে ভানুদার সঙ্গে আমার প্রায়ই ঠাট্টা-তামাসা হত। ভানুদা হাসতে হাসতে বলতেন : তোমার সঙ্গে আমার এত পীরিতের কারণ কী জানো রবিকুমার?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন?

ভানুদা বললেন : তুমি আর আমি দুজনেই জন্মেছি আগস্ট মাসে। আর আগস্ট মাসটা হল মহাপুণ্যের মাস। এই মাসে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন। পৃথিবীতে কত বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে এই আগস্ট মাসেই। যদিও আমি এখনও সঠিকভাবে বুঝতে পারছি না যে ভারত সত্যিই স্বাধীন হয়েছে কি না।

আমি বললাম : ওসব কথা থাক ভানুদা। আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্কে আমি যাব না। আপনি বিপ্লবে বিশ্বাসী, আর আমি গান্ধীবাদে। তর্কের মধ্যে দিয়ে এর মীমাংসা তো হবে না। তার চেয়ে বরং পীরিতির রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা করি আসুন।

এই 'পীরিত' কথাটি উচ্চারিত হলেই ভানুদা হো হো করে হাসতেন। তার কারণও আছে। একদিন স্টার থিয়েটারের গ্রিনরুমের মাঝের ঘরে আমি আর ভানুদা যথারীতি আড্ডা দিচ্ছি। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন ওই স্টার থিয়েটারের একজন বিশিষ্ট অভিনেতা চন্দ্রশেখর দে। ওঁকে সবাই চাঁদুবাবু বলে ডাকতেন। চন্দ্রশেখরবাবুর সঙ্গেও আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। ভদ্রলোক যেমন ভালো অভিনেতা, তেমনি সুদর্শন। পরবর্তীকালে যাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন এবং খুব নামও করেছিলেন। ১৯৭৮ সালে আমি 'যাত্রাতীর্থ নাম দিয়ে একটি যাত্রার দল করেছিলাম। চন্দ্রশেখর দে সেই দলের প্রধান চরিত্রাভিনেতা ছিলেন। ওই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। গভীর রাতে মধ্যপ্রদেশের পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা পরিবেশে বসে চাঁদুবাবু তাঁর জীবনের নানা সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলেন। বারান্তরে সেসব কাহিনী প্রকাশ করা যাবে। আপাতত ভানুদার কথাতেই ফিরে আসি।

ভানুদা আর আমার মধ্যে যে পীরিতের কথা ভানুদা উচ্চারণ করলেন, সেটার সৃষ্টি হয়েছিল ওই চাঁদুবাবুর মুখেই। একদিন স্টার থিয়েটারের গ্রিনরুমের মাঝের ঘরে আমি আর ভানুদা বসে গল্প করছিলাম, এমন সময় সেখানে চাঁদুবাবু এসে হাজির। আমাদের দুজনের মধ্যে ওই ধরনের মাখামাখি দেখে চাঁদুবাবু রসালো ভঙ্গিতে একটা চোখ টিপে বললেন : এই যে রবিবাবু, ভানুর একার সঙ্গে পীরিত করলে চলবে! আমাদের দিকেও একটু তাকিয়ে দেখুন।

চাঁদুবাবুর ওই রসিকতায় আমি একটা যুতসই জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই ভানুদা বলে উঠলেন : ওহে চাঁদু! তুমি হইলা গিয়া কলির কিষ্ট। তোমার আবার পীরিত করণের লোকের

অভাব! এই স্টাব থিয়েটারেই অন্তত হাফ ডজন নাগব-নাগরী তমার সাথে পীরিত করণের লগে বইয়া আছে। তাদের কাছেই যাও না চাঁদু। আমাদের মতো অবোধ পোলাপানদেব দিক নজর দিতাছ ক্যান্?

ভানুদার এই মোক্ষম জবাবটা বোধহয় চাঁদুবাবুব খুব পছন্দ হয়েছিল। হো হো করে হাসতে হাসতে সেই স্থান পবিত্যাগ করলেন। চাঁদুবাবু চলে গেলেও ভানুদা কিন্তু চাঁদুবাবুর ওই 'পীরিত' শব্দটিকে পরিত্যাগ করতে পারলেন না। মন ভালো থাকলে মাঝে মাঝেই 'পীরিত' শব্দটির উল্লেখ সহযোগে বঙ্গ-রসিকতা করতেন। আর কোন কারণে মন ভালো না থাকলে ভানুদা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে থাকতেন। তাঁর কপালের একটা রগ ফুলে থাকতে দেখা যেত। ওই সময়টায় আমি পারতপক্ষে ভানুদার মুখোমুখি হতে চাইতাম না। কারণ ভানুদা এতই স্পষ্টবক্তা ছিলেন যে, অতিশয় অপ্রিয় কথাও ওঁর মুখে এতটুকু আটকাত না। কাবও সামান্য একটু অন্যায় দেখলেই উনি তাঁকে বাক্যবাণে ঝাঁঝরা করে দিতেন। কথার প্যাঁচে ফেলে একেবাবে তুলোধোনা কবে ছাড়তেন তাঁকে।

আমার সামনেই এক-বাব এক ইন্টেলেকচুযাল ভদ্রলোককে এইরকম তুলোধোনা করে ছেড়েছিলেন ভানুদা। ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত পালিযে বাঁচেন ভানুদার সামনে থেকে।

এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতে গিয়ে আমি কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করছি। কারণ এই ঘটনাটির সঙ্গে আমার তথা সাবা ভারতবর্ষেব মানুষেব শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবীব নামটি জড়িত। সমকালীন ভাবতবর্ষে মহাশ্বেতা দেবী কেবমমাত্র একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকই নন, সক্রিয় সমাজসংস্কারকও বটেন। তাঁর লেখনী এখন কেবলমাত্র নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, তাদের প্রতি বঞ্চনা ও শোষণের কাহিনী বিবৃত কবেই ক্ষান্ত থাকছে না, তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তবে, দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন সেই সমস্ত অত্যাচাবিত নিম্নবর্গের মানুষেব পাশে গিযে দাঁড়াতে। প্রতিকারের জন্য নানা আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছেন। মহাশ্বেতা দেবী আজ সেইসব অসহায় মানুষের কাছে ঈশ্বরের সমান। মহাশ্বেতা দেবী কেবল নামেই নন, আজ সত্যই তিনি দেবী।

এমন একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয়া মহিলাকে ভানুদার প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে আমি সঙ্কোচ বোধ করছি। কিন্তু না কবেও পারছি না। কারণ ভানুদা মহাশ্বেতা দেবীর রচনার প্রচণ্ড ভক্ত ছিলেন। তাই তাঁকে নিয়ে কটাক্ষ তিনি সহ্য কবতে পাবেননি। উন্মত্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই ইন্টেলেকচুয়াল ভদ্রলোকের প্রতি। তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যে তাঁকে একেবারে ঝাঁঝরা করে ছেড়েছিলেন।

ঘটনাটা তাহলে গোড়া থেকেই বলি। জানি না এটা আমার অন্যায় হচ্ছে কিনা। যদি হয় তাহলে মহাশ্বেতা দেবী যেন নিজ গুণে মার্জনা করেন।

এককালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক অসিত গুপ্ত ছিলেন আমাব বন্ধু। ছিলেন কেন, এখনও আছেন নিশ্চয়। তবু ছিলেন বললাম এই কারণে যে, দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। তিনি তখন দক্ষিণ কলকাতার বিপিন পাল রোডে থাকতেন। এখন আর সেখানে আছেন কিনা জানি না। কেমন অবস্থায় আছেন তাও জানি না।

অসিত গুপ্তেব সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় অধুনালুপ্ত 'রূপাঞ্জলি' পত্রিকায়। আমি যখন ওই পত্রিকায় যোগ দিই তখন অসিতবাবু ওই পত্রিকার একজন সিনিয়র সাংবাদিক। পরে আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ়তর হয় উল্টোরথ পত্রিকায় এসে। ওখানে একটা সময়ে ওই প্রতিষ্ঠানেরই 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকার গ্রন্থনার দায়িত্ব আমি আর অসিতবাবু স্বাধীনভাবে পেয়েছিলাম। ওই সময়ে আমাদের বন্ধুত্ব এতই প্রগাঢ় ছিল যে আমরা উভয়ের গোপন কথাটি পর্যন্ত অকপটে আদানপ্রদান করতাম।

সাহিত্যিক মহাশ্বেতা তখনও দেবী হননি। উনি তখন ভট্টাচার্য। নবনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং বিশিষ্ট নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের স্ত্রী। মহাশ্বেতা বহরমপুরের বিখ্যাত ঘটক পরিবারের কন্যা। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক মনীশ ঘটক ওঁর পিতা, যিনি 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে আরও বিখ্যাত ছিলেন। বিজনদার সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর কী কারণে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তা আমি জানি না। পরে অসিত গুপ্ত ও মহাশ্বেতা দেবী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন আইনের সাহায্যে। অর্থাৎ রেজেস্ট্রি করে।

এই ঘটনাটি তৎকালীন সাহিত্য সমাজে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ ঘটনাটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু কুসুমেও যেমন কীট থাকে, তেমনি সাহিত্য সমাজেও

কিছু কীট আছেন। তাঁরা এই ঘটনাটিকে মশলাদার রসালো আলোচনাব বস্তু করে তুললেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ঘটনাটিতে খুবই খুশি হয়েছিলাম। খুশির কারণ, পরিচয় দেবার মতো একজন বন্ধুপত্নী লাভ।

আর খুশি হয়েছিলেন ভানুদা। আগেই বলেছি উনি মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য প্রতিভাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তার ওপর অসিত গুপ্ত কিয়দংশে সিনেমা জগতের মানুষ। সিনেমা সম্পর্কে সাংবাদিকতা করা ছাড়াও উনি বেশ কিছুদিন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেকটারের কাজও করেছেন। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক নরেশ মিত্রের উনি সহকারী ছিলেন। সুতরাং সিনেমার সঙ্গে যুক্ত কোন মানুষ যখন এমন অসাধারণ স্ত্রীরত্ন লাভ করেন, তখন সেটা সামগ্রিকভাবে আমাদের সকলেরই গৌরবের কারণ হয়ে ওঠে।

ঠিক এই সময়ে একদিন ঘটনাটা ঘটল। সেদিন আমি স্টার থিয়েটারের গ্রিনরুমে বসে আছি। ভানুদা ভেতরেব ঘরে মেক-আপ নিচ্ছেন। এমন সময় পূর্বোক্ত ইন্টেলেকচুয়াল ভদ্রলোকেব ওখানে আবির্ভাব। ওঁকে আমি এর আগে বহুদিন কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে দেখেছি। সর্বদাই একটু নাক-উঁচু ভাব আমার সঙ্গে পরিচয় থাকলেও আমি পারতপক্ষে ওঁর সঙ্গ এড়িয়ে চলতাম। এক ধরনের মানুষ আছেন যাঁরা সিনেমা সংক্রান্ত সাংবাদিকতার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের করুণার চক্ষে দেখেন। আলোচ্য ভদ্রলোকটিও তাই। আমি অবশ্য এঁদের ফুকো ইন্টেলেকচুয়াল বলে মনে করি। ভেতরে একেবারে ফোঁপরা, কিন্তু বাইরে একগুচ্ছ দাড়ি রেখে নিজেদের ইন্টেলেকচুয়াল বলে জাহির করার প্রবণতা।

তা ওই ভদ্রলোক সেদিন স্টার থিয়েটারে কেন এসেছিলেন জানি না। বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে আমার পাশে এসে ঝপ করে বসে পড়লেন। এবং কোন কথা নেই বার্তা নেই অসিত গুপ্ত আর মহাশ্বেতা দেবীর বিবাহ নিয়ে কুৎসা গাইতে শুরু করলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি অবাক হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, যেহেতু আমি অসিত গুপ্তর বন্ধু তাই তাঁর মনের বিকৃতি আমার সামনেই প্রকাশ করা তিনি প্রশস্ত মনে করেছেন। ভদ্রলোকের কথায় রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল, কিন্তু যেহেতু ওই অত লোকের মাঝখানে কোন সিন ক্রিয়েট হয়ে যায় তাই আমি চুপ করেই ছিলাম। একটা কিছু করবার, হয় একটা যুতসই উত্তর অথবা তার থেকেও বড় কিছু করবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। একবার ভাবলাম, প্রচণ্ড একটা মুষ্টাঘাতে ভদ্রলোকের উঁচু নাকটা থেঁতো করে দিই। আর একবার ভাবলাম, ওঁর ওই ছাগলমার্কা দাড়িতে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওঁর কথার উত্তরটা দিয়ে দিই। কিন্তু এর কোনটাই করা সঙ্গত মনে করলাম না। মনের রাগ মনের মধ্যে পুষে রেখে ছটফট করতে লাগলাম।

কিন্তু আমি কোন প্রতিবাদ না করলেও আর একজন করলেন। তিনি হলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভানুদা যখন এসে আমার পাশে বসলেন তখনও অসিত-মহাশ্বেতাকে নিয়ে ভদ্রলোকের বঙ্কিম কটাক্ষের পাট শেষ হয়নি। কিছু কুৎসিত কথা তখনও তিনি সমানে বলে চলেছেন। এবং সবচেয়ে মজার কথা ভদ্রলোক তাঁর ওইসব কুৎসিত কথাবার্তার সমর্থন পাবার জন্য নীরবে ভানুদার সম্মতি চাইতে লাগলেন।

ভানুদার সেদিনকার মূর্তি আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। শুনেছি জলের মধ্যে নাকি কোথাও কোথাও আগুন লুকানো থাকে। ভানুদার সেদিনকার মূর্তিটা ঠিক সেইরকম। বাইরে শান্ত নিস্তরঙ্গ একটি মানুষ, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটছেন।

ভদ্রলোক বেশ খানিকক্ষণ ধরে কুৎসার সংকীর্তন চালাবার পর একটু বিশ্রাম নিলেন। তারপর এমনভাবে ভানুদার দিকে তাকালেন যাতে মনে হল তিনি চাইছেন তাঁর অসমাপ্ত কাজটুকু এবার ভানুদাই শুরু করুন। তাঁর ধারণা ছিল সিনেমা জগতের মানুষেরা নোংরা আলোচনায় যোগ দিতে বড়ই ভালোবাসে। এবং তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী ভানুদাও সেটাই শুরু করলেন। তবে একেবারে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব কায়দায়।

ভানুদা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন : আপনের পিতৃদেব এই বছর কয় বিঘা জমিতে ধান চাষ দিছেন?

এই ধরনের প্রশ্নে ভদ্রলোক কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। এতক্ষণ যে চোখ দুটো ময়লা ঘাঁটার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ছিল, সেই চোখের দীপ্তি হঠাৎ যেন ঝাপসা হয়ে গেল। বোকার মতো পাল্টা প্রশ্ন

করলেন : তার মানে?

ভানুদা একটু বাঁকা ধরনের হাসি হাসতে হাসতে বললেন আপনে তো শুনেছি পণ্ডিত মানুষ, ঘোর ইন্টেলেকচুয়াল। তবে আমার এই সোজা কথাটার মানে বুঝতে পারলেন না ক্যান্। আমি জিগাইতাছি আপনের পিতৃদেবের নাম কী? তিনি থাকেন কোথায়?

ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা খাওয়ার মতো চোখ করে ভানুদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুঝতে পারছেন একটা আক্রমণ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে ভানুদার তরফ থেকে। কিন্তু সেটা কী ধরনের তা আন্দাজ করতে পারছেন না। কিছুটা শুষ্ক কণ্ঠে বললেন : আমার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? তিনি তো বেশ কয়েক বছর আগেই দেহ রেখেছেন।

ভানুদা বললেন : তবে তো বাঁইচা গেছেন। তিনি জীবিত থাকলে তাঁরেই জিগাইতাম, আপনি এই বচ্ছর কত বিঘা জমিতে ধানের চাষ দিছেন।

ভদ্রলোক এবারে খানিকটা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন : আপনার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কী বলতে চাইছেন খোলাখুলি বলুন না।

ভানুদা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন : আপনের বাপেরে জিগাইতাম যে অসিত গুপ্ত আর মহাশ্বেতা ভটচাজ আপনের পাকা ধানে কী মই দিছে যে আপনের ইন্টেলেকচুয়াল পুত্তুর তাদের লগে প্যাচাল পাড়তাছে। জন্মের সময় এমন পোলার গলায় নুন দিয়ে মাইরা ফ্যালেন নাই ক্যান্?

ভদ্রলোক এবারে উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন : কী আজেবাজে বকছেন ভানুবাবু—

ভদ্রলোকের কথা শেষ হতে না হতেই উত্তেজিত অবস্থায় ভানুদা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : আমি আজেবাজে বক্তাছি। আর আপনে এতক্ষণ চণ্ডীপাঠ করতাছিলেন, তাই না? হালা অসিত আর মহাশ্বেতা বিয়া করছে তাতে তর কী রে! অরা ভদ্রভাবে বিয়া করছে সেটা তর ভালো লাগতাছে না। ছুঁচা কোথাকার! তর মতো কফি হাউসে বইসা বইসা ইউনিভার্সিটির মাইয়াগোর দিকে চোখ তো মারে নাই রে বেল্লিক। তর নামে আমি অনেক কম্‌প্লেন শুনছি। যা, বারাইয়া যা এইহান থাইক্যা। ফের যদি কোনদিন তরে স্টার থিয়েটারের দরজায় মাথা গলাইতে দেখি তো জুতাইয়া মুখটা ছিঁইড়া দিমু। হালা নর্দমার কীট! দাড়ি রাইখ্যা ইন্টেলেকচুয়াল সাজনের শখ হইছে। এক বিরাশি শিক্কার থাপ্পড়ে দাড়ি সমেত মুণ্ডুটা ঘুরাইয়া দিমু উল্লুক কোথাকার!

ভানুদার সেই অগ্নিমূর্তি দেখে ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে সেখান থেকে দ্রুত সরে পড়লেন। এমন ভাবে পালালেন যেন মনে হল একটা লাথি খাওয়া কুকুর দৌড়ে পালাচ্ছে।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমি ভানুদাকে বললাম : এটা বোধহয় ঠিক হল না ভানুদা।

ভানুদার তখনও রাগের কাঁপুনিটা কমেনি। গলার স্বরেই সেটা ধরা পড়ল। ভানুদা বললেন . কী ঠিক হল না?

আমি বললাম : এই যে ভদ্রলোককে এইভাবে যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিলে, এটা বোধহয় করা উচিত হল না।

ভানুদা অবাক হলেন আমার কথা শুনে। বললেন : এটা যে বেঠিক হল সেটা তোমার মনে হল কেন? কুকুরের যা প্রাপ্য আমি তাকে সেটা দিয়েছি। তুমি কি ওই লোকটাকে মানুষ মনে করো নাকি!

আমি বললাম : না। সেটা ঠিকই আছে। তবে ভদ্রলোক তো এরপর পাঁচ জায়গায় তোমার নামে নিন্দেমন্দ করে বেড়াবেন। তোমার একটা ইমেজ আছে মার্কেটে। সেটা কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না খানিকটা?

ভানুদা বললেন : কচু হবে। ওরকম ফুকো ইমেজের মুখে আমি লাথি মারি। আর ওইসব বাজে লোক আমার নামে কী বলল না বলল সেটাও আমি কেয়ার করি না। ওদের কথায় আর ওদের মুখে দুটোতেই আমি হিসি করে দিই।

বলতে বলতে ভানুদা উইংসের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওঁর সিনের সময় হয়ে গিয়েছিল তখন।

আমি মনে মনে ভাবলাম, ভানুদা নিশ্চয় আজ সিনটা ডোবাবেন। ওঁর তো কমেডি রোল্। আজ যে পরিমাণ রেগে আছেন তাতে কি আর কমেডি করতে পারবেন। ওইরকম উত্তপ্ত মন নিয়ে কিছুতেই কমেডি অভিনয় সম্ভবপর নয়। ভানুদা যদি সিনটাকে ডোবান তাহলে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হবে

আমার। আমাকে দেখতে পেয়েই তো ভদ্রলোক অসিত-মহাশ্বেতার নামে কুৎসা করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। আমি না থাকলে তো আর এইরকম একটা সিচুয়েশন ঘটত না। ভানুদাকেও রেগে যেতে হত না। কী কুক্ষণেই না আজ স্টার থিয়েটারে এসেছিলাম।

ভানুদা আজ কী করেন সেটা দেখবার জন্যে আস্তে আস্তে উইংসের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম ঠিক অন্য দিনের মতোই ভানুদা হাসির উড়নতুবড়ি ছাড়ছেন একের পর এক। বরং অন্য দিনের তুলনায় ভানুদার কমেডির তেজ আজ অনেক বেশি। দর্শকরা হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছেন ভানুদার পার্ট দেখতে দেখতে।

আশ্চর্য। এটাও কী সম্ভব! যে মানুষ একবুক রাগ নিয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে স্টেজে ঢুকলেন, তিনি এমন করে মানুষকে হাসাতে পারেন কী ভাবে? উনি কি মানুষ না ঈশ্বর?

পরে ভেবে দেখলাম, এটাও ভানুদার একটা প্রসেস। মাথার রাগ কীভাবে.পায়ের নিচে নামাতে হয় সেটাই ভানুদা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আমায়। সেই মুহূর্তে মনে হল ভানুদার মতো গ্রেট অ্যাকটর বোধহয় আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। অনেক অভিনেতাকে আমি চূড়ান্ত মাতাল অবস্থায় স্টেজে ঢুকেও ঠিক ঠিক অভিনয় করতে দেখেছি। তাঁরাও নিশ্চয় গ্রেট অ্যাকটর। কিন্তু ভানুদা বোধহয় তাঁদের সবাইকেও ছাপিয়ে গেছেন। এমন সজ্ঞান, এমন ক্যালকুলেটিভ ওয়েতে নিজেকে স্থিতধী করে তুলতে আমি তো আর কাউকেই দেখিনি কোনদিন।

ভানুদা যে কত বড় অ্যাকটর তা আমি ওঁর 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে' ছবির কাজ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম। ভানুদা নিজেই ছিলেন ওই ছবির প্রোডিউসার। একজন কমেডি অ্যাকটর যখন ছবি প্রযোজনা করেন তখন ধরেই নেওয়া যায় তিনি কমেডি সাবজেক্টের কথাই ভাববেন। কিন্তু ভানুদা করলেন একেবারে উল্টোটা। একটা সিরিয়াস সাবজেক্ট বেছে নিলেন তাঁর ছবির জন্যে। এতেই বোঝা যায় তাঁর মানসিক গঠন ঠিক কী ছিল। অ্যাকটিং করতেন কমেডি। কিন্তু মানুষটি ছিলেন সিরিয়াস। আদ্যন্ত সিরিয়াস। কাজ এবং ভাবনা উভয় ক্ষেত্রেই।

ভানুদার চরিত্রের মধ্যে এই যে সিরিয়াসনেস এটা তাঁর কিছুটা জন্মসূত্রে। ভানুদার বাবা ছিলেন একজন সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ। তাঁর নাম জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভদ্রলোক প্রথম জীবনে ঢাকার নবাব এস্টেটের সদর মোক্তার ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি পেশার পরিবর্তন ঘটিয়ে হয়ে গেলেন মানুষ গড়ার কারিগর। অর্থাৎ অনেক কম অর্থের বিনিময়ে শিক্ষকতার জীবন বেছে নিলেন তিনি। জিতেনবাবু ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। আমাদের বাংলার মঞ্চজগতের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শিশিরকুমার ভাদুড়ি এবং অহীন্দ্র চৌধুরি দু'জনেই এককালে ছিলেন ভানুদার বাবার ছাত্র। অহীনবাবু তো কথায় কথায় ভানুদার উল্লেখ করতে গিয়ে বলতেন : ভানু মানে আমাদের মাস্টারমশাইয়ের ছেলে তো!

ভানুদার জন্মের পর জিতেনবাবু ভানুদার নামকরণ করেছিলেন 'সাম্যময়'। ভানুদার পোশাকি নাম সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বিশের দশকে এই নাম যে মানুষ রাখতে পারেন তাঁর মানসিক গঠনের কথা একবার ভাবুন। কী ধরনের সিরিয়াস চরিত্র তাঁর।

ওই সাম্যময়ের ডাকনাম ছিল ভানু। এবং এই ডাকনামেই হল তাঁর দেশজোড়া নামডাক। কিন্তু সাম্যময় থেকে 'ভানু' হয়ে ওঠা তো এত সহজে ঘটেনি। তার পিছনেও আছে অনেক উত্থান পতনের কাহিনী। সেই কথাতেই এবার আসছি।

ভানুদা তাঁর চারিত্রিক সততা এবং দৃঢ়তা যে শিক্ষক পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। ভানুদা কথায় কথায় প্রায়ই বলতেন : আমার জীবনের আদর্শ পুরুষ হলেন আমার বাবা। সেই ছোটবেলা থেকে আমি সব ব্যাপারেই আমার বাবাকে ফলো করতাম।

কিন্তু ভানুদা তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা পেয়েছিলেন সম্ভবত তাঁর মাতুল বংশ থেকে। ভানুদার মা সুনীতি দেবীর বাবা ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিখ্যাত দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় আর যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই। সরোজিনী নাইডুর ভাই হলেন বিখ্যাত অভিনেতা হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মাতুল বংশের সুবাদে হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

সঙ্গে ভানুদার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। হরীন্দ্রনাথ কেবল অভিনেতাই নন, তিনি একজন বিশিষ্ট কবি। বেশ কয়েক বছর তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টের মেম্বাব ছিলেন। তাঁর গানের গলাও ছিল চমৎকার। তাঁর কণ্ঠে সেই বিখ্যাত 'সুরিয়া অস্ত হো গায়া/গগন মস্ত হো গ্যয়া' গানটি শোনবাব সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বম্বের জুহু বিচে বসে ওই গানটি তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন। ওঁর সঙ্গে ওই জুহু বিচেই আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।

হরীনদার সঙ্গে আরব সাগরের তীরে বসে সেদিনের সেই আলাপচারিতা আমার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। জুহু বিচে সেদিন সকালে আমি একাই বসেছিলাম। আমাকে ওইভাবে একা একা বসে থাকতে দেখে হৃষীদাই আমার কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। উনি বিচে এসেছিলেন পরের দিনের শুটিং স্পটটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে। সেই কাজটা সেরে ফেরবার সময় আমার সঙ্গে দেখা।

হৃষীদা সেদিন আমাকে ওঁব 'আনন্দ' ছবির গল্পটা পুরো শুনিয়েছিলেন। ওই ছবিটা ওঁর বাংলায় করবার ইচ্ছে ছিল রাজ কাপুর এবং উত্তমকুমাবকে নিয়ে। ওঁর সেই ইচ্ছেটা পূর্ণ হয়নি। পরে উনি ছবিটা হিন্দিতে করেছিলেন রাজেশ খান্না আর অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে। অমিতাভ তখনও সুপারস্টার হননি। তবে ওঁর অভিনয় প্রতিভার সন্ধান হৃষীদা রাখতেন। যে কারণে ওঁর অনেক ছবিতেই অমিতাভ অভিনয় করেছেন। প্রচুর খ্যাতিও পেয়েছেন সেই সব চরিত্র করে। যে কারণে আজও অমিতাভ হৃষীকেশ মুখার্জিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন।

তা সেদিন 'আনন্দ'র গল্পটা শেষ করে হৃষীদা যখন উঠি-উঠি করছেন, সেই সময়ে দেখতে পেলেন হরীনদা নিজের মনে জুহু বিচে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হৃষীদা হরীনদাকে ডেকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর নিজের কাজে চলে গেলেন।

হরীনদা একজন গপ্পোবাজ মানুষ। আর অত্যন্ত অমায়িক। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাকে এমন আপন করে নিলেন যেন আমি তাঁর কত দিনের পরিচিত। হরীন চট্টোপাধ্যায় তার আগে থেকেই আমার কাছে একজন বিস্ময়কর মানুষ। সংসদে তিনি প্রশ্ন করতেন কবিতার ছন্দে। কথায় কথায় গান গেয়ে ওঠেন। 'সুরিয়া অস্ত হো গ্যয়া' গানটি তিনি সংসদে দাঁড়িয়েও গেয়েছিলেন।

আমাব মাথায় সেদিন যে কী ভূত ভর করেছিল কে জানে। ওই অল্প আলাপেই আমি হরীনদার কাছে বায়না ধরে বসলাম গানটি শোনানোর জন্যে। আর হরীনদাও কী অদ্ভুত মনুষ, আমার ওই আবদার সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলেন। ওই জুহু বিচে বসেই উদাত্ত কণ্ঠে গানখানা শোনাতে লাগলেন। প্রচুর ভিড় জমে গিয়েছিল হরীনদার সেই গান শোনবার জন্যে।

এই দেখুন, কথায় কথায় কোথায় চলে এসেছি। হচ্ছিল ভানুদাব কথা, তার মধ্যে এসে গেলেন হৃষীদা, হরীনদা, অমিতাভ বচ্চন। এইরকমই হয়। আমার তো এটা স্মৃতির সরণিতে বিচরণ। কাজেই একজনের কথা বলতে গিয়ে অন্য অনেক ম'নুষের কথা আসাই তো স্বাভাবিক।

শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু বেশ কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন। তিনি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কন্যা। তিনি যখন রাজ্যপাল হয়ে এলেন তখন আমি একদিন ভানুদাকে বলেছিলাম : ভানুদা, আমাদের নতুন রাজ্যপাল তো তোমার আত্মীয়। তা চলো না একদিন ওঁর অতিথি হয়ে রাজভবনে রাত্রিবাস করে আসি। রাজভবনে কয়েকবার গেছি বটে, কিন্তু কোনওদিন লাটসাহেবের বাড়িতে রাত কাটানোর সুযোগ হয়নি।

ভানুদার সঙ্গে তখন আমার হৃদ্যতা এতটাই বেড়ে গেছে যে সম্বোধনটা আপনি ছেড়ে তুমিতে এসে পৌঁছে গেছে। তা ভানুদা আমার কথা শুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন : যে বাঙালি মায়ের মেয়ে বাংলা ভাষা জানে না, তার বাড়িতে আমি রাত্রিবাস করি না।

কথাটা সত্যি। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু রীতিমতো বিদুষী হলেও বাংলা ভাষাটা একদম জানতেন না। রবীন্দ্রনাথ পড়তেন ইংরিজি অনুবাদে। সেটা ওঁর দোষ নয়। সারাজীবন তো প্রবাসেই মানুষ। সে হিসেবে দক্ষিণ ভারতই ওঁর মাতৃভূমি। তবে ইংরিজি বলতেন একেবারে সাহেবের মতো। আর কী কাব্যিক ওঁর উচ্চারণের ভঙ্গি। অতি সাধারণ কথাবার্তাও ওঁর মুখে কবিতার মতো শোনাত।

কিন্তু ভানুদার কাছে এসব কোয়ালিফিকেশনের কোন মূল্যই নেই। বাংলা ভাষা জানেন না, ভানুদার

কাছে এটাই একটা বড় অপরাধ। এতটাই প্রবল ছিল ভানুদার বঙ্গপ্রেম বা বাঙালি-প্রীতি।

বোধহয় এই কারণেই ভানুদা হিন্দি ছবিতে ভালো ভালো অফার পেয়েও বম্বে যেতে চাননি। সেটা নিয়ে ভানুদার কাছে প্রশংসা করলে ভানুদা বলতেন : ওটা একদম বাজে কথা। এখানে আমার হাতে প্রচুর ছবির কাজ। সেই তৈরি মার্কেট ছেড়ে কেউ অন্য জায়গায় যেতে চায়। তারপর একদিন বম্বে থেকে তাড়া খেয়ে ফিরে আসবার পর দেখা যাবে আমার এ-কূলও গেছে আর ও-কূলও গেছে। আমাকে কী অতটা বোকা পেয়েছ নাকি!

আমি বললাম : তা কেন ভানুদা! তোমার যে অভিনয়ের ক্ষমতা তাতে হিন্দি ছবিতে তুমি নাম করবেই। পয়সার কথা না হয় বাদই দিলাম, সারা ভারতজোড়া তোমার কত খ্যাতি হবে বলো দিকি!

ভানুদা হাসতে হাসতে বলতেন : আমি হলাম গিয়ে গঙ্গা-পদ্মার জল খাওয়া মানুষ। আরব সাগরের লোনা জল আমার যে সহ্য হবেই, সে গ্যারান্টি কে দেবে? তুমি?

এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না। তাই চুপ করেই রইলাম।

একটু পরে ভানুদা হাসতে হাসতে বললেন : তবে আমার এই হিন্দি ছবিতে অভিনয় না করতে যাওয়া নিয়ে একটা মোক্ষম পাবলিসিটি আমি পেয়ে যেতে পারি। তোমাকে একবার বললেই তো তোমাদের কাগজে লিখে দেবে, ভানু বাঁড়ুজ্যে বাঙলা ছবির প্রেমে এতই ডগমগ যে হিন্দি ছবির লোভনীয় অফারও প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু সেটা আমি চাই না। ওই ধরনের চিপ পাবলিসিটির আমি ঘোরতর বিরোধী। তুমি বরং লিখে দিও, ভানু বাঁড়ুজ্যে। ভয়ানক ঘরকুনো মানুষ। নিজের সাজানো বাগান ছেড়ে এক পাও বাইরে যেতে চায় না।

এই হলেন ভানুদা। সবরকম হিপোক্রেসির ঊর্ধ্বে একজন খাঁটি মানুষ।

এবারে ভানুদার রাজনৈতিক জীবনের কথা একটুখানি বলি। ওঁর মাতামহ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক নেতা। বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন। তৎকালীন ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে সংঘাতে গিয়েছিলেন। এইসব ঘটনা শৈশবকাল থেকেই ভানুদার মনটাকে আকৃষ্ট করেছিল। ম্যাট্রিক পাস করার পর পরই তিনি রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪০ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ছেন তখন তিনি একজন রীতিমত ছাত্রনেতা। বামপন্থী ভাবধারায় আচ্ছন্ন। এই রাজনৈতিক কারণেই ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র থাকাকালীন ১৯৪১ সালে তাঁকে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসতে হয়। কলকাতায় এসে ওঠেন টালিগঞ্জের চারু অ্যাভিনিউতে তাঁর মেজ বোনের বাড়িতে।

১৯৪২ সালে শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এই আন্দোলনে বামপন্থীরা স্পষ্টতই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই ঘটনাটা ভানুদাকে বিচলিত করে তোলে। সক্রিয় রাজনীতি থেকে তিনি আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিতে থাকেন। এই সময় তিনি একটা চাকরিও পেয়ে গেলেন ভারত সরকারের আয়রন অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোল বিভাগে।

১৯৪৫ সালে ভানুদা বিয়ে করেন বেতারশিল্পী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। চমৎকার গান গাইতেন নীলিমাদি। চল্লিশের দশকের শেষ এবং পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় নীলিমাদির প্রচুর লোকগীতি আমি শুনেছি কলকাতার বিভিন্ন জলসায়। ওঁর গানের গলা যত মিষ্টি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি ছিল নীলিমাদির ব্যবহার। অনেক শিল্পীর একটা লোকদেখানো দাম্ভিকতা আমি দেখেছি। দেখেছি নিজেকে প্রোজেক্ট করার একটা অফুরন্ত প্রয়াস। নীলিমাদির মধ্যে সেই দোষগুলির ছিটেফোঁটাও ছিল না।

নীলিমাদির কথা উঠলে ভানুদাকে দেখেছি মুক্তকচ্ছ হয়ে পড়তে। বউয়ের কথায় তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ। মাঝে মাঝে ভানুদাকে খুব স্ত্রৈন মনে হত। এই যে ভানুদার চরিত্রবিরোধী একটা ব্যাপার, এটা কেমন করে ঘটত বুঝতে পারতাম না। পরে বুঝেছি এমন একটা অঘটন সম্ভব হয়েছিল নীলিমাদির চারিত্রিক সুন্দরতার কারণেই। নীলিমাদির ভালোবাসায় ভানুদা পরিপূর্ণ ছিলেন।

ভানুদাকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম : আচ্ছা ভানুদা, স্টেজ-অ্যাকটিং আর ফিল্ম অ্যাকটিং এই দুটোর মধ্যে কোন্‌টা তোমার বেশি পছন্দ?

প্রশ্নটা শুনে ভানুদা একটু থমকে গিয়েছিলেন। বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়েছিলেন উত্তর দিতে। বোধহয় স্টেজ আর ফিল্মের বেশ কিছু চরিত্র তাঁর মনের পর্দায় ঘোরাফেরা করছিল। অনেকক্ষণ পরে

উত্তর দিয়েছিলেন : আমার মুখ থেকে তুমি তোমার মনের কথা শুনতে চাও, না সত্যি সত্যি আমার মতামতটা জানতে চাও?

আমি বললাম : এ আবার কী রকম কথা। আমি তো তোমার মতামতটাই জানতে চাইছি।

ভানুদা বললেন : সেটা যদি তোমার মনঃপুত না হয় তাহলে তর্ক করবে না তো?

আমি বললাম : একদম না। আমি কেন তর্ক করতে যাব তা নিয়ে।

ভানুদা বললেন : তাহলে শোন। স্টেজ-অ্যাকটিং আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। নাটককে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। কিন্তু দুঃখের কথা কী জানো!

আমি বললাম : কী?

ভানুদা বললেন, : আজ পর্যন্ত আমি কোনও নাটকে মনের মতো একটা চরিত্র পাইনি!

আমি বললাম · সে কী! এত নাটকে অভিনয় করেছ। দর্শকরা কত খুশি তোমাব অভিনয় দেখে। তোমাকে নায়ক করে নাটক পর্যন্ত হয়েছে। আর তুমি বলছ কি না মনের মতো একটাও চরিত্র পাওনি!

ভানুদা বললেন : ঠিক তাই। সব নাটকেই তো আমাকে অর্ডার সাপ্লায়ারের কাজ করতে হয়েছে। দর্শক আমাকে যে চরিত্রে পছন্দ করবে সেই চরিত্রই আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমাকেও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়েছে দর্শকের ঠোঁট চিরে দাঁত বার করিয়ে। কিন্তু কেউ কি কোনওদিন আমার কাছে জানতে চেয়েছে আমার পছন্দ-অপছন্দের কথা?

আমি বললাম : কী ধরনের চরিত্র তোমার পছন্দ ভানুদা?

ভানুদা বললেন : আমি চাই ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করতে। কেউ কি আমাকে দেবে তেমন একটা চরিত্র তাদের নাটকে?

ভানুদার কথা শুনে কেঁপে উঠলাম। না, কোনও স্টেজের মালিকই ভানুদাকে ভিলেন চরিত্র দেবে না। তাই ভানুদার এই মানসিক যন্ত্রণা খুবই স্বাভাবিক।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভানুদা বললেন : অথচ তুমি দেখ, আমাদের উত্তর সারথির 'নতুন ইহুদি' নাটকে আমি তো সিরিয়াস চরিত্রেই অভিনয় করেছি। সেই অভিনয়ে আমি প্রশংসাও পেয়েছিলাম। কিন্তু সে কথা কেউ মনে রাখে না। তাদের কাছে ভানু বাঁড়ুজ্যে তো আর একজন অভিনেতা নয়, একটা সেলেবল্ কমোডিটি। এককালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড় ছিল। আর তোমাদের সভায় আমি হলাম গিয়ে ভানু ভাঁড়। ব্যঞ্জনবর্ণের একটা অক্ষরের অদলবদল মাত্র। জন্মসূত্রে ছিলাম বাঁড়ুজ্যে, কর্মসূত্রে হয়েছি ভাঁড়ুজ্যে।

কথাগুলো বলতে বলতে ভানুদার চোখ দুটো অভিমানে ছলছলে হয়ে এল। আমি ওঁর মুখেব দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

ভানুদার অভিনয় জীবনের শুরু যখন তিনি ক্লাস সিক্সের ছাত্র, তখন থেকে। ঢাকার ওয়াড়ি ক্লাবে 'বনবীর' নাটকে উদয় সিংহের শিশু চরিত্রে অভিনয় করেন। তারপর ঢাকায় এবং কলকাতায় বহু অ্যামেচার নাটকে অভিনয় করেছেন। প্রায় সর্বত্রই সিরিয়াস চরিত্র। তার মধ্যে বিখ্যাত 'নতুন ইহুদি' নাটকের কথা তো সকলের জানা। আর চারু অ্যাভিনিউতে পাড়ার ক্লাবে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য চরিত্রে অভিনয়ের কথা তো আগেই বলেছি।

আমার কিন্তু ভানুদার ফিল্ম অ্যাকটিং অনেক বেশি ভাল লাগে স্টেজ-অ্যাকটিংয়ের চেয়ে। কী অসাধারণ সব চরিত্রে করেছেন ভানুদা। 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে ওঁর সেই বিখ্যাত ডায়লগ 'মাসিমা মালপোয়া খামু' তো এখনও কানের মধ্যে ভাসছে।

১৯৩৯ সালে নিউ থিয়েটার্সের একটি ছবি দেখেছিলাম। ছবিটির নাম 'মন্ত্রমুগ্ধ'। বনফুলের কাহিনী। পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত বিমল রায়। ওই ছবিতে এক-দেড় মিনিটের একটি চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয় দেখেছিলাম। সেই ছবিতে একটা দৃশ্যে ছিল ঋানু মল্লিক তাদের ক্লাবের নাটকের জন্যে শিল্পী নির্বাচন করছেন। ব্ল্যাংক ভার্সে একটি ডায়লগ সবাইকে বলার সুযোগ দিচ্ছেন। হঠাৎ একটি রোগাপটকা লোকের দিকে তাকিয়ে ঋানু মল্লিক বললেন : কী হে ভানু, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি? ভানু নামের সেই চরিত্রটি খ্যানখেনে গলায় বললেন : দেখি চেষ্টা

করে। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে বলতে লাগলেন : 'রাজনন্দিনী, মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে। জানো নাকি তাতার শিশু...'। এই পর্যন্ত বলেই ভানু দু' ঠোঁট ভিজিয়ে হৃদপিণ্ড থেকে বাতাস সংগ্রহ করে এনে ডায়লগ শেষ করলেন : 'মাতৃক্রোড় হতে ছুটে যায় সিংহ সনে করিবারে মল্লরণ।' তারপরই ধপ করে বসে পড়লেন। কী অসাধারণ, আর কী অপূর্ব সে অভিনয়।

দুঃখের বিষয় 'মন্ত্রমুগ্ধ' ছবিতে ভানুদার ওই অসাধারণ অভিনয়ের উল্লেখ কেউ করেন না। নানা জায়গায় তাঁর অভিনীত ছবির তালিকা প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে 'মন্ত্রমুগ্ধ'র উল্লেখ দেখতে পাই না। অন্তত আমার তো চোখে পড়েনি। বোধহয় এক-দেড় মিনিটের একটি অকিঞ্চিৎকর চরিত্র বলেই অনেকের নজর এড়িয়ে গেছে। কিন্তু ভানুদার সেই অসাধারণ অভিনয় আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও আমি ভুলতে পারিনি। ভানুদার সেই অভিনয় ছিল পুরোপুরি ফিল্ম অ্যাকটিং।

এবারে ভানুদার দ্বারা আমার সেই অশ্রুস্নাত হবার ঘটনাটা বলে নিয়ে আপাতত ভানুদাকে নিয়ে আমার এই স্মৃতিচারণার পর্ব শেষ করব। ভানুদার সঙ্গে আমার দীর্ঘ পরিচয়ের সূত্রে বহু ঘটনাই অকথিত থেকে যাবে। আবার কখনও সুযোগ পেলে সেসব স্মৃতি রোমন্থন করা যাবে। এখন এই ঘটনাটি বলেই নিবন্ধের ইতি টানতে চাইছি।

পঞ্চাশ-ষাটের দশক জুড়ে একটা সময়ে আমি অনেকগুলি অনুষ্ঠান অর্গানাইজ করেছি। কখনও গানের শিল্পীদের নিয়ে। কখনও বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে। কখনও কখনও কলকাতায়, তবে বেশির ভাগ সময়েই আমার দেশ তমলুকে।

সেবার আমি একটা নাট্যানুষ্ঠান করিয়েছিলাম তমলুকে। শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ'। তাতে যেসব শিল্পী ছিলেন তার বেশির ভাগই স্টার থিয়েটারের। যেমন সুলালদা, অর্থাৎ জহর গাঙ্গুলি, বিখ্যাত অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ির পুত্র সুদর্শন নট নবকুমার, দীপিকা দাস, যিনি পরে গ্রুপ থিয়েটারেব বিশিষ্ট প্রযোজক ও পরিচালক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিয়ে করেছিলেন। আর ছিলেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায় এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোটখাট রোলে আরও অনেকই ছিলেন যাঁরা সবাই পেশাদার শিল্পী।

যেহেতু অধিকাংশ শিল্পী স্টার থিয়েটারের, তাই আমি হয়াদা অর্থাৎ অভিনেতা শ্যাম লাহাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম ওঁদের একত্র করে নিয়ে যাবার জন্যে। আমি তমলুকেই ছিলাম ওদিকটা সামলাতে।

যথাদিনে যথাসময়ে অভিনয় হল। নাটকটা খুবই জমে গিয়েছিল। আমার যেসব স্নেহভাজন এই নাটকের পেছনে টাকা লগ্নি করেছিলেন, তাঁরা টাকা ফেরত পাওয়া ছাড়াও কিছু লাভের মুখ দেখেছিলেন।

অভিনয় শেষ হতে হতে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। তারপর খাওয়া দাওয়ার পালা। শিল্পীদের তাড়াতাড়ি শুতে পাঠানো দরকার। কারণ পরের দিন খুব ভোরেই ট্রেন ধরতে হবে। কিন্তু সকলের খাওয়া দাওয়া হবার পরও দেখা গেল সুলালদা তখনও খাননি। তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত সুলালদাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কোথায় কীভাবে পাওয়া গিয়েছিল সে ঘটনা আমি সুলালদার স্মৃতিচারণ করবার সময় বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছি। এখানে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

সুলালদাকে খাইয়ে-দাইয়ে শুতে পাঠিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যখন হাঁফ ছাড়বার জন্যে শিল্পীনিবাসের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন হাতের ঘড়িতে দেখলাম রাত একটা বেজে গেছে। হঠাৎ ওই সময়ে আমার সামনে যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভানুদাকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। বললাম : এ কী ভানুদা। তুমি এখনও শুতে যাওনি?

ভানুদা বললেন : না। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

আমি মনে মনে প্রমাদ গণলাম। নিশ্চয় আতিথেয়তায় কোনও ত্রুটি ঘটেছে। শিল্পীদের যা স্বভাব। পান থেকে চুনটি খসলেই তাঁদের মুখ ভার হয়ে যায়। আমি একটু আমতা আমতা করে বললাম : কেন ভানুদা, খাওয়া-দাওয়ায় কোনও ত্রুটি হয়েছে?

ভানুদা বললেন : একদম না। চমৎকার খাওয়া হয়েছে। শোবার ব্যবস্থাটিও চমৎকার। যাকে বলে দুগ্ধফেননিভ শয্যা।

আমি বললাম : তাহলে?

ভানুদা বললেন : তোমার কানটি কষে মলে দেব বলে শুতে না গিয়ে অপেক্ষা করছি।

আমি ভানুদার দিকে কানটি এগিয়ে দিয়ে বললাম : দিন না মলে। কিন্তু তার আগে বলবেন তো আমার অপরাধটা কী?

ভানুদা বললেন : অপরাধ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

আমি বললাম : তার মানে?

ভানুদা বললেন : আমরা অভিনয় করে সকলেই টাকা পেয়েছি। আজকের শো ছিল হাউসফুল। তাতেই মনে হচ্ছে যারা ফিনান্স করেছিল তারা আসল টাকা ফেরত পাবার সঙ্গে কিছু লাভও পেয়েছে। কিন্তু তুমি যে এই মাসখানেক ধরে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে খাটলে, তোমার পকেটে কটা টাকা ঢুকেছে?

আমি এক হাত জিভ কেটে বললাম : ছি ছি! এটা কী বলছেন ভানুদা! পাড়ার ছেলেরা সবাই ধরেছে, আমি তাদের জন্যে গায়ে-গতরে খানিকটা খেটে দিয়েছি। তার জন্যে কখনও টাকা নেওয়া উচিত?

ভানুদা বললেন : এই রোগেই তো ঘোড়া মরে। শোনো রবিকুমার, আমি তোমাকে জীবনের সার কথা বলি। তুমি যদি যে কোন ব্যাপারে প্রফেশ্যনাল না হও তাহলে জীবনে কোনওদিন উন্নতি করতে পারবে না।

এরপরে ভানুদা যে কাণ্ডটা করলেন তাতে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। উনি নিজের পকেট থেকে একখানা খাম বার করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন : এটা রাখো।

খামটা হাতে পেয়ে আমি হকচকিয়ে গেলাম। বললাম : এটা কী?

ভানুদা বললেন : এতে সাড়ে তিনশো টাকা আছে। তোমার এখানে শো করে আমি চারশো টাকা পেমেন্ট পেয়েছি। তার মধ্যে পঞ্চাশটা টাকা আমি ট্যাক্সিভাড়ার দরুন রাখছি। বাকি সাড়ে তিনশো টাকা এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে বউমার হাতে দিয়ে দেবে। এ নিয়ে আর একটা কথাও বলবে না। বললে আর কোনওদিন তোমার মুখদর্শন পর্যন্ত করব না।

না, আমি একটি কথাও বলিনি। কেবল দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়েছিল। সেই সঙ্গে কিছু ফোঁপানির আওয়াজ। এত ভালোবাসেন আমাকে ভানুদা!

আমার ওই অশ্রুজল আর ফোঁপানোর প্রত্যুত্তরে ভানুদাও একটা কথা বলেননি। কেবল দু' হাত দিয়ে আমাকে বুক টেনে নিয়েছিলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে আমার দুটো চোখ মুছিয়ে দিয়েছিলেন।

এমন একটি মানুষকে কি কোনওদিন ভোলা যায়? তাঁর প্রয়াণের এত বছর পরও ভানুদার কথা ভাবলে আজও আমার চোখ দুটো সেদিনকার মতোই জলে ভরে আসে। কিন্তু আজ আর বুকে টেনে নিয়ে সেই অশ্রুজল মুছিয়ে দেবার মতো কেউ নেই আমার পাশে।

জীবেনদা

অভিনেতা জীবেন বসু যে পাড়ায় বাস করতেন, এখন আমি সেই পাড়ার বাসিন্দা। আর আমি যখন এই পাড়ায় বসবাস শুরু করেছি তখন জীবেনদার জীবনেব শেষ পর্যায়। তখন তিনি জীবনযুদ্ধে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত একটি মানুষ। তাঁর তখন প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত কাটছে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে। শরীর ভেঙে গেছে, মনটা তো তার অনেক আগেই ভেঙে গেছে। একটা সময়ে এই মানুষটির চোখের সামনে কত স্বপ্ন ছিল। একটা কিছু, একটা বড কিছু কববার জন্যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা ছিল। সেই মানুষটা শেষ জীবনে হয়ে গিয়েছিলেন জীবন্ত একটি ফসিল। বেঁচে থাকতে হয় তাই ছিলেন, তবে সেটা শাবীরিকভাবে। মানসিক মৃত্যু তার অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল।

অথচ এমনটা তো হবার কথা ছিল না। সারা জীবনে মাত্র দুটি কি তিনটি ছবিতে নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন জীবেন বসু। কিন্তু দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনশোরও বেশি ছবিতে কাজ করেছেন। বাকি সবগুলিতেই পার্শ্ব-চরিত্রে। কিন্তু পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনয় করেও যে নায়কদের সমান পপুলারিটি পাওয়া যায়, সেটা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন জীবেনদা। আমি তো এমন একটা ছবির নামও মনে কবতে পারি না, যেখানে জীবেনদা খারাপ অভিনয় করেছেন। ছবির কোনও দৃশ্যে জীবেন বসুর উপস্থিতি মানেই একটা স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে যাওয়া। কত বকম চরিত্র করেছেন, কখনও কমেডি কখনও বা ট্রাজেডি, কিন্তু সব চবিত্রেই জীবেনদাকে দেখে মনে হত এর চেয়ে ভাল বোধহয় আর হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, জীবেনদাব অভিনয় দেখে কখনও মনে হয়নি যে তিনি অভিনয় করেছেন। এত সাবলীল, এত স্বচ্ছন্দ তাঁর চবিত্রচিত্রণ। জীবেনদাকে যদি 'গ্রেট অ্যাকটর' বিশেষণে বিভূষিত করতে চাই তাহলে হযতো অনেক সমালোচকের ভুরু কুঁচকে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে আমি গ্রেট অ্যাকটরই বলব। যাঁর অভিনয় দেখে কোনদিন অভিনয় বলে মনে হয়নি, তাঁকে যদি গ্রেট অ্যাকটর বলা না যায় তাহলে আর কাকে বলা যাবে।

১৯৩১ সাল থেকে জীবেন বসু সিনেমায় অ্যাকটিং শুরু করেছেন। জীবেনদার প্রথম ছবিটি নির্বাক চলচ্চিত্র। নাম 'আঁখিজল'। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৩২ সালে। তার দু'বছর আগেই অবশ্য ছবি কথা বলতে শিখে গেছে। আগে যে মাধ্যমটির নাম ছিল 'বায়োস্কোপ', কথা বলতে শুরু করার পর সেই মাধ্যমটির নাম হয়ে গেছে 'টকি'। 'আঁখিজল' ছবিতে জীবেনদার ভাগ্যে জুটেছিল একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা। কিন্তু ওই সামান্য ভূমিকার কল্যাণে জীবেনদা সিনেমার দু'টি পর্বের মধ্যে যোগসূত্র করে নিতে পেরেছিলেন নিজেকে।

জীবেনদার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটিতেই আমি প্রশ্নটা তাঁর সামনে রেখেছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম : জীবেনদা, আপনার অভিনয় জীবনের শুরু কবে থেকে?

প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সদাহাস্যময় জীবেনদা যেন মুহূর্তের মধ্যে একজন বেশি বয়সের মানুষ হয়ে গেলেন। বেশ ভারিক্কি চালে উত্তর দিলেন : সে কি আজকের কথা রে ভাই। আমি অভিনয় শুরু করেছি সেই সাইলেন্ট যুগ থেকে।

জীবেনদার কথা শুনে মনে মনে বেশ মজা পেয়েছিলাম। কারণ তার আগেই তো আমার জানা হয়ে গিয়েছে যে উনি নির্বাক যুগের শেষ পর্বের একটি মাত্র ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু জীবেনদা তার পুরো অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নিয়েছিলেন। এমন একটা ভাব দেখাতেন যেন ওঁর অভিনয় জীবনের বয়সের গাছ-পাথর নেই।

জীবেনদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন গিরীনদা। গিরীনদা মানে গিরীন্দ্র সিংহ। উল্টোরথ মাসিক পত্রিকার কর্তাস্থানীয়দের একজন। গিরীনদার একটা ছদ্মনাম ছিল। শ্রীঅরূপ। উনি ওই ছদ্মনামেই লেখাজোখা করতেন। উল্টোরথ পত্রিকার মালিক ছিলেন প্রসাদ সিংহ। যেহেতু গিরীনদারও পদবি সিংহ

তাই অনেকে ভাবতেন গিরীনদা আর প্রসাদদা দুই ভাই। দুজনেই উল্টোরথের মালিক। আসলে তা নয়। ওঁরা দু'জন বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রসাদদা গিরীনদাকে সব ব্যাপারে এগিয়ে দিতেন নিজেকে নেপথ্যে রেখে। ফলে অনেকের মনেই এই ভুল ধারণাটা থেকে গিয়েছিল। ওঁরা দুজনেই এখন স্বর্গগত।

উল্টোরথে কাজ করতে করতেই, অথবা ঠিক অব্যবহিত আগে গিরীনদা ছবি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত থেকেছিলেন কিছুদিন। পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সহকারিত্ব করেছিলেন। 'আজ' প্রোডাকসন্সের 'যোগ বিয়োগ' ছবির উনি সহকারী ছিলেন। ওই সময় আরও একটি মজার ব্যাপার ঘটেছিল। 'যোগ বিয়োগ' ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভাই পিনাকী মুখোপাধ্যায়। আশাপূর্ণা দেবীর এই কাহিনীর চিত্ররূপ দর্শকদের খুবই ভালো লেগেছিল। এই ছবিতেই আজ প্রোডাকসন্সের ভিত্তিটা রীতিমত শক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই 'যোগ বিয়োগ' ছবিতে অর্ধেন্দুদা আর পিনাকীবাবুর আর একজন সহকারী ছিলেন। তাঁর নাম অনিল চট্টোপাধ্যায়। আজ্ঞে হ্যাঁ, আজকের বিশিষ্ট অভিনেতা, চৌরঙ্গি কেন্দ্রের সি পি এম-এর বিধায়ক আর সেদিনের সহকারী অনিল চট্টোপাধ্যায় একই ব্যক্তি। গিরীনদা যেমন সাংবাদিক থেকে ফিল্মের সহকারী পরিচালক হতে গিয়েছিলেন, অনিলবাবুও তেমনি সহকারী থেকে সাংবাদিক হয়েছিলেন কিছুকালের জন্য। উল্টোরথ সংস্থার আর একটি পত্রিকা 'সিনেমা জগৎ'-এ উনি সাংবাদিকতা করতেন। আমিও ওই সময়ে উল্টোরথ পত্রিকায়। আমি আর অনিলবাবু পাশাপাশি বসে বেশ কিছুদিন কাজ করেছি। আজ অনিলবাবু কোথায় আর আমি কোথায়। দুজনে দুই মেরুর বাসিন্দা। তবে আনন্দের কথা, অনিলবাবু আজও আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেন। অনেকের সামনে তারস্বরে সেটা ঘোষণাও করেন। এটা অনিলবাবুর মহত্ত্ব। এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

যাক, ওসব ব্যক্তিগত কথা থাক। আবার জীবেনদার কথাতেই ফিরে আসি। সেটা পঞ্চাশের দশকেব শেষের দিকের একটি বছর। আমি আর গিরীনদা আজ প্রোডাকসন্সের শুটিং কভার করতে গেছি। জীবেন বসু সেদিন সেটে ছিলেন। আমি গিরীনদাকে বললাম : গিরীনদা, আপনি জীবেন বসুর সঙ্গে আমাব একটু আলাপ করিয়ে দেবেন?

গিরীনদা বললেন : জীবেনদার সঙ্গে আলাপ করে কী করবি রে?

আমি বললাম : এমনিই। ভদ্রলোকের অভিনয় আমার খুব ভালো লাগে।

গিরীনদা বললেন : আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। দেখিস্ বেফাঁস কিছু বলে বসিস না যেন! জীবেনদা এই ছবির একজন প্রোডিউসার। রেগে-টেগে গেলে আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেবে।

আমি বললাম : না না, সেসব ভাববেন না। আমি এমনিই একটু আলাপ করব।

তা গিরীনদা আমাকে জীবেন বসুর কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন : জীবেনদা, এই ছেলেটির নাম রবি বসু। আমাদের পত্রিকায় কাজ করে। ও একটু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

জীবেন বসু বোধহয় তখন হ্যাপি মুডে ছিলেন। একগাল হেসে বললেন : তা ভালো কথা। হয়ে যাক আলাপ। তুমিও বসু আর আমিও বসু। দুজনেই গৌতম গোত্র। আলাপ হতে বাধা কোথায়। তবে একটা ব্যাপার কী জানো ভাই। সাংবাদিকদের দেখলেই আমার কেমন হাসি পেয়ে যায়। পেটের ভেতর হাসিটা কুলকুল করে ওঠে। কিছুতেই আর নিজেকে সামলাতে পারি না।

জীবেন বসুর কথা শুনে আমি আর গিরীনদা দুজনেই অবাক। গিরীনদা বললেন : সে কী কথা! সাংবাদিক দেখলেই তোমার হাসি পায়? এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার। তার কারণটা কী জীবেনদা?

জীবেনদা বললেন : ওটা একটা অদ্ভুত ইলিউশনের ব্যাপার। সাংবাদিক শুনলেই আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, একটা লোক উলঙ্গ হয়ে সর্বাঙ্গে খবরের কাগজ জড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সেই খবরের কাগজের অক্ষরগুলো টক্ টক্ করে ছুটে এসে আমার সর্বাঙ্গে তীরের মতো বিঁধছে।

আমি বললাম : সত্যিই এটা একটা অদ্ভুত ভাবনা। তা এরকম ভাবনা কেন হয় তার কোনও কারণ আপনি খুঁজে পেয়েছেন?

জীবেনদা রহস্যময় কণ্ঠে বললেন : একটা কারণ পেয়েছি। তবে সেটা তোমাদের মনঃপূত হবে কি না কে জানে!

গিরীনদা ঠোঁটের কোণে একটু খৈনি গুঁজে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কী সেই কারণ?

জীবেনদা বললেন : আসলে সাংবাদিকদের কলমের নিবটা খুব তীক্ষ্ণ হয়। কারও কাজে পান থেকে চুন খসলেই খবরের কাগজের পাতায় এমন একখানা খোঁচা দেয় যে যাকে খোঁচা দেওয়া হয় সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম জীবেনদা সাংবাদিকদেরই খোঁচা দেবার জন্যে এই রসিকতাটা আমদানি করেছেন। তাই আমিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম : বুঝতে পেরেছি জীবেনদা। আপনি সাংবাদিকের উদ্দেশ করে আমাকেই কথার খোঁচা দিতে চাইছেন। কিন্তু আমি তো এখনও ভালো করে কলম ধরতেই শিখিনি, তা খোঁচা দেব কোত্থেকে? বরং আশীর্বাদ করুন, যাতে আমি সাংবাদিক হিসেবে সত্যিই খোঁচা দিতে শিখি। আপনাদের ঠিক ঠিক খোঁচা দিতে পারা তো মহা পুণ্যের ব্যাপার।

কথাটা বলেই আমি একটু সিঁটিয়ে গেলাম। এটা আবার বেফাঁস কথা হয়ে গেল না তো! গিরীনদা পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। এর ফলে যদি আমাদের কাগজে আজ প্রোডাকসলের ছবির বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে প্রসাদদা আর গিরীনদা দুজনের কাছেই হেনস্থা হতে হবে। হয়তো চাকরিটাও চলে যেতে পারে!

কিন্তু আমার ওই কথা শুনে জীবেনদা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন : তুমি তো ভারি ধড়িবাজ ছেলে হে! আমাকে খোঁচা দেবার জন্যে আমার কাছ থেকেই আগেভাগে আশীর্বাদ চেয়ে রাখছ! এ তো পুরাণের সেই দেব-দানবের গল্পের মতো হয়ে গেল। সেই কোন্ দানব যেন তপস্যা করে শিবের কাছ থেকে বর পেয়ে সবার আগে শিবেরই মুণ্ডুচ্ছেদ করতে ছুটেছিল! আচ্ছা, যাদের পদবি বসু হয় তারা কি সবাই এইরকম ধড়িবাজ হয়?

জীবেনদার হাসি শুনে যতটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম, ধড়িবাজ শব্দটা শুনে ততটাই মুষড়ে পড়লাম। তাহলে তো জীবেনদা সত্যিই রাগ করেছেন। মুখটা আমার আবার পাংশু হয়ে উঠল। চাকরিটা বোধহয় বাঁচাতে পারলাম না। ওটা সত্যিই গেল বোধহয়।

আমার পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে জীবেনদার বোধহয় দয়া হল। সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন : না না, ঘাবড়াবার কিছু নেই মিস্টার বোস। বসুরা যে ধড়িবাজ হয় তার মধ্যে আমি নিজেকে অর্থাৎ জীবেন বসুকেও ইনক্লুড করেছি।

যাক্, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। রসময় জীবেন বসুর এটাও একটা রসিকতা। তা জীবেনদার এই কথা শুনে, আর হাসি দেখে আমার সাহসটা একটু বেড়ে গেল। বললাম : একটা কথা বলব জীবেনদা?

জীবেনদা বললেন : একটা কেন একশোটা কথা বলবে। তোমরা সাংবাদিকরা প্রশ্ন করবে আর আমরা তার উত্তর দেব—এটাই তো আমাদের বিধিলিপি। তা কী বলতে চাও বলো না?

আমি বললাম : এটা আমার ছোটবেলার একটা বালখিল্য ব্যাপার। শুনলে আপনি হাসবেন।

জীবেনদা বললেন : ওই দেখো! আরে বালক বয়েসে বালখিল্য ব্যাপার করবে না তো কি বুড়ো বয়েসে করবে! যা বলতে চাও নির্ভয়ে বলো। কথা দিচ্ছি আমি হাসব না।

এই বলে জীবেনদা নিজের দুটো ঠোঁটের ওপর তর্জনী চেপে ধরে আমাকে নিশ্চিন্ত করতে চাইলেন।

আমি বললাম : দেখুন জীবেনদা, আমার সিনেমা দেখার শুরু মায়ের কোলে চেপে। তখন শুধু ছবিটাই দেখতাম। তেমন কিছু বুঝতাম-টুঝতাম না। পরে যখন ক্লাস এইট-নাইনে পড়ি, তখন থেকে ছবির জগতের খবরাখবর রাখতে শুরু করি। তা সেই সময়ে দেখতাম দেবকী বসু, নীতিন বসু, মধু বসু, হীরেন বসু ইত্যাদি নামকরা সব পরিচালক আছেন সিনেমা জগৎ আলো করে, কিন্তু বসু পদবিধারী নায়ক এক আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। সব চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, মুখুজ্যে ইত্যাদি। এই নিয়ে আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যাঁরা জাতে ব্রাহ্মণ তারা খুব টিটকিরি দিত। নিউ থিয়েটার্সের নরেশ বসু, হরিমোহন বসু কিংবা কমেডিয়ান আশু বসু ইত্যাদি ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা তো সব ক্যারেক্টার অ্যাক্টর। নায়ক হিসেবে একমাত্র আপনিই ছিলেন, আর নায়িকা হিসেবে সাধনা বসু। পরে অবিশ্যি কাবেরী বসু এসে গেলেন, সবিতা চ্যাটার্জি গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুকে বিয়ে করে পদবি পাল্টে বসু হয়ে গেলেন। কিন্তু সে সংখ্যাটাও তো বড় কম। আচ্ছা জীবেনদা, হিরো-হিরোইনদের মধ্যে বসুর সংখ্যা এত কম কেন?

জীবেনদা বললেন : তাই তো হে! এ কথাটা তো কোনদিন চিন্তা করিনি। তাছাড়া আমিই বা ক'টা ছবিতে হিরো করেছি। বেশির ভাগ ছবিতেই তো ক্যারেকটার অ্যাকটিং। তো এই নিয়ে ভাববার কিছু নেই। তোমার ছেলেমেয়ে হলে তাদের সিনেমায় নামিয়ে দিও। তাতে হয়তো বসুর আকাল ঘুচবে একদিন না একদিন।

জীবেনদার কথায় আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। বুঝলাম উনি আবার আমাকে বাগে পেয়ে রসের খোঁচা দিয়ে নিলেন।

এই হলেন জীবেনদা। একটি স্বচ্ছ সরল সুন্দর মনের মানুষ। জীবেনদাকে দেখলেই আমার তমলুকের রাজবাড়ির খোসরঙ্গ পুকুরের কথা মনে পড়ে যেত। অতীতে রাজা-রানিরা নাকি সেই পুকুরে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে জলকেলি করতেন। তখন ওই পুকুরের জল নাকি এত স্বচ্ছ ছিল যে একটা টাকা ফেলে দিলেও তা দেখা যেত পুকুরের নিচে থেকে। কালক্রমে বর্ষার পাড়ধোয়ানো জলে খোসরঙ্গ-এর সেই স্বচ্ছতা কমে গেছে। এখন তো আদপে নেই বললেই চলে। মানুষ থেকে শুরু করে গরু-বাছুর ইত্যাদি সবই নাওয়ানো হয় সেই পুকুরে। জীবেনদার মনের ভিতরটা একদিন সেই রকম স্বচ্ছ ছিল। মনে হত বাইরে থেকে ওঁর মনের ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। সেই জীবেনদার শেষের দিকে যে কী হয়ে গেল। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কী রকম খিটখিটে হয়ে গেলেন। তবু তারই মধ্যে পুরনো জীবেনদাকে কখনও কখনও খুঁজে পাওয়া যেত।

সত্তরের দশকে একবার জীবেনদার মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়ে গেল খবরের কাগজে। আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত। জ্যোতির্ময় বসুরায় ছিলেন তখন আনন্দবাজারের সিনেমা এডিটর। দুর্দান্ত সাংবাদিক। অসম্ভব ভালো লেখার হাত। তা সেই জ্যোতির্ময়বাবু একদিন হাজার হাজার টাকা মাইনের মোহ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন রামকৃষ্ণ মিশনে। একেবারে অন্য জীবনে। ভুল বললাম। জ্যোতির্ময়বাবুর ওই জীবনটাকে অন্য জীবন না বলে অনন্য জীবন বলাই বোধহয় সঙ্গত।

তা যে কথা বলছিলাম। ওই জ্যোতির্ময়বাবু একদিন এক অজ্ঞাত ব্যক্তির টেলিফোন পেলেন অফিসে বসে। এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, অভিনেতা জীবেন বসু কি মারা গেছেন? তাঁদের পাড়ায় এই নিয়ে জোর গুজব রটেছে।

জ্যোতির্ময়বাবু টেলিফোনের এ প্রান্ত থেকে ভদ্রলোককে বললেন : তাই নাকি! আমাদের কাছে তো এরকম কোন খবর নেই। শুনেছি উনি অসুস্থ অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছেন। যাই হোক, আমরা খবর নিচ্ছি।

ভদ্রলোককে ছেড়েই জ্যোর্তিময়বাবু মেডিক্যাল কলেজের অনুসন্ধান বিভাগের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : আমি আনন্দবাজার থেকে বলছি। আপনাদের ওখানে অভিনেতা জীবেন বসু ভর্তি হয়েছেন বলে শুনেছি। তিনি এখন কেমন আছেন?

অনুসন্ধান বিভাগে যিনি ছিলেন তিনি জবাব দিলেন : সিনেমা আর্টিস্ট জীবেন বোস তো?

জ্যোতির্ময়বাবু বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বললেন : তিনি তো মারা গেছেন।

শুনে জ্যোতির্ময়বাবু আঁতকে উঠলেন। বললেন : সে কী! কখন?

ভদ্রলোক বললেন : অনেকক্ষণ। তাঁর বডি তো ফুল-টুল দিয়ে সাজিয়ে অনেকক্ষণ আগে নিয়ে চলে গেছে।

জ্যোতির্ময়বাবু খবরটা শুনে কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে রইলেন। তারপর ধরা-ধরা গলায় বললেন : কোন্ বার্নিং ঘাটে নিয়ে গেছে বলতে পারবেন কি?

ভদ্রলোক বললেন : তা তো ঠিক বলতে পারব না। তবে নিমতলাতেই হবে বোধহয়। তা এখন গিয়ে কি আর বডি দেখতে পাবেন। এতক্ষণে তো পুড়িয়ে-টুড়িয়ে ফিরে চলে যাওয়ার কথা। সেখানে গিয়ে সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি খবরটা তৈরি করে ফেলুন। নইলে অন্য কাগজ আপনাদের আগে বার করে দেবে।

ভদ্রলোকের কথা শোনার পর জ্যোতির্ময়বাবু ফোনটা রেখে দিতে চাইছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে

সাংবাদিকসুলভ সতর্কতা এসে গেল। প্রাথমিক বিহ্বল ভাবটা তখন কেটে গেছে। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কে কথা বলছেন? আপনার নামটা জানতে পারি?

ফোনের ওপার থেকে ভদ্রলোক যেন খেঁকিয়ে উঠলেন। বললেন : আর আমার নাম জেনে কী হবে! একটা লোক মারা গেল, তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পোড়ানো হয়ে গেল, আর এখন উনি এসেছেন খবর নিতে। খবরের কাগজের সাংবাদিক হয়েছেন অথচ নিজের কাজটা ঠিক মতো করতে পারেন না!

তা সত্ত্বেও জ্যোতির্ময়বাবু বললেন : তবু আপনার নামটা জানতে চাইছি। বলতে আপত্তি আছে কী?

ভদ্রলোক বললেন : আমার নাম নেই। আমি এখানকার একজন কর্মচারী।

এই বলে ভদ্রলোক খট্ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

তখন রাত আটটা-নটা বেজে গেছে বোধহয়। জ্যোতির্ময়বাবু অনেক খেটে-খুটে ওবিচুয়ারি নোট্স্ তৈরি করলেন। একবার ভাবলেন জীবেন বসুর কনটেম্পোরারি দু-একজন শিল্পীর রি-অ্যাকশন জেনে নেন টেলিফোনে। অন্তত পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের। তারপর আবার ভাবলেন, ওঁকে কি এখন আর বাড়িতে পাওয়া যাবে? উনি হয়তো শ্মশানঘাট থেকে সোজা জীবেন বসুর বাড়িতে চলে গেছেন তাঁর পরিজনদের সান্ত্বনা দিতে।

সেটা করলে অবশ্য একটা কাজের কাজ হত। তিনি যে একটা শয়তানীর শিকার হতে চলেছেন সেটা ধরে ফেলতে পারতেন। মেডিক্যাল কলেজের এন্কোয়ারিতে মাঝে মাঝে যে দু-একটা ইতর মনোবৃত্তির লোক এসে বসে মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেয় সেটা জেনে ফেলতে পারতেন।

পরের দিন সকাল থেকে ফোনের পর ফোন। আর কোনও কাগজে জীবেন বসুর মৃত্যু সংবাদ বেরোয়নি। বোঝা গেল, আনন্দবাজারকে লোকচক্ষে হেয় করবার এ এক ঘৃণ্য চক্রান্ত। বুর্জোয়া কাগজ আনন্দবাজার বেশ কিছু মানুষের চোখের বিষ কিনা!

তার পরের দিনের কাগজে এই মৃত্যুসংবাদ প্রকাশের জন্য সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয়েছিল পাঠকদের কাছে। তাঁরা আসল ব্যাপারটা জানতে পারেননি কোনদিন। নেপথ্যের খবরটা কাউকে তো জানানো যায়নি। ফিল্ম লাইনের কিছু লোকের কাছে মুখে মুখে বলা হয়েছিল মাত্র। আজ এতদিন পরে ছাপার অক্ষরে সেটা প্রকাশ করলাম।

এই ঘটনার মাস কয়েক পরে জীবেনদার সঙ্গে দেখা। দেখা হতেই উনি হাসতে হাসতে বললেন : তোমরা পারও বটে ভাই। জলজ্যান্ত একটা মানুষকে মেরে ফেললে হে! তোমাদের, সাংবাদিকদের দেখছি অসীম ক্ষমতা।

তারপর নিজের কপালে মৃদু করাঘাত করে জীবেনদা বলেছিলেন : একদিক থেকে দেখতে গেলে তোমরা ঠিকই লিখেছো। আমি তো আর সত্যিই বেঁচে নেই। জীবিত মানুষের কাঠামো নিয়ে একটা মরা মানুষ ঘোরাফেরা করছি মাত্র।

এমন ধরনের আক্ষেপের কথা জীবেনদার মুখ থেকে কোনদিন যে শুনতে হবে, সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি তো তাঁর সোনালী দিনগুলিতে তাঁকে অনেক কাছে থেকে দেখেছি।

সেই উদারহৃদয় জীবেন বসুর কথায় পরে আসছি।

অভিনেতা জীবেন বসু তাঁর স্বোপার্জিত অর্থে বাড়ি করেছিলেন। আড়িয়াদহ-দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলে। জীবেনদার প্রাণে ঈশ্বরভক্তি খুব প্রবল ছিল। সেইজন্যেই বোধহয় ওইরকম একটা জায়গা বেছে নিয়েছিলেন। একদিকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির, অন্যদিকে রামকৃষ্ণের আদিষ্ট মন্দির আদ্যাপীঠ। মানসিক শান্তি পেতে হলে এরচেয়ে ভালো জায়গা আর হয় নাকি!

জীবেনদার ঈশ্বরভক্তির আরও অনেক ঘটনা আমার জানা আছে। তাঁর প্রচণ্ড গুরুবাদে বিশ্বাস ছিল। তা নিয়ে মাঝে মাঝে ভয়ানক বাড়াবাড়িও করতেন। শেষ জীবনে বালিশের নীচে বালক ব্রহ্মচারীর ছবি নিয়ে শুতেন। সেসব বাড়াবাড়ি একটা সময়ে কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, সে কথায় পরে আসছি। তার আগে জীবেনদার ছোটবেলার কিছু ঘটনার কথা বলে নিলে তিনি কী ভীষণ সংগ্রাম করতে করতে শিল্পী জীবনে পৌঁছেছিলেন, সেটা জানতে পারা যাবে।

জীবেনদার আদি বাড়ি ভবানীপুরের বেলতলা অঞ্চলে। ওঁর বাবার নাম যতীন্দ্রনাথ বসু। উনি ছিলেন পেশায় ডাক্তার। জীবনেদারা ভাইবোন মিলিয়ে ষোলো জন। এখনকার দিনে ওই সংখ্যাটা হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কিংবা বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটা মোটেই হাস্যকর ছিল না। বেশি সংখ্যায় ছেলেপুলে হওয়াটাকে তখন সম্ভ্রমের চোখেই দেখা হত। তখন গুরুজনেরা মহাভারতের যুগের মতো 'শতপুত্রের জননী হও' বলে আশীর্বাদ করতেন না বটে, তবে 'বংশের বাড়বাড়ন্ত হোক' শব্দটি অবশ্যই উচ্চারণ করতেন।

যাই হোক, ওই ষোলো জন ভাইবোনের মধ্যে জীবেনদা কত নম্বরের সেটা আমি জানি না। তাছাড়া জীবেনদার জীবিতকালে এসব নিয়ে কোনও কথাও হয়নি আমার সঙ্গে। ওঁদের ভাইবোনের এই সংখ্যাটা সেদিন জানতে পারলাম জীবেনদার কনিষ্ঠা কন্যা শতদলের মুখ থেকে। শতদলকে জীবেনদা আর বউদি আদর করে 'মামণি' বলে ডাকতেন। সেই থেকে পাড়াপড়শি আর আত্মীয়স্বজনের কাছে ওই মামণি নামটাই চালু হয়ে গেছে। শতদল নামটা কেবল র‍্যাশনকার্ডের শোভাবর্ধন করছে।

জীবেনদার বাড়িতে এখন মামণি ছাড়া আর কেউ থাকেন না। ওর আগের তিন দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের কেউ থাকেন আমেরিকায়, কেউ রাজস্থানে, আর একজন ভবানীপুরের হাজরা রোডে। মামণির বিয়ে-থা হয়নি। করতেও চান না। জীবেনদার স্মৃতি আঁকড়ে এই বাড়িতেই পড়ে থাকতে চান। আর সারা জীবন ধরে জীবেনদার আদিষ্ট একটি কাজ নিষ্ঠা সহকারে করে চলেছেন। সে কাজটা যে কী সেটা পরে জানাচ্ছি।

জীবেনদার বাবার ইচ্ছে ছিল তাঁর এই ছেলেটি লেখাপড়া শিখে তাঁর মতো ডাক্তার হোক। কিন্তু জীবেনদা হয়ে গেলেন অভিনেতা। স্কুল-লাইফ থেকেই জীবেনদার অভিনয় করার শখ ছিল। জীবেনদার জন্ম ১৯১৫ সালে। ১৯২৫-২৬ সাল থেকেই জীবেনদা পাড়ার ক্লাবে অভিনয় করা শুরু করেন। কলকাতা শহরে তখন পাড়ায় পাড়ায় প্রচুর অ্যামেচার ক্লাব ছিল। যাত্রা আর থিয়েটার দুইই হত ওইসব ক্লাবে। কোনও বড়লোকের বাড়ির শুভ কাজ উপলক্ষে তাঁরা যদি স্টেজ বেঁধে দিতেন, সিন-সিনারি আর মেক-আপের ভাড়া দিতেন তাহলে থিয়েটার, আর না হলে নিজেদের শখ মেটাবার জন্যে যাত্রা। ফিমেল রোল্‌গুলো তখনও পর্যন্ত পুরুষরাই করতেন।

তা জীবেনদা তখন যে ওই ধরনের শখের অভিনয় করতেন তাতে তাঁদের বাড়িতে কোনও আপত্তি হয়নি। পাড়ার অনেক ছেলে-বুড়োই তো তখন শখের অভিনয় করছে। ভবানীপুর পাড়ায় তখন প্রচুর অভিনেতা। নরেশ মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী—এঁরা তো সব ভবানীপুরের বাসিন্দা। পেশাদার হবার আগে ওঁরা সবাই অ্যামেচার ছিলেন। তিনকড়ি চক্রবর্তীমশাইকে তো অনেকে ডাকতেন 'ভবানীপুরের চক্কোত্তিমশাই' বলে তবে সেটা অন্য কারণে। সে কারণটা বড় মর্মান্তিক। কী করে বা কেমন করে রটে গিয়েছিল জানি না, তিনকড়িবাবুর নাম করলে নাকি যাত্রা শুভ হয় না। শুভ কাজে বিঘ্ন ঘটে। তাই তাঁর নাম না করে বলা হত 'ভবানীপুরের চক্কোত্তিমশাই'। এই নির্মল ব্যাপারটি যাঁরা ঘটাতেন তাঁরা সবাই শিক্ষিত মানুষ। তা সত্ত্বেও এই জাতীয় ব্যবহার তাঁরা করতেন একজন শিক্ষিত, ভদ্র অভিনেতার সঙ্গে, যিনি আমাদের বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের একজন গৌরব।

তিনকড়িবাবু যে এই ব্যাপারটা জানতেন না, তা নয়। কিন্তু কোনদিন তিনি এই ব্যাপার নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হননি। এ নিয়ে তিনি যে মন-খারাপ করেছেন তাও শোনা যায়নি তাঁর সতীর্থদের কারও কাছ থেকে। আসলে এ সব জঘন্য ব্যাপারকে তিনি ডোন্ট কেয়ার করতেন। এটাকে মনের জোরও বলতে পারেন, আবার ভদ্রতাও বলতে পারেন।

যাই হোক, আবার জীবেনদার কথাতেই আসি। কোন কোন শিশু যেমন কলাগাছ কাটতে কাটতে হাত মক্‌সো করে কালক্রমে দুর্দান্ত খুনীতে পরিণত হয়, জীবেনদারও সেইরকম অবস্থা হল। ওই অ্যামেচারে অভিনয় করতে করতে বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে সিনেমার পেশাদারি অভিনয়ে চলে গেলেন। নির্বাক 'আঁখিজল' ছবিতে উনি একটি ছোট্ট-ভূমিকায় অভিনয়ের চান্স পেয়ে গেলেন।

ছবির ওই আঁখিজল নামটি যে জীবেনদার বাস্তব জীবনে মর্মান্তিক ভাবে সত্যি হয়ে উঠবে তা কি উনি জানতেন। যতই লুকিয়ে করুন, সিনেমা তো একদিন না একদিন পর্দায় দেখানো হবে। বাড়ির কেউ

যদি নাও দেখেন, পাড়া-পড়শির মধ্যে দেখবার লোকের তো অভাব নেই। সেইরকম পাড়া-পড়শির মুখ থেকেই জীবেনদার বাবা যতীনবাবু জানতে পারলেন তাঁর গুণধর পুত্র বায়স্কোপে অভিনয় করেছে।

খবরটা শুনে তো যতীনবাবু ক্রোধে অগ্নিশর্মা। একে তো রাশভারী মানুষ, তার ওপর ভয়ানক রাগি। বাড়ির সকলে তাঁকে যমের মতো ভয় করেন। সেই যমের মুখে পড়তেই হল জীবেন বসুকে।

যতীনবাবুর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। সিনেমার মানুষেরা তখনও সামাজিক স্বীকৃতি পাননি। তার ওপর যতীনবাবু শুনেছেন, স্টুডিওপাড়ায় ডবকা ডবকা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা সব কিলবিল করছে। ওঁর ধারণা হল তারা সবাই ওঁর ষোলো বছরের বাচ্চা ছেলেটার মাথাটা চিবিয়ে খাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। ক্রোধে আত্মহারা যতীনবাবু জীবেনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি নাকি বায়স্কোপে অ্যাকটো করেছ?

জীবেনদা বুঝলেন অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই। আবার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকারও করতে পারছেন না। তাই বাবার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আর তারপর যেটা ঘটল তার জন্যে জীবেনদা আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। বাবার রাগের আউটবার্স্ট এভাবে হবে সেটা ভাবতেও পারেননি। টেবিলের ওপর একখানা বড় রুল ছিল। সেটা দিয়ে যতীনবাবু নির্মমভাবে পিটতে লাগলেন জীবেনদাকে। বললেন : যে পায়ে হেঁটে তুমি স্টুডিওপাড়ায় গেছো বায়স্কোপ করতে, সেই পা তোমার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব আমি। যাতে আর কোনদিন ওমুখো না হতে পারো। আমার কত সাধ, তুমি লেখাপড়া শিখবে, ডাক্তার হবে। তার বদলে হলে কী না নোটো। যতীন বোসের ছেলে অ্যাক্টো করবে! ছি ছি! লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কেমন করে।

একই সঙ্গে মুখ আর হাত দুটোই চলতে লাগলো ক্রোধে অগ্নিশর্মা যতীনবাবুর। মারতে মারতে একটা সময়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলেন। আর জীবেনদার তখন পায়ের দুটো গাঁটই ফুলে ঢোল। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই।

ওই ভাঙা পা নিয়েই প্রায় একমাস শুয়ে থাকতে হয়েছিল জীবেনদাকে। আর ওই এক মাসের মধ্যে অভিনয়ের পোকাটা মাথা থেকে চলে গিয়েছিল তাঁর।

কিন্তু জন্মের পর ষষ্ঠীপুজোর দিন বিধাতাপুরুষ যাঁর কপালে 'অভিনেতা' কথাটা গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দিয়ে গেছেন, সেই বিধিলিপির হাত থেকে কি গুড বয় হলেই নিস্তার পাওয়া যায়? জীবেনদাও পেলেন না। শেষ পর্যন্ত অভিনয়ের পেশা তাঁকে গ্রহণ করতেই হল। তবে সেটা আরও দুটো বছর পরে।

১৯৩২ সালে জীবেনদার বাবা মারা গেলেন। তখন তো আর নিষেধ করবার কেউ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর জীবেনদা অভিনয়ের দিকে পা বাড়াতে পারলেন না। স্বর্গত বাবার নিষেধবাণী তাঁকে নিবৃত্ত করে রাখল ওই পথ থেকে।

জীবেনদার জীবনের এই ঘটনাটা জীবেনদার মুখ থেকে শুনেছিলাম সেই ষাটের দশকে। তারপরই প্রশ্ন করেছিলাম : তাহলে আপনি সিনেমায় অভিনয় করতে এলেন কেমন করে জীবেনদা? তখন আপনার বাবার নিষেধের কথা মনে পড়ল না?

আমার প্রশ্নটা শুনে জীবেনদা একটু হাসলেন। তারপর বললেন : দুরাত্মার যেমন ছলের অভাব হয় না, আমারও তেমনি হল না।

আমি জীবেনদার কথার অর্থটা ধরতে পারলাম না। পাল্টা প্রশ্ন করলাম : তার মানে?

জীবেনদা বললেন : রক্তের মধ্যে যার একবার অভিনয়ের বিষ ঢুকেছে সে কি তার থেকে মুক্তি পায় কখনও? আমিও একটা ছলের আশ্রয় নিলাম অভিনয় করবার জন্যে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : সেই ছলটা কী?

জীবেনদা বললেন : মনকে বোঝালাম, বাবা তো সিনেমায় অভিনয়ের ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। থিয়েটারের ব্যাপারে তো করেননি। অতএব আমি তো এখন অনায়াসে থিয়েটারে অভিনয় করতে পারি। বাবার আত্মা তাতে নিশ্চয় কষ্ট পাবেন না। মনে মনে ওই অজুহাতটা খাড়া করে একদিন হাজির হলাম শিশিরকুমার ভাদুড়ির কাছে।

শিশিরবাবুর কাছে জীবেনদা যখন যান তখন ওঁর বয়েস মাত্র আঠারো কী উনিশ। অত কম বয়েস দেখে শিশিরবাবু ওঁকে তাঁর থিয়েটারে নিতে রাজি হলেন না। নিষেধ করলেন থিয়েটারের জগতে আসতে। বললেন : এখন মন দিয়ে পড়াশোনা করো। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করো। তারপর আমার কাছে আসবে।

কিন্তু অভিনয়ের দৈত্য তখন জীবেনদার মাথায় দারুণভাবে ভর করেছে। নাছোড়বান্দার মতো লেগে রইলেন শিশিরবাবুর পেছনে। এইরকম বেয়াড়া একটি ছেলেকে শিশিবকুমার অনায়াসে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা পারলেন না। তার প্রথম কারণ ছেলেটির মুখে একরাশ কোমলতা মাখানো। তার পিঙ্গল দুটি চোখের তারায় ভাসমান সরলতা। তার ওপর অভিনয়ের জন্যে এবকম জিদ। এরকম জেদি ছেলেবাই পারে জীবনে উন্নতি করতে। লক্ষ থেকে নড়ানো যায় না তাদের।

শেষ পর্যন্ত একরকম বাধ্য হয়েই জীবেন বসুকে নিজের থিয়েটারে স্থান দিতে বাধ্য হলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। কিন্তু ওঁর ওখানে অধিকাংশ শিল্পীর ভাগ্যে যা ঘটে জীবেনদারও তাই ঘটল। ছোটখাটো চরিত্রাভিনেতার স্তরেই রয়ে গেলেন তিনি। শিশিরবাবুর থিয়েটারে শিশিরকুমার নিজে আছেন, তারপর তাঁর ভ্রাতারা আছেন, মিহির ভট্টাচার্য আছেন, এঁদের টপকে কোনও বড় রোল পাওয়া খুব মুশকিল।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও জীবেনদা শিশিরকুমারের কাছে পড়ে রইলেন। আর কিছু না হোক অভিনয়টা তো শেখা হচ্ছে। কিছুটা করতে করতে শেখা, কিছুটা দেখতে দেখতে শেখা।

এইভাবেই চলতে লাগল জীবেন বসুর অভিনয় সাধনা। আর এই অকিঞ্চিৎকর মঞ্চাভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে চলতে লাগল সিনেমার সাম্রাজ্যে পুনরায় উঁকিঝুঁকি দেওয়া।

জীবেনদার কথাব মাঝখানেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আবার সিনেমা! বাবার নিষেধের কথা মনে পড়ল না আপনার?

জীবেনদা বললেন : মনে পড়েছিল। এবং মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধও করেছিলাম। কিন্তু তখন যে ও ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। অভিনয়ের কাছে ততদিনে পার্মানেন্ট দাসখত লেখা হয়ে গেছে যে।

আমি বললাম : কেন? আর কোনও রাস্তা খুঁজে পাননি জীবনধারণের?

জীবেনদা বললেন : পেয়েছিলাম। একটা চাকরি পেয়েছিলাম। দশটা-পাঁচটার কেরানির জীবন। কিন্তু সেটাও রাখতে পারলাম না।

আমি বললাম : কেন?

জীবেনদা বললেন : একেই তো ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাকরি করছিলাম। তার ওপর একদিন অতি তুচ্ছ কারণে মনিবের তিরস্কার। বিদেশী মনিব। তাই অপমানটা বড় বেশি বলে মনে হয়েছিল। দিকে দিকে তখন তো ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলছে। আমার তরুণ মনেও তারই প্রতিক্রিয়া। তাই বেশ কয়েকটা কড়া কথা বলে দিলাম চাকরিতে রেজিগনেশান।

আমি বললাম : বেশ করেছেন। ওটা থাকলে আমরা বাংলা সিনেমার একজন ভালো আর সফল অভিনেতাকে হারাতাম।

জীবেনদা একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন আমার কথা শুনে। বললেন : কী যে বলো।

একদিন কথায় কথায় জীবেনদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আচ্ছা জীবেনদা, থিয়েটার আর সিনেমা এই দুটো মিডিয়ামের মধ্যে কোনটা আপনাকে বেশি টানে?

আমার কথা শুনে জীবেনদার দুটি পিঙ্গল চোখের তারায় মজা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন : কোন্ দিকে? সামনে না পেছনে?

বুঝলাম কথাটা বেফাঁস বলে ফেলেছি। আর সদারসিক রঙ্গপ্রিয় জীবেন বসু আমাকে আমারই কথার প্যাঁচে ফেলে দিয়েছেন। সেটা সামলে নেবার জন্যে বললাম : টানে মানে, আমি বলতে চাইছি, কোন্‌টা আপনার বেশি প্রিয়? সিনেমা না থিয়েটার?

একটা মুহূর্তও সময় না নিয়ে জীবেনদা জবাব দিয়েছিলেন : থিয়েটার।

আমি বললাম : কেন? সিনেমা তো আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছে। নাম, যশ, অর্থ। আজ প্রোডাকসন্সের মতো এতবড় একটা প্রোডাকসন করতে পেরেছেন। তা সত্ত্বেও বলবেন, থিয়েটার আপনার প্রিয়।

জীবেনদা বললেন : সেটা অস্বীকার করব না। সিনেমা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। কিন্তু আমি যে থিয়েটারকে অনেক বেশি দিয়েছি। আমার ভালোবাসা। আমার পরিশ্রম। এই যে রঙমহল থিয়েটার, এর পিছনে আমার কত পরিশ্রম গেছে তা তো তোমরা জানো না ভাই।

বুঝলাম কিছু না পেয়েও যখন থিয়েটারকে এত ভালোবাসেন জীবেনদা, তখন ওই ভালোবাসাটা জেনুইন। নিখাদ।

তার পরেই জীবেনদাকে প্রশ্ন করেছিলাম : থিয়েটারে আপনার গুরু বলে কাকে মানেন?

জীবেনদা বললেন : থিয়েটারে আমার গুরু অবশ্যই শিশিরকুমার ভাদুড়ি। কিন্তু আমার আদর্শ তিনি নন। অন্য একজন।

আমি বললাম : তিনি কে?

জীবেনদা বললেন : দুর্গাদাস। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশিরবাবুর কাছে অভিনয় শিখেছি বটে, কিন্তু কোনদিন শিশিরবাবুকে অনুসরণ করিনি। সেটা করতে চেষ্টা করতাম দুর্গাবাবুকে। আহা! কী অভিনয়! কী ব্যক্তিত্ব! কী রোম্যান্টিসিজম্! ওঁর অভিনয়ের এক কণা যদি পেতাম নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

আমি বললাম : আপনি তো দুর্গাদাসবাবুর সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তা অভিনয়ের বাইরে মানুষটিকে কেমন লাগত?

জীবেনদা বললেন : দেখো ভাই রবি, বাইরে আমি দুর্গাবাবুর অনেক বদনাম শুনেছি। তিনি নাকি মদ্যপ। নারীদেহের প্রতি তাঁর নাকি প্রচণ্ড আসক্তি। প্রচণ্ড রাগি। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না। মুখের ওপর যা-তা কথা শুনিয়ে দেন। কিন্তু আমি যতটুকু তাঁর সঙ্গে মিশেছি তাতে বলতে পারি, তিনি ওইসব যতটা না করেন তারচেয়ে অনেক বেশি রটনা করা হয়েছে। আমি ওঁকে যতটুকু জেনেছি তাতে ওঁর মতো স্নেহপ্রবণ মানুষ আমি খুব বেশি দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। গরিবের জন্যে ওঁর চোখে আমি জল দেখেছি। নিজের ব্যাগ উজাড় করে দান করে দিতে দেখেছি। থিয়েটারের টেকনিসিয়ানরা মাইনে পাচ্ছে না বলে মালিকের সঙ্গে লড়াই করতে দেখেছি। তার পরেও মানুষটিকে খারাপ বলব কেমন করে? উনি আমাকে একবার কতবড় আত্মগ্লানির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন জানো?

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

জীবেনদা বললেন : সিনেমার কাজে বেশি করে জড়িয়ে পড়ার আগে আমি পেটের দায়ে বেশ কয়েকবার কম্বিনেশন থিয়েটার করিয়েছি। মাঝে মাঝে এইরকম দল নিয়ে পূর্ব বাংলার দিকেও চলে যেতাম। দু-তিন মাস পরে ফিরতাম। এখন যেমন যাত্রার দলগুলো করে, সেইরকম আর কি।

তা সেবার আমার কম্বিনেশন হচ্ছে শ্রীরঙ্গম থিয়েটারে। কী নাটক সেটা মনে পড়ছে না। তবে বড়বাবু মানে শিশিরবাবু ছিলেন। প্রভা দেবী ছিলেন। বিশ্বনাথ ভাদুড়ি ছিলেন। দুর্গাবাবু ছিলেন। তা ওই কম্বিনেশন করতে গিয়ে অনেক মানুষের মুখোস খুলে গিয়েছিল। বাইরে কত ভদ্র, কত স্নেহপ্রবণ, কিন্তু কমার্শিয়াল কোনও ব্যাপার হলেই একদম চামারের মতো ব্যবহার। সে সব অত্যাচার মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। না হলে শো ডুবে যাবে। অনেক কষ্টের টাকাগুলো সব জলে যাবে।

তা সেই সব ব্যাপার মুখ বুজে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু পোস্টার ছাপানোর সময় এমন একটি প্রস্তাব এল যে আমি থ বনে গেলাম। বিশ্বনাথ ভাদুড়িমশাই আমাকে ডেকে বললেন, শিশিরবাবুর নাম যত ইঞ্চি টাইপে দেওয়া হবে পোস্টারে, তাঁর নামও তত ইঞ্চি টাইপে দিতে হবে। সাধারণত শিশিরবাবুর নাম চার ইঞ্চি টাইপে দেওয়া হয়। বাকি যাঁরা বিখ্যাত তাঁদের নাম থাকে দু'ইঞ্চি টাইপে।

আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। কী করি এখন। আমার তো শুধু শিশির ভাদুড়ি আর বিশ্বনাথ ভাদুড়ি নয়, সেই সঙ্গে দুর্গাদাস আর প্রভামাও আছেন। কী করি এখন! শেষ পর্যন্ত আমি ওই চারটে নামই

তিন ইঞ্চি টাইপে ছাপিয়ে পোস্টার দিয়ে দিলাম।

শো-এর দিন আমি নিজে বুকিং কাউন্টারে বসেছি বুকিং ক্লার্কের সঙ্গে। বুকিং-এর সামনে একটা বোর্ডে পোস্টারটা লাগানো আছে। শো-এর কিছুক্ষণ আগে বড়বাবু একবার নীচে নেমে বুকিং-এর সামনে এলেন। বোধহয় কীরকম কী বিক্রি-টিক্রি হচ্ছে দেখতে এসেছিলেন। তাঁর নজর পড়ল পোস্টারটার দিকে। তিনি এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। তারপব মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে একটু ছাই ঝেড়ে আবার ফিরে গেলেন। একটু পরে বিশ্বনাথবাবু এলেন। তিনিও পোস্টারটা দেখলেন। তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি ঝলমল করে উঠল। সব শেষে এলেন দুর্গাবাবু। পোস্টারটা তাঁর নজরে পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন। তার কপালে ভ্রূকুটির রেখা। তিনি সোজা বুকিং-এর সামনে এসে আমাকে বললেন : জীবেন, তুমি একবার আমার সঙ্গে মেক-আপ রুমে দেখা করো তো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : এখনই যাব দাদা?

দুর্গাবাবু বললেন : না না, এক্ষুনি আসতে হবে না। বুকিং বন্ধ হবার পর এসো।

শো আরম্ভ হবার একটু আগে আমি বুকিং থেকে বেরিয়ে মেক-আপ রুমে গেলাম। দেখলাম দুর্গাবাবু আর বিশ্বনাথবাবু পাশাপাশি আয়নায় বসে মেক-আপ করছেন।

আমি দুর্গাদার পাশে গিয়ে বললাম : আমাকে কেন ডেকেছিলেন দাদা?

দুর্গাবাবু একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন : তুমি একটা অন্যায় করেছ জীবেন।

আমি তখন ক'দিন যাবৎ সকলের নানা বায়নাক্কা শুনতে শুনতে একেবারে বীতশ্রদ্ধ। তাই বললাম: একটা কেন দাদা, আমি একশোটা অন্যায় করেছি। এই নাকে-কানে খত দিচ্ছি, আর কখনও কম্বিনেশন নাইট করাতে যাব না।

দুর্গাবাবু মুখে তুলিটা বোলাতে বোলাতে একবার আড়চোখে বিশ্বনাথ ভাদুড়ির দিকে দেখে নিলেন। তারপর বললেন : না না, আমি সেসব কথা বলছি না। তোমার অন্যায়টা অন্য জায়গায়। তুমি পোস্টারে আমার নামটা শিশিরবাবুর সমান অক্ষরে দিয়েছ কেন! জানো না, শিশিরবাবু যে নাটকে থাকেন সে নাটকের পোস্টারে অন্য কারুর নাম থাকাই উচিত নয়। থাকলেও একেবারে ছোট হরফে থাকা উচিত। কারণ আমরা কেউই তাঁর পেচ্ছাবের যোগ্যও নয়। যাও, এরকম ভুল আর কখনও কোরো না।

বক্তব্যটি শেষ করে জীবেনদা বললেন : জানো রবি, এই হলেন দুর্গাদাস বাঁড়ুজ্যে। যে কথাটা আমার মনের মধ্যে এ ক'দিন যন্ত্রণা দিচ্ছিল, অথচ প্রকাশ করতে পারছিলাম না, দুর্গাদা আমার মনের সেই কথাগুলি বলে দিয়ে আমাকে আত্মগ্লানির হাত থেকে মুক্তি দিলেন। এমন মানুষ আর হবে নাকি?

জীবেনদা দীর্ঘকাল বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ির কাছে হাতেখড়ির পর তাঁর সঙ্গে তো বটেই, আরও অনেক কীর্তিমান নটনটীর সঙ্গে তিনি অভিনয় করেছেন। কিন্তু কোনদিনই তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পেয়েছেন বলে তো মনে হয় না। সারা জীবনে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটখানি নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক হল আলমগীর, ষোড়শী, রমা, শেষরক্ষা, বিজয়া, রঘুবীর, যোগাযোগ ইত্যাদি। ওইসব নাটকে ছোট ছোট বিভিন্ন চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। একই নাটকে আজ এক চরিত্র করেছেন তো কাল অন্য চরিত্র করেছেন। কিন্তু কোনও চরিত্রই বড় গলা করে বলবার মতো নয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের দর্শকরা তাঁকে নিয়ে কোনদিন হইচই করেছেন বলেও শুনিনি।

অথচ জীবেনদা ছিলেন নাটক-অন্ত প্রাণ। মঞ্চকে যে তিনি কী পরিমাণ ভালোবেসেছিলেন তা তাঁর কথার মধ্যেই মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসত। সেইসব কথার মধ্যে চাপা একটা দুঃখের সুর স্পষ্টই ধরা পড়ত।

এর একটা কারণ আমি আবিষ্কার করেছিলাম। তখনকার দিনের নাটকে একটু সুরেলা অভিনয় প্রচলিত ছিল। প্রায় সব শিল্পীই একটু উচ্চগ্রামে অভিনয় করতেন। অহীন্দ্র চৌধুরি তো বটেই, স্বয়ং শিশিরকুমারও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ওঁদের প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা রেখেও আমি এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু জীবেনদার অভিনয়ের মধ্যে সেই সুরেলা ব্যাপারটা একদম আসত না। যে কারণে নাট্যপ্রযোজকরা তাঁকে কোনও বড় ভূমিকা দিতেন না। গ্যালারি অ্যাকটিং-এর ব্যাপারটা জীবেনদার ধাতে

ছিল না। ওঁব অভিনয়ের চেহারাটা ছিল খুবই নর্মাল। যেন ঘরোয়া কথাবার্তা বলছেন এমন একটা ভাব। নাট্যদর্শকদের ওই জিনিস পছন্দ হবে কেন। তখনকার দর্শকরা লাউড-অ্যাকটিং বেশি পছন্দ কবতেন।

এই ধাবার অভিনয়ের ব্যতিক্রম ছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নর্মাল অ্যাকটিং করেও দর্শকের প্রশংসা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। এর মূলে ছিল দুর্গাবাবুর কন্দর্পকান্তি চেহারা আর মাদকতাময় কণ্ঠস্বর। এবং প্রচণ্ড মঞ্চব্যক্তিত্ব। দর্শকরা তাঁর অভিনয়ের মাঝখানে কোন বিরূপ মন্তব্য করলে তিনি তাঁদের তুলোধোনা করে ছাড়তেন। এটা শিশির ভাদুড়িমশাইও করতেন। তিনি দর্শকদের অভিনয় ভালো না লাগলে বেরিয়ে যাবার উপদেশ দিতেন। এবং তা রীতিমত ক্রুদ্ধকণ্ঠে। কিন্তু দুর্গাদাসের কটাক্ষের চেহারাটা ছিল একটু অন্য ধরনের। তিনি চিৎকার করে নিজের উষ্মা প্রকাশ করতেন না। কিন্তু মৃদুস্বরে এমন একটি হুল ফোটাতেন, যার বিষের জ্বালা ছিল মারাত্মক।

দুর্গাদাসের নাট্যজীবনের এমন একটি ঘটনার কথা আমি জীবেনদার মুখ থেকেই শুনেছিলাম। জীবেনদা বলেছিলেন · কেন আমি দুর্গাদাকে গুরু বলে মানতাম শুনবে?

আমি আগ্রহ প্রকাশ করাতে জীবেনদা আমাকে ঘটনাটা শুনিয়েছিলেন। তবে দুর্গাবাবু অভিনীত ওই নাটকটির নাম আমি ভুলে গেছি। বোধহয় নাটকটার নাম 'স্বামী-স্ত্রী'। সেই নাটকের একটি দৃশ্যে নায়ক দুর্গাদাস নায়িকাব কাছে একটি দৃশ্যে প্রেমনিবেদন করছেন। স্বাভাবিক কারণেই সেইসব প্রেমময় সংলাপগুলি নিচু গলায় বলছিলেন দুর্গাবাবু। নিচু গলায় বটে, কিন্তু তা প্রেক্ষাগৃহের শেষের সারির দর্শকদের কাছেও অশ্রুত থাকছিল না।

কিন্তু দর্শকদের মধ্যে কিছু ফাজিল ব্যক্তি চিরকালই থাকেন। সেইরকমই একজন দর্শক ওই প্রেমের সংলাপেব মাঝখানেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন . দুর্গাবাবু, লাউডার প্লিজ!

অভিনয়ের মধ্যে হঠাৎ এইভাবে রসভঙ্গ হওয়ায় দুর্গাদাস রীতিমত বিরক্ত হলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোনরকম উষ্মা প্রকাশ না করে যেদিক থেকে আওয়াজটা এসেছিল, সেইদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে সেইসব প্রেমের সংলাপগুলি আওড়াতে লাগলেন নায়িকার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে।

ওই নাটকের নায়িকা কে ছিলেন সেটা জীবেনদা আমাকে বলেননি। কাজেই আমিও তাঁর নাম বলতে পারব না। তবে সেই ভদ্রমহিলা ওইভাবে দুর্গাবাবুর চিৎকৃত প্রেমের সংলাপ শুনে লজ্জায় স্টেজ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

দুর্গাবাবু এরপর আস্তে আস্তে মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর সেই ফাজিল দর্শকটি যেখানে বসেছিলেন সেইদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন : দেখলেন তো মশাই, প্রেমের সংলাপ উঁচু গলায় বললে হিরোইন এইভাবে লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যাবে। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে স্ত্রীর কাছে যে কথাগুলি প্রত্যহ বলেন সেগুলি এরকম জোর গলায় একবার বলে দেখবেন। তখন বুঝতে পারবেন 'লাউডার প্লিজ'-এর কত জ্বালা। হয় স্ত্রীর হাতে ঝাঁটা খেতে হবে, আর নয়তো আপনার স্ত্রী আপনাকে পরিত্যাগ করে চিরকালের মতো বাপের বাড়ি চলে যাবেন। ওরকম বেহায়া মানুষের সঙ্গে ঘর করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়াও বুঝি ভালো।

এই ঘটনাটি বলে জীবেনদা বললেন : কী প্রচণ্ড সাহস আর আত্মবিশ্বাস থাকলে দর্শকদের মুখের ওপর এই কথাগুলি বলা যায় সেটা ভেবে দেখ একবার!

তা দুর্গাবাবুকে গুরু মেনেছিলেন জীবেনদা এই নর্মাল অ্যাক্টিং-এর কারণেই। জীবেনদা বলতেন : দ্যাখ রবি, চেষ্টা করলে আমিও যে সুরেলা গলায় অভিনয় করতে পারতাম না, তা নয়। তাছাড়া গলার জোরও আমার যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ওভাবে অভিনয় করতে ইচ্ছেই করতে না। আমার সামনে যে তখন দুর্গাদাস উজ্জ্বল একটি নক্ষত্রের মতো বিরাজ করছেন।

তা এই নর্মাল অ্যাকটিং-এর ডিভিডেন্ড জীবেনদা স্টেজ থেকে না পেলেও ফিল্ম থেকে সুদে আসলেই পেয়েছিলেন। ওঁর ফিল্মের অভিনয় দেখে আমার কোন সময়েই মনে হয়নি যে উনি অ্যাকটিং করছেন। একেবারে চরিত্রোপযোগী নর্মাল অ্যাকটিং। এতটুকু কম-বেশি নেই কোনও জায়গায়। তা সেটা

ভালোমানুষের চরিত্রই করুন আর মন্দ মানুষের চরিত্রই করুন।

জীবেনদাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম . আচ্ছা জীবেনদা, আপনি আজ পর্যন্ত কতগুলি ছবিতে অভিনয় করেছেন?

জীবেনদা হাসতে হাসতে বলেছিলেন : সেসব হিসেব রাখিনি ভাই। দুশোও হতে পারে আবার পাঁচশোও হতে পারে। আরে আমি কী আজকের অভিনেতা নাকি! সেই কবে সাইলেন্ট ছবির যুগ থেকে অভিনয় করছি।

এই সাইলেন্ট অর্থাৎ নির্বাক ছবির কথাটা উচ্চারণ করতে জীবেনদা খুব ভালোবাসতেন। অথচ সর্বসাকুল্যে একখানি কী দু'খানি মাত্র নির্বাক ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন।

জীবেনদার প্রথম সবাক ছবি 'অন্নপূর্ণার মন্দির'। না, এটি নরেশ মিত্রের পরিচালনায় উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত যে 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ছবিটি হয়েছিল, সেটি নয়। তার বহু আগে ১৯৩৬ সালে তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনায় এই ছবিটি তৈরি হয়েছিল। ঘটনাচক্রে এটি ছবি বিশ্বাসেরও প্রথম ছবি। বিখ্যাত চরিত্রাভিনেতা ফণী রায়ও এই ছবিতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। স্ত্রী চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছিলেন প্রভা দেবী আর মায়া মুখার্জী। বোধহয় পান্না দেবীও এই ছবিতে ছিলেন।

তা জীবেনদা এই ছবিতে কাজ পেয়েছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী মশাইয়ের আনুকূল্যে। তিনকড়িবাবু পাড়ার ক্লাবে জীবেনদার অভিনয় দেখেছিলেন। জীবেনদারা তখন ভবানীপুরের বাসিন্দা। তিনকড়িবাবুও তাই। পরে তিনকড়িবাবু জীবেনদাকে শিশিরবাবুর থিয়েটারেও দেখেছেন। তাই জীবেনদা যখন তিনকড়িবাবুর শরণাপন্ন হলেন সিনেমায় চান্সের জন্যে, তখন তিনকড়িবাবু তাঁকে বিমুখ করেননি।

সেই শুরু। তারপর থেকে কত অজস্র ছবিতে জীবেনদাকে আমরা দেখেছি। একটি কি দুটি ছবির পর থেকেই তিনি দর্শকদের প্রিয় অভিনেতার তালিকাভুক্ত হয়ে গেলেন। ভালো-মন্দ কত ছবিতে যে তিনি অভিনয় করেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই।

আর এই অভিনয় করতে করতেই একদিন তিনি প্রযোজক হয়ে গেলেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। অর্ধেন্দুদাকে জীবেনদা ঠিক নিজের দাদার মতো শ্রদ্ধা করতেন। অর্ধেন্দুদাও তাই। আমাদের সামনেই তিনি জীবেনদাকে বকাঝকা করতেন। ঠিক যেমন ছোট ভাইকে তার দাদা করে। সবাই বলে বাঙালির পার্টনারশিপের ব্যবসা নাকি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু অর্ধেন্দুদা আর জীবেনদার পার্টনারশিপের আজ প্রোডাকসন্স দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এই কোম্পানি একের পর এক আঠারোটি ছবি প্রযোজনা করেছে। তার বেশির ভাগই হিট। যোগ বিয়োগ, ঢুলী ইত্যাদি ছবি তো লাখ লাখ টাকা লাভ পাইয়ে দিয়েছে। শেষের দিকে কয়েকটি ছবি ভালো চলেনি। তারমধ্যে 'দস্যু মোহন' ছবিটিই সবচেয়ে বেশি দাগা দিয়েছে আজ প্রোডাকসন্সকে। প্রদীপকুমার তখন বোম্বাইয়ের নামকরা হিরো। আনারকলি, নাগিন ইত্যাদি ছবির জন্য প্রদীপকুমারের প্রচণ্ড বাজারদর। সেই প্রদীপবাবুকে নিয়ে 'দস্যু মোহন' করেছিলেন অর্ধেন্দুদা। প্রচুর খরচ হয়েছিল ছবিটির পেছনে। শশধর দত্তের মোহন সিরিজের বইগুলি তখন টপ্ সেলার। আশা ছিল শশধর দত্ত আর প্রদীপকুমারের এই কম্বিনেশন প্রচুর পয়সা দেবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটেনি। সেই ছবিতে আজ প্রোডাকসন্সের প্রচুর লস্ হয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত একদিন আজ প্রোডাকসন্স উঠেই গেল। দেখা গেল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় যে কথা বলতেন সেটাই ঠিক।

শৈলজাদারও একটা সময়ে রমরম বাজার ছিল। নন্দিনী, বন্দী, শহর থেকে দূরে, মানে না মানা—যে ছবিই করছেন তাই হিট। ধুলো ধরছেন আর সোনা হয়ে যাচ্ছে। তাই শৈলজাদা শেষ বয়সে যখন প্রায় নিঃস্ব, তখন আক্ষেপ করে বলতেন : আমাদের সিনেমার পর্দার রঙ তো সাদা। তাই এই শিল্পের ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যতও সাদা। যতক্ষণ ছবি চলছে ততক্ষণ কত রঙ, কত রস, কত উজ্জ্বলতা। শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সব সাদা।

জীবেনদাদের আজ প্রাডাকসন্সের শেষ পর্যন্ত ওই একই গতি হল। সব সাদা। এই দুর্বিপাকের পর জীবেনদা মুষড়ে পড়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু মুখের হাসিটি মেলায়নি তাঁর। হাসতে হাসতে বলতেন : গীতার কথাই একেবারে খাঁটি কথা হে। কাজের দায়িত্ব তোমার। ফলটি স্বয়ং বিধাতার হাতে। তা বিধাতা

যেমন দু'হাত ভরে দিয়েছিলেন, তেমনি দু'হাত ভরে নিয়ে নিয়েছেন। এ নিয়ে আর দুঃখ করে কী লাভ বল।

জীবেনদাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আপনি তো এত ছবিতে অভিনয় করেছেন তার মধ্যে কোন কোন ছবিতে কাজ করে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছেন জীবেনদা?

জীবেনদা বললেন : আমি যদি বুদ্ধিমান মানুষ হই তাহলে নিজেদের প্রোডাকসন্সের কয়েকটা ছবির নাম করা উচিত। কিন্তু আমার তো বোকা বলে একটা বদনাম আছে। তাই নিজেদের কোনও ছবির নাম করতে পারছি না।

আমি বললাম : সে কী জীবেনদা! আপনাদের আজ প্রোডাকসন্সের আঠারোখানা ছবির প্রায় সবগুলোইতে তো আপনি আছেন। আপনার ভালো লাগা চরিত্র তার মধ্যে একটা ছবিতেও নেই?

জীবেনদা বললেন : আন্‌ফরচুনেটলি নট্। এই যে রাশিকৃত ছবিতে অভিনয় করেছি, তার মধ্যে মাত্র তিনটে চরিত্র আমার ভালো লেগেছিল। আর সেইসব চরিত্রে অভিনয় করে তৃপ্তি পেয়েছি।

আমি বললাম : ছবিগুলোর নাম কী?

জীবেনদা বললেন : একটা হল পশুপতিবাবুর ডিরেকশানে 'শেষরক্ষা' ছবিতে গদাইয়ের চরিত্র। নাটকেও আমি ওই চরিত্রে করেছি। কিন্তু ছবিতে করে বেশি তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আর দুটো?

জীবেনদা বললেন : বাকি দুটোর মধ্যে একটা সুধীর মুখার্জির 'শেষ পর্যন্ত' ছবিতে। আর অন্যটা কানন দেবীদের 'নববিধান' ছবিতে।

জীবেনদার সঙ্গে আমি একমত। সত্যিই দারুণ অভিনয় করেছেন জীবেনদা ওই তিনটে ছবির চরিত্রে। কিন্তু তাছাড়া আরও অনেক ভালো অভিনয় দেখা গেছে জীবেনদার। কিন্তু কেন জানি না, জীবেনদা সেগুলির নাম করলেন না। তা না করতে পারেন। এটা তো তাঁর ব্যক্তিগত ভালো লাগার ব্যাপার।

জীবেনদা যে কত বড় অভিনেতা ছিলেন তা এই সেদিন তাঁর ছোট মেয়ে মামণির সঙ্গে গল্প করতে করতে বুঝতে পারলাম। 'নববিধান' ছবিতে জীবেনদা যে চরিত্র করেছিলেন তা গুরুবাদের প্রতি বিরক্ত একটি মানুষের। ওই ছবির নায়ক-নায়িকা ছিলেন কমল মিত্র আর কানন দেবী। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার শিশু সন্তানকে মানুষ করার জন্য কমলদা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন পল্লীবালা ঈশ্বর বিশ্বাসী কানন দেবীকে। শিশু সন্তানটির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শ্রীমান বিভু। কানন দেবী স্বামীগৃহে এসে বিভুকে পরম স্নেহে বুকে তুলে নেন। অগোছালো সংসারে শান্তি ফিরে আসে।

এটা আবার ইঙ্গবঙ্গীয় ভাবাপন্ন কমলদার বোন মঞ্জু দে-র ভালো লাগে না। বলা যায় তাঁরই চক্রান্তে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটে। অভিমানে কানন দেবী পিতৃগৃহে ফিরে যান।

জীবেনদা করেছিলেন এই সংসারের শুভানুধ্যায়ী একটি মানুষের চরিত্র। তিনি এবং মঞ্জু দে-র স্বামী জহর গাঙ্গুলি কানন দেবীর পক্ষে।

শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর প্রতি কমলদার মনেও অভিমান ঘনিয়ে ওঠে। তিনি সেই অভিমানের বশে এক ভণ্ড গুরুদেব গঙ্গাপদ বসুর কাছে দীক্ষা নিতে মনস্থ করেন। তাঁর ছেলেকেও সেই কৃচ্ছ্রসাধনের পথে টেনে নেন। নিজের সব সঙ্গতি গুরুদেবের পায়ে উৎসর্গ করার মনস্থ করেন। জীবেনদা এ কাজে বাধা দিতে গিয়ে অপমানিত হন। শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ি থেকে কানন দেবীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে এই ভণ্ড গুরুর হাত থেকে সংসারটাকে বাঁচান।

ওই ছবিতে জীবেনদার অভিনয় দেখে মনে হয়েছিল জীবেনদা এইসব গুরুবাদের বিপক্ষে। কিন্তু মামণির কাছে শুনলাম উল্টো ঘটনা। ঠিক ওই 'নববিধান' ছবির মতোই জীবেনদা তাঁর গুরুদেব বেনীমাধবের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ওঁদের দক্ষিণেশ্বরের বাড়িতে তিন-চারদিন ধরে প্রচণ্ড ধুমধাম করে সেই দীক্ষাগ্রহণ কর্মটি ঘটেছিল। গুরুদেবের প্রায় চার-পাঁচশো শিষ্য সে ক'দিন এ-বাড়িতে ছিলেন এবং জীবেনদার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়েছিল।

ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। যাঁর গুরুবাদে প্রচণ্ড বিশ্বাস, তিনি কিনা 'নববিধান' ছবিতে একেবারে বিপরীত ধরনের চরিত্রে অমন অসাধারণ অভিনয় করলেন। তবে মামণির মুখে শুনলাম জীবেনদার গুরু বেনীমাধব মানুষটি খুবই সৎ। সত্যিকারের ভক্তিভাবাপন্ন। তাই জীবেনদা তাঁকে গুরু বলে মেনেছিলেন।

এটা হতেই পারে। সৎ গুরুর সংখ্যা তো আমাদের দেশে কম নেই যাঁরা মানুষকে সঠিক পথে চালিত করেন। আমিও একজন গুরুকে জানি যিনি এই প্রকৃতির। তাঁর নাম স্বামী শুভানন্দ। তিনি মঞ্জু দে-র গুরু ছিলেন। সত্যিকারের নিষ্ঠাবান ভগবদ্‌ভক্ত একজন মানুষ। এরকম গুরু আমাদের দেশে নিশ্চয় আরও অনেক আছেন। তবে দুঃখের কথা, কিছু ভণ্ড মানুষের জন্য গুরুবাদে কলঙ্ক লেপিত হচ্ছে। মামণির মুখে যখন শুনলাম তাঁর বাবার গুরু বেনীমাধব মানুষটি ভালো তখন পুলকিত হলাম। জীবেনদা কোনও ভণ্ডের পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করেননি।

এছাড়া শেষ জীবনে বালক ব্রহ্মচারীর প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বালিশের নিচে তাঁর ছবি রেখে নিদ্রা যেতেন।

আমি মামণিকে জিজ্ঞাসা করলাম : তোমার মা রাধারানী দেবীর এসব ব্যাপারে আপত্তি হয়নি?

মামণি বললেন : আমার বাবা আর মা দু'জনে দু'জনের খুব অনুগত ছিলেন। দু'জনে দু'জনকে খুব ভালোবাসতেন। বাবা সিনেমা করতেন বটে, কিন্তু বাড়িতে তার কোন ছোঁয়াচ লাগতে দিতেন না। আমাদের বাড়িতে উত্তমকুমার থেকে শুরু করে অনেক আর্টিস্টই এসেছেন। কিন্তু আমরা কেউ তাঁদের সামনে যেতাম না। আড়ালে থেকেই তাঁদের যা কিছু আপ্যায়ন করতাম। এসব ব্যাপারে বাবা একটু পিউরিটান ছিলেন।

আমি বললাম : তোমরা বাবার শুটিং দেখতে যেতে না?

মামণি বললে : একদম না। একবার শুধু বাবা সঙ্গে করে আমাদের বাড়ির সবাইকে শুটিং দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। লোকে যেমন ভিক্টোরিয়া বেড়াতে যায়, তেমনি আর কি।

এবারে আনন্দবাজার পত্রিকায় জীবেনদার ভুল মৃত্যু-সংবাদ ছাপার পর ওঁদের ফ্যামিলিতে তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেই ঘটনাটা বলি।

মামণি বললে : আগের দিন রাত্রে আমি আর দিদা মেডিক্যাল কলেজে বাবাকে সুস্থ দেখে এসেছি।

আমি ওর কথায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : দিদা মানে জীবেনদার মা? ওঁর তো তাহলে তখন অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছে?

মামণি বললে : না। এই দিদা আমার মায়ের মা। উনি আমাদের কাছেই থাকতেন। মা ওঁর একমাত্র মেয়ে তো, তাই মাকে ছেড়ে দিদা থাকতে পারতেন না। আমার ঠাকুমা তার অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন।

আমি বললাম : তারপর কী হল বল।

মামণি বললে : পরের দিন খুব সকালে উঠে আমি আর দিদা মেডিকেল কলেজে চলে গেছি। সকালে কাগজটাও পড়া হয়নি। মেডিকেল কলেজে গিয়ে দেখি দলে দলে লোক আসছে ফুল-টুল নিয়ে। আনন্দবাজারে নাকি বাবার মৃত্যু-সংবাদ দেখে তাঁরা এসেছেন। বাবা তখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার যে দিদি হাজরা রোডে থাকেন তিনি তো ট্যাক্সি থেকে নেমে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আমার কাছে বাবা সুস্থ আছে শুনে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু তখনও তাঁর শরীরের কাঁপুনি থামছিল না। কী কাণ্ড বলুন তো! এমন ভুল খবর শুনে মানুষ তো হার্টফেল করে যেতে পারতো?

আমি বললাম : তা ঠিক। তবে আনন্দবাজার তো আর এটা ইচ্ছা করে করেনি। ওঁরা একটা চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। তা এই খবরটা শুনে তোমার মায়ের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

মামণি বললে : ওটা মেডিকেল কলেজে বসে জানতে পারিনি। বাড়িতে এসে শুনেছিলাম। আমাদের বাড়িতে খবরের কাগজ আসার আগেই পাড়ার লোকেরা মাকে দুঃসংবাদটা জানিয়েছিল। মা শুনে বলেছিলেন, এটা আমি বিশ্বাস করি না। এটা কক্ষনো হতে পারে না। আমার আগে উনি যেতেই পারেন না। শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে আমি আগে যাব, তারপর উনি যাবেন। তাছাড়া আমার মা আর মেয়ে হসপিটালে গেছে। তেমন কিছু ঘটলে তারা এতক্ষণে ছুটে আসত। তা সত্যিই আমরা মায়ের কথা ভেবে ট্যাক্সি

করে ছুটে এসেছিলাম। মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তোমার মা কোন্ সালে গত হয়েছেন?

মামণি বললে : নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে। মা মারা যাবার পর বাবা একেবারে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, ওই দ্যাখ তোদের মা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আগের মতো হাসছে। সংসার খরচের টাকা চাইছে। আসলে আমাদের সংসারটা তো মা-ই চালাতেন। বাবা তো টাকা দিয়েই খালাস। মাঝে মাঝে সেই টাকা আবার ঝেড়েমুছে নিয়েও নিতেন। কোনও আত্মীয় হয়তো বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। বাবা বললেন, রাধা ওকে পাঁচশোটা টাকা দিয়ে দাও তো। মা বিনা বাক্যব্যয়ে টাকা দিয়ে দিতেন। আত্মীয়টি চলে যাবার পর মা বলতেন, তুমি তো আমার কাছে পাঁচশো টাকাই রেখেছিলে। তার সবটাই যদি দিয়ে দিলে তো সংসার চলবে কী করে? বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, ও তুমি চালিয়ে নাও যেমন করে হোক। তুমি হলে গিয়ে সংসারের লক্ষ্মী। তোমার হাতে সংসার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। তা মা সংসারটা ঠিক ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতেন। অভাব কাকে বলে তা একটা দিনের জন্যেও কাউকে বুঝতে দেননি।

আমি বললাম : মা মারা যাবার কতদিন পরে জীবেনদা গেলেন?

মামণি বললে : তারপর আর মাত্র সাত মাস বাবা বেঁচেছিলেন। তবে সেটাও ওইরকম অর্ধমৃত অবস্থায়। মৃত্যুর আগে তিন মাস জ্বরে ভুগলেন। ডাক্তারেরা ভালো করে ধরতেই পারল না অসুখটা।

বলতে বলতে চোখ দুটো মুছে নিল জীবেনদার আদরের ছোট মেয়ে মামণি ওরফে শতদল বসু। যে তার বাবার স্মৃতি আঁকড়ে এখনও এই বাড়িতে পড়ে আছে। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একই লড়াই করে চলেছে।

জীবেনদার মৃত্যুতে আমি খুব বেদনাবোধ করেছিলাম। কিন্তু শতদলের সঙ্গে কথা বলার পর আমার মনে আর কোনও বেদনা নেই। তার কারণ, আমি জানি পরপারে গিয়ে জীবেনদা নিশ্চয় রাধা বউদির সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং তাঁরা পরম শান্তিতে একত্রে বসবাস করেছেন। অত গভীর ভালোবাসা কি কখনও বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে।

তুলসীদা

হাতি যেমন নিজের শরীরটাকে দেখতে পায় না, নিজের ক্ষমতার পরিমাপ করতে পারে না, আমাদের কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীরও ছিল ঠিক সেই অবস্থা। তাঁর নিজের মধ্যে যে কী পরিমাণ অভিনয়ের ক্ষমতা ছিল, তা তিনি কিছুতেই বুঝতে চাইতেন না। আমরা বোঝাবার চেষ্টা করলে বলতেন : ওরে বাবা, আমি আবার অভিনেতা হলাম কবে! নিজের যা বিদ্যেবুদ্ধি তাতে অন্য কিছু করে তো অন্ন জুটবে না। তাই পেটের দায়ে থিয়েটার-বাইশকোপে পেছন নাচাই। একে কি অভিনয় বলে নাকি!

তা আমার তখন ইয়ং ব্ল্যাড। ১৯৫৬-৫৭ সালের কথা এটা। সবে তিরিশের কোঠায় পা দিয়েছি। রক্তের মধ্যে তার্কিক প্রবৃত্তিটা টগবগ করে ফুটছে। তুলসীদার ওই কথাগুলির মধ্যে যে একটা বিনয়ের ভাব আছে, সেই সুরটা কানে ধরা পড়ত না। তাই সমানে তর্ক চালিয়ে যেতাম তাঁর সঙ্গে। বলতাম: এ আপনি কী বলছেন তুলসীদা! আপনার অভিনয়টাকে যে কখনই অভিনয় বলে মনে হয় না, এটাই তো একজন বড় মাপের অভিনেতার লক্ষণ। এ কথাটাকে আপনি অস্বীকার করবেন কেমন করে?

আমার কথা শুনে তুলসীদা মৃদু মৃদু হাসতেন। বলতেন : ওরে বাবা, আমি হলাম গিয়ে হেঁসেলবাড়ির হলুদের মতো। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সবেতেই আছি। হাসতে বলো হাসব, কাঁদতে বলো কাঁদব, নাচতে বলো নাচব, দু'কলি গান গেয়ে দিতে বলো, তাও পারব। হলুদ যেমন সব ব্যঞ্জনেই থাকে তেমনি আর কী! কিন্তু হলুদের কি নিজের কোনও সোয়াদ আছে? তাই এগুলোকে আমি অভিনয় বলি না ভাই। হ্যাঁ, অভিনেতা ছিলেন বটে আমার গুরু অপরেশ মুখুজ্যে। আহা। কী সব অভিনয় তাঁর দেখেছি গো! দিনরাত আমাদের মতো সব গাধাকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘোড়া বানাবার চেষ্টা করতেন। অমন মানুষ আর হয় না।

বলতে বলতে তুলসীদা দু'কানে হাত দিয়ে করজোড়ে নমস্কার জানাতেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা পরিচালক এবং নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

হ্যাঁ, এই অপরেশচন্দ্রের দৌলতেই তুলসীদা একজন বড় অভিনেতা হতে পেরেছিলেন। তিনিই ওঁকে গড়েপিটে চরিত্রাভিনেতা তৈরি করেছিলেন। আর এই তুলসীদার হাত ধরেই আর একটি মানুষ অপরেশচন্দ্রের পায়ের কাছে এসে বসতে পেরেছিলেন, যাঁকে নিয়ে বাংলা থিয়েটার এবং সিনেমা গর্ববোধ করতে পারে। তিনি হলেন সর্বজনপ্রিয় জহর গাঙ্গুলি। আমাদের সুলালদা।

এই সুলালদার সঙ্গে মাঝে মাঝেই তুলসী চক্রবর্তীকে নিয়ে আলোচনা হত। সুলালদা বলতেন : চক্কোত্তি না থাকলে আমি তো অপরেশচন্দ্রের কাছেই পৌঁছতেই পারতাম না কোনওদিন। তোরা তো জানিস না, আমাকে স্টার থিয়েটারে ঢোকাবার জন্যে ও স্যারের পায়ে পর্যন্ত ধরেছে।

অপরেশচন্দ্রকে সুলালদা 'স্যার' বলেই উল্লেখ করতেন। তিনি স্যারের কথা বলতে গিয়ে ঘন ঘন কপালে হাত ঠেকাতেন।

সুলালদার কথা শুনে আমি বিস্ময়ে আভিভূত হয়ে গেলাম। বললাম : বলেন কী সুলালদা, তুলসীদা আপনার জন্যে অপরেশচন্দ্রের পায়ে ধরেছিলেন?

সুলালদা বললেন : তবে আর বলছি কী। আমি তখন গ্রাম থেকে এসে অন্য কোথাও হালে পানি না পেয়ে মিত্র থিয়েটারে ভিড়ের দৃশ্যে অভিনয় করবার চান্স পেয়েছি। কিন্তু সেখানে ছোট অভিনেতা বলে মালিকদের কাছ থেকে নয়, অন্যান্য অভিনেতাদের কাছ থেকে কী নিদারুণ ব্যবহার যে পেতাম তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না। আমাকে চাকর-বাকরেরও অধম চোখে দেখতে তারা। সেই সময় আলাপ হল চক্কোত্তির সঙ্গে।

সুলালদা আর কার সামনে তুলসীদাকে কী নামে সম্বোধন করতেন তা আমি জানি না। কিন্তু আমার

সামনে 'চক্কোত্তি' বলেই উল্লেখ করতেন। তা সুলালদার কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তুলসীদাও কি তখন মিত্র থিয়েটারে অভিনয় করতেন?

সুলালদা বললেন : না না, ও ছিল স্টার থিয়েটারে। আমাদের ওই মিত্র থিয়েটারে মাঝে মাঝে আসত স্টার থিয়েটারে ওর পার্ট শেষ হয়ে গেলে। তখনই আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। আমাদের দুজনের মধ্যে সুখ-দুঃখের কথা হত। আমি যে কী কষ্টে, একবেলা খেয়ে আর একবেলা না খেয়ে কলকাতা শহরে দিন কাটাচ্ছি, সেটা ও জানত। আমার জন্যে খুব ফিল করত।

আমি বললাম : তারপর? সেই পায়ে ধরার ব্যাপারটা কখন হল?

সুলালদা বললেন : অত তাড়া দিচ্ছিস কেন? একটু গুছিয়ে বলতে দে না।

এই বলে সুলালদা তাঁর পানপাত্রে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে মুখটা মুছে নিলেন। কপালে অল্পস্বল্প ঘাম জমেছিল, সেটাও মুছে নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন।

সুলালদা বললেন · একদিন রাত্রে মিত্র থিয়েটারে সহকর্মীদের নিষ্ঠুর ব্যবহারে চোখে জল এসে গেল আমার। সেই সময় সেখানে চক্কোত্তির আবির্ভাব। ওকে দেখে চোখের জল আর চোখে রইল না, দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। তা দেখে চক্কোত্তি খানিকটা গুম্ হয়ে রইল। তারপর বলল : তুই একবার কাল বিকেলের দিকে স্টার থিয়েটারে আসতে পারবি? আমাদের কাল রিহার্সাল আছে। আমি তোকে একবার অপরেশবাবুর সামনে নিয়ে যাব। তোর জন্যে বলব। কী হবে না হবে জানি না, তবে একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী! এখানে থাকলে তুই তো গঞ্জনা শুনতে শুনতেই মরে যাবি।

আমি বললাম : তা আপনি পরের দিন স্টার থিয়েটারে গেলেন?

সুলালদা বললেন : গেলাম মানে কী রে! যদি সেই রাত্রেই যেতে বলত তো তাই যেতাম। সেই রাত আর পরের দিন বিকেল পর্যন্ত যে কী উৎকণ্ঠায় কেটেছে তা তোকে কী বোঝাব। ঘড়ির কাঁটা যে কত আস্তে চলে তা আগে জানা ছিল না। কাঁটা যেন ঘুরতেই চাইছিল না।

বলতে বলতে আবার একপ্রস্থ চুমুক দিলেন সুলালদা তাঁর পানপাত্রে।

আমি বললাম : অত ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছেন কেন। চট্ করে নেশা ধরে যাবে যে!

সুলালদা বললেন : চক্কোত্তির কথা উঠলে আমার আর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না রে। ওই লোকটা না থাকলে তোরা জহর গাঙ্গুলিকে কোনওদিন পেতিস কি না সন্দেহ। হয়তো মিত্র থিয়েটারে সেই ইঁদুরের গর্তেই পড়ে থাকতে হত বাকি জীবনটা।

আমি বুঝতে পারলাম, পানীয়ের প্রভাবে নয়, সুলালদা একটু বেশি পরিমাণে ইমোশ্যনাল হয়ে পড়েছেন তুলসী চক্রবর্তীর প্রসঙ্গে। বললাম : তারপর কী হল বলুন।

সুলালদা বললেন : পরের দিন বিকেলে গিয়ে দেখি চক্কোত্তি আমার জন্যে স্টার থিয়েটারের গেটের মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। সারা মুখে উৎকণ্ঠা। বললে : এত দেরি করতে হয়। আমাদের রিহার্সাল কখন শুরু হয়ে গেছে! অপরেশ মুখুজ্যের রিহার্সালে দু'মিনিট দেরি করে এলেও তাকে কথা শুনতে হয়।

এই বলে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে অপরেশবাবুর সামনে হাজির করল চক্কোত্তি। একগাল হেসে বললে : এই যে স্যার, এই ছেলেটিকে এনেছি আপনার কাছে।

চক্কোত্তির কথা শুনে ভুরু কুঁচকে তাকালেন অপরেশচন্দ্র। বললেন : ছেলেটিকে এনেছো মানে? একে নিয়ে কী করব? জামাই করতে হবে?

চক্কোত্তি বললে : না স্যার! ওকে নিয়ে এলাম অভিনয় করতে। মিত্র থিয়েটারে পড়ে পড়ে সকলের থাসুনি খাচ্ছিল। তা আমিই ওকে বললাম, ওরে, স্যারের কাছে চল্। একবার যদি তিনি তোকে পায়ে ঠাঁই দ্যান, তবে গোজন্ম থেকে উদ্ধার হয়ে যাবি!

অপরেশবাবু বললেন : খুব তো তৈলমর্দন করতে শিখেছো দেখছি। তা আমি কি তোমাকে বলেছিলাম একটা ছেলে ধরে নিয়ে আসতে? না না, আমার নতুন নাটকে কোনও নতুন ছেলের দরকার নেই।

সুলালদা বললেন : অপরেশবাবুর কথা শুনে আমি তো চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। কিন্তু চক্কোত্তি কী করলে জানো! ঝপ্ করে বসে পড়ে অপরেশচন্দ্রের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠল :

এই আপনার পায়ে পড়ছি স্যার! ছেলেটাকে একটু চান্স দিয়ে দেখুন। ও খুব দুঃখী ছেলে স্যার। খুব ভালো ছেলে। আপনি একটু পায়ে ঠাঁই দিলে ও চিরকাল আপনার গোলাম হয়ে থাকবে।

তুলসীদার ওই কাণ্ড দেখে অপরেশবাবু খুব বিব্রত হয়ে পড়লেন। বলে উঠলেন : আরে করো কী! করো কী! পা ছাড়ো। ঠিক আছে, তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে বসাও। রিহার্সালের পর আমি ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলব।

সুলালদা বললেন : বুঝলি রবি, সেদিন পেছনের দিকে বসে আমি আবার একবার কেঁদে ফেলেছিলাম। অপরেশবাবুর কাছে কাজ হবে কি না হবে তা আমি জানি না, কিন্তু চক্কোত্তি আমার জন্যে যা করল তার ঋণ শোধ করব কেমন করে!

বলতে বলতে সেই মুহূর্তে সুলালদার চোখ দুটো আবার চিক্ চিক্ করে উঠেছিল। গলাটাও বোধহয় ধরে এসেছিল। তাই গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে সুলালদা বললেন : অথচ ভাগ্যের কী পরিহাস দ্যাখ্। যার জন্যে সেদিন পায়ে ধরল সেই ছেলেটাই পরবর্তী কালে হিরো হয়ে গেল, আর চক্কোত্তি সারা জীবন হিরো অথবা হিরোইনের বাড়ির চাকর হয়েই কাটিয়ে দিলে। অথচ কী পাওয়ারফুল অ্যাক্টর জানিস তুলসী চক্রবর্তী? ওর পাশে দাঁড়িয়ে কী স্টেজে আর কী ফিল্মে অ্যাকটিং করতে গিয়ে চিরটাকাল আমার বুক কেঁপেছে।

সুলালদার ওই কথায় অনেকদিন আগে দেখা রঙমহল থিয়েটারের একটি নাটকের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেল। নাটকটির নাম 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের লেখা। নাটকটি আগে একাধিকবার কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। আমি রঙমহলে ওই নাটকটি দেখেছিলাম চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি একটা সময়ে।

সুলালদা অর্থাৎ জহর গাঙ্গুলি ছিলেন ওই নাটকের নায়ক মানস মুখার্জি। নায়িকা নীহারিকা করেছিলেন শান্তি গুপ্তা। আর তুলসী চক্রবর্তী করেছিলেন গ্রামের জমিদার দামোদরের ভূমিকাটি। তাঁর স্ত্রী মানময়ীর চরিত্র করেছিলেন বেলারাণী। আর চপলা ও রাজেন বাড়ুরির চরিত্র দুটি করেছিলেন যথাক্রমে পূর্ণিমা দেবী ও সন্তোষ সিংহ। এঁদের মধ্যে একমাত্র পুনিদি ছাড়া আর সবাই এখন পরলোকে।

যাই হোক আবার নাটকের কথায় আসি। তখনকার দিনে স্টেজ প্লে-তে ইনডিভিজুয়াল অ্যাকটিংয়ের প্রাধান্য থাকত। টিমওয়ার্কের তোয়াক্কা না করে যে যার নিজের কেরামতি দেখাতেই সচেষ্ট থাকতেন বেশি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সেদিনের অভিনয়ে টিমওয়ার্কের প্রাধান্যই দেখা যাচ্ছিল।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয়। এর আগে তাঁকে আনেক ছবি আর নাটকে দেখেছি। ছোট ছোট রোল করেন। কিন্তু 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকে তাঁর ভূমিকাটি বেশ বড়। এবং কিছুটা ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। পুরো নাটকটিতে বেশ কিছু কমেডির প্রাধান্য। দামোদরের চরিত্রটিও তাই। একটু স্ত্রৈণ হলেও জমিদার তো। সুতরাং কমেডির মধ্যেও জমিদারসুলভ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে হয়। তুলসীদা দারুণ অভিনয় করছিলেন চরিত্রটিতে। সুলালদা হিরো হওয়া সত্ত্বেও তুলসীদার অভিনয়ের কাছে পাত্তা পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎ নাটকের একটা জায়গায় সুলালদা একটু এক্সটেম্‌পো দিয়ে তুলসীদাকে বিপাকে ফেলতে চাইলেন। নাটকে মানস আর নীহারিকা চাকরির খাতিরে স্বামী-স্ত্রী সেজে থাকে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও রকম দাম্পত্যসুলভ ঘনিষ্ঠতা নেই। বরং কথায় কথায় তর্ক-বিতর্ক হয়। সেদিনও সেই রকম কথা কাটাকাটি চলছে। হঠাৎ সেখানে জমিদারমশাই এসে গেলেন। সুতরাং তাঁর সামনে ওরা যে কেমন সুখী দম্পতি সেটা প্রকাশ করতেই হবে। সেইজন্যে নীহারিকা হঠাৎ গদগদ ভঙ্গিতে স্বামী মানসকে জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যাঁ গা, আজ বেগুন কত করে সের নিয়েছে গো?

মূল নাটকে ছিল, মানস বলবে : বেগুনের সের চার পয়সা।

এটা তার মনগড়া কথা। কারণ তারা ছাড়ো ছাড়ো ভাবে দাম্পত্যজীবন কাটাচ্ছে। বাড়িতে রান্নাবান্না তো হয় না। তাই বেগুনের দাম জানবে কেমন করে। সুতরাং মনগড়া একটা দাম হিসেবে চার পয়সাই বলে ফেললে।

এর উত্তরে জমিদার বলবে : সে কী! যে বেগুনের দাম এক পয়সা সের, সেটা তোমার কাছ থেকে

চার পয়সা নিয়েছে। আমারই বসানো বাজারে এতবড় জোচ্চুরি। চলো তো সেই বেগুনওলার কাছে!

কিন্তু সুলালদা সেদিন বেগুনের দামের ক্ষেত্রে মূল নাটকের বাইরে চলে গেলেন। কলকাতার বাজারে সেই সময় বেগুন চোদ্দ আনা করে সের যাচ্ছিল। খবরের কাগজে লেখালেখিও চলছিল বেগুনের দুর্মূল্য নিয়ে। সুলালদা সেই মুহূর্তে বেগুনের দাম মূল নাটকের সংলাপ চার পয়সার জায়গায় চোদ্দ আনা বলে একই সঙ্গে দর্শকের হাততালি আর তুলসীদাকে কথার প্যাঁচে ফেলে নাজেহাল করতে চাইলেন।

ঠিক এই মুহূর্তে যে কোনও শিল্পীর থতমত খেয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তুলসীদা একটুও থতমত না খেয়ে বলে উঠলেন : সে কী! যে বেগুনের দাম চোদ্দ পয়সা সের, সেটা তোমার কাছ থেকে চোদ্দ আনা নিয়েছে! আমারই বসানো বাজারে এতবড় জোচ্চুরি! চলো তো সেই বেগুনওলার কাছে!

এই বলে সুলালদাকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তুলসীদা হিড়হিড় করে টানতে টানতে স্টেজের বাইরে নিয়ে চলে গেলেন। মূল নাটকে কিন্তু মানসকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছিল না। বরং আরও কিছু ডায়লগ ছিল। কিন্তু তুলসীদা সুলালদার এক্সটেমপোর ওপরে আরও এককাঠি এক্সটেমপো দিয়ে তাঁকে স্টেজের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেললেন।

এই হলেন তুলসীদা। যত বড় অভিনেতাই হোন না কেন, তুলসীদাকে প্যাঁচে ফেলতে গেলে তাঁর হাতে তাঁকে নাজেহাল হতেই হবে।

ওই ঘটনার উল্লেখ করলে সুলালদা বললেন : ওরে বাবা! সে কথা মনে নেই আবার! সেদিন আমি চক্কোত্তির সামনে নাক-কান মলা খেয়ে বলেছিলাম, আর কোনওদিন তোর সঙ্গে টক্কর দিতে যাব না। যাইওনি কোনওদিন।

ওসব কথা থাক। আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সুলালদাকে জিজ্ঞাসা করলাম : এই যে আপনি হিরো আর তুলসীদা হিরোর বাড়ির চাকর, এ ব্যাপারটা আপনাদের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কোনও চিড় ধরায়নি কোনওদিন?

সুলালদা বললেন : একদম না। অন্য কোনও মানুষের ক্ষেত্রে হয়তো ধরাত। কিন্তু চক্কোত্তি এমন একজন বড় মাপের মানুষ, এমন তার হৃদয়ের উদারতা, যে ওসব ছোটখাটো ব্যাপার তার কাছে পাত্তাই পেত না। যদিও ওর সম্পর্কে আমার একটা আড়ষ্টতা বরাবরই ছিল। ওর সঙ্গে দেখা হলে ভালো করে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারতাম না। কিন্তু চক্কোত্তি ছিল অন্য ধাঁচের মানুষ। উল্টে বরং ও মাঝে মাঝেই আমাকে ঠাট্টা করে বলত : কী হে সুলালবাবু, আজকাল তো তুমি বড়ই ব্যস্ত, দিনরাত কাজ করছ, দোহাত্তা রোজগার হচ্ছে। দেখো ভাই, আমাদের মতো অভাজনদের যেন একেবারে ভুলে-টুলে যেও না।

সুলালদা বলতেন : এমন রসিকতা চক্কোত্তিরই করা সাজে। এসব কথা বলতে বলতে হাসিতে ওর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। বুঝতে পারতাম, আমার সাকসেসটা যেন ওর নিজেরই সাকসেস। এমনই ছিল ওর নির্মল হৃদয়।

বলতে বলতে সুলালদার দু'চোখে আবার জল এসে যেত। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ সুলালদার সঙ্গে যখন এসব কথা হচ্ছিল, তার কয়েক মাস আগেই তুলসীদা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

তবে সুলালদা ওই যে বললেন, নির্মল হৃদয়, তুলসীদার সত্যিই ছিল তাই। সে পরিচয় আমি নিজেও কয়েকবার পেয়েছি। কিন্তু সেসব কথা আপাতত থাক। তার আগে তুলসী চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনটায় ফিরে যাই।

সেটা বোধহয় ১৯৫২ সালের গোড়ার দিক। তখন আমি অধুনালুপ্ত 'রূপাঞ্জলি' পত্রিকার একজন কনিষ্ঠ সাংবাদিক। ওই রূপাঞ্জলি পত্রিকার উদ্যোগে যে ঘটা করে সরস্বতী পুজো হত তার কথা আমি এর আগে অনেকবার বলেছি নানা উপলক্ষে। ওই পুজোর উদ্যোক্তা রূপাঞ্জলি পত্রিকা, কিন্তু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সব ছেড়ে দেওয়া হত শিল্পীদের ওপর। ওই উপলক্ষে স্টেজ ও ফিল্মের ছোট বড় সব শিল্পীকেই পত্রদ্বারা আমন্ত্রণ জানানো হত। যাঁদেরকে সম্ভব সামনাসামনি হয়ে পত্রটি ধরিয়ে দেওয়া হত, আর যাঁরা একটু দূরে থাকতেন তাঁদের কাছে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হত।

তা সেবার তুলসী চক্রবর্তী মশাইয়ের আমন্ত্রণপত্রটা নিয়ে খুবই মুশকিলে পড়া গেল। দুর্ভাগ্যবশত তুলসীদা তখন কোনও স্টেজের সঙ্গে যুক্ত নয়। বাংলা থিয়েটারের তখন খুবই ভগ্নদশা। নিয়মিত মঞ্চগুলি সবই আছে, কিন্তু তার পাদপ্রদীপের আলোগুলি নিয়মিত জ্বলে না। একের পর এক কম্বিনেশন নাইট করে কোনও রকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে মাত্র।

আমাদের পত্রিকার সম্পাদক সুধাংশু বকসী মশাই বললেন : কী আর করবে! তুলসীবাবুর চিঠিখানা পোস্টেই পাঠিয়ে দাও ওঁর হাওড়ার ঠিকানায়।

সে ঠিকানাটা এখন আর আমার মনে নেই। কারণ সেই প্রথম ও শেষবার আমি ওই ঠিকানায় গিয়েছিলাম তুলসী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে। আর কেন যাইনি তার কারণটাও পরে বলছি।

তা সুধাংশুবাবুর কথা শুনে আমি বললাম : ঠিকানা যখন আছে তখন আমি একবার যাই না কেন!

সুধাংশুবাবু বললেন : আবার কষ্ট করে অতদূর যাবে। ডাকে পাঠিয়ে দিলেই তো চলত।

আমি বললাম : এ তো আর বিলেত না, বাড়ির পাশেই হাওড়া। আমি বরং ঠিকানা খোঁজ করে ওঁর হাতেই চিঠিটা দিয়ে আসি। উনি খুশি হবেন।

সুধাংশুবাবু আমার কথা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন : তোমার দেখছি আর্টিস্টদের সামনাসামনি হবার বড় শখ!

আমি বললাম : বা রে। যে মানুষগুলির ছায়া-শরীরটাকে দেখবার জন্য কত মানুষ সিনেমা হলের সামনে লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে ছোটে, আর আমি ওঁদের কায়া-শরীরটাকে দেখতে পাবার সুযোগ পেয়েও যাব না!

তা একটা রবিবার বিকেলে অনেক খুঁজেপেতে, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে তুলসী চক্রবর্তীর হাওড়ার আস্তানা খুঁজে বার করলাম। কিন্তু ওখানে যাবার পর বিস্ময়ে থ মেরে গেলাম। যে মানুষটিকে আমি ছবির পর্দায় আজন্মকাল দেখে আসছি, কতবার থিয়েটারে তাঁর অভিনয় দেখেছি, সেই মানুষটি এমন একটা দৈন্যদশার মধ্যে যে থাকতে পারেন, সেটা তো কল্পনা করতে পারিনি।

তুলসী চক্রবর্তীর ছেলেবেলাটা খুব এলোমেলো ভাবে কেটেছে। ওঁর বাবা আশুতোষ চক্রবর্তী রেলে কাজ করতেন। ঘোরাঘুরির চাকরি। তাই বালক তুলসীকে জোড়াসাঁকোয় ওঁর জ্যাঠামশাই প্রসাদ চক্রবর্তীর কাছেই থাকতে হত বেশিরভাগ সময়। প্রসাদবাবুর হারমোনিয়াম বাজানোয় বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁর একটা অর্কেস্ট্রা গ্রুপও ছিল। পরে তিনি স্টার থিয়েটারে অর্কেস্ট্রা গ্রুপে চাকরিও করেছেন বেশ কিছুদিন।

ভালো করে জ্ঞান হবার আগেই তুলসীদার বাবা একদিন হঠাৎ মারা গেলেন। সামান্য যেটুকু লেখাপড়া শিখছিলেন, সেটাও একদিন বন্ধ করে দিতে হল। শুরু হল নোঙরছেঁড়া জীবন।

এসব তথ্য কিন্তু তুলসীদার সঙ্গে সেই প্রথম আলাপের দিন জানতে পারিনি। পরে জেনেছিলাম আস্তে আস্তে। তার বেশিরভাগটাই স্টাব থিয়েটারে বসে। না, গ্রিনরুমে নয়। গ্রিনরুমের লাগোয়া যে গেস্টদের সঙ্গে কথা বলার ঘর ছিল, সেখানে বসেও নয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তুলসীদা এসে বসতেন গেস্টরুমের উল্টোদিকে একটি রোয়াকে। সেখানে বসেই বিশ্রাম নিতে ভালোবাসতেন তিনি।

আমিও সুযোগ পেলেই তাঁর কাছে এসে বসতাম। থিয়েটারপাড়ার পুরনো দিনের কথা শুনতাম। শুনতাম তাঁর ছেলেবেলাকার কথা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার কলকাতা শহরের চেহারাটা আমার চোখের সামনে ছবির মতো আঁকা হয়ে যেত তুলসীদার মুখের বর্ণনা শুনতে শুনতে। তুলসীদা তো আর আমাদের এই শতাব্দীর মানুষ নন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৯৯ শতাব্দীতে। মাত্র একটি বছরের জন্য তিনি উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরাধিকার পেয়ে গেলেন, যে শতাব্দীটি আমাদের কাছে পরম গৌরবের। ওই শতাব্দীতে আমরা পেয়েছিলাম রামমোহন-বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্র প্রমুখ যুগন্ধর পুরুষদের।

ওইখানেই বসেই একদিন তুলসীদাকে প্রশ্ন করেছিলাম : আপনি তো বলছেন ছেলেবেলায় ভালো করে লেখাপড়া শেখার সুযোগ হয়নি। তাই বুঝি অন্য কোথাও চাকরি বাকরি না পেয়ে অভিনয় করতে চলে এলেন?

তুলসীদা বললেন : চাকরি করিনি বলছ কী গো! অন্তত ডজনখানেক নানা ধরনের চাকরি করেছি। কিন্তু কোনওটাতেই মন বসেনি। শেষ পর্যন্ত মন বসে গেল থিয়েটারে। তাও দানীবাবুর অভিনয় দেখে।

আমি বললাম : আপনি বুঝি খুব ছোটবেলা থেকেই অভিনয় দেখতেন?

তুলসীদা বললেন : হ্যাঁ দেখতুম। তবে হলে বসে টিকিট কেটে নয়। দেখতুম উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

আমি বললাম : তার মানে? আপনি কী তখন থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? না বলে তো গ্রিনরুমে ঢুকে উইংসের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ বাইরের লোকেদের পাবার কথা নয়!

তুলসীদা বললেন · থিয়েটারেব সঙ্গে যুক্ত না হলেও আমার ঢোকার পারমিশান ছিল। আমার জ্যাঠামশাই স্টার থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেন। আমি বাড়ি থেকে তাঁর খাবার নিয়ে আসতাম। সেই সময়ে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখতাম, আর বুকের ভেতরটায় আকুলি-বিকুলি কবত অভিনেতা হবার জন্যে।

আমি বললাম : তখন তো আপনি নেহাতই বাচ্চা। তা ওই বয়সেই অভিনেতা হবার জন্যে বুকের ভেতর আকুলি-বিকুলি করত?

তুলসীদা বললেন : কে বললে আমি তখন বাচ্চা। তখন আমার দস্তুরমতো পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস। রীতিমতো যুবক।

আমি বললাম : তার মানে? এই তো আপনি বললেন বিভিন্ন ধরনের ডজনখানেক চাকরি করেছেন। তা সেগুলো সব কী ওই চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েসের আগেই হয়ে গেছে নাকি?

তুলসীদা বললেন : তাই তো হয়েছিল। অল্প বয়েসেই বাপ মরে গেল, জ্যাঠামশাইয়ের আশ্রয়ে এসে রইলাম। পড়াশোনাতেও মন দিতে পারলাম না। জ্যাঠামশাই আমার অভিভাবক বটে, কিন্তু তিনি তো সব সময় তাঁর অর্কেস্ট্রা পার্টি আর কেলাব নিয়েই ব্যস্ত। তাই আমার অবস্থাটা হয়ে দাঁড়াল বাপে খ্যাদানো মায়ে তাড়ানো ছেলেদের মতো।

তুলসীদার কথার মধ্যে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম · অর্কেস্ট্রা পার্টির মানে না হয় বুঝলাম, কিন্তু 'কেলাব' জিনিসটা কী?

তুলসীদা বললেন : ওই তোমরা যাকে অ্যামেচার ক্লাব বলো, তখনকার দিনেই মানুষজন সেটাকে ঠাট্টা করে বলতো 'কেলাব'। গান-বাজনা যাত্রা-থিয়েটার করাটা তো তখন মানুষ ভালো চোখে দেখত না। তাই ব্যঙ্গ করে বলত 'কেলাব'।

আমি বললাম : আপনার জ্যাঠামশাইয়ের অ্যামেচার থিয়েটার পার্টিও ছিল নাকি?

তুলসীদা বললেন : ছিল মানে! জ্যাঠামশাই তো তখন দিনরাত ওই নিয়েই পড়ে থাকতেন। কলকাতা শহরের বড়লোকদের বাড়ি পুজো-আচ্চায় তাঁর দল গান করতে যেত। নাটক করত। শুধু কলকাতা শহরেই বা বলি কেন, দু-তিনদিনের রাস্তা পেরিয়ে দূর-দূরান্তেও চলে যেতেন মোটা টাকার বায়না পেলে। আর ওই কেলাবই তো আমার সব্বোনাশ করে দিলে। মাথার মধ্যে গান আর অভিনয়ের পোকাটাকে ঢুকিয়ে দিলে।

আমি বললাম : তার মানে আপনিও আপনার জ্যাঠামশাইয়ের দলে অভিনয় করতেন?

তুলসীদা বললেন : অভিনয়টা খুব বেশি করতাম না। তবে গান গাইতাম প্রচুর।

আমি বললাম : কী ধরনের গান?

তুলসীদা বললেন : নানা ধরনের গান। কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, কবিগান। মাঝে মাঝে তর্জার আসরেও নামতে হত মূল গায়েনের দোয়ারকি হয়ে।

তুলসীদার কথায় মনে পড়ে গেল, প্রথম যেদিন তাঁর হাওড়ার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম সেদিন তাঁর সঙ্গেই বাসে করে কলকাতা ফিরেছিলাম। হাওড়া স্টেশন থেকে যে বাসটাতে আমরা উঠেছিলাম তাতে বসবার জায়গা ছিল না। তুলসীদা সারাটা পথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গলা সাধতে সাধতে এসেছিলেন চাপা কণ্ঠে। না, কীর্তনও নয়, শ্যামাসঙ্গীতও নয়, রীতিমতো কালোয়াতি গান।

তা সেদিন খুঁজে খুঁজে হাওড়ায় তুলসীদার আস্তানায় যখন পৌঁছেলাম তখন বাড়ি ঘরদোরের

চেহারা দেখে আমার তো চক্ষুস্থির। এমন একখানি ভিখিরিমার্কা পরিবেশে একজন ফিল্মস্টার থাকেন, এটা তো বিশ্বাস করতেই মন চাইছিল না। কিন্তু আমার আগমনবার্তা পেয়ে তুলসীদা যখন সশরীরে আবির্ভূত হলেন তখন বিশ্বাস না করে আর উপায় রইল না।

আমি বললাম : আমি রূপাঞ্জলি পত্রিকা থেকে আসছি। আমাদের সম্পাদক সুধাংশু বক্সী মশাই একটি চিঠি দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

আমাকে দেখে, আমার বয়স অনুমান করে তুলসীদা এক মুহূর্ত বোধহয় ভেবে নিলেন যে আমাকে তুমি বলবেন না আপনি বলবেন! শেষ পর্যন্ত তুমিই বললেন। বললেন : তা দরজায় দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না। ভেতরে চল। তারপর দেখছি সুধাংশুবাবু কী লিখেছেন।

কথাটা বলেই তুলসীদা ভেতরের দিকে পা বাড়ালেন। আমি ওঁর সঙ্গে চলতে চলতেই বললাম : না, উনি আলাদা করে কিছু লিখে পাঠাননি। রূপাঞ্জলি পত্রিকার পক্ষ থেকে তো সরস্বতী পুজো করা হচ্ছে, তারই একখানা আমন্ত্রণপত্র।

বলতে বলতে আমরা এসে তুলসীদার ঘরের দাওয়ায় পৌঁছে গেলাম। বাড়িটা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা 'বারো ঘর এক উঠোন'-এর মতো। দু-ধারে সারি সারি ঘর, সঙ্গে লাগোয়া রান্নার জায়গা। মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের প্যাসেজ। চলতে চলতেই অনুভব করলাম এ-ঘর ও-ঘর থেকে দু-চারজন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। বুঝতে পারলাম, এখানে মাঝে মাঝে সিনেমা জগতের মানুষদের পদার্পণ ঘটে। আমিও সেই জাতীয় কেউ কিনা সেটা যাচাই করে দেখা হচ্ছে।

তুলসীদার পরনে একখানি ধুতি। ঊর্ধাঙ্গ অনাবৃত। নিজের দাওয়ার ওপর আরাম করে একটি খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসলেন। তারপর ভেতরের দিকে কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন : একটু চা করে দিও গো! কাপে করে দিও। খবরের কাগজের লোক। আমরা এদের খুব ভয় পাই। খাতিরযত্ন না করলে নিন্দে করে দু-চার লাইন লিখে দেবে।

তুলসীদার কথায় আমি লজ্জা পেয়ে গিয়ে বললাম : আমাকে আর খবরের কাগজের লোক বলবেন না। সবে ঢুকেছি এই লাইনে। এখনও তেমন করে বিষদাঁত গজায়নি।

আমার কথা শুনে তুলসীদা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন : তুমি বেশ মজা করে কথা বলতে পার তো! তবে একটা কথা কী জানো ভাই। তোমরা সাংবাদিকরা হলে গিয়ে বাঘের জাত। বয়সে বাচ্চা হলেও বাঘের বাচ্চাকে তো বাঘই বলতে হবে। বেড়াল তো আর বলা চলবে না।

এবার হেসে ওঠবার পালা আমার। ওই দু-চার কথাতেই মানুষটিকে ভালো লেগে গেল। এতক্ষণ এই পরিবেশের দরুন মনের মধ্যে যে বিরক্তি জন্মেছিল তা এক মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

তুলসীদা আমার কাছে জানতে চাইলেন, রূপাঞ্জলির সরস্বতী পুজো যেখানে হচ্ছে সেখানে কীভাবে যেতে হয়। আরও দু-চারটি প্রশ্ন উনি করলেন। আমি তার যথাযথ উত্তর দিলাম।

তারপর তুলসীদা জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার সঙ্গে কী গাড়ি আছে?

আমি বললাম : গাড়ি থাকবে কেন?

তুলসীদা বললাম : পুজোর নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছে তো! পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। একটা গাড়ি না হলে ঘুরবে-ফিরবে কেমন করে?

আমি বললাম : না না, আমি আর কোথাও যাব না। কেবল আপনার কাছেই এসেছি। তাও বাসে করে।

তুলসীদা বললেন : গাড়ি থাকলে ভালো হত হে। তোমার গাড়িতে করে মানিকতলায় চলে যেতাম। আমার একটু বলদেওপাড়ায় দরকার ছিল। তা নেই যখন তখন কী হবে। চল বাসে করেই যাই।

আর সেই বাসে করে আসতে আসতেই তুলসীদার কালোয়াতি গান শুনেছিলাম।

সেই কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় তুলসীদাকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কী মাস্টার রেখে গান-টান শিখেছিলেন? কিংবা কোনও গুরুর কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন নাকি?

তুলসীদা বললেন : আমার যা কিছু শিক্ষা সব আমার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। তিনি অর্জুনের মতো সব্যসাচী ছিলেন। গান জানতেন, বাজনা জানতেন, অভিনয় জানতেন, আরও কত কী জানতেন। আমি

প্রথম প্রথম যা কিছু শিখেছি সব তারই দৌলতে। তারপর তো স্টার থিয়েটারে এসে অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন গুরু পেয়ে গেলাম।

আমি বললাম : তুলসীদা, একটু আগে তো বললেন আপনি অনেক রকম চাকরি করেছিলেন। তা কী ধরনের চাকরি যে সব ছেড়েছুড়ে শেষ পর্যন্ত অ্যাকটিং লাইনে এলেন?

তুলসীদা একটু হেসে বললেন : সে সব অনেক ব্যাপার। আমার প্রথম চাকরি চিৎপুরপাড়ার একটা চাটের দোকানে।

আমি বললাম : চাটের দোকানে মানে?

তুলসীদা বললেন : এই দ্যাখ! চাটের দোকানের মানে বোঝ না। ওই যে সন্ধেবেলা বাবুরা মৌতাত করার সময় মদের সঙ্গে যে সব চাট খায় গো! যেমন কষা মাংস, পাঁঠার ভুঁড়ি-চচ্চড়ি, বেশ করে ঝাল দিয়ে কাঁকড়াভাজা, এইরকম আরও কত কী।

আমি বললাম : কী সর্বনাশ! আপনাকে ওই সব রান্না করতে হত?

তুলসীদা বললেন : আমি রান্না করতে যাব কেন! সে রান্নার জন্যে অন্য লোক ছিল। আমার কাজ ছিল প্লেট-টেট ধোয়ার।

আমি বললাম : সে কী! আপনি তাহলে চাটের দোকানে বয়ের কাজ করতেন?

তুলসীদা বললেন : তাই তো করতাম। তখন তো জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে। কাঁহাতক আর বসে বসে জ্যাঠামশাইয়ের অন্ন ধ্বংস করা যায়। তাই নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে মাতালবাবুদের এঁটো প্লেট ধোবার কাজেই লেগে পড়েছিলাম।

আমি বললাম : তারপর?

তুলসীদা বললেন : তারপর একদিন ওই দোকানে জ্যাঠামশাইয়ের আবির্ভাব। কোনও কথা না বলে মাথার চুল ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। বললেন : ব্যাটা, স্বাবলম্বী হতে চাইছ? তা আর কোনও কাজ পেলে না! বামুনের ছেলে হয়ে মোদো-মাতালের এঁটো ধোবার কাজ করতে এসেছ। এই বলে মাথার ওপর এক রাম গাঁট্টা।

বলতে বলতে তুলসীদা তাঁর মাথার টাকের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে সেদিনকার সেই গাঁট্টার আঘাতটা স্মরণ করতে চাইলেন।

আমি অবাক হয়ে তুলসীদার মাথার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে তুলসীদা একটু হেসে বললেন : কী, কথাটা বিশ্বাস হল না?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন কথাটা?

তুলসীদা বললেন : ওই যে জ্যাঠামশাই আমার মাথার চুল ধরে টেনে নিয়ে গেলেন! তা আজ এই বিরাট টাক দেখে সে কথা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে বটে। কিন্তু চিরকাল তো আর আমার মাথায় এমন ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী টাক ছিল না। আমার মাথায় এক সময় এক মাথা ঘন চুল ছিল গো! আর ঘন বলে ঘন। চিরুনি চালানো যেত না। কত চিরুনি যে ভেঙেছে চুল আঁচড়াতে গিয়ে।

আমি বললাম : না না, অবিশ্বাসের কী আছে! মানুষ তো আর টাক নিয়ে মায়ের পেট থেকে জন্মায় না। ওটা বয়েসের সঙ্গে পড়ে।

তুলসীদা বললেন : কে বলে জন্মায় না। কত বাচ্চার মাথায় দেখবে জন্মের সময় একগাছিও চুল নেই। তারপর অবশ্য চুল গজায়।

আমি বললাম : সে কথা থাক। আমি যেটা জানতে চাইছি সেটা হল, আপনি তো জ্যাঠামশাইয়ের অ্যামেচার দলে ছিলেন বলছেন। তা সত্ত্বেও চাটের দোকানে বাসন ধোবার কাজ করতে গেলেন কেন?

তুলসীদা বললেন : আমি যখন এই কুকর্মটি করতে গেলাম তখন তো জ্যাঠামশাইয়ের ক্লাব বন্ধ হয়ে গেছে। উনি তখন স্টার থিয়েটারে চাকরি নিয়ে নিয়েছেন হারমোনিয়াম বাজানোর।

আমি বললাম : তাই বলুন। তা সেই গাঁট্টা খাবার পর আপনার সম্বিত ফিরল?

তুলসীদা বললেন : তা কিছুটা ফিরলো বৈকি। ওই যে জ্যাঠা বললেন, বামুনের ছেলে, তাতেই কিছুটা কাজ হল। আমার আবার বামুনাই ব্যাপারটা একটু বেশি বেশি কিনা।

আমি বললাম : তখন কী পুজো-আচ্চা, মানে জজমানির কাজ শুরু করলেন?

তুলসীদা বললেন : হায় কপাল। সে ক্ষমতা আমার কোথায় গো! মুখ দিয়ে একবর্ণ সংস্কৃত বেরোয় না। লেখাপড়া কী শিখেছি যে জজমানির কাজ করব। আমার যা কিছু বামনাই সব ওই পৈতে মাজার ওপর। প্রতিদিন আর কিছু করি না করি গলার পৈতেটিকে মেজে মেজে ধপধপে সাদা করে রাখি। ওটাই আমার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়।

আমি বললাম : হ্যাঁ, ওই ব্যাপারটা আপনার 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে লক্ষ্য করেছি। কলকাতা থেকে দেশে ফিরে গায়ের জামাটি খুলে দু'হাতে গলার পৈতেটি মার্জনা করছেন। খুব ন্যাচারাল হয়েছিল ব্যাপারটা।

তুলসীদা বললেন : ন্যাচারাল ফ্যাচারাল বুঝি না। ওই ছবির পরিচালক নির্মলবাবু বলেছিলেন, বাড়িতে যা যা করেন ঠিক তেমনটি করবেন। এই প্রপারলি বিহেভ করাটাই হল অভিনয়ের একটা বিরাট অঙ্গ। তা আমি বাপু তাই করেছিলাম। বাড়ি ফিরে যেমন করে রোজ পৈতে মাজি, শুটিং-এও তাই করেছিলাম।

আমি বললাম . শুধু 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতেই বা বলি কেন, আপনাব অভিনীত সব ছবিতেই এই প্রপারলি বিহেভ করার ব্যাপারটা আছে। 'অঞ্জনগড়' ছবিতে আপনি ট্রাক ড্রাইভারের পাশে বসে যাচ্ছেন। গাড়ির গতির সঙ্গে আপনার একটা তন্দ্রামতন ভাব এসে গেছে। হঠাৎ গাড়িটা থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল। ওই ঘুমন্ত অবস্থায় চমকে ওঠার ব্যাপারটা আমার তো অসাধারণ লেগেছিল।

তুলসীদা বললেন : ও বাবা। তোমরা এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবি দেখো! 'অঞ্জনগড়' ছবিতে ওই ব্যাপারটা করবার জন্যে পরিচালক বিমল রায় আমাকে বলে দেননি। ওটা আমি নিজের থেকে করেছিলাম। বসে বসে যেমন ঢুলতে ঢুলতে যাই সেই রকমই করেছিলাম আর কী।

আমি বললাম : ওসব কথা এখন থাক। জ্যাঠামশাইয়ের গাঁট্টা খাবার পর কী করলেন বলুন। কোন কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন?

তুলসীদা বললেন : সে এক মহৎ কর্ম। আমি বাড়ি থেকে পালালাম।

আমি বললাম : পালালাম মানে?

তুলসীদা বললেন : পালালাম মানে—পালালাম। বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে একদিন ভোরবেলা কেটে পড়লাম।

আমি বললাম : কোথায় গেলেন?

তুলসীদা বললেন : সোজা বর্মা মুলুকে। এখন যেমন ছেলেপুলেরা বাড়ি থেকে পালাতে গেলে বম্বের টিকিট কাটে, তখনকার দিনে পালাবার জায়গা ছিল ওই বর্মা মুলুক। তখন ব্রিটিশের রাজত্ব। বর্মা মুলুকটাও ভারতের মধ্যে। সুতরাং পাসপোর্ট-ভিসা-র বালাই ছিল না।

আমি বললাম : সে কী! একা একা অতদূরে পালালেন! আপনার ভয় করল না?

তুলসীদা বললেন : একা একা যেতে যাব কেন! এক দঙ্গল লোকের সঙ্গে জাহাজে চাপলাম। আর শুধু কী মানুষ! হাতী ঘোড়া বাঘ সিংহ সব একত্রে, একই জাহাজে।

আমি বললাম : তার মানে?

তুলসীদা বললেন : পালালাম একটা সার্কাস পার্টির সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে। আর তারপরে সে কী দুর্ভোগ। মাস ছয়েক পরে দেখলাম আমার শরীর থেকে জন্তু জানোয়ারের গন্ধ বেরোচ্ছে।

তুলসী চক্রবর্তীর সঙ্গে দীর্ঘদিন আলাপ-পরিচয়ের পরও মানুষটি আমার কাছে একটি ব্যাপারে রহস্যাবৃতই থেকে গেছেন। উনি প্রায়শই কথার ফাঁকে ফাঁকে বলতেন : অভিনয়ের ব্যাপারটা আমি বাপু তেমন বুঝি-টুঝি না। নাটকে পার্টের খাতায় যা লেখা থাকে, স্টেজে দাঁড়িয়ে সেইগুলোই গড় গড় করে বলে যাই। প্রম্পটিং-এর ধার ধারি না। মাঝে মধ্যে দু-একটা এক্সট্রা ডায়লগ যে দিই না, তা নয়। কো-অ্যাকটররা কখনও কখনও এক্সটেম্পো দিয়ে একটু বিপদে ফেলে দেয়। তখন আত্মরক্ষার জন্যে দু-একটা বাড়তি কথা বলতেই হয়। নইলে নিজের ক্যারেকটার নিয়ে ভাবনা-চিন্তার কথা আমার মাথায়

আসে না। আর আসবেই বা কেন! আমি যে সব রোল্ পেতাম সেগুলোকে ক্যারেকটার বললে তো ক্যারেকটারেরই অপমান করা হয়।

তুলসীদার কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি বলছেন স্টেজে কো-অ্যাকটররা এক্সটেম্পো দিয়ে আপনাকে বিপদে ফেলতেন। এটা একতরফা হয়ে যাচ্ছে না কি? কো-অ্যাকট্রেসরাও তো শুনেছি মাঝে মাঝে ওই ধরনের কাজ করতেন!

তুলসীদা বললেন : ভুল শুনেছ। আমি তো আমার জ্ঞানে কোনও অভিনেত্রীকে স্টেজে দাঁড়িয়ে কোনরকম বাড়াবাড়ি করতে দেখিনি। থিয়েটারের মেয়েরা খুব সুশীলা। তারা ডিরেকটারের নির্দেশমতোই কাজ করে। নাটকের ডায়লগের বাইরে কক্ষনো যায় না।

আমি বললাম : তাই নাকি! এটা তো খুব ভালো ব্যাপার। তবে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ভালো রোল পাননি বলে আপনার মনে একটা অভিমান আছে। তা সেটা কি মঞ্চ আর সিনেমা দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? সিনেমাতে তো আপনি বেশ কিছু ভালো ভালো রোল পেয়েছেন। ছোট কাজ, কিন্তু চরিত্রগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

তুলসীদার সঙ্গে যখন এইসব আলোচনা হয়েছে তখনও তিনি সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর' ছবিতে কাজ করেননি। সেটা আরও অনেক পরের ব্যাপার।

তুলসীদা হাসতে হাসতে বললেন : তা পেয়েছি। মিথ্যে কথা বলব না, সিনেমায় বেশ কিছু ভালো কাজ পেয়েছি। কিন্তু তার সংখ্যা কত সে হিসেবটা করেছ কখনও? এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচশোর ওপর ছবিতে কাজ করেছি, কিন্তু তার মধ্যে ক'টা ছবিতে কাজ করে আনন্দ পেয়েছি, সেটা তো আঙুলে গুনেই বলে দেওয়া যায়। আর অভিমানের কথা বলছ? ওসব অভিমানটা-টভিমান আমার নেই। আমার কতটা কী কেরদানি দেখানোর ক্ষমতা সেটা তো আমি ভালোই জানি। অভিমানটা আসবে কেন! যেটুকু যা পেয়েছি, এই যে তোমরা পাঁচজন আমাকে ভালোবাসছ, দুটো কথা শুনছ আমার, সেটা আমার বাবা-মা আর জ্যাঠামশায়ের আশীর্বাদের জোরে। স্টেজে কিছু করতে পারি আর না পারি, সিনেমায় যে কিছু ভালো কাজ পেয়েছি, সে সবই তাঁদের আশীর্বাদ।

তুলসীদার মুখ থেকে সিনেমার প্রশস্তি শুনে আমাব মনটা ঝট করে অনেক বছর পিছিয়ে গেল। সেটা ১৯৩৯ সাল। আমার তখন বারো বছর বয়েস। তমলুকের রাজবাড়ির ময়দানে তাঁবু-খাটানো টেম্পোয়ারি সিনেমা হলে একটি ছবি দেখেছিলাম। ছবিটির নাম 'জনক নন্দিনী'। ওই ছবিতে সীতা দেবীর বাবা জনক রাজার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন তুলসী চক্রবর্তী। তুলসী চক্রবর্তীর নাম তখন আমার কাছে পরিচিত। তাঁর অভিনীত বেশ কিছু ছবি দেখা হয়ে গেছে। তবে তার সবগুলিই ছোট ছোট রোল। 'জনক নন্দিনী' ছবির পোস্টারে তুলসী চক্রবর্তীর মুখ দেখে মনের মধ্যে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, ভদ্রলোক কী পারবেন অমন একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে? হয়তো অন্য ছবির মতো এখানেও তিনি দর্শকদের হাসিয়েই ফেলবেন।

কিন্তু ছবি দেখার পর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। তখনও তেমন বিচারবুদ্ধি হয়নি। কিন্তু বেশ মনে আছে, জনক রাজার চরিত্রে তুলসী চক্রবর্তী যে রাজকীয় আভিজাত্য প্রকাশ করেছিলেন, তা এক কথায় অপূর্ব। ওসব ছবির প্রিন্ট বোধহয় এখন আর নেই। থাকলে আপনারা দেখতে পেতেন কী চমৎকার অভিনয় করেছিলেন তুলসী চক্রবর্তী। সাধারণত তুলসী চক্রবর্তী বলতে যে ছবিটা আমাদের চোখের সামনে ভাসে, এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা চরিত্র।

এরকম আরও একটা ছবির নাম করতে পারি যেখানে তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় আমার অসাধারণ মনে হয়েছে। সে ছবিটির নাম 'ভাবীকাল'। এক আদর্শবাদী মানুষের সহযোগী ছিলেন তিনি। বন কেটে বসত করে একটি আদর্শ নগরের পত্তন করেছিলেন তাঁরা। পরে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে সেই আদর্শবাদী মানুষটির বিরুদ্ধে চলে গেলেন বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এটা একটা কমপ্লিকেটেড ক্যারেকটার। একদা আদর্শবাদী, পরে ক্ষমতালিপ্সু বিরুদ্ধবাদী, এই দুই বিপরীত ধরনের চরিত্রে খুবই চমৎকার অভিনয় করেছিলেন তুলসীদা। ওই অভিনয়ের মধ্যে বেশ একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার ছিল। সেটা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি।

'তুলসীদা যখন মাঝে মাঝে বলতেন, আমি অভিনয়ের অ-আ-ক-খও বুঝি না, তখন তার প্রতিবাদ করে আমি 'ভাবীকাল' ছবির ওই চরিত্রটার কথা বলতাম। শুনে তুলসীদা মৃদু মৃদু হাসতেন। বলতেন · ওই চরিত্র করবার জন্যে ভালো অভিনয় জানার দরকার হয় নাকি?

আমি বলতাম . বলেন কী তুলসীদা। একটা আদর্শবাদী মানুষ আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতার মোহ, অর্থের লালসা তাকে পেয়ে বসছে। এই যে পরিবর্তন, সেটা এত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আপনি প্রকাশ করেছেন যে দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। এটাকে যদি বড় অভিনেতার লক্ষণ না বলি তো কাকে বলব?

তুলসীদা বলতেন : ওই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে তো ভালো অভিনেতা হবার দরকার হয় না। তুমি যে সমাজে বসবাস কর, একটু চোখ-কান খোলা রেখে যদি সেই সমাজের মানুষগুলোকে দেখ, তাহলে তুমিও ওইরকম অভিনয় করতে পারবে। চোখের সামনেই তো দেখলাম কত মানুষের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল। যত ছিল বেনাবুনে, সব হয়ে গেল কীত্তুনে। এককালে বড় বড় আদর্শের কথা বলত, পরে ক্ষমতা পেয়ে তারা আর মানুষকে মানুষ জ্ঞান করছে না। এ তো অহরহ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ভাই। তাদেরই একজনের ধাঁচে 'ভাবীকাল' ছবির ওই চরিত্রটা করেছিলাম। ওতে আমার কোনও ক্রেডিট নেই। ছবির পরিচালক বেণু লাহিড়িকে আমি বলেছিলাম সেই কথাটা। তা বেণু বলেছিল, ভালোই তো হবে। আপনি ওইভাবেই অভিনয় করুন তুলসীদা। ক্যারেকটারটা ঠিক ওই ধরনেরই।

তুলসীদা যাঁকে বেণু বলে উল্লেখ করলেন, তিনি হলেন পরিচালক নীরেন লাহিড়ি। তাঁর ওই 'ভাবীকাল' ছবিটি সে বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা পেয়েছিল। বি এফ জে এ পুরস্কার পেয়েছিল। ছবিটিতে একখানিও গান ছিল না। গান ছাড়া তখনকার দিনে তো কোনও ছবি কল্পনাই করা যেত না। 'ভাবীকাল' ছবির গল্পটা লিখেছিলেন সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র।

তুলসী চক্রবর্তীর প্রথম অভিনয় সিনেমায় নয়, থিয়েটারে। ১৯২০ সালে। স্টার থিয়েটারের তৎকালীন কর্ণধার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে তুলসীদাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জ্যাঠামশাই। তাঁরই অনুরোধে অপরেশবাবুর পায়ের কাছে বসে অভিনয় শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তুলসীদা। 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকে প্রথম মুখ দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

অপরেশচন্দ্র কী ভাবে অভিনয় শেখাতেন, সেটা নিয়ে তুলসীদাকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম। তার উত্তরে তুলসীদা বলেছিলেন : স্যারের অভিনয় শেখানোর যেটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, সেটা হল উনি বাচনিক অভিনয়ের ওপর বেশি জোর দিতেন। কোন্ চরিত্র কী ধরনের স্বরক্ষেপণ করতে হবে সেটা ধরে ধরে শেখাতেন। একবার একটা ভারি মজা হয়েছিল জানো!

আমি বললাম : কী মজা?

তুলসীদা বললেন : আমার অভিনয় জীবনের তখন বছর দুই কেটে গেছে। একদিন উনি আমাকে যখন অভিনয় শেখাচ্ছিলেন তখন আমি একটা বেফাঁস কথা জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম স্যারকে।

আমি বললাম . বেফাঁস কথা! তার মানে?

তুলসীদা বললেন : সেদিন স্যার একটা ডায়লগ আমাকে বেশ গলা তুলে বলতে বললেন। অতি সাধারণ একটা সংলাপ। সেটা চেঁচিয়ে বলার কোনও দরকার নেই। অথচ স্যার বলছেন চেঁচিয়ে বলতে। তা আমি খুব আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলাম : এটা কি অত জোরে চেঁচিয়ে বলার দরকার আছে স্যার?

আমার প্রশ্নটা শুনে স্যার কেমন যেন থমকে গেলেন। ঘরভর্তি লোক। কোনওদিন কারও সাহস হয়নি স্যারকে প্রশ্ন করার। অথচ অর্বাচীনের মতো আমি সেটাই করে ফেললাম। প্রশ্নটা শুনে স্যার মিনিটখানেক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন : তুই বোস্। তোকে আজ আর রিহার্সাল দিতে হবে না। আর বাড়ি যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যাস্।

স্যারের কথা শুনে আমার তো মাথা ঘুরতে লাগল। হায় হায়, কেন আমি বোকার মতো প্রশ্নটা করতে গেলাম। স্যার নিশ্চয় রেগে গেছেন। আমার বোধহয় আজ থেকেই ছুটি হয়ে গেল।

রিহার্সালের পর সবাই যখন চলে গেল তখন স্যার আমাকে ডাকলেন। আমি গুটি গুটি পায়ে স্যারের

কাছে এগিয়ে গেলাম। স্যার আঙুল তুলে হলের পেছনের সারির দিকে দেখিয়ে বললেন : ওইখানে বসে যে লোকটা থিয়েটার দেখে সেই লোকটা কে জানিস্?

স্যারের প্রশ্ন শুনে আমি থতমত খেয়ে গেলাম। কোনওরকম ভাবনাচিন্তা কবার আগেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল : পাবলিক।

স্যার বললেন : হ্যাঁ পাবলিক। আট আনা দামের টিকিট কেটে ওরা আসে। ওরাই হল থিয়েটারের লক্ষ্মী। আর ওদেরই প্রসন্নতা-অপ্রসন্নতার ওপর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভাগ্য নির্ভর করে। ওরা যদি কারও অভিনয় দেখে খুশি হয় তাহলে তার সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে বাইরে গিয়ে। থিয়েটারের মালিকরা ওদেরই মতামতের দাম দেন বেশি করে। তা তোমার ডায়লগটি যদি ওই পেছনের সারির মানুষের কানে গিয়ে না পৌঁছয় তাহলে তোমার ভাগ্যে কী ঘটবে সেটা জান কী?

আমি তো স্যারের কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম।

স্যার বললেন : ওই সারি থেকে একবার যদি 'লাউডার প্লিজ' আওয়াজ ভেসে আসে তাহলে তার পরদিনই থিয়েটারের মালিক তোমার হাতে বিল্বপত্র ধরিয়ে দেবে। বলবে, তোমার গলার জোর নেই। তুমি এবার এসো বাপু।

আমি তখন দুই কানে হাত দিয়ে বললাম : আর কোনওদিন এরকম বোকার মতো প্রশ্ন করব না স্যার। আপনি আমাকে মাফ করে দিন।

আমাকে ওইভাবে কান ধরতে দেখে স্যার হেসে ফেললেন। বললেন : না না, কান ধরবার দরকার নেই। কান ধরবার মতো কোন কাজও তুমি করোনি। তোমার প্রশ্নটা খুবই সঙ্গত এবং সঠিক। আমরা তো ব্যবহারিক জীবনে সাধারণ কথাগুলো অতো চেঁচিয়ে বলি না। কিন্তু থিয়েটারে এটা করতেই হয়। না হলে যে তোমার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। সেইজন্যে যে কোনও অভিনেতাকে তার অভিনেয় অংশটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। একটা অংশের অভিনয় তার নিজের জন্যে। আর একটা অংশ রাখতে হয় দর্শকের জন্যে।

স্যারের এই কথাটার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। বললাম : দুটো ভাগ কী ভাবে করব সেটা একটু বুঝিয়ে বলুন না স্যার।

স্যার বললেন : দুটো ভাগের একটা হল ডায়লগ পোর্শান, আর একটা হল সাইলেন্ট পোর্শান। ডায়লগ পোর্শানে তুমি গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বলবে। একেবারে নাভিস্থল থেকে আওয়াজ বার করে আনতে হবে তোমাকে। আর সাইলেন্ট পোর্শানে তুমি একেবারে ন্যাচারাল বিহেভ করবে। সেখানে যদি পাকামি করে বাড়াবাড়ি করতে যাও তাহলে দর্শক তা সহ্য করবে না।

তা স্যারের এই উপদেশটা আমি সারা জীবন মনে রেখেছি। পরবর্তীকালে সিনেমায় অ্যাকটিং করার সময় এই ন্যাচারাল বিহেভ করার ব্যাপারটা আমার খুব কাজে এসেছে।

তুলসীদাকে আমি প্রশ্ন করলাম : আচ্ছা তুলসীদা, দর্শকরা ডায়লগ শুনতে না পেলে 'লাউডার প্লিজ' বলে যেমন বিরক্তি প্রকাশ করতো, তেমনি ভালো অভিনয় দেখলে 'এন্‌কোর এন্‌কোর'-ও তো বলতো?

তুলসীদা বললেন : দূর পাগল। এন্‌কোর দিত কোথায় জানিস। ওই মাগীরা যখন পেছন দুলিয়ে নাচত আর রসের গান গাইতো তখন এন্‌কোরের ধুম পড়ে যেত। তখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই গান বার বার গাইতে হতো। আর ভালো অ্যাকটিং দেখে পড়তো হাততালি।

ওই স্টার থিয়েটারেই তুলসীদার অভিনয় জীবনের শুরু। 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকে। সেটা ১৯২০ সালে। আর শেষও ওই স্টার থিয়েটারে। 'শ্রেয়সী' নাটকে। সেটা ১৯৬১ সালে। ওই নাটকে অভিনয় করতে করতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর ১১ ডিসেম্বর তারিখে জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে তুলসীদার চিরবিদায়।

তুলসীদার সিনেমার জীবনের শুরু থিয়েটার জীবনের বারো বছর পরে। ১৯৩২ সালে। নিউ থিয়েটার্সের 'পুনর্জন্ম' ছবিতে তুলসীদার প্রথম রূপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ। সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ছিলেন ওই ছবির পরিচালক। তুলসীদা মুখ দেখিয়েছিলেন ছোট্ট একটি ভূমিকায়।

আর তারপর থেকে একের পর এক ছবিতে অভিনয় করবার সুযোগ আসতে থাকে তুলসীদার

জীবনে। কেবল বাংলা ভাষাতেই নয়, হিন্দি এবং উর্দু ভাষার ছবিতেও তিনি অভিনয় করবার সুযোগ পেতে থাকেন।

তুলসীদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : হিন্দি কিংবা উর্দু ভাষার ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে আপনি কি বম্বে কিংবা লাহোরে গিয়েছিলেন নাকি?

তুলসীদা বললেন : আরে না না, বোম্বাই কিংবা লাহোর কোথাও যেতে হয়নি। ওইসব ভাষার ছবিতে অভিনয় করেছিলাম কলকাতায় বসেই। নিউ থিয়েটার্সে তখন সব ভাষার ছবিই তৈরি হত। সে সব কী দিন গেছে নিউ থিয়েটার্সের। ভারতের সব ভাষার শিল্পীরাই তখন নিউ থিয়েটার্সে কাজ করতেন।

আমি বললাম : কিন্তু আপনি হিন্দি আর উর্দু ভাষা শিখলেন কেমন করে? তখন তো আর ডাবিং করা হতো না।

তুলসীদা বললেন : শিখেছিলাম ওই সার্কাস পার্টিতে কাজ করতে গিয়ে। সার্কাসটা বাঙালির। বোসেস সার্কাস। বোস সাহেবের ওই সার্কাসে বাঙালির সংখ্যা ছিল কম। বেশির ভাগই আপ কান্ট্রির লোক। হিন্দু-মুসলমান সব জাতের। দিনরাত ওদের সঙ্গে ওদের ভাষাতেই কথা বলতে বলতে হিন্দি আর উর্দু দুটো ভাষাতেই সড়গড় হয়ে গিয়েছিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সার্কাসে আপনাকে কী কাজ করতে হত?

তুলসীদা বললেন : সবরকমের কাজ। ওখানে এক বাঘ-সিংহের খেলা দেখাবার রিং মাস্টার ছাড়া সবাইকে সব কাজ করতে হতো। আমি তো আর বেশিদিন থাকিনি। তাই সব খেলাগুলো শেখা হয়নি। বেশিরভাগ সময়েই জোকার সাজতাম। ট্রাপিজের খেলা ছাড়া অন্য ছোটখাটো খেলাগুলো শিখে গিয়েছিলাম। তারপর যেদিন দেখলাম আমার নিজের শরীর থেকে জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ বেরোচ্ছে, সেদিনই কাউকে কিছু না বলে চম্পট দিলাম।

আমি বললাম : সার্কাস থেকে ফিরে এসেই কী থিয়েটার?

তুলসীদা বললেন : না না। বর্মা থেকে ফিরে যখন এলাম তখন জ্যাঠামশাই আমাকে নিয়ে গিয়ে চিৎপুরের একটা ছাপাখানায় ভর্তি করে দিলেন। ওখানে কম্পোজিটরি করবার জন্যে টাইপের ঘর শিখতে লাগলাম।

আমি বললাম : বলেন কী! আমিও তো এককালে কম্পোজিটার ছিলাম।

তুলসীদা বললেন : এই মরেছে! তুমিও ছাপাখানার কালি হাতে মেখেছে। তা আর কী কী কাজ করেছ?

আমি বললাম : আপনারই মতন অনেক কিছু। কেবল অভিনয়টা ছাড়া।

তুলসীদা হাসতে হাসতে বললেন : তা ওটাই বা বাকি থাকে কেন। দেবনারাণকে বলে স্টার থিয়েটারে ঢুকে পড়। তোমার সঙ্গে তো দেবুর খুব ভাবসাব দেখি। প্রায়ই তো ওর ঘরে গিয়ে আড্ডা দাও দেখতে পাই।

আমি হাসতে হাসতে বলালম : হ্যাঁ, ওইটেই বাকি আছে কেবল। তা প্রেসের কাজে আপনি কতদিন ছিলেন তুলসীদা?

তুলসীদা বললেন : তা ছিলাম বেশ কিছুকাল। আর ওখানে কাজ করতে করতেই তো অভিনয় করার ইচ্ছেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বেশি করে।

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

তুলসীদা বললেন : ওই প্রেসে সব থিয়েটারপাড়ার বড় বড় পোস্টার আর হ্যান্ডবিল ছাপা হতো। পোস্টারে সব নামকরা শিল্পীদের নামগুলি জ্বল জ্বল করত। আর হ্যান্ডবিলের কী সব মনোহারী ভাষা। হাতে পড়লে মনে হবে তক্ষুনি থিয়েটার দেখতে ছুটি।

আমি বললাম : কী রকম ভাষা থাকত হ্যান্ডবিলে? দু-একটা নমুনা দিন না।

তুলসীদা বললেন : সে কত আর বলব তোমাকে। আসুন। দেখুন। উন্মুক্ত মঞ্চের উপর শিবের জটাজাল হইতে গঙ্গার আগমন। কিংবা মঞ্চের উপর জীবন্ত অশ্বপৃষ্ঠে নায়কের প্রবেশ। শূন্যমার্গে দেব-দানবের যুদ্ধ। এইরকম আরও কত কী।

আমি বললাম : ওইসব হ্যান্ডবিল আর পোস্টার দেখেই আপনার অভিনেতা হবার ইচ্ছে হল?

তুলসীদা বললেন : তাই তো হল। কুঁজোরও তো চিত হয়ে শুতে ইচ্ছে হয় গো। তা আমারও মনে হল অভিনেতা হতে পারলে আমারও ওইরকম পোস্টারে নাম ছাপা হবে। সেইজন্যেই তো জ্যাঠামশাইয়ের কাছে এসে বায়না ধরলাম থিয়েটারে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে। জ্যাঠামশাই বললেন : সেই ভালো। তোর তো দেখেছি অ্যাকটিংটা ভালোই আসে। তাছাড়া সব সময় আমার চোখের সামনে সামনে থাকতে পারবি। উনিই অপরেশবাবুর কাছে কাকুতি-মিনতি করে আমাকে থিয়েটারে ঢুকিয়ে দিলেন।

আমি বললাম : তা আপনার পোস্টারে নাম ছাপাবার সাধ মিটেছিল?

তুলসীদা বললেন : কোথায় কী! করতাম তো সব ছুটকো-ছাটকা পার্ট। তার আবার পোস্টারে নাম! পাগল হয়েছ!

তা সেই পোস্টারে নাম তোলার আশা একেবারে শেষ বয়সে এসে পূরণ হয়েছিল তুলসীদার। তবে থিয়েটারে নয়, সিনেমায়। সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর' ছবিতে। বড় বড় হোর্ডিং-এ বিরাট আকারে জ্বল জ্বল করতো তাঁর মুখচ্ছবি।

এই 'পরশ পাথর' ছবিতে কাজ করার সময় তুলসীদা যেন কীরকম হয়ে গিয়েছিলেন। যেন কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব তাঁর মধ্যে এসে গিয়েছিল। সর্বদা একটা ঘোরের মধ্যে থাকতেন। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, রঙ্গ-রসিকতা করতেন আগেরই মতো। কিন্তু তার মধ্যেও কেমন একটা ছন্দপতন লক্ষ্য করতাম। একটি প্রাণখোলা মানুষের মধ্যেকার সহজাত ভাবটা কোথায় যেন উবে গিয়েছিল।

একদিন, কেবল একটা দিনই উনি আমাকে প্রায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিলেন : ব্যাপারটা কী হল বল দিকি! আমাকে নায়ক বানিয়ে ছবি হচ্ছে, এ তো আমি ভাবতেই পারছি না! তাও কিনা সত্যজিৎ রায়ের মতন মানুষের ছবিতে। তবে হ্যাঁ, ওই মানুষটা নাটককে বড় ভালোবাসে গো। কবে কোন্ কোন্ নাটকে আমি কী কী মজার ব্যাপার করেছি, সব স্পষ্ট মনে আছে। সেসব গল্পোও করেন আমার সঙ্গে।

'পরশ পাথর' ছবি রিলিজের সময় তুলসীদা কেমন উদ্ভ্রান্তের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন আমাকে বললেন : এইবারে আমি নিঘ্ঘাত পাগল হয়ে যাব। বড় বড় হোর্ডিংয়ে ইয়া বড় বড় মুখ আমার! জীবনে তো কখনও এত বড় মুখ হোর্ডিংয়ে দেখিনি। এর আগে যাও বা দু-চারবার হয়েছে তা সেসব মুখ তো দূরবীন দিয়ে খুঁজে বার করতে হত। এ আমি কী হনু রে।

তারপর সত্যজিৎ রায়ের উদ্দেশ্যে কপালে নমস্কার জানিয়ে বলেছিলেন : মানুষটা কী রকম রসিক দেখেছ। আমার টাক ফাটিয়ে আটখানা করে তার মধ্যে থেকে রস বার করেছেন। আবার লিখেছেন 'আহ্লাদে আটখানা'। আহা। ওঁরা সব ক্ষণজন্মা পুরুষ গো।

সেই সদানন্দ তুলসীদা ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। উনি চলে যাবার পর স্টার থিয়েটারে আমার আকর্ষণটা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। যখনি যেতাম গ্রীনরুমের সেই শূন্য রকটার দিকে তাকিয়ে বুকটা হু হু করে উঠতো। এখনও করে। তবে স্টার থিয়েটারের শূন্য রকটা দেখে নয়। সেটা তো কবেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঠিক তুলসীদার মরদেহটার মতোই। কিন্তু তাঁর নানা স্মৃতি আজও বুকের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটাই মাঝে মাঝে হু হু করে ওঠে।

বসন্তদা

বসন্ত চৌধুরিকে নিয়ে লিখতে বসে শুরু থেকেই হোঁচট খেতে হচ্ছে। এমন একটা বৈচিত্র্যময় জীবন, যে কোথা থেকে শুরু করব, সেটা ভেবেই থতমত খেতে হচ্ছে। মানুষটার যেমন ব্যক্তিত্ব, তেমনই শিল্পপিপাসা। যেমন রসবোধ, তেমনই অভিনয় ক্ষমতা। সর্বোপরি রয়েছে বিরাট অভিজাত্য। এর যে কোনও একটিকে নিয়েই পাতার পব পাতা লেখা যায়। কিন্তু সেটা তো হবে একটা খণ্ডিত অংশ। আমি তো ধরতে চাই সর্বাঙ্গীণ মানুষটাকে। সেটা দেখাছি খুব সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

তবু কলম যখন ধরেছি তখন তো চেষ্টা করতেই হবে। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করি বলুন তো? আড্ডাধাবী বসন্ত চৌধুরিকে প্রথমেই ধরলে কেমন হয়! ওঁর মতো সুরসিক আড্ডাবাজ মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। যে কোনও পরিবেশে, যে কোনও অনুষঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে পারেন। সেসব আড্ডায় রস আছে, রসিকতা আছে, কিন্তু রুচির বিকৃতি নেই। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পণ্ডিতদের আড্ডায় বসন্ত চৌধুরি যেমন মানানসই, ঠিক তেমনি মানানসই মধ্যবিত্তের ঘরোয়া আড্ডায়। এলিট সোসাইটির আড্ডায় বসন্তদা যেমন সমাদর সহকারে গৃহীত, বিভিন্ন দূতাবাসের সাহেবসুবোরাও তেমনই সমাদরে গ্রহণ করেছেন বসন্ত চৌধুরিকে। সর্বত্রই তিনি একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। আদ্যন্ত বাঙালি পোশাকে সুশোভিত এই মানুষটি সকলের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। এমন একটি মানুষের ছবি আঁকা সহজ কর্ম নয়। তবু চেষ্টা করে তো দেখা যাক।

বসন্ত চৌধুরি এবং আমি প্রায় সমবয়সী। আমি এক বছরেব বড়। ওঁর জন্ম ১৯২৮ সালে। আর আমার ১৯২৭-এ। তা সত্ত্বেও বসন্ত চৌধুরিকে আমি 'বসন্তদা' বলে ডাকি কেন? তারও একটা ইতিহাস আছে। আর সেটা বলতে গেলে ফিরে যেতে হবে সেই ১৯৫২ সালে।

কিছু কিছু মানুষের একটা মহৎ দোষ আছে। তারা যে কোন রচনাকেই গোরুর রচনায় রূপান্তরিত করে নেয়। প্রশ্ন উঠতে পারে : গোরুর রচনা? সেটা আবার কী? কথা তো হচ্ছে বসন্ত চৌধুরি সম্পর্কে। তার মধ্যে গোরু আসছে কী কবে?

তাহলে ধাঁধাটা একটু খোলসা করে দিই। স্কুলের রচনায় এক ছাত্র গোরু সম্পর্কে রচনা আদ্যোপান্ত মুখস্ত করে রেখেছিল। আর কোন বিষয়েই তার পড়া ছিল না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দেখল নদী সম্পর্কে লিখতে বলা হয়েছে। ছাত্রটির তো মাথায় হাত। তখন সে বুদ্ধি খাটিয়ে নদী সম্পর্কে রচনাটি গোরুতে রূপান্তরিত করে নিল। পরীক্ষার খাতায় লিখল : নদী আমাদের খুব উপকারে লাগে। নদীর ধারে মাঠে মাঠে ঘাস থাকে। সেই ঘাস গোরুতে খায়। আর তারপর আমাদের জীবনে গোরুর প্রয়োজনীয়তা কী এবং কতটা তা নিয়ে পুরো তিন পাতা বিশদভাবে লিখে ফেলল।

আমারও হয়েছে তাই। কারও সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলেই আমি নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। ঘুরেফিরে সেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনায় চলে যাই। যেমন চলে যেতে হচ্ছে বসন্ত চৌধুরি সম্পর্কে লিখতে বসে। পুরো পঁয়তাল্লিশটা বছর পিছিয়ে যেতে হচ্ছে।

সেটা ১৯৫২ সাল। আমি তখন সুধাংশু বক্‌সি সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'রূপাঞ্জলি' পত্রিকার একজন কনিষ্ঠ সাংবাদিক। সেখানে আমার যা কিছু কাজ সব ইনডোরে। অর্থাৎ প্রুফ দেখা, প্রেসে গিয়ে পেজ মেক্-আপ করা ইত্যাদি মুদ্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে লিপ্ত থাকতে হত। কচিৎ-কদাচিৎ দু-একটি অ্যামেচার থিয়েটারের রিভিউ করার সুযোগ পাওয়া যেত। স্টুডিওতে যাওয়া কিংবা ছবির শুটিং সম্পর্কে রিপোর্ট করার দায়িত্ব আমি পেতাম না।

তা একবার বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়ল। সুধাংশুবাবু কী কারণে জানি না আমাকে নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে পাঠালেন একটা শুটিং-এর রিপোর্ট করতে। ওই স্টুডিওতে তখন হেমচন্দ্র চন্দ্রের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের 'ছোটি মা' ছবির শুটিং চলছিল। 'ছোটি মা' হল শরৎচন্দ্রের

'বিন্দুর ছেলে' উপন্যাসের হিন্দি সংস্করণ। বিন্দুবাসিনীর চরিত্রে অভিনয় করছিলেন তখনকার দিনের এক বিশিষ্ট নায়িকা মীরা মিশ্র। তিনি একজন আই সি এস-এর গৃহিণী। এলিট সোসাইটির মানুষ। খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর সঙ্গে দু-চারটি কথা বলার। কিন্তু দৃশ্যগ্রহণের লাইট করার ফাঁকে ফাঁকে হেমচন্দ্র মশাই নায়িকাকে এমনি আগলে রাখছিলেন আর গল্পগুজবে মত্ত ছিলেন যে অন্য কেউ সেদিকে ঘেঁষতেই পারছিলেন ন।

জানতাম নিউ থিয়েটার্সের যে কোন ছবির কাজ একটু মন্থর গতিতে হয়। কিন্তু 'ছোটি মা' ছবির দৃশ্যগ্রহণ এতই মন্থর গতিতে হচ্ছিল যে ক্যামেরাম্যান থেকে শুরু করে অন্যান্য টেকনিশিয়ানরা পর্যন্ত সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। ছবির লাইট রেডি, সবাই রেডি, কিন্তু নায়িকার সঙ্গে পরিচালকের খোসগল্প আর শেষই হতে চায় না। কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হয়ে সেট থেকে বেবিয়ে এলাম।

আমার সঙ্গে ছিলেন আমাদের পত্রিকার ফটোগ্রাফার অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। নামটা ঠিক বললাম কি? অনেক দিন আগের ঘটনা তো। তাই নামটা ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে যতদূর মনে পড়ছে অজিতবাবুই তাঁর নাম। ভদ্রলোকের একটা ছবি তোলার স্টুডিও ছিল গোলপার্কের কাছে। রূপাঞ্জলিতে ছবি তোলার কাজটা ছিল পার্টটাইম জব। ভদ্রলোক বেশ ভালো ছবি তুলতেন। শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকেও দেখেছি তাঁর স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তোলাতে।

তা অজিতবাবু বেশ কায়দা করে তাঁর কাজটা ম্যানেজ করে নিয়েছিলেন 'ছোটি মা'র সেটে। শুটিং তো দেখা হয়নি। কিন্তু অজিতবাবু হেমচন্দ্র মশাইকে অনুরোধ করলেন পরিচালকের ভূমিকায পোজ দিতে। হেমবাবুও বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে নায়িকাকে দৃশ্য বোঝানোর পোজ্ দিলেন। ছবিটি রূপাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছিল।

অজিতবাবু তো তাঁর কাজটা ম্যানেজ করে নিলেন। কিন্তু আমার কাজ কিছুই হল না। শুটিং-ই দেখলাম না তো লিখব কী? লিখতে গেলে হেমচন্দ্র আর মীরা মিশ্রের কাজের অজুহাতে আড্ডার কথা লিখতে হয়। কিন্তু সেটা লেখার সাহস আমার সেই। হেমচন্দ্র চন্দ্র হলেন নিউ থিয়েটার্সের বিখ্যাত পরিচালক। ভারতজোড়া তাঁর নাম। ওঁর ডাইরেকশানের 'প্রতিশ্রুতি' ছবিটা দেখে আমি মুগ্ধ। বার আষ্টেক দেখেছিলাম ছবিটা। বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে 'প্রতিশ্রুতি' বি এফ জে এ পুরস্কার পেয়েছিল। ওই অতবড় ডিরেক্টার সম্পর্কে বিরূপ কিছু লেখার সাহস আমার নেই। লিখলে ছাপা হতই। আমাদের সম্পাদক এ ব্যাপারে ভয়ানক সাহসী। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রদের শাসানি সত্ত্বেও উনি ওঁর কলমের রাশ টেনে ধরেননি। সুচিত্রা সেন মামলা করবেন বলে হুমকি দেওয়াতেও উনি দমে যাননি। কিন্তু আমারই সাহসে কুলালো না পরিচালক হেমচন্দ্রের কর্মধারা সম্পর্কে বিরূপ কিছু লেখার। লিখলে হয়তো ভালোই করতাম। যে কারণে নিউ থিয়েটার্সের মতো একটি ভারতবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের নাভিশ্বাস উঠে অবশেষে বন্ধই হয়ে গেল তার অন্যতম কারণ ছিল এই জাতীয় মন্থরগতিতে কাজ। পরের দিকে বিমল রায় ক্যামেরাম্যান থেকে পরিচালক হয়ে লো বাজেটে ছবি করে অবস্থার সামাল দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বিনতা বসু, রাধামোহন ভট্টাচার্য, দেবী মুখার্জি প্রভৃতি নতুন শিল্পীদের নিয়ে 'উদয়ের পথে' ছবি করে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। ছবিটি হই হই করে চলেছিল। তারও পরে মাত্র একুশ দিনে শেষ করেছিলেন 'মন্ত্রমুগ্ধ' নামক একটি ছবির কাজ। তাতেও নতুন শিল্পীরাই বেশি।

বিমল রায় আরও কিছুদিন কলকাতায় থাকলে হয়তো নিউ থিয়েটার্সের চেহারাটাই পালটে যেত। কর্মধারায় পরিবর্তন আসত। এমন করে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু ঘটত না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বাঙালির দুর্ভাগ্য, নিউ থিয়েটার্সের দুর্ভাগ্য, পরিচালক বিমল রায় আর মাত্র দুটি ছবি করেছিলেন নিউ থিয়েটার্সের হয়ে। তার মধ্যে একটি হল সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত ছোট গল্প 'ফসিল' অবলম্বনে 'অঞ্জনগড়'। আর দ্বিতীয়টি হল নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রেক্ষাপটে হিন্দি ছবি 'পহেলা আদমি'। এই ছবিতেই প্রথম অভিনয় করেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল নাজির হুসেন, যিনি পরবর্তীকালে হিন্দি ছবির একজন বিখ্যাত অভিনেতা বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। তার পরেই বিমল রায় মশাই বোম্বাই চলে যান হিন্দি ছবি করতে। সেখান থেকেই বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। বাংলা ছবির জগতে আর ফিরে আসেননি।

এই দেখুন, আমার এই রচনাটাও আবার সেই গোরুর রচনার দিকেই এগোচ্ছে। লিখতে বসেছি বসন্ত চৌধুরির কথা, কিন্তু কলমের আগায় এসে যাচ্ছে নিউ থিয়েটার্সের কথা। অবশ্য বসন্ত চৌধুরি সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে নিউ থিয়েটার্সের কথা তো আসবেই। কারণ এই নিউ থিয়েটার্সই তো অভিনেতা বসন্ত চৌধুরির জন্মদাতা।

সেদিন এই নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতেই আকস্মিক ভাবে দেখা পেয়ে গেলাম বসন্ত চৌধুরির। 'ছোটি মা'র সেট থেকে বেরিয়ে এসে তেতো মন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তখন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও ছিল অনেক খোলামেলা। এখনকার মতো চতুর্দিকে খুদে খুদে ঘরবাড়ি তুলে স্টুডিওর দম বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। গেটের কাছে বড় ফ্লোরটা থেকে বেরোলেই নজরে পড়ত বিখ্যাত গোলঘরটি, যেখানে এসে বসতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নটীর পূজা' ছবির শুটিং করবার সময়। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকার স্টুডিওতে এলে বেশিরভাগ সময় এখানেই বসতেন। আলোচনা করতেন ছোটাইবাবু, কচিবাবু, রাইবাবু, জলুবাবুদের সঙ্গে। গোলঘরটা এখন যেমন বেকার টেকনিশিয়ানদের গল্পগাছা আর বিড়ি খাবার আড্ডা, তখন তেমন ছিল না। তখন ওটা ছিল নিউ থিয়েটার্সের ভি আই পি-দের জন্য সংরক্ষিত। আমরা বহিরাগতরা আমন্ত্রণ না পেলে ওখানে গিয়ে বসবার সাহস পেতাম না। সত্যজিৎ রায়ও লাঞ্চ পিরিয়ডে এই গোলঘরে বসেই সকলের সঙ্গে আলোচনা করতেন।

গোলঘরের পরেই ইন্ডিয়া ল্যাব পর্যন্ত বেশ কিছুটা খেলামেলা জায়গা। বড় বড় গাছের কল্যাণে জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে থাকত। পায়ের নিচে চমৎকার করে ছাঁটা ঘাসের আস্তরণ। সেট থেকে বেরিয়ে ওই মাঠে দাঁড়িয়ে নিউ থিয়েটার্সের প্রবীণ সাউন্ড রেকর্ডিস্ট শ্যামসুন্দর ঘোষের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এমন সময় আমার পাশ থেকে অজিতবাবু চাপা গলায় কণ্ঠস্বরে রীতিমত উত্তেজনা মিশিয়ে বলে উঠলেন: ওই তো বসন্ত চৌধুরি আসছেন!

অজিতবাবুর কথা শুনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ঘুরে দাঁড়ালাম। তার কিছুদিন আগেই চিত্রা সিনেমায় 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিটা দেখে এসেছি। এই একটা ছবিতে অভিনয় করেই বসন্ত চৌধুরি তখন সারা কলকাতার উত্তেজিত আলোচনার বস্তু। শুধু বসন্ত চৌধুরি নন, বসন্ত চৌধুরি আর অরুন্ধতী মুখার্জি দুজনেই। 'মহাপ্রস্থানের পথে'-র ওই নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে সারা কলকাতার সিনেমা রসিকদের মুখে একটাই কথা : এরা যেন 'মেড ফর ইচ আদার'।

বাংলা ছবিতে সেই সময়ে তরুণ নায়কের একটু আকাল চলছে। উত্তমকুমার সবেমাত্র ছবিতে এসেছেন। দু-তিনটি ছবিতে অভিনয় করেও হালে পানি পাচ্ছেন না। জহর গাঙ্গুলি আর ধীরাজ ভট্টাচার্যের বয়স বেড়ে গেছে। ছবি বিশ্বাসের তো আরও বেশি। অসিতবরণ আর রবীন মজুমদার তখন তারুণ্যের কোঠা প্রায় পার হতে চলেছেন। বিকাশ রায় নায়ক করছেন বটে, কিন্তু তাঁর রোম্যান্টিসিজম্ মন ভরাতে পারছে না। এমন সময় 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে বসন্ত চৌধুরিকে দেখে দর্শকরা যেন চমকে উঠলেন। কী অপূর্ব আভিজাত্যমণ্ডিত চেহারা। গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে। আর কণ্ঠস্বর? দেবী মুখার্জির পর এরকম অপূর্ব কণ্ঠস্বর আর কারও মুখ থেকে শোনা যায়নি। ইংরিজিতে একটা কথা আছে, 'গোল্ডেন ভয়েস'। বসন্ত চৌধুরির কণ্ঠস্বর যেন তাই।

তাকিয়ে দেখলাম বসন্ত চৌধুরি আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে এদিকেই আসছেন। চলার ভঙ্গিতে যেন আভিজাত্য ফুটে বেরোচ্ছে। মধ্যবিত্ত মানুষের চলাফেরা একটু ঢিলেঢালা হয়। কিন্তু বসন্ত চৌধুরির সেরকম নয়। ঋজু দৃপ্ত ভঙ্গিতে তিনি এগিয়ে আসছেন। নিশ্চয় ইনি কোন জমিদার ফ্যামিলির ছেলে। সাধারণ বাড়ির ছেলেদের মধ্যে এই আভিজাত্য দুষ্প্রাপ্য।

তখন কী আর জানতাম বসন্ত চৌধুরি আমাদেরই মতো এক মধ্যবিত্ত বাড়ির সন্তান। মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি নাগপুর থেকে কলকাতায় এসেছেন ভাগ্যান্বেষণে।

বসন্ত চৌধুরি ধীরে ধীরে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি মাটির দিকে। বোধহয় কিছু চিন্তা করতে করতে আসছেন। অন্তত আমার তাই মনে হল।

সেট থেকে বেরিয়ে অজিতবাবু ক্যামেরার মুখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন। বসন্ত চৌধুরিকে দেখে

আবার ক্যামেরার মুখ খুলে সেদিকে ছুটে গেলেন। সামনাসামনি গিয়ে ফোকাস করে নিতে নিতে বললেন: এক মিনিট প্লিজ!

সামনে খোলা ক্যামেরা আর ক্যামেরাম্যানকে দেখে বসন্তবাবুর যেন চমক ভাঙল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর সুকুমার ভঙ্গিতে ছবি তোলার জন্যে পোজ্ দিলেন।

চমৎকৃত হয়ে গেলাম বসন্ত চৌধুরির সাবলীলতা দেখে। মাত্র একখানা ছবিতে অভিনয় করে কোন নায়ককে আমি এতটা সাবলীল হতে দেখিনি। প্রেসের লোকেদের সামনে তাঁদের কেমন একটা জড়তা থাকে। কিন্তু বসন্ত চৌধুরির মধ্যে বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। বেশ বুঝতে পারলাম, এই নতুন নায়কটি 'একদিন কা সুলতান' নন। ইনি অনেকদিন থাকবেন। এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করবেন।

অজিতবাবু সেদিন একবার মাত্র শাটার টিপেই ক্ষান্ত হননি। বসন্তবাবুকে ওরকম সাবলীল ভঙ্গিতে পোজ্ দিতে দেখে বেশ কয়েকটি ছবি তুলেছিলেন। রূপাঞ্জলির পৃষ্ঠায় সেগুলি ছাপাও হয়েছিল।

ছবি তোলার পর্ব শেষ হতেই আমি এগিয়ে গেলাম বসন্ত চৌধুরির দিকে। আর প্রথমেই একটি ভুল করে বসলাম। আমি ওঁকে 'বসন্তদা' বলে সম্বোধন করলাম। তখন কী আর জানতাম উনি বয়সে আমার থেকেও এক বছরের ছোট। আসলে আমার থেকে কয়েক ইঞ্চি লম্বা এই ব্যক্তিত্ববান মানুষটিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, উনি বোধহয় আমার থেকে বয়সে বেশ কিছুটা বড়ই হবেন।

আমার এই 'বসন্তদা' উচ্চারণটাই বোধহয় সেদিন আমাদের আলাপের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ কিছুই হল না। মনে হল উনি আমার প্রশ্নগুলিকে কোন গুরুত্বই দিলেন না। মামুলি দু-একটা কথা বলে উনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

সেই থেকে উনি আমার সম্বোধনে বসন্তদাই থেকে গেছেন। আর আমাকে প্রথম প্রথম দু-চারবার হয়তো তুমি-টুমি বলেছেন উনি। কিন্তু কিছুদিন পরেই আমাকে 'তুই' করে নিয়েছেন। এটা বসন্তদার একটা মস্ত গুণ। উনি যাকে হৃদয়ের মধ্যে ঠাঁই দেন, তাকে আপনি-আজ্ঞে করেন না। তুমিও না। একেবারে তুই-তে এসে পৌঁছোন।

যাই হোক, বসন্তদার সেদিনকার অবহেলাটা আমার খুব মনে লেগেছিল। পরে যখন ওঁর অন্তরঙ্গ হয়েছি, তখন একদিন প্রশ্ন করেছিলাম: আচ্ছা বসন্তদা, তুমি আমাকে সেদিন আন্ডার এস্টিমেট করেছিলে কেন বলো তো?

বসন্তদা বললেন: তুই যে ঘটনার কথা বলছিস তার কিছুই আমার মনে নেই। অতদিনের ব্যাপার তো! মনে থাকবার কথাও নয়। আর আন্ডার এস্টিমেটের কথা যে বলেছিস, তোকে আমি এস্টিমেট করলাম কবে যে আন্ডার আর ওভার! তোকে আমি খবরের কাগজের লোক বলে মনেই করি না।

তাহলে বসন্তদা আমাকে কী মনে করেন? কী মনে করেন সেটা বোঝাতে গেলে খুব সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা বলতে হয়। এবারের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বসন্তদার সঙ্গে রোজই দেখা হত। নন্দন প্রেক্ষাগৃহের ব্যালকনিতে উনি এক নম্বর রো-তে বসতেন। আমি বসতাম দুই কিংবা তিন নম্বর রো-তে। তা সেদিন আমার পাশে বসেছিল আমার পুত্র সাংবাদিক অশোক বসু। আমি ওর সঙ্গে বসন্তদার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে বললাম: বসন্তদা, এই দেখুন আমার ছেলে।

বসন্তদা সামনের রো থেকে মুখ ফিরিয়ে অশোককে দেখলেন। তারপর বললেন: আরে, আমি তো তোমাকে চিনি। তুমি তো একদিন আমার বাড়িতে গিয়েছিলে।

অশোক বললে: হ্যাঁ, শুধু যাওয়াই নয়, বেশ খানিকটা অত্যাচার করেও এসেছিলাম।

বসন্তদা সরস ভঙ্গিতে বললেন: তুমি আর কী অত্যাচার করেছ! তোমার বাবা সারা জীবন ধরে আমার ওপর যে অত্যাচার করেছে, তার তুলনায় ওটা তো কিছুই নয়।

বসন্তদার কথা শুনে আমিও তেমনি সরস ভঙ্গিতে বললাম: শুধু অত্যাচার করেছি বলছ কেন! বহুবার তো অত্যাচারিত হয়েওছি।

বসন্তদা বললেন: সে কী রে! আমি আবার তোর ওপর অত্যাচার করলাম কবে?

আমি বললাম: অত্যাচার নয়? তুমি দিনের পর দিন তোমার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে চর্ব-চোষ্য লেহ্য-পেয় খাইয়েছ আর আমাকে মুখ বুজে মাথা হেঁট করে সেটা খেতে হয়েছে, এটা বুঝি অত্যাচার নয়?

আমার কথা শুনে বসন্তদা সেদিন তাঁর স্বাভাবিক সংযমের গণ্ডী ভেঙে একটু জোরে হেসে উঠেছিলেন।

অতীতের সেইসব দিনগুলিতে আমি শুনেছি বসন্তদার নানা সংগ্রামের কাহিনী। জানতে পেরেছিলাম, কেমন করে মাত্র দুটো প্যান্ট আর দুটো শার্ট ব্যাগে ভরে নাগপুর থেকে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতা পাড়ি দিয়েছিল মাত্র বাইশ বছরের এক যুবক।

বসন্ত চৌধুরি নিঃসন্দেহে একজন বড় মাপের অভিনেতা। কিন্তু অভিনয় ছাড়াও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাগুলি আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখেছি, বসন্তদার নিজেরই উৎসাহ বেশি সেই সব কাজে। যেমন প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ এবং সেই সম্পর্কে গবেষণা। এসব নিয়ে তাঁকে দূর-দূরান্তে ছুটে যেতে দেখেছি। অহোরাত্র পরিশ্রম করতে দেখেছি। এর জন্যে প্রয়োজন হলে প্রযোজকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ছবির কাজ থেকে ছুটি নিয়ে গেছেন মফঃস্বলের কোনও গ্রামে। এসব কাজে তাঁর বিশেষ কোন আর্থিক লাভ হয়নি। এসব তিনি করেছেন প্রাণের টানে, শিল্পচেতনার তাগিদে।

আমি তখন 'দেশ' পত্রিকার সাব-এডিটর। একদিন অফিসে আমাদের সম্পাদক সাগরময় ঘোষ তাঁর ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তারপর আমার হাতে একটা পাণ্ডুলিপি ধরিয়ে দিয়ে বললেন · এটা আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে। এখনি প্রেসে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

লেখাটা হাতে নিয়ে দেখলাম প্রাচীন মুদ্রা সম্পর্কিত একটি গবেষণামূলক রচনা। লেখকের নাম বসন্ত চৌধুরি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম এতদিন আমাদের দেশে বসন্ত চৌধুরি বলে একজন অ্যাকটর ছিলেন। এখন ওই নামের একজন লেখককেও খুঁজে পাওয়া গেল।

সাগরদা বললেন : ইনি আলাদা লোক কে বললে তোমাকে! অ্যাকটর বসন্ত চৌধুরিই তো এই আর্টিকলটা লিখেছে।

শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। নিজের টেবিলে ফিরে এসে প্রবন্ধটা খুব মন দিয়ে পড়লাম। পড়ে যেমন আনন্দ পেলাম, তেমনি বিস্মিত হলাম। সারা প্রবন্ধটার মধ্যে কোথাও কোন কন্‌স্ট্রাকশনে গণ্ডগোল নেই। একটাও ভুল বানান নেই। অত্যন্ত সুলিখিত একটি প্রবন্ধ।

প্রবন্ধটি পরের সংখ্যায় ছেপে বেরিয়ে গেল। প্রাচীন মুদ্রা সম্পর্কিত গবেষণা। কেবল তথ্যের ভারেই ভারাক্রান্ত নয়। লেখার মধ্যে প্রসাদগুণ আছে।

এর কিছুদিন পরে বসন্তদার সঙ্গে দেখা। হাসতে হাসতে বললাম · বসন্তদা, আপনার লেখাটা দারুণ হয়েছে। আপনি গল্প উপন্যাস লেখেন না কেন? লিখলে খুব নাম করতে পারতেন। পাঠকরা আপনার লেখা পড়ে নাচানাচি করত নিশ্চয়।

বসন্তদাও হাসতে হাসতে জবাব দিলেন : গল্প-উপন্যাস এখনও লিখছি না কেন জানিস। পাছে তুই কোনদিন গল্প-উপন্যাস লেখা শুরু করিস তাই প্রবন্ধ লিখে তোকে আগাম সাবধান করে রাখলাম। তুই যেদিন গল্প-উপন্যাস লেখা শুরু করবি, সেদিন তোকে চ্যালেঞ্জ করে আমিও ওসব লেখা শুরু করব।

আমি বললাম : ও ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমাকে তো আর পাগলা কুকুরে কামড়ায়নি যে গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করব।

বসন্তদা আশ্বস্ত হবার ভঙ্গিতে বললেন : যাক, বাংলা সাহিত্য অন্তত একজনের বলাৎকারের হাত থেকে বেঁচে গেল!

বসন্তদার বলার ভঙ্গিতে আমি উচ্চস্বরে হেসে উঠলাম। নিজে গম্ভীর থেকেও অন্যকে হাসানোর অসাধারণ ক্ষমতা বসন্তদার আছে।

হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে গেছে এইভাবে বসন্তদা জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যাঁ রে রবি, তোর বাড়ি তমলুকে?

আমি বললাম : হ্যাঁ। কেন?

বসন্তদা বললেন : তুই আগে বলিসনি তো! সেদিন তমলুকে গিয়ে জানতে পারলাম, তুই আর শমিত ভঞ্জ হচ্ছিস তমলুকের দুই সুসন্তান।

আমি বললাম : অত ঠাট্টা করবার কী আছে। তমলুকে জন্মানোটা কি অপরাধ?

বসন্তদা বললেন : এই দ্যাখ, তুই দেখছি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছিস। সত্যি বলছি আমি ঠাট্টা করছি না। সেদিন তমলুকে গিয়েছিলাম তো! সেখানেই জানতে পারলাম তুই তমলুকের লোক। তোদের তমলুক খুব ভালো জায়গা। প্রাচীন এবং বর্ধিষ্ণু। অতীতের তাম্রলিপ্ত তো!

আমি বললাম : তুমি তমলুকে গিয়েছিলে শুনিনি তো! তমলুকে কোনও থিয়েটার কিংবা ফাংশন ছিল নাকি?

বসন্তদা বললেন : পাগল হয়েছিস! আমি ওসব অ্যামেচার থিয়েটার-ফিয়েটার করি না।

আমি বললাম : তাহলে কি আবৃত্তি করতে গিয়েছিলে?

বসন্তদা বললেন : আমি আবৃত্তি করতে পারি তুই জানলি কী করে? তুই আমার আবৃত্তি শুনেছিস নাকি?

আমি বললাম : একবার শুনেছি। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের একটা অনুষ্ঠানে। সেটা বোধহয় পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে। কী ষাটের দশকের গোড়ার দিকেও হতে পারে। তুমি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটা আবৃত্তি করেছিলে। দারুণ হয়েছিল। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল তোমার আবৃত্তি।

বসন্তদা বললেন : সে তো অনেকদিনের কথা রে! তোর মনে আছে এখনও?

তা সেদিন মনে রাখবার মতোই আবৃত্তি করেছিলেন বসন্তদা। ভরাট কণ্ঠস্বরে, ঋজু দৃপ্ত ভঙ্গিতে বসন্তদা নাটোরের বনলতা সেনকে হাজির করেছিলেন আমাদের সামনে। তখন তো ঘরে ঘরে এত আবৃত্তিকারের ছড়াছড়ি ছিল না। আবৃত্তির শিক্ষণকেন্দ্রও তৈরি হয়নি এখনকার মতো। তখন একটা ভালো আবৃত্তি শুনতে পাওয়া ছিল রীতিমত সৌভাগ্যের ব্যাপার।

বসন্তদার সেদিনকার আবৃত্তি শুনেছিলাম পঞ্চাশের দশকের শেষে। তার আগে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি শুনেছিলাম মানিকতলায় একটা রাজনৈতিক সম্মেলনে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্রকে নিয়ে একটা কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন তিনি। ইলা মিত্র তখন আমাদের কাছে জীবন্ত বিগ্রহের মতো। ভিন্ন রাষ্ট্রে পুলিশ তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। কিন্তু তাঁর আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। ইলা মিত্রকে নিয়ে তখন নানা কাহিনী প্রচারিত হচ্ছে। সেই ইলা মিত্রকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে শম্ভু মিত্র যখন মাইকের সামনে বলতেন, 'ইলা মিত্র স্ট্যালিননন্দিনী' তখন আমাদের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

বসন্ত চৌধুরির আবৃত্তি শোনার আগে পর্যন্ত আমার মুগ্ধতা আবর্তিত হচ্ছিল শম্ভু মিত্রের আবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু বসন্তদার আবৃত্তি এনে দিল আর এক ধরনের মুগ্ধতা। উপলব্ধি করলাম যে নাটকীয়তা আরোপ না করেও কবিতা আবৃত্তি করা যায়, এবং তার আবেদনও কোন অংশে কম নয়। পরে ষাট সত্তরের দশকে শম্ভু মিত্রের ভরাট কণ্ঠের আবৃত্তি শুনেছি। সেগুলি অপূর্ব। কণ্ঠস্বরের কাঁপুনিও অনেক পরিমিত। শম্ভুবাবুর সেই সময়কার আবৃত্তি যদি ক্যাসেটবন্ধ করে রাখা যেতে পারত, তাহলে তাঁর 'দিনান্তের প্রণাম' নামক আবৃত্তির ক্যাসেটটি রীতিমতো জোলো মনে হত। শম্ভুবাবুর সেসব আবৃত্তি যাঁরা শোনেননি তাঁরা সত্যিই একটা বড় প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এই যে শম্ভু মিত্রের আবৃত্তির সঙ্গে বসন্ত চৌধুরির আবৃত্তিকে এক সারিতে বসালাম তাতে হয়তো অনেক মিত্রপ্রেমী কুপিত হতে পারেন। কিন্তু আমি ঢাক ঢাক গুড় গুড় পছন্দ করি না। মনের কথা অকপটে প্রকাশ করা পছন্দ করি। তাতে যদি কারও ভালো না লাগে, তাহলে আমি নাচার।

এখন তো কত জায়গায় কত আবৃত্তির আসর বসে। সেসব জায়গায় বসন্ত চৌধুরির কণ্ঠ শোনা যায় না কেন, তা নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন আছে। বসন্তদার সঙ্গে এর পরে দেখা হলে এর কারণটা জেনে নিতে হবে।

যাই হোক, আবার সেই তমলুকের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বসন্তদাকে জিজ্ঞাসা করলাম : নাটকও করতে যাওনি, আবৃত্তিও করতে যাওনি, তাহলে তুমি তমলুকে গিয়েছিলে কী করতে?

বসন্তদা বললেন : আমি গিয়েছিলাম তোদের ওখানকার মিউজিয়ামটা দেখতে। তোদের মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিং-এর পাশে যে মিউজিয়ামটা আছে তার কালেকশন বেশ ভালো।

বুঝলাম বসন্ত চৌধুরির শিল্পপিপাসা তাঁকে কলকাতা থেকে অতদূরে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে। এই পিপাসা আমাদের পশ্চিমবাংলার অভিনয়ের জগতে আর কারও আছে বলে তো শুনিনি।

তা বসন্তদাকে জিজ্ঞাসা করলাম : তুমি যে তমলুকে গেলে, ঘুরে ফিরে বেড়ালে, ওখানকার মানুষজন তোমাকে দেখবার জন্যে কিংবা অটোগ্রাফ নেবার জন্যে হামলে পড়েনি? মফস্বলের একটা শহরে তোমার মতো একজন জনপ্রিয় তারকাকে সশরীরে দেখতে পাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়।

বসন্তদা বললেন : আমাকে দেখবার জন্যে একেবারেই যে মানুষজন আসেনি তা নয়। অনেকেই এসেছিল। কিন্তু তারা সবাই খানিকটা দূরে দূরেই থেকেছে। আসলে তোদের তমলুকের মানুষজন একটু ভিতু। তারা বৃটিশের গুলির সামনে এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু বসন্ত চৌধুরির সামনে আসতে ভয় পায়।

বুঝলাম সদারসিক বসন্ত চৌধুরির এও এক ধরনের রসিকতা।

তা বসন্ত চৌধুরিকে সাধারণ মানুষ যে কী শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে সেটা তো পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে দেখে আসছি। অভিনেতা হিসেবে বসন্ত চৌধুরির গ্ল্যামার তৈরি হয়ে গিয়েছিল উত্তমকুমারেরও আগে। উত্তমবাবুর গ্ল্যামার তৈরি হয়েছিল 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবির পর। তার আগে বসন্তদার 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবি হয়ে গেছে। সুচিত্রা সেনের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছবি হয়ে গেছে। উত্তম-সুচিত্রা জুটি যখন বাংলার চলচ্চিত্রদর্শকদের কাছে এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, তখন বসন্ত চৌধুরির গ্ল্যামার ছিল অন্য ধরনের। উত্তমবাবুর আকর্ষণ উগ্র জনপ্রিয়তায়। আর বসন্তদার আকর্ষণ শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসায়। সেই ষাটের দশকে উত্তমবাবু যখন আমাদের বিবেকানন্দ রোডের উল্টোরথ অফিসে আসতেন, তখন তাঁকে পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকাতে হত। কাকপক্ষীও যাতে তাঁর আগমন সংবাদ জানতে না পারে তার জন্যে সতর্ক থাকতে হত। কিন্তু বসন্তদাকে নিয়ে আমাদের কোনও প্রবলেম হয়নি। উনি যখন আসতেন তখন বিবেকানন্দ রোডের মেইন গেট দিয়ে অফিসে ঢুকতেন। যেখানে বসতেন সেখান থেকে রাস্তার পথচারীরাও তাঁকে দেখতে পেতেন। গেটের সামনে মানুষজনের ভিড় জমত। দু-চারজন এগিয়ে এসে অটোগ্রাফও নিতেন। কিন্তু কেউ কোনদিন অসভ্যের মতো তাঁর শরীরের ওপর হামলে পড়েননি। দূর থেকে শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেছেন। স্পষ্টই বুঝতে পারতাম, উত্তমকুমার ভীষণ জনপ্রিয়, আর বসন্ত চৌধুরি ঠিক তদনুরূপ শ্রদ্ধেয়।

এবারের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও ঠিক সেই দৃশ্যটাই দেখেছি। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বসন্ত চৌধুরি অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ তাঁর চলাফেলায় বাধা সৃষ্টি করছে না। একটা সশ্রদ্ধ দূরত্ব বজায় রেখে তাঁকে দেখছে। দু-একজন দু-একটি কথা বলছে। বসন্তদা অতিচেনা মানুষের মতো তাঁদের কথার উত্তর দিচ্ছেন। দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন এই জনসমুদ্রেরই একজন। ফিল্মস্টার বলে নিজেকে জাহির করার কৃত্রিম কোনও প্রচেষ্টা নেই। আবার জনগণের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলাফেরার অভিলাষও নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি একজন মুক্তচিত্তের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

একটু আগেই রসিক বসন্ত চৌধুরির কথা বলছিলাম না। সেই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

বসন্তদা একজন পরিশীলিত আড্ডাবাজ মানুষ। তাঁর বাড়িতেও আড্ডা জমে। অবশ্যই বন্ধু-বান্ধবের। বিশেষ করে ছুটিছাটার দিনে। আবার আড্ডার মেজাজে থাকলে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েও পড়েন। কয়েক লিটার তেল খরচ করে গাড়ি চালিয়ে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গিয়ে হাজির হন।

একদিনের একটা ঘটনা বলি। আমি তখন উল্টোরথ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। আমাদের অফিস উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে। একদিন বিকেল তিনটে নাগাদ হঠাৎ বসন্তদা আমাদের অফিসে এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই বললেন : তোদের সঙ্গে একটু আড্ডা দিতে এলাম। তোদের কোন অসুবিধা নেই তো?

তা তখনকার দিনে যে কোন পত্রিকার অফিসেই আড্ডা বসত। আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রমুখ দৈনিক পত্রিকার অফিসে যেমন বসত, তেমনি কল্লোল, পরিচয়, প্রবাসী, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনার কথাসাহিত্য ইত্যাদি সাময়িকপত্রের অফিসেও আড্ডা বসত। সেসব আড্ডার সরস বিবরণ বিভিন্ন লেখক নানা

জায়গায় লিখেছেন। তেমনি সিনেমা সংক্রান্ত পত্রিকার অফিসেও আড্ডা বসত। স্বর্গত কালীশ মুখোপাধ্যায়ের রূপমঞ্চ পত্রিকার অফিসে তো নিয়মিত আড্ডার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের উল্টোরথ পত্রিকার অফিসেও আড্ডা বসত তবে অনিয়মিত।

বসন্তদাকে দেখে আমি বললাম : এসো এসো। আড্ডা দেব তার আর অসুবিধে কী? বরং কিছুক্ষণ কাজের চাপ থেকে হাঁফ ছাড়া যাবে। তা আজ এত সকাল সকাল তোমার শুটিং প্যাক-আপ হয়ে গেল যে?

তখন উত্তর কলকাতার সিঁথির মোড়ে একটা বড় স্টুডিও ছিল। ন্যাশনাল সাউন্ড স্টুডিও। সেখানে নিয়মিত এম পি প্রোডাকসন্স এবং অন্যান্য প্রোডিউসারদের ছবির শুটিং হত। আমি ভেবেছিলাম, বসন্তদা আজ ওই স্টুডিওতেই শুটিং করতে গিয়েছিলেন। সকাল সকাল কাজ শেষ হয়ে যাওয়াতে আমাদের এখানে ঢুঁ মেরে যাচ্ছেন।

কিন্তু আমার কথা শুনে বসন্তদা বললেন : আমার তো আজ শুটিং ছিল না। আমি সোজা বাড়ি থেকে আসছি।

বসন্তদা তখন থাকতেন টালিগঞ্জের সাত নম্বর রিজেন্ট গ্রোভে। ওই অতদূর থেকে গাড়ির তেল পুড়িয়ে বসন্তদা এই উত্তর কলকাতায় নিছক আড্ডা দিতে এসেছেন শুনে বিস্মিত হলাম। বললাম : ভালোই করেছ। আজ বেশ জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। তা কী খাবে বলো। টোস্ট? ওমলেট? ওসব ছাড়া তো এখানে অন্য কিছু পাওয়া যায় না। চাচার হোটেলের শিককাবাব কী কাটলেট খেতে ইচ্ছে করলে আরও খানিকটা দেরি করতে হবে। ওরা এখনও ভাজা শুরু করেনি।

বসন্তদা বললেন : তুই একটা টিপিক্যাল বাঙালি। খাওয়া ছাড়া আর কিছু বুঝিস না। জানি আড্ডার সঙ্গে জমিয়ে খাওয়ার একটা ঘোরতর সম্পর্ক আছে। কিন্তু সব সময় যে সেটার দরকার তার কোন মানে নেই। তেমন করে জমিয়ে আর রসিয়ে আড্ডা দিতে পারলে তাতেই খাওয়ার কাজ হয়ে যায়।

তা বসন্তদার কথা শুনে তাঁকে আর খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলাম না। মাত্র এক কাপ চা এগিয়ে দেওয়া হল তাঁর সামনে।

সেদিন খুব জমিয়ে আড্ডা চলছিল। এমন সময় একটি পাগল এসে দাঁড়াল অফিসের দরজার সামনে। পাগলটি প্রায় রোজই আসে। পাঁচ দশ পয়সা হাতে দিলে চলে যায়। সেদিনও তার হাতে দশটি পয়সা দিলাম, কিন্তু পাগলটি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল না। বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বসন্ত চৌধুরিকে দেখল। তারপর ফিক করে একবার হেসে ধীরে ধীরে চলে গেল।

পাগলের ওই ফিক করা হাসি দেখে আমি বসন্তদাকে বললাম : পাগলটা ঠিক তার জাতভাইকে চিনতে পেরেছে। তাই অতক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তোমাকে দেখছিল। যাবার সময় আবার এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে গেল।

বসন্তদা আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন : ভয় নেই, ভালো হয়ে যাবি।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম : কে ভালো হয়ে যাবে?

বসন্তদা তেমনি গম্ভীরভাবে বললেন : তুই।

আমি বললাম : তার মানে?

বসন্তদা বললেন : তাহলে একটা গল্প বলি শোন। গল্পটা হয়ত তোদের শোনা। তবু আর একবার শুনে রাখা দরকার।

জওহরলাল নেহরু তখন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার। তিনি একবার রাঁচির পাগলা গারদ পরিদর্শনে এলেন। ডাক্তাররা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। নেহরুজি বললেন, আমার সঙ্গে গারদের ভেতরে আপনাদের কারও যাবার দরকার নেই। একজন ভালো গাইড দিন। সেই আমাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

তা নেহরুজির সঙ্গে একজন গাইড দেওয়া হল। তিনি নেহরুজিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখাতে লাগলেন। কত রকমের পাগলের জন্যে কত রকম ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে, তাদের কখন কী খেতে দেওয়া হয়, কীভাবে চিকিৎসা করা হয়, সেসব প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি।

গাইডটির ব্যবহারে নেহরুজি খুব প্রীত হলেন। গারদ থেকে বেরোবার আগে তিনি তাঁকে বললেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি যে ভাবে ডিটেলে সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন তা আমার খুব ভালো লেগেছে।

গাইডটি বললেন, ধন্যবাদের কী আছে। এটা তো আমার ডিউটি। আপনার মতো একজন শান্ত ভদ্র মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। একবারের জন্যেও বিরক্ত হননি, বা বিরক্ত করেননি। তা আপনার নামটি কী মশায়?

নেহরুজি গাইডটির দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, আমার নাম জওহরলাল নেহরু।

নেহরুজির কথা শুনে গাইডটি ফিক করে একবার হাসলেন। তারপর বললেন, ভয় নেই। মাস ছয়েকের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবেন।

নেহরুজি অবাক হয়ে বললেন, তার মানে?

গাইডটি বললেন, আমি যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম তখন নিজেকে মহাত্মা গান্ধী বলতাম। দেখতেই তো পাচ্ছেন, ছ' মাসের মধ্যে আমার কতটা ইমপ্রুভমেন্ট। কাজেই আপনিও ভালো হয়ে যাবেন।

গল্পটি শেষ করে বসন্তদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : যে নিজেকে ছাড়া পৃথিবীর আর সবাইকে পাগল ভাবে তার থেকে বড় পাগল আর কেউ আছে নাকি?

এই হল বসিক মানুষ বসন্ত চৌধুরির রসালাপের সামান্য নমুনা।

আবার এর উল্টো রূপেও বসন্তদাকে দেখেছি। তিনি তখন কোট প্যান্ট টাইয়ে সুশোভিত হয়ে পাক্কা সাহেবের মতো কল্পনা অ্যাডভার্টাইজিং-এ বসেন।

সেদিন কিন্তু বসন্তদার ব্যবহারে আমি সত্যিই বড় কষ্ট পেয়েছিলাম।

বসন্ত চৌধুরির মাত্র বাইশ বছর বয়সে নাগপুর থেকে কলকাতা অভিযান কেবলমাত্র অভিনেতা হবার তাগিদে, এটা শুনে আমার খুব আশ্চর্য মনে হয়েছিল। লেখাপড়া শিখে ভালো করে পাস-টাস করার পর একজন যুবকের লক্ষ্য থাকে একটি ভাল চাকরির দিকে। কারও কারও বা উদ্দেশ্য থাকে এঞ্জিনিয়ার অথবা ব্যারিস্টার হওয়া। কিংবা একজন বড় ডাক্তার।

কিন্তু বসন্তদা একেবারেই ব্যতিক্রম। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল অভিনেতা হওয়া। অথচ তিনি যদি উকিল, ব্যারিস্টার বা এঞ্জিনিয়ার হতে চাইতেন তবে তা অনায়াসেই হতে পারতেন। সে যোগ্যতা যে তাঁর ছিল তা আজকের বসন্ত চৌধুরিকে দেখে সকলেই স্বীকার করবেন। বসন্তদার এই ছন্নছাড়া অভিলাষ, তার কারণ কী?

আজকের দিনে অভিনেতারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা রোজগার করেন। তেমন তেমন অভিনেতা হতে পারলে দেশ-বিদেশের সম্মানিত ব্যক্তির তালিকায় নিজের নাম সংযোজিত করতে পারেন। কিন্তু সেই পঞ্চাশের দশকে তো ঠিক এমন অবস্থা ছিল না। তখন অভিনেতাদের হাতে এতো পয়সাও আসত না, এমন সামাজিক সম্মানও জুটত না।

তাহলে?

বসন্তদাকে এ সম্পর্কে প্রশ্নও করেছিলাম একদিন। কিন্তু তার তেমন সদুত্তর পাইনি। ভীষণ চাপা স্বভাবের মানুষ তো! কেবল বললেন : না, আমি অন্য কিছু হতে চাইনি। একজন অভিনেতা হতেই চেয়েছিলাম কেবল।

এমন নয় যে ছোটবেলা থেকেই তাঁর অভিনয়ের প্রতি অনুরাগ ছিল। স্কুল লাইফে কিংবা কলেজ লাইফে দু-চারবার অভিনয় করেছেন বটে, কিন্তু তা এমন কিছু নয়। সেইসব অভিনয়ের জন্য ভূয়সী প্রশংসা আর পুরস্কার-টুরস্কারও যে পেয়েছেন তাও নয়। বাড়িতেও যে অভিনয়ের কোন ট্র্যাডিশন ছিল তাও নয়। তবু বসন্ত চৌধুরি বি. এ. পাস করার পর অভিনয়ের প্রফেশ্যনটাই বেছে নিলেন।

এইসব দেখেশুনেই তো বলতে ইচ্ছে করে, বসন্ত চৌধুরি আমার পরিচিত পরিধির মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী একটি মানুষ।

আক্ষরিক অর্থে যাকে একবস্ত্রে বলে, প্রায় সেই অবস্থাতেই নাগপুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন বসন্তদা। দুটি শার্ট আর দুটি প্যান্ট নিয়ে কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে বাইশ টাকা দিয়ে টিকেট কেটে বম্বে মেলের থার্ড ক্লাসে চেপে বসেছিলেন। কলকাতায় তেমন কোন পয়সাওয়ালা আত্মীয়স্বজন ছিল না যে তাঁর ওখানে এসে উঠবেন। এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কর্মস্থলে ল্যাবরেটরির এক কোণায় পাতা টেবিলের ওপর শুয়ে রাত্রিযাপন করতেন। খেতেন বাইরে বাইরে। পাই পয়সার হিসেব কবে করে। তার সঙ্গে দিনভর চলত এ স্টুডিও থেকে ও স্টুডিও, এ প্রযোজকের দরজা থেকে ও প্রযোজকের দরজা, এ পরিচালকের বাড়ি থেকে ও পরিচালকের বাড়িতে ধরনা। অভিনয় করার একটা চান্স চাই।

একটা দিক থেকে বসন্তদা খুবই ভাগ্যবান। একটা চান্স পাবার জন্যে যে সব তরুণদের দরজা থেকে দরজায় ঘুরে বেড়াতে হয়, তাদের কিছুটা গঞ্জনা আর বক্রোক্তি শুনতেই হয়। কিন্তু বসন্তদার বেলায় সেটা হয়নি। কারণ, তাঁর ছিল নায়কোচিত চেহারা আর অপূর্ব কণ্ঠস্বর। কিন্তু তা সত্ত্বেও বসন্তদাকে দীর্ঘ একটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে একটি সুযোগের জন্য। ওই একটি বছর কলকাতা শহরে একজন সহায় সম্বলহীন যুবকের যে কী ভাবে কেটেছে তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

বসন্তদা কিন্তু সেইসব শিহরণের কাহিনী আজ আর স্মরণ করতে চান না। বলেন : পাস্ট ইজ পাস্ট। সেটাকে স্মৃতি হিসেবে আঁকড়ে থেকে নিজেকে জাহির করা আমি পছন্দ করি না। এরকম স্ট্রাগল তো প্রত্যেক মানুষকেই করতে হয়। কাউকে কম আর কাউকে বেশি। কেউ সাকসেসফুল হয়, আবার কেউ হয় না। তা নিয়ে অত মাতামাতি করার কী আছে তা তো আমি বুঝি না।

আমি বললাম : কিন্তু তোমাদের সেই স্ট্রাগলের ইতিহাসটাও তো পরবর্তী জেনারেশনের কাছে প্রকাশ হওয়া দরকার। যারা অভিনয়ের একটা সুযোগ পাওয়া মাত্রই লক্ষ লক্ষ টাকার ঝনঝনানির আওয়াজ শুনতে পায়, তাদের তো জেনে রাখা দরকার যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিটি ইঞ্চি জমি দখলের জন্যে কী পরিমাণ লড়াই করতে হয়। যেটা তোমাকে, শুধু তোমাকেই বা বলি কেন, তোমাদের মতো অনেককেই করতে হয়েছে। আজ না হয় তুমি প্রতিষ্ঠা পেয়েছ, একটা রোলের জন্যে কারও কাছে অ্যাপ্রোচ করতে হয় না। তোমার নিজস্ব যোগ্যতাতেই সেইসব ভূমিকাগুলি তোমার কাছে আসে। কিন্তু এমন অবস্থা তো চিরদিন ছিল না। তোমাকেও তো একটু সুযোগের জন্যে ছুটে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। সেই ইতিহাসটা জানা না থাকলে কামিং জেনারেশনের সংগ্রাম করার মানসিকতাই তো তৈরি হবে না।

তা বসন্তদার সে একটা সংগ্রামের দিন গেছে বটে। অনেক ঘোরাঘুরির পর রাধা ফিল্মসের মাধব ঘোষালদের 'মন্দির' ছবিতে নায়ক হবার চান্স পেলেন বসন্তদা। রাধা ফিল্মসের তখন খুব নামডাক। ওঁদের নিজেদের স্টুডিও। স্টুডিওটি পরবর্তীকালে উঠে যায়। কলকাতার প্রথম দূরদর্শন কেন্দ্রটি সেখানেই স্থাপিত হয়। পরে টি ভি সেন্টার গল্‌ফ গ্রিনে তার নিজস্ব ভবনে উঠে যায়। এখন রাধা ফিল্ম স্টুডিওর জায়গাটিতে পশ্চিমবঙ্গের সেনসর বোর্ডের অফিস।

যাই হোক, রাধা ফিল্মসের তখন প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক দেবকীকুমার বসু। 'মন্দির' ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন দেবকীবাবুর ভাইপো চন্দ্রশেখর বসু। তিনি দেবকীবাবুরই সহকারী ছিলেন। বসন্ত চৌধুরিকে ওঁদের খুব পছন্দ হয়ে গেল। অবিলম্বে নায়কের ভূমিকায় চুক্তিবদ্ধ করে নিলেন তাঁকে। বোধহয় হাজার তিনেক টাকায় পিকচার কন্ট্রাক্ট হয়েছিল। তার মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনশো টাকা অ্যাডভান্স পেয়ে গেলেন।

বসন্তদা বললেন : ওই তিনশো টাকা হাতে পেয়ে তখন যে কী আনন্দ হয়েছিল তা তোকে কী বলব রবি। তখনকার বাজারে তিনশো টাকার দাম অনেক। এখনকার ভ্যালুয়েশনে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকার মতো। ওই টাকাটা হাতে পেয়ে আমিই বা কে, আর লর্ড লিনলিথগোই বা কে।

কিন্তু অকস্মাৎ হরিষে বিষাদের মতো একটা ঘটনা ঘটে গেল। কাজের জন্যে উমেদারি করার তাগিদে তখন বসন্ত চৌধুরি ঘন ঘন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে যেতেন। একে ধরতেন, তাকে ধরতেন। কিন্তু ওখানে কিছু না হওয়ায় রাধা ফিল্মসে 'মন্দির' ছবির কাজটা পেয়ে হাতে চাঁদ পেয়ে গিয়েছিলেন বসন্তদা। আর ঠিক সেই সময়েই ডাক এলো নিউ থিয়েটার্স থেকে।

নিউ থিয়েটার্সের তখন ভারতজোড়া নাম। সুদূর নাগপুরে বসে বসন্ত চৌধুরি তখন নিউ থিয়েটার্সের

অনেক ছবিই দেখে ফেলেছেন। নিউ থিয়েটার্স তখন হিন্দী আর বাংলা দুই ভাষাতেই ছবি করতেন। সেইসব ছবির কল্যাণে সায়গল, প্রমথেশ বড়ুয়া, কানন দেবী, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক ইত্যাদি নামগুলি বসন্তদার অতি পরিচিত। কলকাতায় এসে তাই তিনি নিউ থিয়েটার্সের দরজাতেই প্রথম হানা দিয়েছিলেন সুযোগের সন্ধানে।

নিউ থিয়েটার্সের আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন তখন সৌরেন সেন। ইনি ছবির পরিচালকও ছিলেন। কলকাতা এবং বোম্বাই দুই জায়গাতেই ইনি ছবি পরিচালনা করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পটি অবলম্বন করে সৌরেনবাবু 'সওদাগর' নামে হিন্দী ভাষায় একটি অসাধারণ ছবি করেছিলেন। ওই ছবির নায়ক হিসেবে অমিতাভ বচ্চনের অভিনয়ও স্মরণীয় হয়ে আছে। ওইরকম একটু ডি-গ্ল্যামারাইজড চরিত্রে অমিতাভ খুব কমই অভিনয় করেছেন।

কী কারণে জানি না, এই সৌরেনবাবু বসন্তদাকে প্রীতিব চক্ষে দেখেছিলেন। হয়তো এই ভদ্র, শিক্ষিত, সুদর্শন, উচ্চাভিলাষী যুবকটি তাঁর মনের কোণে কোথাও একটা ছাপ ছেলেছিল। তাই মূলত সৌরেনবাবুর উদ্যোগে বসন্তদা নিউ থিয়েটার্সের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবির নায়ক চরিত্রে অভিনয় করার ডাক পেলেন।

নিউ থিয়েটার্সের তখন খুব নড়বড়ে অবস্থা। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে তাঁদের একের পর এক ছবি ফ্লপ করতে শুরু করে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় তো কোম্পানির নাভিশ্বাস ওঠার মতো অবস্থা। ওই অবস্থাতেও তাঁরা প্রবোধকুমার সান্যালের বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবি করবার কথা যে ভেবেছিলেন, এটাই আশ্চর্য। আসলে এটাই ছিল নিউ থিয়েটার্সের ট্র্যাডিশন। তাঁরা কখনও সমকালীন হই হল্লার সঙ্গে আপস করেননি।

ওই 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে নায়ক করার ডাক পেলেন বসন্ত চৌধুরি। ছবির নায়িকাও একজন আনকোরা নতুন মুখ। অরুন্ধতী মুখার্জি। এটাও ছিল নিউ থিয়েটার্সেব একটা ট্র্যাডিশন। চরম দুঃসময়েও তাঁরা এই জাতীয় দুঃসাহস দেখাতে পারতেন। গানের শিল্পী সায়গল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিককে দিয়ে তাঁরা নায়ক করিয়েছেন। গায়িকা অসিতা বসুকে দিয়ে নায়িকা করিয়েছেন। অসিতবরণ, ভারতী দেবী, জ্যোতিপ্রকাশ, রাধামোহন ভট্টাচার্য, বিনতা বসু ইত্যাদি আরও বহু নবাগত এবং নবাগতাকে তাঁরাই সুযোগ দিয়েছেন। এবং তার ডিভিডেন্ডও পেয়েছেন।

নিউ থিয়েটার্স থেকে ডাক পেয়ে বসন্তদার তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সবেমাত্র 'মন্দির' ছবির কাজটা পেয়েছেন, অ্যাডভান্স হিসেবে তিনশো টাকা হাতে এসেছে, দু-দিন শুটিংও করে ফেলেছেন। কী হবে তাহলে?

বসন্তদা সৌরেনবাবুকে বললেন আপনি বোধহয় জানেন না, আমি অলরেডি একটা ছবিতে কাজ পেয়েছি। দু'দিন শুটিংও করেছি। আমি যদি ওদের এবং আপনাদের দুটো ছবিতেই একসঙ্গে কাজ করি, তাহলে কী অসুবিধে হবে?

সৌরেনবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন : নিউ থিয়েটার্সের ছবিতে কাজ করতে গেলে অন্য কোথাও কাজ করা চলে না। এখানে এক্সক্লুসিভ হিসেবে কাজ করতে হয়।

কথাটা শোনার পর বসন্তদা ছুটলেন মাধববাবুর কাছে। বললেন : দেখুন, আমি নিউ থিয়েটার্সের ছবিতে কাজ করার চান্স পেয়েছি। ওঁরা বলছেন, এক্সক্লুসিভ হিসেবে কাজ করতে হবে। তাই আপনারা যদি দয়া করে আমাকে ছেড়ে দেন তাহলে আমার বড় উপকার হয়।

বসন্তদার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ওঁরা এক কথায় রিলিজ করে দিলেন তোমাকে?

বসন্তদা বললেন : তাই কখনও দেয়। মাধববাবুর দাদা, নামটা এখন মনে পড়ছে না, বোধহয় কানাইবাবু না কী যেন নাম, ভদ্রলোক চেইন স্মোকার ছিলেন : তিনি বললেন, তাই কখনো হয়। আমরা তোমাকে হিরো হিসেবে নিয়েছি, দুদিন শুটিংও হয়েছে, এখন ছেড়ে দিন বললে ছেড়ে দেওয়া যায় নাকি।

বসন্তদা বললেন : আমি এখন কী করবো তাহলে?

কানাইবাবু বললেন, কী আর করবে। আমাদের ছবিতে কাজ করবে। তবে একটা কাজ আমরা করতে পারি। ওঁরা যদি তোমাকে নিজে রাজি থাকেন তাহলে আমরা ওঁদের সঙ্গে শুটিং-এর ডেট অ্যাডজাস্ট করতে পারি।

বসন্তদা আবার ছুটলেন নিউ থিয়েটার্সে। কানাইবাবুর কথাটা সৌরেনবাবুকে বললেন। সব শুনে সৌরেনবাবু বললেন, তোমাকে তো আগেই বলেছি, নিউ থিয়েটার্সে এক্সক্লুসিভ ছাড়া কাজ করা যায় না। আমাদের এটা ডবল ভার্সান ছবি। বাংলা আর হিন্দিতে হবে। আর ওই কাজ করতে গেলে সব সময় হাতের কাছে আর্টিস্টকে মজুদ রাখতে হয়। তাছাড়া এ ছবিতে প্রচুর আউটডোর। সুতরাং অন্য ছবির সঙ্গে ডেট অ্যাডজাস্টের প্রশ্নই ওঠে না।

বসন্তদা কানাইবাবুকে যে কথা বলেছিলেন, সৌরেনবাবুর কাছেও সেই প্রশ্নটাই রাখলেন। বললেন: আমি তাহলে কী করব?

সৌরেনবাবু বললেন : কী করবে সেটা তুমিই জানো। তবে ডিসিশন বা নেবার তাড়াতাড়ি নিতে হবে। আমাদের হাতে আর সময় নেই। তুমি যদি না করো তাহলে দু-চার দিনের মধ্যে অন্য লোক খুঁজে নিতে হবে। এই রোলটা করবার জন্যে অন্য অনেকেই ইন্টারেস্টেড।

বসন্তদার মাথায় এবার সত্যিই আকাশটা ভেঙে পড়ল। মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত অবস্থায় আবার ছুটলেন রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে। পুনরায় কাতর ভাবে আবেদন জানালেন কানাইবাবুর কাছে। তার উত্তরে কানাইবাবু বললেন : তোমাকে আমরা রিলিজ দিতে পারি একটা শর্তে।

কথাটা শুনে বসন্তদার মুখটা ঝলমল করে উঠলো। বললেন : বলুন কী শর্ত। আপনাদের যে কোন শর্তেই আমি রাজি।

কানাইবাবু বললেন : আমাদের কাছ থেকে যে তিনশো টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছ সেটা তো ফেরত দেবেই। সেই সঙ্গে যে দু দিনের কাজ হয়েছে তার পুরো খরচটা ডেমারেজ হিসেবে দিতে হবে তোমাকে। তা সেটা এমন কিছু বেশি টাকা নয়। ধর হাজার তিনেকের মতো। ওই টাকাগুলো পেলে তোমাকে রিলিজ করে দিতে পারি।

বসন্তদা বললেন : সে কী! অত টাকা আমি পাব কোথায়! জানেন তো, আমি বেকার মানুষ। কোন চাকরি বাকরি করি না। তার ওপর আপনাদের কাছ থেকে যা অ্যাডভান্স নিয়েছিলাম তার অর্ধেক টাকা তো অলরেডি খরচ হয়ে গেছে। আমি কষ্টেসৃষ্টে ওই টাকাটা জোগাড় করে দেব। আপনারা প্লিজ আমাকে রিলিজটা দিন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তোমার কথায় ওঁরা রাজি হয়ে গেলেন?

বসন্তদা বললেন : না, সেই মুহূর্তে রিলিজ পাইনি। কানাইবাবু আমাকে তার পরের দিন দেখা করতে বললেন। এবং সেই দিন আমার রিলিজের ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে শুনেছিলাম, আমার ওই রিলিজের ব্যাপারে দেবকীবাবুর হাত ছিল। তিনিই আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আমি বললাম : সেটা কীরকম?

বসন্তদা বললেন : দেবকীবাবু তো ওঁদের অ্যাডভাইসর ছিলেন। তিনি ওঁদের বলেছিলেন, যে মানুষ তোমাদের ছবিতে কাজ করতে ইচ্ছুক নয়, তাকে কন্ট্রাক্টের জোরে জোর করে কাজ করিয়ে কী ভালো ফল পাওয়া যায় কখনও। তোমরা ওকে রিলিজ করে দাও।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : দু'দিনের শুটিং-এর খরচ হিসেবে তিন হাজার টাকা খেসারত দিতে হয়েছিল নাকি?

বসন্তদা বললেন : না, সেটা আর ওঁরা চাননি। এটা ওঁদের মহানুভবতা। তবে অ্যাডভান্সের তিনশো টাকা আমি ফেরত দিয়ে দিয়েছিলাম।

আমি বললাম : নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে তোমার কত টাকায় কন্ট্রাক্ট হয়েছিল?

বসন্তদা বললেন : ওখানে ছিল মাস মাইনের কন্ট্রাক্ট। মাসে তিনশো টাকা করে মাইনে।

আমি বললাম : ক বছরের কন্ট্রাক্ট হয়েছিল ওঁদের সঙ্গে।

বসন্তদা বললেন : কোন পার্টিকুলার পিরিয়ড মেনশন করা হয়নি। ওটা ওপন ছিল। উভয় পক্ষের

ইচ্ছামতো। ইচ্ছা করলে ওঁরা আমাকে যে কোন সময় ছাড়িয়ে দিতে পারতেন। অথবা আমিও যে কোন সময় ছেড়ে দিতে পারতাম। শেষ পর্যন্ত তিন চারখানা ছবির পর আমিই ছেড়ে দিয়েছিলাম। নিউ থিয়েটার্স সে সময়ে রেগুলার ছবি করতে পারছিল না। অপরদিকে আমার কাছে প্রচুর ছবির অফার আসছিল।

আমি বললাম : যে দেবকীবাবু তোমাকে রাধা ফিল্মস থেকে রিলিজ পাইয়ে দিয়েছিলেন, তিনিই তো তোমাকে কাস্ট করেছিলেন তাঁর 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিতে। তাও আবার সুচিত্রা সেনের বিপরীতে। এটা নিশ্চয়ই তোমার একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট।

বসন্তদা বললেন : দেবকীবাবু যখন তাঁর ছবিতে আমাকে নিয়েছিলেন তখন তো আমি মোটামুটি এস্টাব্লিসড। বাজারে বেশ খানিকটা নামধাম ছড়িয়েছে। আর অপোজিটে কে হিরোইন তা নিয়ে আমাব কোন মাথাব্যথা ছিল না। আমি আমার নিজের চরিত্রটা দেখে নিতাম। স্ক্রিপ্ট শুনতে চাইতাম। তারপর ডিসাইড করতাম ওই ছবিতে কাজ করব কি না। তা সে যতবড় ডিরেক্টরের ছবির কাজ হোক না কেন! আমার কাছে ছবির চরিত্রটাই বড়। ছবির ডিরেক্টর নয়।

আমি বললাম তবু দেবকীবাবুর মতো একজন বিখ্যাত পরিচালকের ছবিতে কাজ করার একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে তো!

বসন্তদা বললেন : সেটা একশোবার। 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিতে কাজ করার আগে আমার বৈষ্ণবসাহিত্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পড়াশোনা ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেব সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতাম না। দেবকীবাবু আমাকে নিয়ে কয়েকদিন বসে চৈতন্যদেবের বিরাটত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেটা জানার পর আমার ওই চরিত্রে কাজ করার খুব সুবিধে হয়েছিল।

আমি বললাম : তা তো হবেই। দেবকীবাবু তো বৈষ্ণবসাহিত্যের একজন মাস্টার। উনি যখন 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবির স্ক্রিপ্ট করছিলেন, সেই সময়ে ওঁর সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ওঁর কাছেই শুনেছিলাম, চৈতন্যদেব প্রথম জীবনে ছিলেন দাম্ভিক, দুর্বিনীত, রীতিমতো পাণ্ডিত্যাভিমানি। তর্কযুদ্ধে কেশব ভারতীয় মতো ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতকে পরাস্ত করার পরই তাঁর মনে পরিবর্তন আসে। ওই অশীতিপর বৃদ্ধ যখন পরাজয়ের লজ্জায় আর অপমানে তাঁর সামনে বসে টপ টপ করে চোখের জল ফেলছেন তখনই চৈতন্যদেবের চৈতন্যোদয় হল। ভাবলেন, এই যে বয়োবৃদ্ধ মানুষটির তিনি অশ্রুপাত ঘটালেন, এতে তিনি কী পেলেন। এই কী পেলাম আর কী পাইনি জিজ্ঞাসাটাই তাঁকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেল। শুরু হল তাঁর ঈশ্বরের অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানপর্বের শেষে তাঁর যে উপলব্ধি ঘটেছিল সেটাই তাঁকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করলো। দেবকীবাবু ভারী চমৎকার করে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। একে পণ্ডিত মানুষ, তার ওপর শিক্ষক। এমন প্রাঞ্জল করে গভীব করে কোন কিছু বোঝাতে তিনিই তো পারেন।

বসন্তদা বললেন : তুই ঠিক বলেছিস। বিনয়ই মানুষকে মহৎ করে। চৈতন্যদেব যেদিন বিনয় আয়ত্ত করলেন, নিজেকে তৃণাদপি সুনীচেন ভাবতে পারলেন, সেদিনই মহত্ত্বে পৌঁছে গেলেন। আমিও এইরকম মানুষ কিছু কিছু দেখেছি। তার মধ্যে একজন হলেন হেনরি কারতিয়া ব্রেঁস। পৃথিবীর সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফারদের মধ্যে একজন। তাঁর কথায় পরে আসছি। একটি ভারি ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটেছিল তাঁর সঙ্গে আমার আলাপের সময়। তবে অতদূর যাবার দরকার কী। আমাদের হাতের কাছেই তো আছেন সত্যজিৎ রায়। কী ভদ্র মানুষ বল তো। টেলিফোন এলে নিজে হাতে রিসিভ করবেন। কাউকে বিদায় জানাতে গেলে তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবেনই। তা সে যে স্তরেরই মানুষ হোক না কেন, আর নিজে যত ব্যস্তই থাকুন না কেন! এই না হলে কখনো গ্রেট ম্যান হওয়া যায়।

কিন্তু এই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে প্রথম জীবনে একটা বিরাট সংঘাত ঘটে গিয়েছিল বসন্ত চৌধুরির। আর সেটা বসন্তদার স্ত্রী অলকা বউদিকে কেন্দ্র করে। যদিও তখনও ওঁদের বিয়ে হয়নি। হয়তো সেই কারণেই বসন্ত চৌধুরি সত্যজিৎ রায়ের কোন ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেলেন না। সে কথায় পরে আসছি।

সেই পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকেও দেখেছি অভিনয়ের ক্ষেত্রে উত্তমকুমার এবং বসন্ত চৌধুরির

মধ্যে একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলত। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতা কখনোই অস্বাস্থ্যকরতার পর্যায়ে নেমে আসেনি। বাইরের পৃথিবীতে কখনও সেই প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা প্রকট হয়ে পড়েনি বটে, কিন্তু আমরা, সাংবাদিকরা, যাঁরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত ছিলাম, তাঁরা স্পষ্টই সেটা অনুভব করতে পারতাম।

উত্তমকুমার আর বসন্ত চৌধুরি প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু একই ছবিতে অভিনয়ের ব্যাপারে দুজনে দুজনকে প্রায় এড়িয়েই চলতেন। যে ছবিতে দুজনে থাকতেন, সেখানেও খুব সতর্ক হয়ে অভিনয় করতেন। ওঁরা দুজনে একসঙ্গে খুব বেশি ছবিতে অভিনয় করেননি। মাত্র খান পাঁচেক ছবিতে করেছেন। 'নবীন যাত্রা', 'হারজিৎ', 'শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক', 'শঙ্খবেলা' এবং 'যদি জানতেম'। এর মধ্যে শেষোক্ত ছবিতে বসন্তদার ভূমিকা ভিলেনের। পলিশ্‌ড্‌ ভিলেন। ভারি চমৎকার অভিনয় করেছিলেন তিনি। প্রচলিত ফর্মুলার বাইরে একটা অন্য ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন দিয়েছিলেন ওই চরিত্রে। দর্শক আর সমালোচক উভয় পক্ষকেই খুশি করেছিল বসন্তদার ওই অভিনয়।

কিন্তু একেবারে সমসাময়িক হয়েও উত্তমকুমার এবং বসন্ত চৌধুরি মাত্র পাঁচখানা ছবিতে একত্রে অভিনয় করলেন কেন? সে ব্যাপারে বসন্তদার সঙ্গে একবার আলোচনা করেছিলাম। আর আমার ওই প্রশ্নের উত্তরটা বসন্তদা নানা কায়দা করে এড়িয়ে যাননি। একেবারে সোজাসুজি জবাব দিয়েছিলেন।

বসন্তদা বলেছিলেন : একটা সময়ে উত্তমকে আর আমাকে একসঙ্গে কাস্ট করবার অফার নিয়ে এসেছিলেন অনেকে। কিন্তু আমি চট করে সে সব প্রস্তাবে রাজি হইনি।

আমি বললাম : কেন? তুমি কি ছবির পর্দায় উত্তমবাবুর মুখোমুখি হতে ভয় পেতে?

বসন্তদা বললেন : একদম না। আমি ভয় পেতাম একপেশে চিত্রনাট্যকে। উত্তম-সুচিত্রার জনপ্রিয়তা তখন এমন তুঙ্গে যে, আমার কাছে যে সব ছবির অফার আসত, তার প্রায় প্রতিটি চিত্রনাট্যেই উত্তমের প্রাধান্য। সেসব ছবিতে আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে হত। সেরকম একটা অবস্থা নিশ্চয় আমার অভিপ্রেত হতে পারে না।

আমি বললাম : সে কথা ঠিক। কিন্তু তুমি তো প্রযোজক কিংবা পরিচালককে বলতে পারতে চিত্রনাট্য পরিবর্তন করবার কথা।

বসন্তদা বললেন : তা আমি বলব কেন? আর বললেই বা তাঁরা শুনবেন কেন। তাঁরা তাঁদের ব্যবসার কথা বড় করে ভাবতেন। সেই কারণে চিত্রনাট্যে উত্তমকে প্রেফারেন্স দেবার কথাই ভাবতেন। তবে যেসব চিত্রনাট্যে দেখেছি উত্তম আর আমার সমান প্রেফারেন্স, সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করেছি। তাতে যদি উনিশ বিশ হয়ে পাল্লাটা উত্তমের দিকে একটু ঝুঁকে থাকত, তাতেও আমি আপত্তি করতাম না। কারণ আমার নিজের ওপরে বিশ্বাস ছিল। যে কোনও অবস্থাতেই আমার চরিত্রটাকে বার করে নেবার ক্ষমতা আমার ছিল।

আমি বললাম : তেমন দু-একটা উদাহরণ দাও না।

বসন্তদা বললেন : এই ধর 'শঙ্খবেলা' ছবিটার কথা। ছবির রোমান্টিক পোর্শান উত্তমের। কিন্তু আমি জানতাম, আমার যা চরিত্র তাতে উত্তম হাজার চেষ্টা করলেও আমাকে মেরে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

আমি বললাম : ঠিক বলেছ। ওই ছবিতে তোমার ছিল ডাক্তারের ভূমিকা। দারুণ অভিনয় করেছিলে তুমি।

বসন্তদা হেসে বললেন : থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট। ওই চরিত্রটার জন্যে আমাকে কিন্তু দারুণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ডাক্তারি ব্যাপার সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। যেটুকু জানতাম তা ওই ইংরিজি ছবি-টবি দেখে। অপারেশন-টপারেশন সম্পর্কে কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই ছিল না। তাই 'শঙ্খবেলা' ছবির কাজটা অ্যাকসেপ্ট করার পর আমি কলকাতার তিনজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তাঁরা আমাকে এ ব্যাপারে দারুণ সাহায্য করেছেন। কী প্রসেসে অপারেশন করতে হয় তা আমি তাঁদের কাছ থেকেই শিখেছি।

আমি বললাম : তুমি কি তাঁদের কোনও অপারেশনের সময় উপস্থিত ছিলে নাকি?

বসন্তদা বললেন ছিলাম বইকি। তা না হলে ব্যাপারটা জানবো কেমন করে। দূর থেকে দেখা আর কাছে দাঁড়িয়ে দেখা দুটো একেবারে আলাদা জিনিস। আপারেশনের সময় সার্জনের যে স্মার্টনেস, সেটা দূর থেকে দেখে আয়ত্ত করা যায় না। আমার ওই স্মার্টনেসের জন্যেই তো তোদের কাছে চরিত্রটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তাই না?

আমি বললাম ঠিক তাই। ওই চরিত্রে তোমাকে সত্যিকারের ডাক্তারদের মতোই মনে হচ্ছিল। এক মুহূর্তের জন্যেও সাজানো ডাক্তার বলে মনে হয়নি। আমার তো ধারণা, এইরকম ডেডিকেশন না থাকলে বড় অভিনেতা হওয়া যায় না।

বসন্তদা হাসতে হাসতে বললেন তুই হয়ত ভাবছিস ডেডিকেশনের কথাটা বলে তুই একটা দারুণ কিছু উচ্চারণ করেছিস। শুনে আমি খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠব। মোটেই তা নয়। তোর আগে কয়েক লক্ষ মানুষ কয়েক কোটি বার এসব কথা বলে গেছে। এর মধ্যে আর নতুনত্ব কিছু নেই। নতুনত্ব যেটা তা হল আজকাল এই ডেডিকেশনের অভাবটা বড্ড দেখা যাচ্ছে। সেটা শুধু অভিনয়ের ক্ষেত্রেই নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিল্পের ক্ষেত্রে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে, ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রফেশ্যানের ক্ষেত্রে। এককথায় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। এমন কী গুণ্ডামি বদমাইসিগুলোও আজকাল আর ডেডিকেটেডলি করতে পারে না। দেশের বড় দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে রে।

শেষের দিকে বসন্তদার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন ব্যঙ্গের ছোঁয়া পাওয়া গেল। বুঝলাম, মানুষ বসন্ত চৌধুরির ওপর রসরাজ বসন্ত চৌধুরি ভর করেছেন এই মুহূর্তে।

যাক যে কথা বলছিলাম। এই যে অভিনয়ের ব্যাপারে উত্তমকুমার আর বসন্ত চৌধুরির মধ্যে একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতা সেটা কিন্তু ওই দুজনের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কোনরকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি কোনদিন। দুজনেই দুজনের সম্পর্কে দারুণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একটা ঘটনার কথা বলি। এটা সেই ১৯৬৫ সালের কথা।

সেই বছরে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের 'রাজা রামমোহন ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। ছবিটির পরিচালক ছিলেন বিজয় বসু। রামমোহনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বসন্ত চৌধুরি। ছবি রিলিজ করার পর বসন্তদার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ।

উত্তমকুমার সেই সময়ে খ্যাতির একেবারে মধ্যগগনে। তাঁর বিখ্যাত রোমান্টিসিজমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিনয়দক্ষতা। যে রোলই করছেন তাই নিয়েই হইচই পড়ে যাচ্ছে। সেই সময়ে উত্তমবাবুর নাম যত ছড়িয়েছে, স্তাবকের সংখ্যাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেইসময়ে একদিন সকালে উত্তমবাবুর ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, তিনি স্তাবক পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। স্তাবকেরা অনেকে অনেক কিছু বলে যাচ্ছেন, কিন্তু উত্তমবাবু তাঁদের কথা শুনছেন বলে মনে হচ্ছে না। তিনি যেন এই পরিবেশ থেকে অনেক দূরে। একক। নিঃসঙ্গ।

স্তাবকদের দিকে তাকিয়ে মনে হল তাঁরা কেউ বিনা স্বার্থে এখানে উপস্থিত হননি। প্রত্যেকেরই কোন না কোন উদ্দেশ্য আছে। তাঁদের মুখে এই যে অনর্গল উত্তম-প্রশস্তি সেটা বোধহয় উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, উত্তমবাবু তাঁদের কথাগুলি নির্বিকার ভাবে এক কান দিয়ে শুনছেন আর অন্য কান দিয়ে বার করে দিচ্ছেন।

হঠাৎ একজন স্তাবক দুম করে বলে বসল রামমোহন ছবিতে বসন্তর অ্যাকটিং নিয়ে কেন যে এত হইচই হচ্ছে তা বুঝতে পারি না বাবা। দাদা যদি ওই রোলটা করতেন তাহলে এর চেয়ে অনেক ভালো হত। একেবারে ফাটিয়ে ছেড়ে দিতেন।

এই 'দাদা' শব্দটি যে উত্তমবাবুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত, সেটা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না। যে উত্তমকুমার চপলচিত্ত দর্শকদের কাছে 'গুরু', স্তাবকদের কাছে তিনিই 'দাদা'।

স্তাবকের মুখে বসন্তদার অভিনয় সম্পর্কে এই কমেন্ট শুনে উত্তমবাবু যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কাউকে কোনও কথা না বলে গটগট করে ভেতরে চলে গেলেন।

তার পরের দৃশ্যটি বড়ই মজাদার। উপস্থিত অন্য স্তাবকেরা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে কমেন্ট করা স্তাবকটির দিকে তাকিয়ে তাকে যেন ভস্ম করে দিতে চাইলেন। আজকের সকালটাই মাঠে মারা গেল। 'দাদা'

যেভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তাতে চট করে আর এ ঘরে আসবেন বলে মনে হয় না। আবার কবে যে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে কে জানে!

মিনিট দশেক পরে দেখা গেল আস্তে আস্তে ঘর খালি হতে শুরু করেছে। ঠিক কী কারণে উত্তমবাবু সভাস্থল ত্যাগ করলেন সেটা জানবার কৌতূহল ছিল আমার। তাই মন্টুদির মারফত খবর পাঠালাম উত্তমবাবুর কাছে।

উত্তম অনুরাগিনীর তালিকায় মন্টুদির স্থান এক নম্বরে কিংবা দুই নম্বরে। খুব সকাল থেকেই তিনি নিজের সংসার অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে উত্তমবাবুর সংসার তদারক করতে আসেন। একটু পরেই মন্টুদি এসে খবর দিলেন : আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছে।

ভেতরে গিয়ে দেখলাম উত্তমবাবু থমথমে মুখে বসে আছেন। বেণুদি মানে সুপ্রিয়া দেবীকে দেখতে পেলাম না। উনি মনে হয় বাইরে কোথাও গেছেন।

উত্তমবাবুর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে আমি একটু দমে গেলাম। ভাবলাম, যে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে চাইছি সেটা করা উচিত হবে কী না? বিরূপ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না তো?

পরিবেশটাকে একটু হালকা করে দেবার জন্যে আমি হাসতে হাসতে বললাম : কী ব্যাপার? হঠাৎ বাসভা ছেড়ে উঠে এলেন যে?

উত্তমবাবু রীতিমত ক্ষোভের সুরে বলে উঠলেন : এরা আমাকে কী ভেবেছে বলুন তো! আমি কী একটা গাড়ল! যা বলবে তাই বিশ্বাস করতে হবে! আমার হয়েছে জ্বালা। এইসব ফালতু স্যাটেলাইটগুলোকে না পারছি গিলতে, না পারছি উগরোতে। আরে তেল দেবারও একটা লিমিট আছে তো! বসন্তর অ্যাকটিং সম্পর্কে যা নয় তাই বললেই হলো। আমি তো রামমোহন ছবিটা দেখেছি। বসন্তর অ্যাকটিং দারুণ। বইয়ের পাতায় রামমোহনের যে ছবি দেখেছি, তাঁর সম্পর্কে যা পড়েছি, বসন্ত যেন হুবহু সেখান থেকেই উঠে এসেছে! আমিও এত ভালো অ্যাকটিং করতে পারতাম না। আমার চেহারা, আমার রোমান্টিক ইমেজ বাদ সাধত। ইস, আমি যদি ওর মতো ভয়েসটা পেতাম : ওইরকম অ্যারিস্টোক্র্যাট চেহারা, তাহলে অনেক কিছু করে ফেলতে পারতাম। ভগবান তো আমায় ওইখানেই মেরে দিয়েছেন।

এই হল বসন্ত চৌধুরি সম্পর্কে উত্তমবাবুর কমপ্লিমেন্ট। এবারে অপর দিকটা দেখা যাক। বসন্তদা উত্তমবাবু সম্পর্কে কী বলেন?

একবার কথায় কথায় বসন্তদার কাছে উত্তমবাবুর বাড়ির ওই ঘটনাটা বলেছিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলাম : উত্তমবাবু সম্পর্কে তোমার অ্যাসেসমেন্ট কী?

বসন্তদা বললেন : উত্তমকে আমি আমার বন্ধু বলেই মনে করি। আমার ধারণা ও-ও তাই করে। ওর সম্পর্কে আমার মনে একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। ও নিজেও বোধহয় সেটা জানে না।

আমি বললাম : আমি তোমাদের বন্ধুত্বের কথা জানতে চাইছি না। ওর অ্যাকটিং সম্পর্কে তোমার অ্যাসেসমেন্ট কী?

বসন্তদা বললেন : উত্তম একজন দারুণ ভালো অ্যাক্টর। হি ইজ এ সেল্‌ফ মেড ম্যান। ওর চেহারায় এবং চরিত্রে অনেক ড্র-ব্যাকস্ আছে। কিন্তু ও অসাধারণ অভিনয় দিয়ে সেইসব খামতিগুলো মেক-আপ করে নিয়েছে। তিলে তিলে নিজেকে একজন বড় শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলেছে। ইংরেজির টিউটর রেখে সঠিক ইংরেজি উচ্চারণ শিখেছে। তেমনি হিন্দি কিংবা উর্দু শিখেছে টিউটর রেখেই। সব দিক থেকে নিজেকে অ্যাকমপ্লিশড করে তুলতে চেয়েছে। ফাঁকি দিয়ে সে বড় হতে চায়নি। এমন কঠোর পরিশ্রম করতে আমি আর কাউকে দেখিনি। হার্ড ওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে ও নিজেকে উত্তমকুমার বানিয়েছে।

আমি বললাম : সেটা ঠিক কথা। অ্যাক্টর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে ওঁকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে। উত্তমবাবুর তো প্রথম দিককার একটা ছবিও লাগেনি। ফ্লপের পর ফ্লপ। প্রোডিউসার আর ডিরেকটাররা তো ওঁর নামই দিয়ে দিয়েছিলেন এফ এম জি।

বসন্তদা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : এফ এম জি-টা আবার কী?

আমি বললাম . ফ্লপ মাস্টার জেনারেল।

বসন্তদা বললেন : সেদিক থেকে আমার ভাগ্যটা বেশ ভালোই ছিল বলতে হবে। প্রথম ছবিই হিট। তবে তার যেমন একটা সুবিধে ছিল, তেমনি অসুবিধেও ছিল অনেক।

আমি বললাম : কী রকম?

বসন্তদা বললেন : প্রথম ছবি হিট করার ক্রেডিট তো একজন নতুন আর্টিস্টের হতে পারে না। তাকে পুরোটাই অন্যের অভিরুচি অনুযায়ী চলতে হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ছবির ক্ষেত্রে দর্শকদের একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়ে যায় ওই নতুন শিল্পী সম্পর্কে। ছবি হিট করাবার সবটা না হলেও অনেকটা দায় তার কাঁধেই চেপে যায়। একজন নতুন শিল্পীর পক্ষে সে এক ভয়াবহ অবস্থা। চিত্রনাট্যের ব্যাপারে, পরিকল্পনার ব্যাপারে তার কিছু করার নেই, অথচ দর্শকদের প্রত্যাশা তারই কাছে। আমার দ্বিতীয় ছবি 'নবীন যাত্রা'র ব্যাপারেও সেই দুর্ভোগের ব্যাপারটাই ঘটতে যাচ্ছিল। ছবিটা তেমন ভালো চলেনি। অন্তত 'মহাপ্রস্থানের পথে'র মতো নয়। বেঁচে গেলাম থার্ড ছবিতে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম . তোমার থার্ড ছবিটা কী যেন?

বসন্তদা হাসতে হাসতে বললেন : তোর প্রিয় ছবি 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। অথচ উত্তমের বেলায় দেখ। একের পর এক ছবি মার খেয়ে গেছে। সে কিন্তু হাল ছাড়েনি। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গেছে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে গেছে সাফল্যের মুখ দেখার আশায়। এই নিষ্ঠার তুলনা হয় না। উত্তমের যা নিষ্ঠা, তার অর্ধেকও যদি আমার থাকত।

বসন্তদা যে একজন বড় মাপের মানুষ, তা তাঁর এইসব উক্তি থেকেই বোঝা যায়। অন্যের কাজের স্বীকৃতি দিতে পারেন মহৎ মানুষেরাই। বসন্তদা সেইসব মানুষদেরই একজন।

উত্তমকুমারের প্রসঙ্গে ইতি টানবার আগে বসন্তদাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলেছিলাম : বসন্তদা, মানুষ হিসেবে উত্তমবাবুকে তোমার কেমন লাগে?

বসন্তদা বললেন : চমৎকার। এত বড় স্টার হয়েও আমি কখনও শুনিনি উত্তম কারও সঙ্গে কোনও দুর্ব্যবহার করেছে। মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ, সৌজন্যবোধ ওর মধ্যে খুব প্রবলভাবে আছে। ওর মধ্যে একটা প্রচণ্ড সরলতা আছে। অকৃত্রিমতা আছে। মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বভাবটা ও ওর অভিনয়ের মধ্যে উজাড় করে দিয়েছে ছবির পর্দায়। সেই জন্যেই মানুষের এত আদর পেয়েছে উত্তম। ওর মধ্যে মধ্যবিত্তের নীতিবোধ কতটা প্রবল ছিল শুনবি?

আমি বললাম : হ্যাঁ বল।

বসন্তদা বললেন : একবার একটা পার্টিতে উত্তমকে সিগারেট অফার করলাম। কিন্তু ও আমার হাত থেকে কিছুতেই সিগারেট নিল না। কেন? কারণ কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন দীপচাঁদ কাংকারিয়া। দীপচাঁদবাবুকে তো তুই চিনিস। আমাদের কালের একজন বিশিষ্ট প্রযোজক এবং পরিবেশক। তা উত্তম আমার হাত থেকে সিগারেট নিল না, কারণ দীপচাঁদবাবু বয়সে বড়। উত্তমকে স্নেহ করেন। ওর এই মধ্যবিত্ত মানসিকতাটা আমার ভালো লাগল। ইন্ডাস্ট্রির যে কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে ও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। যেটা আমি পারি না।

আমি বললাম : তুমি বড়দের সামনে সিগারেট খেতে পার?

বসন্তদা বললেন : পারি। খাইও। আমি তো বাংলাদেশের বাইরে মানুষ। সেটা অন্যরকম পরিবেশ। সেখানে মানুষকে শ্রদ্ধা জানানো হয় অন্তর থেকে। বাহ্যিক কোনও আড়ম্বর দেখিয়ে নয়। আমি তো নিউ থিয়েটার্সের মিস্টার বি. এন. সরকারের সঙ্গেও সিগারেট খেয়েছি সেই প্রথম ছবি করতে এসে।

আমি বললাম : সে কি! উনি তো খুব রাশভারি মানুষ ছিলেন। ওঁর ইউনিটের জুনিয়াররা তো ওঁর সামনে সিগারেট খেতেন না! ঘটনাটা একটু বলবে?

বসন্তদা বললেন : মিস্টার সরকারকে আমি যতটা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে উনি একজন ফাইন জেন্টলম্যান। অত্যন্ত উদারপন্থী মানুষ। ঘটনাটা হল, একদিন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে 'মহাপ্রস্থানের পথে'র শুটিং-এর ফাঁকে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলাম। এমন সময় মিস্টার সরকারের গাড়ি এসে দাঁড়াল। উনি গাড়ি থেকে নেমে ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। উনি গিয়ে গোল ঘরটায়

বসলেন। আমিও সেখানে গিয়ে বসলাম।

আমি বললাম : ওঁকে আসতে দেখে নিশ্চয় সিগারেটটা ফেলে দিয়েছিলে?

বসন্তদা বললেন : না ফেলিনি। সিগারেট খেতে খেতেই ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। উনিও সিগারেট খাচ্ছিলেন। উনি তো চেইন স্মোকার ছিলেন। মিঃ সরকার জিজ্ঞাসা করলেন : কেমন লাগছে কাজ করতে?

আমি বললাম : কেমন লাগছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে যা করতে বলা হচ্ছে আমি তাই করছি। ফল কী দাঁড়াবে জানি না। তবে কাজটা যে খুব ইন্টারেস্টিং তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কথা বলতে বলতে আমার সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। মিস্টার সরকার আমাকে সিগারেট অফার করলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তুমি নিলে?

বসন্তদা বললেন : হ্যাঁ নিলাম। আর দেখতে পেলাম, একটু দূরে ইউনিটের যারা ঝোপঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদেরও ঠিক তোরই মতো চোখ কপালে উঠে গেছে। মিস্টার সরকার শুধু আমাকে সিগারেট দেনইনি, আমার কাছ থেকে সিগারেট চেয়েও নিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে ওঁর সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল।

আমি বললাম : তোমার এই সরকার সাহেবের সঙ্গে সিগারেট খাওয়া নিয়ে স্টুডিওতে তুলকালাম হয়নি?

বসন্তদা বললেন : হয়েছিল। পরের দিন কানাঘুষোয় শুনতে পাচ্ছিলাম আমার এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্যে হয়তো চাকরিও চলে যেতে পারে।

আমি বললাম : তেমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল নাকি?

বসন্তদা বললেন : মোটেই না। বরং এই ঘটনার পর মিস্টার সরকারের স্নেহের পরিমাণ আমার ওপর একটু বেড়েই গিয়েছিল। উনি আমাকে অন্যরকম দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

আমি বললাম : সরকার সাহেব যে ভিন্ন চরিত্রের মানুষ ছিলেন সেটা জানতাম। তোমার কথায় আমার সেই ধারণাটা দৃঢ় হল। যাক গে, নিউ থিয়েটার্সের কথা থাক। এখন তোমার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের কী নিয়ে মন-কষাকষি হয়েছিল সেটা বল দেখি।

১৯৬৪ সালে আমি একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করতাম। পত্রিকাটির নাম ছিল 'সাতরঙ'। এই 'সাতরঙ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বসন্ত চৌধুরির কাছ থেকে আমি মানসিক আঘাত পেয়েছিলাম একবার!

'সাতরঙ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন আমার সাহিত্যিক বন্ধু ডাক্তার বিশ্বনাথ রায় এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রয়াত সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সনৎবাবুও নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। কিন্তু একক ভাবে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনার যোগ্যতা আমার আছে কিনা তার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল তারাশঙ্করবাবুর কাছে। ওই ধরনের একটি পত্রিকা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা আমার মাথায় ছিল, সেটি লিখিত আকারে পেশ করেছিলাম তারাশঙ্করবাবুর সামনে। উনি সেটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে খুশি হয়েছিলেন এবং পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাতে আমার মনের বল শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

ওই 'সাতরঙ' পত্রিকায় ফিনান্স করেছিলেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বোন মৃদুলা ব্যানার্জি এবং তাঁর স্বামী প্রমোদ ব্যানার্জি। প্রমোদবাবু ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত কংগ্রেস নেত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই। পূরবী দেবী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ক্যাবিনেটে মন্ত্রীও হয়েছিলেন একটা সময়ে। প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদকও হয়েছিলেন অতুল্য ঘোষের আমলে।

প্রমোদবাবু ও মৃদুলা দেবী এলগিন রোডের যে বাড়িতে থাকতেন সে বাড়িটি নানা কারণে বিখ্যাত ছিল। ওই বাড়িতে আমি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন সাহেবকে দেখেছি, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ককে দেখেছি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তখন প্রাইম মিনিস্টার। সেই সময় তিনি একবার কলকাতা সফরে এসে নির্দিষ্ট সফরসূচির বাইরে ঘণ্টাখানেকের জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিলেন।

পরে জানা যায় তিনি ওই সময়টা এলগিন রোডে প্রমোদ মৃদুলার বাড়িতে কাটিয়েছিলেন।

ওটা নিয়ে পরের দিন খবরের কাগজে খুব হইচই হয়েছিল। একটি সংবাদপত্রে তো মৃদুলা ব্যানার্জিকে 'কলকাতার ক্রিস্টিন কিলার' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। বৃটিশ মন্ত্রিসভার কোন কোন সদস্যের সঙ্গে সুন্দরী ক্রিস্টিন কিলারের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে ইংল্যান্ডের সংবাদপত্রে তখন প্রতিদিন নানা মুখরোচক খবর প্রকাশিত হচ্ছিল।

তাঁকে ক্রিস্টিন কিলারের সঙ্গে তুলনা করায় মৃদুলা ব্যানার্জি মনে মনে খুব আহত হয়েছিলেন। কিন্তু এটা নিয়ে তিনি আদালত পর্যন্ত যাওয়া করেননি। বুদ্ধির পরিচয় রেখেছিল। হাজার হোক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাতনি তো! অন্য কালচারের মেয়ে মানুষ। তাছাড়া কানাঘুষায় শুনেছি, ওঁর স্বামী প্রমোদ ব্যানার্জি দিল্লির 'প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। ওই পত্রিকার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক সুবিদিত।

এই প্রসঙ্গে একটা রোমাঞ্চকর তথ্য দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। ওই এলগিন রোডের বাড়িতে আমি বাসন্তী দেবীকে লেখা যুবক চিত্তরঞ্জন দাশের একটি চিঠি দেখেছিলাম। তখনও ওঁদের বিয়ে হয়নি। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বাসন্তী দেবীর পূর্বরাগ এবং মেলামেশা নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে কী ধরনের আলোচনা চলছিল তারই বিবরণ ছিল চিঠিটিতে। চিত্তরঞ্জন বাসন্তী দেবীকে চিঠির প্রারম্ভে 'বসন' বলে সম্বোধন করেছেন।

চিঠিটি দেখে আমি লাফিয়ে উঠেছিলাম। চিত্তরঞ্জনের ওই চিঠির ফ্যাকসিমিলি সহ একটি রচনা সাংবাদে প্রকাশ করার আগ্রহ দেখিয়েছিলাম। বাধা দিয়েছিলেন প্রমোদবাবু। তৎক্ষণাৎ মনঃক্ষুণ্ণ হলেও পরে ভেবে দেখেছিলাম, ওই কাজটা করা উচিত হত না। একটি পরিচ্ছন্ন প্রেমপত্র সম্পর্কে কোন কোন মানুষ হয়তো কুৎসিত রসের খোরাক খুঁজে পেতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পর্কে যেটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

'সাংবাদ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার জগতে কিঞ্চিৎ আলোড়ন তুলতে পেরেছিল। পূর্ণেন্দু পত্রী ছিলেন আমাদের পত্রিকার আর্ট ডিরেক্টার। তাঁর আঁকা কভারগুলি ভারি সুন্দর হত। লেখকসূচিতেও বৈশিষ্ট্য ছিল। কমলকুমার মজুমদারকে দিয়ে আমি একটি অসাধ্যসাধন করিয়েছিলাম। তাঁকে দিয়ে ক্রাইম থ্রিলার লিখিয়েছিলাম। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস সাংবাদেই প্রকাশিত হয়েছিল। বিখ্যাত উর্দু লেখক এবং চলচ্চিত্রকার খাজা আহম্মদ আব্বাস নিয়মিত একটি কলাম লিখতেন। বোম্বাই থেকে চলচ্চিত্রের খবর লিখতেন হেমন্ত-জায়া বেলা মুখোপাধ্যায়। আমাদের ওই পত্রিকার সার্কুলেশন নেহাত মন্দ ছিল না। কিন্তু নিছক কাগজ বিক্রির ওপর তো একটি পত্রিকার আর্থিক বনিয়াদ তৈরি হতে পারে না। তার জন্যে চাই বিজ্ঞাপন। বিজু পট্টনায়েকের বদান্যতায় আমরা কলিঙ্গ টিউবসের বিজ্ঞাপন নিয়মিত পেতাম। পেতাম ইউনির্ভাসাল কোমোক্রাটসের বিজ্ঞাপন, যার মালিক ছিলেন প্রমোদ ব্যানার্জি নিজেই। ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ডি এন ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। দেবেনবাবু তখন মেট্রোপলিটন ইনসিওরেন্স এবং অ্যালবার্ট ডেভিডের চেয়ারম্যান। ডাঃ রায়ের সুবাদে ওই দুই কোম্পানির বিজ্ঞাপন আমরা পেতাম। দেবেনবাবু তখন চলচ্চিত্র নির্মাণেও ব্রতী হয়েছেন। ওঁদের প্রথম ছবি সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'কালস্রোত'-এর বিজ্ঞাপন সাহিত্য পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও আমরা পেয়েছি। পেয়েছি ওঁর পরবর্তী ছবি 'অনুষ্টুপ ছন্দ', যার নায়ক ছিলেন বসন্ত চৌধুরি, এবং 'রাজদ্রোহী'র বিজ্ঞাপনও। আমিও মনে মনে ভাবছিলাম এই সময়ে আমারও কিছু বিজ্ঞাপনের জন্যে চেষ্টা করা উচিত। সেই উদ্দেশ্যেই একদিন বসন্ত চৌধুরির শরণাপন্ন হলাম।

বসন্তদা তখন কল্পনা অ্যাডভার্টাইজিং-এর অন্যতম কর্ণধার। ওই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞাপনজগতের এক প্রবাদপুরুষ যুধাজিৎ চক্রবর্তী। তাঁর কন্যা অলকাকে বিবাহের সূত্রে ওই কোম্পানি দেখাশোনার দায়িত্ব বসন্তদার স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে। বসন্তদাও সানন্দে ছবির কাজকর্ম কমিয়ে দিয়ে ওই ব্যাপারটা নিয়ে মেতে আছেন। এটাই বসন্তদার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। জীবনটাকে তিনি নানাভাবে উপভোগ করতে ভালোবাসেন। এই পৃথিবীর নানা বৈচিত্র্য তাঁকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে। কত বিচিত্র ভাবেই না তিনি জীবন কাটিয়েছেন! হঠাৎ যদি কোনদিন শুনি, বসন্তদা সবকিছু ছেড়েছুড়ে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে

পাড়ি জমিয়েছেন তাঁর প্রথম ছবি মহাপ্রস্থানের পথে'র পরিব্রাজকের মতো তাহলে আমি আদৌ বিস্মিত হব না। এই মানুষটি যে বৈচিত্র্যের পিয়াসী সেটা আমার কাছে বহুদিন আগে থেকেই স্পষ্ট।

কল্পনা অ্যাডভার্টাইজিং-এর অফিসে ঢুকে দেখলাম বসন্তদা আদ্যন্ত সাহেবি পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে বসে আছেন। কালো রঙের কোটের আড়াল থেকে তাঁর রঙ যেন ফেটে বেরোচ্ছে। বসন্তদা এমন একটি মানুষ যাঁকে দেখে একই সঙ্গে রূপমুগ্ধ এবং গুণমুগ্ধ দুইই হওয়া যায়। আমি ওই মুহূর্তে বসন্তদার রূপমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। মনে পড়ল বছর কয়েক আগে আমার ভগ্নিপতি বিখ্যাত প্রচারসচিব শ্রীপঞ্চাননের বাড়িতে বসন্তদাকে অতি সাধারণ পোশাকেও অপূর্ব দেখাতে লেগেছিল। পঞ্চানন তখন থাকত উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে স্কটিশচার্চ স্কুলের পেছনে। সেখান থেকে বিশ্বরূপা থিয়েটার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের ভেতরেই পড়ে। বসন্তদা তখন বিশ্বরূপা থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করতেন।

ওই সময়ে নাকি বসন্তদা শো শেষ হবার পর মাঝে মাঝেই পঞ্চাননের বাড়িতে আসতেন। ওই মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে অতি সহজভাবে মিশে যেতেন। আধ ঘণ্টা কি তিন কোয়ার্টার হইচই করে গল্পগুজব করে চলে যেতেন। আমি অবশ্য একবার কি দু'বার পঞ্চাননের বাড়িতে বসন্তদার মুখোমুখি হয়েছি। তখন বসন্তদার সঙ্গে গল্প গুজব করতে করতে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম কলকাতার এলিট সোসাইটিতে যে মানুষটির অনায়াস যাতায়াত তিনি একটি মধ্যবিত্ত বাড়িতে মাঝে মাঝে আড্ডা দিয়ে কী রসের সন্ধান করছেন? বছরখানেকের মধ্যেই আমার এ প্রশ্নের জবাব পেয়ে গিয়েছিলাম বসন্তদাকে পর পর কয়েকটি ছবিতে মধ্যবিত্ত সন্তানের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখে। বিশ্বরূপা মঞ্চে হাড়ভাঙা খাটুনির পর তিনি মধ্যবিত্ত বাড়ির আদবকায়দা, চলা ফেরা, জীবনযাপন ইত্যাদি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। ছবিতে অভিনীত চরিত্রের মধ্যে সেগুলি ফুটিয়ে তুলতেন। এই পরিশ্রম, এই অধ্যবসায় না থাকলে কি বড় শিল্পী হওয়া যায়? জীবনের প্রতিটি স্তরকে বসন্তদা এইভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন উপলব্ধি করেছেন তারপর সেগুলির রূপ দিয়েছেন ছবির পর্দায়।

যুধাজিৎ চক্রবর্তীর কন্যা অলকা চক্রবর্তীর সঙ্গে বসন্তদার বিয়ের ব্যাপারটাও কিছুটা নাটকীয়তায় ভরা। কবে কীভাবে ওঁদের প্রথম সাক্ষাৎ, সে ব্যাপারটা বসন্তদা কিছুতেই বলতে রাজি নন। একান্ত আলাপচারিতার মধ্যেও বসন্তদা এই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে চলেন। তাই তো হওয়া উচিত। পৃথিবীতে কিছু কিছু ঘটনা একান্তই নিজস্ব হয়ে থাকে। সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করে তার মাধুর্য নষ্ট করা উচিত নয়। তাই বসন্তদার জীবনের অনুরাগপর্বের কোন সরস বিবরণ দিতে আমি অক্ষম। পাঠক-পাঠিকারা তার জন্যে আমাকে মার্জনা করবেন।

তবে ওঁদের বিয়েকে কেন্দ্র করে যে নাটকীয় ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা আমার জানা। শুধু আমার কেন, সেই সময়কার সকল সাংবাদিকই ঘটনাটা জানতেন। তবে সে ব্যাপারেও বসন্তদার মুখ থেকে একটি কথাও বার করতে পারিনি। উনি একবারে মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন। তাই আমি যেটুকু জানি, কেবল সেইটুকুই সর্বসাধারণে নিবেদন করছি। ভুলচুক কিছু থাকলে বসন্তদা এবং অলকা বউদি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন।

'পথের পাঁচালী'র বিরাট সাফল্যের পর সত্যজিৎ রায় অপু ট্রিলজির দ্বিতীয় পর্ব 'অপরাজিত' ছবির কাজে হাত দেন ১৯৫৬ সালে। এই ছবিটি সারা পৃথিবীতে আলোড়ন ফেলে দেয়। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'গোল্ডেন লায়ন অব সেন্টমার্ক' পায়। আমার বন্ধু, দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক হীরেন বসুর মতে, তাঁর দেখা সত্যজিৎ-চিত্রাবলীর মধ্যে 'অপরাজিত'-ই শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু আমার আলোচ্য বস্তু সত্যজিতের ছবি নয়। অন্য কিছু। এই 'অপরাজিত' ছবিতে একটি ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য সত্যজিৎবাবু যুধাজিৎ চক্রবর্তীর কন্যা অলকা চক্রবর্তীকে নির্বাচন করেন। অলকা বউদির সঙ্গে বসন্তদার তখন অনুরাগপর্ব চলছে। বসন্তদা সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে অনুরোধ করলেন, বসন্তদার ভাবী স্ত্রীকে যেন তিনি ছবিতে সুযোগ না দেন। বসন্তদা চান না, তাঁর যিনি স্ত্রী হবেন তাঁর সঙ্গে যেন অভিনয়ের কোন সম্পর্ক থাকে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে দাম্পত্যজীবনে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। তাই সত্যজিৎবাবুর কাছে

বসন্তদার অনুরোধ, তিনি যেন তাঁর ছবিতে অলকা চক্রবর্তীকে অভিনেত্রী হিসেবে চিন্তা না করেন।

কিন্তু সত্যজিৎবাবু কি এক কথায় বসন্তদার অনুরোধ রেখেছিলেন? মনে হয় না। কারণ বসন্তদা এ সম্পর্কে কোনরকম আলোকপাত না করেও একটি কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন : আমি সত্যজিৎবাবুকে বাধ্য করেছিলাম আমার অনুরোধ রক্ষা করতে।

আমার তো মনে হয় এ ব্যাপারে নিশ্চয় সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে বসন্তদার কিছু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছিল। নইলে সারা জীবনে অতগুলি ছবি নির্মাণ করার পরও সত্যজিতের ছবিতে বসন্তদার ডাক পড়ল না কেন? সত্যজিৎবাবু তো স্ক্রিপ্ট করার সময় চরিত্রগুলির মুখের ছবি আঁকেন। তারপর সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে চলে শিল্পী অনুসন্ধানপর্ব। কিন্তু এই দীর্ঘ জীবনে একটিবারও বসন্ত চৌধুরির মতো কোন মুখ তাঁর তুলি-কলমে আসেনি। হয়তো আমার এ ধারণা ভুল। সম্পূর্ণ ভুল। তবু সব ঘটনাটার অগ্রপশ্চাৎ ভাববার পর মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির কাঁটা থেকেই যায়।

এই ব্যাপারে বসন্তদার ভাবী শ্বশুরবাড়িতে কিঞ্চিৎ উষ্ণতার সৃষ্টি হয়েছিল বলে শুনেছি। যুধাজিৎবাবু এটাকে সহজ ভাবে নাকি মেনে নিতে পারেননি। এই জনশ্রুতির সত্যাসত্য নিরূপণ করবার ক্ষমতা আমার নেই। যাঁর আছে তিনি তো মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। তবে শেষ পর্যন্ত যে ববফ গলেছিল সেটা বুঝতে পারা যায়। ১৯৫৬ সালের ওই ঘটনার দীর্ঘ চার বছব পবে ১৯৬০ সালে বসন্তদাব সঙ্গে অলকা বউদির বিয়ে হয়।

ওঁদের বিয়ের পর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বসন্তদাকে সস্ত্রীক যোগ দিতে দেখেছি। অলকা বউদি একজন অসাধারণ সুন্দবী মহিলা। তাঁর রূপের সঙ্গে গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্ব মিলেমিশে তাঁকে আরও বেশি সুন্দবী করে তুলেছিল। ওঁদের দু'জনকে পাশাপাশি দেখে মুগ্ধতায় চোখ দুটো ভরে যেত। মনে হত একটি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিব সুপরিচিত ক্যাপশান 'মেড ফর ইচ আদার' যেন এঁদের জন্যেই সৃষ্টি।

ওঁদের বিয়ের পর যুধাজিৎবাবু যে বসন্তদার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন সেটা কল্পনা অ্যাডভার্টাইজিং-এর এই কক্ষে সাহেবি পোশাকে সুসজ্জিত বসন্ত চৌধুরিকে দেখে বুঝতে পারা যায়। এই কোম্পানির দায়িত্ব বসন্তদা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আবও অনেক দায়িত্বশীল জামাতার তালিকায় বসন্ত চৌধুরির নামটাও যুক্ত হয়েছে। তবে এই কারণে সিনেমার অনেকগুলি লোভনীয় অফার বসন্তদাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে নিশ্চয়। মনে হয় এই সময় থেকেই বসন্তদা ছবিব কাজের ব্যাপারে বাছাবাছির ওপব জোর দেন। স্ক্রিপ্ট শুনে, বিচার-বিবেচনা করে তবে রোল্ অ্যাকসেপ্ট করতে থাকেন। তার প্রমাণ পীযূষ বসু পরিচালিত 'অনুষ্টুপ ছন্দ', তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'আলোব পিপাসা', বিজয় বসু পরিচালিত 'রাজা রামমোহন', হরিসাধন দাশগুপ্ত পরিচালিত 'একই অঙ্গে এত রূপ', অগ্রগামী পবিচালিত 'শঙ্খবেলা', বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী পরিচালিত 'দিবারাত্রির কাব্য' ইত্যাদি বিশিষ্ট ছবিগুলি। এই সব ছবিতে বসন্তদার অভিনয় একটা অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে, যার জন্যে বাংলা চলচ্চিত্র গর্ববোধ করতে পারে।

যাঁদের দেখলে মনে হত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুখী দম্পতি, সেই অলকা বউদি ও বসন্তদার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেল ১৯৭৮ সালে। এই ব্যাপারটা আমরা যারা বসন্তদাকে ভালোবাসি তাদের খুব আহত করেছিল। কিন্তু হঠাৎ এমন কী কারণ ঘটল যাতে এই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল?

এ ব্যাপারে বসন্তদার মতামত হল : 'ডিফারেন্স ইন ভ্যালুজ ইন লাইফ। জীবনের মূল্যবোধের পার্থক্য। এটাই মূল কারণ। মতের অমিল বলা যায়। তার চেয়েও এক্ষেত্রে যে শব্দটা বেশি প্রযোজ্য, তা হল ইনকমপ্যাটিবিলিটি। বাংলায় কী বলা যায়? অসামঞ্জস্য বলতে পারো।'

সেটাই স্বাভাবিক। দু'জন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের মধ্যে মতের অমিল হতেই পারে। তারই ফলশ্রুতিতে বিচ্ছেদ ঘটাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সে ব্যাপারে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য থাকে। যাঁরা প্রকৃত অর্থেই কালচার্ড তাঁরা ঢাকঢোল পিটিয়ে এটা করেন না। উভয়ের মতামতকে উভয়ে সম্মান জানিয়ে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেন। এই স্বচ্ছ সুন্দর এবং রুচিশীল মনোবৃত্তি যাঁদের থাকে তাঁরা মনুষ্যসমাজের নমস্য। সেই কারণে বসন্তদা এবং অলকা বউদি দুজনেই আমার কাছে আন্তরিক ভাবে নমস্য।

বসন্তদা আর অলকা বউদির যখন বিচ্ছেদ হয় তখন ওঁদের দুটি পুত্র সন্তান। বড়টির নাম সৃঞ্জয়। ডাকনাম জয়। ছোটটির নাম সঞ্জিত। ডাকনাম জিত। জয়ের বয়স তখন ষোল আর জিতের বারো। ওরা দু'জনে বাবার সঙ্গেই থেকেছে। সৃঞ্জয় এখন আনন্দবাজার গোষ্ঠীর ইংরাজি দৈনিক 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক। আর সঞ্জিত চলচ্চিত্র নির্মাণকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বড় বড় কোম্পানির হয়ে ডকুমেন্টারি ছবি করেন। বছর দুয়েকের মধ্যে যাতে ফিচার ফিল্ম করতে পারেন তারই প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেদিন বসন্তদার বাড়িতে জিতের সঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি এবং প্রকরণ নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। দেখলাম ছেলেটির মধ্যে দারুণ কনফিডেন্স। এ ছেলে একদিন সকলের নজর কাড়বেই।

খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার পর সঞ্জিত যখন ঘরের বাইরে চলে গেল, তখন বসন্তদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন জিতের সঙ্গে কথা বলে তোর কিরকম মনে হল?

আমি বললাম ওর ফিউচার তো খুব ব্রাইট বলেই মনে হচ্ছে।

শুনে বসন্তদার মুখখানি খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তা এরকম দুটি কৃতী সন্তানের যিনি জনক তাঁর তো খুশি হবারই কথা। বিশেষ করে আর একজনের আমানত যখন তাঁর কাছে গচ্ছিত আছে, তখন তাদের সর্বাংশে উপযুক্ত করে তোলার দায়িত্ব তো তাঁরই।

এবারে আমার সেই বেদনার ইতিহাসটুকু বলে নিই। আমি যেদিন কল্পনা অ্যাডভার্টাইজিং এর অফিসে গেলাম তার আগে বসন্তদার সঙ্গে বছর দুয়েক দেখা হয়নি। তার আগে যখন নিয়মিত থিয়েটার করতেন বিশ্বরূপায় অথবা স্টার থিয়েটারে তখন প্রায় নিয়মিতই দেখা সাক্ষাৎ হত। থিয়েটারের গ্রিনরুমগুলি তখন আমার কাছে নিয়মিত আড্ডার ক্ষেত্রই শুধু নয় সেগুলি ছিল আমার কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডারের মতো। জীবনের রূপ রস গন্ধ অনেকটা সেখান থেকেই আহরণ করতাম।

কল্পনার অফিসে বসন্তদা আমাকে দেখে খুশি হলেন বলেই মনে হল। আমার নতুন পত্রিকার কথা ওঁকে বললাম। কারা ফিনান্স করছেন সেটাও জানালাম। বসন্তদা দেখলাম প্রমোদ ব্যানার্জি ও মৃদুলা ব্যানার্জী দু'জনকেই চেনেন। শুধু ওঁদেরই নয় ওদের এলগিন রোডের বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাঁরা থাকেন, বোধহয় ভদ্রলোকের নাম মিস্টার কাপুর তাঁদেরকেও চেনেন বসন্তদার কাছেই জানতে পারলাম মিস্টার কাপুর হলেন বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ মোটর কোম্পানির ইস্টার্ন জোনের জেনারেল ম্যানেজার। বুঝলাম, কলকাতা শহরের এলিট সোসাইটির বহুজনকেই বসন্তদা খুব কাছ থেকে চেনেন। তাঁদের সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা আছে।

এবারে আমি সসঙ্কোচে বসন্তদার কাছে একটি বিজ্ঞাপনের প্রার্থনা জানালাম। মুহূর্তে বসন্তদার চেহারাটাই পাল্টে গেল। যে ধরনের গম্ভীর স্বরে বসন্ত চৌধুরি কথা বললেন, তাতে বোঝা গেল সেই মুহূর্তে তিনি আমার অতি পরিচিত অতিপ্রিয় বসন্তদা নন। তিনি তখন কল্পনা অ্যাডভার্টাইজিং-এর অন্যতম কর্ণধার।

বেশ বাশভারি কণ্ঠে বসন্তদা বললেন তোমাদের কাগজের যা সার্কুলেশন তাতে তোমরা আমার কাছ থেকে বিজ্ঞাপনের আশা করতে পারো না।

আমি বললাম : সেটা ঠিক কথা। তবে তুমি ইচ্ছে করলেই একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারো। এটা তোমার এক্তিয়ারের মধ্যেই পড়ে। তুমি একটা বিজ্ঞাপন দিলে তোমাদের পার্টি নিশ্চয় তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে না।

বসন্তদা বললেন কৈফিয়ত চাইবে না বলেই তো দিতে পারছি না। পার্টি আমাদের ওপরে বিশ্বাস করে তাদের পণ্যের প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছে। আমি তাঁদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে পারি না। ইট ইজ এগেইনস্ট মাই প্রিন্সিপল্।

সেই মুহূর্তে রীতিমতো অপমানিত বোধ করেছিলাম। অভিমানের মাত্রাটা প্রবল হয়ে উঠেছিল। মুখ কালো করে বেরিয়ে এসেছিলাম বসন্তদার অফিস থেকে।

পরে সব অভিমান যখন থিতিয়ে এল তখন মনে হল বসন্তদা ঠিকই করেছেন। কোন বিবেকবান মানুষেরই বিশ্বাসের অমর্যাদা করা উচিত নয়। মনে মনে বসন্তদার মতো ম্যান অব প্রিন্সিপল্-কে নমস্কার

জানিয়েছিলাম।

ঠিক এমনি ঘটনাই ঘটেছিল যেদিন তাঁর কাছে যাত্রাপালায় অভিনয় করার জন্য অফার নিয়ে গিয়েছিলাম।

বসন্ত চৌধুরিকে নিয়ে শেষ কিস্তির লেখাটা লিখতে বসার মুখেই খবর পেলাম, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মশাই কলকাতার পরবর্তী শেরিফ হিসেবে বসন্তদাকে মনোনীত করেছেন। ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত কোনও মানুষ এর আগে পশ্চিমবঙ্গে এই সম্মান পাননি। বোম্বাইতে বোধহয় একবার অভিনেতা দিলীপকুমার এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে।

এটা খুবই আনন্দের কথা যে, সিনেমা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা আজকাল সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্মানিত হচ্ছেন, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেও। দক্ষিণ ভারতের শিল্পীরা এই সম্মান অনেকদিন আগে থেকেই পেয়ে আসছেন। স্বর্গত অভিনেতা এম জি রামচন্দ্রন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এখন তাঁর জায়গায় রয়েছেন অভিনেত্রী শ্রীমতী জয়ললিতা। অভিনেতা এন টি রামারাও বেশ কিছুদিন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এসব অবশ্য কেবলমাত্র অভিনয়ের জন্য নয়, মূলত তাঁদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের জন্যই। তবু সিনেমার সঙ্গে যুক্ত কোনও মানুষ এইভাবে সম্মানিত হচ্ছেন দেখতে পেলে বড় ভালো লাগে। বাংলা ছবির অভিনেতাদের মধ্যে স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়া আসাম বিধানসভার সদস্য ছিলেন। আর তার সুদীর্ঘকাল পরে অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বিধানসভার সদস্য হয়েছেন। ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত আরও একটি মানুষ একবার বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। তিনি হলেন বিখ্যাত পরিবেশক প্রতিষ্ঠান চণ্ডীমাতা ফিল্মসের কর্ণধার স্বর্গত সত্যনারায়ণ সাধুখাঁ। হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর কেন্দ্র থেকে তিনি বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর কারও নাম তো আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

যাই হোক বসন্ত চৌধুরির এই কলকাতার শেরিফ হওয়াটা আমার কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কাউকে ধরাকরা করে নয়, বসন্তদা অভিনয় ছাড়াও তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য এই সম্মান পেয়েছেন। কোনরকম ধরাকরা করার মানুষ তো বসন্তদা নন। এমন কি নিজেকে প্রোজেক্ট করাতেও তাঁর অনীহা। অনেককে তো দেখেছি, অতি সামান্য সঞ্চয় নিয়েও সদর্পে চতুর্দিকে দাপিয়ে বেড়ান। সবসময় 'আমায় দেখো' 'আমায় দেখো' ভাব। বসন্তদা কিন্তু এই বস্তুটিকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন। বরং কিছুটা নিজেকে আড়ালে রাখাই তাঁর স্বভাব। এতদ্‌সত্ত্বেও যে শেরিফ হিসেবে বসন্তদার নাম বিবেচিত হয়েছে তার জন্যে জ্যোতিবাবু নিঃসন্দেহে সকলের সাধুবাদ পাবেন। এর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সত্যজিৎ রায় যখন বিভিন্ন সাম্মানিক উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, তখন যে রকম আনন্দ পেয়েছিলাম, বসন্তদার এই সম্মাননাতেও সেইরকমই আনন্দ পাচ্ছি। এই তো সবে শুরু। এরপরও বসন্তদা নিশ্চয় আরও অনেক সম্মান পাবেন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। তার জন্য আমার এবং স্মৃতির সরণির পাঠক-পাঠিকাদের তরফ থেকে অগ্রিম অভিনন্দন জানিয়ে রাখলাম। ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

এবারে আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বসন্তদা নিঃসন্দেহে একজন গুণী মানুষ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি একজন গুণগ্রাহী মানুষ। অজস্র মানুষ আমি দেখেছি, কিন্তু তাঁরা সবাই গুণগ্রাহী নন। অন্যের গুণকে সম্মান জানাবার জন্য বুকের ভেতরের খাঁচাটা অনেক বড় হওয়া দরকার। বসন্তদার সেটা আছে। তাঁর গুণগ্রাহিতার দু-একটা নমুনা দিই।

স্বর্গত কৌতুকাভিনেতা নৃপতি চট্টোপাধ্যায়কে আমি একজন বিস্ময়কর মানুষ বলে মনে করি। সবাই তাঁকে ভাঁড় বলে জানতেন। কিন্তু তিনি যে ভাঁড়ের ছদ্মবেশে একজন পরম দার্শনিক এবং জীবনপ্রেমিক, তাঁর খোঁজ অনেকেই রাখতেন না। মুষ্টিমেয় যে ক'জন মানুষ রাখতেন এবং নৃপতিদাকে সম্মান করতেন, বসন্ত চৌধুরি তাঁদেরই একজন।

এই ব্যাপারটা আমার কাছেও একটা বিস্ময়ের মতোই মনে হত। শিক্ষায় দীক্ষায় অভিজাত্যে মানসিকতায় কোন দিক থেকেই বসন্ত চৌধুরির সঙ্গে নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা সত্ত্বেও নৃপতিদাকে কেন এতো সম্মান করতেন বসন্তদা? এটা নিয়ে তাঁকে একবার প্রশ্নও

করেছিলাম।

তার উত্তরে বসন্তদা বলেছিলেন তাহলে তোকে একটা ঘটনার কথা বলি শোন্। নৃপতিদা নিজে খুব সহজ সরল ভাবে দিন কাটাতেন। কোনরকম বিলাসিতার ধার ধারতেন না। বিয়ে-থা করেননি। নেশার মধ্যে একমাত্র ছিল মদ্যপান। তা আমি যে সময়কার কথা বলছি, সেই পঞ্চাশের দশকে মদ্যপানের খরচও এমন কিছু বেশি ছিল না। উনি যা রোজগার করতেন তাতে ওঁর আর ওঁর কাজের লোকটির খরচ চলে গিয়েও বেশ কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকার কথা। নৃপতিদা সে টাকাটা অনায়াসেই সঞ্চয় করতে পারতেন। কিন্তু ওঁর জমার ঘটা ছিল চিরকালই শূন্য। কেন জানিস্?

আমি বললাম না, তা তো জানি না। উল্টে বরং ওঁকে হাত পাততে দেখেছি কখনও কখনও।

বসন্তদা বললেন সেটা নিজের জন্যে নয়।

আমি বললাম তবে কার জন্যে?

বসন্তদা বললেন সেই সময়ে একজন ভেটারেন ফিল্ম ডিরেকটার দারুণ অভাবের মধ্যে দিন কাটাতেন। না খেতে পাওয়ার মতো অবস্থা। তাঁর কিংবা তাঁর পরিবারের জন্যে আর কেউ ভাবেননি। ভেবেছিলেন কেবল নৃপতিদা। তিনি যা রোজগার করতেন তা থেকে প্রতিদিন দুটি করে টাকা তুলে রাখতেন ওই পরিচালকের জন্য। তিনি প্রত্যেকদিন সকালবেলা বাজারের থলি হাতে নৃপতিদার ইন্দ্রাণী পার্কের বাড়িতে এসে ওঁর জন্যে বরাদ্দ টাকা দুটো নিয়ে যেতেন। সেই পঞ্চাশের দশকে দু টাকার বাজার করলে একটা সংসার হেসেখেলে চলে যেত। নৃপতিদা বাড়িতে না থাকলে ওঁর কাজের লোকের কাছে টাকা দুটো রাখা থাকত। যদি কোনদিন হাতে টাকা না থাকত তাহলে অন্যের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা চেয়ে এনে ওই পরিচালকের বরাদ্দ মেটাতেন। তিনি যতদিন বেঁচে থেকেছেন ততদিন তাঁকে এইভাবে সাহায্য করে গেছেন নৃপতিদা।

আমি বললাম ওই ফিল্ম ডিরেকটারের নাম কী বসন্তদা?

বসন্তদা বললেন সেটা আমি তোকে বলব না। নৃপতিদাও সেই ঘটনাটা কোনদিন কাউকে জানাননি, পাছে ভদ্রলোক অস্বস্তিতে পড়েন। আমাকেও বলেননি। আমি ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছিলাম ব্যাপারটা। তবে সবচেয়ে মজার কথা কী জানিস।

আমি বললাম কী?

বসন্তদা বললেন ওই পরিচালকের কোন ছবিতে নৃপতিদা কোনদিন কাজ করেননি। যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা ওই পরিচালকের দুঃসময়ে তাঁর কথা মনে রাখেননি। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেননি। যেটা এসেছিলেন নৃপতিদা। হাউ গ্রেট হি ওয়াজ। ঠিক ওই ভাবে একজন অক্ষম আর দুস্থ টেকনিসিয়ানকে নৃপতিদা প্রতিদিন দু টাকা করে সাহায্য করতেন। সেই বাজারে ওই চার টাকার দাম আজ প্রায় দুশো টাকা। ভেবে দ্যাখ, প্রতিদিন দুশো করে টাকা দান করার মতো মানসিকতা আজও তুই খুব বেশি খুঁজে পাবি কি না। এমন একটি মানুষকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায়?

আমি বললাম . ঠিক কথা। নৃপতিদা যে গ্রেট সে সম্পর্কে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আর কী পাওয়ারফুল অ্যাকটর। দুঃখটা কোথায় জানো বসন্তদা, অতবড় একজন অভিনেতা জীবনে একটা বড়রকম সুযোগ পেলেন না। যেটা পেয়েছিলেন তুলসী চক্রবর্তী মশাই সত্যজিৎবাবুর 'পরশ পাথর' ছবিতে, অথবা নির্মল দে-র 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে। তেমন কোনও সুযোগ নৃপতিদা কোনদিনই পেলেন না। চিরটাকাল ভাঁড়ামি করেই গেলেন।

বসন্তদা বললেন তোর সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। তবে তোরা তো ছবির পর্দায় কিংবা নাটকে নৃপতিদার অভিনয় দেখেছিস। কিন্তু আমি ছবির পর্দার বাইরে তাঁর যে অভিনয় দেখেছি, তা তোরা কোনদিন দেখিসনি।

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

বসন্তদা বললেন . আমি একবার প্রভুকে কলকাতার একটা নামকরা রেস্টুরেন্টে খেতে নিয়ে গিয়েছিলাম।

আমি বললাম : তুমিও নৃপতিদাকে 'প্রভু' বলে ডাকতে?

বসন্তদা বললেন . হ্যাঁ। ওই নামে ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই নৃপতিদাকে ডাকত। উনি সত্যিই ওই নামের উপযুক্ত মানুষ ছিলেন।

আমি বললাম : একদম খাঁটি কথা। তা তুমি ওকে কোন্ রেস্টুরেন্ট নিয়ে গিয়েছিলে?

বসন্তদা বললেন : তখনকার দিনে নীরা বলে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল চৌরঙ্গিতে। ঠিক গ্র্যান্ড হোটেলের নিচেটায়। খুব অভিজাত। বেশিরভাগ বিদেশি মানুষ ওখানে খাওয়াদাওয়া করতে আসত। যে কারণে খাবার-দাবারের দাম একটু বেশিই ছিল। আমি প্রায়ই নৃপতিদাকে কোথাও না কোথাও খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করতাম। সেদিন ফর এ চেঞ্জ আমি ওঁকে নীরায় নিয়ে গিয়েছিলাম।

আমি বললাম : ওবকম একটা সাহেবি বেস্টুরেন্টে গিয়ে নৃপতিদা অস্বস্তিবোধ করেননি?

বসন্তদা বললেন : তা করেছিলেন কি না বুঝতে পারিনি। আমি তো দেখলাম বেশ স্মার্টলিই উনি ঢুকলেন। ওই বেস্টুরেন্টের ম্যানেজার ছিলেন এক সাহেব। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমাকে ঢুকতে দেখে উনি এগিয়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তা আমি তাঁকে বললাম, আমার এই সিনিয়ার ফ্রেন্ডটিকে তোমাদের এখানে ডিনার খাওয়াতে এনেছি। তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি তোমাদেব বেস্ট ডিশটা এঁকে সার্ভ করো। সাহেব আমার কথা শুনে হেসে বললেন, সে কথা আর বলতে। আমি আশা করছি তোমার ফ্রেন্ডকে খাইয়ে আমি স্যাটিসফাই করতে পারব। বলা বাহুল্য আমাদের কথাবার্তা সবই হচ্ছিল ইংরেজিতে। নৃপতিদা যে ইংরেজিতে একটু মাঠো ছিলেন তা তো তুই জানিস। কিন্তু আমাদের কথাবার্তার মধ্যে নৃপতিদা একদম সঠিক ভাবে রি-অ্যাক্ট করতে লাগলেন মৃদু মৃদু হেসে।

আমি বললাম : তারপর।

বসন্তদা বললেন · সাহেব আমাদের নিচে বসতে দিলেন না। দোতলায় ভি আই পি-দের জন্যে রিজার্ভ করা একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আর সেদিন খাবাবের প্রিপাবেশনও হয়েছিল অপূর্ব।

আমি বললাম : তো এব মধ্যে নৃপতিদার যে বিস্ময়কব অভিনয়ের ক্ষমতার কথা তুমি বলেছ তার সম্পর্ক কোথায়?

বসন্তদা বললেন . সেই কথাতেই তো আসছি। খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পব ম্যানেজার নিজে এলেন আমাদের টেবিলে। আব তারপর আমার সঙ্গে কোন কথা না বলে সোজা নৃপতিদাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, খাবার কেমন লাগল' আমি তো তখন মনে মনে প্রমাদ গুণতে শুরু করেছি। নৃপতিদা যে ইংবেজিতে মাঠো সেটা তো তোকে আগেই বলেছি। তা নৃপতিদা সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে কী করলে জানিস। সারা চোখে মুখে তৃপ্তির ভাব ফুটিয়ে এমন একখানা এক্সপ্রেশান ঝাড়লেন যে সাহেব তাঁর প্রশ্নেব যথার্থ উত্তর পেয়ে গেলেন। খুশি মুখে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগলেন আর পুনরায় তাঁর রেস্টুরেন্টে আসবার জন্যে অনুরোধ জানাতে লাগলেন নৃপতিদাকে। নৃপতিদাও তার জবাবটা তাঁর ওই অসাধারণ এক্সপ্রেশানের মাধ্যমেই দিতে লাগলেন। আর আমি অবাক হয়ে নৃপতিদার সাইলেন্ট অ্যাকটিং-এর দক্ষতা দেখতে লাগলাম। অ্যাকটিং-এর মধ্যে চোখা চোখা ডায়লগ পেলে তো সবাই ফাটাতে পারে। কিন্তু অভিনেতার আসল ট্যালেন্টের পরিচয় তো সাইলেন্ট অ্যাকটিং-এ। ও ব্যাপারে নৃপতিদার যা দক্ষতা তার সিকি ভাগও যদি আমি পেতাম, তাহলে কোথায় পৌঁছে দিতে পারতাম নিজেকে!

বসন্তদা একবার একটা বিরাট অ্যাকসিডেন্টের কবলে পড়েছিলেন। বসন্তদা তখন ব্যাচেলার। আর ওই বয়সে আরও অনেক যুবকের যা হয়, বসন্তদাও তেমনি তাঁর জীবনযাপনে কিছুটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময় একদিন রবীন মজুমদারের সঙ্গে গাড়িতে করে ফিরছিলেন মধ্যরাত্রের পর। গাড়ির স্টিয়ারিং ছিল রবিদার হাতে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে তিনি গাড়ির স্পিড হু হু করে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর তারপরই অ্যাকসিডেন্ট। রবিদা অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু বসন্তদা রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। বাঁদিকের কপালে চোখের ওপর ভয়ানক চোট লেগেছিল।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন বসন্তদা বেলগাছিয়ার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের এমার্জেন্সি

ওয়ার্ডে। ওই ওয়ার্ড থেকে এক ফাঁকে পালিয়ে আসেন বসন্তদা। রাস্তায় বেরিয়ে কোনরকমে একটি ট্যাকসি ধরে সোজা ল্যান্সডাউন রোডে বিখ্যাত সার্জন ডাঃ অমরনাথ মুখার্জির বাড়িতে এসে হাজির হন। ডাঃ মুখার্জি বসন্তদাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি নিজে হাতে বসন্তদার কপালের কাটা জায়গাগুলো এমন ভাবে স্টিচ করে দিলেন যাতে তাঁর মুখটা অবিকৃত থাকে। এই যে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসা সেটা এই কারণেই। বসন্তদার মনের মধ্যে তখন ঝড় বইছে। যেমন করে হোক মুখটাকে তাঁর বাঁচাতেই হবে। নইলে এতদিন ধরে যে এত সংগ্রাম করে চলেছেন তা অর্থহীন হয়ে যাবে।

এই ব্যাপারে বসন্তদাকে বেশ কিছুদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। সারা ইন্ডাস্ট্রিতে রটে গিয়েছিল যে বসন্ত চৌধুরির মুখটা এমনভাবে বিকৃত হয়ে গেছে যে, আর তাঁর পক্ষে অভিনয় জীবনে ফিরে আসা সম্ভব হবে না। একটি কাগজেও তখন এইরকম একটা খবর বেরিয়েছিল। খবরটা যে কত মিথ্যে তা তো আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বসন্তদাকে ওই সময়ে নিজের একজিস্টেন্সের জন্যে রীতিমত লড়াই করতে হয়েছিল।

ঘটনাটা শুনতে শুনতে বসন্তদার মুখের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলাম। কই, কোথাও তো আঘাতের সামান্যতম চিহ্নও নেই। বসন্তদাকে বলেওছিলাম সেই কথাটা।

বসন্তদা বলেছিলেন : এটা ডাঃ মুখার্জির ক্রেডিট। তবে তার থেকেও বড় কথা, আমার এই মুখের ছবি তুলেছেন এমন একটি মানুষ, যাঁকে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফার বলে মনে করি।

আমি বললাম : কে তিনি?

বসন্তদা বললেন : তাঁর নাম হেনরি কারতিয়া ব্রেঁস। দ্যাখ রবি, ঈশ্বর আছেন কি না তা আমি জানি না। আমার বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার কোন ছবি তুই খুঁজে পাবি না। শুধু ঠাকুর-দেবতার কেন, কারও ছবিই নেই। তবে ব্রেঁসকে দেখবার পর আমার ঈশ্বরদর্শন করা হয়ে গেছে।

আমি বললাম : ব্রেঁসের সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায়?

বসন্তদা বললেন : এই কলকাতাতেই। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'আওয়ার ফিল্মস্ দেয়ার ফিল্মস্' বইতে স্বীকার করেছেন যে, কম্‌পোজিশনের ক্ষেত্রে ব্রেঁসের ছবিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। কলকাতায় কোন বিখ্যাত মানুষ এলে তাঁরা সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে যান তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সত্যজিৎবাবু নিজেই গিয়েছিলেন ব্রেঁসের সঙ্গে দেখা করতে। তাহলেই ভেবে দেখ কত ইম্পর্টান্ট মানুষ তিনি।

আমি বললাম : ব্রেঁসের ফটোগ্রাফি সম্পর্কে তুমি জানলে কোথা থেকে?

বসন্তদা বললেন : ইংল্যান্ডের যুবরাজ একজন ভালো ফটোগ্রাফার। তাঁর একটা লেখায় আমি পড়েছিলাম ব্রেঁস কাউকে তাঁর ছবি তুলতে দেন না। তা আমার কী অসীম সৌভাগ্য যে আমি ব্রেঁসের ছবি তুলেছি।

বললাম : তাই নাকি! তা তিনিও তো তোমার ছবি তুলেছেন বললে।

বসন্তদা বললেন : সেটাই তো আশ্চর্য! উনি কখন যে আমার ছবি তুলেছিলেন তা আমি একদম বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারলাম ছবিটা উনি আমাকে প্রেজেন্ট করার পর।

আমি বললাম : ছবিটা একটু দেখাবে?

বসন্তদা একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়লেন। তারপর যেন না দেখাতে পারলেই ভালো হত এমন একটা মনোভাব নিয়ে অতি সন্তর্পণে ছবিটা নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দিলেন। বসন্তদার মনোভাব অনুধাবন করে আমিও অতি সন্তর্পণে ছবিটা হাতে নিয়ে দেখলাম। অসাধারণ ছবি। অসাধারণ তার কম্পোজিশান। এই ছবিই বলে দিচ্ছে ব্রেঁস হলেন ফটোগ্রাফির উইজার্ড।

আমি বললাম : বসন্তদা, তোমার এই ছবিটা ছাপতে দেবে?

বসন্তদা প্রায় ছিনিয়ে নেবার মতো আমার হাত থেকে ছবিটা কেড়ে নিয়ে বললেন : পাগল হয়েছিস! এ ছবিটাকে আমি যক্ষের মতো বুক দিয়ে আগলে রেখেছি। আমার কাছে এটা মহাসম্পদ। আমি চাই না এটা পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হোক। অনেক লোকের দৃষ্টি এ ছবির দিকে পড়ুক। এ আমার কৃপণের ধন। তাতে তুই যদি মনঃক্ষুণ্ণ হোস তাহলেও আমার কিছু করবার নেই।

হঠাৎ বসন্তদা বলে উঠলেন : জ্ঞান এবং বিদ্যা যে মানুষকে কতটা বিনয়ী করে তোলে তা আমি ব্রেঁসকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম।

আমি বললাম : কী রকম?

বসন্তদা বললেন : ব্রেঁসর সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন তাঁর হাতে ধরা ছিল তাঁর সেই বিখ্যাত লাইকা ক্যামেরা, যেটার সম্পর্কে আমি প্রচুর পড়েছি। তা ওই লাইকা ক্যামেরা দেখে আমি আর লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, তোমার ওই বিখ্যাত লাইকা ক্যামেরাটা আমাকে দেখতে দেবে? তা ব্রেঁস তার উত্তরে কী বললে জানিস।

আমি বললাম : কী?

বসন্তদা বললেন : উনি অনায়াসে ক্যামেরাটা আমার হাতে দিয়ে বলতে পারতেন, ঠিক আছে, দেখো না। কিন্তু তার বদলে উনি যা বললেন তাতে আমার ভেতরটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। উনি ক্যামেরাটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, প্লিজ ব্লেস্ মাই ক্যামেরা। অর্থাৎ আমার এই ক্যামেরাটাকে একটু আশীর্বাদ করো। এই বিনয়ের তুলনা হয়। গ্রেট। গ্রেট। হী ইজ এ গ্রেট ম্যান।

আমি বললাম : কিন্তু তুমি ওঁর ছবি তুললে কী ভাবে?

বসন্তদা বললেন : ওঁর ওই বিনয় দেখে আমি একটু সাহসী হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, হেনরি, আমি জানি তুমি কাউকে তোমার ছবি তুলতে দাও না। আমার কি সৌভাগ্য হবে তোমার ছবি তোলার? কথাটা শুনে ব্রেঁস একটু হাসলেন। তারপর বললেন, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তুমি আমার ছবি তুলতে পারো।

আমি বললাম : তুমি তুললে ওঁর ছবি?

বসন্তদা বললেন : আমি না। আমার এক বন্ধু আমার সঙ্গে ছিল ক্যামেরা নিয়ে। সেই তুলেছে। ব্রেঁস পরে সেই ছবিতে ওঁর নাম সই করে দিয়েছেন। এটা আমার একটা মস্তবড় সৌভাগ্য। আমি জানি না, ভারতবর্ষে আর কারও এই সৌভাগ্য হয়েছে কি না।

আমি বললাম : এবারে তোমার থিয়েটারজীবনের কিছু কথা বলো।

বসন্তদা বললেন : আমার প্রথম জীবনে একটা সুযোগ এসেছিল শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে অভিনয় করার।

আমি বললাম : তাই নাকি।

বসন্তদা বললেন : তাই। কেতকী দত্ত, যাকে আমরা 'ছোট' বলে ডাকি, তার ভাই একটা কম্বিনেশন নাইটের ব্যবস্থা করেছিল শ্রীরঙ্গম মঞ্চে। শিশিরবাবুর ডাইরেকশান দেবার কথা ছিল। কিন্তু আমি তাতে অভিনয় করতে পারিনি। কেন পারিনি সেটা শিশিরবাবুকে গিয়ে বলেছিলাম। উনি তখন ওই শ্রীরঙ্গমের বাড়িতেই থাকতেন। এখন যেটা বিশ্বরূপা থিয়েটার। আমি গিয়ে শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে অভিনয় করতে পারব, এটা আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এত কম দিন রিহার্সালে অভিনয় করতে নামা আমি অন্যায় বলে মনে করি। অন্তত তিন মাস রিহার্সাল দিতে পারলে রাজি হতাম। কিন্তু সিনেমার এত কাজ আমার হাতে যে আমি অত সময় দিতে পারব না। আমার এই অক্ষমতার জন্যে আমাকে মার্জনা করবেন।

আমি বললাম : তোমার কথা শুনে শিশিরবাবু কী বললেন?

বসন্তদা বললেন : শিশিরবাবু বললেন, ইয়েস, ইউ আর রাইট। তুমি ঠিক কথাই বলেছ।

আমি বললাম : ওই বিশ্বরূপাতেই তো তুমি তোমার জীবনের প্রথম নাটক করেছিলে?

বসন্তদা বললেন : হ্যাঁ। তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকে। তারপর ওখানে 'ক্ষুধা' করেছি। আমার তো প্রফেশ্যনাল থিয়েটার সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বুড়ো, মানে তরুণকুমার আর কালী ব্যানার্জি আমাকে খুব হেল্প করেছে। ওদের তো অভিজ্ঞতা ছিল।

আমি বললাম : তারপর তো স্টার থিয়েটারে 'শ্রেয়সী নাটক?

বসন্তদা বললেন : হ্যাঁ। ওখানকার স্টেজের অ্যাটমসফিয়ারের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। ওই থিয়েটারের মালিক সলিল মিত্রের মতো ভদ্র মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। তারপর তো বিভিন্ন

স্টেজে। অগ্নিবন্যা, কালবৈশাখী, দেনা পাওনা, পরমা, আর সব শেষে বিপ্রদাস।

আমি বললাম : এখন আর স্টেজে অভিনয় করতে ইচ্ছে করে না?

বসন্তদা বললেন : একদম না। কলকাতার স্টেজগুলোর যা দৈন্যদশা তাতে বাঙালি জাতটা অত্যন্ত নাট্যপ্রেমী বলেই এখনও নাটক দেখতে যায়।

আমি বললাম : স্টেজে অভিনয় না করতে পারলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে না?

বসন্তদা বললেন : লাগে। তবে সেটা আমি মিটিয়ে নিই অন্য ভাবে। 'দেড় ইঞ্চি ওপরে' বলে একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের নাটকে একক অভিনয় করি সোহাগ সেনের এনসম্বলের ব্যানারে। মূল নাটকটা নির্মল ভর্মার। হিন্দিতে অনুবাদ করেছে সত্যদেব দুবে। সোহাগ ওটা বাংলা করে নিয়েছে। এই নাটকটা আমি গত বছরে অ্যামেরিকাতেও করে এসেছি। এখানেও করি। দর্শকরা নাটকটা পছন্দ করেছে বলেই মনে হয়।

আমি বললাম : এর আগে আমেরিকা যাওনি?

বসন্তদা বললেন : গেছি। ১৯৮৫ সালে। 'নতুন বৌঠান' বলে একটা স্কেচ তৈরি করেছি কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং রচনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। অমিতাভ চৌধুরি ওটা তৈরি করেছে। গোড়ায় আর শেষে পূর্বা দামের দুটো গান আছে। গোড়ায় 'তুমি কী কেবলি ছবি' আর শেষকালে 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। মাঝখানের বাকি অংশটা আমার পাঠ আর আবৃত্তি। আমেরিকায় ছটা জায়গায় করেছি। গত বছরও করে এসেছি। কলকাতাতেও অনেকগুলো শো করেছি। নাইনটি ওয়ানে যখন রবীন্দ্রনাথের ফিফটিয়েথ ডেথ অ্যানিভার্সারি হল তখন সংগীত নাটক আকাদমি আর ললিতকলা আকাদমি জয়েন্টলি যে অনুষ্ঠানটা দিল্লিতে করেছিল, সেখানেও করে এসেছি আমাদের ওই 'নতুন বৌঠান'।

আমি বললাম : এই জাতীয় অনুষ্ঠানে খুব তৃপ্তি পাও। তাই না?

বসন্তদা বললেন : দারুণ। আর একটা ব্যাপারে খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

আমি বললাম : সেটা কী?

বসন্তদা বললেন : জ্ঞান মঞ্চে আমি একবার রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' উপন্যাসটাকে এডিট করে পাঠ করেছিলাম। সন্তোষদা, মানে সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ তখন বেঁচে। উনি যে অনুষ্ঠানটা দেখতে এসেছিলেন তা আমি জানতাম না। শেষ হবার পর গ্রিনরুমে এসে সন্তোষদা বললেন : বসন্ত, তোমার এই 'নষ্টনীড়'-টা কে এডিট করেছে?

কথা শুনে তো আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। নিশ্চয় কিছু মারাত্মক ত্রুটি ঘটে গেছে, আর সন্তোষদার মতো একজন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞের কাছে তা ধরা পড়ে গেছে। তাই ভয়ে ভয়ে বললাম : ওটা আমিই করেছি সন্তোষদা।

সন্তোষদা আমার কথা শুনে খুশিতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন : দারুণ এডিট করেছ তুমি। সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'র থেকে তোমার 'নষ্টনীড়' অনেক ভালো হয়েছে।

আমি জিভ কেটে বললাম : দোহাই সন্তোষদা, এ কথাটা যেন বাইরে বলে বেড়াবেন না। একে তো মানিকদার কোন ছবিতে আজও চান্স পাইনি। এসব শুনলে ভবিষ্যতে আর কোনদিন পাব না।

আমি বললাম : তোমার যাত্রার জীবন সম্পর্কে কিছু বলবে না?

বসন্তদা বললেন : পুরো দুটো সিজন্ আমি যাত্রা করেছি। আর ওই দু বছরে নানা ইন্টারেস্টিং ঘটনা দেখেছি। ওটা নিয়ে তুই পরে কোন এক সময় লিখিস। আমি তোকে ডিটেলে সব বলব।

তাই হবে। বসন্তদার কাছে থেকে পরে এক সময়ে যাত্রাজীবনের নানা বৈচিত্র্যের কথা শুনে নিতে হবে। শুধু একটা কথাই জানিয়ে রাখি, বসন্তদা যাত্রা করতে গিয়েছিলেন ওই বৈচিত্র্যের সন্ধানেই। নিছক টাকা রোজগারের জন্য নয়।

পৃথিবীর এই নানাবিধ বৈচিত্র্যই বসন্ত চৌধুরিকে জীবন সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছে। তাঁর চলার গতি তাই আজও অব্যাহত।

স্বপনকুমার

আমাদের বাংলা সিনেমা-থিয়েটারে লিজেন্ডারি ফিগারের সংখ্যা প্রচুর। সেই গিরিশ ঘোষ থেকে শুরু করে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, অমৃতলাল বসু, অমর দত্ত, দানীবাবু, শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরি, নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস, প্রমথেশ বড়ুয়া, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত থেকে উত্তমকুমার পর্যন্ত আরও অনেকের নাম এক নিঃশ্বাসে বলে যাওয়া যায়। কিন্তু যাত্রার জগতে, কপাল কুঁচকে আকাশ-পাতাল চিন্তা করবার পরও স্বপনকুমাব ছাড়া আব কারও নাম স্মবণে আনতে পারা যাচ্ছে না। শহর থেকে শুরু করে গ্রাম বাংলার আবালবৃদ্ধবণিতাকে কেবল অভিনয় নয়, সেইসঙ্গে রাজকীয় আচার-আচরণ আর প্রবল ব্যক্তিত্বের জন্য এমন করে মাতাল করে তুলতে আর কেউ পেরেছেন বলে তো আমার মনে পড়ছে না।

এই যে আজ সারা বাংলার মানুষ এক ডাকে স্বপনকুমাবকে চেনেন, এটা কিন্তু আকাশ থেকে পড়ে পাওয়া কোনও জিনিস নয়। এর জন্যে সেই উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস থেকে একটি তরুণকে দিনের পর দিন মুখের রক্ত তুলতে হয়েছে, চোখের জল ফেলতে হয়েছে, কপালের ঘাম ঝরাতে হয়েছে। সেদিন তাঁর পাশে কোনও বন্ধু ছিল না, বান্ধব ছিল না, শুভানুধ্যায়ী ছিল না।

আমাদের যাত্রাজগৎ বড় বিচিত্র স্থান। এখানে কেউ কারও বন্ধু নয়। দিগন্তপ্রসারী মাঠের মধ্যে পর পর হার্ডল সাজানো আছে। প্রত্যেককে নিজের চেষ্টায় তা অতিক্রম করতে হবে। কেউ যদি মুখ থুবড়ে পড়ে তবে অন্যেবা তাকে মাড়িয়ে চলে যাবে। কেউ সহানুভূতিসূচক আহা-উহু পর্যন্ত করবে না। হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দেবে না। এখানে নিজের শব নিজেকেই বহন করতে হয়। ব্যতিক্রম যে কখনও ঘটে না, তা নয়। তবে তার সংখ্যা কোটিকে গুটিক। ওটাকে অ্যাকসিডেন্ট বলেই ধরে নিতে হয়। কিংবা ভেবে নিতে হয় ওটা একটা স্বপ্নের মতোই অলীক ব্যাপার।

এই পরিবেশের মধ্যে যাদের বছরেব পর বছর কাটাতে হয় তারা আত্মকেন্দ্রিক হতে বাধ্য। সেটা স্বপনকুমারও স্বীকার করলেন। বললেন · আপনি ঠিক কথাই বলেছেন রবিবাবু। সত্যিই আমি আত্মকেন্দ্রিক। যাত্রা ওয়ার্ল্ডে এ জাতীয় রটনা যে আছে তা আমি জানি। কিন্তু কত দুঃখে, কত যন্ত্রণায় যে আমাকে এমন আত্মকেন্দ্রিক হতে হয়েছে, সেটা তো আপনি জানেন না। আমার মুখ থেকে সব ঘটনা শোনবার পরও যদি আপনি বলেন আমি আত্মকেন্দ্রিক, তখন সেটা মাথা পেতে নেব।

সেইসব ঘটনা শোনবার জন্যে একদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার মেঘমল্লার বিল্ডিং-এর টপ ফ্লোরে স্বপনকুমারের ফ্ল্যাটে তাঁর মুখোমুখি বসেছিলাম। স্বপনবাবুর সঙ্গে আমার এর আগে পরিচয় ছিল না। তবে গত তিরিশ বছর ধরে আমি তাঁর অভিনয় দেখে আসছি। পরিচয় হয়তো আগেই হতে পারত, কিন্তু পরিচয় করিয়ে দেবার মতো কেউ ছিল না বলে সেটা সম্ভব হয়নি। আমার এক হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে স্বপনবাবু প্রবোধবন্ধু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেছেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ হয়নি। আমি আর প্রবোধবন্ধু একই সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি করতাম। ওঁরই আগ্রহে যাত্রাপাড়া নিয়ে কিছু কিছু লেখা আনন্দবাজারে লিখেছি। একই সঙ্গে দুজনে যাত্রাপাড়া পরিক্রমণ করেছি। কিন্তু প্রবোধবাবু কোনদিন ভুল করেও স্বপনকুমারের সঙ্গে আমার আনুষ্ঠানিক পরিচয় করিয়ে দেননি। শুধু স্বপনকুমার কেন, কারও সঙ্গেই নয়। উনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে একেক জনের সঙ্গে কথা বলছেন আর আমি ভবের ঠাটের মতো পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি। কী বিশ্রী অস্বস্তিকর অবস্থা একবার কল্পনা করুন।

ওই অস্বস্তিকর অবস্থায় হাত থেকে এক ভদ্রলোক আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর নাম শৈলেন্দ্রনাথ মোহান্ত। সত্যম্বর অপেরার মালিক। তিনি নিজে যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তখনকার পরিবেশে শৈলেনবাবু যাত্রা জগতে একজন শিক্ষিত মানুষ বলে পরিগণিত হতেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। আনন্দবাজারে প্রকাশিত আমার লেখাগুলি তিনি খুব যত্ন সহকারে পড়তেন। ওঁর

সঙ্গে আলাপটা ক্রমে বন্ধুত্বের পর্যায়ে চলে যায়। তিনি তাঁর চিৎপুরের গদিঘরের দোতলায় আমাকে বসিয়ে বিভিন্ন দলের মালিক এবং শিল্পীদের ডেকে এনে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। তাঁর এই উদারতার কথা কোনদিন ভুলব না। ভদ্রলোক অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। এটা বড় দুঃখের ব্যাপার।

ঠিক ওই সময়ে আবও একজন যাত্রার মালিক নিজে যেচে আমার সঙ্গে আলাপ কবেছিলেন। তাঁর নাম কিষাণ দাশগুপ্ত। কিষাণবাবু নিজেও একজন সাংবাদিক। ইউ এন আই-এর রিপোর্টার। কিষাণবাবুর দলটির নাম আমি ভুলে গেছি। ওই দলের 'বিনয় বাদল দীনেশ' পালাটি খুব নাম করেছিল। ড্যালহাউসি স্কোয়ারের নাম পালটে যেদিন 'বি বা দি' বাগ রাখা হয়, সেদিন রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে কিষাণবাবুর দল ওই পালাটি অভিনয় করেছিলেন।

কিষাণবাবু আমার থেকে বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন। তত্রাপি আমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমি একবার টেস্ট ম্যাচের টিকিট জোগাড় করবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেটা না পেয়ে খুব মনমরা হয়ে পড়েছিলাম। কিষাণবাবু লোকমুখে সে খবরটা পেয়ে আমার বাড়ি বয়ে এসে ক্লাব হাউসের একখানা কমপ্লিমেন্টারি কার্ড আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এই উদারতার কথা কোনদিন ভুলতে পারব না। সেই কিষাণবাবুও অকালে চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। খবরটা পেয়ে বড কষ্ট হয়েছিল। এই কিষাণবাবুর দলে স্বপনকুমারও বেশ কিছুদিন অভিনয় করেছিলেন।

যে স্বপনকুমারের অভিনয় আমি ১৯৬২ সাল থেকে নিয়মিত দেখে আসছি, তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো এই ১৯৯৩ সালে। সেটাও নাটকীয়ভাবে।

সেদিন সকালে মানিকতলায় রামমোহন মঞ্চের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম কী একটা কাজে। এমন সময় পিছন থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল : রবিদা, ও রবিদা!

পেছন ফিরে দেখি আমার দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে যাত্রাপাড়ার বিখ্যাত ফটোগ্রাফার রবি দাস। রবিকে আমি দীর্ঘকাল ধরে চিনি। অসাধারণ ছবি তোলে। যাত্রাপাড়ায় হাজার হাজার টাকাব ছবি তোলার কাজ করে। রঙিন পোস্টার ছাপানোর ব্যবসা করে। যাত্রাপাড়া থেকে যেমন হাজার হাজার টাকা রোগজাগ করছে, তেমনি হাজার হাজার টাকা মারাও গেছে। তাই নিয়ে ওর দুঃখ আছে, কিন্তু ক্ষোভ বা অভিমান নেই। যাঁরা টাকা দিতে পারেননি, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এখনও অটুট আছে।

রবির সঙ্গে বছর আষ্টেক কোনও যোগাযোগ নেই আমার। আগে প্রায়শই আমি ওর বাড়িতে যেতাম এবং ও আমার বাড়িতে আসত। ওর মেয়ে আমার এক পুত্রবধূর কলেজ-জীবনের বন্ধু। তার মুখ থেকেই রবির কিছু কিছু খবর পেতাম। সেই রবির সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে রামমোহন মঞ্চের সামনে দেখা।

রবি আমার সামনে এসে বললে : এদিকে কোথায় যাচ্ছেন দাদা?

আমি বললাম : আমার একটা কাজ আছে। তা তুমি কেমন আছ রবি?

রবি বললে : আমি ভালোই আছি দাদা। আজ আপনার একটু সময় হবে?

আমি বললাম : কেন বল তো?

রবি বললে : এই রামমোহন মঞ্চে সকাল ন'টা থেকে আমার দলের যাত্রাপালার রিহার্সাল আছে। বারোটা-একটা পর্যন্ত চলবে। আপনি যদি তার মধ্যে সময় করে একবার আসেন তাহলে ভালো হয়। একজনের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতাম।

সেই একজন যে যাত্রাসম্রাট স্বপনকুমার সেটা তখন বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, নতুন কোনও নায়িকা-টায়িকা নিয়েছে হয়তো। তার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে ওর সিলেকশনটা ঠিক কি বেঠিক সেটা আমার কাছে জেনে নেবে।

যাই হোক, রবির কথার উত্তরে আমি বললাম : আমি তো বুঝতে পারছি না আমি যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকে কখন ছাড়া পাব। যদি তাড়াতাড়ি বেরোতে পারি তাহলে তোমার রিহার্সালে একবার ঢুঁ মেরে যাব।

রবি বললে : একবার আসবার চেষ্টা করবেন দাদা। যদি আসেন তাহলে আমার অনেক দিনের একটা ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

রবির এই হেঁয়ালি মাখানো কথার কোন মানে আমি বুঝতে পারলাম না। তবু জিজ্ঞাসা করলাম: যাত্রার দলটা কি নতুন?

রবি বললে : হ্যাঁ দাদা। আমি আর আমার বন্ধু পীযূষ মিলে এই দলটা করেছি। তা আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে আজকে প্রথম রিহার্সালের দিনই পীযূষকে পাচ্ছি না।

আমি বললাম : কেন?

রবি বললে : ও জামসেদপুরে গিয়েছিল একটা বিশেষ কাজে। সেখানে বিরাট একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে। নার্সিংহোমে আছে। কবে সুস্থ হয়ে ফিরতে পারবে সেটা সঠিক বুঝতে পারছি না।

আমার তাড়া ছিল। তাই বললাম : ঠিক আছে ভাই। আমি চেষ্টা করব বারোটার মধ্যে আসতে। তুমি থাকবে তো?

রবি এক হাত জিভ কেটে বললে : বা রে! আপনাকে ডেকে পাঠাচ্ছি আর আমি থাকব না, তাই কখনও হয়।

আমি হাসতে হাসতে বললাম : ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি আসব।

বলে আমি চলে এলাম। আর বারোটার অনেক আগেই ফিরে এলাম রামমোহন মঞ্চে। ওখানে ঢুকেই প্রথম দেখা বেণুদির সঙ্গে। বেণুদি মানে সুপ্রিয়া দেবী। ওকে দেখে অবাক হয়ে বললাম : কী ব্যাপার বেণুদি, তুমি এখানে?

বেণুদি বললে : সে কী রবিদা, তুমি জান না আমি এই দলে এই বছর যাত্রা করছি।

আমি বললাম : তাই নাকি! আমি জানতাম না তো! তা ভালোই হল। তবে এরকম খাপছাড়া ভাবে যাত্রা না করে এই মিডিয়াটাকে কেরিয়ার করবার চেষ্টা করো না।

বেণুদি বললে : কেরিয়ারই তো করতে চাই রবিদা। কিন্তু ওই সিনেমার ব্যাপারটাই সব গণ্ডগোল করে দেয়।

আমি বললাম : তার মানে?

বেণুদি বললে : আমার হাতে হয়তো সিনেমার কাজ খুব বেশি নেই। শুয়ে-বসে দিন আর কাটছে না। ঠিক করলাম, এ বছর যাত্রা করব। দু-একটা দলের সঙ্গে কথাও হল। কিন্তু হঠাৎ হুড়মুড় করে তিন-চারটে ছবির কাজ হাতে এসে গিয়ে সব প্ল্যান ভেস্তে দিলে। ব্যস্, হয়ে গেল আমার যাত্রা করা।

আমি বললাম : এ বছর তাহলে তোমার সিনেমার কাজ কম বলো?

বেণুদি বললে : না গো রবিদা, প্রায় ছ'-সাতটা ছবির কাজ হাতে। কিন্তু এ বছর আমি ডিটারমাইন্ড যাত্রা করবই করব। সিনেমার প্রডিউসার-ডিরেক্টদের বলে দিয়েছি সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে আমার কাজ সব করিয়ে নাও। না হলে আবার সেই মার্চ মাস। তা সবাই হুড়মুড় করে যা ডেট নিয়েছে তাতে কী করে যাত্রার রিহার্সাল করব কে জানে!

বেণুদির সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন রবি খানিকটা দূরে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীরভাবে কী সব আলোচনা করছিল। তিনি আমার দিকে পেছন ফিরে ছিলেন। তাই তাঁর মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। বেণুদির সঙ্গে কথা শেষ হবার আগেই রবির নজর পড়ে গেল আমার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এল আমার কাছে। হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলে সেই পেছন ফিরে থাকা ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, ভদ্রলোক হলেন স্বপনকুমার।

সেদিন প্রায় এক ঘণ্টার ওপর বসে বসে স্বপনবাবুর কাজ লক্ষ করেছিলাম। শুনেছিলাম তিনি শারীরিক দিক থেকে ইদানীং তেমন সুস্থতা বোধ করছিলেন না। তাই তিনি ঠিক করেছিলেন যাত্রা করা ছেড়ে দেবেন। কিন্তু তিনি ছাড়তে চাইলেও কমৃলি তাঁকে ছাড়বে কেন। গত বছরও যাত্রার বিশিষ্ট অভিনেত্রী জ্যোৎস্না দত্তের বিশেষ অনুরোধে যাত্রা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ বছর তো একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছিলেন, আর যাত্রা একদম নয়। কিন্তু রবি দাসের অনুরোধে তাঁকে একেবারে শেষ প্রহরে এসে রাজি হতে হয়েছে। অন্য সব দলের পালা যখন প্রায় তৈরি তখন তাঁকে রবির দলের দায়িত্ব

নিতে হয়েছে।

কিন্তু ওঁর কাজ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, কোথায় ওঁর শরীর খারাপ? লাফাচ্ছেন, ঝাঁপাচ্ছেন, ছোটাছুটি করছেন, একেবারে আনকোরা শিল্পীদের কখনও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, কখনও বা ধমকে-ধামকে তৈরি করে নিচ্ছেন। উনি যদি অসুস্থ হন তবে আমরা তো খরচের খাতায়।

তখনই ঠিক করে ফেললাম, যাত্রার এই টপ গ্ল্যামারটিকে নিয়ে কিছু লেখালেখি করতে হবে। উনি তো কেবল যাত্রার শিল্পীই নন, হাফ ডজনের ওপর ছবিতেও কাজ করেছেন। পুরো একটা সিজন্ প্রতাপ মঞ্চে থিয়েটার করেছেন। তাছাড়া ওঁকে নিয়ে যাত্রামহলে কত রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রচলিত। এমন মানুষকে নিয়ে লেখা তো খুবই দরকার।

মনস্থির করে সেদিনই রবিকে ডেকে আমার মনের বাসনা প্রকাশ করলাম। শুনে তো রবি লাফিয়েই উঠল। বললে : এই জন্যেই তো দাদা আপনাকে আসতে বলেছিলাম। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে আপনার কলমে স্বপনকুমার আসুক।

আমি বললাম . ভদ্রলোকেব সঙ্গে আজই তো আমার প্রথম আলাপ। তাছাড়া উনি আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত আছেন কি না কে জানে। তুমি একটু কথা বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দাও।

প্রস্তাবটা শুনে স্বপনবাবু খুশি হলেন বলে মনে হল। দিন চারেক পরেই অ্যাপয়েন্টমেন্টের ডেট ঠিক হল ওঁর মেঘমল্লারেব ফ্ল্যাটে। কিন্তু আমার তো ব্যাপার। পর পর তিনটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেইল কবলাম। ভেবেছিলাম ভদ্রলোক অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন না আর। কিন্তু উনি যে একজন নিপাট ভদ্রলোক তাব প্রমাণ দিয়েছেন আমাকে তার পরও প্রশ্রয় দিয়ে। এবং প্রথম সিটিংয়েই আমরা উভয়ে উভয়ের বন্ধু হযে গেছি।

স্বপনকুমারেব রোমাঞ্চকর জীবনপর্ব সেইরকম কয়েকটি সিটিং-এ শুনেছি। তাতেই বুঝেছি একদিনেই তিনি যাত্রাদর্শকের নয়নের মণি হয়ে ওঠেননি। শুরু করেছিলেন একেবারে শূন্য থেকে। আর এখন যে তিনি কোথায় তা সুবে বাংলার তামাম যাত্রাদর্শক জানেন। আমাকে আর মুখ ফুটে বলে দিতে হবে না।

স্বপনকুমারের আসল নাম যে সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়—সেটা বোধহয় স্বপনবাবু নিজেই এখন ভুলতে বসেছেন। হঠাৎ সনৎ কেমন করে স্বপনকুমার হয়ে গেলেন তারও একটা ইতিহাস আছে।

স্বপনবাবুর বাবার নাম অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়। উনি ছিলেন মার্টিন রেলের গার্ড। থাকতেন বাগুইহাটির রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে। স্বপনবাবুর জন্ম সেইখানেই। ১৯৩৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। ওঁদের আদি বাড়ি কাঁচড়াপাড়ার বীজপুর গ্রামে।

স্বপনবাবু যে ফ্যামিলির ছেলে তাতে যাত্রা করতে আসবার কথা নয় তাঁর। বস্তুতপক্ষে উনি যখন যাত্রায় এসেছিলেন সেই ১৯৫১ সালে আজকের মতো এমন কৌলীন্য ছিল না যাত্রার।

সেই ১৯৫১ সালে স্বপনবাবু তখন বি-কম পড়ছেন। বাবার ইচ্ছে ছেলেকে চার্টার্ড অ্যাকউনটেনসি পড়াবেন। অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু এই মুখুজ্যে পরিবারের সব কিছু ওলটপালট করে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই স্বপনবাবুর বড়দা প্রভাত মুখোপাধ্যায় মেনিনজাইটিসে মারা গেলেন। তখনকার দিনে মেনিনজাইটিসের চিকিৎসার ব্যবস্থা সহজ ছিল না। অসুখটি একবার ধরলে তেরাত্তিরও পেরোতে দিত না। বাবার মৃত্যু, বড়দার মৃত্যু, স্বপনবাবুর মা করুণাময়ী দেবী তখন চোখে অন্ধকার দেখছেন। বিপদের ওপর আরও বিপদ। স্বপনবাবুর মেজদা অকস্মাৎ সংসার থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। অতএব বি-কম পরীক্ষায় ইতি দিয়ে ওই অপরিণত বয়সেই স্বপনবাবুকে চাকরির চেষ্টায় নামতে হল।

ঠিক মনোমত না হলেও একটা সুযোগ হঠাৎই স্বপনবাবুর সামনে এসে গেল। উনি তখন অ্যামেচার ভাবে কিছু কিছু অভিনয় করতেন। তেমনই একটা অভিনয় হয়েছিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'। উনি করেছিলেন নায়ক গদাইয়ের রোল। আর সেই অভিনয় দেখেছিলেন যাত্রা জগতের দুই দিকপাল পঞ্চু সেন এবং সৌরেন কুণ্ডু। ওঁরা তখন অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত দল আর্য অপেরার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই আর্য অপেরায় তখনকার দিনের বিখ্যাত অভিনেতা ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ, যাঁকে বড় ফণী বলে ডাকা হতো তিনি এবং ফণীভূষণ মতিলাল, যিনি ছোট ফণী নামে

পরিচিত ছিলেন, এঁরা দুজনেই অভিনয় করতেন। আমার শৈশবে আমি এই দুই ফণীর একত্রে অভিনয় দেখেছি। 'লক্ষ্মণবর্জন' পালায়। বড় ফণী করতেন রাম আর ছোট ফণী লক্ষ্মণ। এখন সেই অভিনয় দেখলে কেমন লাগত জানি না, কিন্তু সেই শৈশবে ওঁদের অভিনয় দেখে খুবই আপ্লুত এবং রোমাঞ্চিত বোধ করেছিলাম। বড় ফণীবাবু খুবই শিক্ষিত মানুষ ছিলেন, বিদ্যাবিনোদ উপাধিও পেয়েছিলেন সেই কারণে। কিন্তু ছোট ফণীবাবু শুনেছি কোনক্রমে নিজের নামটি স্বাক্ষর করতে পারতেন। কিন্তু অভিনয়ের সময় তাঁর পরিশীলিত উচ্চারণ শুনে সে কথা বিশ্বাসই হত না।

এই মুহূর্তে যাঁরা স্বপনবাবুর বাড়িতে এসেছেন সেই পঞ্চু সেনও একজন বিখ্যাত অভিনেতা। এই পঞ্চুবাবুই স্বপনকুমারের মা করুণাময়ী দেবীর সামনে প্রস্তাব রাখলেন, 'শেষরক্ষা' নাটকে সনৎ-এর অভিনয় তাঁদের খুব ভালো লেগেছে। ওকে তাঁরা আর্য অপেরায় নিতে চান। ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারলে যাত্রায় ওর ভবিষ্যৎ আছে।

করুণাময়ী দেবী স্বপনকুমারকে ডেকে বললেন স্বপন, তোমাকে দিয়ে এঁরা যাত্রা করাতে চান। তুমি রাজি আছ?

পঞ্চুবাবু বললেন ওর নাম তো সনৎ। ওকে স্বপন বলে ডাকছেন কেন? নাকি ওরা যমজ ভাই? একজনের নাম সনৎ, আর একজনের নাম স্বপন?

করুণাময়ী দেবী একটু হেসে বললেন : না না, যমজ-টমজ নয়, এরই নাম সনৎ। স্বপন ওর ডাক নাম। আমরা ওই নামেই ডাকি।

পঞ্চুবাবু বললেন · স্বপন নামটি তো বেশ ভালো। ও যদি যাত্রা করে তাহলে স্বপনকুমার নামেই করুক। বলা তো যায় না, ওই নামের দৌলতেই ও হয়তো একদিন মানুষের স্বপ্নের রাজকুমার হয়ে উঠবে।

না, যাত্রাকে ভালোবেসে নয়, তাৎক্ষণিক কিছু অর্থপ্রাপ্তির আশায় স্বপনকুমার আর্য অপেরায় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা খুব সুখকর হয়নি। সেদিনকার অভিনয় ছিল গ্রামের আসরে। গভীর রাতে যখন পালা শেষ হল তখন একটা মাঠের মাঝখানে লঙ্গরখানার মতো সারি দিয়ে শালপাতা পেতে খেতে বসানো হল তাঁদের। দলের প্রবীণ শিল্পীদের জন্যে কাঁসার থালায় থরে থরে ভাত-মাছ-পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে তাঁদের ঘরে ঘরে ধরে দিয়ে আসা হল। আর বাকি অভাজনদের জন্যে শালপাতায় ভাত, ডাল, একটা ঘ্যাঁট আর এক টুকরো মাছ। খেতে বসে চোখে জল এসে গিয়েছিল স্বপনকুমারের। শালপাতা চুঁইয়ে ডাল-ভাত মাটিতে মাখামাখি হয়ে গেছে। একটি গ্রাসও মুখে তোলা যায়নি।

বাড়ি ফিরে এই দুঃখের ঘটনা বলেছিলেন মায়ের কাছে। সব শুনে করুণাময়ী দেবী বলেছিলেন: দেখ বাবা স্বপন, আমরা গরিব হয়ে যেতে পারি বটে তা বলে তোকে শালপাতা পেতে ভাত খেতে হবে? তোর বাপ-ঠাকুর্দার আমলের আর কিছু না থাকুক, এখনও কাঠের সিন্দুক ভর্তি কাঁসার বাসন আছে। তুই কাল থেকে একটা থালা-বাটি-গেলাস সঙ্গে নিয়ে যাবি।

পরের দিন অভিনয়ের পর সেই থালা পেতে খেতে বসেছেন স্বপনকুমার। রান্নার ঠাকুর যথারীতি ভাত-ডাল দিয়ে গেছে থালায়। এমন সময় দলের ম্যানেজার এসে চিৎকার করে উঠলেন : এ কী ঠাকুর একে কাঁসার থালায় খেতে দিয়েছ কেন?

ঠাকুর বললে : আমি তো দিইনি। উনি বাড়ি থেকে থালা-বাটি এনেছেন।

শুনে ম্যানেজার আরও রেগে গেলেন। ঠাকুরকে বললেন : তুমি জানো ও কাঁসার থালায় খাচ্ছে শুনলে ছোট ফণীবাবু এক্ষুনি রেগে দল ছেড়ে চলে যাবেন।

এই বলে সাজানো ভাত সমেত থালাটি স্বপনকুমারের সামনে থেকে তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ভাতগুলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। অপেক্ষমান একদল কুকুর চিৎকার করতে করতে সেই ছড়ানো ভাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

না, সেই মুহূর্তে স্বপনকুমারের চোখ থেকে এক বিন্দু জলও ঝরে পড়েনি। তার বদলে ঠিকরে বেরিয়েছিল একরাশ আগুন। দাঁতে দাঁতে চেপে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এর বদলা তাঁকে নিতেই হবে।

এটা ১৯৫১ সালের ঘটনা। এবারে ১৯৮৫ সালের একটি দৃশ্যের দিকে চোখ ফেরানো যাক।

যেহেতু স্বপনকুমার নদী পেরিয়ে জলপথে গিয়ে অভিনয় করতে রাজি নন, তাই দিল্লি থেকে স্পেশ্যাল পারমিশন করিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলের চব্বিশ বিঘা জমির গাছ কেটে পনেরো দিন ধরে রাতদিন খেটে রানওয়ে বানিয়ে ফেলা হল। প্লেন চার্টার করে তাঁকে দমদম বিমানবন্দর থেকে সুন্দরবনে নিয়ে যাওয়া হল অভিনয় করাতে।

এমন প্রচেষ্টা বর্তমান সিনেমার মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের জন্যে কোনদিন করা হয়েছে কি না তা আমি জানি না।

কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটি ঘটল সে কথায় পরে আসছি।

যাত্রার জগতে আজ যিনি লিজেন্ড, সেই স্বপনকুমার তাঁর প্রথম জীবনে একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। আত্মহত্যা বলাটা হয়তো ঠিক হবে না, বরং বলা যায় আত্মহননের পথটি বেছে নিয়েছিলেন। আর তার পেছনে ছিল একটি ব্যর্থ প্রেমের উপাখ্যান।

স্বপনকুমার বরাবরই একটু রোম্যান্টিক ধরনের মানুষ। সিনেমার পর্দায় উত্তমকুমার যে রোম্যান্টিসিজমের জন্যে বিখ্যাত, যাত্রার আসরে স্বপনকুমারও তাই। ভিন্ন ভিন্ন পালায়, সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কত বিচিত্র চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে একজন রোম্যান্টিক নায়ক হিসেবে তিনি দর্শককে পাগল করে দিয়েছেন।

এই রোম্যান্টিসিজম যে কেবল তাঁর অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই প্রতিফলিত হয়েছিল তা নয়, তাঁর বাস্তব জীবনেও তার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে। প্রেমের সেই বিচিত্র ঘূর্ণিপাক তাঁকে যেমন আনন্দ দিয়েছে, তেমনি দুঃখও দিয়েছে প্রচুর। আর এটার শুরু সেই ১৯৫২ সাল থেকেই। অর্থাৎ যাত্রাজীবনের প্রায় শুরু থেকেই।

আগেই বলেছি স্বপনকুমারকে যাত্রায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতা পঞ্চু সেন। পঞ্চু সেন যাত্রাজগতের এক বিরল প্রতিভা। যাত্রার আসরে যখন সুরেলা অ্যাকটিং ছাড়া আর কিছুই চলত না, তখন পঞ্চু সেনই ন্যাচারাল অ্যাকটিং-এর আমদানি করেছিলেন সেখানে। তাবড় তাবড় অভিনেতারা যখন টেনে টেনে সুর করে আসরে দাঁড়িয়ে সংলাপ বলতেন, তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে পঞ্চু সেন স্বাভাবিক অভিনয় করে হাততালি পেয়েছেন। দর্শককে মোহিত করেছেন।

স্বপনকুমারও ঠিক ওই রাস্তাটিই বেছে নিয়েছিলেন। যার জন্যে পঞ্চুবাবু স্বপনকুমারকে খুব ভালোবাসতেন। যে কোনও বিপদে আপদে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতেন।

অনেকের ধারণা আছে, যাত্রার জগতে পঞ্চু সেনই হলেন স্বপনকুমারের অভিনয়ের গুরু। প্রয়াত পালাকার নন্দগোপাল সেনগুপ্ত আমাকে সেই তথ্যই দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জেনেছি, এ তথ্যটি ভুল। একেবারেই ভুল। স্বপনকুমারের অভিনয় জীবনের দীক্ষাগুরু হলেন তাঁর দাদা প্রভাত মুখোপাধ্যায়। প্রভাতবাবু ছিলেন তখনকার অ্যামেচার থিয়েটারের এক বিশিষ্ট প্রতিভা। সাধন সরকার, রেণু সেন, অনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালীন বিশিষ্ট অ্যামেচার অভিনেতাদের তিনি ছিলেন সমসাময়িক। স্বপনবাবুর অভিনয়ের বর্ণপরিচয় তাঁর এই দাদার কাছেই। স্বপনবাবু তখন স্কুলের ছাত্র। সে কথায় পরে আসছি।

যাত্রা জীবনের শুরুতেই স্বপনবাবু যে পঞ্চু সেনের অগাধ ভালোবাসা পেয়েছিলেন, তার একটি কারণ ছিল। স্বপনবাবুর যে যাত্রায় একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে সেটা পঞ্চুবাবু আঁচ করতে পেরেছিলেন। সুদর্শন চেহারা, মোটামুটি শিক্ষিত, উচ্চ বংশ, সর্বোপরি আচারে ব্যবহারে অনুপম এই যুবকটিকে তিনি বোধহয় জামাতা হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। তাঁর মেয়ে তৃপ্তিও তো রীতিমত সুন্দরী। পঞ্চুবাবুর মনে হল, বিয়ে হলে এ দুটিকে মানাবে বড় ভালো।

সেই কারণেই পঞ্চুবাবুর বাড়িতে স্বপনকুমারের ছিল অবাধ যাতায়াত। স্বপন কিংবা তৃপ্তি দু'জনের কেউই জানতেন না পঞ্চুবাবুর মনোগত ইচ্ছার কথা। কিন্তু এই দুই তরুণ-তরুণী বোধহয় প্রথম দর্শনেই মদনের পঞ্চশরে বিদ্ধ হয়েছিলেন। একটি দিনও দু'জনে দু'জনকে না দেখে থাকতে পারতেন না।

তখন প্রতিদিন যাত্রা হত। এখন যেমন একটা সিজনে তিন-চার মাসের বেশি যাত্রা হয় না, তখন

ছিল তার একেবারে উল্টো। বছরে ন'মাস থেকে সাড়ে ন'মাস যাত্রা করতে হত। যাত্রাপাড়ায় প্রবাদই চালু ছিল ষষ্ঠী থেকে জষ্ঠি। তার মানে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজায় ষষ্ঠীর দিন থেকে যাত্রা শুরু হত। একটানা চলত জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। বর্ষা শুরু হলে যাত্রা বন্ধ। শুরু হত পরের বছরের তোড়জোড়।

তখন তো টিকিট কেটে যাত্রা হত না। গ্রামের বারোয়ারি মণ্ডপে, জমিদারদের চণ্ডীমণ্ডপে আর কল-কারখানার মানুষের অবসর বিনোদনের জন্যে চাঁদা তুলে যাত্রা করাত। তখন তো গ্রামের দিকে এত সিনেমা হল ছিল না। ভিডিও পার্লারের ছড়াছড়িও ছিল না। তখন মফঃস্বলের মানুষের রিক্রিয়েশনের একমাত্র মাধ্যম ছিল যাত্রা। কোথাও কোথাও পাঁচালি আর কথকতা। সুতরাং আট-ন'মাস যাত্রা না করলে দলের খরচ উঠত না।

তা রাত্রে মুখে রঙ মেখে সারারাত রাজা উজির মারার পর শেষরাত্রে সামান্য একটু ঘুমিয়ে সকালে এসে তৃপ্তির হাতের চা খেতেন স্বপনকুমার। মুখে তখন আব রঙ লেগে নেই বটে, তবে সারা মন রঙে রঙিন। না, তখনকাব দিনের সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণীর কাছে শারীরিক আকর্ষণ বড় কথা নয়। চায়ের কাপটা হাত বাড়িয়ে নেবার সময় একটু আধটু হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি—সেটাই তখন পরম প্রাপ্তি। তাই নিয়েই মনে মনে ফাল্গুনী রচনা করা যায়। আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদি স্থূল ব্যাপাবগুলি তরুণ-তরুণীদের কাছে তখনও পাপের তালিকাভুক্ত। অতএব স্বপন কিংবা তৃপ্তি ওই পথে বিচরণের চেষ্টা করেননি কোনওদিন। একটা স্বর্গীয় প্রেমের সুষমায় উভয়ের মন আলোকিত হয়ে থাকত সারাদিন।

পঞ্চুবাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন স্বপনকুমারকে তিনি জামাতা হিসেবে পাচ্ছেন। স্বপনকুমার নিশ্চিত ছিলেন তৃপ্তিকে তিনি অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে পাচ্ছেন। তৃপ্তি পরিতৃপ্ত ছিলেন এই ভেবে যে এই সুঠাম সুন্দর মানুষটিকে কেন্দ্র করে তাঁর বাকি জীবন আবর্তিত হবে।

এইভাবে কেটে গেল দুটি বছর। তারপর একদিন পঞ্চুবাবু স্বপনকুমারকে বললেন . স্বপন, তোমার মাকে বলে রেখো আমি আগামীকাল সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা কবত যাব। কী জন্যে তা তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো। কিন্তু সে কথা তোমার মাকে তোমার বলবার দরকার নেই। যা বলবার আমি গিয়ে বলব। প্রস্তাবটা আমার মুখ থেকেই তাঁর প্রথম শোনা উচিত।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বপনকুমারের সারা মনে সানাইয়ের সুর বেজে উঠল। তৃপ্তির মনেও তখন জয়-জয়ন্তীর দ্রুত লয়ের স্পন্দন।

পরের দিন পঞ্চুবাবু চলে গেলেন স্বপনকুমারের মা করুণাময়ী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে। এ-বাড়িতে স্বপন আর তৃপ্তি আনন্দে উৎফুল্ল। প্রাত্যহিক সংযমের গণ্ডি ডিঙিয়ে উভয়ে উভয়ের হাত দুটি ধরলেন। তারপর ভবিষ্যৎ জীবনের কত রঙিন আর সোনালি পরিকল্পনা।

ওদিকে করুণাময়ী দেবীর সামনে পঞ্চুবাবু প্রস্তাবটা উত্থাপন করা মাত্র করুণাময়ী থরথর করে কেঁপে উঠলেন। এমন একটা প্রস্তাব আসতে পারে তা তিনি কল্পনাও করেননি। তিনি ভেবেছিলেন যাত্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বপনকুমার সম্পর্কে হয়তো নতুন কিছু ভেবেছেন পঞ্চুবাবু। সেটা নিয়েই আলোচনা করতে এসেছেন তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তার বদলে এ কী শুনছেন তিনি!

নিজেকে সামলাবার জন্যে একটু সময় নিলেন। তারপর খুব ধীর কণ্ঠে বললেন : পঞ্চুবাবু, আপনি প্রবীণ মানুষ। আমার শ্রদ্ধেয়। স্বপনও আপনাকে দারুণ শ্রদ্ধা করে। যাত্রার জগতে আপনি তাঁর অভিভাবকের মতো। কিন্তু আজ যে প্রস্তাব আপনি করলেন, সেটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

পঞ্চুবাবু বললেন : আপনি আমার মেয়েকে দেখেননি, তাই হয়তো অমত করছেন। কিন্তু আমার মেয়ে সত্যিই সুন্দরী। বাপ হয়ে মেয়ের গুণকীর্তন করা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলছি তৃপ্তি-মা আমার সংসারের সব কাজেই পারদর্শী। কিছুটা লেখাপড়াও তাকে শিখিয়েছি। আপনি একবার নিজের চোখে তৃপ্তিকে দেখুন। দেখবেন, আপনার মত পাল্টাতে বাধ্য হবেন।

করুণাময়ী বললেন : মেয়ে সুন্দর-অসুন্দরের প্রশ্ন নয়। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আপনারা কায়স্থ আর আমরা ব্রাহ্মণ। সুতরাং এ বিয়ে হতে পারে না।

পঞ্চুবাবু বললেন : এটা কোনও সমস্যাই নয়। আজকাল আর সবর্ণ অসবর্ণ কেউ দেখে না। এখন

মানুষের পরিচয় বর্ণে নয়, তার মনুষ্যত্বে। আজকাল আকছার অসবর্ণ বিয়ে হচ্ছে।

করুণাময়ী বললেন : তা হোক। আমি সেটা হতে দিতে পারি না। আমার শ্বশুর নেই, স্বামী নেই,। বড় ছেলেও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। সুতরাং শ্বশুরের বংশের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আমার ওপর। আমি এমন কোনও কাজ করতে পারি না যাতে শ্বশুরের কুলে কলঙ্ক লাগে।

করুণাময়ীর কথা শুনে মুখ কালো করে ফিরে এলেন পঞ্চুবাবু। তাঁর চেহারা দেখে মনে মনে কেঁপে উঠলেন স্বপন আর তৃপ্তি দু'জনেই। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে পঞ্চু সেন বললেন : স্বপন, আমার প্রস্তাব তোমার মা নাকচ করে দিয়েছেন। এতদিন আমি তোমাদের খোলাখুলি মেলামেশা করতে দিয়েছি তোমাকে জামাই হিসেবে পাব সেই আশায়। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব নয় তখন তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি আর আমাদের বাড়িতে এসো না। তৃপ্তির সঙ্গে মেলামেশা করো না। কথাটা তোমাকে বলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এছাড়া তো কোনও উপায় নেই। তৃপ্তির তো অন্য কোথাও বিয়ে দিতে হবে। আমি চাই না তোমাদের মেলামেশার কারণে তৃপ্তির নামে বদনাম রটুক।

পঞ্চুবাবুর প্রতিটি কথা স্বপনকুমারের বুকে কশাঘাতের মতো আঘাত করতে লাগল। বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইছে। ওদিকে তৃপ্তির দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অঝোর ধারায় অশ্রু। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন স্বপনকুমার। তারপরে ধরা ধরা গলায় বললেন : আমি একবার এ ব্যাপারটা নিয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই। মা আমাকে ভয়ানক ভালোবাসেন। আমি চাইলে মা এ বিয়েতে নিশ্চয় মত দেবেন। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে আর দুটো দিন সময় দিন।

পঞ্চুবাবু বললেন : আমার তো মনে হয় তোমার বলাতেও কোনও কাজ হবে না। তাঁকে যে রকম অ্যাডামেন্ট দেখলাম তাতে তো মনে হয় কারই কথাও তিনি শুনবেন না। তবু তুমি যখন বলছ তখন চেষ্টা করে দেখো।

দুরু দুরু বুকে বাড়িতে এলেন স্বপনকুমার। রাস্তা থেকেই ভাবতে ভাবতে আসছিলেন কেমন করে গুছিয়ে গাছিয়ে মায়ের সামনে কথাটা পড়াবেন। কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই ঝড়ের মুখে পড়ে গেলেন।

স্বপনকুমারকে বাড়ি ঢুকতে দেখেই করুণাময়ী কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : তুই নাকি পঞ্চুবাবুর মেয়েকে বিয়ে করতে চাস?

মায়ের সামনে কোনও দিন মিথ্যা কথা বলেননি স্বপনকুমার। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে এমন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন তিনি। মুখ ফসকে বেরিয়ে এল : না তো।

কথাটা শুনে করুণাময়ীর সারা মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পঞ্চুবাবু চলে যাবার পর থেকে তিনি ভাবছিলেন, কেমন করে স্বপনকে এই বিয়ের ব্যাপারে নিরস্ত করা যায়। তাঁর অমত আছে শুনলে স্বপন যে ভয়ানক আঘাত পাবে। হয়তো তাঁর সামনেই স্বপনের চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল ঝরে পড়বে। প্রাণাধিক পুত্রের সেই ম্লান মুখ তিনি সহ্য করবেন কেমন করে?

কিন্তু এই মুহূর্তে স্বপনের মুখে যে কথা শুনলেন তাতে তাঁর মনের সব অস্বস্তি কেটে গেল। ঠিকই তো! স্বপন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। সে কি অসবর্ণ বিবাহের মতো এত বড়ো অনাচার করতে পারে!

কিন্তু তখন যে পঞ্চুবাবু বললেন, তৃপ্তি আর স্বপনের মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে! ওরা দু'জনে দু'জনকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তাই তিনি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। তবে কি কথাটা মিথ্যে?

সে যাই হোক, এই অনাচার যাতে কোনও রকমেই না ঘটে তার জন্যে করুণাময়ীকে সচেষ্ট হতে হবে। তাই তিনি বললেন : তাহলে আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, আর কোনওদিন তুই পঞ্চুবাবুর বাড়িতে যাবি না। তৃপ্তির সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখবি না। কর, পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।

যন্ত্রচালিতের মতো মায়ের পায়ে হাত রেখেছিলেন স্বপনকুমার। বিড় বিড় করে কী যে উচ্চারণ করেছিলেন, তার একটা শব্দও নিজের কানে স্পষ্ট হল না। তাঁর চোখের সামনে তখন সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে।

আমি বললাম : সে কী। আপনি কি সত্যিই আর তৃপ্তি দেবীর সঙ্গে দেখা করেননি? আর কোনও দিন ওঁদের বাড়িতে যাননি?

স্বপনবাবু ম্লান হাসলেন। ওঁর বুকের মধ্যে যে ব্যথাটা ঘনিয়ে এসেছিল সেটা ঝেড়ে ফেলবার জন্যে দু'বার খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর বললেন : তারপর কতবার যে তৃপ্তিদের বাড়ির দিকে ছুটে গেছি তার কোনও হিসেব নেই। একদিকে প্রেম আর অন্যদিকে মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা। কী করব ঠিক করতে পারছিলাম না। দুরন্ত প্রেমের আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে গেছে তৃপ্তিদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত। নিশি-পাওয়া জীবের মতো ওদের বাড়ির কলিং বেলে গিয়ে হাত রেখেছি। আর সেই মুহূর্তেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মায়ের মুখখানা। মনে পড়ে গেছে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞার কথা। ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো হাতটা টেনে সরিয়ে নিয়েছি। তারপর ভারাক্রান্ত জন্তুর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ফিরে এসেছি। বুকখানা ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। কিন্তু মায়ের কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞার খেলাপ করিনি।

এরপর থেকে স্বপনকুমার কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে গেলেন। একবার মনে হল এ জীবন রেখে লাভ কী! গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব জ্বালা জুড়োবেন। তিনি তো সাঁতার জানেন না। মুহূর্তে অতলে তলিয়ে যাবেন। তাঁর চোখের জল আর গঙ্গার জল একাকার হয়ে যাবে।

পরমুহূর্তেই মনে পড়ল ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছেন আত্মহত্যা মহাপাপ। এখন যে পালাটা যাত্রায় করছেন তাতে তো তাঁর অভিনীত চরিত্রের মুখেও সেই সংলাপটা আছে। তেমন মহাপাপ করা কি তাঁর উচিত হবে?

তারপরই ভাবলেন, তিনি তো পৃথিবী ছেড়ে চলেই যাচ্ছেন। পাপ-পুণ্যে তাঁর কী যায় আসে। কিন্তু তাঁর মা? তাঁকে কে দেখবে? তিনি যে তাঁকে উজ্জ্বল জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখার আশায় বেঁচে আছেন?

অতএব আত্মহত্যা করা হল না স্বপনকুমারের। কিন্তু অন্য এক ধরনের আত্মহননের পথে পা রাখলেন তিনি। খাওয়া-দাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে দিলেন বলা ভুল। কোনও ধরনের খাবারই মুখে তুলতে পারলেন না। যা খেতে যান তাই বমি হয়ে যায়। সারা দিনে কেবল কাপের পর কাপ চা খেয়ে বেঁচে রইলেন তিনি।

ফল যা হবার তাই হল। মাস ছয়েকের মধ্যে দেখা গেল স্বপনকুমার গ্যাসট্রিক অ্যালসার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। বাঁচবার আশা ছিল না। অনেক কষ্টে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা হল।

স্বপনকুমারের কথার মাঝখানেই হঠাৎ একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসলাম। বললাম : আর কোনও দিন আপনার তৃপ্তিদেবীর সঙ্গে দেখা হয়নি?

প্রশ্নটা শুনে স্বপনকুমার কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেলেন। বেশ খানিকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না। তারপর যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছেন এইভাবে বললেন : অনেকদিন পরে একবার দেখা হয়েছিল।

আমি বললাম : কোথায়?

স্বপনবাবু বললেন : দুর্গাপুরে। আমি তখন যাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। সেই সময়ে দুর্গাপুরের এক আসরে যাত্রা শেষ হওয়ার পর তৃপ্তি তার স্বামীকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে তখন একজন সুখী গৃহিনী। তার স্বামী বিনয় সাহা। ওদের দু'জনকে পাশাপাশি দেখে খুব ভালো লেগেছিল। তৃপ্তির জীবন এখন তৃপ্ত।

আরও একটি বেখাপ্পা প্রশ্ন আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বললাম : ওদের সুখী দেখে, তৃপ্ত দেখে, আপনার মনে কোনও যন্ত্রণাবোধ হয়নি?

আমার প্রশ্নটা শুনে একটু হেসে ফেললেন স্বপনকুমার। বললেন : একদম কোনও যন্ত্রণা হয়নি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। বুকের মধ্যেটা কেমন যেন চিন চিন করে উঠেছিল।

আমি বললাম : এটাই স্বাভাবিক। যে কোনও পুরুষেরই এটা হয়।

স্বপনবাবু বললেন : তবে ওই যন্ত্রণাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। আমার জীবনেও তো ততদিনে অনেক মহিলার আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। সব শেষে স্বপ্নাকুমারীকে পেয়ে আমার জীবনটাও তো রঙে রসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমিও তো তৃপ্ত। সুতরাং যন্ত্রণাটা একবার দেখা দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে

গিয়েছিল।

স্বপনবাবুর সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে। বেশ খোলামেলা আলোচনা করতে ভালোবাসেন। কোনওরকম হিপোক্রেসি নেই। কতজন মহিলার সঙ্গ করেছেন তা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে তাঁর বাধে না। যেমন জ্যোৎস্না দত্তের ব্যাপারটা।

গত বছর স্বপনকুমার তাঁর শারীরিক কারণে ধনুকভাঙা পণ করে বসেছিলেন, না, আর যাত্রা করবেন না। কিন্তু জ্যোৎস্না দত্ত এসে অনুরোধ করাতেই সব ওলটপালট হয়ে গেল। যাত্রা করতে রাজি হয়ে গেলেন।

আমি বললাম : জ্যোৎস্না দত্ত বলতেই রাজি হয়ে গেলেন! নিজের শরীরের কথাটা একবার চিন্তা করলেন না?

স্বপনবাবু একটু হেসে বললেন : কী করব বলুন। আমার 'মাইকেল মধুসূদন' যাত্রাপালায় জ্যোৎস্না আমার হিরোইন ছিল। শুধু নাটকের হিরোইনই নয়, আমার জীবনেরও হিরোইন। ওর সঙ্গে অনেকগুলি আনন্দঘন মুহূর্ত কাটিয়েছি আমি। কাজেই ও অনুরোধ করলে আমাকে রাখতে হবে বইকি।

আমি বললাম : আপনি তো দেখছি একজন সম্রাটের মতো স্বেচ্ছাচারী জীবন কাটিয়ে গেলেন যাত্রায়?

আমার কথা শুনে স্বপনবাবু তাঁর সোফার ওপর মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন। তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন : হ্যাঁ, আমি একজন সম্রাটের মতোই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু কেন জানেন? আমার নিজের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার গ্ল্যামারটাকে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিতে। আমার প্রথম জীবনে আমি দেখেছি যাত্রা সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষের কোনও শ্রদ্ধা নেই। তার জন্যে দায়ী আমরাই। কারণ আমরা নিজেদের গ্ল্যামার তৈরি করতে পারিনি। হবেই তো! কোথাও যাত্রা করতে গিয়ে যদি মানুষজন দেখে যে যাত্রার হিরো বদনা হাতে মাঠের মাঝখানে পায়খানা করতে যাচ্ছে, তাহলে সে যত বড় অভিনেতাই হোক না কেন তার সম্পর্কে কোনও মোহ সৃষ্টি হবে কি? না হওয়া সম্ভব?

আমি বললাম : সেক্ষেত্রে আপনি কি করলেন?

স্বপনবাবু বললেন : মেক আপ নিয়ে আসরে ঢোকার আগে আমার মুখ কেউ দেখতে পাবে না। আমি গাড়ি করে যাব। গাড়ি সোজা প্যান্ডেল পর্যন্ত যাবে। আমি গলায় নেকটাই ঝুলিয়ে স্যুটেড-বুটেড অবস্থায় গাড়ি থেকে নেমে চট করে সাজঘরে ঢুকে যাব। সেখানে আমার জন্যে পর্দাঘেরা আলাদা মেক-আপ রুম থাকবে। আমার সহশিল্পীরাও সে ঘরে ঢুকতে পারবে না। অভিনয় শেষ হবার পর আমি সকলের চোখের আড়ালে গাড়িতে উঠে বসব। গাড়ি তার আগে থেকেই স্টার্ট দেওয়া থাকবে। আমি উঠবামাত্র আমাকে নিয়ে হুস করে বেরিয়ে যাবে।

আমি বললাম : এতে কী লাভ হয়েছিল?

স্বপনবাবু বললেন : প্রচণ্ড লাভ হয়েছিল। আমাকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে দর্শকের আগ্রহ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। যত দেখতে না পেত ততই আগ্রহ বাড়ত। আমার পালা দেখবার জন্যে হাউসফুল হয়ে যেত। আমি যে দলে থাকতাম তার মালিক বায়নার পরিমাণ দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ করে দিতেন। যাত্রা সম্পর্কে শুধু মফঃস্বলেই নয়, শহরেও একটা ক্রেজ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমার আগে ওই ক্রেজ ছিল না। ফলে আমি বেশি টাকা যেমন পেয়েছি, অন্যান্য শিল্পীরাও তেমন পেয়েছে। মালিকরাও পেয়েছে। দিনের পর দিন যাত্রার রমরমা বেড়েছে। আর সেই রমরমার জন্যে সিনেমা থেকে শিল্পীদের হাতে-পায়ে ধরে ডেকে আনতে হয়নি। বোম্বাইয়ের তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পীদের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি।

আমি বললাম : কিন্তু এই অবস্থা তো একদিনে হয়নি। তার জন্যে নিশ্চয় আপনাকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে?

স্বপনবাবু বললেন : তা তো হয়েইছে। শুনবেন সে সব কথা?

আমি বললাম : শুনব বইকি।

একদিন সন্ধেবেলা উত্তমকুমারের টেলিফোন এল স্বপনকুমারের বাড়িতে। ফোনের ও প্রান্ত থেকে

উত্তমবাবু বললেন : স্বপনবাবু, কাল সকালে ফ্রি আছেন?

ফোনের এ প্রান্ত থেকে স্বপনবাবু বললেন : এটা কী মাস উত্তমবাবু?

উত্তমবাবু একটু বিস্মিত হলেন স্বপনকুমারের কথা শুনে। বললেন : কেন, এটা তো মে মাস।

স্বপনবাবু বললেন : তাহলে আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন! এই মে জুন, জুলাই, আগস্ট আমি একেবারে মুক্ত বিহঙ্গ। আপনি তো জানেন এ ক'মাসে যাত্রার কনসার্ট বাজে না।

উত্তমবাবু বললেন : সেটা তো জানি। তবু কোনও পার্সোনাল কাজেও তো এনগেজড থাকতে পারেন। তাই জেনে নিচ্ছিলাম। আমার তো যেদিন শুটিং থাকে না সেদিন বেশি কাজের চাপ পড়ে। কারও স্ক্রিপ্ট শোনা। আরও নানা প্রবলেম্।

স্বপনবাবু বললেন . না না, আমার তেমন কোন ব্যাপার নেই। বললাম না, একেবারে মুক্ত বিহঙ্গ। তা হঠাৎ আমাকে স্মরণ করলেন কেন? আপনার কী সেবায় লাগতে পারি বলুন।

উত্তমবাবু বললেন . ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। কাল সকালে আমার পিঠে কয়েক ঘা চাবুক মারতে হবে আপনাকে?

উত্তমবাবুর কথা শুনে তাজ্জব বনে গেলেন স্বপনকুমার। বললেন : সে কী মশাই। এই সাঁঝবেলায় আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন নাকি? কোথা থেকে কথা বলছেন আপনি?

ফোনের ও প্রান্ত থেকে উত্তমকুমার হাসতে হাসতে বললেন না না মশাই, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমি কোন পাগলাগারদে বসে নেই। এই মুহূর্তে সুস্থ শরীরে ময়রা স্ট্রিটে বসে আছি। বেণুও রয়েছে আমার পাশে। ওকে একবার লাইনটা দেব নাকি? সন্দেহভঞ্জন করে নেবেন?

ফোনের এ প্রান্ত থেকে স্বপনকুমার বললেন : সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে পরে কথা বলছি। তার আগে চাবুক-টাবুক মারার কথা কী বলছেন সেটা খোলসা করে বলুন দেখি। আপনার কথা শুনে আমার তো মাথাটা ঘুরতে শুরু করেছে মশাই!

উত্তমবাবু বললেন : আমিও তো সেটাই চাইছি। মেয়ের মুখ থেকে আমার নামে অভিযোগ শুনে আপনি মাথার ঠিক রাখতে পারেন নি। চাবুক চালিয়ে আমার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছেন।

স্বপনবাবু বললেন : ওই দেখুন, আপনি তো আরও গুলিয়ে দিলেন সব। আমার আবার মেয়ে কোথা থেকে এল!

উত্তমবাবু বললেন : সে আমি জোগাড় করে দেব। আরতি ভট্চাজের বাবা হতে আপত্তি আছে নাকি?

স্বপনকুমার কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন : প্লিজ উত্তমবাবু, আমাকে আর সাসপেন্সের মধ্যে রাখবেন না। যা বলবার খুলে বলুন।

ফোনের ও-প্রান্তে উত্তমকুমারের দীর্ঘ হাসি শোনা গেল। তারপর হাসি থামিয়ে উত্তমবাবু বললেন : এখনও পর্যন্ত সাসপেন্সটা রাখতে পেরেছি তা হলে? আমি স্ক্রিপ্টের কাজে হাত দিলে খুব খারাপ হবে না, কী বলেন?

স্বপনবাবু পকেট থেকে রোমাল বার করে কপালটা মুছে নিতে নিতে বললেন : সাসপেন্স বলে সাসপেন্স! আপনার পিঠে চাবুকের পর চাবুক। আরতি ভট্চাজের বাবা হওয়া! আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে পারছি না।

উত্তমবাবু বললেন : না, আর সাসপেন্সে রাখব না। এর থেকে বেশি টানতে গেলে মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আসলে মঙ্গলদা, মানে পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তীর 'আমি সে ও সখা' ছবিতে একদিনের ছোট্ট একটা কাজ আছে। দু-চারটে সংলাপ আর আমার পিঠে সপাসপ চাবুক মারা। কাল সকালে এই কাজটুকু করে দিতে হবে আপনাকে।

স্বপনবাবু বললেন : তা এই সামান্য কাজটুকুর জন্যে আপনাদের টালিগঞ্জপাড়ায় আর লোক পাওয়া গেল না? খুঁজে-পেতে আমাকেই সিলেক্ট করলেন মশাই!

উত্তমবাবু বললেন : মঙ্গলদা তো বললেন, কেউই রাজি হচ্ছে না। উত্তমকুমারের পিঠে চাবুক মারলে নাকি দর্শকদের চোখে ভিলেন হয়ে যেতে হবে। তাই কেউ রাজি হচ্ছে না।

স্বপনবাবু বললেন : আমারও তো সেই প্রবলেম্ আছে। যাত্রায় আমার যারা ফ্যান তার মধ্যে এইট্টি পার্সেন্টের আপনি নয়নের মণি। আপনার পিঠে চাবুক মারলে আমার মার্কেট খারাপ হয়ে যাবে যে! তাছাড়া আপনি যেমন সিনেমার উত্তমকুমার, আমাকেও তেমনি ভালোবেসে সবাই যাত্রার উত্তমকুমার বলে। আপনার পিঠে চাবুক মারতে দেখলে আমার ফ্যানেরা ভাববে স্বপনকুমার নিশ্চয় জেলাসি থেকে এই কাজটা করেছে। না মশাই, আপনি এই গুরু দায়িত্বটুকু অন্য কারও ঘাড়ে চাপান।

উত্তমবাবু বললেন : সে কী মশাই। আমি তো আপনাকে সাহসী পুরুষ বলেই জানতাম। তা আপনিও ইমেজ নষ্ট হবার ভয়ে ব্যাক করে যেতে চাইছেন! স্বপনকুমারের ইমেজ এতই ঠুন্‌কো নাকি? ঠিক আছে, আপনিও একদিন আপনাদের যাত্রাপালায় আপনার পিঠে চাবুক মারবার একটা সিন্ রাখবেন। আমি সেটা করে দিয়ে আসব। তাহলে শোধবোধ হয়ে যাবে তো?

স্বপনবাবু হাসতে হাসতে বললেন : আপনি মশাই খুব বড় অ্যাক্টর! একেবারে আঁতে ঘা-টি দিয়ে দিলেন। ঠিক আছে। আমি রোলটা করব। কাল কোথায় যেতে হবে বলুন।

উত্তমবাবু বললেন . থ্যাংক ইউ স্বপনবাবু। আপনি একটা কাজ করুন না। কাল সকাল ন'টা নাগাদ আমার ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে চলে আসুন। দুজনে একসঙ্গে স্টুডিওতে যাব।

স্বপনবাবু বললেন : ঠিক আছে। তাই হবে। তবে আমার ন'টা মানে কাঁটায় কাঁটায় ন'টা!

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন : কী বললেন৷ কাঁটায় কাঁটায়। অত কাঁটায় কাঁটায় চলাফেরা করবেন না মশাই! পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হবে যাবে যে! একটু ফুলে ফুলে ঘোরাফেরা করার চেষ্টা করুন।

এই কথার পরে টেলিফোনের উভয় প্রান্তে দুটি জনপ্রিয় কণ্ঠের দীর্ঘ হাসির আওয়াজ শোনা গেল।

তা পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী কিংবা উত্তমকুমার যতটা চেয়েছিলেন তার থেকেও অনেক বেশি অমানুষিক ভাবে 'আমি সে ও সখা' ছবির ওই দৃশ্যটা করেছিলেন স্বপনকুমার। ছবির পর্দায় ওই দৃশ্যটা দেখতে দেখতে আমার সারা শরীরটা তো শিউরে শিউরে উঠছিল। ছবির ওটা একটা নাটকীয় দৃশ্য। দাদা উত্তমকুমারের পিঠে চাবুকের যত আঘাত পড়েছিল, ভাই উত্তমকুমার তার চেয়েও অনেক বেশি বদলা নিয়েছিলেন পরবর্তী একটি দৃশ্যে।

কিন্তু 'আমি সে ও সখা' স্বপনকুমারের প্রথম ছবিতে কাজ নয়। ওঁর প্রথম ছবি 'রূপ সনাতন'। সে ছবির পরিচালক ছিলেন পশুপতি কুণ্ডু। ঠিক স্মরণে আনতে পারছি না, যতদূর মনে পড়ে এটা পঞ্চাশের দশকের শেষ অথবা ষাটের দশকের গোড়ার দিকের ছবি।

স্বপনকুমারকে 'রূপ সনাতন' ছবির কাজ জোগাড় করে দিয়েছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। স্বপনবাবু তখন থাকতেন টালায় শৈলজাদার বাড়ির কাছাকাছি। ওই বাড়িতে স্বপনবাবুর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। শৈলজাদা স্বপনবাবুকে খুব ভালোবাসতেন।

পশুপতি কুণ্ডু একজন বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন। কমেডি চরিত্রে অভিনয় করতেন। উনি থাকতেন বাগবাজার স্ট্রিটে নাট্যকার-অভিনেতা যোগেশ চৌধুরির বাড়িতে। বেশ সদালাপী ছিলেন মানুষটি। ভদ্রলোকের সামনের দাঁতগুলো একটু উঁচু ছিল। যে কারণে ওঁকে দেখলেই সকলের হাসি পেত। শারীরিক এই ডিফেক্টের কারণেই ভদ্রলোক প্রায় সারা জীবন কমেডি রোল করে গেলেন। নইলে ভাবনায় চিন্তায় আলাপে উনি রীতিমত সিরিয়াস চরিত্রের মানুষ ছিলেন।

শৈলজানন্দের প্রায় সব ছবিতেই পশুপতি কুণ্ডু অভিনয় করেছেন। সেই সময়ে শৈলজাদাও বাগবাজারে থাকতেন। পশুপতিবাবু ছিলেন শৈলজাদার পার্শ্বচরের মতো। কাজেই পশুপতিবাবু যখন ছবি করতে এলেন তখন তাঁর ছবিতে স্বপনকুমারের মতো আনকোরা শিল্পীকে কাজ জোগাড় করে দিতে কোনও অসুবিধা হয়নি শৈলজাদার।

ওই 'রূপ সনাতন' ছবির আগে বেশ কিছুদিন সিনেমার পরিচালকদের দরজায় দরজায় ঘোরাঘুরি করেছিলেন স্বপনবাবু। যাত্রার জগতে তখনও তিনি সে ভাবে প্রতিষ্ঠা পান নি। দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তখন চেষ্টা করেছিলেন সিনেমার মাধ্যমে যদি ভাগ্যের দরজাটা খুলে যায়।

স্বপনবাবুর কথার মধ্যেই হঠাৎ আমি প্রশ্ন করলাম : সিনেমার সুযোগের জন্যে কোন্ কোন্

পরিচালকের কাছে গিয়েছিলেন?

স্বপনবাবু চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে কাচটা একটু মুছে নিলেন। বোধহয় সেই সব উমেদারির দিনগুলি স্মরণ করলেন। তারপর বললেন : অগ্রদূতের বিভূতি লাহার কাছে গেছি। অগ্রগামীর সরোজ দে মশাইয়ের কাছে গেছি। তা ওঁরা ওঁদের অক্ষমতার কথা আমাকে পত্রপাঠ জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আর দুজন চিত্র পরিচালক আমাব সঙ্গে যে রসিকতা করেছিলেন সে কথা কোনদিনই ভুলতে পারব না।

আমি বললাম : তাঁরা কে কে?

স্বপনবাবু বললেন : তাঁদের একজন হলেন সুধীর মুখার্জি। বিরাট পরিচালক। বিরাট নামডাক। তা আমাকে বেশ খানিকক্ষণ দেখে-টেখে তারপর বললেন . আপনার তলপেটটা খুব ভারি। ওটা কমিয়ে আসুন।

আমি বললাম : তা ভুঁড়ি বড হলে পরিচালকেব তো পছন্দ না হবারই কথা। এতে ওঁর দোষটা কোথায়?

স্বপনবাবু বললেন : দেখবেন সেই সময়ে কত বড় ভুঁড়ি ছিল আমার?

এই বলে উনি ওঁর ছবির ফাইল থেকে একটি ফটোগ্রাফ বার করে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম বোগা প্যাংলা একজন তরুণের ছবি। তলপেট ভারি হওয়া দূরে থাক, তলপেটটা আদৌ আছে কি না তাই বোঝা যাচ্ছে না।

স্বপনবাবু বললেন : যখন দিনের পর দিন দুধে-ভাতে থেকেছি তখনই আমার ভুঁড়ি হল না তা ওই বয়েসে ভুঁড়ি। আমি শরীর সম্পর্কে সব সময়েই খুব পার্টিকুলার। কোন সময়েই প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেদ জমতে দিইনি শরীরে। আর উনি যখন আমাকে ভারী তলপেটের কথা বললেন তখন তো আমার স্ট্রাগ্‌লিং-এর চূড়ান্ত। ভালো করে খাদ্যই জুটছে না, তার আবার ভুঁড়ি! এটা একটা রসিকতা নয়?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আর একজন কে?

স্বপনবাবু একটু হেসে বললেন : নীরেন লাহিড়ি। আপনাদের প্রিয় বেণুদা!

আমি বললাম : তাঁর রসিকতার ধরনটা কেমন ছিল শুনি।

স্বপনবাবু বললেন : নীরেন লাহিড়ি মশাই আমার নাকটা ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, আপনার নাকটা বড় বসা। বছরখানেক নাকে বেশ করে তেল ডলুন। তারপর সিনেমায় অভিনয় করতে আসবেন। বুঝুন ব্যাপারটা! উনি একজন বড় সিনেমার পরিচালক সেটাই আমার জানা ছিল। কিন্তু উনি যে একজন শরীর-বিশেষজ্ঞ, কোন্‌খানে তেল দিলে কোন্ জিনিসটা ওঠে, সেটা জানেন বলে আমার জানা ছিল না।

কথাগুলো শুনতে শুনতে স্বপনকুমারের তৎকালীন মানসিক লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করে চুপ করে গেলাম। কোনও কথা বলতে পারলাম না।

কিন্তু স্বপনবাবু চুপ করলেন না। তিনি বললেন : আজও আমি বিভূতিদাকে এবং সরোজদাকে শ্রদ্ধা করি। তাঁরা একজন অভিনয়েচ্ছু তরুণকে নিয়ে এমন কুৎসিত রসিকতার পথে যান নি। তাঁরা সরাসরি তাঁদেব অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, না ভাই, তোমাকে কোনও সুযোগ দিতে পারছি না। আমাদের সিনেমাতেই অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের কাজ দিতে পারি না বলে মনে মনে কষ্ট পাই। তোমাকে মিছিমিছি স্তোক দিয়ে ঘোরাব না। তুমি মন দিয়ে যাত্রাটাই করার চেষ্টা কর। আর তার জায়গায় এই দুই ভদ্রলোক নিউকামারাদের নিয়ে কী মজাটাই না করলেন। আমরা যারা ওঁদের কাছে অভিনয়ের প্রার্থী হয়ে আসি তারাও যে মানুষ সে কথাটাও বিবেচনা করলেন না।

স্বপনবাবু এরপর একটু থামলেন। একটু দম নিলেন বোধহয়। তারপর আবার বললেন : তবে ওই ঘটনা দুটো আমার জীবনে একটা বড় শিক্ষা হয়ে রইল। এরপরে যখন আমি যাত্রায় পরিচালক হয়েছি তখন বহু মানুষ আমার কাছে অভিনয়ের প্রার্থী হয়ে এসেছে। আমি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের ক্ষমতার পরিমাপ করেছি। তাদের কাউকে কাজ দিতে পেরেছি, কাউকে বা দিতে পারিনি। কিন্তু তাদের নিয়ে এমন মর্মান্তিক রসিকতার খেলায় মাতিনি। কত ছেলে এসেছে যাদের উচ্চারণে স-এর দোষ আছে। তাদের ভালো করে বুঝিয়েছি। কী করে উচ্চারণ শুদ্ধ করা যায় তার উপায় বাতলে দিয়েছি।

কিন্তু তাদের কাউকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করিনি। কে বলতে পাবে, ওদের মধ্যে কেউ একজন কঠোর অনুশীলনের দ্বারা পরবর্তীকালে আর একজন স্বপনকুমাব হয়ে উঠবে না!

আমি বললাম : ও সব দুঃখের কথা থাক। যত ভাববেন ততই মনটা তেতো হয়ে যাবে। তার চেয়ে আপনার প্রথম ছবি 'রূপ সনাতন'-এর কথা বলুন।

স্বপনবাবু বললেন : ফিল্ম ডিরেক্টারদের কাছ থেকে যা যা ব্যবহার পেতাম সে সব কথা আমি শৈলজাদার কাছে বলতাম। বলতে বলতে চোখ দুটো জলে ভরে আসত। আমার ওই দুঃখটা বোধহয় শৈলজাদাকে খুব টাচ্ করেছিল। পশুপতিবাবুর সঙ্গে কথা বলে উনি আমাকে 'রূপ সনাতন' ছবির কাজটা পাইয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে আমার কান কাটা গিয়েছিল প্রথম দিনই।

কথাটা শুনেই আমি শিউরে উঠলাম। স্বপনবাবুব কান দুটোর দিকে দৃষ্টি চলে গেল। কিন্তু না, সেগুলো তো যথাস্থানে বহাল তবিয়তেই আছে। তাহলে? জিজ্ঞাসা করলাম : কান কাটা গেল? সেটা কী রকম?

স্বপনবাবু বললেন : রূপ আর সনাতনের কাহিনীটা আপনার জানা আছে?

আমি বললাম : হ্যাঁ জানি। রূপ আর সনাতন প্রথম জীবনে ছিলেন জবরদস্ত রাজপুরুষ। ওঁরা ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। পরে চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসে ওঁরা জাতপাতের উর্ধ্বে অন্য জীবনের সন্ধান পান। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করে নাম-গান-সংকীর্তনে মেতে ওঠেন। তা নিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ওঁদের দারুণ ভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। কিন্তু ওঁদের কোনওক্রমেই টলানো যায়নি।

স্বপনবাবু বললেন : ঠিক বলেছেন। ওই 'রূপ সনাতন' ছবিতে রূপে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ববীন মজুমদার, আর সনাতন করেছিলেন গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়। নবাব করেছিলেন নীতীশ মুখার্জি। আর আমি করেছিলাম কাজীর চরিত্রে। বেশিদিনের কাজ নয়। মাত্র চার দিনের। দক্ষিণা পেয়েছিলাম পার-ডে দেড়শো টাকা হিসেবে মোট ছ'শো টাকা।

আমি বললাম : তখনকার দিনের অনুপাতে ছ'শো টাকা তো অনেক টাকা।

স্বপনবাবু বললেন : হ্যাঁ। টাকার অঙ্কটা ভালোই। তবে আমার মনে হয় তার পেছনেও শৈলজাদার হাত ছিল। নইলে একজন নিউকামার প্রথম ছবিতে অত টাকা পেত না ওইরকম ছোট একটা ক্যারেকটার রোলে। যাত্রায় সারা মাসে যত টাকা পেতাম তার ওয়ান ফোর্থ পেয়ে গেলাম ওই চারদিন কাজ করেই।

আমি বললাম : তা ওই টাকার সঙ্গে কান কাটা যাবার সম্পর্কটা কোথায়?

স্বপনবাবু বললেন . সেই কথাতেই তো আসছি। প্রথম দিন আমার শুটিং ছিল নীতীশবাবুর সঙ্গে। তখন 'মনিটার' কাকে বলে জানতাম না। জানতাম না যে ফাইনাল শট্ নেবার আগে যে দৃশ্যটার রিহার্সাল হয় তাকেই বলে মনিটার। তা পশুপতিবাবু যখন নীতীশবাবুকে বললেন যে দাদা একটা মনিটার নিচ্ছি, তখন নীতীশবাবু দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, আমি নবাব আর স্বপন কাজী। আমাদের বাঘ-সিংহের লড়াই হচ্ছে। তার আবার মনিটার কী? একেবারে ফাইনাল টেক কর।

আমি বললাম : এখনও কিন্তু আপনার কান কাটা যেতে দেখলাম না।

স্বপনবাবু বললেন : একটু পরেই যাবে। শুনুন না সবটা একটু ধৈর্য ধরে।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম : ঠিক আছে। ঠিক আছে। বলুন আপনি।

স্বপনবাবু বললেন : তারপর ফাইনাল টেক শুরু হল। যথারীতি আমার ডায়লগটা শেষ করে একটা পজ্ দিয়ে ঘাড়টা ফেরাতেই ডিরেকটার পশুপতিবাবু সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, কাট্ কাট্ কাট্।

আমি বললাম : কেন?

স্বপনবাবু বললেন : আমিও সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম পশুপতিবাবুকে। জিগ্যেস করেছিলাম কেন শট্টা ও-কে হল না? আমার দোষটা কোথায়? তা শুনে উনি বলেছিলেন, আপনি এত জোরে ঘাড়টা ফেরালেন কেন। আপনার তো একটা কান ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে চলে গেল। ওই শট্টা রাখলে আপনাকে কানকাটা কাজী মনে হত।

স্বপনবাবুর কথা শুনে আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম : সর্বনাশ! এরই নাম আপনার কান কাটা যাওয়া!

স্বপনবাবু বললেন : আমি কিন্তু ওই ব্যাপারে আপনার মতো হেসে উঠতে পারিনি। সিনেমার এই যান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা আমার খুব খারাপ লেগেছিল। এর চেয়ে আমাদের যাত্রা অনেক ভালো। সেখানে অভিনেতার অনেক বেশি স্বাধীনতা। ইন্ ফ্যাক্ট, এর পর থেকেই আমি যাত্রাকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেললাম।

আমি বললাম : সে কী! তার আগে যাত্রাকে ভালোবাসতেন না নাকি! আপনি তো যাত্রারই শিল্পী মশাই!

স্বপনবাবু বললেন : যাত্রার শিল্পী হয়েছিলাম দায়ে পড়ে। অভাবের কারণে। কিন্তু যাত্রাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতে পারিনি। পারব কী করে! একটা বনেদি বাড়ির ছেলে। মোটামুটি লেখাপড়া শিখেছি। তাছাড়া তখন পর্যন্ত যাত্রার কোনও কৌলিন্য নেই, সামাজিক স্বীকৃতি নেই। সেই শিল্পটাকে কি ভালোবাসা যায়। কিন্তু ওই একটা ছবিতে কাজ করার পর মনে হল, যাত্রা শিল্প হিসেবে অনেক বড়। সে পরনির্ভর নয়। অনেক উদার, অনেক স্বাধীন।

আমি বললাম : তাহলে তারপরে আবার সিনেমা করতে এলেন কেন?

স্বপনবাবু বললেন : আমি তো স্বেচ্ছায় আসিনি। আমাকে জোর করে ধরে এনেছিলেন উত্তমকুমার।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন্ ছবিতে?

স্বপনবাবু বললেন : 'বনপলাশীর পদাবলী'। আর সেটা করার পেছনে আছে আর-একটা নাটক। সে কথায় আর একটু পরেই আসছি।

যত ভালো যাত্রাই করুন আর সিনেমাই করুন না কেন, স্বপনকুমারের ভালোবাসার বস্তু হল স্টেজ। থিয়েটার। সেই ছোটবেলায় স্কুলের পড়ুয়া হিসেবে যখন অভিনয়ের অ আ ক খ জ্ঞান পর্যন্ত হয়নি তখন থেকে তিনি থিয়েটার করছেন। স্কুলের বার্ষিক উৎসবে থিয়েটার করে বেশ কয়েকটা প্রাইজও বাগিয়েছেন।

স্বপনবাবুরা তখন থাকতেন বেলগাছিয়ার অনাথ দেব লেনে। পড়াশোনা করতেন টালার দিগম্বর হাই স্কুলে। এই স্কুলের কিশোর উপযোগী নাটকগুলিতে স্বপনকুমারকে দেখা গেছে সেই চল্লিশের দশকে। শৈশবের সেই অভিনয়ের স্মৃতি এখনও স্বপনকুমারকে উতলা করে দেয়।

ওই স্কুলের হেড মাস্টারমশাই ছিলেন রামগোপাল সোম। তিনি ছিলেন একজন নাট্যানুরাগী মানুষ। মুখ্যত তাঁরই উদ্যোগে স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে নাটক অভিনীত হত। ভালো অভিনয় করবার সুবাদে স্বপনকুমার তাঁর স্নেহ পেয়েছেন অজস্র ধারায়।

স্বপনবাবু বললেন : একবার তো এই নাটকই আমাকে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

স্বপনবাবু বললেন : আমাদের হেড স্যার রামগোপালবাবু ছিলেন অঙ্কের টিচার। একবার আমরা জনা বারো ছেলে অ্যালজেব্রার ফর্মুলা মুখস্থ বলতে পারিনি। হেড স্যার তাঁর টেবিলের সামনে আমাদের সবকটি দোষী ছেলেকে ডেকে লাইন দিয়ে দাঁড় করালেন। তারপর শাস্তি হিসেবে প্রত্যেকের হাতে পড়তে লাগল এক ঘা করে বেত। আমার কাছে এসে স্যারের হাতের বেত থেমে গেল। ভালো করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন : অ্যালজেব্রার ফর্মুলা মুখস্থ করতে পারিসনি বটে, তবে নাটকের পার্টগুলো ঠিক ঠিক মুখস্থ করিস তো, তাই তোকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু বাবা, ফর্মুলা না জানলে যে বাকি জীবনটা হাবুডুবু খাবি। জীবন তো তোকে রেহাই দেবে না বাপ। লড়াই করে বেঁচে থাকতে হলে তোকে তো ফর্মুলা মুখস্থ করতেই হবে।

আমি বললাম : খুব দামি কথা বলেছিলেন আপনার হেড মাস্টারমশাই।

স্বপনবাবু বললেন : সেদিন তো স্যারের ওই কথাটার মানে বুঝতে পারিনি। পরে যখন জীবনের পদে পদে ঠোক্কর খেয়েছি, তখন বুঝতে পেরেছি বেঁচে থাকতে হলে ফর্মুলা জানাটা কত দরকারি।

আমি বললাম : কিন্তু আপনি কী জীবনের সব ফর্মুলা মেনে চলেছেন?

স্বপনবাবু বললেন : না মানি নি। অনেক ফর্মুলাই ভেঙেছি। যাত্রার সুরেলা অভিনয়ের ফর্মুলা ভেঙে ন্যাচারাল অ্যাকটিং করেছি। অন্যান্য সব নিয়মকানুন ভেঙে আমার মনোমত নিয়ম মেনে চলতে সবাইকে বাধ্য করেছি। এমনকি দাম্পত্যজীবনের প্রচলিত ফর্মুলাটাকে ভেঙে নতুন নতুন রাস্তায় পা বাড়িয়েছি। কিন্তু যে কোনও ফর্মুলাকে ভাঙতে গেলে ফর্মুলা জানাটা যে বিশেষ জরুরি, সেটা পদে পদে উপলব্ধি করেছি।

স্বপনকুমারের এই অকপট সত্য ভাষণে আমি তাঁর মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড চমৎকৃত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। হয়তো সেই মুহূর্তে তাঁকে আরও একটু উস্‌কে দিয়ে তাঁর জীবনের গুহ্যতম বার্তাগুলি শুনতে পারতাম। কিন্তু আমার অনুসন্ধান তো অন্যত্র। অন্য জীবন খুঁজতে বেরিয়েছি। তাই বললাম, ওসব তত্ত্বকথা এখন থাক স্বপনবাবু। আপনি বরং আপনার অভিনয় জীবনের কথাই বলুন। ওই কিশোর বয়েসেই তাহলে অভিনয়ের তৃষ্ণা জেগেছিল আপনার মনের মধ্যে?

স্বপনবাবু বললেন : একদম নয়। ওই মা যেমন তাড়া দিলে তবে খেতে বসতাম, তেমনি স্কুলের স্যারেরা কান ধরে টেনে নিয়ে গেলে তবে বিহার্সালে যেতাম। সত্যি কথা বলতে কী, নাটক করতে একদম ভালো লাগত না। তবে শো-এর দিন যখন হাততালি পেতাম, তখন বেশ ভালো লাগত। অভিনয়ের জন্যে যখন একরাশ বই প্রাইজ পেতাম, তখন আর একটু বেশি ভালো লাগত।

আমি বললাম : তবে যে আপনি সেদিন বললেন, যাত্রা করার আগে আপনি অ্যামেচার থিয়েটার করতেন, ভালো না লাগলে সেটা কেমন করে সম্ভব হল?

স্বপনবাবু বললেন : ততদিনে তো গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। সেদিনের সেই কিশোর তারুণ্যে পৌঁছে গেছে। আর বয়েসের সেই সন্ধিক্ষণটায় আমার বড়দা আমার মনের মধ্যে নাটকের প্রদীপটি জ্বেলে দিয়েছেন।

আমি বললাম : আপনার বড়দা মানে প্রভাত মুখার্জি। যাঁর কথা সেদিন আপনি বললেন?

স্বপনবাবু বললেন : বড়দা ছিলেন নাটকের মানুষ। শ্রীনাট্যম সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে ভূমেন রায়, রবি রায় ইত্যাদি পেশাদার অভিনেতাদের সঙ্গে অ্যামেচার শিল্পীদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গ্রুপ করে কল্ শো করতে যেতেন। এই বড়দাই আমাকে সঙ্গে করে স্টার রঙমহল মিনার্ভা ইত্যাদি জায়গায় নাটক দেখতে নিয়ে যেতেন। অহীন্দ্র চৌধুরি, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ির মতো দুর্ধর্ষ অভিনেতাদের অভিনয় বড়দার সঙ্গে গিয়ে গিয়ে দেখেছি।

বলতে বলতে স্বপনকুমার ফিক করে হেসে ফেললেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এতে হাসবার কী আছে?

স্বপনবাবু বললেন : বাড়ি ফিরে ওইসব নাটক বড়দার সামনে অভিনয় করে দেখাতে হত।

আমি বললাম : সেটা কীরকম?

স্বপনবাবু বললেন : আমি একটু শ্রুতিধর টাইপের মানুষ। সেই ছোটবেলা থেকেই। একবার কি দু'বার যা শুনতাম, তা মুখস্থ হয়ে যেত। যে কারণে যাত্রার পার্ট মুখস্থ করতে আমার বিশেষ সময় লাগত না। কোনও পালা রিহার্সালে পড়ার আগেই আমার অংশের সংলাপ আমার মুখস্থ হয়ে যেত।

আমি বললাম : শুধু অ্যালজেব্রাটা ছাড়া?

আমার কথা শুনে স্বপনবাবু হেসে ফেললেন। বললেন : হ্যাঁ, ওইটে ছাড়া। সারা জীবন এ স্কোয়ার প্লাস-বি-স্কোয়ার মিলিয়ে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার করতে পারলাম না। জীবনের একটা বড় অংশ মাইনাসই থেকে গেল।

আলোচনাটা আবার অন্য দিকে যাচ্ছে দেখে বললাম : তারপর কী হল বলুন।

স্বপনবাবু নিজেকে সামলাতে একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন : হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সেদিন মিনার্ভায় নির্মলেন্দু লাহিড়ির 'গৈরিক পতাকা' দেখে এসেছি। বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়ার পর বড়দা বললেন, ছোটবাবু, শিবাজীর পার্টটা একটু করে দেখাও তো। তা আমি বড়দার আদেশ পাওয়া মাত্রই গড় গড় করে অভিনয় করে দেখিয়ে দিলাম।

আমি বললাম : নির্মলেন্দুবাবু তো সুরেলা অ্যাকটিং করতেন। কিন্তু আপনি তো—

স্বপনবাবু বললেন : হ্যাঁ। কিন্তু নির্মলেন্দু লাহিড়িকে আমি আদর্শ করিনি। ওই একই পার্ট কীভাবে অন্য সুরে অ্যাকটিং করা যায় সেটা বড়দাই আমাকে শিখিয়েছিলেন। যে কারণে আমি প্রভাত মুখার্জিকে আমার গুরু বলে মানি। শুধু বাচনভঙ্গিই নয়, বড়দা আমাকে শারীরিক অ্যাকটিংটাও শিখিয়েছিলেন। আমি যখন অ্যামেচারে 'কেদার রায়' নাটকে কার্ভালো করি তখন আমাকে বড়দাই ভূমেন রায়ের মতো ভল্ট খেতে শিখিয়েছিলেন। ভূমেন রায়ের মতো অত ভালো কার্ভালো তো আর সেযুগে কেউ করতে পারেননি। বড়দা ভূমেন রাযের খুব অনুরাগী ছিলেন।

আমি বললাম : তাহলে যাত্রাপাড়ার সকলে যে বলে আপনার অভিনয়ের গুরু পঞ্চু সেন?

স্বপনবাবু বললেন : ওটা ঠিক কথা নয়। পঞ্চুবাবুও ন্যাচারাল অ্যাকটিং করতেন, কিন্তু আমার অভিনয় তাঁর থেকে স্বতন্ত্র। তবে আমার ধারাটা যে দর্শকরা অ্যাকসেপ্ট করছেন, সেটা বুঝতে পেরেছি মালা পাবার তারতম্য দেখে।

আমি বললাম : মালা?

স্বপনবাবু বললেন : তখন যাত্রার অ্যাকটিংয়ে খুশি হয়ে মেডেল পরানোর যুগ চলে গেছে। শুরু হয়েছে মালা পরানোর যুগ। একই আসরে, একই পালায় পঞ্চুবাবু যেখানে একটা মালা পেয়েছেন, সেখানে আমি পেয়েছি চারটে মালা। পঞ্চুবাবু খুব বড় অভিনেতা। কিন্তু আমি তাঁকে অনুসরণ করিনি কখনও। তাঁর জামাই হতে পারিনি বলে আমার দুঃখ আছে। যাত্রার জগতে তিনি ছিলেন আমার অভিভাবক। সব বিপদ আপদ থেকে আমাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। তিনি যদি সেবারে বাধা না দিতেন তবে কবে আমি যাত্রা ছেড়ে চলে আসতাম।

আমি বললাম . তাই নাকি! কীরকম?

স্বপনবাবু বললেন : সেটা আমার যাত্রার সেকেন্ড ইয়ার। আর্য অপেরায়। আমার ওই নতুন ধারার অভিনয় নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। কিছু দর্শক বলতে শুরু করলেন, এটা কী যাত্রা হচ্ছে নাকি? সুর নেই, বীররস নেই, গমক নেই। একে কী যাত্রা বলে। তা ওই কথা শুনে ঠিক করলাম, যাত্রা করা ছেড়েই দেব। পঞ্চুবাবুর কাছে মনের সেই ইচ্ছের কথা বলেও ফেললাম। উনিই তো আমাকে যাত্রায় এনেছেন। কাজেই চলে যাবার আগে ওঁর মতামতটা নেওয়া দরকার।

আমি বললাম : পঞ্চুবাবু আটকে দিলেন?

স্বপনবাবু বললেন . হ্যাঁ। উনি বললেন, তুমি কী আন্দাজ করতে পার কত পার্সেন্ট লোক তোমার অভিনয়কে খারাপ বলছে?

তা আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম : মনে হয় তিরিশ পার্সেন্টের মতো।

পঞ্চুবাবু বললেন : তাহলে বাকি সত্তর পার্সেন্ট লোক, যারা তোমার অভিনয়কে ভালো বলছে, তাদের বঞ্চিত করতে চাইছ কেন?

আমি বললাম : ওই তিরিশ পার্সেন্ট লোকের কটূক্তি যে আর সহ্য করতে পারছি না।

পঞ্চুবাবু বললেন : ভগবান তোমার মাথার দু'পাশে দুটো কান দিয়েছেন কেন জানো? একটা দিয়ে শুনবে, ভালো না লাগলে আর একটা কান দিয়ে বার করে দেবে।

স্বপনবাবু বললেন : তা পঞ্চুদা ওভাবে সাহস না যোগালে আমি হয়তো সত্যি সত্যি যাত্রা ছেড়ে দিতাম। যাত্রাসম্রাট স্বপনকুমারের আর জন্ম হতো না। পঞ্চুদা ছাড়া আরও একজন আমাকে নিরস্ত করেছিলেন। তিনি আমার মা।

আমি বললাম : করুণাময়ী দেবী?

স্বপনবাবু বললেন : হ্যাঁ। আমার মা শুধু নামেই করুণাময়ী ছিলেন না, সব দিক থেকেই তিনি করুণাময়ী। সেই মায়ের কাছে আমি একদিন কাঁদতে কাঁদতে যাত্রা ছেড়ে দেবার বাসনা প্রকাশ করলাম।

আমি বললাম : শুনে মা কি বললেন?

স্বপনবাবু বললেন : খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বাঁ হাতটা আমার মাথায় রেখে বললেন, যাত্রা তুই ছাড়িস না স্বপন। আমি তোকে আশীর্বাদ করছি, তোর সময়ে যাত্রায় তোর থেকে বড় কেউ থাকবে না। তুই হবি সবার সেরা।

আমি বললাম : মায়ের সেই আশীর্বাদ ফলেছে তো!

স্বপনবাবু বললেন : অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার সবটাই ঘটেছে মায়ের আশীর্বাদে। একটা সময়ে তো এমন হয়েছে যে একই বছরে তিন-চারটে বড় দল বিরাট টাকার অফার নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাকে রাখব আর কাকে ফেরাব ঠিক করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত তাঁদের সবাইকার সামনে টুকরো করা কাগজে দলের নাম লিখে চোখ বেঁধে লটারি করে দল ঠিক করতে হয়েছে। আমি জানি না আর কোনও যাত্রাশিল্পীর জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছে কিনা। আমি মনে করি এর সবটাই আমার মায়ের আশীর্বাদ।

বলতে বলতে স্বপনকুমার তাঁর ভেজা চোখ দুটো আঙুল দিয়ে মুছে নিলেন।

আমি বললাম : এবারে আপনার 'বনপলাশীর পদাবলী' ছবিতে অভিনয়ের ঘটনাটা বলুন।

স্বপনবাবু বললেন : উত্তমকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ তাঁর ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে। ওখানে সেদিন শিল্পী সংসদের মিটিং ছিল। উত্তমবাবুরা শিল্পী সংসদ তৈরি করার সময় যাত্রা শিল্পীদেরও সংসদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সিনেমার মানুষেরা বরাবরই একটু উন্নাসিক প্রকৃতির ছিলেন। যাত্রার শিল্পীদের তাঁবা মানুষ বলেই গণ্য করতেন না। অথচ অহীন্দ্র চৌধুরি, তিনকড়ি চক্রবর্তী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলি—এঁরা সবাই এককালে যাত্রা করেছেন। উত্তমকুমারও করেছেন। অথচ আমাদের শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। উত্তমবাবুরাই প্রথম এই প্রথাটা ভেঙে দিলেন শিল্পী সংসদ করার সময়। যাত্রার পঞ্চু সেনকে ওঁরা শিল্পী সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট করে নিয়ে গিয়েছিলেন ময়রা স্ট্রিটে শিল্পী সংসদের মিটিং-এ।

আমি বললাম : সেখানেই আপনার প্রথম আলাপ উত্তমবাবুর সঙ্গে?

স্বপনবাবু বললেন : আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি বললাম : প্রথম আলাপে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

স্বপনবাবু বললেন : দারুণ। পঞ্চুদা নিয়ে গিয়ে আমার পরিচয় দেওয়া মাত্র উত্তমবাবুর মতো ওরকম একজন সর্বজনপ্রিয় শিল্পী সিট ছেড়ে উঠে এলেন। আমার দু'হাত ধরে সমাদর করে তাঁর পাশে বসালেন। বললেন, এতকাল আপনার নামই শুনেছি। আজ প্রথম দেখা হল। উত্তমবাবুর ওই রকম আন্তরিকতা দেখে আমার তো চোখে জল এসে গিয়েছিল মশায়।

আমি বললাম : উত্তমবাবু তার আগে আপনার কোন যাত্রা দেখেছিলেন নাকি?

স্বপনবাবু বললেন : পাগল হয়েছেন। উনি বলে নিজের ছবিই দেখতে যেতে পারতেন না মবড্ হয়ে যাওয়ার ভয়ে, তা পাবলিক প্লেসে যাত্রা দেখা! তবে আমি ওঁকে আমার একটা পালা দেখিয়েছিলাম।

আমি বললাম : কী রকম?

স্বপনবাবু বললেন : সেটা ১৯৬৭ সাল। ওই শিল্পী সংসদ যে বছর প্রতিষ্ঠা করা হল। আমি সে বছর নবরঞ্জন অপেরার হয়ে 'মাইকেল মধুসূদন' পালাটা করছি। পালাটা দারুণ হিট্ করে গেছে। আমারও খুব যশ-টশ হয়েছে। যেদিন ময়রা স্ট্রিটে আমাদের মিটিং তার ক'দিন পরেই রবীন্দ্র সদনে মাইকেলের একটা শো ছিল। আমি ওই ময়রা স্ট্রিটে বসেই উত্তমবাবু আর সুপ্রিয়া দেবীকে শো দেখার আমন্ত্রণ জানালাম।

আমি বললাম : বলেন কী। রবীন্দ্র সদনের মতো পাবলিক প্লেসে উত্তমবাবু যাত্রা দেখতে যেতে রাজি হলেন।

স্বপনবাবু বললেন : আমার প্রস্তাব শুনে উত্তমবাবু প্রথমে একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, আপনি যখন ইনভাইট করছেন তখন নিশ্চয় যাব। কিন্তু দশ-পনেরো মিনিটের বেশি থাকতে পারব না। আমার সেদিন অন্য একটা জরুরি কাজ আছে। তা বলব কী মশাই, উত্তমবাবু আর সুপ্রিয়া দেবী বসে বসে পুরো পালাটা দেখলেন। শো-এর পর দেখা হতে বললেন, দেখুন, আমি প্রতিদিন সাড়ে আটটার মধ্যে ডিনার করি। তা আপনার অভিনয় আমাকে এমনভাবে বসিয়ে রাখল যে আজ আর ডিনার করাই হবে না। দারুণ অ্যাকটিং করেছেন আপনি। উত্তমবাবুর ওই কথা শুনে আমি সেদিন কৃতজ্ঞ বোধ

করেছিলাম।

আমি বললাম : যাত্রায় মাইকেল মধুসূদনের জীবন অবলম্বনে পালা করা তো একটা দুঃসাহসিক চেষ্টা। শিশির ভাদুড়ি থিয়েটারে মাইকেল নাটক নিয়ে যতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, আপনি তো বোধহয় তার থেকেও বেশি পেয়ে গিয়েছিলেন। ওটাই বোধহয় আপনার জীবনের সেরা পালা?

স্বপনবাবু বললেন : কোন্‌টা সেরা আর কোনটা নয় তার বিচার করবার আমি কে! তবে মাইকেল চরিত্রটার সঙ্গে আমি ভয়ানক ভাবে ইনভল্‌ভড হয়ে পড়েছিলাম। পালাটা লিখিয়েছিলাম বিখ্যাত নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যকে দিয়ে। আমি তখন টালায় থাকতাম। বিধায়কদা থাকতেন ব্রিজের ওপারে। চরিত্রটা করার আগে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ বসুর লেখা মাইকেলের জীবনী পড়েছি। আরও অনেক বই ঘেঁটেছি। মাইকেলের ক্যারেক্টারকে ভালো করে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত আমি পালা নাবাইনি।

আমি বললাম : ও পালাটা তো আপনারই ডিরেকশান?

স্বপনবাবু বললেন : হ্যাঁ। ১৯৬২ সাল থেকে আমি ডিরেকশান দিচ্ছি। আমি যা করতে চাই তা অন্যের ডিরেকশানে পাচ্ছিলাম না বলে ডিরেকশান দিতে আসা। আমার ডিরেকশানের প্রথম পালা কুণ্ডু অপেরায় 'কবরের কান্না'।

আমি বললাম : মাইকেল নিয়ে যে অত এক্সপেরিমেন্ট করলেন, সেটা ফিনানসিয়ালি সাকসেসফুল হয়েছিল তো?

স্বপনবাবু বললেন : কড়াক্রান্তি হিসেব বলতে পারব না। তবে ওই পালা করে নবরঞ্জনের মালিক দু'খানা বাড়ি করেছিলেন।

আমি বললাম : আপনার বনপলাশীর পদাবলী ছবির চরিত্রের মেক-আপটা অনেকটা মাইকেলের ধরনের হয়ে গিয়েছিল।

স্বপনবাবু বললেন : উত্তমবাবু তাই চেয়েছিলেন। ওই ছবিতে অট্টামার স্বামী ব্রজমোহন ভট্টাচার্যের চরিত্রটাও অনেকটা মাইকেলের ধাঁচে। ব্রজমোহনও খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিলেন।

আমি বললাম : ওই চরিত্রে খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন আপনি। আদ্যন্ত সিনেমাটিক। যাত্রার অভিনয়ের প্যাটার্নের সঙ্গে এতটুকু মিল নেই। আপনি কী তখন শিল্পী সংসদের মেম্বার ছিলেন?

স্বপনবাবু বললেন : হ্যাঁ। প্রথম দিনই ময়রা স্ট্রিটে অভিনেতা জহর রায় একটা ফর্মে সই করিয়ে আমাকে মেম্বার করে নিয়েছিলেন।

আমি বললাম : 'বনপলাশীর পদাবলী'র রোলটা তো বেশ বড়। আর কোন ছবিতে অত বড় রোল করেছেন।

স্বপনবাবু বললেন : না। বাকি সব ছোট রোল। 'সন্ন্যাসী রাজা' আর 'রাজবংশ'-য় ব্যারিস্টার, 'আমি সে ও সখা'-য় আরতি ভট্টাচার্যের বাবা, 'দুই পুরুষ-এ জমিদারের ছেলে, 'বহ্নিশিখা'-য় পুলিশের ডি সি ডি ডি। তরুণ মজুমদারের 'কুহেলী' ছবিতে একটা বিরাট বড় রোল পেয়েছিলাম। কিন্তু করতে পারিনি।

আমি বললাম : কেন?

স্বপনবাবু বললেন : তনুবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে যাবার পর জানতে পারলাম নভেম্বর ডিসেম্বরে কালিম্পঙে লম্বা আউটডোর করতে হবে। ওই সময়ে তো যাত্রার ফুল সিজন। কী করে যাই বলুন। কাজেই ছবিটা ছেড়ে দিতে হল। আমার ওই রোলটা শেষ পর্যন্ত বিশ্বজিৎ করল।

আমি বললাম : যাত্রা আর সিনেমা ছাড়াও আপনি, তো প্রফেশন্যাল স্টেজেও অভিনয় করেছেন।

স্বপনবাবু বললেন : হ্যাঁ করেছি। একবার। ১৯৮০ সালে আমার একটা ছোট্ট হার্ট অ্যাটাক হল। ১৯৮১-তে তাই আর যাত্রায় গেলাম না। ওই সময়ে প্রতাপ মঞ্চ থেকে শ্যামল মৈত্র আর অসীম মৈত্র এসে ধরল তাদের একটা নাটক করে দিতে হবে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিশিপদ্ম' গল্পের ওঁরা

বাইট কিনে নিয়ে এসেছিল বিভূতিবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে। তা আমি ভাবলাম যাত্রায় যখন রাত জাগতে হচ্ছে না তখন এই নাটকটাই করি। নাটক লেখালাম রমেন লাহিড়িকে দিয়ে। আমার সঙ্গে ওখানে অভিনয় করেছিলেন প্রেমাংশু বসু, সন্তোষ দত্ত, সোমা গাঙ্গুলি, আরও কে কে যেন। আমারই ডিরেকশান। ছবিতে উত্তমকুমার যে রোলটা করেছিলেন, আমি সেটাই করেছিলাম। এই নাটক করে দিল্লির ক্রিটিকস্ ক্লাব অব ইন্ডিয়ার পুরস্কার পেয়েছিলোম।

আমি বললাম : সিনেমায় উত্তমকুমার যেসব চরিত্র করেছেন, যাত্রাতেও তো আপনি সেরকম অনেক ক্যারেকটার করেছেন। 'স্ত্রী', 'সপ্তপদী' আরও কী কী যেন?

স্বপনবাবু বললেন : তা করেছি। তবে সেসব অভিনয়ে উত্তমবাবুর কোনও প্রভাব পড়েনি। আমি আমার মতো করেছি। ওটা ছিল আমার একটা চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া ওই সময়ে স্বপ্নাকুমারীর মতো একজন ট্যালেন্টেড শিল্পীকে আমার হিরোইন হিসেবে পেয়েছিলাম তো। স্বপ্না আমার ব্যক্তিজীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। আমারই দুর্ভাগ্য, একটা অ্যাকসিডেন্টে মেয়েটা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।

আমি বললাম . এবারে আর একটা প্রশ্ন করি। আপনি জলপথ পেরিয়ে অভিনয় করতে যেতে চান না কেন?

স্বপনবাবু বললেন : জলে আমার বড় ভয়। আমি তো সাঁতার জানি না। অথচ জীবনের প্রতি আমার বড়ই মায়া। আগে যেতাম। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটার পর জলপথ বর্জন করেছি।

আমি বললাম : কী সে ঘটনা?

স্বপনবাবু বললেন : আগে আমি বাসেই যেতাম। ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে দলের সঙ্গে যাই না। আলাদা যাই। বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত ট্যাক্সি করে। তারপর ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে। যেখানে নামতাম সেখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা থাকত। আমি স্যুটেড-বুটেড হয়েই অভিনয় করতে যেতাম। একবার মেদিনীপুরের একটা অঞ্চলে আমাকে নৌকায় করে নদী পার করা হল। আমি তো ইষ্টনাম জপ করতে করতে কোনরকমে গেলাম। ফেরার সময় দেখলাম নদীতে ভাঁটা। দলের সবাই লুঙ্গি তুলে, শাড়ি গুটিয়ে মাইলখানেক হাঁটুভর কাদা ভেঙে নৌকায় গিয়ে উঠছে। আমার কী হবে? ম্যানেজার বললে, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সে একটি হৃষ্টপুষ্ট লোককে ধরে নিয়ে এল। সে নাকি আমাকে কাঁধে করে নৌকো পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কী কাণ্ড। অগত্যা তার কাঁধেই চড়লাম। মাঝামাঝি রাস্তায় সে এসে বললেন, তুমি আমার কাঁধ থিকে লাম। আমি আর পারতিছিনি। এই বলে ঝপ করে কাদার মধ্যে ফেলে দিলে। আমি তো জলে-কাদায় একাকার। সেই থেকে প্রমিস্ করলাম, এভাবে আর যাত্রা করতে আসব না। সেই ১৯৭২ থেকে আমার জন্যে আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা হল। এখন তো অনেকের জন্যেই গাড়ি থাকে। ওই ব্যাপারটির পথপ্রদর্শক আমিই।

আমি বললাম : শেষ পর্যন্ত আপনার প্রতিজ্ঞা তো টিকলো না। সুন্দরবনের সাহেবখালিতে আপনাকে তো নদী পেরিয়ে অভিনয় করতে যেতে হলো।

স্বপনবাবু বললেন : আমি চাইনি যেতে। আমি নায়েকদের বলেছিলাম নদীর এপারে যাত্রা করাতে। দর্শকরা নদী পেরিয়ে এসে আমার অভিনয় দেখে যান। তা তারা বললে, অত হাজার হাজার লোক নদী পেরিয়ে আসবে তা তো সম্ভব নয়। আমরা আপনাকে আকাশপথে নিয়ে যাব। তা সত্যিই তারা দিল্লি থেকে পারমিশান করিয়ে চব্বিশ বিঘে জমিতে গাছ কেটে রানওয়ে তৈরি করে দমদম থেকে প্লেন চার্টার করে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল যাত্রা করাতে।

আমি বললাম : এটা কিন্তু একটা দারুণ ব্যাপার। এর আগে কখনও হয়নি। পরেও হবে কিনা সন্দেহ আছে। একেই বলে স্বপনকুমার ক্রেজ।

স্বপনবাবু বাধা দিয়ে বললেন : আহা সবটা শুনুন না আগে, তারপর মতামত দেবেন। আমি তো দমদম থেকে বেলা দুটোয় প্লেনে চেপে দুটো পঁয়তাল্লিশে সাহেবখালিতে নামলাম। নামবার আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছি গভীর বনের মধ্যে থেকে হাজার হাজার মানুষ পিল পিল করে ছুটে আসছে। কী ব্যাপার? পরে শুনলাম আমার প্লেনে করে আসা আর প্লেন থেকে নামা দেখার জন্যে এক টাকা করে টিকেট করা হয়েছিল। এইভাবে দেড়লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন নায়েক পার্টি। সুতরাং এটা জেনে

রাখুন, স্বপনকুমার যত অত্যাচারই করে থাকুক না কেন, তার সব কিছুই যাত্রাজগতের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে লেগেছে।

আমি বললাম : বেশ একটা থ্রিলিং লাইফ কাটিয়ে গেলেন বলুন।

স্বপনবাবু বললেন : ঈশ্বর যদি আরও কটা বছর বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে আবও কিছু থ্রিলার উপহার দেবার ইচ্ছে আছে। দেখা যাক্ কী হয়।

আমরাও সেই আশাতেই রইলাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি স্বপনকুমারের দীর্ঘ জীবন, আর কিছু রোমাঞ্চকর থ্রিলার।

সুমিত্রা দেবী

সুমিত্রা দেবীর কথাগুলো যেন আমার দুই গালে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় কষিয়ে দিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, আমি প্রচণ্ড একটা ভুল করে ফেলেছি। অত লোকের মাঝখানে ওই প্রশ্নটা করা আমার মোটেই উচিত হয়নি। হয়তো আমার ওই অবাঞ্ছিত প্রশ্নটা উপস্থিত আর কারও কানে যায়নি। সবাই মশগুল ছিলেন নানা ধরনের আলোচনায়। তা সত্ত্বেও সুমিত্রা দেবীর ব্যক্তিগত জীবনের সম্পূর্ণ গোপন একটি ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করার সময় এবং পরিবেশ তো এটা নয়। লজ্জায় মরমে মরে যেতে লাগলাম আমার এই ধরনের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য।

ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলা যাক। চল্লিশের দশকের মধ্যভাগে আমাদের সেই সদ্য যৌবনের দিনগুলিতে সুমিত্রা দেবী ছিলেন বাংলা ফিল্মের সবচেয়ে সুন্দরী অভিনেত্রী। তাঁর অভিনীত ছবি দেখবার জন্য আমরা হই হই করে সিনেমা হাউসের সাড়ে চার আনা টিকিটের কাউন্টারে দীর্ঘক্ষণ লাইন দিতাম। সেই সব ছবি মন স্পর্শ করুক আর না করুক, পর্দার বুকে সুমিত্রা দেবীর উপস্থিতিটাই আমাদের মুগ্ধ করে রাখত।

সুমিত্রা দেবী প্রথম নায়িকা হয়ে দেখা দেন চিত্ররূপা লিমিটেডের 'সন্ধি' ছবিতে। ওই ছবির পরিচালক ছিলেন অপূর্ব মিত্র। কিন্তু ছবির নেপথ্যের কারিগর ছিলেন দেবকীকুমার বসু। ছবিটি ১৯৪৪ সালে পুজোর পর, বোধহয় নভেম্বর মাস নাগাদ, মিনার সিনেমায় রিলিজ করেছিল।

রিলিজের সময় ওই ছবি দেখবার জন্য আমরা মোটেই উৎসাহ বোধ করিনি। যেমন করিনি বিমল রায় পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের সেই বিখ্যাত ছবি 'উদয়ের পথে' দেখবার জন্য। আমাদের তখন প্রধান লক্ষ্য থাকত কোন ছবিতে কে কে আর্টিস্ট আছেন, তারই ওপর। ওই চুয়াল্লিশ সালে রিলিজ করা 'ছদ্মবেশী' ছবি দেখবার জন্যে আমরা পাগল হয়ে ছুটেছিলাম, কারণ সে ছবিতে জহর গাঙ্গুলি আর পদ্মা দেবী ছিলেন। 'বিদেশিনী' ছবি দেখবার জন্যে ছুটেছিলাম, কারণ তাতে কানন দেবী আর ধীরাজ ভট্টাচার্য ছিলেন। ছবিটা দেখে খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সুন্দরী অভিনেত্রী কানন দেবীকে কী বিশ্রী দেখতে লাগছিল ওই ছবিতে। সেই সময়ে তিনি অসম্ভব মুটিয়ে গিয়েছিলেন। আর 'মাটির ঘর' দেখবার জন্য তো পাগল হয়ে গিয়েছিলাম ওই ছবির অসাধারণ পাবলিসিটির কারণে। হঠাৎ অসাধারণ বিশেষণটা কেন ব্যবহার করলাম তার কারণটা ব্যাখ্যা করি।

১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে একদিন অবাক হয়ে দেখলাম, সারা কলকাতা শহরের সবকটি দেওয়াল জুড়ে স্লিপ পোস্টারে ছেয়ে গেছে। তাতে লেখা, 'নন্দা বিষ খেয়েছে'। সেই পোস্টারের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এটা কি কোনও সিনেমার পোস্টার, না থিয়েটারের? অথবা অন্য কোনও কিছুর? ওই পোস্টারের বিস্ময় কাটতে না কাটতেই আবার একখানা পোস্টার। তাতে লেখা, 'তন্দ্রা পাগল হয়ে গেল'। এ কী কাণ্ড রে বাবা! এ যে আমাদেরই পাগল করে দেবার জোগাড়। দিন তিনেক পরে আবার একখানা পোস্টার। তাতে লেখা, 'ছন্দার বিয়ে গেল ভেঙে'। এবং তার দিন দুই পরের পোস্টারের বক্তব্য, 'সত্যপ্রসন্ন এখন কী করবে'? এতদিনে বুঝলাম এটা নির্ঘাৎ কোনও আসন্ন ছবির পোস্টার। কিন্তু কোন ছবির? সেই কৌতূহল মিটল পরের সপ্তাহের একটি বিরাট পোস্টারে। তাতে নন্দা, তন্দ্রা, ছন্দা এবং সত্যপ্রসন্ন সম্পর্কে ওই উক্তিগুলি উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে যে, এটি শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'মাটির ঘর' ছবির বিজ্ঞাপন। পরিচালনা : হরি ভঞ্জ। কাহিনী : মধুসংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্যের। কাস্টিং দেওয়া আছে, সত্যপ্রসন্ন— অহীন্দ্র চৌধুরি, তন্দ্রা—মলিনা দেবী, নন্দা—পদ্মা দেবী, ছন্দা—জ্যোৎস্না গুপ্তা, চঞ্চল—জহর গাঙ্গুলি, কল্যাণ—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ তখনকার দিনের একটি মাল্টিস্টারার ছবি। ওই জাতীয় বিজ্ঞাপন দেখার পর আর ওই ছবি না দেখে উপায় আছে?

কিন্তু 'উদয়ের পথে' কিংবা 'সন্ধি' ছবির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের কোনও আড়ম্বর তো ছিলই না, সেই সঙ্গে ছিল না কোনও তারকার আকর্ষণ। 'উদয়ের পথে'-র নায়ক-নায়িকা রাধামোহন ভট্টাচার্য এবং বিনতা বসু। তাঁদের নাম আগে কখনও শুনিনি। অর্থাৎ একেবারেই নবাগত। আবার 'সন্ধি' ছবির ক্ষেত্রেও তাই। নায়ক-নায়িকা কে? না, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুমিত্রা দেবী। এঁদের নামও আগে কখনো শুনিনি। অর্থাৎ এঁরাও নবাগত। সুতরাং এ জাতীয় ছবি দেখার জন্য আমাদের উৎসাহিত হবার কথা নয়। 'সন্ধি' ছবির কাহিনীকার তবু আমাদের অতি পরিচিত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে দেবকীকুমার বসুর নামও যুক্ত। কিন্তু 'উদয়ের পথে'-র কাহিনীকার আমাদের একেবারেই অপরিচিত। জ্যোতির্ময় রায়। এই নামটি তো আগে কখনও শুনিনি।

কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, যে দুটি ছবিকে আমরা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর মনে করেছিলাম, সেই 'উদয়ের পথে' আর 'সন্ধি' ছবিই সব শ্রেণীর মানুষের চিত্ত জয় করে দীর্ঘকাল টিকে রইল রূপালী পর্দার বুক জুড়ে। সে বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে সাংবাদিকদের স্বীকৃতি পেল ওই দুটি ছবি। নবগতা নায়িকা সুমিত্রা দেবী শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসেবে বি এফ জে এ পুরস্কার পেলেন।

সত্যি কথা বলতে কী, 'সন্ধি' ছবিতে সুমিত্রা দেবীর অভিনয় হয়েছিল দেখবার মতো। নবাগতা অভিনেত্রীদের মধ্যে যে যত অল্পই হোক এক ধরনের আড়ষ্টতা থাকে, তার ছিটেফোঁটাও নেই। কী দাপটের সঙ্গে তিনি অভিনয় করেছেন। চরিত্রটি একটি খামখেয়ালী তরুণীর। তাঁর সেই খেয়ালের ঠ্যালায় ভালোমানুষ স্বামী একেবারে তটস্থ। পান থেকে চুনটি খসবার উপায় নেই। সব কিছু ভেঙেচুরে তচনচ করে দেবে। তাঁর দাপটে সবাই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত। কিন্তু একটি জায়গায় দুর্বলতা ছিল এই তরুণীর। সেটা হল আরশোলা। আরশোলা দেখলে তিনি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যেতেন। মুখ দিয়ে কথা সরত না। ওঁর এই দুর্বলতা যেদিন আবিষ্কৃত হল সেদিন থেকে স্বামী একটি বোতলের মধ্যে আরশোলা ভরে রেখে তাই দিয়ে তাঁকে জব্দ করতেন। অমন দাপুটে মেয়ে একদম বোবা বনে যেত। কালক্রমে সেই মেয়ের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। নিজের খামখেয়ালীপনা ছেড়ে তিনি স্বামীর সঙ্গে সন্ধি করে নিলেন।

এই ছবিতে কী অসাধারণ অভিনয় সুমিত্রা দেবীর। দাপটের অংশে যেমন তিনি দুর্দান্ত, আরশোলা দেখে ভীত হয়ে পড়াটাও তেমনি। দুই পর্যায়েই তাঁর অভিনয়ে দারুণ চমৎকারিত্ব। বি এফ জে এ যোগ্য পাত্রেই শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মানটি প্রদান করেছিলেন।

তবে এর পেছনে দেবকী বসুর অবদান যে প্রচুর, সে কথাটিও অনস্বীকার্য। দিনের পর দিন তাঁর কাছ থেকে ট্রেনিং পেয়ে এমন পরিণত অভিনয় করতে পেরেছিলেন সুমিত্রা দেবী। এই ছবিতে দেবকীবাবুর পরিচিতি ছিল প্রযোজক হিসেবে। আসলে তিনিই ছিলেন ছবির প্রাণপুরুষ। চিত্রনাট্যও তাঁর। শৈলজানন্দের কাহিনীকে ভাঙচুর করে তিনি যে চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন, তাতে দেবকীবাবুর অবদান এত বেশী ছিল যে, 'সন্ধি' যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল তখন তার লেখক হিসেবে দেবকীবাবুর নামও সংযোজিত হয়েছিল। বইয়ের মলাটের ওপর লেখা ছিল শৈলজানন্দের 'সন্ধি'। নীচে লেখকের নামের জায়গায় দেবকীকুমার বসু। অর্থাৎ 'সন্ধি' বইটি দেবকী ও শৈলজার দ্বৈত রচনা।

সুমিত্রা দেবীর আসল নাম নীলিমা। নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মেছিলেন বীরভূমের শিউড়িতে। কিন্তু প্রাক্-বিবাহ যুগের বেশিরভাগ দিন কেটেছে বিহারের মজঃফরপুরে। বিয়েটাও হয়েছিল বিহারে। ভাগলপুরে।

যে কোনও কারণেই হোক, নীলিমার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। তাই একদিন স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করে চলে এলেন কলকাতায়। ঘটনাচক্রে রাধা ফিল্মসের অন্যতম কর্ণধার কানাইলাল ঘোষালের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর। তিনি সেই রূপবতী মহিলাটির সামনে সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব রাখেন। ছোটবেলা থেকেই সিনেমা দেখার নেশা ছিল নীলিমার। মজঃফরপুর আর ভাগলপুরে গিয়েও সে নেশা কাটেনি। প্রচুর হিন্দি আর বাংলা ছবি দেখতেন। কাজেই সিনেমার অফার পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন নীলিমা।

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, নীলিমা দেবী কলকাতায় এসে নিজেই কানাই ঘোষাল মশাইয়ের সঙ্গে

যোগাযোগ করেছিলেন, অথবা কানাইবাবুই কোন সূত্রে নীলিমা দেবীর সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে হাজির হয়েছিলেন, সেটা আমার সঠিক জানা নেই।

আমি যখন সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হই, তার বেশ কয়েক বছর আগেই সুমিত্রা দেবী ফিল্মে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন। ওঁর আসল নাম যে নীলিমা সেটাও জানতাম না। সেটা জেনেছিলাম মাত্র কয়েক বছর আগে কালাচাঁদদাব কাছ থেকে।

কালাচাঁদদাই যে বিখ্যাত পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, সেটা স্মৃতির সরণির পাঠক-পাঠিকার কাছে অজ্ঞাত নয়। কাবণ এব আগে নানা প্রসঙ্গে কালাচাঁদদার কথা আমাকে বলতে হয়েছে। এবং সুমিত্রা দেবীর প্রসঙ্গেও আবার সেই নামটিব শবণাপন্ন হতে হচ্ছে।

ক'বছব আগে নাট্যাচার্য শিশিবকুমার ভাদুড়ির জন্মশতবর্ষ হয়ে গেল। সেই উপলক্ষে দেশ পত্রিকায় শিশিববাবুকে নিয়ে একটি লেখার দাযিত্ব আমাকে দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাগরময় ঘোষ। শুনলাম আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি লিখবেন।

আমাব সঙ্গে শিশিববাবুর কোনবকম সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তাঁকে শ্রীরঙ্গম থিয়েটারের (বর্তমানে বিশ্বরূপা) সামনে দু-চাব বাব দেখেছি মাত্র। একটি দিনেব জন্যেও কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি। কাজেই শিশিববাবুর সম্পর্কে কী লেখা যায তাই নিযে চিন্তায় পড়ে গেলাম।

হঠাৎ কালচাঁদদা, অর্থাৎ অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি তো কিছুকাল শিশিরবাবুব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অভিনেতা হিসেবে। সুতরাং কালাচাঁদদার কাছ থেকে শিশিরবাবু সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পাবে।

কিন্তু কালাচাঁদদাকে এখন পাই কোথায? অনেকদিন যাবৎ তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। ছবি কবা তো তিনি ছেড়েই দিযেছেন বেশ কিছুকাল আগে। যখন তিনি অজিত বসু মশাইদের অরোরা স্টুডিওতে থাকতেন তখন তাঁব সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত। পরবর্তীকালে যখন তিনি শিল্পী সংসদের অফিসে বসবাস করতেন তখনও তাঁব সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছুদিন হল তিনি সেখানেও নেই। হঠাৎ যেন একেবারেই উধাও হয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না হলে তো আমার শিশিরবাবুর সম্পর্কে লেখাই হবে না।

হঠাৎ পানুবাবুর কথা মনে পডে গেল। পানুবাবু চিত্র পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের ডাকনাম। উনি অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভাই। তাঁব কাছ থেকে নিশ্চয়ই আত্মগোপনকারী অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের হদিস জানা যেতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই একদিন পানুবাবুর বাড়িতে টেলিফোন করলাম।

টেলিফোন পানুবাবুই ধবলেন। বললেন : দাদা তো খুব অসুস্থ।

আমি বললাম : সে কী' তাহলে তো ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হয়। ওঁর ঠিকানাটা আমাকে দিন তো।

পানুবাবু বললেন : দাদা তো এখন কলকাতায় থাকেন না।

আমি বললাম : তাই নাকি! তাহলে কী উনি ভাগলপুরে চলে গেছেন?

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়দের বাড়ি ভাগলপুরে। তাই ওই নামটাই প্রথম মাথায় এল।

পানুবাবু বললেন : না না, উনি এখন কৃষ্ণনগরে আছেন। আমাদের এক ভাইপোর বাড়িতে।

আমি বললাম : তাহলে কৃষ্ণনগরের ঠিকানাটা আমাকে দিন। আমি একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওঁকে আমার খুব দরকার।

পানুবাবু ঠিকানাটা দিলেন। সেই সঙ্গে কৃষ্ণনগর স্টেশনে নেমে কী ভাবে যেতে হবে সেই নির্দেশও দিয়ে দিলেন। তারপর বললাম : দাদার কাছে তো এখন আর কেউ যায়-টায় না। আপনি গেলে দাদার খুব ভালো লাগবে।

তা সত্যিই তাই। আমাকে দেখে অর্ধেন্দুদা হই হই করে উঠলেন। বাড়ির সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওঁর ভাইপোর সঙ্গে দেখা হয়নি। তিনি বাড়িতে ছিলেন না।

দেখলাম অর্ধেন্দুদার চেহারাটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু অসম্ভব মনের জোর তো! সব সময় হইচই করে বেঁচে থাকতে ভালোবাসেন। সেই মনের জোরই ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

প্রাথমিক হইচইটা কেটে যাবার পর কালাচাঁদদা বললেন : তারপর রবি, কী মতলবে এসেছ বল দিকি? নিশ্চয় তুমি বুড়োটাকে দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে এত দূরে ছুটে আসনি?

আমি বললাম : না না, আমি আপনাকে দেখতেই এসেছি। পানুবাবুর কাছে শুনলাম, আপনি অসুস্থ। তাই।

কালাচাঁদদা বললেন : ও সব আমড়াগাছির কথা ছাড় দিকি! তোমাকে আমি চিনি না! যখনই যেখানে দেখা হয়েছে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার পেটের কথা বার করে নিয়েছ! এই তো সেবার হেদোর ধারে তোমার সঙ্গে দেখা হতেই তুমি বসন্ত কেবিনে চা খাওয়ানোর ছুতো করে টানা দুটি ঘণ্টা বক বক করিয়ে নিলে!

কালাচাঁদদার কথা শুনে আমার একটু অভিমান হল। বললাম : ওইসব আলোচনাকে আপনি বক বক করা বলেন? আপনার কী পুরনো দিনের গল্প করতে ভালো লাগে না?

কালাচাঁদদা বললেন : কে বলেছে লাগে না! না হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার সঙ্গে আড্ডা দিই! তা এবারে আসার উদ্দেশ্যটা কী চটপট বলে ফেল দিকি? তোমাকে তো আবার কলকাতা ফিরতে হবে। না কী দু-একদিন কেষ্টনগরে থেকে যাবে?

আমি বললাম : না না, আমি আজই ফিরে যাব। আমার কী থাকার উপায় আছে। দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমার ওপর ওপর এমন একটি দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন যে—

আমার কথা শেষ হতে না হতেই কালাচাঁদদা বলে উঠলেন · ওই দেখ, সাগরের কথায় মনে পড়ে গেল। সাগর তো আমাকেও ফাঁসিয়ে দিয়েছে।

তারপর ভেতর বাড়ির দিকে মুখ করে বলে উঠলেন : হ্যাঁ রে. লেখাটা ঠিকমতো কপি করছিস তো? দেখিস বাবা, যেন ভুল-টুল না হয়।

আমি বললাম : কী ব্যাপার কালাচাঁদদা? কিসের কপি হচ্ছে?

কালাচাঁদদা বললেন : আর বল কেন! সাগরের হুকুম হয়েছে শিশিরবাবুর সম্পর্কে আমাকে একটা লেখা লিখতে হবে। তা আমার কী আর নিজের হাতে লেখার ক্ষমতা আছে। ডিকটেশন দিয়ে লিখিয়েছি। সেটাই ভালো করে কপি করাচ্ছি আর কী!

কালাচাঁদদার কথা শুনে তো আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। যে উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে এতদূর ছুটে আসা সেটাই তো ব্যর্থ হয়ে গেল। যাঁর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করব, তিনি যদি নিজেই লেখেন, তাহলে আর আমার লেখার কী প্রয়োজন। একই তথ্যের ভিত্তিতে ইনিয়ে বিনিয়ে কোনরকমে একটা লেখা খাড়া করার তো কোন মানেই হয় না। শিশিরবাবু সম্পর্কে লেখার সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম।

এই প্রথম সাগরদার কোনও আদেশ লঙ্ঘন করতে হচ্ছে। কিন্তু উপায় কী! লেখার ব্যাপারে আমি সৎ থাকতে চাই।

তা সেবারে দেশ পত্রিকায় শিশির ভাদুড়িকে নিয়ে আমি কিছু লিখতে পারিনি। আর লিখতে যে পারব না, সেটা জানাবার সাহসও হয়নি সাগরদাকে। আমি সাগরদার স্নেহপ্রবণ মূর্তি যেমন দেখেছি, তেমনি তাঁর দুর্বাসামূর্তিও তো দেখেছি। ভয়ে আর ও পথ মাড়াইনি দীর্ঘকাল। পরে অবশ্য সাগরদার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। সাগরদাকে তো আমি চিনি, তিনি আমাকে আগেই ক্ষমা করে রেখেছিলেন।

শিশিরবাবুকে নিয়ে লেখার সঙ্কল্প তো ত্যাগ করলাম। কিন্তু শুধু হাতে কলকাতায় ফিরতে হবে এটা ভাবতেই খারাপ লাগছিল। তাই বললাম, কালাচাঁদদা, পুরনো দিনের কথা কিছু বলুন। আপনারা চলে গেলে সেসব কথা তো আর কারও কাছে শুনতে পাব না।

কালাচাঁদদা বললেন : আমার জীবনের প্রায় সব ঘটনাই তো তোমাকে বলেছি রবি। বলার তো আর কিছু বাকি নেই। এখন শুধু অপেক্ষা করে আছি কবে ডাক আসবে।

তা সত্যিই আর বেশিদিন সেই ডাকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি কালাচাঁদদাকে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় লোকান্তরিত হয়েছিলেন। একদিন সকালে খবরের কাগজে সংবাদটা দেখে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম। চোখে জল এসে গিয়েছিল।

তা সেই মুহূর্তে কালাচাঁদদার কথা শুনে ধমকে উঠেছিলাম। বলেছিলাম : ওসব আজেবাজে কথা রাখুন তো। আপনি এখনো অনেকদিন বাঁচবেন। আমাদের জন্যে আপনাকে বাঁচতে হবে।

কথাটা শুনে কালচাঁদদা বোধহয় খুশি হয়েছিলেন। তাঁর মুখটা কেমন জানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন : নতুন কথা আর কী বলি বল তো রবি। বলতে গেলে তো সেই পুরনো কথাই সব বলতে হয়।

আমি বললাম : একটু ভেবে দেখুন না। যদি কিছু মনে পড়ে।

কালাচাঁদদা খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন : তোমাকে কী নীলিমার কথা কিছু বলেছি এর আগে?

আমি বললাম : কে নীলিমা? ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী? না, ওঁর কথা তো কিছু বলেননি।

কালাচাঁদদা বললেন : আরে না না, ভানুর বউ নয়। আমি বলছি তোমাদের ওই ভেটারেন সুমিত্রা দেবীর কথা। 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবির ছোট বউঠান।

সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রথম যৌবনে দেখা একজন অসাধারণ সুন্দরী মহিলার ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বললাম : না, ওঁর কথা তো কিছু বলেননি।

কালাচাঁদদা বললেন : তাহলে শোন। সে এক ভারি ইন্টারেস্টিং ঘটনা।

আমাদের যৌবনকালের সেই অসামান্যা সুন্দরী অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবীর আসল নাম যে নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেটা যেমন আমার জানা ছিল না, তেমনি জানা ছিল না যে, তিনি বেশ কিছুদিন বিবাহিতা জীবন যাপনের পর ফিল্ম করতে এসেছিলেন। আসলে তখনকার দিনের পত্র-পত্রিকায় কোনও অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রীর ব্যক্তিজীবন নিয়ে তেমন কিছু তো আলোচনা হত না। যেটুকু যা হত, সেটা কেবল তাঁদের কর্মজীবন নিয়ে। তখনকার দিনের সাংবাদিকরা মানুষের ব্যক্তিজীবন নিয়ে আলোচনা পছন্দ করতেন না। কারও নিজস্ব গণ্ডিতে নাক গলানোকে তাঁরা অনধিকার চর্চা বলেই গণ্য করতেন।

এ ব্যাপারটা ভালো কী মন্দ তা নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না। তবে আজকাল যেমন প্রায়শই দেখতে পাই যে, শিল্পীদের সঙ্গে সাংবাদিকদের সম্পর্কটা মাঝে মাঝেই তিক্ত হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত স্ক্যান্ডালের কারণে, তখনকার দিনে কিন্তু তা হত না। সেসব আমলে সাংবাদিকরা ছিলেন শিল্পীদের বন্ধু। কখনও বা অভিভাবক। তাঁরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একজন হিসেবেই গণ্য হতেন। সুখে-দুঃখে ইন্ডাস্ট্রির মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতেন। প্রয়োজন হলে তাঁদের জন্য লড়াই করতেন। আজকাল তো দেখতে পাই, সাংবাদিকরা চলচ্চিত্র শিল্পে প্রায় বহিরাগতের মতোই। তখনকার দিনে এ অবস্থা ছিল না।

যেহেতু তখনকার দিনের পত্র-পত্রিকায় শিল্পীদের ব্যক্তিজীবনের ওপর আলোকপাত করা হত না, সেই হেতু আমরা জানতেও পারিনি যে, সুমিত্রা দেবী বিবাহিতা ছিলেন। আমরা জানতাম তাঁর বিয়ে হয়েছিল বিখ্যাত অভিনেতা দেবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

দেবী মুখোপাধ্যায় ছিলেন চল্লিশের দশকের একজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিনেতা। চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয়জীবনের আয়ু মাত্র আট বছর। কিন্তু ওই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় এবং অসাধারণ কণ্ঠস্বরের জন্য। ইংরেজিতে যাকে 'গোল্ডেন ভয়েস' বলে, দেবী মুখার্জির ছিল তাই। বাংলা আর হিন্দি মিলিয়ে তাঁর অভিনীত ছবির সংখ্যা হয়তো ডজনখানেকের বেশি হবে না। কিন্তু যে কোনও ছবিতে, যত ছোট চরিত্রেই তিনি অভিনয় করুন না কেন, দর্শকদের নজরে আসতেনই। উদাহরণস্বরূপ দুটি ছবির কথা বলি। 'উদয়ের পথে' আর 'বিরাজ বৌ'। দুটিই নিউ থিয়েটার্সের ছবি। প্রথমটির পরিচালক বিমল রায় আর দ্বিতীয়টির পরিচালক অমর মল্লিক। 'উদয়ের পথে' ছবিতে দেবী মুখার্জির চরিত্রটি হল নায়িকার দাদার। এমনিতে ওই চরিত্রে করার কিছু নেই। কিন্তু দেবী মুখার্জির ব্যক্তিত্বের কারণেই চরিত্রটি দর্শকের নজরছাড়া হতে পারল না। আর 'বিরাজ বৌ' ছবিতে দেবীবাবু রূপ দিয়েছিলেন লম্পট এক জমিদারের চরিত্রে, যিনি নদীর ঘাটে বজরা ভিড়িয়ে বিরাজের রূপমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ছিপ হাতে বসে থাকতেন বিরাজের স্নান করার সময়ে। তাঁর জন্যই বিরাজের

চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন তাঁর দেবর পিতাম্বর। এই চরিত্রেও বিশেষ কিছু করার ছিল না। কিন্তু ওই অকিঞ্চিৎকর চরিত্রটিও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল দেবী মুখার্জির অভিনয়ের গুণে।

দেবী মুখার্জি যে কত বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন তা তাঁর অভিনীত 'ভাবীকাল', 'পথের দাবী', 'বিশ বছর আগে' প্রভৃতি ছবিগুলি দেখলে বুঝতে পারা যায়। নীরেন লাহিড়ি পরিচালিত 'ভাবীকাল' ছবির তিনি ছিলেন নায়ক। একটি আদর্শবাদী চরিত্র। ওই ছবিতে দেবীবাবুর অসাধারণ অভিনয় তাঁকে সেই বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান দিয়েছিল। তিনি প্রেস্টিজিয়াস বি এফ জে এ পুরস্কার পেয়েছিলেন। 'ভাবীকাল' ছবিটিও সেই বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা পেয়েছিল। এই ছবিতে একটিও গান ছিল না, যা সেই যুগে ছিল অকল্পনীয়।

'পথের দাবী' ছবির সব্যসাচী চরিত্রটি সম্পর্কে তো সকলেরই জানা। ওই রকম একটি অগ্নিগর্ভ চরিত্রে দেবী মুখার্জির বিস্ময়কর অভিনয় আজও আমার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে। পরবর্তীকালে ওই চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন উত্তমকুমার। উত্তমকুমারের অনুরাগী দর্শকেরা শুনলে হয়তো ব্যথা পাবেন এবং আমি নিজেও একজন উত্তম-অনুরাগী বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, দেবীবাবুর অভিনয়ের পাশে উত্তমবাবুর অভিনয় আমার কাছে অনেক খাটো মনে হয়েছে।

'বিশ বছর আগে' দেবী মুখার্জির শেষ ছবি। বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা এই নাটকটি দেবীবাবু প্রথম জীবনে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত অ্যামেচার ক্লাবে একাধিকবার অভিনয় করেছেন। ছবিতে ওই চরিত্রটি যে তাঁর দ্বারা প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কী। ঠিক তাই হয়েছিল। এবং আমাদের দুর্ভাগ্য, ওই ছবিতে অভিনয় করতে করতেই দেবী মুখার্জি মারা যান মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে। তাঁর অসমাপ্ত কাজটুকু শেষ করানো হয়েছিল তাঁর ভাই গৌতম মুখার্জিকে দিয়ে। গৌতমবাবুও প্রায় দেবী মুখার্জির মতোই গোল্ডেন ভয়েসের অধিকারী ছিলেন। তিনিও অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি বোম্বাইতে সেটল করেছিলেন। তিন-চারটি ছবি প্রযোজনাও করেন। গৌতমবাবুর সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কাজেকর্মে বোম্বাই গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতেই হত। মানুষটি তো অসম্ভব ভালো, তাই তাঁকে এড়ানো সম্ভব ছিল না।

কলকাতায় গৌতমবাবুর সঙ্গে আলাপ থাকলেও দেবী মুখার্জির সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। সেটা সম্ভবও ছিল না। কারণ তিনি যখন লোকান্তরিত হয়েছেন তার বছর দুই পরে আমি সাংবাদিকতা করতে আসি। তবে হাতে-কলমে সাংবাদিকতা শুরু করার আগেই আমার সঙ্গে সংবাদপত্র জগতের যোগাযোগ ছিল। কালীশ মুখোপাধ্যায়ের রূপমঞ্চ পত্রিকার অফিসে আমার গতায়াত ছিল এবং সেখানে বসে কালীশদার মুখেই আমি দেবী মুখার্জি এবং সুমিত্রা দেবী সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানতে পেরেছিলাম ওঁদের ব্যক্তিগত জীবনের। সে কথায় পরে আসছি।

দেবী মুখার্জির সঙ্গে বিয়ের আগে সুমিত্রা দেবী যে বিবাহিতা ছিলেন সে কথাটা আমি কিন্তু কালীশদার কাছে শুনিনি। সেটা জানতে পারলাম কৃষ্ণনগরে গিয়ে পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জির কাছে।

অর্ধেন্দুদা বললেন : সুমিত্রাকে আমি আগে চিনতাম না। ইন্ডাস্ট্রিতে এর-ওর-তার মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম যে কানাই ঘোষাল মশাইরা এক অসামান্যা সুন্দরী তরুণীকে নাকি রিক্রুট করেছেন তাঁদের পরের ছবির নায়িকা হিসেবে। তবে তাকে চোখে দেখেনি কেউ। যাকেই জিজ্ঞেস করি, সেই বলে যে, সেও শুনেছে। এমন সময় ভাগলপুর থেকে খবর এল, আমার পরিচিত একজনের বউ নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে কলকাতায়। তারা সন্দেহ করছে যে হয়তো সিনেমা করবার জন্যেই গেছে। মেয়েটি সিনেমার ব্যাপারে একটু পাগল-পাগল ছিল। আমি যেন তার ব্যাপারে খোঁজখবর করি।

আমি বললাম : তাঁরা কি ভাগলপুর থেকে আপনার কাছে কোনও ছবি পাঠিয়েছিলেন মেয়েটির?

অর্ধেন্দুদা বললেন : না না। ছবি-টবি কিচ্ছু পাঠায়নি। কেবল একটা চিঠিতে লিখেছে যে, নীলিমা হয়তো সিনেমা লাইনের দিকে যেতে পারে। আমি যেন একটু সন্ধান করে দেখি। যদি হদিস পাই, তাহলে যেন তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভাগলপুরে তার শ্বশুরবাড়িতে ফেরত পাঠাই।

আমি বললাম : এভাবে কারও খোঁজ পাওয়া যায় নাকি?

অর্ধেন্দুদা একটু হেসে বললেন : তবে আর বলছি কী। ভাগলপুরের ওদের তো কিন্ম ইন্ডাস্ট্রি

সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। তাদের যা কিছু জ্ঞান তা ওই থিয়েটারের ক্লাব। সিনেমার ব্যাপারটাও ভেবেছে একটা থিয়েটারের রিহার্সাল দেবার ক্লাবঘরের মতো। নতুন কোনও মেয়ে এলে সকলের নজরে পড়ে যাবে সে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমি ক্যাঁক করে ধরে ফেলব।

আমি বললাম : তা আপনি তখন নীলিমার খোঁজ করেছিলেন?

অর্ধেন্দুদা বললেন : খোঁজ করা মানে ওই কানাইবাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তা কানাইবাবু আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন : আমরা কোনও নতুন মেয়ের খোঁজ-টোজ পাইনি। তবে হ্যাঁ, নেক্সট ছবির হিরোইনের খোঁজ করছি আমরা। দু-চারটে মেয়ে দেখেছি, কিন্তু তাদের কাউকেই পছন্দ হয়নি দেববকীবাবুর।

আমি বললাম : কানাইবাবু তাহলে আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলেন বলুন?

অর্ধেন্দুদা বললেন : আমাদের এ লাইনে ওরকম মিথ্যে কথা দু-চারটে বলতে হয়। না বলে উপায় কী! আমি তো একজন পরিচালক বটে। ওঁরা কষ্ট করে নতুন মেয়ে খুঁজে পেলেন, আর আমি যদি দু-একশো বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে আমার ছবির জন্যে ভাঙিয়ে নিই!

আমি বললাম : তা আপনি কানাইবাবুর ওই কথা শোনার পর কী করলেন?

অর্ধেন্দুদা বললেন : আমি বুঝতে পারলাম কানাইবাবু মিথ্যে কথা বলছেন। অন্য সময় হলে আমি এ ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিতাম না। মরুকগে যাক বলে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য। সিনেমা করবার জন্য একটি মেয়ে তার সংসার ভেঙে বেরিয়ে আসবে, এটা আমার পছন্দ নয়। আমি মনে মনে ঠিক করলাম কানাইবাবুদের ওই নতুন মেয়েটির খোঁজ করতেই হবে। জানতেই হবে সে ভাগলপুরের বধূ কি না! তা যদি হয় তাহলে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখতে হবে। আমারও বাড়ি ভাগলপুরে। আমি চাই না, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে ভাগলপুরের মানুষের কোনও বাজে ধারণা হোক। তারা যেন মনে না করে আমরা লোকের বাড়ির বউকে ভাগিয়ে নিয়ে আসি।

আমি বললাম : আপনি শেষ পর্যন্ত নীলিমা দেবীর খোঁজ পেলেন কীভাবে?

অর্ধেন্দুদা বললেন : সেটা একেবারে তোমাদের ওই নীহার গুপ্তের রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের মতো ব্যাপার। কানাইবাবুর কথা শুনে আমার জেদ চেপে গেল, যেমন করেই হোক ভাগলপুরের পুত্রবধূকে খুঁজে বার করতেই হবে। আমি চর লাগিয়ে দিলাম কানাইবাবুর পিছনে। ওঁরা হয়তো সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে ওঁদের নতুন নায়িকাকে স্টুডিওতে আনবেন না। নিজেরাই গিয়ে যোগাযোগ করবেন তার আস্তানায়। সেই আস্তানাটা জানাই আমার আপাতত দরকার।

আমি বললাম : আপনার লাগানো চরেরা খোঁজ পেয়েছিল মেয়েটির বাড়ির?

অর্ধেন্দুদা বললেন : ঠিক বাড়িটার খোঁজ তারা দিতে পারেনি। তবে খবর এনেছিল যে, নর্থ ক্যালকাটার গিরীশ পার্কের কাছাকাছি একটা রাস্তায় কানাইবাবুকে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়।

আমি বললাম : ব্যাস, ওইটুকু খবরের ওপর ভিত্তি করেই আপনি নীলিমা দেবীর বাড়ির খোঁজ পেয়ে গেলেন?

অর্ধেন্দুদা বললেন : আমার হাতে তো তখন আর দেরি করার মতো সময় নেই। কানাইবাবুদের ওই মেয়েটি যদি সত্যিই নীলিমা হয় এবং তাকে নিয়ে যদি ওঁরা শুটিং শুরু করে দিতে পারেন তাহলে তো আর ভাগলপুরে ফিরে যাবার কোনও উপায় থাকবে না।

আমি বললাম : কেন?

অর্ধেন্দুদা বললেন : তখনকার দিনের গোঁড়া সমাজ ব্যবস্থার কথা তোমার কি মনে নেই! বাড়ির ছেলে সিনেমা করলে হয়তো ততটা দোষের নয়, কিন্তু বাড়ির বউ যদি সিনেমা করে তাহলে ভাগলপুরের মতো একটি জায়গার মানুষের পক্ষে তাকে ঘরে নেবার মতো মানসিকতা না থাকাই স্বাভাবিক।

আমি বললাম : সেটা ঠিক। সিনেমা সম্পর্কে মানুষের মন তো আজকের মতো মোহমুক্ত ছিল না তখন। তারপর কী হল বলুন।

অর্ধেন্দুদা বললেন : আমি গিরিশ পার্কের কাছে সেই রাস্তাটা ধরে দু-চারদিন হাঁটাহাঁটি করলাম।

কিন্তু কিছুতেই সঠিক বাড়িটার হদিশ পাই না। তারপর একদিন দেখলাম একটা বাড়ির বারান্দায় একটা শাড়ি শুকোচ্ছে।

অর্ধেন্দুদার কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। বললাম : শাড়ি তো ওই রাস্তার সব বাড়ির বারান্দাতেই শুকোতে পারে। তাতে কী হল? এইরকম একটা ক্লু থেকে আসামীকে খুঁজে বার করার কথা তো শার্লক হোমসও ভাবতে পারতেন না।

অর্ধেন্দুদা বললেন : না হে! এটা যে-সে শাড়ি নয়। আমাদের ভাগলপুরে মেয়েরা এক ধরনের টিপিকাল শাড়ি পরে, এটা সেই ধরনের শাড়ি।

আমি বললাম : তাই নাকি! তারপর?

অর্ধেন্দুদা বললেন : ওই শাড়ি দেখেই আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম ওই বাড়িতেই নীলিমা আছে। আমি সোজা গিয়ে কড়া নাড়লাম।

আমি বললাম · কড়া নাড়তেই নিশ্চয় নীলিমা দেবী এসে আপনাকে দরজা খুলে দিলেন?

অর্ধেন্দু বললেন : আজ্ঞে না। ওসব তোমাদের গল্প-উপন্যাসে হয়। বাস্তবে ওরকম ইচ্ছা পূরণের ঘটনা ঘটে না।

আমি বললাম : তাহলে?

অর্ধেন্দুদা বললেন : দরজা খুলল শ্যামবর্ণের একটি মেয়ে। দেখে মনে হল সে এ-বাড়িতে কাজ-টাজ করে। তাকে বললাম : আমি একটু নীলিমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মেয়েটি বললে : ও নামে কেউ এ বাড়িতে থাকে না।

অর্ধেন্দুদা বললেন : আমি বুঝতে পারলাম মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে। তাই বললাম, তাহলে যে আছে তাকে ডেকে দাও।

মেয়েটি বলল : এ বাড়িতে আমি ছাড়া আর কোনও মেয়ে নেই।

অর্ধেন্দুদা বললেন : আমি তখন মেয়েটিকে এক ধমক দিলাম। বললাম : আমার কাছে মিথ্যে কথা বোল না। আমি কে জানো? আমি পুলিশের লোক। ভালোয় ভালোয় নীলিমাকে ডেকে দেবে তো দাও। নইলে আমি এক্ষুনি তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাব।

আমি বললাম : ওইভাবে ভয় দেখাতেই কাজ হল?

অর্ধেন্দুদা বললেন : তাই তো হল! মেয়েটি থানায় যাবার নাম শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমাকে নীচের একটি ঘরে বসিয়ে ওপর থেকে নীলিমাকে ডেকে নিয়ে এল।

আমি বললাম : তিনিই পরবর্তীকালের সুমিত্রা দেবী?

অর্ধেন্দুদা বললেন : হ্যাঁ তাই। একটু পরে যে মেয়েটি আমার সামনে এসে বসল, সে সত্যিই অসামান্যা সুন্দরী। আমাকে পুলিশ ভেবে ভয়ে তার মুখ পাংশু হয়ে আছে। আমি তার কাছে আমার নিজের সঠিক পরিচয় দিলাম। দেখলাম মেয়েটি আমাকে নামে চেনে। আমি যে ভাগলপুরের লোক তাও জানে।

আমি বললাম : নীলিমা যখন আপনার কাছে প্রায় সারেন্ডার করলেন, তখন তাঁকে আবার শ্বশুরবাড়িতে ফেরত পাঠালেন না কেন?

অর্ধেন্দুদা বললেন : ওর কাছে সব কথা শুনে বুঝতে পারলাম, ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসার যথেষ্ট কারণ আছে। ব্যাপারটা এতটাই চিড় খেয়েছে যে পুরনো সম্পর্কটা হাজার চেষ্টা করলেও জোড়া লাগানো যাবে না। নীলিমার ভবিতব্য ছিল অভিনেত্রী হবার। সুতরাং সে নাম বদলে সুমিত্রা দেবী হয়ে গেল। আর প্রথম ছবিতে অভিনয় করেই তোমাদের বি-এফ-জে-এ পুরস্কার পেয়ে গেল।

আমি বললাম : একটা কথা জিজ্ঞাসা করব অর্ধেন্দুদা?

অর্ধেন্দুদা বললেন : এত কিন্তু কিন্তু করছ কেন? কী জানতে চাও বলো না।

আমি বললাম : কালীশদার কাছে শুনেছি দেবী মুখার্জির সঙ্গে সুমিত্রা দেবীর বিয়ের পেছনে একটা নাটকীয় ঘটনা আছে। দেবীবাবু নাকি স্টুডিওতে সুমিত্রা দেবীর মেক-আপ রুমে জোর করে ঢুকে তাঁকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছিলেন?

অর্ধেন্দুদা বললেন : কথাটা ঠিক। তবে তুমি যেভাবে বলছ সে ভাবে ঠিক নয়। দেবী সুমিত্রার মেক-আপ রুমে ঢুকে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। দেবীর এই সাহস দেখে সুমিত্রা অবাক হয়েছিল, সেই সঙ্গে তার পৌরুষ দেখে মুগ্ধও হয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে নয়, তার কয়েকদিন পরে সুমিত্রা বিয়ের সম্মতি জানায় দেবীকে।

আমি বললাম : কিন্তু আর একটা কথা যা শুনেছি সেটা তো ভয়ানক ব্যাপার।

অর্ধেন্দুদা বললেন : কী কথা?

আমি বললাম : সুমিত্রা দেবীর অত্যাচার এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই নাকি দেবী মুখার্জি মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে নিজেকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেন!

অর্ধেন্দুদা বললেন : যদি কেউ এ কথা বলে থাকে তবে সে এক নম্বরের মিথ্যেবাদী। দেবীর মৃত্যুর কারণ ও নিজেই। তবে আমি সে ব্যাপারে কোনও আলোচনা করতে চাই না।

তারপর একটু থেমে অর্ধেন্দুদা বললেন : তোমাকে একটা কথা বলে রাখি রবি। শিল্পীদের জীবন নিয়ে আলোচনা করতে বসে কোনওদিন নর্দমার পাঁক ঘাঁটতে যেও না। ইয়েলো জার্নালিজম্ কক্ষনো করবে না। আফটার অল্ তুমি তো একজন ভদ্রসন্তান!

ঠিক এই কথাটাই আরও কঠিন ভঙ্গিতে সুমিত্রা দেবী আমাকে বলেছিলেন বোম্বাইতে অনীতা গুহর বাড়িতে দাঁড়িয়ে। ঘটনাটা কী ঘটেছিল সেটা একটু পরেই জানাচ্ছি। তার আগে সুমিত্রা দেবী অভিনীত কয়েকটি ছবির কথা বলে নিই।

পঞ্চাশের দশকে সাংবাদিকতা করতে এসে সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ আলাপ হয়েছিল। ওঁর কয়েকটি ছবির শুটিংয়েও গেছি। উনি সব সময় হাসি হাসি মুখে ভাই-ভাই করে কথা বলতেন আমাদের সঙ্গে। তবে 'সন্ধি' ছবিতে ওঁর যে অভিনয় দেখেছিলাম, তেমনটি আর কোনও ছবিতে দেখতে না পাওয়ার মনে কিছু আক্ষেপ ছিল আমার। 'সন্ধি'-র পর অভিযাত্রী, পথের দাবী, অভিযোগ, জয়যাত্রা, প্রতিবাদ, সমর, দস্যু মোহন, অসবর্ণা, আঁধারে আলো, একদিন রাত্রে, স্বামী, যৌতুক, কিনু গোয়ালার গলি ইত্যাদি কত ছবিই তো করলেন, কিন্তু তেমন করে মন ভরাতে পারলেন কই! এমন কি 'দেবী চৌধুরানী'-র মতো চরিত্র পেয়েও তিনি ঝড় তুলতে পারলেন না। কিন্তু সব আক্ষেপ মিটিয়ে দিলেন 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবিতে পটেশ্বরী বৌঠানের চরিত্র করে। কী অসাধারণ অভিনয় তাঁর ওই ছবিতে। তারপর তো বম্বে চলে গেলেন হিন্দি ছবিতে অভিনয় করতে।

ষাটের দশকের শেষ দিকে সুমিত্রা দেবীর দেখা পেয়েছিলাম বম্বেতে অনীতা গুহর বাড়িতে। অনীতার স্বামী মানিক দত্ত আমাদের পুরনো বন্ধু। মানিক নিজেও একজন ভালো অভিনেতা ছিল। বয়েসটা পরিণত হবার আগেই মানিক আমাদের ছেড়ে চলে গেছে চিরকালের মতো।

তা যে কথা বলছিলাম। বম্বেতে গেলেই মানিকের বাড়িতে আড্ডা দিতে যেতাম। ওর বাড়িতে রীতিমতো তাসের আসর বসত। আমার তাসে অনুরাগ নেই। তবে ওই আসরে যেসব লোভনীয় খাদ্যবস্তু পরিবেশন করা হতো তাতে প্রচুর আগ্রহ ছিল।

সেদিন বোধহয় মানিকের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো ছিল। বম্বের বাঙালি অবাঙালি প্রচুর শিল্পী সেই উপলক্ষে ওঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। এসেছিলেন সুমিত্রা দেবীও। ওঁর সঙ্গে কলকাতার পুরনো একজন শিল্পী। তাঁর নাম মনোরমা। ছোট ছোট রোল করতেন। সুমিত্রা দেবীই তাঁকে বম্বে নিয়ে যান।

আমাকে দেখে সুমিত্রা দেবী হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। বললেন : কবে আসা হল?

আমি বললাম : এই তো দিন আষ্টেক হল।

সুমিত্রা দেবী বললেন : ভালো আছ তো?

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

সুমিত্রা দেবীর এই মিষ্টি ব্যবহার দেখে আমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম : দেখুন সুমিত্রাদি, দেবীদার মৃত্যু নিয়ে অনেকে অনেক রকম আজেবাজে কথা বলেন। আসলে কী ঘটেছিল সেটা একমাত্র আপনিই বলতে পারেন।

আমার কথা শুনে হঠাৎ সুমিত্রা দেবীর মুখখানা ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল। তারপর রীতিমতো

ঝঙ্কাব দিয়ে বলে উঠলেন · জেন্টলম্যানরা যদি জার্নালিস্ট হতে পারে তাহলে জার্নালিস্টরা জেন্টলম্যান হয না কেন?

সুমিত্রা দেবীর ওই কথাগুলো আমাব দুই গালে যেন ঠাস ঠাস করে দুটো চড কষিয়ে দিয়ে গেল।

আব তাবপর থেকেই আমি আমাব জীবনেব সাংবাদিকতাব ধারাটাই বদলে ফেললাম। আমার সেই পুনর্জন্মের জন্য আমি সুমিত্রা দেবীব কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বিশ্বজিৎ

উল্টোরথ পত্রিকার অফিস তখন বিধান সরণিতে শ্রীমানী বাজারের উল্টোদিকে। ডি রতনের ফটোগ্রাফি স্টুডিওর ঠিক নীচে বুক এম্পোরিয়াম নামে একটি বইয়ের দোকান ছিল। সেই দোকানেরই অর্ধেকটা অংশ নিয়ে ছিল উল্টোরথ পত্রিকার অফিস। পরে ওটি উঠে যায় বিবেকানন্দ রোডে।

তা একদিন বিকেলে সাতকড়িদা এসে আমাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে গেলেন শ্রীমানী বাজারের নীচে একটি চায়ের দোকান চণ্ডী কেবিনে। অর্ডার দিয়ে এক প্লেট চা আর টোস্ট ধরে দিলেন আমার সামনে।

সাতকড়িদা বলে যাঁকে উল্লেখ করলাম, তাঁর পোশাকি নাম প্রফুল্লকুমার বসু। সাতকড়িদা ছিলেন বুক এম্পোরিয়ামের ম্যানেজার। নিজেও একজন ভালো লেখক। তাঁর দু তিনটি অনুবাদের বই তখন প্রকাশিত হয়ে গেছে। উল্টোরথ পত্রিকার যাঁরা মালিক, বুক এম্পোরিয়ামটা তাঁদেরই। তাই দুবেলা সাতকড়িদার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হত। সেই সাতকড়িদা হঠাৎ এভাবে আমাকে আড়ালে ডেকে এনে চা-টোস্ট দিয়ে কেন আপ্যায়িত করছেন, সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। বিশেষ করে এর আগে অনেক ফন্দি-ফিকির করেও আমরা কোনদিন সাতকড়িদার ঘাড় ভেঙে এক কাপ চাও খেতে পারিনি। তার উপর আবার টোস্ট। ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করতে পারছিলাম না। বেশ খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে টোস্টে কামড় দিলাম। টোস্ট চিবোতে চিবোতেই সাতকড়িদার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। কিন্তু তাঁর তরফ থেকে কোনও উচ্চবাচ্য শোনা গেল না। অস্বস্তিটা তাতে আরও বেড়ে গেল।

টোস্ট শেষ করে যখন চায়ে চুমুক দিলাম তখনও সাতকড়িদার কোনও ভাবান্তর নেই। চুপচাপ শূন্য চোখে তাকিয়ে বসে আছেন। কপালে চিন্তার ঘন রেখা। সুতরাং আমাকেই জিজ্ঞাসা করতে হল: কী ব্যাপার সাতকড়িদা, হঠাৎ চা টোস্ট খাওয়াচ্ছ যে?

আমার প্রশ্নে সাতকড়িটা যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বললেন : তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, ঠিক ঠিক উত্তর দিবি তো?

আমি বললাম : তুমি কী জিজ্ঞাসা করবে সেটা না শুনে কথা দিই কী করে।

সাতকড়িদা বললেন : তুই আমার মনের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারবি না। পিন্টুটাকে নিয়ে বড় চিন্তায় পড়ে গেছি রে।

আমি বললাম : পিন্টু কে?

সাতকড়িদা বললেন : পিন্টু আমার এক ছাত্র। খুব হ্যান্ডসাম দেখতে। পড়াশোনাতেও মন্দ নয়। কিন্তু কানাঘুষায় শুনছি সে নাকি সিনেমায় নামতে যাচ্ছে। তুই আমায় সত্যি করে বল দিকি সিনেমা লাইনের মেয়েগুলোর চরিত্র কেমন?

এতক্ষণে সাতকড়িদার ভাবান্তরের কারণটা বুঝতে পারলাম। সাতকড়িদা কয়েকটি টুইশানি করেন। তিনি অকৃতদার মানুষ। এই ছাত্র ছাত্রীরাই তাঁর সন্তান সন্ততি। কাজেই তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ হওয়াই স্বাভাবিক।

আমি বললাম : সিনেমা লাইনের মেয়েদের কার চরিত্র কী রকম তা কি করে বলব? সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন ভালো মন্দ দুই রকম থাকে, সিনেমা লাইনেও সেই রকম থাকা স্বাভাবিক। তা তোমার পিন্টু সিনেমা করতে যাচ্ছে, এটা তো ভালো কথা। সে নিজে যদি ঠিক থাকে, তাহলে আর অন্যের চরিত্র নিয়ে ভাববার কী আছে।

সাতকড়িদা বললেন : ভাববার আছে রে। পিন্টু তার বাবার একমাত্র ছেলে। ওদের প্রচুর বিষয় সম্পত্তি আছে। ওর জ্যাঠারও কোন ছেলেপুলে নেই। তাঁরও প্রচুর সম্পত্তি। এইরকম একটা মালদার ছেলের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার জন্যে লাইনের খারাপ মেয়েরা তো মুখিয়ে থাকবেই। সেই জন্যেই তো

এত চিন্তা হচ্ছে।

আমি বললাম : তাহলে তুমি তোমার পিন্টুকে বারণ করে দাও সিনেমায় নামতে। তাহলে তো আর কোনও চিন্তার কারণ থাকবে না।

সাতকড়িদা বললেন : সেটাও তো পারছি না। পিন্টু যে সিনেমায় নামতে যাচ্ছে সে কথা তো আমাকে বলেনি। আমি তো ওর বন্ধু বান্ধবদের কাছে কথাটা শুনেছি।

আমি বললাম : ওসব তাহলে উড়ো কথা। সিনেমায় নামা এত সহজ নাকি! কত আচ্ছা আচ্ছা ট্যালেন্টেড ছেলে হাজার চেষ্টা করেও ছবিতে নামাতে পারছে না। সিনেমায় নামতে গেলে তো অভিনয় জানতে হয়। ও এর আগে কোথাও অভিনয় টভিনয় করেছে?

সাতকড়িদা বললেন, তেমন তো কিছু শুনিনি। তাছাড়া ও একদম বাচ্চা ছেলে। মাত্র আঠারো উনিশ বছর বয়েস। পড়াশোনার মাঝখানে থিয়েটার-ফিয়েটার করার স্কোপ কোথায়?

আমি বললাম : তাহলে তোমার পিন্টু নিশ্চয় বন্ধুদের কাছে গুল দিয়েছে।

সাতকড়িদা বললেন : না রে। ঘটনাটা সত্যি। পিন্টু তার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে এ বছর দুর্গাপুজোর সময় কারবালা ট্যাংক লেনের ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল। তা সেখানেই নাকি ওকে দেখে কালুবাবুর খুব পছন্দ হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে কালুবাবু নাকি এ ব্যাপারে কথাও বলেছে। এতগুলো ঘটনা কী মিথ্যে করে সাজানো যায় নাকি! তুই একবার কালুবাবুর কাছে খবরটা নিতে পারিস।

কালুবাবু বলে যাঁকে উল্লেখ করলেন সাতকড়িদা, তিনি হলেন সরোজ দে। আমাদের যুগের একজন বিখ্যাত চিত্র পরিচালক। আগে অগ্রদূত গোষ্ঠীতে সহকারী ছিলেন। পরে অগ্রগামী বলে একটি গোষ্ঠী করেছেন। তাঁদের প্রথম ছবি উত্তম-সুচিত্রাকে নিয়ে 'সাগরিকা' প্রচুর হইচই ফেলে দিয়েছিল বাংলা ছবির দর্শকদের মধ্যে।

সাতকড়িদার প্রশ্নের উত্তরে বললাম : আমার সঙ্গে তো কালুবাবুর তেমন পরিচয় নেই। তুমি বরং এ ব্যাপারে প্রসাদদা কিংবা গিরীনদার সঙ্গে কথা বলতে পারো।

এ কথাটা আমি কোনও অজুহাত দেখাবার জন্য সাতকড়িদাকে বলিনি। সত্যিই তখন কালুবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। পরবর্তীকালে পরিচয় হয়েছে, ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। এখন আমি আর কালুবাবু বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

পিন্টুর ব্যাপারে সাতকড়িদা প্রসাদদা কিংবা গিরীনদার সঙ্গে কথা বলেছিলেন কি না জানতাম না। প্রসাদদা আর গিরীনদা হলেন প্রসাদ সিংহ এবং গিরীন্দ্র সিংহ। উল্টোরথ পত্রিকার দুই কর্ণধার। তৎকালে তাঁরা ছিলেন স্বনামে বিখ্যাত।

তা এই পিন্টুই যে পরবর্তীকালে বিখ্যাত সুদর্শন অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সেটা জানতে পেরেছিলাম উল্টোরথ পত্রিকার তার একটা ছবি দেখে। সাতকড়িদার সঙ্গে আমার ওই আলোচনার মাস পাঁচেক পরে উল্টোরথ পত্রিকায় পৃষ্ঠায় এক অসাধারণ সুন্দর যুবকের ছবি ছাপা হল। ক্যাপসন মারফত জানা গেল উনি একজন অভিনেতা। নাম বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ছবিটা দেখে আমরা অনেকেই ওই যুবকের রূপের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলাম।

সেদিন বিকেলেই সাতকড়িদা আমাকে ডেকে বললেন : পিন্টুর ছবিটা দেখেছিস উল্টোরথে? তোকে বলেছিলাম না, ও খুব হ্যান্ডসাম দেখতে।

আমি বললাম : কই পিন্টুর কোনও ছবি তো উল্টোরথে ছাপা হয়নি।

সাতকড়িদা বললেন : সে কী রে! পিন্টুকে চিনতে পারলি না। ওই যে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ছবি ছাপা হয়েছে, ওইই তো পিন্টু।

আমি বললাম : তাই নাকি। ভদ্রলোককে তো ভারী সুন্দর দেখতে। তুমি দেখে নিও ফিল্মে ও খুব নাম করবে।

সাতকড়িদা বললেন : হ্যাঁ, ট্যাপনও সেই কথা বলছিল।

আমি অবাক হয়ে বললাম : ট্যাপনটা আবার কে গো সাতকড়িদা?

সাতকড়িদা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে একটা ছাপার অযোগ্য গালাগালি দিয়ে বললেন : ন্যাকাচৈতন! নিজের

মালিকের নাম জানো না।

আমি বললাম : আমার মালিক তো প্রসাদ সিংহ। তিনি আবার ট্যাপন হলেন কবে থেকে?

সাতকড়িদা বললেন : জন্মের কিছুদিন পর থেকে। প্রসাদের আদরের ডাকনাম ট্যাপন।

আমি বললাম : ও! তো সেটা আমি জানব কী করে। তোমরা বন্ধুবান্ধব, তোমরা ওসব জানো। তোমার সঙ্গে তাহলে পিন্টুর ব্যাপারে প্রসাদদার সঙ্গে কথা হয়েছিল?

সাতকড়িদা বললেন : তা হয়েছিল বৈকি। না হলে আর উল্টোরথে ছবি ছাপা হল কী করে। ট্যাপনকে পিন্টুর ছবি দেখিয়েছিলাম। ছবি দেখে তো ট্যাপন উচ্ছ্বসিত। বললেন, এই ছেলেটাকে আমি দ্বিতীয় উত্তমকুমার তৈরি করব।

কথাটা শুনে পাঠকরা আঁতকে উঠছেন নিশ্চয়ই। ভাবছেন কাগজওয়ালাদের এমন কী ক্ষমতা আছে যাতে তাঁরা উত্তমকুমার তৈরি করতে পারেন।

ঠিক কথা। কাগজওয়ালারা হয়তো একজন অভিনেতা তৈরি করতে পারেন না। কিন্তু তাঁর নানা রকম ছবি ছেপে, তাঁর সম্বন্ধে নানা খবর প্রকাশ করে একজন অভিনেতা সম্পর্কে পাঠকদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারেন, যেটা তাঁদের গ্ল্যামার সৃষ্টির সহায়ক হয়। উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে উল্টোরথ পত্রিকার এইরকম একটা ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে বিশ্বজিতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। বিশ্বজিৎ আরও পরে বম্বে চলে গেল হিন্দি ছবিতে অভিনয় করতে। তাই প্রসাদদা তাঁর কথাটা পুরোপুরি রাখতে পারেননি। কিন্তু বিশ্বজিৎ যতদিন কলকাতায় ছিল ততদিন সে ছিল উত্তমকুমারের পরেই দ্বিতীয় গ্ল্যামারাস অভিনেতা। অতএব প্রসাদদা যে বলেছিলেন, পিন্টুকে আমি দ্বিতীয় উত্তমকুমার তৈরি করব, সেই জাতীয় দম্ভের কথা প্রসাদদার মুখে মানায় বৈকি!

শুধু কী ছবি ছেপে আর নিউজ ছেপে বিশ্বজিতের গ্ল্যামার তৈরি করা? না তা নয়। বিভিন্ন প্রযোজকের কাছে বিশ্বজিৎকে নায়ক করার সুপারিশ করতেন প্রসাদদা। শুধু কী অন্য প্রযোজককে! নিজেরা ছবি প্রযোজনা করেছেন বিশ্বজিৎকে নায়ক করার কথা ভেবে। গিরীনদা যখন হেমেন মিত্রের বকলমে অজয় করের ডাইরেকশানে 'প্রভাতের রঙ' ছবিটি প্রযোজনা করলেন, তখন নায়ক হিসেবে বিশ্বজিতের কথাটাই মাথায় ছিল। দ্বিতীয় কোনও নায়কের কথা ভাবেনওনি। ওই ছবিতে বিশ্বজিতের নায়িকা ছিলেন শর্মিলা ঠাকুর। আবার প্রসাদদা যখন 'মণিহার' ছবির প্রযোজনা করলেন সলিল সেনের ডাইরেকশানে, তখন তার রোম্যান্টিক নায়ক হিসেবে কেবলমাত্র বিশ্বজিতের কথাই ভেবেছিলেন। নায়িকা সন্ধ্যা রায়। ওই ছবিতে আরও একজন নায়ক ছিলেন। সেটি বিশ্বজিৎ অভিনীত চরিত্রের দাদা। ওই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সৌমিত্রবাবু তার আগে সব ইনটেলেকচুয়াল ছবিতে নায়ক করেছেন। 'মণিহার'ই প্রথম ব্যতিক্রম। এবং সাধারণ গার্হস্থ্য ছবিতেও যে সৌমিত্রবাবু সমান স্বচ্ছন্দ, সেটা ওই 'মণিহার' ছবিতেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। ওই ছবিতে হেমন্তদা ও লতা মঙ্গেশকরের অসাধারণ সব গান ছিল। সৌমিত্রবাবু তাঁর চরিত্রের গানে অসাধারণ লিপ দিয়েছিলেন।

এইসব কারণে স্টুডিওপাড়ায় বিশ্বজিতের নাম হয়ে গিয়েছিল উল্টোরথের ছেলে। কিন্তু উল্টোরথের ছেলে হলেও বিশ্বজিৎকে তার প্রাপ্য থেকে এক পয়সাও কম দেননি প্রসাদদা কিংবা গিরীনদা। তখন বিশ্বজিতের যা বাজারদর ছিল তার পুরোটাই দিয়েছিলেন।

এই টাকার ব্যাপার বিশ্বজিতের সঙ্গে আমার একটা মান অভিমানের ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। বিশ্বজিৎ তখন রঙমহল থিয়েটারে তরুণ রায়ের 'এক পেয়ালা কফি' নাটকে অভিনয় করে। সেই সময়ে আমরা একটা নাটক করেছিলাম তমলুক শহরে। আমার দেশে। নাটকটি ছিল 'মন্ত্রশক্তি'। ওই নাটকের প্রযোজক ছিলাম আমি। আর পরিচালক ছিলেন আমার দুই সাংবাদিক বন্ধু অসিত গুপ্ত এবং অশোক ঘোষাল। সাংবাদিকতা ছাড়াও অশোক আর অসিতবাবু চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালকের কাজ করেছিলেন। অসিত গুপ্ত ছিলেন কলকাতায় পরিচালক নরেশ মিত্রের সহকারী। আর অশোক ছিলেন বোম্বাইতে পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের সহকারী।

তা আমাদের ওই 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে আমরা তৎকালীন তিনজন তরুণ নায়ককে কাস্ট করেছিলাম। একজন হলেন অসীমকুমার। 'নীলাচলে মহাপ্রভু' ছবিতে চৈতন্যদেবের চরিত্রে অভিনয় করে তার তখন

দারুণ পপুলারিটি। দ্বিতীয়জন হলেন আশিসকুমার। সেই সময়ে আশিস বহু ছবিতে নায়ক করেছে। স্টার থিয়েটারেও সে বাঁধা মাইনের নিয়মিত নায়ক। আর তৃতীয় জন হলেন বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিৎ তখনও পর্যন্ত পপুলার নায়ক হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু বাংলা ছবির দর্শকরা তার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। রঙমহল মঞ্চে ও তখন নাটকে অভিনয় করতে শুরু করেছে। সেখানে পরবর্তীকালে ও 'মায়ামৃগ' এবং 'সাহেব বিবি গোলাম' নাটকে নায়ক করে রীতিমতো বিখ্যাত হয়েছিল।

তা আমাদের ওই 'মন্ত্রশক্তি' নাটক প্রযোজনা হিসেবে উৎরে গিয়েছিল বটে, তবে আর্থিক দিক থেকে ফ্লপ করেছিল। সুতরাং আর্টিস্টদের পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। তাই আমি অন্য সবাইকে পেমেন্ট করে অসীম, আশিস আর বিশ্বজিৎকে বলেছিলাম : তোমাদের কলকাতায় গিয়ে পেমেন্ট করব। নাটকের নায়িকা ছিলেন তপতী ঘোষ। তিনি আমাকে আগেই বলে দিয়েছিলেন, ওখানে আমি টাকা পয়সা নেব না। কলকাতায় এসে যা দেবার দেবেন। না দিলেও ক্ষতি নেই। এখানে আমি অভিনয় করছি ভালোবাসার খাতিরে। পেশাদার অভিনেত্রী হিসেবে নয়। যদিও তপতী ঘোষ তখন বিশ্বরূপা মঞ্চের নিয়মিত নায়িকা।

অসীমকুমার অশোক ঘোষালের পুরনো বন্ধু। সেই সূত্রে আমাদেরও ঘোরতর বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। অসীমকে আমাদের আর্থিক দুরবস্থার কথা জানাতেই সে বলেছিল তোমরা আমাকে টাকা দেবার কথা ভাবলে কী করে। আমি না তোমাদের বন্ধু!

আশিসও সেই কথা বললে। সে বললে আমার জন্যে ভেবো না রবিদা। যদি পারো পরে এক সময়ে কিছু দিও। না পারলেও কোন ক্ষতি নেই। আমি তো এখানে খেপ খাটতে আসিনি। এসেছি তোমাদের সঙ্গে পিকনিক করতে। টাকা পয়সার দুরবস্থার কথা তুলে সেই পিকনিকের মেজাজটা নষ্ট করে দিও না।

মাস দুই তিন আগে বম্বে গিয়েছিলাম। আশিসের বাড়িতে বসে গল্প করতে করতে সেদিনের কথাগুলো মনে করিয়ে দিতেই আশিস একগাল হেসে বললে : সেইসব দিনগুলো কী দারুণ ছিল বল তো। আজ আমি কয়েক কোটি টাকার মালিক। ছবি প্রোডিউস করছি, ডাইরেকশান দিচ্ছি, আমার ছেলেও নায়ক হয়েছে। কিন্তু সেইসব দিনগুলোর মেজাজই ছিল আলাদা।

কিন্তু ধাক্কা খেলাম বিশ্বজিতের কাছে এসে। ওকে কলকাতায় গিয়ে পেমেন্ট করব বলতেই ওর মুখখানা কেমন ব্যাজার হয়ে গেল। বললে : আমার টাকাটা ঠিক দেবে তো?

বিশ্বজিতের সঙ্গে আমার মৌখিক চুক্তি হয়েছিল পঁচিশ টাকার। 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে অভিনয়ের কথা বলতেই ও জিজ্ঞাসা করেছিল আমাকে কত টাকা দেবে তোমরা?

বিশ্বজিতের তখন কোনও বাজারদরই নেই। আমি বলেছিলাম : তোকে কুড়ি টাকা দেব।

বিশ্বজিৎ বলেছিল : ওটা আর পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দাও।

আমি বলেছিলাম : তাই হবে।

তা সেদিন হাতে হাতে টাকা না পেয়ে বিশ্বজিতের ব্যাজার মুখ দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। মনে মনে একটু আহতও হয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন তো বুঝতে পারিনি, সেই মুহূর্তে ওই পঁচিশটা টাকা বিশ্বজিতের কত দরকার ছিল। তখন তো আর জানি না সিনেমায় অভিনয় করার কারণে ওকে দমদমের বাড়ি ছেড়ে হ্যারিসন রোডের একটা মেসে এসে কাল কাটাতে হচ্ছে!

বিশ্বজিতের বাবা ডাক্তার রঞ্জিৎ চ্যাটার্জি চেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র ডাক্তার হোক। দমদম অঞ্চলে তিনি ছিলেন সুখ্যাত ডাক্তার। ডাক্তারী জীবনে মানুষের কত শ্রদ্ধা, কত সম্মান তিনি পেয়েছেন। মানুষের রোগে ভোগে ডাক্তার হলেন ঈশ্বর প্রেরিত দূতের মতো। ডাঃ চ্যাটার্জীও চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে এই বিরল সম্মানের অধিকারী হোক।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা হয়ে গেল উল্টো। তাঁর ছেলে এমন একটা প্রফেশ্যানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেলল যেটাকে কোনওক্রমেই নোব্‌ল প্রফেশ্যান বলা যাবে না। অন্তত সেই পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ পর্যন্ত। আজকের দিনে অবশ্য চেহারাটা বদলে গেছে। বসন্ত চৌধুরি অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার শেরিফ হতে পারেন। অনিল চ্যাটার্জি হতে পারেন একজন সম্মানীয় বিধায়ক। আর দক্ষিণ

ভারতের কথা তো আলাদা। সেখানে তো হামেশাই মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করতে দেখা যাচ্ছে ছায়াছবির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের।

বিশ্বজিৎ সিনেমা করতে আসায় ডাঃ চ্যাটার্জি মনে মনে আহত হয়েছিলেন নিশ্চয়। সঠিক জানি না, হয়তো এই ব্যাপার নিয়ে পিতাপুত্রের মধ্যে কিছুটা মনান্তরের সৃষ্টিও হয়ে থাকতে পারে। তা না হলে বিশ্বজিৎ হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে, অমন সমাদরের আস্তানা ছেড়ে, হ্যারিসন রোডে একটা সামান্য মেসবাড়িতে আশ্রয় নিতে যাবে কেন? আর যে মানুষটা তার পিতার প্রচুর অর্থের দৌলতে যে কোনও মানুষকে অনায়াসে দু-একশো টাকা দান করে দিতে পারে, সেই বা হঠাৎ সামান্য পঁচিশটা টাকার জন্যে আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করবে কেন?

এই ঘর ছেড়ে মেসে থাকার ব্যাপারে আমি পরবর্তীকালে বিশ্বজিৎকে প্রশ্নও করেছিলাম। বিশ্বজিৎ একটু হেসে বলেছিল : তুমি যা ভাবছ তা নয় রবিদা। কারুর সঙ্গে কোনরকম মনোমালিন্যের কারণে আমি বাড়ি ছেড়ে মেসে থাকতে আসিনি। ওখানে থাকতে এসেছিলাম ফিল্ম লাইনের সঙ্গে যোগাযোগটা ঠিকমতো রাখবার জন্যে। যেটা দমদমের বাড়িতে থেকে অসুবিধা হচ্ছিল।

আমি বললাম : দমদম তো আর পশ্চিমবঙ্গের বাইরের কোনও জায়গা নয়। ওটা তো খাস কলকাতার নাকের ডগায়। ওখানে থাকলে ফিল্ম লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার তো তেমন অসুবিধে হবার কথা নয়।

বিশ্বজিৎ বললে : দমদম কলকাতার নাকের ডগায় ঠিকই, তবে আমার মতো একজন ফিল্ম লাইনের নিউকামারের সঙ্গে কার দায় পড়েছে দমদমে গিয়ে যোগাযোগ করার। তাই আমি হ্যারিসন রোডের মেসে উঠেছিলাম। ওখান থেকে উত্তর কলকাতার থিয়েটারপাড়া তো খুবই কাছে, আর টালিগঞ্জও এমন কিছু দূর নয়।

কিন্তু ওই পঁচিশ টাকার জন্যে তাগাদার ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথা থেকে যাচ্ছিল না। তাই বললাম : কিন্তু তুমি সেদিন ওইভাবে পঁচিশটা টাকার জন্যে কাবুলিওয়ালার মতো তাগাদা দিতে শুরু করেছিলে কেন? বাবা-জ্যাঠার অতুল ঐশ্বর্যের দৌলতে তোমার তো অভাব থাকার কথা নয়। তবু কেন ওইভাবে তাগাদা?

বিশ্বজিতের সঙ্গে এই কথাগুলো হচ্ছিল বম্বের জুহু হোটেলের কটেজে বসে ষাটের দশকের এক সন্ধ্যায়। বিশ্বজিতের হাতে তখন চার-পাঁচখানা হিন্দি ছবি। তার বছর দেড়েক আগে ও বম্বে এসেছে ওর প্রথম ছবি 'বিশ সাল বাদ'-এ কাজ করতে। হেমন্ত মুখার্জি প্রযোজিত এবং বীরেন নাগ পরিচালিত ওই ছবিটি সুপার হিট করেছে। তারই দৌলতে ও একসঙ্গে চার-পাঁচখানি ছবিতে কন্ট্রাক্ট সই করেছে। সবথেকে বড় কথা, ও এখন একখানা ইমপোর্টেড গাড়ির মালিক। তার আগের দিন ও আমাকে আর হেমেন মিত্রকে নিয়ে ওর সেই চমৎকার গাড়িটায় করে গোটা বোম্বাইটা ঘুরিয়েছে।

আমার কথায় বিশ্বজিৎ একটু লজ্জা পেয়ে গেল। বললে : আই অ্যাম সরি রবিদা। সেদিন ওই সামান্য ক'টা টাকার জন্যে তোমাকে ওভাবে তাগাদা করা উচিত হয়নি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, সেদিন সেই মুহূর্তে ওই সামান্য ক'টা টাকার দাম আমার কাছে অসামান্য ছিল। তোমার কাছ থেকে ওটা না পেলে আমি খুব অসুবিধেয় পড়তাম। মান-ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি হত।

কী ধরনের মান-ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি সে প্রশ্নে আর গেলাম না আমি। হাসতে হাসতে বললাম : এখন বুঝি তারই প্রায়শ্চিত্ত করছ আমাদের জন্যে শ'য়ে শ'য়ে টাকা খরচ করে। এই তিন-চারদিনে আমার আর হেমেনের পেছনে তুমি তো প্রায় হাজার টাকার ওপর খরচ করেছ। সব সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছ যাতে আমাদের আদর-আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি না হয়।

বিশ্বজিৎ এক হাত জিভ কেটে বললে : ও নিয়ে আর লজ্জা দিও না রবিদা। তোমরা আমার জন্যে যা করেছ তার ঋণ কি এই সামান্য আদর আপ্যায়নে শোধ হয়?

আমি বললাম : এই তো তুমিও লজ্জা দিতে শুরু করলে। আমরা তোমার জন্যে যা করেছি সেটা সাংবাদিক হিসেবে কর্তব্য মাত্র। তবে হ্যাঁ, ঋণী যদি থাকতে হয় তবে দু'জনের কাছে তোমার ঋণী থাকা উচিত। তাঁদের একজন হলেন উল্টোরথের প্রসাদ সিংহ, আর দ্বিতীয় জন হলেন হেমন্তদা। হেমন্ত

মুখার্জি।

হ্যাঁ, কলকাতায় বিশ্বজিতের কেরিয়ার মেকিং-এ প্রসাদ সিংহের বিরাট অবদান। তেমনি বম্বের ক্ষেত্রে হেমন্ত মুখার্জির। হেমন্তদা প্রযোজক হিসেবে তাঁর প্রথম ছবি করিয়েছিলেন মৃণাল সেনকে দিয়ে। সে ছবির নাম 'নীল আকাশের নীচে।' ভারতবর্ষ তখন হিন্দি চীনি ভাই ভাই স্লোগানে মুখরিত। ঠিক সেই সময়ে মহাদেবী বর্মার লেখা কাহিনী নিয়ে 'নীল আকাশের নীচে' ইন্টেলেকচুয়াল মহলে দারুণ সাড়া ফেলেছিল। ছবিটি ভারতবর্ষের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ দেখেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও দেখেছিলেন। ওঁরা হেমন্তদা আর মৃণালবাবুর পিঠ চাপড়ে সাবাসী জানিয়েছিলেন। কিন্তু পেটে না খেলে পিঠে সইবে কী করে। প্রযোজক হিসেবে হেমন্তদা ওই ছবিটি থেকে বিনিয়োগ করা টাকার একটি পয়সাও ফেরত পাননি। সঙ্গত কারণেই হেমন্তদা আর বাংলা ছবি প্রযোজনা করার দিকে ঝোঁকেননি। অনেকদিন পরে আর একখানি বাংলা ছবি করেছিলেন নিজেরই ডিরেকশানে। সে ছবির নাম 'অনিন্দিতা'।

এর অনেক বছর পরে হেমন্তদা একটি হিন্দি ছবি করার পরিকল্পনা করলেন। চল্লিশের দশকে অজয় করের পরিচালনায় একটি বাংলা ছবি দুর্দান্ত হিট করেছিল। সে ছবিটির নাম 'জিঘাংসা'। একটি ইংরিজি কাহিনী 'হাউন্ড অব বাস্কারভিলস্' অবলম্বনে ছবিটা তৈরি করা হয়েছিল। সেই ছবির আর্ট ডাইরেক্টর ছিলেন বীরেন নাগ। বীরেনবাবু পরে বম্বেতে সেটল্ করেন।

হেমন্তদা ওই একই কাহিনী নিয়ে 'বিশ সাল বাদ' নামে যে ছবিটির পরিকল্পনা করলেন তার পরিচালনার দায়িত্ব বীরেন নাগের ওপরেই দিলেন। সম্ভবত এটিই বীরেনবাবুর প্রথম পরিচালিত ছবি।

বম্বেতে তখন হেমন্তদার রমরমা অবস্থা। ছবির পর ছবিতে সুর দিচ্ছেন, গান গাইছেন। বম্বেতে চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতাতেও তাঁর ডিমান্ড বেড়েছে। মা লক্ষ্মীর কৃপা তাঁর ওপর অবিরল বর্ষিত হচ্ছে। বম্বেব খার অঞ্চলে গীতাঞ্জলি নামে একটি নাতিবৃহৎ বাড়িও করে ফেলেছেন।

অথচ এই হেমন্তদাকে প্রথম প্রথম বম্বেতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে নিদারুণ স্ট্রাগল করতে হয়েছে। সেসব কাহিনী যখন হেমন্তদা আমাদের শোনাতেন তখন বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসত। একের পর এক বিপর্যয় এসেছে, কিন্তু তিনি বম্বে থেকে হেরে গিয়ে বিদায় নেননি। বোম্বাইয়ের মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছেন। তাই নতুন কেউ বম্বে গেলে হেমন্তদা তাঁদের প্রত্যেককেই উপদেশ দিতেন : এখানে যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাও তাহলে অধৈর্য হলে চলবে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। তবে একদিন না একদিন সুখের মুখ দেখতে পাবে।

খুব খাঁটি কথা। নচিকেতা ঘোষও একবার বম্বে গিয়েছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। কিন্তু তাঁর মতো গুণী সুরকারকেও শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়েছিল এই ধৈর্যের অভাবের কারণে।

হেমন্তদা তাঁর 'বিশ সাল বাদ' ছবিতে নায়ক করবার জন্যে বিশ্বজিৎকে কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছবি করতে আসার আগে থেকেই হেমন্তদা বিশ্বজিতের স্বপ্নের পুরুষ। গানের প্রতি একটা ন্যাক্ বিশ্বজিতের ছেলেবেলা থেকেই ছিল। বন্ধুমহলে হেমন্ত মুখার্জির গান গেয়ে কিছুটা সুনামও করেছিল। ছবি করতে আসার পর যখন বিশ্বজিতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হল তখন মাঝে মাঝে ও আমাদের গান শোনাত। আমরা ওর কণ্ঠস্বরের তারিফ করতাম। ওর খুব ইচ্ছে হত গান রেকর্ড করবার। ছবিতে গান গাইবার। ঈশ্বর ওর দুটি সাধই পূর্ণ করেছিলেন। বিশ্বজিতের অনেকগুলি গান রেকর্ড হয়ে বেরিয়েছিল এইচ এম ভি থেকে। সে যুগে, এবং এখনও এইচ এম ভি থেকে রেকর্ড কিংবা ক্যাসেট বেবনো রীতিমতো সম্মানের।

প্রযোজক হিসেবে 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে মার খাবার পর হেমন্তদা খুব সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বম্বের বাজার অনুপাতে একটি লো-বাজেটের ছবি করতে। তাই নায়ক হিসেবে তিনি নতুন মুখের কথাই ভেবেছিলেন। তাঁর একজন সুদর্শন নায়কের দরকার। বম্বেতে সুদর্শন নায়ক হিসেবে তখন প্রদীপকুমারের জয়জয়কার। 'আনারকলি' আর 'নাগিন' ছবি সুপারহিট করার পর প্রদীপবাবুর বাজারদর দারুণ বেড়ে গিয়েছে। হেমন্তদার সঙ্গে প্রদীপবাবুর খুবই ভালো সম্পর্ক। আগে থেকেই ছিল, ফিল্মিস্তানের 'নাগিন' ছবি করবার পর সেটা আরও বেড়েছিল। ওই 'নাগিন' ছবির গান

হিট করার পর সুরকার হিসেবে বম্বেতে হেমন্তদার কদর খুব বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও 'বিশ সাল বাদ' ছবির নায়ক করার জন্য হেমন্তদা প্রদীপবাবুর কাছে অ্যাপ্রোচ করেননি। তিনি লো-বাজেটে ছবি করতে চান। ছবি যদি মার খায় তাতে যাতে পথে বসতে না হয় সে জন্যে পূর্বাহ্নেই আটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছিলেন। তাঁর সেই লো-বাজেট ফিল্মে প্রদীপকুমারের মতো দামি শিল্পীকে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি কলকাতার উঠতি গ্ল্যামার বিশ্বজিতের দিকেই তাকিয়েছিলেন।

কলকাতায় তখন বিশ্বজিৎ ছাড়াও আরও দু'চারজন সুদর্শন নায়ক ছিলেন। কিন্তু হেমন্তদা বিশ্বজিৎ ছাড়া আর কারও কথা ভাবেননি তাঁর ছবির জন্য। হ্যাঁ, আর একজনের কথা ভেবেছিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে ছবি করার কথা প্রায়ই ভাবতেন। তিনি হলেন উত্তমকুমার। একবার তো উত্তমকুমারকে নিয়ে 'শর্মিলী' বলে একটা ছবি অ্যানাউন্সও করে দিয়েছিলেন। ইংরিজি স্ক্রিন পত্রিকার ফুল পেজ জুড়ে তার একটা বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছিল। কিন্তু উত্তমবাবু শেষ পর্যন্ত সেই ছবি করেননি। এই নিয়ে হেমন্তদা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু কোনরকম তিক্ততার মধ্যে যাননি উত্তমবাবুর সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ কথাবার্তার সময় মাঝে মাঝে তাই নিয়ে আক্ষেপ করতেন, এই মাত্র।

হেমন্তদা বিশ্বজিৎকে বম্বে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই একটি অত্যন্ত সৎ উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : দ্যাখ বিশু, আমি তোমাকে বম্বে নিয়ে যাচ্ছি ঠিকই, তবে তোমার ভাগ্য গড়ার ভার তোমার নিজের হাতে। ছবি যদি হিট করে তাহলে তোমার কাছে অনেক ছবির অফার আসবে। আর সেই সময়েই শুরু হবে তোমার অগ্নিপরীক্ষা। এমন কোন কাজ অথবা ব্যবহার তুমি করবে না, যাতে লোকে তোমার দুর্নাম করতে পারে। এই দুর্নামের জন্য অনেক ট্যালেন্টের কেরিয়ার ভুমড়্ হয়ে গেছে। বম্বে তোমাকে প্রয়োজনহীন হয়ে পড়লে পেছনে লাথি মারতেও দ্বিধা করবে না। এটা আউট অ্যান্ড আউট কমার্শিয়াল সিটি। নিজের চাহিদা তোমাকে নিজেকেই তৈরি করতে হবে, নিজেকেই বজায় রাখতে হবে। তার জন্যে বম্বের মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। ফ্লাইং সসারদের স্থান বম্বেতে নেই।

তা বিশ্বজিৎ সারা জীবন হেমন্তদার এই উপদেশ মনে রেখেছে। তাই নানাবিধ বিপর্যয়ের পরও বম্বের মাটি কামড়ে পড়ে আছে। নিজস্ব একটা আস্তানা করেছে। বিশ্বজিতের দক্ষিণামূর্তির সেই ফ্ল্যাটটা দেখলে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়, যেখানে ঘন ঘন ম্যাড্রাস আর হায়দরাবাদ থেকে প্রোডিউসার আর ফিনান্সিয়ারদের টেলিফোন আসছে। বিশ্বজিৎ এখন বেশ কয়েকটি ছবির প্রযোজনা ও পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত।

বিশ্বজিৎ যখন বম্বেতে 'বিশ সাল বাদ' ছবির শুটিং করছিল, তখন কলকাতায় আমাদের মনে একটাই চিন্তা। সে চিন্তাটা নায়িকা ওয়াহিদা রহমানকে নিয়ে। বিশ্বজিতের সঙ্গে ওয়াহিদার বয়সের খানিকটা তফাত আছে। ওদের দু'জনকে ঠিক ঠিক মানাবে কি না, দর্শকরা ওঁদের সুস্থভাবে নিতে পারবেন কিনা, তাই নিয়ে চিন্তা ছিল।

তাই নিয়ে কলকাতায় একবার হেমন্তদার সঙ্গে কথাও হয়েছিল। আমি বলেছিলাম : বিশ্বজিৎকে একেবারে বাঘের মুখে ফেলে দিলেন হেমন্তদা।

হেমন্তদা আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারেননি। বললেন : তার মানে?

আমি বললাম : আপনার ছবিতে ওয়াহিদার অপোজিটে কি ওকে মানাবে? তাছাড়া ওয়াহিদার অ্যাকটিংয়ের রেঞ্জ আর বিশ্বজিতের অ্যাকটিয়ের রেঞ্জ তো এক নয়। ছেলেটা পড়ে পড়ে মার খাবে না তো?

হেমন্তদা বললেন : আমি তো শুটিং-এর পর রেগুলার প্রোজেকশান দেখছি। তাতে তো বেমানান মনে হচ্ছে না। তারপর দেখা যাক বিশুর বরাতে কী আছে। ও যদি মার খায় তাহলে আমিও তো মার খেয়ে যাব।

ছবি রিলিজের পর দেখা গেল দু'জনকে দারুণ মানিয়েছে। ওয়াহিদা গুণী শিল্পী। উনি ওঁর অ্যাকটিং-এর মধ্যে দিয়ে বয়েসটা কমিয়ে নিয়েছিলেন। আর বিশ্বজিৎও দেখলাম নিজের বয়সের তুলনায় ব্যক্তিত্বটা বেশিই প্রকাশ করেছে। যার ফলে ওদের দু'জনকে নিয়ে দর্শকরাও মেতে উঠলেন।

ওয়াহিদার প্রতি হেমন্তদার একটা দুর্বলতা ছিল। উনি ওয়াহিদাকে একজন বড় অ্যাকট্রেস মনে করতেন। তাই 'বিশ সাল বাদ'-এর সাকসেসের পর কেবল ওয়াহিদার কথা ভেবেই উনি 'কোহরা' বলে একটা ছবি করেছিলেন। ওয়াহিদা সেখানে দারুণ ভালো অ্যাকটিং করেছিলেন। কিন্তু 'কোহরা' শব্দের অর্থ তো কুয়াশা। তাই হেমন্তদার কপালটা অত ভালো ছবি হওয়া সত্ত্বেও কুয়াশাতেই ঢেকে রইল। দর্শকরা ছবিটিকে তেমনভাবে গ্রহণ করেননি। 'বিশ সাল বাদ' করে যা লাভ হয়েছিল তার সবটাই 'কোহরা' খেয়ে নিল।

এই 'কোহ্‌রা' ছবিতেও বিশ্বজিৎ নায়ক করেছিলেন। কিন্তু 'বিশ সাল বাদ'-এর একই নায়ক নায়িকা থাকা সত্ত্বেও এ ছবিটা বক্স অফিসে ক্লিক করল না। আমার কিন্তু ছবিটা বেশ ভালো লেগেছিল। কিন্তু ছবি ভালো হলেই যে ভালো পয়সা পাবে তার তো কোন মানে নেই। এমন অঘটন তো বহুবার ঘটে গেছে ফিল্মে। পয়সা পাওয়া কিংবা না-পাওয়াটা সম্পূর্ণ ভাগ্যের ব্যাপার।

তা 'বিশ সাল বাদ' হিট করার পর আমরা ভেবেছিলাম পুজোর সময় বিশ্বজিৎ যখন কলকাতায় আসবে তখন তাকে নিয়ে খুব হই-চই করব। বাঙালির মন পুজোর সময় কলকাতায় আসবার জন্যে ছটফট করবেই। আর বিশ্বজিৎ তো সেন্ট পার্সেন্ট বাঙালি। কলকাতায় থাকলে ঘুরে ঘুরে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখা ওর নেশা। এই ঠাকুর দেখতে গিয়েই তো কারবালা ট্যাংক লেনে কালুবাবুর নজরে পড়েছিল। ওর অভিনয়জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল। সুতরাং আমরা ভাবছিলাম এবার পুজোতেও বিশ্বজিৎ কলকাতায় আসবে আর আমরা চুটিয়ে আড্ডা দেব।

কিন্তু একসঙ্গে চার-পাঁচটা ছবি হাতে পেয়ে গেল বিশ্বজিৎ। আর পড়বি তো পড় পুজোর মধ্যেই দুটো ছবির শুটিং-এর ডেট পড়ে গেল। ফোন করে জানা গেল এবার পুজোয় ওর আর কলকাতায় আসা হচ্ছে না।

তো আমি আর আমাদের সেই বিখ্যাত ফটোগ্রাফার হেমেন মিত্র দু'জনে মিলে ঠিক করলাম এবার পুজোতে আমরাই বম্বে যাব। মহম্মদ যদি পর্বতের কাছে না আসে তো পর্বতই যাবে মহম্মদের কাছে। সেই হিসেবে বম্বে মেলের টিকিট কাটা হয়ে গেল।

তা সেবার বম্বেতে গিয়ে একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হল আমাদের। একটা চিঠি দিয়ে বিশ্বজিৎকে জানিয়ে দিয়েছিলাম অমুক তারিখে আমরা বম্বে যাচ্ছি। উঠব তাজ হোটেলের পাশে অ্যাপোলো হোটেলে। সেইদিনই ওর সঙ্গে জুহু হোটেলে গিয়ে দেখা করব।

কিন্তু অ্যাপোলো হোটেলে পৌঁছেই বিশ্বজিতের মেসেজ পেলাম। ও সেইদিনই আমাদের শুটিং-এ যেতে বলেছে। এবং আমাদের অনারে ওর ছবির প্রযোজক রাম বেলারা জুহু হোটেলে একটা ক্লোজডোর সান্ধ্য পার্টির ব্যবস্থা করেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় নামক তরুণটি সিনেমায় চান্স পেয়েই তর তর করে উন্নতির সোপানে চড়ে বসেছিল। ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয়। প্রথম প্রথম কাজ পাবার জন্যে ওকে প্রচুর ছোটাছুটি করতে হয়েছে। একে-ওকে-তাকে ধরাধরি করতে হয়েছে।

তবে একেবারে প্রথম থেকেই উল্টোরথ পত্রিকার আনুকূল্য পাওয়াটা ওর কাছে সৌভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছবির পর ছবি ছাপা হতে থাকায় দর্শকদের মধ্যে বিশ্বজিৎ সম্পর্কে একটা আগ্রহ বাড়ছিল। তাছাড়া ওর ঈশ্বরপ্রদত্ত সৌন্দর্য তো ছিলই।

উল্টোরথের পৃষ্ঠায় কারণে অকারণে বিশ্বজিতের ছবি ছাপা হত। ফটোগ্রাফার হেমেন মিত্রকে প্রসাদদা, মানে উল্টোরথ পত্রিকার কর্ণধার প্রসাদ সিংহ একটা স্থায়ী নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, একটু সুযোগ পেলেই যেন বিশ্বজিতের ছবি তোলা হয়। যেমন স্টুডিওতে কোনও মহরতে অথবা অন্য কোনও উপলক্ষে একটা গ্রুপ ফটো তোলা হচ্ছে। বিশ্বজিৎ হয়তো সেই গ্রুপের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে। একজন নবাগত হিসেবে তার তো পেছনের দিকেই থাকবার কথা। কিন্তু হেমেন করত কি ছবি তোলার সময় বিশ্বজিৎকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিত। এর জন্যে হেমেনকে অন্যদের কিছু বঙ্কিম কটাক্ষও শুনতে হত। কিন্তু হেমেন ওসব গ্রাহ্য করত না। এছাড়া অন্য অন্য নায়িকাদের সঙ্গে বিশ্বজিৎকে নিয়ে আউটডোরে গিয়ে রোম্যান্টিক ফিচারও তুলত হেমেন। প্রসাদদা সেইসব ফিচারে মজার মজার ক্যাপসন

দিয়ে ফিচারটিকে মনোগ্রাহী করে তুলতেন।

এছাড়া ছিল 'মেলব্যাগ' বিভাগে রেগুলার পাবলিসিটি। 'মেলব্যাগ' বিভাগটি নির্দিষ্ট ছিল পাঠকদের চিঠিপত্রের উত্তর দেবার জন্য। ওটা খুব পপুলার ফিচার। পাঠকদের চিঠির উত্তর দিতেন প্রসাদ সিংহ নিজেই। সেই বিভাগে প্রতি সংখ্যায় অন্তত বার পঞ্চাশেক বিশ্বজিতের নাম উচ্চারিত হত। যেমন কোনও পাঠক হয়তো প্রশ্ন করলেন . উঠতি নায়কদেব মধ্যে কার কার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে আপনার মনে হয়? প্রসাদদা তার উত্তরে লিখতেন : নিঃসন্দেহে বিশ্বজিতের।

এইভাবে বিশ্বজিৎকে নিয়ে অল্ আউট পাবলিসিটি করতেন প্রসাদদা। কোনরকম রাখঢাক রাখতেন না। এর জন্যে প্রসাদদাকে কিছু পাঠকের ব্যঙ্গও সহ্য কবতে হত। একবার একজন পাঠক চিঠিতে লিখলেন : হ্যাঁ মশাই, আপনাকে বিশ্বজিৎ কত টাকা ঘুষ খাইয়েছে যে আপনি তার এত পাবলিসিটি করেন? উত্তরে প্রসাদদা লিখলেন : সে অনেক টাকা। আপনার যদি পৈতৃক বাড়িটাড়ি থাকে তবে সেটা বিক্রি করে আমার কাছে টাকা নিয়ে চলে আসুন, আপনারও ওইরকম পাবলিসিটি দেব।

উল্টোরথে এই ধরনের অল্ আউট পাবলিসিটিব ফলে ঈর্ষাকাতর একটা বিরুদ্ধপক্ষ তৈরি হয়ে গিয়েছিল বিশ্বজিতের। তারা হয়তো সামনাসামনি কিছু বলত না, কিন্তু আড়াল থেকে এমন সব কলকাঠি নাড়ত যা অত্যন্ত মর্মান্তিক। তেমন একটি ঘটনার কথা আমার জানা আছে। সেটা বিশ্বজিতের অভিনয়জীবনের একেবারে প্রথম দিককার ঘটনা।

বিশ্বজিৎ তখন রঙমহল থিয়েটারে সবে অভিনয় করতে ঢুকেছে। বোধহয় তরুণ রায়ের 'এক পেয়ালা কফি' নাটকে ও তখন অভিনয় করছে। একদিন আমি সপরিবারে ওই নাটকটা দেখতে গেছি। বসেছি দোতলার একটা বক্সে। বিশ্বজিৎ জানত আমি সেদিন নাটক দেখতে গেছি। ইন্টারভ্যালের সময় ও আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। এসেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলল : একটা দারুণ সুসংবাদ আছে রবিদা।

আমি বললাম : কী সুসংবাদ রে?

বিশ্বজিৎ বললে : সত্যজিৎ রায় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমি বললাম : এটা তো দারুণ খবর। তা উনি কী তোর কাছে কাউকে পাঠিয়েছিলেন নাকি?

বিশ্বজিৎ বললে : না। থিয়েটারে টেলিফোন করেছিলেন।

আমি বললাম : উনি নিজে ফোন করেছিলেন?

বিশ্বজিৎ বললে : না। ওঁর প্রোডাকসনের কেউ হবে।

আমি বললাম : তাঁর নামটা কী? অনিল চৌধুরী?

বিশ্বজিৎ বললে : নাম-টাম কিছু বলেননি। আমিও জিগ্যেস করিনি। কেবল বললেন আমি যেন সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে কাল সকালেই দেখা করি।

আমি বললাম : কোথায় দেখা করতে বলেছেন?

বিশ্বজিৎ বললে : তাঁর লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে।

আমি বললাম : খুব ভালো কথা। তুই কাল সকালেই চলে যা। ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা উল্টোরথ অফিসে চলে আসবি। কী কথাবার্তা হল জানিয়ে যাস। প্রসাদদা খবরটা পেলে খুব খুশি হবেন।

বিশ্বজিৎ বললে : তা তো আসবই। ফোনটা পাবার পর থেকে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। সত্যজিৎ রায় আমাকে ডেকে পাঠাবেন এটা তো আমি ভাবতেই পারছি না।

আমি বললাম : এরকম একটা খবরে আনন্দে তো বুক কাঁপবারই কথা। উনি যদি তোকে সিলেক্ট করেন তাহলে তো ইন্টারন্যাশনাল ফেমাস হয়ে যাবি।

বিশ্বজিৎ বললে : কিন্তু আমি ভাবছি উনি আমাকে দেখলেন কোথায় যে আমাকে কাস্ট করার কথা ভাবলেন। উনি তো আমাদের থিয়েটার দেখতে এসেছেন বলে শুনিনি।

আমি বললাম : সামনাসামনি না হলেও উল্টোরথে তোর ছবি তো দেখেছেন। উনি তো স্ক্রিপ্ট করার সময় চরিত্রগুলোর মুখের স্কেচ করেন। সেইভাবেই হয়তো তোর মুখের আদল এসে গেছে ওঁর স্কেচে।

বিশ্বজিৎ বললে : একটু উইশ করো রবিদা, কালকে যেন উনি আমাকে ওঁর ছবির জন্যে পছন্দ করেন।

আমি বললাম : এই তো একটা লুজ কথা বললি। তুই বললে তবে উইশ করব, না হলে করব না।

বিশ্বজিৎ বললে : স্যরি রবিদা, আমি ঠিক ওই ভেবে কথাটা বলিনি। আসলে ফোনটা পাওয়ার পর থেকে আমি যেন কেমন ডিসব্যালান্সড্ হয়ে পড়েছি।

আমি বললাম : ডিস্‌ব্যালান্সড্ হলে তো চলবে না। সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে ইন্টারভিউটা মাথা ঠাণ্ডা রেখে দিতে হবে তো।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই ইন্টারভ্যালের পর ফার্স্ট বেল্ বেজে উঠল। বিশ্বজিৎ বললে : আমি এখন যাচ্ছি রবিদা। কাল তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

আমি ওর হাতটা ধরে বললাম : উইশ ইউ গুড লাক্।

বিশ্বজিতের হাতে হাত রাখতেই বুঝতে পারলাম উত্তেজনায় ওর হাতটা কাঁপছে। ও একটু হেসে চলে গেল।

ঠিক এইভাবে ওর হাতের কাঁপুনি আরও একবার অনুভব করেছিলাম। তবে সেটা কলকাতায় নয়, বোম্বাইতে। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথাটা বলে নিই।

পরের দিন উল্টোরথ অফিসে আমরা সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলাম বিশ্বজিতের জন্যে। সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল, কিন্তু বিশ্বজিতের আর পাত্তা নেই। আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

সন্ধের মুখোমুখি বিশ্বজিৎ এল আমাদের অফিসে। ওর মুখচোখ লাল। ক্লান্ত বিধ্বস্ত একটা মানুষের মতো শরীরটাকে যেন কোন রকমে টানতে টানতে এসেছে।

ওকে দেখে আমরা চমকে উঠলাম। এ কী চেহারা হয়েছে ওর! টকটকে ফর্সা মুখে যেন কেউ একপোচ কালি বুলিয়ে দিয়েছে। বোধহয় অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করেছে। তবে কি ওর ওপরে কোন শারীরিক নির্যাতন হয়েছে।

বিশ্বজিৎ এসে চুপ করে একটা চেয়ারে বসে রইল। কোন কথা বলছে না। বোধহয় বলতে পারছে না।

বিশ্বজিৎকে ওই অবস্থায় দেখে প্রসাদদাই প্রথম বলে উঠলেন : কী হয়েছে রে বিশু?

প্রসাদদার কথার উত্তর দিতে গিয়েও বিশ্বজিৎ কিছু বলতে পারল না। ওর দুটো চোখ জলে ভরে গেল।

প্রসাদদা বললেন : ঠিক আছে। তোকে কিছু বলতে হবে না। সত্যজিৎ রায় তোকে ছবিতে নেননি তো কী হয়েছে। অনেক বড় বড় ছবির কাজ তুই পাবি।

এতক্ষণে বিশ্বজিৎ কথা বলল। কাঁপা কাঁপা গলায় বললে : সত্যজিৎবাবু আমাকে ডেকে পাঠাননি। ওটা ফল্‌স্ টেলিফোন ছিল।

ওর কথা শুনে আমরা সবাই কেঁপে উঠলাম। প্রসাদদা বললেন : সে কী রে!

বিশ্বজিৎ বললে : আমি আজ সকাল ন'টার সময় সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে উনি বললেন, আমি তো তোমাকে ডেকে পাঠাইনি ভাই। আমার নাম করে কেউ মিথ্যে করে টেলিফোন করেছে তোমায়।

আমাদের মধ্যে থেকে গিরীনদা মানে গিরীন্দ্র সিংহ বলে উঠলেন : ব্যস্ এইটুকুই কথা হল সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে?

বিশ্বজিৎ বললে : না। আরও কিছুক্ষণ কথা হল। উনি বললেন, এটা কোনও দুষ্টু লোকের কাজ। তোমার আগে আরও দু-একজনকে এইরকম ফল্‌স্ টেলিফোন করেছে। তবে তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে। তোমাকে সামনাসামনি দেখা রইল। পরে যদি কোন ছবিতে তোমাকে দরকার লাগে তবে আমি নিজে তোমাকে ফোন করব অথবা লোক পাঠাব।

প্রসাদদা বললেন : এটা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে কিছু লোক তোকে হিংসে করতে শুরু করেছে। এটা খুব গুড সাইন। আমাদের পাবলিসিটিতে যে কাজ হয়েছে সেটা বুঝতে

পারা যাচ্ছে। এই ভাবেই তো গ্ল্যামার তৈরি হয়।

গিরীনদা হাসতে হাসতে বললেন : সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কাজ পেলে তোর বিশ্বজিৎ নামটা হয়তো সার্থক হতে পারত। সেটা না হলেই বা ক্ষতি কী! অন্য ভালো ডিরেক্টারবরাও তো আছেন। তাঁদের ছবিতে কাজ করলে বিশ্বজিৎ না হোক ভারতজিৎ তো হওয়া যেতে পারে।

গিরীনদার কথায় আমরা সবাই হেসে উঠলাম। বিশ্বজিৎও। এতক্ষণের গুমোট ভাবটা কেটে গেল।

গুমোট ভাবটা কেটে গেলেও আমার মনটা খচ খচ করতে লাগল কিছু মানুষের হৃদয়বৃত্তির কথা ভেবে। একটি নতুন ছেলে, আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। তার সঙ্গে এমন মর্মান্তিক রসিকতা কেউ করে' সেই মানুষটি কী ধাতুতে গড়া কে জানে'

সেদিন গিরীনদা হাসতে হাসতে কথাটা বললেও পরবর্তীকালে তাঁর কথা অক্ষবে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। বিশ্বজিৎ সত্যি সত্যি ভাবতজিৎ হয়েছিল। বাংলা ছবির পাশাপাশি হিন্দি ছবির জগতেও একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিল নিজের।

বম্বেতে কাজ করার প্রথম বছরেই একটা বিদেশি ইম্‌পালা গাড়ি কিনে ফেলেছিল। সেই গাড়িতে করে বোম্বাই শহরটাকে চক্কর দিতে দিতে আমাব হাতটা ধরে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বিশ্বজিৎ বলে উঠেছিল : আমি তো কোনদিন ভাবতে পাবিনি রবিদা, বম্বেব রাস্তায় নিজেব কেনা ইম্‌পালা গাড়িতে করে ঘুরে বেড়াব।

কথাগুলো যখন বলছিল তখন আমার হাতের মধ্যে রাখা ওর হাতখানা আবেগে থর থর করে কাঁপছিল। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল রঙমহল থিয়েটারের সেদিন সন্ধের কথাটা। সেদিনও ওর হাতখানা এইভাবে থর থর করে কাঁপছিল।

তবে সেদিনের ঘটনার উপসংহারটা সুখকর হয়নি। দুষ্টু লোকের মর্মান্তিক রসিকতার শিকার হতে হয়েছিল ওকে। আর আজ ও একজন রীতিমত সাকসেসফুল ম্যান। এদিনের এই কাঁপুনির প্লেজারটাই আলাদা।

হিন্দি ছবিতে কাজ করার পর অবাঙালি দর্শকদের কাছে বিশ্বজিৎ কতটা পপুলার হয়ে উঠেছিল তার একটা উদাহরণ দিই।

ষাটের দশকে আমি একটানা একুশ দিন আগ্রায় কাটিয়েছিলাম অসীম ব্যানার্জী পরিচালিত 'হারানো প্রেম' ছবির আউটডোরে। ওই ছবির খানিকটা শুটিং হবার পর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম পর্বের শুটিং-এর সময় বিশ্বজিৎ ছিল নায়ক। তাকে আর সুপ্রিয়া দেবীকে নিয়ে আগ্রার তাজমহলে প্রচুর শট্ নেওয়া হয়েছিল। শুটিং বন্ধ হয়ে যাবার পর আবার যখন নতুন করে কাজ শুরু হল তখন আর বিশ্বজিতের ডেট্ পাওয়া যায়নি। ও তখন ভয়ানক ব্যস্ত হিন্দি ছবিব কাজে। সুরতাং ওকে বাদ দিয়ে নতুন নায়ক নেওয়া হয়েছিল বম্বেরই আর এক শিল্পী অসীমকুমারকে। ইনি কলকাতার অসীমকুমার নন। দ্বিতীয় ব্যক্তি। বেশ কিছু হিন্দি এবং ভোজপুরী ছবিতে ইনি নায়ক করেছেন।

তা বিশ্বজিৎকে নিয়ে অসীম যখন তাজমহলের স্পটে 'হারানো প্রেম' ছবির প্রথম পর্বের শুটিং করত তখন প্রচুর ভিড় হত শুধু বিশ্বজিৎকে দেখবার জন্যেই। পুরনো হিন্দি ছবির নামকরা ডিরেক্টার এবং অভিনেতা কিশোর সাহুও একদিন তাজমহল দেখতে এসে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বজিতের শুটিং দেখেছিলেন। আমি কিশোরবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : বিশ্বজিতের কাজ আপনার কেমন লাগছে?

উত্তরে কিশোরবাবু বলেছিলেন : ভালো। বেশ ভালো। ছেলেটি খুব ফ্রি। ও তো ইতিমধ্যেই পপুলার হয়ে গেছে।

কিশোর সাহুর মতো একজন নামকরা পরিচালকের এই মতামত যে খুবই মূল্যবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ওঁর সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল সেটা বিশ্বজিৎকে বলতেই ও বলে উঠল : কোথায় তিনি? তাঁর সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেবে চল।

আমি বললাম : তিনি তো অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছেন। তুমি শুটিং করছিলে বলে ডাকতে পারিনি।

আমার কথা শুনে বিশ্বজিৎ আফসোস করতে লাগল। আমি জানতাম ফিল্ম লাইনের প্রবীণ ব্যক্তিত্বদের বিশ্বজিৎ খুবই শ্রদ্ধা করে। সম্মান করে।

ওই শুটিং-এর ব্রেকের সময় বিশ্বজিৎকে প্রতিদিন প্রচুর অটোগ্রাফ দিতে হত। একবার একটি ইয়াং ছেলে কাগজের অভাবে একখানা একশো টাকার নোটের সাদা অংশটায় ওর অটোগ্রাফ নিয়েছিল। সেই ষাটের দশকে একশো টাকার প্রচুর দাম। সই করতে করতে বিশ্বজিৎ আশ্চর্য হয়ে বলেছিল : তুমি যে এই একশো টাকার নোটে আমার অটোগ্রাফ নিচ্ছ, এটা তো ভাঙালে আর তোমার কাছে থাকবে না। এতে সই করিয়ে কী লাভ তোমার?

ছেলেটি বললে : এ নোটটা আমি কোনদিনই ভাঙাব না। এটা সুভেনির হিসেবে আমার কাছেই রেখে দেব চিরকালের জন্যে।

জানি না, সেই নোটটি আজও ছেলেটির কাছে আছে কি না! এখন তো আর তাকে ছেলেটি বলা যাবে না। সে নিশ্চয় এখন একজন প্রৌঢ় মানুষ। অল্প বয়সের সেই বালখিল্যতার নিদর্শন সে কি আজও বয়ে বেড়াচ্ছে?

বিশ্বজিতের পপুলারিটির আর একটা উদাহরণ দিই।

বিশ্বজিৎ তখন জুহু হোটেলে একটা কটেজ নিয়ে থাকে। তার আগের রাতটা ওর ঘরেই আমরা কাটিয়েছি। ভালো করে সকাল হতে না হতেই ওর ঘরে একটি সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব ঘটল। আমরা তখনও বিছানাতেই শোয়া। মেয়েটিকে দেখেই বিশ্বজিৎ আঁতকে উঠলো। বললে : এ কী! তুমি এখানে ঢুকলে কী করে?

মেয়েটি বললে : আমি দারোয়ানদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়েছি। আই শ্য ইওর ফিল্ম 'বিশ সাল বাদ'। আই লাইক ইউ। পারহ্যাপস্ আই লাভ ইউ। অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ম্যারি ইউ।

মেয়েটির কথা শুনে আমাদের তো আক্কেল গুড়ুম। ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ দেখা দিল। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মেয়েটিকে সেদিন ঘর থেকে বিদায় করতে হয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে দরোয়ানদের ডাকতে হয়নি।

মেয়েটি সেদিন নিশ্চয় জানত না যে বিশ্বজিতের বিয়ের ব্যাপারটা তার আগেই ঘটে গেছে। ওর স্ত্রীও অপূর্ব সুন্দরী। তার নাম রত্না। দমদমের শ্রীযুক্ত সুবোধ মৈত্রের কন্যা। রত্না আর বিশ্বজিতের সাহচর্যে সে এক দারুণ সুখের দিন গেছে আমাদের।

অভিনেতা হিসেবে বিশ্বজিৎ একদিক থেকে খুবই ভাগ্যবান। সেটা তার নায়িকার ব্যাপারে। ছবিতে নামবার পরে পরেই বিশ্বজিৎ তার নায়িকা হিসেবে সন্ধ্যা রায়কে পেয়ে গিয়েছিল। যেটা উত্তমকুমার তাঁর প্রথম জীবনে পাননি। তার জন্যে উত্তমবাবুকে প্রচুর অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল।

উত্তমকুমারের প্রথম জীবনের নায়িকা কারা ছিল জানেন। ছবি রায়, ভারতী দেবী, মঞ্জু দে, সন্ধ্যারাণী ইত্যাদি। যাঁদের বয়স উত্তমবাবুর থেকে বেশি। দর্শকরা এমন জুটিকে মেনে নেবেন কেন! তাই একের পর এক ছবি ফ্লপ করে যাচ্ছিল উত্তমকুমারের।

সেই অবস্থা থেকে উত্তমবাবু মুক্তি পেয়েছিলেন সুচিত্রা সেনের সঙ্গে কাজ করার পর। বাংলা ছবিতে রোম্যান্টিক জুটির একটা ইতিহাস তৈরি করে ফেলতে পারলেন ওঁরা, যেটা উত্তমকুমারের লোকান্তরের দীর্ঘকাল পরেও আজও অম্লান। ওটা একটা লিজেন্ড হয়েই রইল।

কিন্তু বিশ্বজিৎ আর সন্ধ্যা রায়ের নায়ক-নায়িকা হিসেবে প্রথম ছবিই হিট্। শুধু হিট্ নয়, সুপারহিট। ছবিটির নাম 'মায়ামৃগ'। এম কে জি প্রোডাকসন্সের ছবি। পরিচালক ছিলেন চিত্ত বসু। সুরকার মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিশ্বজিৎ আর সন্ধ্যা রায় দু'জনেই দারুণ ফ্রি অ্যাকটিং করেছিলেন। যাঁরা ছবিটি দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয় মনে আছে 'মেটিরিয়া মেডিকার কাব্য' গানখানির কথা। কী দারুণ রোম্যান্টিক সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল ওই গানের সময়।

অথচ তখন পর্যন্ত বিশ্বজিৎ আর সন্ধ্যা রায়ের শরীর থেকে নতুনত্বের গন্ধ মুছে যায়নি। বিশ্বজিৎ তার আগে অগ্রগামীর 'ডাকহরকরা' ছবিতে সামান্য একটি ভূমিকা করার পর কেবলমাত্র 'কংস' ছবিতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রটি করেছেন মাত্র, যে ভূমিকায় রোম্যান্টিকতার লেশমাত্র ছিল না। আর সন্ধ্যা রায় হয়তো

দু-তিনখানা ছবি করেছেন, কিন্তু রোম্যান্টিক নায়িকা হিসেবে দর্শকদের কাছে অ্যাকসেপটেড নন। অথচ 'মায়ামৃগ' ছবি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল ওঁরা যেন কত বছর ধরেই না নায়ক-নায়িকা করছেন।

তবে বিশ্বজিতের এই রোম্যান্টিক নায়ক হবার পিছনে যে মানুষটির সবচেয়ে বড় অবদান ছিল, তিনি হলেন বিমল ঘোষ। বিমল ঘোষের বাহ্যিক পরিচয় ছিল তিনি এম পি প্রোডাকসন্সের প্রোডাকসন কন্ট্রোলার। পরে যখন ক্যামেরাম্যান বিভূতি লাহা, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট যতীন দত্তর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিমলদা অগ্রদূত গোষ্ঠী তৈরি করলেন তখন তিনিই ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রবীণতম দূত। পরবর্তীকালে এই গোষ্ঠীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় বিমলদার। এম পি প্রোডাকসন্স ছেড়ে তিনি যোগ দেন এম কে জি প্রোডাকসন্সে। এম কে জি ইউনিট, যাঁরা পৌরাণিক 'কংস' ছবি করে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিলেন, সেই ইউনিটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এই বিমল ঘোষ।

বিমল ঘোষ মানুষটি ছিলেন আশ্চর্য ধবনের। বাইরে থেকে দেখলে কিছুতেই ওঁর ভেতরের চেহারাটা বোঝা যেত না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হত ওঁর মধ্যে সিরিয়াসনেস বলতে কিছু নেই। স্থান-কাল বিচার নেই, পাত্র-পাত্রী ভেদাভেদ নেই, সকলের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেন। হো-হো করে হাসেন। আদিবসাত্মক আলোচনাতেও কোনও অরুচি নেই। বিমলদাকে এক নজরে দেখলে মনে হবে একজন তরল প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে উনি কত সিরিয়াস তা যাঁরা ওঁর সঙ্গে গভীরভাবে মিশেছেন তাঁরাই বুঝতে পারতেন। আমার একবার সুযোগ হয়েছিল ওঁর সঙ্গে বসে একটা ছবিব চিত্রনাট্য করবার। নিজের প্রযোজনায় সুপারহিট 'বধূ' ছবিটি করবার পর ওই ছবিটি নিজের পরিচালনায় করবার ইচ্ছে ছিল ওঁর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ছবির কাজে হাত দেবার আগেই তাঁকে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হয়েছিল।

ওই চিত্রনাট্য করবাব সময় আমি বিমল ঘোষের ভিতরের মানুষটিকে আবিষ্কার করেছিলাম। আজকাল ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগে আমরা যে সব নতুন ধবনের শিল্পসুষমামণ্ডিত ছবি দেখতে পাই, বিমলদার চিত্রনাট্যটি ছিল সেই জাতীয়। যদিও তখনও পর্যন্ত বাংলা সিনেমায় এই জাতীয় ছবির সংখ্যা ছিল খুবই মুষ্টিমেয়।

বিমলদাকে উত্তমকুমার অসাধারণ শ্রদ্ধা করতেন। উত্তমবাবুর অভিনয় জীবনের প্রথম যুগে যখন তাঁর ছবি একের পর এক ফ্লপ করছে, বাজারে তাঁর বদনাম হয়ে গেছে 'ফ্লপ মাস্টার জেনারেল' বলে, সেই সময় এই বিমল ঘোষই তাঁকে এম পি প্রোডাকসন্সে কাজ করবার জন্যে মাস মাইনেতে চুক্তিবদ্ধ করেন। সেই সময়ে বিমল ঘোষের এই অবিমৃশ্যকারিতা অনেকের কাছে হাসির কারণ হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল বাংলা ছবিতে উত্তমকুমার নামক একজন যুগান্তকারী শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে। বিমল ঘোষের চোখ ছিল জুহুরির চোখ। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন উত্তমকুমার হলেন একখণ্ড উজ্জ্বল হীরে। সাময়িকভাবে ধুলায় গড়াগড়ি খাচ্ছেন বলে সবাই তাকে কাচ বলে ভুল করছে। বিমলদা সেই হিরেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে বাংলার মানুষের কাছে উত্তমকুমার নামক এক বিরাট শিল্পীকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁকে স্বস্থানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়েছিলেন।

বিশ্বজিতের ক্ষেত্রেও বিমলদার ওইরকম একটি ভূমিকা ছিল। তাই নিয়ে একটি মজার ঘটনা আমার মনে পড়ছে।

একদিন সকাল ন'টা কী সাড়ে ন'টার সময় উল্টোরথ অফিসের ভেতরের ঘরে আমি আর প্রসাদ সিংহ বসে আছি। আমাদের অফিসটা তখন বাইশের এক কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট থেকে একশো চব্বিশের বি বিবেকানন্দ রোডে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমি আর প্রসাদদা সকাল আটটার মধ্যে অফিসে চলে আসতাম। বাকি সবাই আসতেন দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ। সকালের দিকে লোকজন কেউ আসার আগে আমরা সেদিনের কাজের প্ল্যান প্রোগ্রামটা সেরে রাখতাম। সেই সময়ে অন্য কেউ এলে আমাদের কাজের অসুবিধে হত। প্রসাদদা তখন রীতিমত বিরক্ত বোধ করতেন।

তা সেদিন সকালে কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ বিমল ঘোষ মশাই এসে হাজির হলেন আমাদের অফিসে। হাজির হলেন না বলে বলা উচিত হানা দিলেন। কারণ উনি এসে এত চিৎকার চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিলেন যে বাইরে থেকে কেউ শুনলে মনে করতে পারে আমরা ওঁর কয়েক হাজার টাকা মেরে

দিয়ে বসে আছি, উনি সেইজন্যে উচ্চকণ্ঠে তাগাদা দিতে এসেছেন পাওনা আদায় করতে।

বিমলদাকে আসতে দেখে প্রসাদদা কাগজ কলম গুটিয়ে রাখলেন। বুঝলেন যে সকালের কাজের দফা রফা হয়ে গেল।

মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে ভদ্রতা দেখিয়ে প্রসাদদা বললেন : এই যে বিমলদা, আসুন আসুন। কেমন আছেন বলুন।

বিমলদা একটা চেয়ারে নিজেকে স্থাপন করতে করতে বললেন : আমি তো ভালোই আছি। কিন্তু তোমরা এসব কী শুরু করেছ বল তো?

প্রসাদদা একটু অবাক হয়ে বললেন : আমরা আবার কী শুরু করলাম!

বিমলদা বললেন : কথা নেই বার্তা নেই একটা নতুন ছেলেকে একেবারে কাছাখোলা পাবলিসিটি দিতে শুরু করেছ তোমরা?

প্রসাদদা হাসতে হাসতে বললেন : সে কী! কার আবার কাছা খুলতে গেলাম আমরা?

বিমলদা বললেন : না না, তোমরা কাছা খুলতে যাবে কেন! তবে ওই যে বিশ্বজিৎ বলে নতুন ছেলেটাকে এত তোল্লা দিচ্ছ, এরপর ও কাছাকোঁচা ঠিক রাখতে পারবে তো?

প্রসাদদা বললেন : ও তো প্যান্টশার্ট পরে কাজেই ওর কাছা খোলার ভয় নেই।

বিমলদা বললেন : না না, ঠাট্টার কথা নয়। তোমরা ওই আনকোরা নতুন ছেলেটার মধ্যে কী এমন দেখতে পেলে যে অত পাবলিসিটি দিচ্ছ। শেষ পর্যন্ত ও ধোপে টিকবে তো?

প্রসাদদা বললেন : আপনি একবার আপনার ধোপাখানায় ফেলুন না ওকে। তারপর বোঝা যাবে ও ধোপে টিকবে কী টিকবে না।

বিমলদা বললেন : আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি যে তোমাদের ওই কেষ্ট ঠাকুর মার্কা চেহারা ছেলেটাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করব। ও সিনেমা করতে না এসে যাত্রায় গেলে ভালো করত। মাইথোলজিকাল পালা-টালায় বেশ নাম করতে পারত। সিনেমা বড় কঠিন জায়গা হে!

প্রসাদদা বললেন : তা সিনেমায় কিছু যদি না হয় তো ও না হয় যাত্রাই করবে। যাত্রা তো আর খারাপ কিছু নয়। ফোক আর্ট!

প্রসাদদার কথার উত্তরে বিমলদা আর কিছু বললেন না। তবে ওঁর কপালের দুটো রেখা একটু কুঁচকেই রইল। খানিকক্ষণ পরে এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট খেয়ে বিমলদা চলে গেলেন।

বিমলদা চলে যাবার পর প্রসাদদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : বিমলদার হঠাৎ আসার কারণটা বুঝতে পারলি কিছু?

আমি বললাম : বিশ্বজিৎকে নিয়ে এত মাতামাতি ওঁর ভালো লাগছে না। তাই সে কথাটা জানাতে এসেছিলেন।

প্রসাদদা বললেন : ছাই বুঝেছিস। তোর মাথায় একদম গোবর পোরা।

আমি থতমত খেয়ে বললাম : তাহলে?

প্রসাদদা বললেন : বিশ্বজিৎকে ওঁর চোখে ধরেছে। ওকে নিয়ে বড় কিছু করার কথা ভাবছেন। আর কারও মাথায় যাতে এই ব্যাপারটা না আসে, তাই একটু জল ঘোলা করে দিতে এসেছিলেন। উত্তমকুমারের বেলায় বিমলদা কী করেছিলেন সেবার, সেটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলি!

প্রসাদদার কথায় মনে পড়ে গেল। সত্যিই সেবার উত্তমকুমারকে নিয়ে একটা মারাত্মক কাণ্ড করেছিলেন বিমল ঘোষ। সেটা উত্তমকুমারের অভিনয় জীবনের প্রথম যুগ। উনি তখন সিনেমার ব্যাপারে হালে পানি পাচ্ছিলেন না। নাম বদলে অরূপকুমার নাম নিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। এই সময় একদিন রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে উত্তমবাবুর মুখোমুখি হলেন বিমলদা। দু'জনের মধ্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক কী যেন গোপন আলোচনা হল।

উত্তমকুমার নামক একজন ফ্লপ শিল্পীর সঙ্গে এম পি প্রোডাকসন্সের প্রোডাকসন কন্ট্রোলার বিমল ঘোষকে এতক্ষণ নিভৃতে কথা বলতে দেখে ফিল্ম লাইনের অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বিমলদা ফ্লোর থেকে বেরিয়ে আসতে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : কী ব্যাপার বিমলবাবু, আপনারা কি

উত্তমকুমারকে আপনাদের ছবিতে নিচ্ছেন নাকি?

বিমলদা তার উত্তরে বললেন : দূর দূর, ওই তো চেহারা! পুরু ঠোঁট, থ্যাবড়া নাক, খুদে খুদে চোখ। ওকে দিয়ে আবার হিরোর রোল হয় নাকি?

তার ঠিক দু'দিন পরেই শোনা গেল উত্তমকুমার এম পি প্রোডাকসন্সের মাস-মাইনের শিল্পী হিসেবে কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করেছেন। আর এই এম পি প্রোডাকসন্স থেকেই হল উত্তমকুমারের নতুন জীবনের সূত্রপাত। বয়স্কা হিরোইনদের সঙ্গে দু'চারটে ফ্লপ ছবি করার পর সুচিত্রা সেনকে পেলেন তাঁর নায়িকা হিসেবে। 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবি থেকেই আমরা পেয়ে গেলাম বিখ্যাত এক রোম্যান্টিক জুটিকে।

প্রসাদদা বললেন : সেইরকম কিছু নিশ্চয় ভেবেছেন বিমলদা। তুই আমার কথাটা মিলিয়ে দেখে নিস। দু-চারদিনের মধ্যেই খবর পাবি বিমল ঘোষেদের এম কে জি প্রোডাকসন্সের সঙ্গে একখানা ছবিতে কন্ট্রাক্ট করেছে বিশ্বজিৎ।

তা প্রসাদদার কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। ঠিক দু'দিন পরেই বিমলদা আবার আমাদের অফিসে এসেছিলেন। প্রসাদদার ঘরে পা দিয়েই বললেন : একটা দুঃসংবাদ আছে প্রসাদ।

দুঃসংবাদ শব্দটা শোনার পরও প্রসাদদা এতটুকু বিচলিত হলেন না। বললেন : বিশ্বজিৎকে যে ছবিতে নিলেন সেটার কী নাম? রোলটাই বা কী ধরনের বিমলদা?

প্রসাদদার কথা শুনে বিমলদা হকচকিয়ে গেলেন। বললেন : তুমি তো বড় সর্বনেশে লোক হে প্রসাদ। গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছো নাকি? কিংবা জ্যোতিষ-টৌতিষ। আমি তো খবরটা কাউকেই জানাইনি। প্রথম তোমাকেই জানাতে এলাম। আর তুমি কি না তার আগেই জেনে বসে আছ।

প্রসাদদা বললেন . এর জন্যে আবার জ্যোতিষ জানার দরকার আছে নাকি! একটু বুদ্ধিটাকে শান দিয়ে রাখলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। আপনি দু'দিন আগে এসে যখন বিশ্বজিতের এক্সটেনসিভ পাবলিসিটির ব্যাপারে আমাদেব গালমন্দ করে গিয়েছিলেন, সেইদিনই বুঝতে পেরেছিলাম আপনারা বিশ্বজিৎকে ছবিতে নিচ্ছেন। কথাটা রবিকে বলেওছিলাম। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা করুন ওকে।

বিমলদা আর সেটার প্রয়োজন বোধ করলেন না। প্রসাদদার কথা শেষ হতে হো হো করে আকাশ ফাটানো হাসি হেসে বললেন : এইরকম তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকলে কী আর উল্টোরথের মতো একটা কাগজকে দাঁড় করানো যায়। তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ ভাই প্রসাদ!

প্রসাদদা দাঁতে কাঠি দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন : আমার কথার উত্তর এখনও পাইনি বিমলদা। ছবিটার নাম কী?

বিমলদা বললেন : 'কংস'। কমল মিত্তির কংস করছেন। আর বিশ্বজিৎকে দিয়েছি শ্রীকৃষ্ণের রোল। ওকে ওই রোলে ভালোই মানাবে, কী বলো?

প্রসাদদা বললেন : খুব সুন্দর মানাবে। ও তো দারুণ হ্যান্ডসাম। তাছাড়া প্রথম বড় ছবি হিসেবে এইরকম একটা হালকা রোলই ওর দরকার। মিটি মিটি হাসি দিয়ে কেল্লা ফতে করে দেবে। মেয়েদের ওকে খুব ভালো লাগবে। তা ছবিটা ডিরেকশান দিচ্ছেন কে?

বিমলদা বললেন : এ ছবিটি ইনডিভিজুয়াল কোনও ডিরেকক্টারকে দিয়ে করাচ্ছি না আমরা। একটা ইউনিট এটার ডিরেকশান দিচ্ছে। খুব শীগগির আমরা মহরত করছি। তোমাকে যেতে হবে কিন্তু। আফটার অল বিশ্বজিৎ তো তোমাদেরই প্রোডাক্ট।

প্রসাদদা বললেন : আমি তো শুটিং-টুটিংয়ে বিশেষ যাই না বিমলদা। ও কাজটা করে গিরীন। তা গিরীনই যাবে এখন। আমি এখন থেকেই তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। উইশ ইউ গুড লাক্।

বিমলদা বললেন : থ্যাংক ইউ।

এই বলে বিমলদা চলে গেলেন।

তা 'কংস' ছবি দারুণ ভাবে হিট করেছিল। বিশ্বজিৎকে দর্শকরা দারুণ ভাবে নিয়েছিল। বিশেষ করে মহিলা দর্শকরা। প্রসাদদার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল।

এবং শুধু ওই ছবিতেই নয়, এম কে জি প্রোডাকসন্সের পরের ছবি 'মায়ামৃগ'-তে বিশ্বজিৎ একেবারে রোম্যান্টিক নায়কের রোল পেয়ে গিয়েছিল। আর ওই ছবিতে উত্তমকুমার করেছিলেন একটা অসাধারণ

ক্যারেক্টার রোল্। তাঁর মুখে শোন 'শোন গেরেবাজ খোপ থেকে বেরো আজ' গানটা দারুণ ভাবে হিট করেছিল। উত্তমকুমারের টপ ফর্মে তাঁকে দিয়ে ক্যারেক্টার রোল করানোর এই অসাধ্য কাজটা করেছিলেন বিমল ঘোষই। তাঁর অনুরোধ উত্তমবাবু ফেলতে পারেননি।

এরপর থেকে বিশ্বজিতের তর তর করে ওপরে ওঠার পালা। কালক্রমে ভারতবিখ্যাত শিল্পী হয়ে উঠল।

বিশ্বজিৎ যখন বম্বের ছবি নিয়ে খুব ব্যস্ত, কলকাতায় আসবার সময়ই পাচ্ছে না, সেই সময় একদিন দুপুরে ওর একটা ফোন পেলাম। উল্টোরথ অফিসে। বিশ্বজিৎ বললে : রবিদা, কাল একবার সময় করে আমাদের বাড়িতে আসতে পারবে? তোমার সঙ্গে খুব দরকার।

আমি চমকে গেলাম ওর ফোন পেয়ে। বললাম : তোমার বম্বের বাড়িতে?

বিশ্বজিৎ বললেন না না, কলকাতার টালিগঞ্জের বাড়িতে। অবশ্যই এসো কিন্তু।

আমি বললাম তথাস্তু।

বিশ্বজিতের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বেশ অল্প বয়সেই। বলা যায় প্রি-ম্যাচিওরড এইজে। ওঁর জন্ম ১৯৩৭ সালে। আর বিয়ে হয়েছিল ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তার মানে ওর তখন বাইশ বছর বয়েস। আর ওর স্ত্রী রত্না তো তখন চোদ্দ পেরিয়ে পনেরতে পা দিয়েছে। ভাগ্যিস তখন বিয়ের ব্যাপারে আইনের অত কড়াকড়ি ছিল না। নইলে তো রত্নাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসবার জন্যে অন্তত আরও একটি বছর অপেক্ষা করতে হত।

অনেকে হয়তো ভাবছেন যে বিশ্বজিৎ সিনেমায় অভিনয় করছে বলে যাতে ওর না চরিত্র খারাপ হয়ে যায় তাই ওর বাবা অত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। বিশ্বজিতের বিয়ের ব্যাপারটা ওর বাবা ডাঃ রঞ্জিত চ্যাটার্জির আগ্রহ অনুসারে হয়নি। বিয়েটা ঠিক হয়েছিল রত্নার বাবা সুবোধ মৈত্র মশাইয়ের আগ্রহে।

বিশ্বজিতের ছেলেবেলার এক বন্ধু আছে। তার নাম নিমাই মৈত্র। সিঁথিতে ওদের বাড়ি। বিশ্বজিৎ আর নিমাই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এই নিমাই হল রত্নার বাবা সুবোধবাবুর ছোট কাকার ছেলে। একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে বিশ্বজিৎ নিমাইয়ের সঙ্গে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। সেখানে ওকে দেখে সুবোধবাবুর খুব পছন্দ হয়ে যায়। বিশ্বজিৎ তো দেখতে ভারি সুন্দর। তাছাড়া ওদের বংশটাও বেশ ভালো। বনেদি পরিবার। তাই সুবোধবাবু তাঁর ছোট মেয়ে রত্নার সঙ্গে বিশ্বজিতের বিয়ে দিতে আগ্রহী হয়ে পড়লেন।

সুবোধবাবুর ছেলে নেই। দুই মেয়ে। বড় মেয়ে কৃষ্ণার বিয়ে দিয়েছেন একজন ডাক্তারের সঙ্গে। ডাঃ অধিকারী। ভদ্রলোক অতিশয় সভ্য ভদ্র বিনয়ী নম্র। সবদিক থেকে দেখবার মতো। ডাঃ অধিকারীকে সুবোধবাবু জামাই বলে পরিচয় দিতেন না। বলতেন, আমার ছেলে। কিন্তু তাঁর একটাই আক্ষেপ। ছেলে ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার নয়। অথচ একজন এঞ্জিনিয়ার জামাই তাঁর অতীব প্রয়োজন। সে কারণটা পরে বলছি। তার আগে ডাক্তার অধিকারী সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা বলে নিই।

একদিন আমি আর সাহিত্যিক সমরেশ বসু আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস থেকে বেরিয়েছি, এমন সময় ডাঃ অধিকারী সেখান দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। আমাদের দেখে গাড়ি থামালেন। তারপর গন্তব্য জেনে নিয়ে বললেন : আমিও ওইদিকেই যাচ্ছি। চলুন, আপনাদের নামিয়ে দিয়ে যাই।

গাড়িতে উঠে আমি ডাঃ অধিকারীর সঙ্গে সমরেশবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলাম। ডাঃ অধিকারী নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে সমরেশবাবুকে দেখছিলেন। সমরেশবাবুর সঙ্গে এর আগে ডাঃ অধিকারীর পরিচয় ছিল না। এইদিনই প্রথম।

গাড়ি চালাতে চালাতে ডাঃ অধিকারীর ওইভাবে সমরেশবাবুকে বার বার দেখায় আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু সমরেশবাবুর মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। তিনি তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাঁর চোখে-মুখে আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস। সমরেশবাবুর সেই বিপদের কারণটা আমি জানতাম। তাই নিয়েই তাঁর সঙ্গে আনন্দবাজার অফিসে বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে। এক অজ্ঞাত ব্যক্তির চক্রান্তে তাঁর মান-সম্মান বিপন্ন হতে চলেছে। ব্যাপারটা এতই মারাত্মক যে শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। সমরেশবাবু দিশেহারা। কী করবেন কিছুই ঠিক করতে পারছেন না।

গাড়ি চালাতে চালাতে ডাঃ অধিকারী হঠাৎ সমরেশবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : আপনি যার কথা ভাবছেন তিনিই কালপ্রিট। তবে তিনি আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না। চিন্তার কোনও কারণ নেই। সব বিপদ কেটে যাবে।

ডাঃ অধিকারীর কথা শুনে সমরেশবাবু সিটের ওপর প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। ডাঃ অধিকারীর পিঠে হাত রেখে বললেন : আপনি বলছেন বিপদ কেটে যাবে? আমার কোনও ক্ষতি হবে না?

ডাঃ অধিকারী বললেন : নিশ্চয়। আজ রাত্রের মধ্যেই আপনি সুসংবাদ পাবেন।

সমরেশবাবু ভারমুক্ত ব্যক্তির মতো গাড়ির ব্যাকসিটে নিজের শরীরটাকে শিথিল করে ছেড়ে দিযে বললেন : আঃ, আপনি আমাকে বাঁচালেন!

তারপর হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ঠিকরে উঠে বললেন : কিন্তু আপনি আমার বিপদের কথা জানলেন কেমন করে? আমি তো আপনাকে কিছু বলিনি। আপনি কী থট্-রিডার?

ডাঃ অধিকারী একটু হেসে বললেন : না মশাই, আমি থট্ রিডিং-ফিডিং জানি না। তবে অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করি।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম : তাই নাকি! কিন্তু আপনি তো সমরেশবাবুর হাতও দেখেননি, আর কোষ্ঠীর ছকও দেখেননি। তাহলে কেমন করে আপনার জ্যোতিষ বিদ্যার প্রয়োগ করলেন?

ডাঃ অধিকারী বললেন : ওটা রাশিয়ান পদ্ধতি। ওতে হাত-টাত দেখার দরকার লাগে না। মুখের কতকগুলো রেখা থেকেই সব কিছু আঁচ করা যায়।

আমি বললাম : তাই বোধহয় বার বার ঘাড় ফিরিয়ে সমরেশবাবুর মুখের দিকে দেখছিলেন গাড়ি চালাতে চালাতে।

ডাঃ অধিকারী বললেন : আপনি সেটা লক্ষ করেছেন দেখছি।

সমরেশবাবু বললেন : কিন্তু আপনার ওই রাশিয়ান পদ্ধতিতে আপনি না হয় মনের কথা জানতে পারলেন, কিন্তু পরিণতিতে কী ঘটবে সেটা কেমন করে জানলেন?

ডাঃ অধিকারী বললেন : ওই পদ্ধতিতে বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ সবটাই জানা যায়। তবে সব ক্ষেত্রে যে মিলবেই তেমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তার জন্যে এক্সট্রা কনসেনট্রেশনের দরকার। আপনার ব্যাপারটা মিলে গেছে দেখে বুঝতে পারছি আমি ঠিক ভাবেই কনসেনট্রেট করতে পেরেছি। বর্তমানটা যখন মিলে গেছে তখন ভবিষ্যৎটাও মিলবেই।

এতক্ষণে সমরেশবাবুর মুখে হাসি ফুটল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন : আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। দুটো দিন যে কী দুর্ভাবনার মধ্যে কাটিয়েছি।

তা ডাঃ অধিকারীর মতো এমন একজন গুণান্বিত ব্যক্তিকে জামাই হিসেবে পেয়েও সুবোধ মৈত্র মশাই পরিপূর্ণভাবে খুশি নন। তিনি একজন এঞ্জিনিয়ার জামাইয়ের সন্ধানে আছেন যাঁকে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে তৈরি করে তুলতে পারবেন।

দমদমের সুবোধ মৈত্র মশাইকে হয়তো অনেকেই চেনেন না। কিন্তু সিভিল অ্যাভিয়েশন লাইনে তাঁর মতো বিখ্যাত ব্যক্তি খুব কমই ছিলেন তখনকার দিনে। সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরে তাঁর অসংখ্য ছাত্র আজও ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের কেউ মেইনটেনান্স এঞ্জিনিয়ার, কেউ বা গ্রাউন্ড এঞ্জিনিয়ার। তাঁর নামে কৈখালি আর ভি আই পি রোডের মোড়ে বেশ বড়সড় একটি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে যেখানে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্টুডেন্টরা শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে।

সুবোধবাবু চেয়েছিলেন তাঁর ছোট মেয়ে রত্নার বিয়ে যার সঙ্গে দেবেন তাকেই মনের মতো করে তৈরি করে নিয়ে এই ইনস্টিটিউটের সর্বোচ্চ দায়িত্ব দিয়ে যাবেন। সেইজন্যেই বিশ্বজিৎকে দেখামাত্র তাঁর পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর একটাই শর্ত। বিশ্বজিৎকে তিনি এঞ্জিনিয়ার তৈরি করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত পাঠাবেন। সব খরচ তাঁর। বিনিময়ে তাঁকে কথা দিতে হবে, ফিরে এসে সে এই ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব নেবে।

এই শর্তের কথাটা নিমাইয়ের মুখ থেকে জানতে পারল বিশ্বজিৎ। তার আগে সেদিন ওই বিয়েবাড়িতেই রত্না আর বিশ্বজিতের মধ্যে চোখের দেখাদেখির ব্যাপারটা ঘটে গেছে। রত্না জেনে গেছে

বিশ্বজিৎ একজন ফিল্মের অভিনেতা। 'কংস' ছবিতে শ্রীকৃষ্ণের রোল করেছে।

নিমাইয়ের মারফৎ বিশ্বজিতের কাছে যখন বিয়েব প্রস্তাব এল তখন সে 'মায়ামৃগ' ছবিতে অভিনয় করছে। তখনও সে জানে না ভবিষ্যতে তার ভাগ্যে কী আছে। অভিনেতা হিসেবে কতদূর এগোতে পারবে সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা করতে পারছে না। তাই একটা নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় সে রত্নাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল। কথা দিল বিয়ের পর ফিল্ম করা ছেড়ে দেবে।

ওঁদের কথা দিয়ে বিশ্বজিৎ তার বাবা রঞ্জিতবাবুকে সমস্ত ঘটনাটা জানাল। রঞ্জিতবাবু খুশি হলেন কথাটা শুনে। বিশ্বজিতের এই সিনেমা করার ব্যাপারটা তাঁর নিজেরও খুব একটা পছন্দের নয়। সবদিক বিবেচনা কবে তিনি এই বিয়েতে সানন্দে মত দিলেন। তার আগে রত্নাকে একবার চোখের দেখা দেখে নিলেন। খুব ভালো লাগল মেয়েটিকে দেখে। মেয়েটি সুন্দরী তো বটেই, তার ওপর নম্র এবং ভদ্র। গুরুজনদের সম্মান দিতে জানে। বেশ একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে মেয়েটির মধ্যে।

তা 'মায়ামৃগ' রিলিজ করল ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে, আর বিশ্বজিতের বিয়ে হয়ে গেল ফেব্রুয়ারি মাসে। তখন ও জানত না 'মায়ামৃগ' ছবিটা অমন দুর্দান্তভাবে হিট করবে আর সেই সঙ্গে অভিনেতা হিসেবে ওর একটা ডিমান্ড তৈরি হয়ে যাবে। পর পর বেশ কয়েকটি ছবির অফার এসে গেল ওর কাছে। সেই সঙ্গে রঙমহল থিয়েটারে বাঁধা মাইনের অভিনয়শিল্পী।

এবার বিশ্বজিৎ খুব ফ্যাসাদে পড়ল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। একদিকে অভিনেতা হবার লোভনীয় হাতছানি, অপর দিকে সুবোধবাবুকে দেওয়া এঞ্জিনিয়ার হবার প্রতিশ্রুতি। কোন রাস্তাটা বেছে নেবে সে।

বেশ কয়েকদিন ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারল না। কিন্তু ভাববার জন্যে তো বেশি সময় হাতে নেই। পরিচালক সুধীর মুখার্জি তাগাদা দিয়ে জানতে চাইছেন তাঁর 'শেষ পর্যন্ত' ছবির নায়কের চরিত্রটি বিশ্বজিৎ অ্যাকসেপ্ট করবে কি করবে না। দুটো রাত বিনিদ্র কেটে গেল এইসব ভাবতে ভাবতে। নিজে থেকে কোনও ডিসিশন নিতে না পেরে সে ঠিক করল বলটা সুবোধবাবুর কোর্টেই ঠেলে দেবে। তিনি যা ডিসিশন নেবেন সেটাই মাথা পেতে নেবে।

বিশ্বজিতের কাছে সব কথা শুনে সুবোধবাবু বললেন : ঠিক আছে। তুমি মাস ছয়েক সময় নাও। ফিল্মের ব্যাপারটা কতটা কী দাঁড়ায় দেখো। তারপর তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করা যাবে।

তা সেই ছ'মাসের মধ্যেই বিশ্বজিতের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেল। সুধীর মুখার্জির 'শেষ পর্যন্ত' ছবি দারুণভাবে হিট কবে গেল। আর হিট তো শুধু নয়, একেবারে সুপারহিট। 'শেষ পর্যন্ত' ছবিতে বিশ্বজিতের নায়িকা ছিলেন সুলতা চৌধুরী। নায়ক-নায়িকা হিসেবে 'মায়ামৃগ' ছবিতে বিশ্বজিৎ আর সন্ধ্যা রায়কে যেমন চমৎকার মানিয়েছিল, 'শেষ পর্যন্ত' ছবিতে বিশ্বজিৎ আর সুলতা চৌধুরীকে তেমনটা মানাল না বটে, তবে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ চিত্রনাট্য, ছবি বিশ্বাস, অনুভা গুপ্তা আর জীবেন বসুর চমৎকার অভিনয়, আর হেমন্ত মুখার্জির মনমাতানো গানগুলির জোরেই ছবি সুপারহিট করে গেল। সেই সঙ্গে বিশ্বজিৎ আর সুলতার অভিনয়টাও দর্শকদের বেশ ভালো লেগে গেল। রাতারাতি বিশ্বজিতের একটা গ্ল্যামার তৈরি হয়ে গেল।

এই 'শেষ পর্যন্ত' ছবি হিট হয়ে যাওয়ার কারণে বিশ্বজিৎ আরও দুটি ছবির কাজ পেয়ে গেল। তার একটি হল বহু হিট্ ছবির জনক পরিচালক সুশীল মজুমদারের নিজের প্রোডাকসনের ছবি 'কঠিন মায়া' আর অপরটি পরবর্তীকালের নামকরা পরিচালক কণক মুখার্জির 'আশায় বাঁধিনু ঘর'। প্রথম ছবিতে বিশ্বজিতের নায়িকা সন্ধ্যা রায় আর দ্বিতীয় ছবিটির নায়িকা ছিলেন রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রঞ্জনা ছিলেন আকাশবাণীর বিখ্যাত অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে। রঞ্জনা কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করার পর বিখ্যাত শব্দগ্রাহক এবং পরবর্তীকালের বিখ্যাত প্রযোজক দেবেশ ঘোষকে বিয়ে করেন। এখন রঞ্জনা এবং দেবেশবাবু দু'জনেই বোম্বাই প্রবাসী। বোম্বাইতে তাঁদের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র।

'শেষ পর্যন্ত', 'কঠিন মায়া' এবং 'আশায় বাঁধিনু ঘর' ছবির পর এমন একটি ছবির অফার বিশ্বজিতের সামনে এল, যে ছবির পর বিশ্বজিৎ সিনেমা লাইন ছাড়ার কথা ভাবতেই পারল না। সেটি পরিচালক সুধীর মুখার্জির ছবি। ছবিটির নাম 'দুই ভাই'। বড় ভাই উত্তমকুমার আর ছোট ভাই বিশ্বজিৎ। এই ছবিতে

কাজ করার ব্যাপারে বিশ্বজিতের জীবনে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল।

সুধীর মুখার্জি পরিচালক হিসেবে প্রচুর নাম করা সত্ত্বেও একটি বিরাট অতৃপ্তি তাঁর নিজের মধ্যে কাজ করছিল। তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছে উত্তমকুমারকে নিয়ে একটা ছবি করেন। কিন্তু এমন মনের মতো একটা গল্প পাচ্ছিলেন না যে তাতে অভিনয় করবার প্রপোজাল উত্তমকুমারকে দেওয়া যায়। 'দুই ভাই' ছবির স্ক্রিপ্ট তৈরি হবার পর সুধীরবাবুর মনে হল, এবারে উত্তমকুমারের কাছে যাওয়া যেতে পারে।

১৯৬১ সালে উত্তমকুমার তখন খ্যাতির তুঙ্গে। প্রচণ্ড চাহিদা উত্তমকুমারের। সেই সঙ্গে বড়ই খুঁতখুঁতে হয়ে পড়েছেন উত্তমবাবু। চিত্রনাট্য পছন্দ না হলে ছবি করতে রাজি হচ্ছেন না। শুধু কি চিত্রনাট্য? সেই সঙ্গে কো-আর্টিস্টরাও তাঁর মনোমত হওয়া চাই। তা 'দুই ভাই' ছবির স্ক্রিপ্ট উত্তমবাবুর খুব ভালো লেগে গেল। না লাগবার তো কারণ নেই। সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যে স্ক্রিপ্ট করেছেন তা পছন্দ না হয়ে উপায় আছে। উত্তমবাবুরও নেপেনদার প্রতি দারুণ শ্রদ্ধা ছিল। তিনিও ওঁকে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার বলে মনে করতেন।

উত্তমবাবু রাজি হবার পর এবার কো-আর্টিস্ট নির্বাচনের পালা। সুধীরবাবুর সব ছবিতে সুলতা চৌধুরী থাকেন, অতএব তিনি থাকবেনই। প্রধান নারী চরিত্রে সুধীরবাবু সাবিত্রী চ্যাটার্জির কথা ভেবেছিলেন। সেটাও তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করলেন উত্তমবাবু।

এবারে দুই ভাইয়ের দ্বিতীয় ভাইটি কাকে দেওয়া হবে? সুধীরবাবু মনে মনে বিশ্বজিতের কথা ভেবে রেখেছিলেন। 'শেষ পর্যন্ত' ছবিতে বিশ্বজিৎকে নিয়ে তিনি বেশ ভালো ফল পেয়েছেন। কিন্তু মনের এই বাসনার কথাটা উত্তমবাবুর কাছে বলতে ইতস্তত করছেন। কী জানি যদি বিশ্বজিতের নামটা উত্তমবাবুর পছন্দ না হয়। তাই তিনি কায়দা করে বললেন : উত্তম, তুমি তো স্ক্রিপ্টটা আদ্যোপান্ত শুনেছ। তোমার ভাইয়ের ক্যারেকটারটা তো খুবই ভাইটাল। ওটা কাকে দেওয়া যায় বল তো?

সুধীরবাবুর কথা শুনে উত্তমবাবু একটু হাসলেন। তারপর বললেন : আপনি যাকে ভেবেছেন তাকেই নিন না।

সুধীরবাবু একটু চমকে গেলেন উত্তমবাবুর কথা শুনে। তারপর বললেন : না না, আমি কারও কথা ভাবিনি। ভাবলে আর তোমার কাছে সাজেশান চাইব কেন?

উত্তমবাবু বললেন : আমার কাছে অস্বীকার করে লাভ নেই সুধীরদা। আপনি যার কথা ভেবেছেন, এবং এখনও ভাবছেন, তাকেই নিন।

সুধীরবাবু হাসতে হাসতে বললেন : ওরে বাবা! তুমি থট্ রিড করতেও পার দেখছি। বেশ তো, বলো দেখি আমি তোমার ছোট ভাইয়ের রোলে কার কথা ভেবেছি?

উত্তমবাবু বললেন : বিশ্বজিৎ ছাড়া আর কার কথা ভাববেন আপনি!

সুধীরবাবু ধরা পড়ে যাবার মতো লাজুক হাসি হেসে বললেন : আমার মনের কথাটা তুমি জানলে কেমন করে?

উত্তমবাবু বললেন : এটা তো অঙ্কের ব্যাপার। 'শেষ পর্যন্ত' ছবিটা অমন হিট করার পর বিশ্বজিতের কথা ভাবাটাই তো স্বাভাবিক।

সুধীরবাবু বললেন : তাহলে তুমি ওই রোলে বিশ্বজিৎকে অ্যাপ্রুভ করছ?

উত্তমবাবু বললেন : নিশ্চয়। আমার পরে বিশ্বজিৎ তো বাংলা ছবির সবচেয়ে পপুলার হিরোর জায়গাটা নেবে।

উত্তমকুমারের এই সার্টিফিকেটের কথাটা বিশ্বজিতের কানে গিয়েছিল। 'দুই ভাই' ছবির কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করতে করতে ও স্থির করে ফেলল ফিল্ম লাইন ছাড়বে না। উত্থানই ঘটুক আর পতনই ঘটুক ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে আঁকড়েই ও পড়ে থাকবে চিরকাল।

কিন্তু সুবোধবাবুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কী হবে? সারা মনে একটা অস্বস্তি নিয়ে বিশ্বজিৎ মাথা নিচু করে গিয়ে দাঁড়াল সুবোধবাবুর সামনে।

বিশ্বজিৎ সম্পর্কে যাবতীয় খবরাখবর নিমাইয়ের মারফত নিয়মিত পেতেন সুবোধবাবু। তাই হেঁটমাথা বিশ্বজিৎকে দেখে তার মনের অস্বস্তির ব্যাপারটা টের পেতে দেরি হল না তাঁর। মনে মনে

তিনি আশাহত, কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করলেন না সুবোধবাবু। বিশ্বজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন: তুমি এঞ্জিনিয়ার হলে আমি খুব খুশি হতাম। কিন্তু তুমি সিনেমা করে এখন যা রোজগার করছ এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশি করবে বলেই মনে হয়, তা অত টাকা তো এঞ্জিনিয়ার হিসেবে কোনদিনই রোজগার করা যাবে না। সুতরাং আমি বলি কী, তুমি সিনেমা নিয়েই থাক।

শ্বশুরমশাইয়ের কথা শুনে বিশ্বজিতের ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। সে কোনও কথা না বলে ঝপ করে সুবোধবাবুর পায়ের ধুলো নিলে।

বিশ্বজিতের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে সুবোধবাবু বললেন: ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি দিনে দিনে তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক। তবে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, জীবনে যে কাজটাই করবে, সেটা মন দিয়ে কোরো। নিজেকে সৎ এবং পরিচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টা কোরো। ডিসিপ্লিনড হও। ডিসিপ্লিন না থাকলে কোনও মানুষ বড় কাজ করতে পারে না।

সুতরাং বিশ্বজিতের সিনেমা করা নিয়ে আর কোনও মহলেই আপত্তির কোনও কারণ রইল না। একদিকে কাজের পর কাজ, অপরদিকে সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে বিশ্বজিতের জীবনের সুখের ভেলা তরতর করে এগিয়ে চলল।

কিন্তু অকস্মাৎ একটা প্রবল ঝড়ে সেই সুখের জীবন তচনচ হয়ে গেল।

বিশ্বজিৎ যেদিন আমাকে ফোন করে ওর টালিগঞ্জের বাড়িতে দেখা করবার জন্যে ডেকে পাঠাল, আমি ঠিক তার পরদিনই গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। এত জরুরি তলব কী কারণে সেটা ভেবে পাচ্ছিলাম না। বিশ্বজিৎকে তখন তো কলকাতাতে পাওয়াই দুর্ঘট। বম্বেতেই বেশিরভাগ দিন কাটে তার। তবে কলকাতায় এলে একবার না একবার ফোন করেই। কখনও বা সশরীরে চলে আসে আমাদের উল্টোরথের অফিসে। আমরা অবশ্য ওকে আসতে নিষেধ করতাম। ফিল্মস্টার দেখলেই আমাদের অফিসে মানুষজন উঁকিঝুঁকি দেয়। উত্তমকুমার কিংবা বিশ্বজিৎ অথবা বিকাশ রায়ের মতো গ্ল্যামারযুক্ত স্টাররা এলে তখন তো হামলেই পড়ে। সেই কারণে আমরা পারতপক্ষে চাইতাম না যে আমাদের অফিসে শিল্পীরা আসুক। তাতে আমাদের কাজের অসুবিধে হয়।

বিশ্বজিতের বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছালাম তখন দেখলাম ও ওর ছেলে প্রসেনজিতের সঙ্গে খেলা করছে। ওর নাম যে প্রসেনজিৎ তখন সেটা জানতাম না। আমরা জানতাম ওর নাম বুম্বা। ওটা ওর ডাকনাম। এখনও ফিল্ম লাইনের অনেকে ওকে ওই বুম্বা নামেই ডাকে। তবে এখন তো ওর গ্ল্যামার বেড়েছে, তাই একদা যারা ওকে বুম্বা বলে ডাকত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ খাতির করে বুম্বাদা বলেও ডাকে।

তা সেদিন ছেলের সঙ্গে বিশ্বজিতের খেলাটা ছিল অদ্ভুত ধরনের। বিশ্বজিৎ নিজেকে একটু দূরত্বে রেখে জোর গলায় ডাক দিচ্ছে—বুম্। সঙ্গে সঙ্গে প্রসেনজিৎ ছুটে এসে বাবার দুই হাতের চেটোর ওপর নিজের ছোট ছোট হাতের তালি দিতে দিতে বলে উঠছে—বা। বুম্বা নামটাকে পিতা-পুত্রে দুজনে ভাগ করে নিয়ে নামটার পরিপূর্ণতা দিচ্ছে।

ব্যাপারটা দেখে আমার বেশ ভালো লাগল। কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি যে এটা নিছক খেলা নয়, রিহার্সাল চলছে। সেটা জানতে পারলাম বিশ্বজিতের সঙ্গে কথা বলার পর।

আমাকে পেয়েই বিশ্বজিৎ ছেলের সঙ্গে খেলা থামিয়ে দিলে। বললে: এই যে রবিদা, তুমি এসে গেছো। বসো বসো। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

আমার গলার আওয়াজ পেয়ে রত্নাও ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল একমুখ হাসি নিয়ে। বোধহয় একটু আগেই স্নান করেছে। ওকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঠিক লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো।

আমি একটা চেয়ারে বসে বিশ্বজিৎকে বললাম: এত জরুরি তলব কী জন্যে বলো।

বিশ্বজিৎ বললে: এত তাড়াহুড়ো কিসের। ভালো করে জমিয়ে বসো। চা-টা খাও। তারপরে সব বলছি।

ওর এই রকম ক্যাজুয়াল ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম ডেকে পাঠানোর ব্যাপারটা বিপজ্জনক কোনও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নয়। হয়তো বম্বের কাজকর্ম সম্পর্কে নতুন কিছু জানাবে-টানাবে।

তারপরেই ভাবলাম তার জন্যে তো আমাদের বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি কলিন পালই আছেন। কলিনবাবু তো প্রতি মাসের ডেসপ্যাচে বিশ্বজিৎ সম্পর্কে সাতকাহন করে লেখেন। ছবিও পাঠান প্রচুর। মনে হয় প্রসাদদার সেই রকমই নির্দেশ আছে কলিন পালের ওপর। তাহলে আর আমাকে কী দরকার।

না, ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে। নিশ্চয় অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। নতুবা এই জরুরি তলব কেন? অনেক মাথা ঘামিয়েও কারণটা খুঁজে পাওয়া গেল না। বিশ্বজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, ও আমার দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসছে।

রত্না নিজে হাতে করে চা নিয়ে এল। সঙ্গে কিছু খাদ্যবস্তু। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে করতে বিশ্বজিৎকে বললাম : ডেকে পাঠানোর কারণটা এবারে বলো। না কি, এখনও আমাকে সাসপেন্সের মধ্যেই রাখবে।

বিশ্বজিৎ রত্নাকে বলল : ডেকে পাঠানোর কারণটা তুমিই বলো রবিদাকে। ব্যাপারটা তো তোমারই।

বিশ্বজিতের কথায় রত্না একটু লজ্জা পেল। বললে : না না, তুমিই বলো।

আমি পড়ে গেলাম আরও ফাঁপরে। এ কী রে বাবা। এ বলছে তুমি বলো, আর ও বলছে তুমি বলো। কী এমন কথা যা বলবার জন্যে এ ওর ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাচ্ছে!

বিশ্বজিৎ রত্নার দিকে তাকিয়ে বললে : অত লাজুক হলে চলবে কেন রত্না। আমার অ্যাবসেন্সে সব ব্যাপারটা তো তোমাকেই দেখতে হবে। সকলের সঙ্গে তোমাকেই কথা বলতে হবে। এখন থেকে সেটা সড়গড় করে নাও।

রত্না বললে : সে যখন তুমি থাকবে না তখন দেখা যাবে। এখন তুমি যখন আছ তখন বলার দায়িত্ব তোমার।

বিশ্বজিৎ বললে : বেশ, আমিই বলছি। রবিদা আমরা একটা ফিল্ম করতে যাচ্ছি।

আমি চমকে উঠে বললাম : তাই নাকি! এটা তো বেশ ভালো খবর। এর জন্যে এত সাসপেন্সের দরকার ছিল কী?

বিশ্বজিৎ বললে : ছবি কবাটা সাসপেন্স নয়। আসল সাসপেন্স যেটা সেটা একেবারে শেষে ক্লিয়ার করব।

আমি বললাম : কী জানি বাবা। তোমাদের কথার কোনও দিশে খুঁজে পাচ্ছি না। তা তুমি যে বললে, আমরা একটা ফিল্ম করতে যাচ্ছি, সেই আমরাটি কে কে? তুমি আর রত্না নিশ্চয়।

বিশ্বজিৎ বললে : না না, আমি নয়। আমি এই ছবির একজন অ্যাক্টর মাত্র। ছবির প্রযোজক তিনজন। রত্না, গৌরীদা আর নচিদা।

রত্না মানে বিশ্বজিতের গিন্নি রত্না চাটার্জি, গৌরীদা হলেন গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার আর নচিদা হলেন সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। গৌরীদা গান লেখেন আর নচিবাবু গানের সুর করেন। এঁরা হঠাৎ ছবির প্রযোজনায় নামছেন এটা একটা খবরের মতো খবর বৈকি। তা এই রকম একটা বিচিত্র কম্বিনেশন কী করে হল সেটাই আমার মাথায় আসছে না। তাই বিশ্বজিৎকে বললাম : এই রকম একটা যোগাযোগ ঘটল কী করে? আমি গৌরীদা আর নচিবাবুকে যতটা জানি তাতে তো ওঁরা গাঁটের টাকা খরচ করে ছবি প্রোডিউস করার মানুষ নন।

বিশ্বজিৎ বললে : টাকা খরচ ওঁরা করছেন না। টাকাটা আমার, মানে রত্নার। গৌরীদার গল্প আর চিত্রনাট্য। উনি তার জন্য কোনও টাকা নিচ্ছেন না। সেটাই ওঁর শেয়ার। আর নচিদাও মিউজিকের জন্যে টাকাটা ওঁর শেয়ার হিসেবে ইনভেস্ট করছেন। সেই জন্যেই আমাদের এই প্রোডাকশনের নাম দেওয়া হয়েছে ট্রায়ো ফিল্মস্।

আমি বললাম : ছবির নাম কী?

রত্না বললে : 'ছোট্ট-জিজ্ঞাসা'।

আমি বললাম : বাঃ, বেশ নাম। তা প্রোডিউসার হিসেবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি ম্যাডাম, বিশ্বজিৎ তো এখন হিন্দি ছবি নিয়ে খুবই ব্যস্ত। ওকে নায়ক করে কলকাতায় বসে বাংলা ছবি করা একটু রিস্কি হয়ে যাবে না? ডেট-টেট ঠিকমতো পাওয়া যাবে তো?

বিশ্বজিৎ বললে : আমি তো এই ছবির নায়ক নয় রবিদা?

আমি অবাক হয়ে বললাম : সে কী! তোমার টাকায় ছবি হচ্ছে, আর তুমি সে ছবির নায়ক নয়। তাহলে নায়কটি কে?

রত্না বললে : আমার ছেলে বুম্‌বা।

দারুণ চমকে উঠলাম রত্নার কথা শুনে। বললাম : এইটেই তাহলে তোমাদের সাসপেন্স! বুম্‌বার বয়েস তো বোধহয় চার কী পাঁচ। ওকে নায়ক করা মানে এটা একটা চিলড্রেন ফিল্ম।

বিশ্বজিৎ বললে · না। এটা অ্যাডাল্ট ফিল্ম। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের মিস অ্যাডজাস্টমেন্টের কাহিনী। কিন্তু তাদের ছেলে বুম্‌বাই এ ছবির কেন্দ্র-চরিত্র। গল্পের সিংহভাগ জুড়ে আছে সে।

আমি বললাম · খুব ভালো সাবজেক্ট। স্বামীটি তাহলে তুমি করছ। স্ত্রীটি কে?

বিশ্বজিৎ বললে : মাধবী মুখার্জি।

আমি বললাম : ডিরেক্টার কে?

বিশ্বজিৎ বললে : জগন্নাথ চ্যাটার্জি। জগন্নাথদাকে তুমি চেনো তো রবিদা?

আমি বললাম : খুব চিনি। সাউন্ড রেকর্ডিস্ট জগন্নাথ চ্যাটার্জি তো? সেই এম পি প্রোডাকসনের আমল থেকে ওঁর সঙ্গে আলাপ। বেশ ভালো মানুষ। কাজের মানুষ। এর আগে বিমল ভৌমিক আর নারায়ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে একত্রে একটা ইউনিট করে 'অয়নান্ত' ছবিটা করেছিলেন। ছবিটা আমার ভালো লেগেছিল। তবে এবারের সাবজেক্টটা আরও কঠিন। বুম্‌বার জন্যে তো ছবিটা করছো তোমরা। ওকে ঠিকমতো ট্যাকল্ না করতে পারলেই মুশকিল।

রত্না বলল : সেটা ঠিক কথা। তবে বুম্‌বার মধ্যে একটা আলাদা ব্যাপার আছে রবিদা। আমাদের এখানে তো প্রায়ই অনেক ফটোগ্রাফার আসেন বিশ্বজিতের ছবি তুলতে। তাঁরা বুম্‌বারও ছবি তোলেন। সেই সময় ও যে রকম সব পোজ দেয়, এক্সপ্রেশন দেয়, তা চমকে দেবার মতো।

আমি বললাম : সেই জন্যেই তোমরা ওকে নিয়ে ছবির কথা ভাবলে?

বিশ্বজিৎ বললে : আগে ভাবিনি। তবে গৌরীদার ওই গল্পটা শোনার পর ভেবেছি।

আমি বললাম : ও, তোমাদের আগে কোনও পরিকল্পনা ছিল না! তা হলে গৌরীদার কাছে হঠাৎ গল্প শুনতে গেলে কেন?

বিশ্বজিৎ বললে · গৌরীদা মাঝে মাঝে এসে আমাদের কাছে তাঁর লেখা গল্প শুনিয়ে যান। কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। এমনিই শোনাতেন। তা এবারের এই গল্পটা আমাদেব খুব পছন্দ হয়ে গেল। তখনই ইনসট্যান্ট ডিসিশন নিলাম, আমরা এটা ছবি করব। গৌরীদা বললেন, আমি কোনও টাকা পয়সা নেব না। আমাকে একটা শেয়ার দিস। নচিদাকে মিউজিক করবার জন্যে গল্পটা শোনানো হল। নচিদাও ওই একই প্রোপোজাল দিলেন। বাস্ ট্রায়ো ফিল্মসের জন্ম হয়ে গেল। পরবর্তীকালে অবশ্য গৌরীদা এবং নচিবাবু তাঁদের পারিশ্রমিকের টাকা নিয়ে শেয়ার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তা বিশ্বজিৎ ঠিক কথাই বলেছে। গান লেখা ছাড়াও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মাঝে মাঝেই গল্প লেখেন আর যাকে সামনে পান তাঁকে শোনান। আমিও এইভাবে দু-তিনবার গৌরীদার গল্প শুনেছি। দু-একটি গল্পের ছবিও হয়েছে গৌরীদার। সর্বপ্রথম বোধহয় ওঁর গল্প নিয়ে ছবি করেছিলেন ক্যামেরাম্যান-পরিচালক সন্তোষ গুহরায়। ছবিটার নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। ছবিটা চলেওনি ভালো।

কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি বিশ্বজিৎকে বললাম : এবার উঠি তাহলে। উইশ ইউ গুড লাক্। তোমাদের শুটিং শুরু হলে খবর দিও। ফটোগ্রাফার পাঠিয়ে দেব। 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'-র নিউজটা এই সংখ্যাতেই দিয়ে দিচ্ছি।

বিশ্বজিৎ বললে : এখনই উঠবে কী। আসল সাসপেন্সটাই তো এখনও বাকি।

আমি বললাম : আরও সাসপেন্স আছে। তাহলে সেটা চটপট ক্লিয়ার করে দাও।

বিশ্বজিতের ইঙ্গিতে রত্না উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেল। তা এর মধ্যে সাসপেন্সের কী আছে বোঝা গেল না। আমি ভাবলাম বোধহয় কিছু খাবারদাবার আনতে গেল। খাওয়ানোর ব্যাপারটা তো নতুন কিছু নয়। এ ব্যাপারে বিশ্বজিতের প্রচণ্ড সুনাম আছে। ওর বাড়িতে এলে তো খাওয়াতই। প্রতি বছর

অন্তত একবার করে সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায় কলকাতার কোনও বড় হোটেলে। গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে পান-ভোজনের মহোৎসব চলে।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে রত্না ঘর থেকে বেরিয়ে এল একগোছা নোট হাতে করে। এসে সেগুলো বিশ্বজিতের হাতে দিলে। বিশ্বজিৎ আমার হাতখানা টেনে নিয়ে নোটগুলো গুঁজে দিয়ে বললে : কিছু মনে করো না রবিদা, তোমাকে আমার ছবির পাবলিসিটির দায়িত্বটা নিতে হবে।

আমি হাতটা গুটিয়ে নিয়ে হাঁ হাঁ করে উঠলাম। বললাম : তার জন্যে টাকার দরকার কী? আমরা তো ভালোবাসার বিনিময়েই তোমার ছবির পাবলিসিটি করি আমাদের কাগজে।

বিশ্বজিৎ বললে : তা তো করোই। কিন্তু এবারে টোটাল পাবলিসিটির দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। একটা দারুণ ব্যাপার করতে হবে। আর টাকার কথা বলছো! আমি কি তোমাকে টাকা দিয়ে অসম্মান করতে পারি। এই পাঁচশোটা টাকা রাখতে বলছি তোমার গাড়িভাড়া বাবদ। তোমাকে তো অনেক ছোটাছুটি করতে হবে। এটা তোমাকে নিতেই হবে।

সেই ষাটের দশকে পাঁচশো টাকার দাম অনেক। অত টাকা গাড়ি ভাড়াতে লাগতেই পারে না। খুবই সঙ্কোচ হচ্ছিল টাকাটা নিতে। তবু বিশ্বজিতের পীড়াপীড়িতে টাকাটা নিতেই হল। মনে মনে লোভও যে হচ্ছিল না তাও নয়। পাঁচশো টাকা আমার এক মাসের মাইনের চেয়েও বেশি।

ঠিক সাত দিনের মধ্যে 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' ছবির প্রথম বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল খবরের কাগজে। ছয় ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি। পূর্ণেন্দু পত্রী অসাধারণ ডিজাইন করেছিলেন বুম্বার ছবি দিয়ে। পরে বিশ্বজিতের মুখে শুনেছিলাম বম্বেতে বসে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় দারুণ প্রশংসা করেছিলেন ওই বিজ্ঞাপনটার। হৃষীদা বিশ্বজিতের ওই ছবির এডিটার ছিলেন। পরে জগন্নাথ চ্যাটার্জির সঙ্গে মতান্তর হওয়াতে তিনি 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' ছবির পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। অসমাপ্ত ছবিটি শেষ করতে হয়েছিল হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়কে।

শেষ পর্যন্ত আমিও ওই ছবির পাবলিসিটির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবে সেটা মতান্তরের কারণে নয়। আমি পাবলিসিটির ব্যাপারে সময় দিতে পারছিলাম না কাজের চাপে। বিশ্বজিতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়নি কোনওদিন। তবে ইদানীং দেখাসাক্ষাৎ খুব কমই হয়। বছর খানেক আগে বম্বে গিয়ে জুহুতে ওর দক্ষিণামূর্তির নতুন ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। ওর দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে দেখা হল। তার মেয়েকেও দেখলাম। মনে হল ওরা সুখেই আছে।

হ্যাঁ, বিশ্বজিৎ এখন তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গেই বসবাস করছে। যতদূর জানি রত্নার সঙ্গে ওর কোন রকম ডিভোর্স হয়নি। তবে এই নতুন বিয়েটা সে মেনে নিয়েছে বলেই কোনও আইনগত ঝামেলা হয়নি। রত্না আছে তার ছেলে প্রসেনজিৎ আর মেয়ে পল্লবীকে নিয়ে বালিগঞ্জের গড়চার বাড়িতে।

বিশ্বজিতের সঙ্গে রত্নার এই বিচ্ছেদ কেন ঘটে গেল সেটা আমি জানি না। জানবার চেষ্টাও করিনি। নানা জনে নানা কথা বলে। আমি সেগুলো বিশ্বাস করি না। সিনেমার কাগজগুলোতে পিতা-পুত্রের মানসিক দ্বন্দ্বের ব্যাপারে নানা মুখরোচক খবর বেরোয়। আমার সে সব পড়তে ভালো লাগে না। আমি প্রাচীনপন্থী মানুষ। আমার মনে বিশ্বজিৎ আর বুম্বার সেই ছোটবেলাকার আদর সোহাগের দৃশ্যগুলি অক্ষয় হয়ে আছে। সেই মুহূর্তগুলিকেই আমি ধরে রাখতে চাই চিরকালের মতো।

তবে বিশ্বজিৎ রত্নাকে ছেড়ে চলে যাবার পর রত্না খুবই অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল। বুম্বা আর মাকু তখনও ছোট। মাকু হল রত্নার কন্যা পল্লবীর ডাকনাম।

রত্না ওদের সিনেমায় সুযোগ দেবার আবেদন নিয়ে দিনের পর দিন প্রযোজক আর পরিচালকদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথাও কিঞ্চিৎ সহানুভূতি পেয়েছে, আবার কোথাও বা উপেক্ষা। সেইসব উপেক্ষায় রত্না দমে যায়নি। দিনের পর দিন অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

সেইসব চেষ্টার ফল ফলেছে অনেকদিন পরে। প্রসেনজিৎ আজ বাংলা ছবির অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক। পল্লবী এখনও সেই জায়গায় পৌঁছতে পারেনি। তাই তার জন্যে রত্নার প্রচেষ্টার অন্ত নেই আজও। নানা রোগে শরীর অশক্ত, মনটা তো অনেকদিন আগেই ভেঙে গেছে। তবু এক ধরনের মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে রত্নার সংগ্রাম চলেছে আজও।

অথচ বিশ্বজিৎ আর রত্নার কী সুন্দর সুখের সংসার ছিল তখন। বিশ্বজিৎ একের পর এক হিন্দি আর বাংলা ছবিতে কাজ করছে। তরুণ মজুমদারের সঙ্গে একত্রে বাংলা 'পলাতক' ছবির হিন্দি ভার্সান 'রাহ্‌গীর' প্রযোজনা করেছে। বিশ্বজিৎ ভাবি সুন্দর অভিনয় করেছিল ওই ছবিতে। কেবল অভিনেতা হিসেবেই নয়, দানবীর হিসেবেও বিশ্বজিতের তখন দারুণ খ্যাতি। কলকাতা শহরে যাত্রীসাধারণের সুবিধার জন্য অনেকগুলি বাসস্ট্যান্ড তৈরি করে দিয়েছে বিশ্বজিৎ। বম্বেতেও তাই করেছে। রাজ্যপালের ত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করেছে। কলকাতার তখনকার মেয়র গোবিন্দ দে মশাই বন্যার্তদের জন্য যে ত্রাণ তহবিল গঠন করেছিলেন, তাতে টাকা তোলার জন্যে বিশ্বজিৎ বম্বে থেকে শিল্পীদের নিয়ে এসে কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান করিয়েছে। সাংসদ সুনীল দত্ত, গায়ক কিশোরকুমার প্রমুখ শিল্পীরা কেবলমাত্র বিশ্বজিতের অনুরোধে সেই অনুষ্ঠানে একটি পয়সাও না নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন।

সেই বিশ্বজিৎ অকস্মাৎ এমন বদলে গেল যে ভাবা যায় না। ওটা বোধহয় গ্রহের ফের। বিশ্বজিতের সঙ্গে শুধু রত্নারই নয়, আমাদেরও একটা দূরত্ব রচিত হয়ে গেল। এখনও দেখা হলে হাসিমুখে কথাবার্তা বলে। ওর বম্বেতে বাড়িতে গেলে আগের মতোই খাওয়ায় দাওয়ায়। আপ্যায়নের কসুর করে না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারি ওর মধ্যে আগের সেই উত্তাপ নেই। ওর হাতে হাত দিয়ে আগেকার সেই চাঞ্চল্য অনুভব করি না। এখন যা আছে সেটা নিছক ভদ্রতা। আগেকার সেই প্রাণের স্পর্শ নেই।

এটা নিয়ে দুঃখ করি না। দুঃখ হয় রত্নার জন্য। ক'দিন আগে রত্নার গড়চার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তার সেই সোনার বর্ণ এখন কালিমালিপ্ত। নানা রকম অসুখ তার শরীরে ভর করেছে। বুম্‌বাও এখন আর মায়ের কাছে থাকে না। চুম্‌কি অর্থাৎ দেবশ্রীকে বিয়ে করার পর আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে। এখন রত্নার যত চিন্তা পল্লবীকে নিয়ে।

কাগজে প্রসেনজিৎ আর দেবশ্রী রায়ের বিয়ের খবর পড়ে বিশ্বজিৎ রত্নাকে বম্বে থেকে টেলিফোনে বলেছিল : ওদের বিয়েটা আটকাতে পারলে না রত্না?

উত্তরে রত্না বলেছিল : তোমাকে কি আটকাতে পেরেছি যে ওকে আটকাবো।

আমার তো মনে হয় এখনও বিশ্বজিতের মনে রত্নার জন্যে বেশ খানিকটা জায়গা সংরক্ষিত আছে। আর রত্নার মনে তো বিশ্বজিতের জন্য পুরোটাই। সেটাই তো স্বাভাবিক। সাত পাকের বাঁধন কি এত সহজে কাটানো যায়?

মাঝে কিছুদিন চুপচাপ কাটাবার পর এখন বিশ্বজিৎ আবার কাজে মন দিয়েছে। ছবি প্রোডিউস করছে। ডিরেকশান দিচ্ছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি বাকি জীবনটা যেন ও এইভাবে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারে।

মহুয়া

এই তো ক'দিন আগে দূরদর্শনের পর্দায় 'সুবর্ণ গোলক' ছবিতে মহুয়া রায়চৌধুরীর অভিনয় দেখতে দেখতে মনটা হাহাকার করে উঠল। অমন ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটা অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। ওর কাছ থেকে বাংলা ছবির অনেক কিছু পাওয়ার ছিল। ঠিক যে সময়ে মহুয়ার অভিনয়ের মধ্যে পরিপক্কতা আসতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময়ে ওকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন মঙ্গলময়। কিন্তু মহুয়াকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তিনি কার কী মঙ্গল করলেন কে জানে।

কিন্তু মহুয়াকে নিয়ে লেখার আগে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার কিছু নিবেদন আছে। কেউ কেউ অনুযোগ করেন আমি নাকি শিল্পীদের সম্পর্কে লিখতে বসে ধান ভানতে শিবের গীত গাই। যাকে নিয়ে লিখি তার কথা বলতে বলতে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই। তার পাশাপাশি আরও অনেক চরিত্র আমদানি করে থাকি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঠিক কথা। যাঁরা অনুযোগ করেন তাঁরা সর্বাংশে ঠিক। কিন্তু তাঁরা এইসব রচনাগুলির স্পিরিটটা ঠিকমতো ধবতে পারেননি। 'স্মৃতির সরণি' পর্যায়ের এই রচনাগুলি মামুলি জীবনকাহিনী নয়। এটা একটা সময়ের দলিল। যাঁকে নিয়ে লিখি তাঁর পারিপার্শ্বিকটাকে ধরবার চেষ্টা করি। তিনি কতবড় অভিনেতা বা অভিনেত্রী তার বিচার-বিশ্লেষণে না গিয়ে আসল মানুষটাকে ধরবার চেষ্টা করি। তাঁর পাবিপার্শ্বিকের মানুষগুলি সেই কারণেই লেখার মধ্যে এসে যায়। আমিও এসে যাই। কারণ এটা তো আমাবই স্মৃতির সরণিতে বিচরণ। তাই আমাকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। এই তো মহুয়াকে নিয়ে লিখতে বসেছি, সেখানেও আমাকে তো আসতেই হবে। কারণ আমাকে নিয়ে মহুয়া সেদিন যে কাণ্ডটা করেছিল, তাতে তো আমার প্রাণ সংশয় হবার যোগাড় হয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে পনেরো-ষোলো বছর আগে। মহুয়া বোলপুবে গিয়েছিল নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের ছবি 'আজ কাল পরশুর গল্প'-র আউটডোরে। আমিও গিয়েছিলাম। ছবির বেশিরভাগ শুটিং হয়েছিল শান্তিনিকেতন থেকে দু-তিন কিলোমিটার দূরে, গোয়ালপাড়া গ্রামে।

সেদিন গোয়ালপাড়ার সেই নিম্ন মধ্যবিত্ত পাড়াটায় আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সূর্যদেব পশ্চিমগগনে ঢলতে শুরু করেছেন। আমাকে দেখেই মহুয়া চিৎকার করে উঠল : এ মা রবিদা, তুমি এতক্ষণে এলে। একটু আগেই তো তোমার ছেলের বিয়ে হয়ে গেল। আমরা তোমাকে কত খোঁজাখুঁজি করলাম।

মহুয়ার কথায় আমি একটুও চমকে উঠলাম না। ও একটা রসের খনি। যখন-তখন যা-তা রসিকতা করতে পারে। অবশ্য মুডটা ভালো থাকলে। ছেলে তো ছেলে, ও আমার বাবারও বিয়ে দিয়ে দিতে পারে অনায়াসে। তাই ওর কথা শুনে সারা মুখে একটা কপট গাম্ভীর্য এনে বললাম : এই মউ, কী হচ্ছে কী! বড়দের সঙ্গে ওইরকম ইয়ার্কি দিতে লজ্জা করে না।

মহুয়া চোখ দুটো বড় বড় করে বললে : না রবিদা, এটা মোটেই ইয়ার্কির কথা নয়। একটু আগেই তোমার ছেলের বিয়ে হয়ে গেল এই মেয়েটির সঙ্গে।

এই বলে মহুয়া তার পাশে বসে থাকা বছর বারো-তেরোর একটি লাজুক-লাজুক মেয়েকে দেখিয়ে দিলে। তার পরনে লাল চেলি। কপালে চন্দনের ফোঁটা।

এরপর মহুয়া কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এনে একজন পাকা শাশুড়ির মতো মেয়েটিকে হুকুম করলে : যাও তো মা, তোমার শ্বশুরকে প্রণাম করে এসো। মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার দু পায়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকাল। তাই দেখে আমি এবারে সত্যি সত্যি হকচকিয়ে গেলাম। তবে কি সত্যিই আমার অবর্তমানে আমার পুত্রের বিবাহ নামক অঘটনটি ঘটে গেছে! মহুয়া যা বলছে তা কি সত্যি?

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ভেসে উঠল নব্যেন্দুর চেহারাটা। নব্যেন্দু মানে, চিত্রপরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়। আমার ছেলে অশোক বসু তখনও সাংবাদিক হয়নি। সে নব্যেন্দুর সঙ্গে এই ছবিতে অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করছে। আমার সঙ্গে নব্যেন্দুর যা হৃদ্যতার সম্পর্ক, আর অশোককে সে যেভাবে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসে, তাতে আমার মতামতের তোয়াক্কা না করেই সে অনায়াসে অশোকের বিয়ে দিয়ে দিতে পারে। সে অধিকার তার আছে।

এটাই নব্যেন্দুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে হুট-হাট দুম-দাম যা খুশি তাই করে ফেলতে পারে। ও রাস্তা থেকে যাকে খুশি তাকে ধরে এনে তার ছবির নায়ক কিংবা নায়িকা বানিয়ে দিতে পারে। এমন তো হয়েছেও কতবার। শ্রীলেখা মুখার্জি গানের জগতের মানুষ। অভিনয়ের সঙ্গে তার কোনওদিন কোনও সম্পর্ক ছিল না। নব্যেন্দু তার 'পরশুরামের কুঠার' ছবিতে তাকে নায়িকা বানিয়ে দিলে। সে বছরের ন্যাশানাল অ্যাওয়ার্ডে ভারতের শ্রেষ্ঠ নায়িকার সম্মান পেয়ে গেল শ্রীলেখা। নন্দিনী মালিয়ার ছোট বোন নীরা মালিয়া কোনওদিন অভিনয় করেনি। নব্যেন্দু তার 'রানুর প্রথম ভাগ' ছবিতে রানুর চরিত্রে নীরাকে দিয়ে এমন অসাধারণ অভিনয় করিয়ে নিলে যে সে বছর রানু শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী হিসেবে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়ে গেল। সর্বেন্দ্রর গা থেকে নতুনের গন্ধ যায়নি। নব্যেন্দু তাকে তার 'অদ্বিতীয়া' ছবির নায়ক হিসেবে মাধবী মুখার্জির বিপরীতে দারুণ অভিনয় করিয়ে নিলে কারও বাধা-নিষেধ না শুনে। এমনি আরও কত কাণ্ড যে করে ফেলে নব্যেন্দু, তার হিসেব-নিকেশ নেই।

এই তো এবারেরও সেরকম কাণ্ডকারখানা ঘটছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'আজ কাল পরশুর গল্প'-র ঘটনাকাল বাংলা পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়কার। সে সময়ে সাধারণ মানুষ লম্বা ঝুলপি রাখত না। নব্যেন্দু তার ছবির প্রয়োজনে শিল্পীদের সবাইকার ঝুলপি কেটে ছোট করে দিয়েছে। রাস্তা থেকে লোকজন ধরে ধরে শুটিং করানো নব্যেন্দুর স্বভাব। একজন হোলটাইমের নাপিত বরাদ্দ করা হয়েছে। সকাল থেকে তার কাজই হল ক্ষুর দিয়ে লোকজনের ঝুলপি চেঁছে দেওয়া। শুটিং পার্টির দুপুরের খাবার আসে দাসবাবুর বোলপুর ট্যুরিস্ট সেন্টার থেকে। সেখানকার কাজের লোকজন কিছুতেই দুপুরের খাবার নিয়ে আসতে রাজি নয়। বলে : উখানে যেছে তারই ঝুলপি চেছে দিতেছে। মোরা যাব নাই।

আমার অবশ্য ঝুলপি যাবার ভয় নেই। কারণ আমি এই ছবির শিল্পী নই। পর্দার নেপথ্যে আমার যৎকিঞ্চিৎ ভূমিকা আছে। সেইজন্যেই নব্যেন্দুদের সঙ্গে লোকেশনে আসা। আমি কোন রকমে দাসবাবুর লোকজনদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লোকশনে খাবার নিয়ে যেতে রাজি করালাম। তবে কথা দিতে হল, ওদের যদি কোনও কারণে ঝুলপি-নিধন ঘটে তাহলে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সে ক্ষতিপূরণ ওরা চাইতেই পারে। ওরা অনেক শখ করে হিন্দি ছবির সুপার-নায়ক অমিতাভ বচ্চনের অনুকরণে ঝুলপি রেখেছে। সে ঝুলপি কাটা গেলে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

নব্যেন্দু এইসব পিরিয়ডিক্যাল ব্যাপারে খুবই খুঁতখুতে। ঠিক এই কারণেই মহুয়া রায়চৌধুরী বাদ পড়ে যাচ্ছিল 'আজ কাল পরশুর গল্প'র নায়িকার ভূমিকা থেকে। নব্যেন্দুর নিষেধ সত্ত্বেও মহুয়া তার ভুরু প্লাক্ করে ফেলেছিল। শুটিংয়ের দু'তিন দিন আগে মহুয়ার ভুরুর এই অবস্থা দেখে নব্যেন্দু তো ক্রোধে অগ্নিশর্মা। বললে : আমার ছবিতে ভুরু প্লাক করা নায়িকা চলবে না। মহুয়ার জায়গায় আমি অন্য নায়িকা নেব।

আমরা যারা নব্যেন্দুর ঘনিষ্ঠ তারা নব্যেন্দুর এই সিদ্ধান্তে প্রমাদ গণলাম। মহুয়া একজন পোটেনশিয়াল আর্টিস্ট। এইরকম একটা কারণে ছবি থেকে সে বাদ চলে যাক, এটা আমরা চাইছিলাম না। এমনিতে তো নায়ক রামপদর চরিত্রে মিসকাস্ট করা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। ওই চরিত্রে অভিনয় করছেন নিরঞ্জন রায়। অভিনেতা হিসেবে নিরঞ্জনবাবু ভালো। খুবই ভালো। কিন্তু ১৯৪২-৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাংলার চাষী হিসেবে তিনি বেমানান। ওঁর সিলেকশনে আমরা মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলাম। কিন্তু নব্যেন্দু তার সিদ্ধান্তে অনড়।

তাই 'আজ কাল পরশুর গল্প' ছবি থেকে মহুয়াকে বাদ দেবার প্রস্তাবে আমি শঙ্কিত হয়েছিলাম। নব্যেন্দুকে বোঝানোর চেষ্টা করে বলেছিলাম : মহুয়া তোমার এবং তোমার ছবির স্পিরিটটাকে বুঝতে পারেনি। ও এ ছবিটাকে টালিগঞ্জের আর পাঁচটা ছবির মতোই মনে করেছে। আমার মনে হয়, ওকে

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে ও এ ধরনের কাজ আর করবে না।

নব্যেন্দু বললে : কিন্তু আমি এখন কী করব! আজ বাদে কাল শুটিং। আর আমার ছবির চাষীবউ মুক্তোর ভুরু প্লাক্ করা। এটা তো আমি ভাবতেও পারছি না।

আমি বললাম : এক কাজ করো না। শুটিংটা দিন দশ-পনেরো পিছিয়ে দাও। ততদিনে নিশ্চয় মহুয়ার ভুরুতে চুল গজিয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত নব্যেন্দু তাই করেছিল। তবে আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, ও ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই কাজটা করেছিল।

এই ঘটনাটা ঘটার পর মহুয়া সত্যিই বেশ লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। সামান্য একটা ভুরু প্লাক করার ফলে ছবির যে কতটা ক্ষতি হতে পারে সেটা মহুয়া উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এর পর থেকে মহুয়া 'আজ কাল পরশুর গল্প' ছবিটাকে রীতিমতো সিরিয়াসলি নিয়েছিল। অর্থের অস্বচ্ছলতার দরুন প্রায় দু'বছর ধরে খেপে খেপে ছবিটার শুটিং হয়েছিল। আর এই দু'বছরের মধ্যে মহুয়া একদিনের জন্যেও ভুরু প্লাক করেনি। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে যখন স্টুডিওতে দেখা হত, তখন মহুয়া ওর ভুরু দুটো দেখিয়ে বলতো : এই দেখুন রবিদা, আমি আর একদম ভুরু প্লাক করিনি। নব্যেন্দুদার সঙ্গে তো আপনাব দেখা হবে। কথাটা তাঁকে বলবেন।

বস্তুতপক্ষে এই সিরিয়াসনেশের ব্যাপারটা তখন থেকেই মহুয়ার ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে। তার আগেও যে সে সিরিয়াস ছিল না এমন কথা বলা যাবে না। নইলে পরিচালক শঙ্কর ভট্টাচার্যের 'দৌড়' ছবিতে একটি প্রতিবন্ধী চরিত্রে অমন সুন্দর অভিনয় করতে পারত না। কিংবা 'শেষরক্ষা' ছবিতে ইন্দুমতীর চবিত্রে। ওতে অভিনয় করেই তো মহুয়া বি এফ জে এ-র পুরস্কার পেয়েছিল। ওর বয়সী অভিনেত্রীদের পক্ষে সেটা একটা বিরল সম্মান। কিন্তু 'আজ কাল পরশুর গল্প'র পর থেকে ওর মধ্যে একটা অন্য ধরনের মানসিকতা কাজ করতে দেখেছি। যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল পরিচালক তপন সিংহের 'আদমী ঔর আওরত' ছবিতে। ওই ছবিতে কী অসাধারণ সাইলেন্ট অ্যাকটিং মহুয়ার, তাও কিনা অমল পালেকারের মতো ঝানু শিল্পীর বিপরীতে। তপনবাবু মহুয়ার কাছ থেকে অভিনয়টা যেন নিংড়ে আদায় করে নিয়েছিলেন। সেই ট্যালেন্ট মহুযার ভিতরে ছিল।

এখন চলুন আবার আমরা ফিরে যাই আমার পুত্রের বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনার কথায়। রসময়ী মহুয়ার সে এক নিদারুণ রসিকতা। তার আগে ছোট্ট আর একটা ঘটনার কথা বলে নিই। তাতে মহুয়ার রসিক মনের আর একটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

একদিন সকালে লোকেশনে গিয়ে দেখি পুরোদমে ঝুলপিনিধন পর্ব চলছে। সেই সঙ্গে মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। একসঙ্গে জনা চারেক সার দিয়ে বসে আছে, আর নরসুন্দর মশাই ক্ষিপ্র হাতে তাঁর কাজ করে চলেছেন।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে মহুয়া হাঁ করে সেই দৃশ্য দেখছে। তার মেক-আপ নেওয়া সারা হয়ে গেছে। সেই অর্থে তো মেক আপ বলতে নব্যেন্দুর ছবিতে কিছু থাকে না। মুখে রঙ-টঙ মাখা নিষিদ্ধ। শুধু চাষীবউয়ের মতো করে শাড়িটা পরে নিয়েছে, আর মাথার চুলটাকে একটু উস্কোখুস্কো করে নিয়েছে।

আমি লোকেশনে গিয়ে পৌঁছতেই মহুয়া আমাকে দেখে ফিক করে হেসে ফেললে। আমি অবাক হয়ে বললাম : সাত সকালে এত হাসবার কী আছে?

মহুয়া বললে : বা রে! এতবড় একটা হাসির ব্যাপার হচ্ছে, আর হাসব না।

আমি বললাম : এটা মোটেই হাসির ব্যাপার নয়। সিরিয়াস ছবির ক্ষেত্রে এমন বহু কিছু করতে হয়।

মহুয়া বললে : না না, আমি সে ব্যাপারে কিছু বলছি না। আমি হাসছি নব্যেন্দুদার উল্টোপাল্টা কাণ্ড দেখে।

আমি বললাম : নব্যেন্দু আবার কখন কী উল্টোপাল্টা কাণ্ড করল?

মহুয়া বললে : উল্টোপাল্টা ব্যাপার নয়? আমার ভুরুর চুল তুলে ফেলেছিলাম বলে নব্যেন্দুদা আমাকে ছবি থেকে বাদ দিতে চাইছিল। আর এদের চুল আছে বলে এরা শাস্তি পাচ্ছে। এক যাত্রায় কীরকম পৃথক ফল দেখো।

আমি বললাম : ওরে বদমাইশ মেয়ে। সেই জন্যে তখন থেকে ফিক ফিক করে হাসা হচ্ছে।

এমনিধারা ছিল মহুয়ার রসিকতার ধরন। নব্যেন্দু যে ওকে ছবি থেকে বাদ দিতে যাচ্ছিল সেটা ওর মনে খুব লেগেছিল। ওই নিয়ে হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে ও মনের ঝাল মেটাত। কথা নেই বার্তা নেই মাঝে মাঝে আমাকে ওর ভুরু দুটো দেখাত আর বলত : এই দেখো রবিদা, আমি একদম ভুরু প্লাক করছি না। রিপোর্টটা নব্যেন্দুদাকে দিয়ে দিও কিন্তু।

'আজ কাল পরশুর গল্প'-র শুটিং-এ এক ভদ্রলোক কিন্তু চুল আর ঝুলপির ব্যাপারটা চমৎকারভাবে ম্যানেজ করেছিলেন। তিনি হলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। অজিতেশবাবু এই ছবিতে এক জোতদার ভিলেনের রোলে দুর্ধর্ষ অভিনয় করেছিলেন। অজিতেশবাবুর ছিল একমাথা ঘন কোঁকড়া চুল। কিন্তু শুটিংয়ে আসবার আগে কলকাতায় বসেই তিনি তাঁর চুলগুলি ছোট ছোট অথচ মানানসই করে ছেঁটে নিয়েছিলেন। আর বড় ঝুলপি তো উনি কোনওদিনই রাখতেন না। অজিতেশবাবু আবার তাঁর চুলগুলিকে ব্যাকব্রাশ করার বদলে সামনের দিকে টেনে আঁচড়ে নিয়েছিলেন। ফলে ওঁর চুলের একটা আলাদা প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যেটা ওই পুং চরিত্রের সঙ্গে খুবই মানানসই।

সেবার শুটিং কবতে বোলপুর ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছে অজিতেশবাবু প্রথমেই নব্যেন্দুর খোঁজ করেছিলেন। দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন : আমার চুলটা ঠিক আছে তো নব্যেন্দুবাবু?

নব্যেন্দু বেশ খানিকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অজিতেশবাবুর চুল পর্যবেক্ষণ করে শেষ পর্যন্ত বলেছিল : নাঃ, কোথাও তো কোনও খুঁত রাখেননি দেখছি।

নব্যেন্দু এবং অজিতেশবাবু উভয়েরই ব্যক্তিগত জীবনে উভয়ের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। কিন্তু সেসব আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। এখন আমরা আবার মহুয়ার প্রসঙ্গেই ফিরে যাই গোয়ালপাড়ার লোকেশনে, যেখানে আমার পুত্রবধূ আমার পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে আশীর্বাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

মহুয়ার হুকুমে কপালে চন্দনের ফোঁটা আর লাল চেলি পরা লাজুক মেয়েটি যখন আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, তখন আমার পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দুলতে শুরু করেছে আমার চোখের সামনে। এ কী হল! অশোকের মা আর তার ভাই-বোনেদের কাছে আমি কী জবাব দেব? আত্মীয়স্বজনের কাছেই বা কী কৈফিয়ৎ দেবার আছে আমার?

ছেলেপুলের বিয়ের ব্যাপারে আমার কোনও ছুঁৎমার্গী ব্যাপার নেই। সবর্ণ অথবা অসবর্ণ কোনও বিয়েতেই আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সব ব্যাপারেই তো একটা সামঞ্জস্য থাকবে। বনের ফুল বনেই সুন্দর। তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফুলদানিতে রাখলে তার সৌন্দর্য তো দু'দিনেই ঝরে যাবে। গ্রামের চাষী পরিবারের একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে যেমন মানিয়ে চলতে পারবে না, আমরাও তো তেমনি পারব না। প্রেম করে বিয়ে হলেও না হয় একটা কথা ছিল। এ যে হুট বলতে 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে'। এর পরিণতি তো ভালো হতে পারে না। এটা নব্যেন্দু কী করল?

আশেপাশে তাকিয়ে নব্যেন্দুকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। অশোককে দেখলাম দূরে একটা গাছের নীচে এই ছবির ক্যামেরাম্যান রেজা সাহেব আর তাঁর সহকারী কেষ্টবাবুর সঙ্গে কথা বলছে। তার পরনে তখনও বরবেশ।

মহুয়ার মুখের দিকে ভালো করে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে দেখলাম। তার মুখে রসিকতার চিহ্নমাত্র নেই। হঠাৎ আমার গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে উঠল। মহুয়ার দিকে তাকিয়ে কোনও মতে উচ্চারণ করলাম : এক গ্লাস জল।

আমার কথা শুনে মহুয়া তটস্থ হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে লাল চেলি পরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল : যাও তো মা, তোমার শ্বশুরের জন্যে এক গ্লাস জল নিয়ে এসো।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করতে ছুটল। আর আমি অবসন্নের মতো সেখানেই মাটির ওপর ধপ করে বসে পড়লাম।

আমাকে ওইভাবে বসে পড়তে দেখে মহুয়া আমার কাছে দৌড়ে এল। উদ্বেগভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল : কী হল রবিদা, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

আমি মহুয়ার কথার কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ইতিমধ্যে চেলি পরা মেয়েটি ঝকঝকে একটি কাঁসার গ্লাসে জল নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। তার হাত থেকে গ্লাসটা নিতে নিতে আর একবার তার মুখের দিকে ভালো করে দৃষ্টিপাত করলাম। দেখলাম, তার চোখ দুটো হাসছে।

হঠাৎ মহুয়া হো হো করে হাসতে শুরু করল। সে কী হাসি! যেন আর থামতেই চায় না। আমি অবাক হয়ে বললাম : কী ব্যাপার মউ, হঠাৎ এত হাসি কিসের?

মহুয়া তখন চিৎকার করতে শুরু করেছে : ও নব্যেন্দুদা, ও টিটোদা, তোমরা সব দেখে যাও, আমার একটুখানি অ্যাকটিং-এর ঠ্যালায় তোমাদের আনন্দবাজারের ফিল্ম ক্রিটিক কেমন কুপোকাত।

এই বলে আবার তার সেই আকাশ ফাটানো হাসি।

টিটোদা বলে যাঁকে ডাকা হল তিনি হলেন অভিনেতা দীপংকর দে। দীপংকরবাবু এই ছবিতে রাজনীতিসচেতন একটি ভালো চরিত্রে অভিনয় করছেন। কিন্তু মহুয়ার ডাকে দীপংকরবাবু অথবা নব্যেন্দু কেউই ছুটে এল না। তার বদলে প্রোডাকসন ডিপার্টমেন্টের সতীশ আর কার্তিক ছুটে এল। সতীশ বলল : কী হল? এত চ্যাঁচাচ্ছ কেন মহুয়াদি?

মহুয়া হাসতে হাসতে বললে : চ্যাঁচাব না! এই দেখ না, ছেলের বিয়ে হয়েছে শুনে রবিদা কেমন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

কার্তিক বললে : সে তো শুটিং-এর বিয়ে। নব্যেন্দুদার ঠাৎ খেয়াল হল রাস্তা দিয়ে বর-বউ বিয়ের পর হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে তেমন একটা শট্ নেবেন। তা হাতের কাছে ওই বয়সের আর কাউকে না পেয়ে পাশের বাড়ির একটা মেয়েকে ডাকিয়ে এনে কনে সাজিয়ে আর রবিবাবুর ছেলেকে বর বানিয়ে শটটা নিয়েছেন।

ও হরি! শুটিং-এর বিয়ে! কথাটা শুনে আমার ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। মহুয়ার দিকে তাকিয়ে বললাম : এটা কী হল মউ! বুড়ো মানুষের সঙ্গে এই ধরনের রসিকতা করতে তোমার বিবেকে একটু বাধল না?

মহুয়া সঙ্গে সঙ্গে জিভ ভেঙিয়ে আমাকে উত্তর দিলে : আর বুড়ো মানুষ যখন কথায় কথায় আমাকে বলে, মউ তোমার অ্যাকটিংটা বড় একঘেয়ে, তার মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায় না, তার বেলা? তাই তো একটু অ্যাকটিং করে দেখিয়ে দিলাম। এখন তো স্বীকার করবে যে আমি অ্যাকটিং করতে জানি?

আমি বললাম : মোটেই জানো না। এটা খুব ব্যাড অ্যাকটিং। জানো, এর ফলে আমার হার্টফেল করতে পারত।

মহুয়া হাসতে হাসতে বললে : তা হলে তো ভালোই হত। নব্যেন্দুদার সব ছবিতেই একটা করে ডেড বডির শট্ থাকে। এ ছবিটাতে না হয় একজোড়া থাকত।

আমি বললাম : ওরে পাজি মেয়ে! আমাকে বোকা বানিয়ে তারপর আবার মরণ কামনা করা হচ্ছে।

এই বলে কপট রাগে মহুয়াকে মারবার জন্যে ডান হাতটা উঁচিয়ে তেড়ে গেলাম।

মহুয়া আমার নাগাল এড়াবার জন্যে খিল খিল করে হাসতে হাসতে বন্য হরিণীর মতো ছুটে পালাল।

সেই রসবতী মেয়েটি এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। ঈশ্বর তাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। ভাবলেই বুকের ভেতরটা তীব্র বেদনায় টন টন করে ওঠে।

মহুয়া রায়চৌধুরির চরিত্রের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। সেখানে কখনও মেঘ, আবার কখনও রৌদ্র। এই দেখা গেল সকলের সঙ্গে হাসছে খেলছে, নানারকম রসিকতা করছে। পরমুহূর্তেই দেখা গেল দারুণ রকম গম্ভীর। কারও সঙ্গে কথা বলছে না। কেউ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিচ্ছে না। দেখে মনে হত সেই মুহূর্তে ওর পার্থিব শরীরটাই এখানে পড়ে আছে। মনটা উধাও হয়ে গেছে অন্য কোথাও।

একটা ঘটনার কথা বলি। এটা মহুয়া মারা যাবার মাস তিন-চারেক আগেকার ঘটনা।

একদিন সকালে একটা প্রয়োজনে অভিনেতা সুখেন দাসের হাজরা রোডের বাড়িতে গেছি। সুখেন তখন তৈরি হয়ে শুটিং-এ বেরোচ্ছিল। তাই দেখে আমি বললাম : আমি তবে আজ চলে যাই। পরে একদিন এসে কথাবার্তা বলব।

সুখেন বললে : তা কেন! আমি না হয় একটু দেরি করেই স্টুডিওতে যাব। আপনার সঙ্গে আধ ঘণ্টাটাক কথা বলতে পারব।

আমি বললাম : তাতে হবে না রে। আমার যা কথাবার্তা তাতে অন্তত ঘণ্টা তিন-চারেক তো লাগবেই। হুড়োতাড়া করে সে সব কথা হয় না। ঠাণ্ডা মাথায় বসতে হবে।

সুখেন বললে : তাহলে তো মুশকিল হল। আজ তাহলে আর বসা গেল না। আমাব খুব খারাপ লাগছে। আপনি সেই বেলঘরিয়া থেকে এতদূর এলেন, অথচ কোনও কাজ হল না।

আমি বললাম · তাতে কী হয়েছে। আবার একদিন আসা যাবে না হয়। তুমি একটু ডায়রিটা দেখে বল দেখি নেক্সট উইকে কবে ফ্রি আছ।

সুখেন বললে : ডায়রি দেখতে হবে না রবিদা। এখন আমার প্রতিদিনই কাজ। হয় নিজের ছবির, না হয় অন্যের ছবির। আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না?

আমি বললাম : কী?

সুখেন বললে : আপনি আমার সঙ্গে স্টুডিওতে চলুন না কেন! সারাদিন আমার সঙ্গে থাকবেন। আমার সঙ্গেই খাবেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে কথা হবে।

আমি বললাম : সেটা মন্দ নয়। পুরো একটা দিন পেলে আমার কাজটা অনেক এগিয়ে যাবে। তা কার ছবির শুটিং আছে আজ?

সুখেন বললে : সুজিতের। সুজিত গুহ। ছবির নাম 'অভিমান'।

আমি বললাম : বিনা আমন্ত্রণে সুজিতবাবুর সেটে যাব। তিনি যদি কিছু মনে করেন?

সুখেন বললে : না না, সুজিত সেরকম ছেলেই নয়। খুব ভদ্র। আমারই তো অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। আমি ওকে ভালো করে চিনি। তাছাড়া আপনি তো আমার গেস্ট হয়ে যাচ্ছেন। আপনার লজ্জা কী। সুজিতের সঙ্গে আপনার আলাপ নেই রবিদা?

আমি বললাম : সে রকম আলাপ নেই। তুমি একদিন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে। ব্যস সেইটুকুই। তা আজকের শুটিং-এ আর কে কে আছে?

সুখেন বললে : মহুয়া আছে, রঞ্জিৎ মল্লিক আছে। আর কে কে আছে জানি না।

আমি বললাম : চল যাওয়া যাক তাহলে। মউয়ের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। আজ দেখা হয়ে যাবে।

সুখেন বললে : মহুয়ার এখন কী ডিমান্ড! প্রথম ছবি করল তনুদার শ্রীমান 'পৃথ্বীরাজ'-এ। অথচ ওর প্রথম কাজ করার কথা আমার ছবিতেই।

আমি বললাম : তাই নাকি! এটা তো আমি জানতাম না। তা করল না কেন মহুয়া তোমার ছবিতে?

সুখেন বললে : সে অনেক কথা। চলুন গাড়িতে যেতে যেতে বলব। নইলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

গাড়িতে বসে সুখেনকে আমি সেই প্রশ্নটাই আবার করলাম। বললাম : এবারে বল তোমার ছবিতে মহুয়ার কাজ করা হল না কেন?

সুখেন বললে : তখন তো ওর নাম মহুয়া ছিল না। ওর আসল নাম শিপ্রা। খুব ছোটবেলা থেকেই ও ফাংশানে নাচত সোনালী নাম দিয়ে। সেই সময়ে একটা ফাংশানে ওকে দেখে খুব ভালো লাগল। আমার তখন দুটো ছবি রিলিজ করে গেছে। 'পান্না হীরে চুনি' আর 'অচেনা অতিথি'। প্রথমটা সুপার হিট, দ্বিতীয়টাও হিট। থার্ড ছবি 'নয়া মিছিল'-এর জন্যে নতুন হিরোইন খুঁজছিলাম। তা সোনালীকে দেখে মনে হল একে আমার ছবির নায়িকা করা চলে। আমি ওর বাবা নীলাঞ্জনবাবুর সঙ্গে কথা বললাম। সোনালীকে সিনেমায় নামার প্রোপোজাল দিলাম। ওর বাবা রাজিও হলেন।

আমি বললাম : তাহলে আটকাল কোথায়?

সুখেন বললে : আমার ছবির ডিরেক্টারের পছন্দ হল না ওকে।

আমি বললাম : তোমার 'নয়া-মিছিল' ছবির ডিরেক্টার তো পীযূষ গাঙ্গুলি ছিলেন। তাই না?

সুখেন বললে : হ্যাঁ। পীযূষদা অনেকক্ষণ ধরে মহুয়াকে দেখলেন। ওর সঙ্গে কথাও বললেন। তারপর আমাকে বললেন, না, ওকে দিয়ে চলবে না। এত রোগা মেয়েকে দিয়ে এই রোল হবে না। তাছাড়া নায়িকার চেহারায় যে ব্যক্তিত্ব আমি চাইছি, সেটা ওর মধ্যে নেই।

আমি বললাম : হ্যাঁ, তখন মহুয়া বেশ রোগা ছিল বটে।

সুখেন বললে : রোগা হলেও ওর মুখটা তো খুব সুন্দর ছিল। আমার তো বেশ পছন্দই হয়েছিল। কিন্তু ডিরেক্টারের ওপরে তো কোনও কথা বলতে পারি না। ছবি যদি ফ্লপ করে তাহলে পীযূষদা হয়ত বলবে, তোমার পছন্দসই নায়িকা নিতে গিয়ে ছবি মার খেল।

আমি বললাম : কিন্তু তোমার 'নয়া-মিছিল' ছবিটা তো তেমন পয়সা দেয়নি বলেই মনে হয়।

সুখেন বললে : একেবারে সুপার ফ্লপ নয়, তবে ফ্লপই। কে জানে মহুয়া আমার ছবিতে থাকলে ছবিটা হিট্ করত কি না। তবে পরে যখন তনুদার 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' দেখে সবাই মহুয়ার খুব প্রশংসা করেছিল তখন আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল।

আমি বললাম : হ্যাঁ, ওকে প্রথম ছবিতে চান্স দেবার ক্রেডিটটা তোমরা নিতে পারতে।

সুখেন বললে : না রবিদা, তোমাদের সকলের ধারণা তনুদার 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবিতেই মহুয়ার প্রথম আসা। সেটা ঠিক নয়। এর আগে আর একটা ছবিতে ও কাজ করেছিল। চার কী পাঁচ দিন শুটিংও করেছিল। তারপরে ছবিটার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ও ছবিটা যদি কমপ্লিট হত আর রিলিজ করত, তবে সেটাই হত মহুয়ার প্রথম ছবি।

আমি বললাম : তাই নাকি! কী নাম ছিল সে ছবিটার?

সুখেন বললে : তা বলতে পারব না। আমি মহুয়ার বাবা নীলাঞ্জনবাবুর মুখ থেকে ঘটনাটা শুনেছিলাম। আমাদের এখানে কত এলেবেলে ছবিই তো হচ্ছে। দু-চারদিন কাজ হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তেমনি কোনও একটা ছবিতে মহুয়া কাজ করতে এসেছিল।

আমি বললাম : তা তুমি যখন ছবি পরিচালনা করতে লাগলে তখন তোমার প্রথম দিকের কোনও ছবিতে মহুয়াকে নিলে না কেন? তাহলে তো তোমার আগের ভুলের কিছুটা সংশোধন হয়ে যেত।

সুখেন বললে : পরিচালক হিসেবে সে ইচ্ছেটা যে আমার বার বার হয়েছে সে কথাটা অস্বীকার করব না। কিন্তু আমি তো শুধু পরিচালক নই, একজন শিল্পীও বটে। আমার ওই শিল্পীসত্তাটাই বাধা দিয়েছিল মহুয়ার কাছে অ্যাপ্রোচ করতে।

আমি বললাম : কেন?

সুখেন বললে : যারা একবার মহুয়াকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের ছবিতে মহুয়া কাজ করতে আসুক সেটা আমি চাইনি। আমি নিজে হলে যা করতাম, মহুয়ার ক্ষেত্রে সেটাই ভেবেছি।

আমি বললাম : ও কথা বলছ কেন? তোমরা তো আর তাকে অপমান করনি। তোমাদের ছবিতে স্যুট করেনি তাই তাকে নাওনি। এতে তো মান-অপমানের কোনও ব্যাপার নেই।

সুখেন বললে : আছে রবিদা। আমরা অপমান করিনি, কিন্তু মহুয়া নিজেকে অপমানিত মনে করেছিল। পীযূষদা রিজেক্ট করার পর ওর চোখ-মুখের অবস্থা যদি দেখতে! কনে দেখতে এসে পাত্রপক্ষ যখন মুখের ওপর জবাব দিয়ে যায়, তখন একটি মেয়ের মুখ-চোখের যে অবস্থা হয়, মহুয়ার মুখে আমি সেই ছবিটাই দেখতে পেয়েছিলাম সেদিন। ওর বাবা, কাকা—যাঁরা ওর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁরা হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু মহুয়া নিজেকে অপমানিত মনে করেছিল। ওর চোখ-মুখ দিয়ে অপমানের আগুন ছিটকে ছিটকে বেরোচ্ছিল। একজন শিল্পী হিসেবে আর একজন শিল্পীকে কী তারপরও আমি অভিনয় করার কথা বলতে পারি, না বলা উচিত। তুমিই বল?

আমি বললাম : সেটা ঠিক কথা। তা শেষ পর্যন্ত বরফ গলল কী করে? 'প্রতিশোধ' ছবিতে তো ওকে কাস্ট করেছিলে। পার্টটা কী মউ তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল? না তুমিই এগিয়েছিলে?

সুখেন বললে : আমিই এগিয়েছিলাম। আর সেটা উত্তমদার হুকুমে। আমার ছবির ডিস্ট্রিবিউটর প্রণব বসু, প্রণবদারও তাই ইচ্ছে ছিল। তা আমি আমার ওই 'প্রতিশোধ' ছবিতে মহুয়া আর ওর স্বামী তিলক,

দু'জনকেই নিয়েছিলাম।

আমি বললাম : মহুয়া এক কথায় রাজি হয়ে গেল?

সুখেন বললে : না, এক কথায় রাজি হয়নি। ওর মন তো তখনও অভিমানে পরিপূর্ণ। খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে তো। মুখ ফুটে নিজের ব্যথার কথা, দুঃখের কথা একেবারে ঘনিষ্ঠজন ছাড়া আর কারও কাছে প্রকাশ করে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি ওকে রাজি করিয়েছিলাম ইমোশ্যনাল ট্রিটমেন্টের জোরে।

আমি বললাম : মউয়ের ট্যালেন্টটা তুমি বোধহয় ঠিকমতো বুঝতে পারনি, তাই অত দেরি করে তোমার ইমোশ্যনাল ট্রিটমেন্টের কাজটা করলে।

সুখেন বললে : না রবিদা, ওর যে ট্যালেন্ট আছে সেটা আমি প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছিলাম। না হলে ওর বাবার কাছে অ্যাপ্রোচ করব কেন?

আমি বললাম : কী ভাবে বুঝলে? তুমি তো তার আগে ওর কোনও অভিনয় দেখনি।

সুখেন বললে : আপনাদের পাঁচজন আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে সে ক্ষমতাটা আমার হয়েছে। কম দিন তো আর অভিনয় করছি না। প্রায় চল্লিশ বছর। কত চরিত্রে অভিনয় করলাম, কত চরিত্রে অন্যদের অভিনয় করালাম বলুন তো? সেই ক্ষমতার জোরেই তো আমার প্রথম ছবি 'পান্না হীরে চুনি'-তে রত্না ঘোষালকে হিরোইন করবার সাহস করেছিলাম। শকুন্তলা বড়ুয়ার মধ্যে ট্যালেন্টের খোঁজ তো আমিই পেয়েছিলাম। আমার মেয়ে পিয়াকে দিয়েও নায়িকা করাতে পেরেছিলাম।

সুখেনের কথা শেষ হতে না হতে আমাদের গাড়িটা স্টুডিওর মধ্যে ঢুকল।

মহুয়াকে নিয়ে লেখা যে কী শক্ত ব্যাপার তা ওকে নিয়ে লিখতে বসে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি। এই নয় যে, মহুয়া সংক্রান্ত মেটিরিয়ালের অভাব। সেটা আমার কাছে প্রচুর জমে আছে। অসুবিধাটা হৃদয়ের দিক থেকে। মহুয়া ছিল আমার কাছে মেয়ের মতো। কিংবা বোনের মতো। তাই তাকে নিয়ে যখনই লিখছি তখনই প্রতিটি অক্ষর কান্নায় ভিজে ভিজে যাচ্ছে। এ যে কী যন্ত্রণা সেটা কাকে বোঝাব। তবু কাঁদতে কাঁদতে বুকটা হালকা করতে পারলে মানুষ এক ধরনের সুখ পায়। আমিও এখন সেই সুখটাই পেতে চাইছি মহুয়ার স্মৃতিচারণ করে।

সেদিন সুখেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 'অভিমান' ছবির সেটে গিয়ে মহুয়াকে ফ্লোরের মধ্যেই পেয়ে গেলাম। সারা ফ্লোর জুড়ে তখন আলো করা হচ্ছে। শিল্পনির্দেশক সূর্য চ্যাটার্জি ফ্লোরের মেঝে জুড়ে চমৎকার আলপনা দিয়ে রেখেছেন। সেই আলপনার ওপর মোড়া পেতে মহুয়া বসে আছে রাজেন্দ্রাণীর মতো। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে মহুয়াকে তা কী বলব।

সেটে ক'জন টেকনিসিয়ান ছাড়া বাইরের আর কেউ নেই। আমি খানিকটা এগিয়ে গেলাম মহুয়ার দিকে। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে এসে দাঁড়ালাম। একেবারে মহুয়ার সামনাসামনি।

কী ব্যাপার! এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছি তবু মহুয়া আমাকে উইশ করছে না কেন? ও তো সোজাসুজি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। ওর চরিত্র অনুযায়ী এতক্ষণে তো কলকল করে ওঠার কথা। তবে কী মহুয়া আমাকে চিনতেই চাইছে না? আমার সম্পর্কে ওর কোনও অভিযোগ আছে?

মহুয়ার এহেন ব্যবহারে নিজেকে খুব অপমানিত মনে হতে লাগল। ভাবলাম চলেই যাই এখান থেকে। পরমুহূর্তেই ভাবলাম, আমার সম্পর্কে সত্যিই যদি ওর কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে সেটাও তো জেনে যাওয়া দরকার। এই লাইনে তো কান ভাঙাবার লোকের অভাব নেই। মহুয়া আমাকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, এটা যে অনেকের অভিপ্রেত নয় তা তাদের চোখমুখ দেখে বুঝতে পারি। তাদের মধ্যে ঠিক কোন জনটি আমার নামে মহুয়ার কানে বিষোদগীরণ করেছে সেটাও তো জেনে যাওয়া দরকার। ভবিষ্যতে তার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে পারব।

আমি আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম মহুয়ার দিকে। মাত্র এক হাত তফাতে একেবারে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু তখনও মহুয়ার নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ নেই। একেবারে যেন একটি পাথরের মূর্তি।

এবারে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। শুনেছি এইরকম বসা অবস্থাতেই মানুষের কত রকম দুর্ঘটনা ঘটে যায়। হে ঈশ্বর, সে রকম যেন কিছু না ঘটে।

আরও দু-তিন মিনিট ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাতেও মহুয়ার ধ্যানভঙ্গ হচ্ছে না দেখে ওর একেবারে মুখের সামনে হাতখানা নিয়ে গিয়ে দুটো আঙুল নাড়াতে লাগলাম।

এবারে মহুয়ার ধ্যানভঙ্গ হল। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল : কী ব্যাপার! কখন এলে তুমি?

আমি বললাম : চিনতে পেরেছো তা হলে? আমি কে বলো দেখি?

মহুয়া বিস্ময়ে কপালটা কুঁচকে বলল : এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? তুমি তো রবিদা!

আমি বললাম : আমি অন্তত সাত-আট মিনিট তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, অথচ তোমার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। কার ধ্যান করছিলে মউ?

মহুয়া লজ্জা পেয়ে বললে : বিশ্বাস করো রবিদা, আমি তোমাকে একদম দেখতে পাইনি। মাঝে মাঝে আমার যে কেন এরকম হয়! এক হাত দূরেব অতি চেনা লোককেও চোখে পড়ে না। তার সঙ্গে কথা না বলেই হয়তো চলে যাই। এ নিয়ে অনেকে আমাকে ভুল বোঝে।

আমি বললাম : আমি ভাবলাম তুমি বোধহয় তোমার শখের টেপ-বেকর্ডারটার কথা ভাবছ!

দিন দুই আগে মহুয়ার একটা দামি টেপ-রেকর্ডার চুরি হয়ে গেছে বলে শুনেছিলাম। টেপ-রেকর্ডারটা ওর খুব প্রিয় ছিল বলে জানতাম। বিদেশ থেকে আনা।

মহুয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে · সেটার কথা ভেবে আর কী করব বলো। কে যে চুরি করল ওটা! ওর বদলে অন্য কোনও জিনিস চুরি গেলে এতটা কষ্ট হত না।

আমি বললাম : যাক বাবা, তুমি ভালোভাবে কথাবার্তা বলছ দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আমি তো অন্য কিছু ভেবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

মহুয়া বলল : ইস্, ওইভাবে মরতে আমার বয়ে গেছে। আমি এখনও অনেক দিন বেঁচে থাকব। অনেক দিন তোমাদের জ্বালাব।

মহুয়ার কথা শুনে অলক্ষে সেদিন ঈশ্বর হেসেছিলেন কিনা কে জানে! এর মাস দুয়েকের মধ্যে মহুয়া আমাদের ছেড়ে চলে গেল। যে মেয়েটার অত বাঁচবার শখ ছিল তাকে ভগবান হঠাৎ করে টেনে নিলেন। তাও ওইরকম যন্ত্রণা দিতে দিতে!

তবে যে সবাই বলে ঈশ্বর করুণাময়। এই কি তাঁর করুণার নমুনা?

এইসব দেখেশুনে মাঝে মাঝে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে ইচ্ছে করে।

মহুয়া রায়চৌধুরির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ওর সিনেমায় নামবার অনেক পরে। ও যেদিন 'শেষরক্ষা' ছবিতে অভিনয় করে বি এফ জে এ পুরস্কার পেল, সেদিন ওর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ওই ছবির পরিচালক শঙ্কর ভট্টাচার্য।

তবে ওকে আমি প্রথম দেখি মিনার্ভা হোটেলের ওয়েটিং চেম্বারে। সঙ্গে ওর বাবা নীলাঞ্জনবাবু ছিলেন। মহুয়া তখন তরুণ মজুমদারের 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবিতে কাজ করছে। ওই হোটেলটা ছিল ওই ছবির প্রযোজক কে এল কাপুর প্রোডাকসন্সের হেড অফিস। সব কিছু দেখাশোনা করতেন কাপুর ব্রাদার্সের মামা রবীন্দ্রনাথ মালহোত্রা। উনি মামাজি নামেই পরিচিত।

এই মামাজির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। এখনও আছে। মামাজির সঙ্গে আমার বয়সের ফারাক বেশ কয়েক বছরের। এই অসম বয়সটাও যে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি, এটা মামাজির উদারতা।

আমি এবং বিখ্যাত শিল্পী ও লেখক পূর্ণেন্দু পত্রী তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় একই সঙ্গে কাজ করি। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাতেই আমরা অফিস থেকে বেরিয়ে দু মিনিটের রাস্তা পেরিয়ে গণেশ অ্যাভিনিউতে মিনার্ভা হোটেলে চলে আসতাম আড্ডা দিতে। বলা বাহুল্য, সেই সব দিনগুলিতে মামাজি আমাদের পান-ভোজনে আপ্যায়িত করতেন। তবে ওই খাদ্য-পানীয়ের থেকে বড় আকর্ষণ ছিল মামাজির সঙ্গ। আমরা ওঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম।

একদিন সন্ধেবেলা মামাজির ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাইরের সোফায় মহুয়া তার বাবার সঙ্গে বসে আছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছবির দৌলত মহুয়ার মুখটা তখন চেনা হয়ে গেছে। তরুণ

মজুমদার অর্থাৎ তনুবাবুর ছবিতে কাজ করলে আলাদা একটা এক্সপোজার পাওয়া যায়। যেমন পাওয়া যায় সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, মৃণাল সেন ইত্যাদি ডিরেক্টারের ছবিতে কাজ করলে। ইদানীং গৌতম ঘোষ, নব্যেন্দু চ্যাটার্জি, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রভৃতিদের ছবিতে কাজ করলেও পাওয়া যাচ্ছে।

মহুয়ার সঙ্গে সেদিন কথা বলতে পারিনি আলাপ-পরিচয় ছিল না বলে। তবে ওই এক পলকের মধ্যেই মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিলাম। চেহারাটা রোগা রোগা, কিন্তু মুখখানা কী মিষ্টি! পানপাতার মতো মুখে বড় বড় টানা টানা চোখ। ঠিক যেন মা দুর্গার ছোটবেলার মতো।

মহুয়া সেদিন বেশ সাজগোজ করে এসেছিল। অনেকটা যাত্রাদলের নর্তকীরা যে ভাবে সাজে, সেই রকম সাজগোজ। বুঝলাম, মেয়েটি খুব সাজতে ভালোবাসে।

পরে যখন মহুয়ার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল, তখন বুঝেছিলাম আমার ওই ধারণাটা মিথ্যে। ও খুব সিম্পল সাজগোজ পছন্দ করে।

তাহলে সেদিন মহুয়া অত সাজগোজ করে মিনার্ভা হোটেলে ওর বাবার সঙ্গে এসেছিল কেন? পরে জেনেছিলাম সেদিন ছিল ওটা ওর নাচের সাজগোজ। তখনও তো জানতাম না যে মহুয়া ফংশানে ফাংশানে নাচে। ওইসব নাচের আসরে ওর নাম ছিল সোনালী। যেমন দেবশ্রী রায় আর তার দিদি ছোটবেলায় ফাংশানে নাচত। ওদের নাম ছিল রুমকি-ঝুমকি।

এই সাজের ব্যাপার নিয়ে আমার একদিন মহুয়ার সঙ্গে কথা হয়েছিল। ও তখন নব্যেন্দু চ্যাটার্জির 'আজ কাল পরশুর গল্প' ছবির শুটিং করবার জন্য বোলপুরে গেছে। আছে সরকারি ট্যুরিস্ট লজে।

ওই শুটিং-এ ওর সঙ্গে ওর স্বামী তিলক চক্রবর্তীও এসেছিল। তিলক আমার পাড়ার ছেলে। উত্তর কলকাতার হেদুয়ার কাছে রায়বাগান স্ট্রিটে আমি থাকতাম। আর তিলকরা থাকত ঠিক তার পাশেই দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেনে। পরে ওরা বেহালায় চলে যায়।

তা তিলক ওই আউটডোরে একটা দিন মাত্র ছিল। ওর ব্যাঙ্কের চাকরি। বেশি ছুটি নেবার উপায় ছিল না। যাবার দিন অন্য অনেকের সঙ্গে আমাকেও বলে গিয়েছিল : রবিদা, মউ রইল। ওকে একটু দেখবেন।

আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম : মউকে আমার দেখার দরকার হবে না। ও এখনকার লিডিং হিরোইনদের মধ্যে একজন। ওর দেখাশোনা করবার জন্যে কত লোক মুখিয়ে আছে।

তিলকও হাসতে হাসতে বললে : সেটা জানি। আর জানি বলেই তো বিশেষ করে আপনাকে বলছি ওকে একটু লুক্ আফটার করতে। জানেন তো ও ভয়ঙ্কর মুডি। কখন যে কী করে বসে, কাকে যে কী বলে বসে, তার ঠিক নেই। ওর দিকে একটু নজর রাখবেন।

তিলক চলে যাবার পর মহুয়াকে গিয়ে বললাম : এই মউ, তিলক তোমাকে দেখাশোনার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গেছে। সব সময় আমার কথা শুনে চলবে। কোন রকম বেগড়বাই করবে না বলে দিচ্ছি।

মহুয়া ঠিক বাচ্চা মেয়ের মতো ঠোঁট উলটে বললে : তিলকেরও আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, আমার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গেছে তোমার ওপর। তুমি তো নিজেই বুড়ো-হাবড়া। তোমাকে কে দেখে তার ঠিক নেই! তুমি আবার দেখাশোনা করবে আমার!

আমি কৃত্রিম রাগের ভাব দেখিয়ে বললাম : এই মউ, ভালো হচ্ছে না কিন্তু! বাপের বয়সী একটা মানুষের সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে লজ্জা করে না!

আমার কথা শুনে মহুয়ার সে কী খিল খিল করে হাসি। বললে : ওঃ আবার বয়েস কমানো হচ্ছে। মাথার চুলগুলো সব পেকে শন নুড়ি হয়ে গেছে! যার দাদুর বয়েস পেরিয়ে গেছে সে কি না বলছে বাপের বয়সী।

এবার আপনারাই বলুন এই মেয়ের সঙ্গে কথায় পারা যায়?

মহুয়ার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে থেকেই তিলকের সঙ্গে আমার পরিচয়। না, অভিনেতা তিলকের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না। খুব ছোটবেলা থেকেই ও ছবিতে অভিনয় করছে। তখন ওর নাম ছিল মাস্টার তিলক। আমাদের দেশে শিশুশিল্পীরা বড় হবার পর কেমন যেন হারিয়ে যায়। একমাত্র সুখেনকেই দেখলাম সেই বাচ্চা বয়স থেকে বুড়ো পর্যন্ত একইভাবে অভিনয় করে যাচ্ছে। নইলে মাস্টার

বিভু, মাস্টার তিলক, মাস্টার সতু, মাস্টার বুদ্ধদেব, মাস্টার বাবুয়া—সবাই বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল। 'হংসরাজ' ছবির অরিন্দম গাঙ্গুলি, 'বাদশা' ছবির মাস্টার শঙ্কর কিংবা 'সোনার কেল্লা' ছবির কুশল চক্রবর্তী যদিও এখনও অভিনয় করছে, তবে তাদের যা কিছু কর্মকাণ্ড সব ছোট পর্দাকে কেন্দ্র করে। মাস্টার বিভুরও তাই।

তিলকও মাস্টার থেকে মিস্টার হবার পর অভিনয়ের কিছু কিছু চেষ্টা করেছিল। ছবিতে তো করেইছিল, নাটকেও করেছিল। কিন্তু সেগুলো বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। পরে একটা সময়ে ও অভিনয়কে গুডবাই জানিয়ে গান নিয়ে পড়েছিল।

সেই সময় বিভিন্ন ফাংশানে গাইয়ে হিসেবে তিলক বেশ পপুলারিটি পেয়েছিল। তবে ও ছিল কপি সিঙ্গার। বেশিরভাগ সময়ে কিশোরকুমারের গাওয়া গানগুলিই ও গাইত। দারুণ জমিয়ে দিত ফাংশান। রীতিমতো হাততালি টাততালি পেত। এটা শোনা কথা নয়, আমার নিজের চোখে দেখা। তবে মৌলিকত্ব না থাকলে যা হয়, শেষ পর্যন্ত তাই হল। একটা সময়ে কপি-সিঙ্গারে বাজার ছেয়ে গেল। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছু হটে গেল তিলক। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী গাইয়েদের যোগাযোগ ব্যবস্থা এত নিখুঁত ছিল যে তিলক তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না।

আমার মনে হয় তিলক বোধহয় সে রকম সিরিয়াসলি গায়ক হিসেবে নিজেকে প্রোজেক্ট করতে চায়ওনি। ব্যাঙ্কে ওর একটা ভালো চাকরি ছিল। টাকার অভাব ছিল না। সুতরাং গানের ব্যাপারে ও অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চায়ওনি। গানের ব্যাপারে যা কিছুই উদ্যোগ, সেটা ছিল ওর দাদা অলক চক্রবর্তীর। অলকবাবুই ফাংশান পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। রেট-টেট সেটল করতেন। কড়া হাতে টাকা-পয়সা আদায় করতেন। নইলে তিলক যে রকম লাজুক আর মুখচোরা ছেলে, তাতে ফাংশান ধরা কিংবা টাকা-পয়সা ঠিক ঠিক আদায় করা ওর দ্বারা কিছুতেই হত না।

তবে ওই ফাংশান করতে করতেই তিলক একটি অমূল্য রত্ন পেয়ে গিয়েছিল। সে রত্নটির নাম মহুয়া। মহুয়া তখন সোনালী নামে ফাংশানে নাচত। এই রকম একটি ফাংশানে ওদের পরিচয়। পরিচয় থেকে প্রণয়। প্রণয় থেকে উদ্বাহ। অর্থাৎ বিয়ে। এটা কিন্তু আর কোন কপি-সিঙ্গারের ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। সেদিক থেকে তিলক সত্যিই ভাগ্যবান।

ওদের বিয়ে হবার অনেকদিন পরে আমি একবার মহুয়াকে প্রশ্ন করেছিলাম : হ্যাঁ রে মউ, তুই তিলকের কী দেখে ভালোবেসেছিলি? ওর গানের গলা শুনে, না রূপের ছটা দেখে, না ব্যাঙ্কের মোটা মাইনের চাকরিটার কথা ভেবে?

মহুয়াকে সম্বোধনের ব্যাপারে আমার কোন নির্দিষ্টতা ছিল না। বেশিরভাগ সময়েই 'তুমি' বলতাম। কখনও কখনও খুব স্নেহপ্রবণ হয়ে পড়লে 'তুই তোকারি' করতাম। 'আপনি' বলিনি কখনও। তবে দিনে দিনে অভিনয়ের ব্যাপারে ও যেভাবে পরিপক্ক হয়ে উঠছিল, গভীরতা প্রাপ্ত হচ্ছিল, তাতে হয়তো কোনদিন শ্রদ্ধা সহকারে 'আপনি' বলেও ফেলতে পারতাম। কিন্তু সে সুযোগ তো ঈশ্বর দিলেন না।

আমার প্রশ্ন শুনে মহুয়া হাসতে হাসতে বললে : ও তিনটের কোনটাই নয়।

আমি বললাম : তাহলে?

মহুয়া বললে : ওর মধ্যে যে ছেলেমানুষটা লুকিয়ে আছে, তাকেই ভালোবেসেছিলাম।

মনে মনে ভাবলাম, এটাই স্বাভাবিক। বাচ্চারা যেমন তাদের সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সই পাতায়, মহুয়াও তাই করেছিল। ওর মধ্যেও একটা ছেলেমানুষ লুকিয়ে আছে তো! তাই ও আর একটি ছেলেমানুষকে ওর সারা জীবনের সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছিল।

সেই তিলকের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল অদ্ভুত একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। আমি তখন উল্টোরথ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছি। আমার যেখানে নিবাস সেই রামবাগান স্ট্রিটের গলির মধ্যে পাড়ার ছেলেদের আবদারে মাঝে মাঝে ফাংশান করতে হত। সেবারেও তেমনি একটি ফাংশানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে গাইয়ে তিলকের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ছোটখাট একটা নাটক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে ঘটনা আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়।

তা ফাংশানের মাধ্যমেই আমার তিলকের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত। তিলক সেদিন আমাদের

ফাংশানে প্রাণ দিয়ে গান গেয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম ওর গান।

সেদিন ফাংশানের পর তিলকের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম। সত্যিই ভদ্র ছেলে। কম কথা বলে। একটু লাজুক লাজুক। সব সময় মুখে হাসিটি লেগেই আছে। দেখলেই মনে হয় একটি শিশু সব সময়ে ওর ভেতর খেলা করছে।

তখনও কিন্তু মহুয়ার সঙ্গে তিলকের বিয়ে হয়নি। হয়েছিল আরও কিছুদিন পরে। শুনে আমার ভালো লেগেছিল।

তাই সেদিন যখন মহুয়ার মুখে শুনলাম, মহুয়া তিলককে ভালোবেসেছিল ওর ভেতরের শিশুমনের পরিচয় পেয়ে, সেদিন তিলকেব সঙ্গে আমাব প্রথম পরিচয়ের কথাই মনে হচ্ছিল।

অনেক পরে মহুয়ার মৃত্যুসংবাদ যে মুহূর্তে পেলাম, সেই মুহূর্তে আমার তিলকের জন্য বেশি কষ্ট হচ্ছিল। ওরা দুজনে দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসত। মহুয়াকে হারিয়ে তিলক কী ভাবে দিন কাটাচ্ছে কে জানে। ওর ভেতরটায় যে কষ্ট হচ্ছে তার পরিমাপ কে করবে? ও যে বড় চাপা স্বভাবের ছেলে। ভেতরের কষ্টটা কাউকে বুঝতেই দিচ্ছে না হয়তো!

আগেই বলেছি মহুয়ার প্রথম ছবি তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'। ওই ছবির কাজ করতে করতেই মহুয়া আর একটি বড় ছবির কাজ পেয়ে যায়। সেটি হল অগ্রগামী গোষ্ঠী পরিচালিত 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'।

এই অগ্রগামী গোষ্ঠীর প্রধান পুরুষ ছিলেন সরোজ দে। ওঁকে আমরা ওঁর ডাকনামে কালুবাবু বলে ডাকি। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ওই নামেই উনি বিখ্যাত। এই কালুবাবু হলেন একজন ডেয়ারিং ডিরেকটার। ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনে উনি যেমন দুঃসাহসী, শিল্পী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তেমনি। 'হেডমাস্টার' ছবিতে রঞ্জনা ব্যানার্জি, 'স্বাতী' ছবিতে তনুশ্রীশঙ্কর, 'কোনি' ছবিতে শ্রীপর্ণা ব্যানার্জিকে উনি প্রথম সুযোগ দিয়েছিলেন। ছেলেদের মধ্যে 'ডাক হরকরা' ছবিতে বিশ্বজিৎকে। আরও দুজন নতুন ছেলেকে উনি সুযোগ দিয়েছিলেন কিন্তু তারা কেউ ধোপে টেকেনি। মহুয়াকে যখন কালুবাবু তাঁর ছবিতে নিয়েছিলেন, তখন সেও তো প্রায় নতুনই। দু-এক মাস আগে তনুবাবুর ছবিতে সুযোগ পেয়েছে মাত্র।

সেই মহুয়া 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' ছবির শুটিং-এর সময় একটা দুর্দান্ত কাণ্ড করে বসল।

মহুয়ার সেই দুর্দান্ত ব্যাপারটার কথা কালুবাবুর মুখ থেকেই শুনেছি। 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' এবং 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে', প্রথম দিককার এই দু'খানা ছবিতে কাজ করেই মহুয়া বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে শিল্পীর মর্যাদা পেয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কালুবাবুকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম : আচ্ছা কালুবাবু, আপনি যে আপনার 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' ছবিতে টিন-এজার নায়িকা হিসেবে মহুয়াকে নিলেন, সেটা কিসের ভিত্তিতে? আপনি কি তার আগে তনুবাবুর ছবিতে ওর শুটিং-টুটিং কিছু দেখেছিলেন নাকি?

কালুবাবু বললেন : একদম না। আমি মহুয়াকে সিলেক্ট করেছি ওকে দেখে, ওর সঙ্গে কথা বলে।

আমি বললাম : ব্যস তাতেই! আপনি ওর স্ক্রিন-টেস্ট নেননি?

কালুবাবু বললেন : ঠিক মনে পড়ছে না। বোধহয় নিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা নিয়ম রক্ষার খাতিরে। তার আগেই আমি মনস্থির করে ফেলেছিলাম, 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'-র ওই চরিত্রটাতে আমি মহুয়াকেই নেব।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এতটা স্যাঙ্গুইন হবার কারণটা কী?

কালুবাবু বললেন : ওই চরিত্রটাতে আমি একটি গেছো ধরনের চটপটে মেয়ের খোঁজ করছিলাম। মহুয়ার চেহারা আর চরিত্রের সঙ্গে সেটা একশো ভাগ মিলে গিয়েছিল।

আমি বললাম : মহুয়া কি নিজের থেকে আপনার কাছে এসেছিল, না কি অন্য কেউ ওর হয়ে সুপারিশ করেছিল?

কালুবাবু বললেন : আমি নতুন মেয়ে খুঁজছি শুনে বিমল দে মশাই আমাকে মহুয়ার কথা বলেছিলেন। তা আমি বিমলবাবুকে বলেছিলাম, ওই ক্যারেকটারে আমার একটা খুব স্মার্ট মেয়ের দরকার। বয়েসটাও কম হওয়া চাই। ইন্ডাস্ট্রিতে ঠিক ওই ধরনের একটি মেয়েরও দেখা পাচ্ছি না। আপনার কি মনে হয় মহুয়া রায়চৌধুরীর মধ্যে সেটা আছে?

আমি জানতে চাইলাম : উত্তরে বিমলবাবু কী বললেন?

কালুবাবু বললেন : বিমলবাবু আমার কথা শুনে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, আমি তনুর ছবিতে ওর শুটিং দেখেছি। তাছাড়াও দেখেছি শুটিং-এর বাইরে ওর চাল-চলন, ওর ছেলেমানুষি। আমার তো মনে হয় আপনি যে রকম মেয়ে খুঁজছেন মহুয়া সেই রকমই। তবে আমার কথার ওপর নির্ভর করতে বলছি না আপনাকে। আপনি ওকে নিজের চোখে দেখুন, কথাবার্তা বলুন, তারপর পছন্দ হয় নেবেন, না হলে বাতিল করে দেবেন। তেমন কোনও বাইন্ডিংস তো নেই।

এই বিমল দে ছিলেন আমাদের বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। যেমন শার্প চোখ, তেমনি শার্প ব্রেইন। ভদ্রলোক এককালে সক্রিয় রাজনীতি করতেন। আজকের মতো ও রকম কলুষিত আর ধান্দাবাজীর রাজনীতি নয়। তখন রাজনীতি করতে গেলে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হত। এখন তো ভোগের রাজনীতি। এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই।

এককালে প্রযোজক ও পরিবেশক হিসেবে আর ডি. বনশলের যে বিরাট রমরমা ছিল, তার মূলে ছিলেন এই বিমল দে। উনি ছিলেন বনশল কোম্পানির ম্যানেজার এবং প্রধান পরামর্শদাতা। রীতিমত ইনটেলেকচুয়াল মানুষ। বছর তিন-চার আগে বাঙ্গালোরের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে চিফ অব দ্য জুরি হিসেবে ওঁর বক্তৃতা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে সত্যিকারের ভালো না বাসলে অমন আন্তরিক বক্তব্য রাখা যায় না।

যাক, আবার মহুয়ার কথায় আসি। বিমলবাবু সুপারিশ করার দু-তিন দিনের মধ্যেই মহুয়া এসে দেখা করেছিল পরিচালক সরোজ দে ওরফে কালুবাবুর সঙ্গে। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল মহুয়া কালুবাবুর সঙ্গে বেশ জমিয়ে গপ্পো করছে। যেন কত কালের চেনাশোনা।

এটা ছিল মহুয়ার একটা মস্ত গুণ। ওর যাকে ভালো লাগত তাকে প্রথম দিনই আপন করে নিত। আর যাকে ভালো লাগত না তার সঙ্গে দু-পাঁচ বছর পরেও অন্তরের দূরত্ব রেখে কথাবার্তা বলত। বাইরে থেকে স্পষ্টই বোঝা যেত কে মহুয়ার মনের মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার পেয়েছে, আর কে পায়নি।

প্রথম দিনের আলাপের সময় কালুবাবু মহুয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : তুমি সাইকেল চড়তে পারো?

মহুয়া বলেছিল : হ্যাঁ।

কালুবাবু আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন : তুমি গাছে উঠতে পারো?

মহুয়া বলেছিল : হ্যাঁ।

কথাটা বলেই মহুয়া এমনভাবে এদিক ওদিক তাকিয়েছিল যে তখন যদি এখানে একটা গাছ থাকত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গাছকোমর বেঁধে গাছে চড়ে প্রমাণ করে দিত যে সে গাছে উঠতে পারে কি না।

কালুবাবু পুনরায় প্রশ্ন করলেন : তুমি নাচতে পারো?

মহুয়া বললে : খুব পারি। আমি তো ফাংশানে নাচি।

কালুবাবু বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে বটে। আমিই ভুলে গিয়েছিলাম।

এরপর দু-একটা এ-কথা সে-কথার পর কালুবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন : আচ্ছা মহুয়া, তোমাকে তো যা জিজ্ঞেস করছি তাতেই 'পারো' বলছ। 'পারি না' বলতে পার না একবারও?

মহুয়া বললে : হ্যাঁ, তাও পারি।

কালুবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন : কি পারো?

মহুয়া সপ্রতিভভাবে জবাব দিলে : ওই যে 'পারি না' বলতে বললে, সেটাও পারি।

কালুবাবু বললেন : তার মানে?

মহুয়া বললে : তুমি তো ডিরেকটার। তুমি যা বলতে বলবে, আমি চোখ-কান বুজে তাই বলে যাব। তুমি যদি 'পারি না' বলতে বলো তবে সেটাও আমি পারব।

কালুবাবু বললেন : আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না রবিবাবু, আমি মহুয়ার এই কথা শুনে থ বনে গিয়েছিলাম। অসম্ভব ইনটেলিজেন্ট মেয়ে ছিল মহুয়া।

আমি বললাম : মহুয়া কী আপনাকে ওই রকম 'তুমি' 'তুমি' করে বলত নাকি?

কালুবাবু বললেন : হ্যাঁ, একেবারে প্রথম দিন থেকে। ও মানুষকে মুহূর্তে আপন করে নিতে পারত।

কালুবাবুর কথা শুনে আমার একটা পুরনো ঘটনা মনে পড়ে গেল। ওর সঙ্গে কোন আউটডোরে গেলে বেশ জমত আমার। নানারকম খুনসুটি করত তো! ওর সঙ্গে যখন একান্তে বসে কথা বলতাম তখন ও 'তুমি' 'তুমি' করে কথা বলত। কিন্তু অন্য লোকের সামনে হলেই 'আপনি আজ্ঞে' করত। সেটা শুনে আমি ওকে বলেছিলাম : তুই একরকম ভাবে ডাকিস না কেন রে মউ? এখানে 'তুমি' আর অন্য লোকেব সামনে 'আপনি আজ্ঞে' করিস!

মহুয়া চোখ মটকে বলেছিল : তুমি সাংবাদিক কি না, তাই।

আমি বললাম : সাংবাদিক তো কী হয়েছে?

মহুয়া বললে বা রে! তোমার একটা প্রেস্টিজ নেই বুঝি! সকলের সামনে আমি যদি তোমায় 'তুমি তুমি' কবে বলতে থাকি তাহলে অন্যরাও তো বলতে শুরু করবে। তাতে তোমার মান যাবে না!

আমি বললাম . দুর বোকা! আমার প্রেস্টিজ কি এতই ঠুনকো যে কেউ আমায় 'তুমি' করে বললেই আমার সম্মান চলে যাবে? আমি যা আছি ঠিক তাই থাকব।

মহুয়া বললে · না না, সেটা আমার শুনতে ভালো লাগবে না। দেখতে তো পাই সবাই তোমায় কত খাতির করে।

আমি বললাম · কই, তুই তো করিস না!

মহুয়া মুখ মটকে বললে · বযে গেছে তোমাকে খাতির করতে। তোমাকে যেদিন খাতির করতে হবে সেদিন থেকে তোমাকে আব 'ববিদা' বলে ডাকব না। 'রবিবাবু' বলব। সেটা ভালো লাগবে শুনতে?

আমি বললাম · একদম লাগবে না। দরকার নেই তোর আমাকে খাতির করে। তুই আমাকে চিরকাল 'রবিদা' বলেই ডাকিস।

আজ সেই সব কথা মনে পড়লে চোখ দুটো জলে ভরে আসে। সত্যিই কত সরল ছিল মেয়েটা। একেবারে ফুলের মত নিষ্পাপ ছিল ওর মনটা।

মহুয়ার সঙ্গে আমাব খিটিমিটি লাগত মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে। ও ছিল ইস্টবেঙ্গলের পাঁড সাপোর্টাব। যেমন আমি মোহনবাগানের। ও আমাকে মাঝে মাঝে ক্ষ্যাপাত : এই যে মোহনবাগানেব ছেলে এলেন। আমিও তার উত্তরে বলতাম : কী রে ইস্টবেঙ্গলেব মেয়ে, কেমন আছিস?

ফুটবল খেলাটাকে প্রচণ্ড ভালোবাসত মহুয়া। একদম ছোটবেলা থেকেই। ওর দাদা পিনাকী যখন বন্ধুদের নিয়ে ফুটবল খেলতে যেত, তখন মহুয়াও তাদের পেছন পেছন যেত মাঠে। কেবল দর্শক হিসেবেই নয়, প্লেয়ার কম পড়লে নিজে মাঠে নেমে পড়ে গোলে দাঁড়িয়ে যেত। সেখান থেকেই চিৎকার করে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের শাসাত : এই, আমার গোলের দিকে জোরে বল মারবে না বলে দিচ্ছি। আমাকে গোল দিয়ে দিলে তোমাদের সঙ্গে রক্তারক্তি হয়ে যাবে কিন্তু।

স্বপক্ষ আর বিপক্ষ উভয় দলের খেলোয়াড়রাই মহুয়ার কথা শুনে হেসে ফেলত।

যেদিন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকত, মহুয়া সেদিন সকাল থেকেই খুব টেনশনে ভুগত। কাজেকর্মে ভালো করে মন বসাতে পারত না। সেদিন স্টুডিওতে এসেই ডিরেকটারকে বলত : আমাকে লাঞ্চের আগে যত পার খাটিয়ে নাও। বিকেলের দিকে খেলা আরম্ভ হলে আমাকে দু'ঘণ্টা ছুটি দিতে হবে। ওই সময় আমি খেলা দেখব।

মহুয়াদের একটা ট্রানজিস্টার টি ভি ছিল। হাত দুয়েক লম্ব সরু মতন। স্ক্রিনটা বোধহয় ছ'ইঞ্চি বাই ছ'ইঞ্চি হবে। ব্যাটারিতে চলত। তিলক অফিস যাবার সময় ওই টি ভি-টা মহুয়াকে দিয়ে যেত। মহুয়া সেটাকে মেক-আপ রুমে কাজের মেয়েটির কাছে রেখে দিত। আমি স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলে বলত : এই রবিদা, আজ আমাদের টিমকে হারাবার চেষ্টা করবে না বলে দিচ্ছি। আমাদের টিম যদি হারে তাহলে তোমার সঙ্গে একচোট হয়ে যাবে কিন্তু।

আমি হাসতে হাসতে বলতাম : আজ তোমাদের টিম হারবেই। আমি আসবার সময় কালীঘাটে মোহনবাগানের হয়ে পাঁচসিকে পুজো দিয়ে এসেছি।

মহুয়া বলত : আমিও দক্ষিণেশ্বরের মায়ের কাছে আড়াই টাকা মানত করে রাখলাম। দেখি তোমরা ইস্টবেঙ্গলকে কেমন করে হারাও।

এই রকম নানা হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে মহুয়া তার টেনশন কাটাবার চেষ্টা করত। কিন্তু যত বেলা গড়াত ততই তার মুখটা শুকিয়ে যেত। মাঝে মাঝে বলত : কী হবে বলো তো রবিদা?

আমি ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলতাম : এই মউ, ব্যাপারটাকে এত সিরিয়াসলি নিচ্ছিস কেন বল তো! খেলাটা তো স্পোর্টস। এটাকে স্পোর্টিংলি নিতে পারিস না? যারা ভালো খেলবে তারা জিতবে। ব্যস্ মিটে গেল সব ল্যাঠা।

মহুয়া মুখ শুকনো করে বলত : না গো রবিদা, ইস্টবেঙ্গল হেরে গেলে বুকের ভেতর যে কী কষ্ট হয় তা তোমাকে বোঝাতে পারব না।

সব থেকে দুঃখের ব্যাপার সেদিন ইস্টবেঙ্গল সত্যিই হেরে গেল। মেক-আপ রুমে বসে ওরই টি ভি-তে আমরা দুজনে খেলাটা দেখছিলাম।

ইস্টবেঙ্গল হেরে যাবার পর মহুয়াব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কী কান্না। তখন মনে হচ্ছিল মোহনবাগান হেরে গেলেই বোধহয় ভালো হত। অনেক কষ্টে সেদিন ওর কান্না থামাতে পেরেছিলাম।

আজও যখন টি ভি-তে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখি তখন মহুয়ার কথা বড্ড বেশি করে মনে পড়ে যায়। সে যেখানে গেছে সেখান থেকে কি খেলা দেখা যায়?

মহুয়ার জন্যে আমার একটাই বড় দুঃখ। ও ওর প্রতিভা অনুযায়ী অভিনয়েব সুযোগ পেল না। সারা জীবনে শ'খানেক ছবিতে অভিনয় করেছে মহুয়া। তার মধ্যে খান ষাটেক ওর জীবদ্দশায় মুক্তি পেয়েছে। মৃত্যুর পর মুক্তি পেয়েছে খান কুড়ি। আর বাকি কুড়িখানা কোনদিনই মুক্তি পাবে না। কারণ তার কোনটাতে দু'দিন কোনটাতে চার দিন, কোনটাতে কেবল মহরত-দৃশ্যেই কাজ করেছে মহুয়া।

এই যে আশিখানা ছবি রিলিজ হয়েছে মহুয়ার, তার মধ্যে মাত্র খান কুড়ি ছবির নাম করা যায় যেখানে মহুয়ার অভিনয়ের তারিফ করা যেতে পারে। আর ওর সত্যিকারের ভালো অভিনয় আমরা দেখতে পেয়েছি মাত্র খান দশেক ছবিতে। আলাদা করে কোন ছবির নাম আমি করতে চাই না। তাতে হয়তো বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ওর অভিনয় জীবনের চোদ্দ-পনেরো বছরে সৃষ্টিশীলতার ছাপ এত কম ছবিতে কেন, তা নিয়ে তো প্রশ্ন উঠতেই পারে। দোষটা কার? মহুয়ার. না যে সব পরিচালক তাকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন তাঁদের—এ প্রশ্নটা তো এসে যেতেই পারে।

এটাও একটা বিতর্কমূলক প্রশ্ন। কাজেই আমি সে ব্যাপারে যাব না। তবে একটা কথা বলব। উত্তমকুমারও অনেক ছবিতে খারাপ অভিনয় করেছিলেন। তার ফলে যেমন আমরা উত্তমকুমারের প্রতিভাকে খাটো করে দেখতে পারি না, মহুয়ার ক্ষেত্রেও সেই কথাটাই প্রযোজ্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে খারাপ অভিনয়ের সব দোষটা মহুয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাই না। তাতে ওর প্রতি অবিচার করা হবে।

আমার ধারণা মহুয়া একজন বর্ন-আর্টিস্ট। এত বড় কথাটা কেন বলছি তার একটু বিশ্লেষণ দরদার। ওর প্রথম ছবি 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'-এর কথাটাই ভাবা যাক। ওই ছবিতে পরিচালক তরুণ মজুমদার মহুয়ার মুখে সংলাপ খুব কম রেখেছিলেন। অনেকে ভাবতে পারেন যে মহুয়া নতুন শিল্পী বলেই হয়তো তনুবাবু এই সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ওই ছবিতে অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ও তো নতুন শিল্পী। কিন্তু তনুবাবু তার মুখে তো ঝুড়ি ঝুড়ি সংলাপ রেখেছিলেন। তাহলে মহুয়ার মুখে নয় কেন? আসলে তনুবাবু সেভাবেই চিত্রনাট্যটি সাজিয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন সাইলেন্ট অ্যাকটিং-এ মহুয়ার সহজাত দক্ষতা। সেটা উনি বুঝেছিলেন অন্যের কথায় মহুয়াকে রি-অ্যাক্ট করতে দেখে। ছবিতেও সেটা ব্যবহার করেছিলেন। বিয়ের পর ফুলশয্যার রাতে অয়ন পতিসুলভ গাম্ভীর্যে যত কথা বলে যাচ্ছে মহুয়া তার এক্সপ্রেশনে অদ্ভুতভাবে সেগুলি রি-অ্যাক্ট করছে।

মহুয়ার গানে লিপ দেবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এ ব্যাপারে ও ছিল ছোটবেলা থেকেই পারদর্শিনী। ওর বাবা নীলাঞ্জনবাবুর মুখে শুনেছি, খুব ছোটবেলায় কোনও গান শুনলেই মহুয়ার দুটি পা ছন্দিত হয়ে উঠত। নীলাঞ্জনবাবু নিজে উদয়শঙ্করের গ্রুপে ছিলেন। উনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মেয়ে শিপ্রার পা দুখানিতে নাচ লুকিয়ে আছে। শিপ্রা মহুয়ার পোশাকী নাম। জন্মকুণ্ডলী এবং স্কুলের রেজিস্টারে ওই

শিপ্রা নামটাই আছে। পরে যখন সিনেমা করতে এল তখন ওর নতুন নামকরণ হল মহুয়া। তার আগে ও যখন ফাংশানে নাচত তখন ওর নাম ছিল সোনালী। সোনালী রায়। চৌধুরী বাদ।

এখন কথা হল গান শুনলেই শিশু মহুয়ার পা দুটি নেচে উঠত কেন? আমার তো মনে হয় গানের সুর ওর মনের মধ্যে দারুণভাবে ক্রিয়া করত। যার প্রতিক্রিয়া দেখা দিত ছোটবেলায় ওর পায়ে। বড় হবার পর চোখ-মুখের এক্সপ্রেশানে। নইলে একেবারে আনকোরা একজন শিল্পী 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবিতে 'সখি ভাবনা কাহারে বলে' গানখানায় অমন সুন্দর লিপ দিতে পারে। অমন চমৎকার এক্সপ্রেশান ফুটিয়ে তুলতে পারে চোখে-মুখে! কিংবা ওর দ্বিতীয় ছবি 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'-র কথা ভাবুন। জিপের মধ্যে বসে গান গাইছে 'ওই নীল দিগন্তে ফুলের আগুন লাগল', কিংবা 'বিলম্বিত লয়' ছবিতে 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না'। সেই সব মুহূর্তগুলি কি ভোলা যায়? আমি তো আজ এত বছর পরেও ভুলতে পারিনি। পরবর্তীকালের ছবিগুলির কথা না হয় বাদই দিলাম। তখন তো মহুয়া আর্টিস্ট হিসেবে অনেক পরিণত হয়ে গেছে।

মহুয়ার অসীম সৌভাগ্য যে ও ওব প্রথম এবং দ্বিতীয় ছবিতে তনুবাবু আর কালুবাবুর মতো দুজন ভালো ডিরেকটারের হাতে পড়েছিল। কিন্তু এমন সুন্দর ধরতাইটাও মহুয়া কাজে লাগাতে পারল না অজস্র আজেবাজে ছবিতে সই করে। আসলে মহুয়া বোধহয় নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিল না। ভেবেছিল তার এই অভিনেত্রীজীবন হয়তো পদ্মপত্রে নীরের মতো। আজ আছে, কাল হয়তো থাকবে না। তাই হাতের কাছে যা পেয়েছে সেই ছবিতেই সই করেছে। কিছু টাকা তো পাওয়া যাচ্ছে।

একটা সময় এমন গেছে যখন কলকাতায় যতগুলো বাংলা সিনেমা হাউস, তার সবগুলোতেই এক সঙ্গে মহুয়ার ছবি চলছে। তার কোনটার আয়ু দু'সপ্তাহ, কোনটার বা পাঁচ সপ্তাহ। তবে সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, মহুয়া কিন্তু দর্শকদের বিরক্তির কারণ হয়নি কোন ছবিতেই। দর্শকরা তাকে চিরকালই স্নেহের চোখে দেখেছেন। তার মুখের নির্মল হাসি প্রাণ ভরে উপভোগ করেছেন। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি চিরকালই ক্ষমার চোখে দেখেছেন। ভাবখানা এই, মহুয়া যেন তাদেরই কারো বাড়ির মেয়ে। অথবা মায়ের পেটের বোন।

এরই মাঝখানে একবার ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল মহুয়ার প্রতিভার ঝলক। শঙ্কর ভট্টাচার্য পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' ছবিতে অভিনয় করে মহুয়া বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানজনক বি-এফ-জে-এ অ্যাওয়ার্ড পেয়ে গেল।

ওই পুরস্কারটা পাবার পর মহুয়ার রি-অ্যাকশন দেখে আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেবার এই পুরস্কার বিতরণ উৎসবটা হয়েছিল সকালবেলা। বিকেলবেলায় ভারতী সিনেমায় একটা ছবির প্রেস শো ছিল। সেখানে মহুয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম : পুরস্কারটা পেয়ে কেমন লাগছে মউ?

মহুয়ার সঙ্গে আমার তখনও তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি। ও তখন আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করত। খুব নিস্পৃহভাবে মহুয়া বলল : আপনারা সাংবাদিকরা আমাক ভালোবেসে পুরস্কারটা দিয়েছেন। তাই ভালো লাগছে।

বুঝলাম ভারতবিখ্যাত এই পুরস্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে মহুয়া আদৌ সচেতন নয়। এ যেন একখানা ভালো শাড়ি কেউ তাকে উপহার দিয়েছে। তার বেশি আর কিছু নয়।

আমি আলোচনার মোড়টা অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করলাম। বললাম : 'শেষরক্ষা' ছবির এই রোলটা তোমার কেমন লেগেছে মউ?

আমার প্রশ্ন শুনে মহুয়ার চোখে-মুখে কিছুটা উত্তেজনার চিহ্ন দেখা গেল। বললে : জানেন, রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' গল্পটা আমি আগে পড়েছি। তারপরে 'শেষরক্ষা' নাটকটাও পড়েছি। তখন থেকেই মনে মনে ভাবতাম, এই ইন্দুমতীর চরিত্রটা যদি আমি করার সুযোগ পেতাম তাহলে খুব ভালো হত। তাই যেদিন শঙ্করদা আমাকে এই চরিত্রটা করার অফার দিলেন সেদিন আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলাম।

আমি বললাম : তাই নাকি! তোমার গল্প-উপন্যাস পড়ায় অভ্যেস আছে নাকি?

মহুয়া একটু অভিমানের সুরে বললে · থাকবে না কেন? জানেন, আমি স্কুলে কখনো সেকেন্ড হইনি।

আমি বললাম : আর কলেজে?

মহুয়া বললে : কলেজে পড়িনি তো!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন?

মহুয়া একটু ম্লান হেসে বললে : স্কুল ফাইনালটাও যে পাস করা হল না। মাত্র তিনটে সাবজেক্টে বসেছিলাম। বাকিগুলো আর দিতে পারলাম না।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম : সে কী! কেন?

মহুয়া বললে : তখন দিনের পর দিন শুটিং চলছে। 'আনন্দমেলা' ছবিতে কাজ করছিলাম তো! তার মধ্যে পরীক্ষা দেওয়া যায়, না পাস করা যায়?

আমি বললাম · বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারনি বলে তোমার মনে খুব দুঃখ। তাই না?

মহুয়া বললে : না, কোন দুঃখ নেই। কী হত বেশি লেখাপড়া করে? বড়জোর একটা সেল্‌স্ গার্ল, অথবা টেলিফোন অপারেটার কিংবা স্টেনোগ্রাফার হতে পারতাম। তারপরে হয়তো একটা সরকারি অথবা বেসরকারি কেরানির সঙ্গে বিয়ে হত। তারপর একদিন ওই চাকরি আর সংসার করতে করতে বুড়িয়ে যেতাম। কেই বা চিনত আমাকে। তার থেকে এখন যা করছি সেটা তো অনেক ভালো। তাই না?

মহুয়ার কথা শুনে আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। বা রে' মেয়েটার মধ্যে তো বেশ গভীরতা আছে। এমনিতে ওপর ওপর ভিজে বেড়ালের মতো দেখতে হলে কী হবে, জীবনটাকে নিয়ে তো ও বেশ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে।

কিন্তু মহুয়াকে আমি বর্ন-আর্টিস্ট বললাম কেন? তাহলে যে ঘটনাটার কথা বলতে গিয়ে আমি থেমে গিয়েছিলাম সেটাই বলতে হয়। ঘটনাটা আমি শুনেছিলাম পরিচালক অগ্রগামী গোষ্ঠীর প্রধান পুরুষ সরোজ দে অর্থাৎ কালুবাবুর মুখ থেকে।

মহুয়া রায়চৌধুরী যে কালক্রমে একজন বড় শিল্পী হবে তা শুরু থেকেই বোঝা গিয়েছিল। 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' ছবির শুটিং-এর সেই ঘটনাটার কথা বললেই আমার এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যাবে।

পরিচালক সরোজ দে অর্থাৎ কালুবাবু মহুয়াকে নিয়ে আউটডোরে গেছেন। সেবারের লোকেশান ছিল সুবর্ণরেখা নদীর ধারে। কাকভোর থেকে শুটিং শুরু হয়েছে। মাঝখানে একবার ব্রেকফাস্টের জন্যে স্বল্পকালীন ব্রেক দেওয়া হয়েছিল।

সেদিনকার শুটিং-এ সবাই খুব মুডে ছিল। ডিরেক্টর মুডে, শিল্পীরা মুডে, এমন কি সচরাচর যা হয় না, সেই টেকনিসিয়ানরাও দারুণ মুডে ছিল।

বেলা দুটো বাজার কিছু আগে কালুবাবু দেখলেন তখন সবাই যে মুডে আছে সেই মুডটা থাকতে থাকতেই ওই সিকোয়েন্সটা শেষ করে নিতে পারলে ভালো হয়। এখন লাঞ্চের জন্যে ব্রেক দিলে এই মুডটা হয়তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যথাসময়ে লাঞ্চের ব্রেক না দিলে টেকনিশিয়ানরা হয়তো ক্ষেপে যাবে। তাহলে কী করা যায়?

কালুবাবুর হঠাৎ মহুয়ার দিকে নজর পড়ল। সে তখন নিজের মনেই একা একা এক্কা-দোক্কা খেলছে। মহুয়ার তখন তো একেবারেই কিশোরী বয়স। ও তখন কাজের ফাঁকে ফাঁকে এইরকম ছেলেমানুষি করত।

কালুবাবু হঠাৎ মহুয়ার কাছে গিয়ে বললেন : এই মউ, একবার এদিকে শোন।

মহুয়া হাতের ঢিলটা ফেলে দিয়ে কালুবাবুর কাছে এসে বললে : কী বলছ কালুদা?

কালুবাবু বললেন : তোর খুব খিদে পেয়েছে নাকি রে?

মহুয়া বললে : হ্যাঁ গো কালুদা, দারুণ খিদে পেয়ে গেছে।

কালুবাবু বললেন : আমারও খুব খিদে পেয়েছে রে। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি।

মহুয়া জিগ্যেস করলে : কী কথা?

কালুবাবু বললেন : তুই আজ দারুণ অ্যাকটিং করছিস। আমি যা চাই তার থেকেও অনেক ভালো করছিস। তার মানে একটা চমৎকার মুডে আছিস। কিন্তু এখন যদি খাবার ছুটি দিই, তাহলে লাঞ্চের পর হয়তো তোর এই মুডটা আর থাকবে না। অ্যাকটিংটা খারাপ হয়ে যাবে। তাছাড়া তুই ভালো অ্যাকটিং করছিস বলে আমিও দারুণ মুডে কাজ করতে পারছি। এই মুডটা যদি নষ্ট হয় তাহলে ছবির ক্ষতি হয়ে যাবে।

মহুয়া চিন্তিত মুখে বললে : তাই তো! তাহলে কী হবে কালুদা?

কালুবাবু বললেন : একটা উপায় আছে। আজ যদি আমরা সবাই একটু দেরি করে খাই, এই ধর ঘণ্টা দু-আড়াই বাদে, তাহলে কি তোর খুব অসুবিধে হবে?

মহুয়া একবার ঢোক গিলে নিজের পেটটাতে হাত বুলিয়ে নিলে। তারপর বললে : না না, তাহলে এখন লাঞ্চের ব্রেক দিয়ে দরকার নেই। তুমি তাড়াতাড়ি শটগুলো নিয়ে নাও। ওরে বাবা! মুড নষ্ট হয়ে গেলে কী বিপদ হবে বলো দেখি। আজ না হয় দু'ঘণ্টা পরেই খাব।

কালুবাবু হাসতে হাসতে মহুয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন : এই কথাটা তুই বুঝলি আর আমি বুঝলাম। কিন্তু টেকনিশিয়ানরা বুঝবে কেন?

মহুয়া বললে : কেন বুঝবে না? তুমি তো ডিরেক্টার। তুমি যা বলবে তাই হবে।

কালুবাবু বললেন : সেটাই তো হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ম করা আছে, দুপুরে দুটোর মধ্যে লাঞ্চের ব্রেক দিতে হবে। আমরা সবাই সেই নিয়মটা মেনে চলি। কাজেই আমি তো কিছু বলতে পারব না। এক তুই যদি ওদের বলে কয়ে রাজি করাতে পারিস তো দ্যাখ।

কালুবাবু মহুয়াকে শিখিয়ে-পড়িয়ে এই কাজের ভারটা দিলেন বটে, কিন্তু ওঁর সন্দেহ ছিল টেকনিশিয়ানরা মহুয়ার কথায় রাজি হবে কি না! একে তো মহুয়া একেবারে নতুন, তার ওপর একদম বাচ্চা বয়েস। টেকনিশিয়ানরা ওকে পাত্তা দেবে কেন!

কালুবাবু বললেন : কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন রবিবাবু, মহুয়া সেদিন ছবির চিত্রনাট্যের বাইরে যে অ্যাকটিংটা করল, তাতে আমার মতো এক ডজন হিরোইন চরানো ডিরেক্টারের চোখও কপালে উঠে গিয়েছিল।

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

কালুবাবু বললেন : শুনুন তাহলে। মহুয়ার সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে যাবার পর আমি প্রোডাকশন ম্যানেজারকে ডেকে বললাম : আপনার রান্নাবান্না সব রেডি? আমি তাহলে এবার লাঞ্চের ব্রেক দিই?

প্রোডাকশন ম্যানেজার বললে : হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্রেক দিয়ে দিন। আমার রান্না অনেকক্ষণ আগেই রেডি হয়ে গেছে।

প্রোডাকশন ম্যানেজারের কথা শেষ হতে না হতেই মহুয়া সেখানে এসে আমার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। বললে : না কালুদা, আপনি এখন ব্রেক দেবেন না। এখন ব্রেক দিলে আমার মুড নষ্ট হয়ে যাবে। এখন আমিও খাব না, আপনিও খাবেন না।

তারপর টেকনিশিয়ানদের দিকে তাকিয়ে বললে : আপনারাও কেউ খাবেন না এখন। আপনারা তো ছবির ভালো চান, তাই না? এখন ব্রেক দিলে ছবির ক্ষতি হবে। তাছাড়া একদিন দু'ঘণ্টা দেরি করে খেলে মানুষ তো আর মরে যায় না। ছবির ভালোমন্দের কথাটাও তো আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে। কী বলেন?

টেকনিশিয়ানরা মহুয়ার এইরকম তীব্র মূর্তি দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। সবাই এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। তারপর ওদেরই মধ্যে একজন বললে : মহুয়া যখন কাজ শেষ করে খেতে চাইছে তখন তাই হোক।

মহুয়া একগাল হেসে বললে : নিন কালুদা, চটপট শটগুলো নিয়ে নিন।

চিত্রনাট্যের বাইরে মহুয়া এই যে অসাধারণ অভিনয় করল তার কোনও তুলনা হয়? মনে রাখতে হবে, মহুয়ার গা থেকে তখনও নতুনের গন্ধ মেলায়নি।

এর পরেও কি বলা যাবে না যে মহুয়া একজন বর্ন-আর্টিস্ট?

মহুয়া ছিল সন্তান-অন্তপ্রাণ। ওর একটিই সন্তান। পুত্রসন্তান। তার ডাকনাম গোলা। ভালো নাম তমাল। আমি যখন গোলাকে প্রথম দেখি তখন ওর বয়েস বছর দুয়েকের বেশি নয়। এখন যে স্টুডিওর নাম টেকনিশিয়ান্স-টু, তখন সেটির নাম ছিল নিউ থিয়েটার্স দু নম্বর স্টুডিও। আনোয়ার শা রোডের ওই স্টুডিওতে তখন পরিচালক তপন সিংহের অফিস ছিল। উনি তাঁর সব কাজ এই স্টুডিও থেকেই করতেন। একতলার ডান দিকের আর একটি ঘরে ছিল পরিচালক অগ্রদূত, অর্থাৎ বিভূতি লাহার অফিস।

তা সেবার ওই স্টুডিওতে নব্যেন্দু চ্যাটার্জির 'আজ কাল পরশুর গল্প' ছবির দিন দু-তিনেক ইনডোরে কাজ হয়েছিল। আগেই বলেছি মহুয়া ওই ছবির নায়িকা। নব্যেন্দু সাধারণত স্টুডিওতে কাজ করা পছন্দ করে না। গত ছ'-সাতখানা ছবিতে ও স্টুডিওর ধারও মাড়ায়নি। সবটাই আউটডোরে। ঘরের মধ্যেকার যে সব কাজ সেটাও আউটডোরে করত।

সেবার নব্যেন্দু বাধ্য হয়েছিল দু-তিন দিন ইনডোরে কাজ করতে। তার কারণ শান্তিনিকেতনের কাছে গোয়ালপাড়া গ্রামে মহুয়া আর নিরঞ্জন রায়ের, অর্থাৎ মুক্তা আর রামপদর বাড়ি হিসেবে যে বাড়িটাতে কাজ করা হয়েছিল, দীর্ঘ কয়েক মাসের ব্যবধানে সে বাড়িটির রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল। ছবিটার শুটিং তো অনেক দিন ধরে খেপে খেপে হয়েছে। বাড়ির মালিক জানত না যে ওই বাড়িতে আরও শুটিং বাকি আছে। তারা তাদের প্রয়োজন অনুসারে বাড়িটির রূপান্তর ঘটিয়ে নিয়েছে।

খবর পেয়ে তো নব্যেন্দুর মাথায় হাত। কী হবে এখন? অবশেষে ঠিক হল স্টুডিওতে ওই বাড়িটার সেট বানিয়ে বাকি কাজটুকু সেরে নেওয়া হবে। কিন্তু সত্যিকারের লোকেশনের সঙ্গে স্টুডিওর তৈরি সেটের একটা ফারাক তো থেকেই যায়। তাছাড়া যেখানে আগে শুটিং হয়েছে তার সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে একটা সেট তৈরি তো চাট্টিখানি কথা নয়। যেহেতু নব্যেন্দুর এটা বাস্তবধর্মী ছবি, আর ও যে রকম খুঁতখুঁতে, তাতে এতটুকু ফাঁকিবাজি চলবে না। সেটটি হওয়া চাই নিখুঁত। আর তাও করতে হবে ফটোগ্রাফ দেখে। কারণ আসল বাড়ি তো তখন ভাঙচুর হয়ে গেছে।

নব্যেন্দু ভাবতে বসল সেট তৈরির দায়িত্ব কাকে দেওয়া যায়। হঠাৎ মনে পড়ল শিল্পনির্দেশক রবি চ্যাটার্জির কথা। বাস্তবধর্মী সেট বানানোয় রবিবাবু ওস্তাদ। এক সময়ে ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' ছবির জন্যে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে রবিবাবু বাঁচির রাস্তার যে সেট বানিয়েছিলেন তা নিয়ে হই-চই পড়ে গিয়েছিল। দলে দলে মানুষ আসতেন ওঁর সেট দেখতে।

সেই রবিবাবু নব্যেন্দুর ছবির জন্যে যে সেট বানিয়ে দিলেন, সেটাও অসাধারণ। আমরা যারা লোকেশনে মূল বাড়িটা দেখেছি, তারাও কোনও খুঁত ধরতে পারলাম না। সেই ছিটেবেড়ার দেওয়াল, খুপরি ঘর, দরজা-জানালাবিহীন মাটির দেওয়াল, বাঁশের সিলিং। গোয়ালপাড়া গ্রামের দরিদ্র ভাগচাষীর একেবারে নিখুঁত বাড়ি। অথচ খরচ পড়ল খুবই সামান্য।

শিল্পনির্দেশক রবি চ্যাটার্জির এই বিশেষ গুণটি ছিল। অনেক দরিদ্র প্রযোজককে কেবলমাত্র মেটিরিয়াল কস্ট নিয়ে উনি সেট তৈরি করে দিয়েছেন। নিজের জন্যে এক পয়সাও পারিশ্রমিক নেননি। এরকম একদিন-আধদিন নয়, দিনের পর দিন। যে কারণে ওঁর সমসাময়িক অনেক শিল্পনির্দেশকের বাড়ি হয়েছে, বৈভব হয়েছে, কিন্তু রবিবাবু সহজ সরল সাধারণ ভাবে জীবন কাটিয়ে গেছেন। তার জন্যে তাঁর কোনও দুঃখ ছিল না, ক্ষোভ ছিল না। সত্যিকারের শিল্পী হলে যা হয় তাই আর কী! ভালো কাজ জানতেন বলে রবিবাবুর কোনও দম্ভ ছিল না। কোনও অহঙ্কার ছিল না। পোশাক-পরিচ্ছদের বিলাসিতাও ছিল না।

তা সেবারের শিডিউলে আউটডোরে যেতে হবে না শুনে মহুয়া খুব খুশি। খুশির কারণ আর কিছু নয়, গোলাকে এ কদিন ছেড়ে থাকতে হবে না। রোজ শুটিং-এর সময় গোলাকে কাছে পাবে। গোলা অবশ্য কোনও দিনই সকালের দিকে স্টুডিওতে আসত না। মহুয়ার কাজের মেয়েটি ওকে নিয়ে বিকেল তিনটে নাগাদ আসত। শুটিং প্যাক-আপ হবার পর মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যেত।

'আজ কাল পরশুর গল্প'র আউটডোরে মহুয়া গোলার একটি সাবস্টিটিউট পেয়ে যেত। তার নাম টুবলু। টুবলু গোলার থেকে মাস ছয়েকের বড়। ও মহুয়া আর নিরঞ্জন রায়ের ছেলের রোলে কাজ

করেছিল। চরিত্রটির নাম খোকনা। খোকন শব্দেব গ্রাম্য সংস্করণ। সেই টুবলু এখন স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র। ওর পোশাকি নাম স্নেহাশিস ঘোষ।

টুবলু আমার ভায়রাভাই স্বর্গত ভবানীচরণ ঘোষের ছোট ছেলে। ওরা বেলগাছিয়ায় নব্যেন্দুদের পাড়াতেই থাকে! টুবলুকে নব্যেন্দুর কাছে আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। নিয়ে গিয়েছিলাম বললে ভুল হবে, ও একদিন আমার সঙ্গে নব্যেন্দুদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। তখনই ওকে দেখে নব্যেন্দুর পছন্দ হয়ে যায়। রামপদ আর মুক্তার ছেলের জন্যে নব্যেন্দু ওরই বয়সের একটি ছেলে খুঁজছিল। ওই আড়াই বছর বয়সে টুবলু তো অভিনয়ের অ-আ-ক-খ-ও জানত না। কিন্তু নব্যেন্দু ওকে তার ছবিতে দারুণভাবে ব্যবহার করেছে।

অভিনয়ের খাতিরে নয়, মহুয়া বোধহয় টুবলুকে সত্যি সত্যি নিজের ছেলের মতোই ভালোবেসে ফেলেছিল। আউটডোরে যাবার সময় কলকাতা থেকে টুবলুর জন্যে একরাশ টফি আর লজেন্স কিনে নিয়ে যেত। খেলবাব জন্যে রঙ-বেরঙের বল নিয়ে যেত। ছোটবেলায় টুবলু ছিল ভয়ানক দুষ্টু। মহুয়া টুবলুর সে-সব দুষ্টুমি হাসিমুখে সহ্য করত। টুবলুব ছিল একমাথা ঝাঁকড়া চুল। শুটিং থেকে ফিরে মহুয়া টুবলুর মাথা আঁচড়ে মেয়েদের মতো বিনুনি করে দিত।

টুবলু মহুয়াকে ডাকত মউ-মা বলে। লোকেশানে ওর নিজের মা কমলা ঘোষও থাকতেন টুবলুর দেখভাল করবার জন্যে। কিন্তু টুবলু নিজের মায়ের কাছে বিশেষ ঘেঁষত না রাত্রে শোবার সময়টুকু ছাড়া। বাকি সময়টা মহুয়ার গায়ে গায়ে লেপটে থাকত। যা কিছু আদব-আবদার সব মহুয়ার কাছে।

আমি মহুয়াকে মাঝে মাঝে সাবধান করে দিতাম। বলতাম : মউ, তুমি টুবলুকে অত প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন? দেখছ না সর্বক্ষণ কী রকম দুষ্টুমি করছে। তোমাকে একটু বিশ্রাম পর্যন্ত নিতে দিচ্ছে না।

মহুয়া হাসতে হাসতে জবাব দিত : করুক দুষ্টুমি। ও কাছে থাকলে গোলার কথাটা ভুলে থাকতে পারি। গোলার মতো টুবলুও তো আমার আর একটা ছেলে। ওরা দুজনেই তো প্রায় একবয়েসী। ও কাছে থাকলে মনে হয় গোলা আমার কাছে আছে।

তারপরই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত : গোলাটা এখন কী করছে কে জানে।

বুঝলাম মা-মহুয়ার বুকটা এখন টন টন করছে ছেলের জন্যে। টুবলুকে কাছে পেয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে।

তা সেবার এন টি দু নম্বর স্টুডিওর ইনডোরে শুটিং করার সময় গোলা যখন আসত তখন তাকে 'ভাই ভাই' বলে আদর করার কী বহর টুবলুর। যেহেতু গোলার থেকে ছ'মাসের বড় তাই দাদা হবার অধিকার ছিল বইকি ওর। ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে স্টুডিওর সারা বাগানটা ঘুরে ঘুরে বেড়াত। আমি মহুয়া আর কমলাদেবী দুজনকেই সাবধান করে বলে দিয়েছিলাম : ওদের ওপর একটু নজর রেখো তোমরা। রাস্তার দিকে যেন চলে-টলে না যায়। আনোয়ার শা রোডের ওপর বাস মিনিবাসগুলো যা রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ায়।

একদিন তো আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে রেগেও গিয়েছিলাম। খোকাবাবু অর্থাৎ বিভূতি লাহার ঘরে আমি, খোকাবাবু আর এডিটর সুবোধ রায় বসে বসে পুরনো দিনের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির গল্প করছিলাম। সিনেমা লাইনে সবাই বিভূতি লাহাকে খোকাবাবু বলেন। ওটা ওঁর ডাকনাম। আমি তো কোনওদিন কাউকে ওঁকে বিভূতিবাবু বা বিভূতিদা বলে ডাকতে শুনিনি। প্রবীণদের কাছে উনি খোকা বা খোকাবাবু। তরুণদের কাছে খোকাদা। ইদানীং পক্ককেশে খোকা ডাকটা যতই বেমানান হোক, এখনও উনি ওই নামেই বিখ্যাত।

তা গল্প করতে করতে হঠাৎ খোকাবাবুর ঘরের জানালার বাইরে নজর পড়ল। দেখলাম টুবলু আর গোলা হাত ধরাধরি করে স্টুডিওর গেটের দিকে যাচ্ছে। আমি খোকাবাবুর ঘর থেকে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলাম : অ্যাই টুবলু, তোরা ওদিকে কোথা যাচ্ছিস? আচ্ছা বে-আক্কেলে তোদের মায়েরা তো। ছেলে দুটোর দিকে একটু নজর রাখতে পারে না!

হঠাৎ গেটের দিকের একটা গাছের নীচে থেকে মহুয়া উঁচু গলায় বলে উঠল : তোমার ভাববার কিছু নেই রবিদা। আমরা এখানেই আছি। ওদের চোখে চোখে রাখছি। তুমি যেমন আড্ডা দিচ্ছিলে

তেমনি দাওগে যাও। ওদের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

মহুয়ার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম, মহুয়া আর কমলাদেবী পাশাপাশি বসে দাঁত বার করে হাসছে।

ওদের হাসি দেখে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। বললাম : ওখানে বসে নজর রাখবার দরকার নেই। তোমরা মেক-আপ রুমের দিকে বসে গপ্পো করোগে যাও। ওরা দুজনে সেদিকেই খেলা করুক। এদিকে যেন না আসে।

আমার কথায় কাজ হল। মহুয়া ধরল টুবলুর হাত, আর কমলা ধরলেন গোলার হাত। ওরা মেক-আপ রুমের দিকে যেতে লাগল। আমিও ওদের পেছন পেছন গেলাম।

যেতে যেতে মহুয়া বললে : বউদি, তুমি তোমার টুবলুকে আমাকে দাও। আমি ওকে মানুষ করব। গোলার তাহলে একটা খেলার সঙ্গী হবে। ওদের দুটিতে কেমন ভাব-ভালোবাসা দেখছ তো!

কমলা হাসতে হাসতে বললেন : অত আদিখ্যেতায় দরকার নেই ভাই। এর পরে তোমার কোলে যখন আর একটি গোলার খেলার সঙ্গী আসবে তখন টুবলুর কী হবে?

মহুয়াও হাসতে হাসতে বললে : রক্ষে কর বউদি। একা রামে রক্ষা নেই তার আবার সুগ্রীব দোসর। আর ছেলেপুলের দরকার নেই। গোলা আমার সুস্থ সবল হয়ে বেঁচে থাক।

এমন সময় সেট থেকে টুবলুর ডাক পড়ল। কমলা টুবলুর হাত ধরে সেটের দিকে চলে গেলেন।

আমি মহুয়ার কানের কাছে মুখ দিয়ে এসে বললাম : হ্যাঁ রে মউ, সত্যিই কি তোদের আর বাচ্চা-টাচ্চা হবে না?

মহুয়া কপট রাগ দেখিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বললে : সে খবরে তোমার দরকার কী? বুড়ো ভাম কোথাকার! অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে এইসব কথাবার্তা বলতে খুব ভালো লাগে, তাই না?

আমি বললাম : এই দ্যাখ, তুই মিছিমিছি রেগে যাচ্ছিস! ঠাট্টা-তামাসাও বুঝিস না? যার হিউমার সেন্স নেই সে কোনওদিন বড় আর্টিস্ট হতে পারে না। বুঝলি?

মহুয়া বললে : দরকার নেই আমার বড় আর্টিস্ট হয়ে। তোমার ওই সব গাড়োয়ানি রসিকতা বুঝে আমাকে যদি বড় আর্টিস্ট হতে হয় তো তেমন আর্টিস্ট আমি হতে চাই না।

আমি বুঝতে পারলাম না মহুয়া সত্যি সত্যি রেগে গেছে কি না। তাই আমার দু' কানে হাত দিয়ে বললাম : আমার ঘাট হয়ে গেছে বাবা। আমাকে ক্ষমা করে দাও।

আমার ওই কাঁচুমাচু ভঙ্গি দেখে মহুয়ার সে কী খিল খিল হাসি। ওর হাসির আওয়াজ পেয়ে খোকাবাবু আর সুবোধবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ওঁদের বেরিয়ে আসতে দেখে আমি চট করে কান থেকে হাত দুটো নামিয়ে নিলাম।

সুবোধবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন : কী ব্যাপার রবিবাবু, মহুয়া এমন পাগলের মতো হাসছে কেন?

আমি বললাম : ও কিছু না। মহুয়া হাসির অ্যাকটিং কেমন করতে পারে তার নমুনা দেখাচ্ছিল আমাকে।

কথাটা শুনে সুবোধবাবু হাসতে লাগলেন। খোকাবাবুর স্বাভাবিক গাম্ভীর্যেও যেন একটু চিড় খেয়েছে বলে মনে হল। ওঁর মুখেও যেন এক চিলতে হাসি দেখতে পেলাম।

ওঁরা দুজনে ঘরে ঢুকে যেতে আমি বললাম : এটা কী হল মউ? আর একটু হলে আমাকে বে-ইজ্জৎ করে দিচ্ছিলি আর কি!

মহুয়া ঠোঁট চাপা হাসি হেসে বললে : বেশ করেছি। আর কোনওদিন আমার পেছনে লাগতে আসবে?

সেই হাসিখুশি প্রাণচঞ্চল মেয়েটা এমন হঠাৎ করে হারিয়ে গেল যে ভাবতেও বুক ফেটে যায়।

শুধু টুবলুর জন্যেই নয়, পৃথিবীর তাবৎ শিশুর জন্যেই বোধহয় মহুয়ার বুকের মধ্যে ভালোবাসা জমা হয়ে ছিল। একদিনের একটা ঘটনার কথা বলি।

সুজিত গুহ পরিচালিত 'অভিমান' বোধহয় মহুয়ার শেষ ছবিগুলোর একটি। ছবিটা মুক্তি পেয়েছিল মহুয়ার মৃত্যুর পর। দর্শকরা একবুক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সে ছবিটি দেখেছিলেন। সেই ছবিরই একদিনের

শুটিংয়ের একটা ঘটনা বলি।

সেবার 'অভিমান' ছবির শুটিং ছিল এন্টালি অঞ্চলে ক্যানাল রোডের একটি বাড়িতে। বাড়িটি বোধহয় প্রযোজকদের কোনও একজনের। সাহেবি আমলের বাড়ি। বিরাট বিরাট ঘর। উঁচু উঁচু সিলিং। শুটিংয়ের আয়োজনও বিরাট। তিনটে কি চারটে দমকলের গাড়ি এসেছে জলভরা অবস্থায়। কৃত্রিম বৃষ্টিপাত দেখানোব জন্যে প্রচুর ঝাঁঝরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে আর্টিস্ট আর টেকনিশিয়ান ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। কিন্তু কম্পাউন্ডের বাইরে বিরাট ভিড়। তারা শুটিংয়ের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তবুও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে যদি কিছু দেখা যায়।

সাংবাদিক হিসেবে বোধহয় একমাত্র আমিই ছিলাম সেখানে। তবে আমি আমন্ত্রিত নয়। সুখেন, মানে অভিনেতা সুখেন দাস আমাকে জোর কবে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

দৃশ্যটি ছিল মহুয়া আর সুখেন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কম্পাউন্ডের ভেতরকার উঠোন পেরিয়ে মূল বাড়ির দালানে এসে উঠবে। বাব ছয়েক এন-জি হবার পর দৃশ্যটি গৃহীত হল। এই দৃশ্যে শিল্পীদের বিশেষ কিছুই অভিনয় কবার ছিল না। তবু যে এতবাব এন-জি হল সেটা টেকনিক্যাল কারণে। কখনও বৃষ্টিপাত ঠিকমতো হয় তো ক্যামেরায় গণ্ডগোল। আবার কখনও ক্যামেরা ঠিকমত চলে তো বৃষ্টিপাতের গণ্ডগোল।

যাই হোক, ছ'বারের পর যখন দৃশ্যটি গৃহীত হল তখন মহুয়া আর সুখেন দুজনেই ভিজে ঢোল। পরের দৃশ্য ঘরের ভেতরে। অন্য দিনের। কাজেই সুখেন আর মহুয়া দুজনেই ভেতরের কোনও এক জায়গা থেকে পোশাক পাল্টে এল। মহুয়া এসে আমাব পাশেই বসল।

মহুয়াকে দেখে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। মনে হল এতক্ষণ বৃষ্টিতে ভেজার জের এটা। কিন্তু কথাবার্তা বলে মনে হল অন্যরকম। আমি মহুয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম . কেমন আছিস মউ?

মহুয়া খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল কবে আমার দিকে তাকিযে রইল। তাবপর বললে : আমি ভালো নেই রবিদা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম · কেন রে? বৃষ্টিতে ভিজে শরীর খারাপ লাগছে?

মহুয়া বললে . না না, এটা তেমন কিছু নয়। ভয় হচ্ছে পরে না সর্দি হয়ে যায়।

আমি বললাম : তাহলে তুই ভালো নেই কথাটা বললি কেন?

মহুয়া বললে : কেন জানি না, গত ক'মাস ধরে আমার মনে হচ্ছে আমি অন্য কোথাও চলে যাই। এই পৃথিবী, মানুষজন, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি, গোলমাল-গণ্ডগোল কিছুই আর ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাই।

আমি বললাম : দূর পাগলি। ওসব কিছু নয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কখনও না কখনও এইরকম ক্লান্তি আসে। মনের ওইরকম অবস্থায় সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। পরে আবার সব ঠিক হয়ে যায়। এই পৃথিবীর মায়ার বন্ধন কাটানো কি সহজ?

মহুয়া বললে : মায়ার বন্ধন তো কাটাতে চাইছি না ববিদা। আমি কটা দিন অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে চাই। একেবারে নিরিবিলিতে। মনের এই ক্লান্তিটা কাটিয়ে আসতে চাই।

আমি বললাম : বেশ তো! মাসখানেক কোনও হিল স্টেশনে গিয়ে কাটিয়ে আয় না। তিলককে বল, ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। ওকে আর গোলাকে নিয়ে চলে যা।

মহুয়া বললে : গোলা যেতে পারবে না। ওর স্কুল কামাই হবে। তিলকেরও অফিস। দেখি, পারি তো আমি একাই চলে যাব। দিনকতক ঘুরে না এলে মরে যাব।

আমি বললাম : এই, মরার কথা বলবি না একদম। মরে যাবিই বা কোথায়? এই পৃথিবীর চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথাও আছে নাকি?

মহুয়া বললে : না গো রবিদা। মরতে আমি চাই না। আমি অনেক দিন বেঁচে থাকতে চাই। আমাকে এখনও অনেক কিছু করতে হবে।

যেদিন মহুয়ার সঙ্গে এসব কথা হচ্ছিল, সেদিন কি আর জানতাম যে আর কিছু দিনের মধ্যেই সত্যি সত্যি মহুয়াকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। বিধাতার কী অদ্ভুত বিচার। যে মেয়েটা পৃথিবীতে অনেক

দিন বাঁচতে চেয়েছিল, অনেক কিছু করতে চেয়েছিল, তাকেই সবার আগে নিজের কাছে টেনে নিলেন তিনি!

মহুয়া ওই অনেক কিছু করার কথা বলতেই মনে পড়ে গেল আর একটা কথা। মহুয়ার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম : কনগ্র্যাচুলেশন্স!

মহুয়া অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। বললে : হঠাৎ?

আমি বললাম : টিভিতে তোর টেলিফিল্ম 'আদমী ঔর আওরত' দেখলাম। দারুণ কাজ করেছিস।

মহুয়া একটু লজ্জা পেয়ে গেল। বললে : আমার আর কী! সবটাই তপনদার ক্রেডিট।

আমি বললাম . সেটা ঠিক। তবে তুই অমল পালেকরের মতো অমন একজন দুঁদে আর্টিস্টের পাশে দাঁড়িয়ে যে রকম দাপটে অভিনয় করেছিস তাতে তোর ক্রেডিট আছে বলতেই হবে। বিশেষ করে হসপিটালের শেষ দৃশ্যে। তোর সারা মুখে যে অপূর্ব মাতৃত্বময়ী ভাব ফুটিয়ে তুলেছিস তার তুলনা হয় না।

মহুয়া একটু হেসে বললে . ওটাও আমার ক্রেডিট নয়। গোলার।

আমি বললাম : তার মানে?

মহুয়া বললে · ওই সময়ে আমি গোলার কথাই ভাবছিলাম যে!

বুঝলাম মহুয়া গোলা-অন্ত প্রাণ। ওকে ছেড়ে দু-চারদিনের বেশি কোথাও থাকতে পারবে বলে মনে হয় না।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মহুয়া ঘন ঘন জিভ বার করে আমাকে দেখাতে লাগল। ওর এই ব্যবহারে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। হচ্ছে একটা সিরিয়াস কথা, ও তার মধ্যে এমন করে জিভ ভেংচি কাটছে!

আমি বললাম : এ কী মউ! তুই এভাবে আমাকে ভেঙচি কাটছিস কেন?

মহুয়া হাসতে হাসতে বললে : তোমাকে নয় গো ববিদা। তোমার পেছন দিকে দেখো।

মহুয়ার কথায় পেছন ফিরে দেখলাম। সর্বনাশ! চার থেকে ছ'বছর বয়সের বয়সের গোটা পাঁচ-ছয় বাচ্চা বিরাট জানালার গরাদে পাকা ফলের মতো ঝুলে আছে। আর তারা সমানে মহুয়াকে জিভ দেখিয়ে যাচ্ছে।

বুঝলাম মহুয়া আবার তার শিশু বয়সে ফিরে গেছে। অথবা ওদের মধ্যেই সে তার প্রাণাধিক প্রিয় গোলাকে দেখতে পাচ্ছে।

গোলা এখন যৌবন ছুঁতে চলেছে। ১৯৮৫ সালে মহুয়ার প্রয়াণের দীর্ঘ দশ বছর পরে গোলার স্মৃতিতে কি তার মায়ের চেহারাটা ফিকে হয়ে এসেছে? অথবা বুকের মধ্যে কান্না আর দীর্ঘশ্বাস চেপে দিন কাটাচ্ছে সে? কে জানে!

মহুয়ার কথা লিখতে বসে আজ কত স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে। সব কথা লিখতে গেলে একখানা ছোটখাটো মহাভারত হয়ে যাবে। সেটা তো আর সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে একটা সময়ে কলমের রাশ টেনে ধরতে হচ্ছে।

মহুয়ার সঙ্গে আমার আগে আলাপ হলেও ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল ১৯৮০ সালে 'আজ কাল পরশুর গল্প' ছবি করার সময়। সেই সময়ে একদিন মহুয়াকে বলেছিলাম : জানিস মউ, তোর সঙ্গে আরও আগে আলাপ হলে তোকে নিয়ে কত কী লিখতে পারতাম। এখন তো আমি রিটায়ার্ড পার্সন। তোকে নিয়ে লেখবার কোনও সুযোগই নেই।

মহুয়া বললে : ছাই লিখতে! তোমাদের লেখা তো আমি জানি। কে কার সঙ্গে প্রেম করছে, কার সঙ্গে ঢলাঢলি করছে—এইসব। ওসব লেখা আমার একদম ভালো লাগে না।

আমি বললাম : আমাকে দেখে তোর তাই মনে হয় বুঝি?

মহুয়া বললে : হয় না বলেই তো তোমার কাছে প্রাণের কথা খুলে বলি। গল্প করি।

অথচ এই মহুয়ার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে গিয়েছিলাম ওদের দমদমের বাড়িতে। মহুয়ার

মা কাজ করতেন ক্যালকাটা টেলিফোনসে। কর্মসূত্রে তিনি দমদমে একটা সরকারি ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন। ওখানে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীপঞ্চানন। একজন স্বনামখ্যাত পুরুষ। ওর সঙ্গে মহুয়ার মায়ের পরিচয় ছিল।

ওদের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, মহুয়া ওর মায়ের সঙ্গে কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেছে। ফিরতে রাত হবে। মহুয়ার ছবি 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' তখন সবে মুক্তি পেয়েছে। বেশ প্রশংসাও হয়েছে ওর কাজের। স্বভাবতই আত্মীয়মহলে তখন মহুয়ার সমাদর প্রচুর। ওর দেখা না পেয়ে ওর বাবা নীলাঞ্জনবাবুর সঙ্গে গল্প করে ফিরে এসেছিলাম সেদিন।

মহুয়াকে সেদিনকার ঘটনার কথা বলতে মহুয়া গালে হাত দিয়ে বলেছিল : ও মা! তাই নাকি! তা আগে থেকে একটা খবর দিয়ে রাখলে না কেন? তাহলে বাড়িতে থাকতে পারতাম।

আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম : কী করে জানব বল যে একটা ছবি রিলিজ করতে না করতেই তুমি অমন ভি আই পি হয়ে যাবে। তাহলে আগে থাকতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তারপর যেতাম।

মহুয়া বললে · ঠাট্টা করছ রবিদা! কিন্তু সাকসেস আর ফেলিওর কোনওটাই তো আমার হাতে নয়। সব ওপরওলার ইচ্ছে। তিনি যেমনভাবে আমাদের চালাবেন সেইভাবেই চলতে হবে। নিজেদের করাব কিছুই নেই।

মহুয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। ভগবানকে শ্রদ্ধা করত, ভক্তি করত, ভালোবাসত। সেই মহুয়াকে তার ঈশ্বর এমনভাবে বঞ্চনা করবে, তা কি সে জানত?

আমিও ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করি। পূজা করি। কিন্তু মহুয়ার কথা যখন ভাবি তখন সেই ঈশ্বরভক্তিতে চিড় খেয়ে যায়। ঈশ্বরকে তখন অপরাধী মনে হয়।

আজও টিভি-র পর্দায় যখন মহুয়ার ছবি দেখি, তখন বুকের ভেতরটায় ব্যথা আর বেদনা মোচড় দিয়ে ওঠে। বুকটা হু হু করে। ওকে নিয়ে লিখতে বসলে চোখে জল এসে যায়। সেই জলভরা চোখেই হতভাগিনী মহুয়ার স্মৃতিচারণ আপাতত শেষ করছি। ও যেখানে গেছে সেখানে যেন শান্তি পায়।

উত্তমকুমার

উত্তমকুমার সম্পর্কে লেখা শুরু করার আগে সর্বসাধারণ্যে আমার কিছু নিবেদন আছে। উত্তমকুমার এমনই এক বর্ণময় চরিত্র, তাঁর জীবনে এত বেশি ঘটনা এবং দুর্ঘটনা যে তাঁকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্রকায় মহাভারত রচনা করা যায়। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, তাই আমি উত্তমবাবুর জীবনের বিশেষ কয়েকটি ঘটনার মধ্যেই আমার এই রচনা সীমাবদ্ধ রাখব। এতে হয়তো রচনাটি কিছুটা খাপছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু এ ছাড়া তো কোন উপায় নেই।

কিন্তু উত্তমবাবুকে নিয়ে লেখাটা ঠিক কোন্ জায়গা থেকে শুরু করি। উত্তমকুমারের জন্ম যে তাঁর মামারবাড়ি আহিরিটোলায় ১৯২৬ সালের তেসবা সেপ্টেম্বর এটা তো প্রায় সকলেরই জানা। তাঁর পিতৃদত্ত নাম যে অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায এবং মামাববাড়ির গুরুদেব যে উত্তমকুমার নামকরণ করেছিলেন এ তথ্যও তো অনেকেরই জানা। কাজেই উত্তমকুমারের ছোটবেলার দিকে না এগনোই ভালো। তবে লিখতে লিখতে কোনও প্রসঙ্গে ছোটবেলার কথা যদি এসে যায়, তাহলে সেটা তো আলাদা কথা।

তার চেয়ে বরং আমার স্মৃতির সরণিতে পরিক্রমণই বোধহয় ভালো। মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে কাজে-অকাজে সকাল দুপুর সন্ধ্যা কিংবা গভীর রজনীতে আমার বহুবার দেখা হয়েছে। প্রচুর আলাপচারিতার সুযোগ পেয়েছি সেই সব সময়ে। সেইসব আলাপচারিতার কিছু কিছু বিবরণ স্মৃতির গভীর থেকে তুলে আনতে পারলে উত্তমকুমারের মনন এবং মানসিকতার কিছু পরিচয় হয়তো পাওয়া যেতে পারে। আমার তো মনে হয় সেই পথ ধরে এগনোই ভালো।

তাহলে প্রথমেই বলতে হয় ১৯৬৮ সালের এক মধ্যরাতের কথা। সেই সময়ে আমি থাকতাম উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিট অঞ্চলে হেদুয়ার পাশে রায়বাগান স্ট্রিটের তিন নম্বর বাড়িতে। সেদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলাম। নিদ্রাকর্ষণের এটা আমার একটা পুরনো অভ্যাস। ঘুমটা তখন আসি আসি করছে। একটু আগে পাশের বাড়ির দেওয়ালঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ আমার কানে এসেছে। এমন সময় পর পর তিন-চারবার কড়া নাড়ার আওয়াজ পেলাম। প্রথমে সেই কড়া নাড়াটাকে গুরুত্ব দিইনি। এত রাত্রে আমাদের বাড়িতে কে কড়া নাড়তে আসবে। পাশের বাড়ির ব্যানার্জিদের কানুদা অনেক রাত করে বাড়ি ফেরেন, এটা হয়তো ওদেরই দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ। কিন্তু তারপর আবার একটু ঘন ঘন কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম, আমাদেরই বাড়িতে কোন আগন্তুক এসেছেন এত রাত্রে। সচরাচর যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। একটা অজানা আশঙ্কায় আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল।

দরজা খুলে দেখি সামনে ন্যাপা দাঁড়িয়ে। ন্যাপা হলেন উত্তমকুমারের গাড়ির চালক। ছোটবেলা থেকেই উত্তমবাবুর বন্ধু। অবস্থা বিপাকে বন্ধুর কাছেই ড্রাইভারের চাকরি করতে হচ্ছে ন্যাপাকে। কিন্তু তার জন্যে উভয় তরফেই বন্ধুত্বের সম্পর্কের কোনও তারতম্য ঘটেনি।

আমাকে দরজা খুলতে দেখে ন্যাপা বললে : দাদা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এক্ষুনি একবার যেতে হবে।

আমি বললাম : সে কী। এত রাত্রে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন কেন? শরীর-টরীর আবার খারাপ হয়নি তো?

মাত্র কিছুদিন আগেই উত্তমবাবুর একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। তেমন মারাত্মক কিছু নয় যদিও, তাহলেও ডাক্তারের নির্দেশে ধরাকাটের মধ্যে আছে। নিয়মমাফিক খাওয়া-দাওয়া করতে হচ্ছে। সিঁড়ি ভাঙা একেবারেই বারণ।

আমার কথার উত্তরে ন্যাপা বললে : কই, শরীর-টরীর খারাপ বলে তো মনে হল না। আমাকে

শুধু বললেন, ন্যাপা একবার রবিবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি, খুব জরুরি দরকার।

আমি বললাম : গাড়ি নিয়ে এসেছো না ট্যাক্সি?

ন্যাপা বললে : গাড়ি নিয়েই এসেছি। দাদা তো তাই বললেন।

আমি বললাম : গাড়িটা কোথায়?

ন্যাপা বললে : হেদোর পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

আমি বললাম : ঠিক আছে। তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।

উত্তমবাবুর ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন আমার হাতের ঘড়িতে পৌণে একটা। উত্তমবাবুর ঘরে ঢুকে দেখলাম, তিনি তাঁর সামনে রাখা পানীয়ের গ্লাসে আয়েস করে চুমুক দিচ্ছেন। আমাকে দেখে একটু হেসে বললেন : ডিস্টার্ব করলাম তো। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?

আমি বললাম : না, ঠিক ঘুমোইনি। ঘুমটা আসব আসব করছিল, এমন সময় আপনার দূত গিয়ে হাজির। কী ব্যাপার বলুন তো? হঠাৎ এমন জরুরি তলব!

উত্তমবাবু আমার দিকে এক গ্লাস পানীয় এগিয়ে দিয়ে বললেন : ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়। বাড়িতে কেউ নেই তো। বেণু আউটডোর শুটিং-এ গেছে। খুব লোন্‌লি ফিল্ করছিলাম। তাই আপনাকে ডাকিয়ে আনলাম একটু গপ্পসপ্প করব বলে। আপনি রাগ করেননি তো?

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি বেণু হল সুপ্রিয়া দেবীর ডাকনাম। উনি তখন উত্তমবাবুর সঙ্গে ময়রা স্ট্রিটেই বসবাস করছেন।

উত্তমবাবুর কথার উত্তরে আমি বললাম : না না। আপনার ওপরে রাগ হলেও সে রাগ দীর্ঘক্ষণ পুষে রাখা যায় না। এমনই আপনার হাসির মহিমা। ওই হাসি দিয়েই তো আপনি বঙ্গবিজয় করেছেন।

উত্তমবাবু এবার আরও মোলায়েম করে হাসলেন। বললেন : তাই বুঝি?

আমি বললাম : তা নয় তো কী।

উত্তমবাবু বললেন : তা হলে আপনারা, মানে সাংবাদিকরা সেবার আমাকে বয়কট করেছিলেন কেন? আমার হাসিটা তখন কাজে লাগেনি বুঝি?

আমি বললাম : এই মরেছে! আপনি কি এত রাত্তিরে ঝগড়া করবার জন্যে ডেকে পাঠালেন নাকি? সে সব তো কবে চুকে-বুকে গেছে। ফরগেট অ্যান্ড ফরগিভের পর্ব তো সারা হয়ে গেছে।

তা উত্তমবাবুর সঙ্গে সাংবাদিকদের এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল বেশ কিছুদিন আছে। উত্তমবাবু কী কারণে জানি না একজন সিনিয়ার সাংবাদিককে তাঁর সেট থেকে বার করে দিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোক অন্যান্য সাংবাদিকদের এই ঘটনা জানান এবং প্রতিকারের জন্যে অনুরোধ করেন। অস্বীকার করব না, সাংবাদিকদের নিজেদের মধ্যে একটা রেষারেষি আছে। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে যদি কোনও সাংবাদিক অপমানিত হন তখন সবাই সমবেত ভাবে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ান। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। পত্র-পত্রিকায় উত্তমকুমারের ছবি ছাপা হত না। কোন ছবির স্টিল ছাপলে ক্যাপশনে তাঁর সহশিল্পীর নাম দেওয়া হত, কিন্তু উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হত 'জনৈক শিল্পী' বলে। ছবির সমালোচনায় অন্য সকলের অভিনয় সম্পর্কে ভালো-মন্দ বলা হত, কিন্তু উত্তমকুমার অভিনীত ভূমিকাটির কথা এড়িয়ে যাওয়া হত।

তা শেষ পর্যন্ত এই মনোমালিন্য মিটে গিয়েছিল। মধ্যস্থতা করেছিলেন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের একজন প্রচণ্ড শুভানুধ্যায়ী অসিত চৌধুরি। অসিতবাবু ছিলেন বিখ্যাত পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ছায়াবাণীর অন্যতম কর্ণধার। তাছাড়া তিনি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও এবং ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির একজন ডিরেক্টারও ছিলেন। অসিতবাবু বেশ কয়েক বছর হল প্রয়াত হয়েছেন। এখন তাঁর আরব্ধ কাজ দেখছেন তাঁর ভাগনে রামলাল নন্দী। রামবাবুরও অসিতবাবুর মতোই মানসিকতা।

অসিতবাবু যেমন বাংলা ছবির শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, তেমনি উত্তমকুমারের প্রচণ্ড শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। উভয়ের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল ঠিকই, কিন্তু তারও ওপরে প্রেম প্রীতির একটা মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

অথচ উত্তমবাবুর প্রথম জীবনে এই অসিতবাবুই ছিলেন উত্তমকুমারের ঘোরতর বিপক্ষে। তখন

উত্তমবাবু অভিনয়ের জগতে পায়ের নিচে একটু মাটি পাবার জন্যে দারুণভাবে স্ট্রাগল্‌ করছেন। পাড়ার গণেশদার অনুগ্রহে সেই কবে 'মায়াডোর' নামে একটা ছবিতে দু-চার সেকেন্ডের জন্যে পর্দায় মুখ দেখিয়েছিলেন। তখন থেকেই একটা নেশা ধরে গিয়েছিল। তারপর সুনন্দা দেবীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে নীতীন বসু পরিচালিত 'দৃষ্টিহীন' ছবিতে একটি অকিঞ্চিৎকর দৃশ্যে বর সেজে বসেছিলেন। তারপর সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কামনা' ছবিতে নায়ক করার চান্স পেলেন। নায়িকা ছিলেন ছবি রায়। সে ছবি সুপার ফ্লপ।

উত্তমবাবু ভাবলেন তাঁর এই উত্তমকুমার নামটাই বোধহয় গণ্ডগোল ঘটাচ্ছে। বোধহয় তেমন পয়মন্ত নয় নামটা। দু-একটা ছবিতে তিনি অরূপকুমার নাম নিয়ে ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করলেন। একবার ভেবেছিলেন পিতৃদত্ত অরুণকুমার নামটাই নেবেন। পরে ভাবলেন, ওই নাম ব্যবহারের কারণে যদি পোর্ট কমিশনার্সের চাকরিটা চলে যায়। যত কম মাইনেই হোক না কেন, একটা স্থায়ী চাকরি তো বটে। চাকরি ছাড়ার মতো মনোবল তখনও অর্জন করতে পারেননি উত্তমবাবু।

তা যখন ওইরকম দোদুল্যমান অবস্থায় আছেন, তাঁর বরাতে ছবির পর ছবি ফ্লপ করছে, বাজারে তাঁর নামই হয়ে গেছে 'এফ এম জি', অর্থাৎ ফ্লপ মাস্টার জেনারেল, ঠিক সেই সময়ে একটা বড় ছবিতে নায়ক করার ব্যাপারে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল।

উত্তমকুমারের মন আনন্দে উদ্বেল। এতদিন প্রতীক্ষার পর একটা কিছু করে দেখানোর মতো কাজ পাওয়া গেছে। পাথরচাপা কপাল থেকে পাথরটা বোধহয় এবার সরবে। তার জীবন থেকে ফ্লপ মাস্টার জেনারেলের কলঙ্ক বোধহয় এতদিনে ঘুচতে চলল।

যথা দিনে যথাসময়ে ধর্মতলায় সেই প্রযোজকের অফিসে হাজির হলেন উত্তমকুমার। আজ চুক্তিপত্র সই হবে। চুক্তির কাগজটি সামনে মেলে পকেট থেকে কলমটা খুলে সই করতে যাচ্ছেন উত্তমকুমার, এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন অসিত চৌধুরি। উত্তমকুমারের সামনে মেলে ধরা চুক্তিপত্রের দিকে এক নজর দৃষ্টিপাত করে তিনি প্রযোজককে বলে উঠলেন : এ কী করছেন মশাই। একজন ডাহা অপয়া শিল্পীকে সই করাচ্ছেন। আপনার ছবি তো ডাববাগুল হয়ে যাবে।

অসিতবাবুর কথা শুনে প্রযোজকের মুখের ভাব গেল বদলে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চুক্তিপত্রখানা তুলে নিলেন উত্তমবাবুর সামনে থেকে। বললেন : আজ তাহলে সই-সাবুদ থাক। আমরা আর একটু ভেবে দেখি। পরে আপনাকে খবর দেব।

লজ্জায় অপমানে উত্তমবাবুর মুখখানা পাংশু হয়ে গেল। পায়ের নিচে থেকে মাটি যেন সরে যেতে থাকল। নিদারুণ অপমানে জর্জরিত উত্তমকুমার বেরিয়ে এলেন প্রযোজকের অফিস থেকে। তাঁর দু চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। বাড়ি ফিরে সেদিন আর কিছু খেলেন না। সারা রাত কেঁদে কেঁদে মাথার বালিশ ভিজিয়ে ফেললেন। ভোরবেলা উঠে প্রভাতসূর্যের দিকে তাকিয়ে উত্তমকুমার প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি যদি সত্যিকারের ব্রাহ্মণ সন্তান হন তবে এ অপমানের প্রতিশোধ তিনি নেবেন।

হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিয়েছিলেন উত্তমকুমার। তবে অন্য কোনও ভাবে নয়। ভালো অভিনয় করে এই অপমানের জবাব তিনি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ওই প্রযোজকের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন উত্তমকুমার। আর অসিত চৌধুরি হয়ে উঠেছিলেন সেদিনের সেই অপমানিত উত্তমকুমারের পরম শুভানুধ্যায়ী।

এই অপমানের ঘটনার কথা আমাকে উত্তমবাবু বলেননি। বলেছিলেন অসিত চৌধুরি নিজেই। শুধু বলাই নয়, আমি এক সময়ে প্রসাদ পত্রিকায় যে উত্তমকুমার সংখ্যা বার করেছিলাম, সেখানে তিনি সেটা লিখেছিলেন।

ওই লেখাটা পাবার পর আমি উত্তমবাবুর কাছে ঘটনার সত্যাসত্য জানতে চেয়েছিলাম। উত্তমবাবু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন : আমি নিজে মুখ ফুটে এই ঘটনার কথা কোনদিন কাউকে বলিনি। আজ অসিতবাবু যখন নিজে থেকেই প্রকাশ করলেন, তখন আর আমার বলতে বাধা নেই।

এই বলে উত্তমবাবু পুরো ঘটনাটা আমাকে শুনিয়েছিলেন। শোনবার পর উত্তমবাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। যে মানুষটি তাঁকে একদিন চূড়ান্ত অপমান করেছিলেন, তাঁকে তিনি পাল্টা অপমান

করেননি কোনদিন। সে সুযোগ তো তাঁর ছিল। কিন্তু তা না করে তিনি তাঁকে অনায়াসে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন। কতটা মহৎ মনের অধিকারী হলে তবে যে সেটা করা যায় তা ভেবে মনে মনে নমস্কার জানিয়েছিলাম উত্তমকুমারকে।

তা সেই অসিত চৌধুরির মধ্যস্থতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে উত্তমকুমারের মনোমালিন্য মিটে গেল। খাদ্য ও পানীয়ের প্রচুর ভুরিভোজের মধ্যে দিয়ে এই মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ হল।

এতদিন পরে সেই মধ্যরাত্রে সেই প্রসঙ্গ ওঠায় আমি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তমবাবু বললেন : এই তো মুখ ভার হয়ে গেল আপনার। ঠিক আছে বাবা, আমি ওই প্রসঙ্গটা উইথড্র করে নিচ্ছি। এখন আর কোনও সিরিয়াস কথা নয়। খানিকটা হাসিঠাট্টা আর গপ্পোগুজব করা যাক খোলা মনে।

সেই রাত্রের উত্তমকুমারকে বেশ খানিকটা অন্যরকম মনে হচ্ছিল। অতি সহজ সরল, একেবারে সাধারণ মানুষেব মতো। এব আগে দিনেরবেলা যে উত্তমকুমারকে দেখি, তার থেকে একেবারে অন্যরকম। কথার মধ্যে সেই আধো-আধো ভাব নেই, কণ্ঠস্বরে পায়রার বকবকম শব্দের মধ্যে যে আদুরে-আদুরে ব্যাপারটা থাকে সেটা নেই, চোখেব সেই ঢুলু ঢুলু ভাবটিও অন্তর্হিত।

কৌতূহল নিরসনের জন্যে বললাম · উত্তমবাবু, একটা প্রশ্ন করব আপনাকে? ঠিক ঠিক জবাব দেবেন তো?

উত্তমবাবু বললেন : সাংবাদিকসুলভ কোনও সিরিয়াস প্রশ্ন না হলে উত্তর দেব। আপনাদের তো আবার ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও কী যেন করে, সেই ব্যাপারটা আছে তো!

আমি বললাম : না না, সেরকম সিরিয়াস কোনও প্রশ্ন নয়। এটা অন্য ব্যাপার।

উত্তমবাবু বললেন : কী ব্যাপার বলুন।

আমি বললাম : আপনাকে যখন দিনের বেলা সকলের মধ্যে দেখি তখন যেন মনে হয় আপনি সর্বক্ষণ অভিনয় করছেন। আপনি যে বিখ্যাত অভিনেতা উত্তমকুমার সেটা সব সময়ে মনে করিয়ে দিতে চান। অথচ এখন আপনাকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। এটা কেন মনে হচ্ছে আমার?

উত্তমবাবু বললেন : আপনি ঠিকই ধরেছেন। দিনের বেলা কী স্টুডিওতে আর কী বাড়িতে সর্বক্ষণ আমি আমার উত্তমকুমারের ইমেজটাকে ধরে রাখতে চাই। তবে কয়েকটা মুহূর্ত ছাড়া।

আমি বললাম : সেটা কখন?

উত্তমবাবু বললেন : প্রত্যহ সকালে যখন স্টুডিও যাবার আগে আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই, তখন আমি উত্তমকুমারের খোলসটা খুলে রাখি। আবার বাড়ি থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা পরে নিই।

আমি বললাম : এটা করে আপনার লাভ?

উত্তমবাবু বললেন : আমি নিজেকে সিনেমার হোলটাইমার হিসেবে ভাবতে চাই। আমার চলাফেরা, কথা বলা, সবটাতেই অ্যাকটিং-এর ছোঁয়া থাকে। হতে পারে সেটা সেদিন যে ছবির শুটিং করতে যাচ্ছি সেটার রিহার্সাল। কিংবা হয়তো গতকাল যে স্ক্রিপ্টটা শুনেছি তারই নায়কের চরিত্রের মহড়া।

আমি বললাম : ও বাবা। আপনি দেখছি সমস্ত ব্যাপারটা এত সিরিয়াসলি নেন।

উত্তমবাবু বললেন : না নিয়ে উপায় কী। নোটোর খাতায় যখন নাম লিখিয়েছি তখন সেটাকে সার্থক করে তুলতে হবে তো। তবে অনুশীলনের এই পদ্ধতিটা আমি শিখেছি আর একজন মহান শিল্পীকে দেখে।

আমি বললাম : কে তিনি?

উত্তমবাবু তাঁর দুই কানে হাত ঠেকিয়ে বললেন : উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান।

উত্তমকুমার যে অনুক্ষণ একটা অনুশীলনের মধ্যে থাকেন, এটা আমি তাঁকে আগে দেখে বুঝতে পারিনি। তখন ভাবতাম ওটা এক ধরনের নায়কোচিত স্টাইল। এর আগে পাড়ার অ্যামেচার ক্লাবের শিল্পীদের তো দেখেছি। পাড়ার মাঠে এক রাত্তির স্টেজ বেঁধে অভিনয় করার পর দিন থেকে পাড়ার প্যালাদা কিংবা হ্লোদার চলাফেরা, কথা বলার ধরনটাই কেমন বদলে যেত। এর জের চলত প্রায়

মাসখানেক ধরে। তারপর আবার যথাপূর্বং। ছোটখাটো খেলোয়াড়দেরও দেখেছি। একবার একটা সেঞ্চুরি হাঁকাবার পরদিন থেকেই তার জামার কলার উঠে যেত। উত্তমবাবুর ক্ষেত্রেও ভেবেছিলাম ব্যাপারটা সেই ধরনেরই কিছু। কিন্তু সেদিন গভীর রাতে উত্তমবাবুর সঙ্গে কথা বলার পর ওঁর সম্পর্কে আমার ধ্যানধারণা পুরোটাই বদলে গেল।

উত্তমবাবু যখন কথার পিঠে কথা বলতে গিয়ে উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁয়ের নাম উচ্চারণ করলেন, তখন আমার কৌতূহল ভয়ানকভাবে বেড়ে গেল। সেটা মেটাবার জন্যে একটা কথা জিজ্ঞাসা কবতে গিয়েও করা হল না টেলিফোনের আওয়াজে। ওই অত রাত্রে টেলিফোন আসাটা কিছুটা বিস্ময়কর বটে। তবে অভিনেতা অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়। ওঁদের বেলায় রাতটাই বোধহয় দিনের কাজ করে। সারাটা দিন ওঁরা কাজে অথবা অকাজে এতই ব্যস্ত থাকেন যে ওঁদের সঙ্গে দূরভাষে বাক্যবিনিময়ের প্রশস্ত সময় হল গভীর রাত। সেই সময়ে ওঁদের পাওয়া যাবেই।

টেলিফোনের আওয়াজটা কানে আসতে আমি নিজের মনেই বলে উঠলাম : এত রাত্রে আবার কে ফোন করছেন?

আমরা উত্তমবাবুর শোবার ঘরে মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে কথাবার্তা বলছিলাম। সেই অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে উত্তমবাবু বললেন : এটা নির্ঘাত বেণুর ফোন।

রিসিভার কানে উত্তমবাবুর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলাম, ওঁর অনুমানই ঠিক। সুপ্রিয়া দেবী সেই বর্ধমান না বীরভূমের কোন শুটিং স্পট থেকে উত্তমবাবুব শারীরিক ভালোমন্দের খোঁজখবর নিচ্ছেন। শেষের দিকে আমার নামও উচ্চারিত হতে শুনলাম। উত্তমবাবু বললেন : রবিবাবুব সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাচ্ছি।

আমার নাম শুনে সুপ্রিযা দেবী বোধহয় আশ্বস্ত হলেন। কোন মহিলার নাম শুনলে হয়তো টেলিফোনেই তুলকালাম করতেন। বলা যায় না, হয়তো এই বাত্রেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে ময়রা স্ট্রিটের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতেন। আসলে ওই সময়টায় উত্তমবাবু আব সুপ্রিয়া দেবী দুজনে দুজনকে চোখে হারাচ্ছিলেন তো!

টেলিফোন সেবে উত্তমবাবু বেশ পরিতৃপ্ত মুখে আবার আসরে এসে বললেন। সেই সময়ে আমি পুরনো কথার জের ধরে বললাম : বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেবের কথা কী বলছিলেন যেন?

উত্তমবাবু বললেন : আপনি তো জানেন আমি খাঁ সাহেবের একজন অন্ধ ভক্ত।

আমি বললাম : তা আর জানি না। আপনাদের মৌসুমী ক্লাবে তো খাঁ সাহেবকে নিয়ে একবার একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন, সেটা মনে আছে আমাব।

উত্তমবাবু বললেন : আপনি সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন নাকি?

আমি বললাম · ছিলাম বৈকি! আমি তখন উল্টোরথ পত্রিকায়। আপনিই তো আমাদের ফটোগ্রাফার হেমেন মিত্রকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন আমাদের সকলকে সেই অনুষ্ঠানে হাজির থাকবার জন্যে। হেমেন অনেকগুলো ছবিও তুলেছিল। আপনি গম্ভীর হয়ে বসে খাঁ সাহেবের গান শুনছিলেন, অথচ সতীনাথ মুখোপাধ্যায় পাগলের মতো তারিফ করছিলেন গান শুনতে শুনতে। আপনিও জায়গায় জায়গায় তারিফ করছিলেন তবে নিঃশব্দে, খুবই সংযত ভঙ্গিতে। আপনার ওই আচরণ আমার অদ্ভুত লেগেছিল। কারণ সেদিন খাঁ সাহেব যে মেজাজে গান গাইছিলেন তাতে তো পাগলের মতোই তারিফ করবার কথা।

আমার কথা শুনে উত্তমবাবু একটু হাসলেন। বললেন : সেদিন আপনাদের মতো আমিও পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। তবে সোচ্চারে সেটা প্রকাশ করতে পারিনি। আমার যে তখন উত্তমকুমারের ইমেজ রাখার দায় এসে গেছে। আসরের ওই অত লোকের সামনে তার কি আদেখলেপনা করা চলে। এখন অবশ্য হাসি পায় আমার ওই ধরনের ছেলেমানুষির কথা ভাবলে।

আমি বললাম : ওসব কথা থাক। খাঁ সাহেবের কাছ থেকে কী শিখেছিলেন বলুন।

উত্তমবাবু বললেন : শিখেছিলাম তন্ময়তা কাকে বলে। শিখেছিলাম সর্বক্ষণ নিজেকে অনুশীলনের মধ্যে রাখার কায়দা।

আমি বললাম : সেটা কী রকম একটু খুলে বলুন।

উত্তমবাবু বললেন : খাঁ সাহেবের বাড়িতে সেবার আমাকে যেতে হয়েছিল মৌসুমী ক্লাবের ব্যাপার নিয়ে। খাঁ সাহেব প্রায় প্রতি বছরই একবার করে কলকাতায় আসতেন শীতের মরসুমে বিভিন্ন কন্‌ফারেন্সে গাইবার জন্যে। তা সেবার শীতের মরসুমে মৌসুমী ক্লাবের সবাই ঠিক করলেন, আমাদের ক্লাবের ঘরোয়া আসরে খাঁ সাহেবকে দিয়ে গান গাওয়াতে হবে। সবাই আমাকে ধরলেন এই দৌত্য নিয়ে খাঁ সাহেবের কাছে যেতে হবে। খাঁ সাহেবের ছেলে মুনাব্বর আমার বন্ধুস্থানীয়। সেই সুবাদেই আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল। আমার মনে সন্দেহ ছিল খাঁ সাহেবকে এইরকম একটা ছোট্ট ঘরোয়া আসরে গান গাওয়াতে রাজি করানো যাবে কি না। তা সত্ত্বেও দুগ্গা বলে একদিন সকালে খাঁ সাহেবের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে শুনলাম খাঁ সাহেব তখন রেওয়াজে বসেছেন। রেওয়াজের সময় তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না। তবু মুনাব্বর বললে, উত্তমদা, আপনি একটু বসুন। আমি বাবাকে একবার খবর দিই যে আপনি এসেছেন। আপনার নাম শুনলে বাবা হয়তো দেখা করতে রাজি হয়েও যেতে পারেন।

আমি বললাম : খাঁ সাহেবের সঙ্গে আপনার আগে কখনো মোলাকাত হয়নি?

উত্তমবাবু বললেন : হয়েছে দু-একবার। তবে সেটা তেমন কোনও ঘনিষ্ঠ ব্যাপার নয়। ওঁর সঙ্গে তো আমার ভক্ত আর ভগবানের সম্পর্ক । তা সারা দেশে আমার মতো ভক্ত তো খাঁ সাহেবের হাজার হাজার আছে। তার মধ্যে কত বড় বড় ফিল্মস্টারও আছে। কাজেই সে আলাপ কিংবা পবিচয়টা তেমন কোনও ধর্তব্যের ব্যাপারই নয়।

আমি বললাম : তারপর কী হল বলুন। খাঁ সাহেব দেখা করলেন আপনার সঙ্গে?

উত্তমবাবু বললেন : মুনাব্বর আমাকে তো বসিয়ে রেখে ভেতরে গেল, আর ফিরে এলো ঠিক দু'মিনিটের মধ্যে। বললে, উত্তমদা, আপনার জন্যে আমাকে বাবার কাছে বকুনি খেতে হল। তো ওর কথা শুনে আমি বললাম, কেন কেন, আমার জন্যে তোমাকে বকুনি খেতে হল কেন? তার উত্তরে মুনাব্বর বললে, বকুনি খেতে হবে না। আপনার মতো একজন মসুর কলাকারকে সোজা বাবার কাছে না নিয়ে গিয়ে আমি কিনা বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখেছি। বললেন, শীগগিরি গিয়ে তাঁর কাছে মাফ চেয়ে নাও, আর ভেতরে নিয়ে এসো। তা আমার কী দোষ বলুন উত্তমদা! উনি তো নিজেই এই নিয়ম করেছেন যে রেওয়াজের সময় কেউ যেন তাঁর সঙ্গে দেখা না করে। এতে ওঁর সাধনার ব্যাঘাত ঘটে। তা আপনার বেলায় যে এই নিয়ম চলবে না, সেটা তো বাবা আমাকে বলে দেননি। যাই হোক, আপনি আমায় মাফ করে দিন উত্তমদা, আর শীগগির ভেতরে চলুন। নইলে বুড়ডার গোঁসা আরও বেড়ে যাবে। এই বলে মুনাব্বর হাসতে লাগল। বললে, আবার যদি কখনও জন্ম নিই তা হলে খোদা যেন আমাকে ফিল্মস্টার করে পাঠান। তাদের কদরই আলাদা।

আমি বললাম : তা হলে খাঁ সাহেব আপনাকে খুব ভালোবাসতেন বলুন।

উত্তমবাবু বললেন : মুনাব্বরের কথা শুনে আমারও সেই কথাটাই মনে হয়েছিল। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, কলাকার মাত্রই ছিলেন খাঁ সাহেবের প্রিয়জন। তা সে অভিনেতাই হোক বা গাইয়েই হোক অথবা বাজিয়েই হোক। তবে আমার প্রতি যে স্নেহটা একটু বেশি ছিল সেদিন তার প্রমাণ পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমি বললাম : কী ভাবে?

উত্তমবাবু বললেন : যে বড় গুলাম আলি খাঁ সাহেবকে প্রচুর সাধ্যসাধনা করে কনফারেন্সে আনতে হয় সেই বড়ে গুলাম আমার একটি কথায় মৌসুমী ক্লাবের মতো একটা অকিঞ্চিৎকর ঘরোয়া আসরে গান গাইতে রাজি হয়ে গেলেন। এরকম ঘটনা এর আগে আর কখনো হয়েছে কিনা তা আমি জানি না।

আমি বললাম : হ্যাঁ, এটা একটা অভিনব ঘটনা বটে। কিন্তু আপনি যে বললেন, আপনি ওঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন, সেটা কী ব্যাপার? সেই ঘটনাটায় আসুন।

উত্তমবাবু বললেন : বলছি রে বাবা, বলছি। এত তাড়া দেন কেন? আমি তো আপনাকে একটা আর্ট ফিল্মের স্ক্রিপ্ট শোনাচ্ছি না যে ধন ধন জাম্পকাট করে চলে যাব। গপ্পো করতে বসেছি, একটু

মেজাজ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বলতে দিন না। না কী ঘুম পেয়ে গেছে। তাই বাড়ি যাবার জন্যে ছটফট করছেন?

আমি বললাম : না, ঘুম ঠিক পায়নি। তবে রাত তো অনেক হল। আপনারও তো একটু রেস্ট দরকার। কাল সকালে শুটিং নেই?

উত্তমবাবু বললেন : শুটিং আছে বৈকি। আপনি ঠিকই বলেছেন। আর বেশি রাত জাগা ঠিক নয়। একটু আগে বেণুও ফোনে বলছিল বেশি রাত না জাগতে। তা হলে চটপট বাকি ঘটনাটা বলে নিই। ওটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

আমি বললাম : হ্যাঁ, তাই বলুন।

উত্তমবাবু বললেন : আমি ঘরে ঢোকামাত্র খাঁ সাহেব বলে উঠলেন, আইয়ে উত্তমকুমারজি, তসরিফ রাখখিয়ে। কিন্তু কথাটা তিনি সাধারণভাবে বললেন না। যে রাগে রেওয়াজ করছিলেন, সেই রাগের রেশ রেখে সুরেলা গলায়, ঠিক গানের মতো করে কথাগুলি বললেন। এবং তারপর অন্তত দশ মিনিট সেখানে ছিলাম, তার সর্বক্ষণই তিনি আমার কথার উত্তরে যা যা বললেন, তা ওই গানেরই সুরে। প্রায় গান গাইবার মতো করেই।

আমি বললাম : কী বললেন, সেটা মনে আছে আপনার?

উত্তমবাবু বললেন : সব কথা মনে নেই। তবে তাঁর মোদ্দা বক্তব্য, উত্তমকুমারজি, আপনার মতো একজন মসুর কলাকার আমার মতো একজন সাধারণ গায়ককে গান গাইতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি নিশ্চয় আপনাদের অনুষ্ঠানে যাব। একজন কলাকারের মনের বাসনা আর একজন কলাকার যদি পূর্ণ না করে তবে সেটা গুণাহ হবে। আমি তো সে কাজ করতে পারি না। আমি যাব, নিশ্চয় যাব।

কথাগুলো বলতে বলতে উত্তমবাবুর গলাটা আবেগে ভারি হয়ে এলো। কয়েক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে তিনি বললেন : অত বড় একজন শিল্পী, কিন্তু তাঁর কী বিনয়! অথচ আমরা কত সামান্য পুঁজি নিয়ে নিজেদের সম্পর্কে মনে মনে কত বড়াই না করি। একটা মানুষ যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পান, সেটা তাঁর নিজেরই গুণে। শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল খাঁ সাহেবের কথা শুনে।

আমি বললাম : আপনি এই বিনয়ের ব্যাপারটার কথা বলছিলেন নাকি? এটাই শিখেছেন খাঁ সাহেবের কাছে?

উত্তমবাবু বললেন : ওটা তো শিখেইছি। তার সঙ্গে আরও একটা বড় ব্যাপার শেখা হয়ে গেছে আমার।

আমি বললাম : সেটা কী?

উত্তমবাবু বললেন : আপনিই বলুন না সেটা কী হতে পারে। নিজেকে তো খুব বুদ্ধিমান বলে মনে করেন। এখন দেখা যাক আপনার বুদ্ধির দৌড় কতটা! আন্দাজ করুন দেখি আর কী শিখেছি।

আমি তো অনেক ভেবেও কোনও কূলকিনারা পেলাম না। অবশেষে বললাম : না উত্তমবাবু, আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না। আমি সারেন্ডার করছি। এবার আপনিই উত্তরটা দিয়ে দিন।

উত্তমবাবু বললেন : পারলেন না তো! আমি জানতাম পারবেন না। তবে তার জন্যে আপনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আপনি তো আর অভিনেতা নন। অথবা অন্য কোনও ধরনের পারফরমিং আর্টিস্ট নন। সেটা হলে চট করে ধরে ফেলতে পারতেন।

আমি বললাম : দাঁড়ান দাঁড়ান, আমাকে আর দু'মিনিট সময় দিন। আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

উত্তমবাবু আমার বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে রিস্টওয়াচটা একবার দেখে নিলেন। তারপর বললেন : ওরে বাবা, এ তো প্রায় ভোর হতে চলল। ঠিক আছে দু মিনিট সময় দিচ্ছি আপনাকে। তারপরই আজকের মতো সভা ভঙ্গ হবে।

দু' মিনিটও সময় লাগল না। প্রায় উত্তমবাবুর কথার পিঠেই জবাব দিলাম : আপনি খাঁ সাহেবের কাছ থেকে শিখেছেন কঠোরভাবে অনুশীলন করার শিক্ষা।

উত্তমবাবু বললেন : প্রায় ঠিকই ধরেছো আপনি। তবে আরও একটু আছে। আপনাকে তো বলেছি

খাঁ সাহেব যে রাগে রেওয়াজ করছিলেন সেই রাগেই সাধারণ কথাগুলোও গানে রূপান্তরিত করে আমার কথার জবাব দিচ্ছিলেন। এই ব্যাপারটা আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করল। উনি একটা মুহূর্তের জন্যও গান থেকে সরে আসতে চান না। হয়তো মুনাব্বরকেও যে ধমকানি দিয়েছেন, সেটাও এইভাবে গানের সুরে সুরে। কিন্তু আমি তো কই ওভাবে নিজেকে মগ্ন রাখতে শিখিনি আমার প্রফেশ্যানে!

আমি বললাম : সেই দিন থেকে আপনি নিজেকে সব সময় অভিনয়ের মধ্যে রাখতে লাগলেন?

উত্তমবাবু বললেন . ঠিক তাই। বাইরে থেকে আমাকে অনেকে ভাবতে পারেন আমি একটা স্টাইল করে চলছি ফিরছি কথা বলছি। কিন্তু না, এটা স্টাইল নয়। এটা আমার প্রতিমুহূর্তেব অনুশীলন। এটা শুরু হয় আমার প্রতিদিন ভোর থেকে। সকালে ম্যাসাজ নিই। তারপর খানিকটা ফেসিয়াল এক্সারসাইজ করি। আর তারপরই আমি উত্তমকুমার হয়ে যাই। বাদ শুধু ওই মায়ের সঙ্গে দেখা করার সময়টুকু।

আমি বললাম : আরও কয়েকটা মুহূর্ত বাদ থাকে।

উত্তমকুমাব চমকে উঠলেন আমার কথা শুনে। বললেন : আরও কটা মুহূর্ত? সেটা কখন?

আমি বললাম · আপনি যখন স্নান সেরে হাতে একগুচ্ছ জ্বলন্ত ধূপ নিয়ে ড্রইংরুমে রাখা আপনার বাবার ছবি আর সুপ্রিয়া দেবীর বাবার ছবির সামনে আরতি করেন, ওইসব মুহূর্তগুলি নিশ্চয় আপনার অ্যাকটিংয়ের আওতায় পড়ে না।

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন : আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার ওই আরতি করাটা লক্ষ করেছেন তো! তবে ওখানেও একটু ফাঁকিবাজি আছে। আমার আবতি করাটা ভক্তির দিক থেকে একেবারে খাঁটি, কিন্তু ওই যে হাত ঘোরানোর কায়দা, ওটা অ্যাকটিং। অনেক ছবিতেই আমাকে ওইভাবে ঠাকুরের সামনে আরতি করতে দেখা গেছে।

এই যে টুকরো টুকরো ভাবে নিজেকে তৈরি করা, এটাই উত্তমকুমারকে বড় করেছে। অভিনীতব্য চরিত্র নিয়ে তিনি যেভাবে চিন্তা করেন তেমন করে আর কেউ করেন কি না আমি জানি না। প্রকৃত অর্থে তাঁর কোনও গুরু নেই যাঁর কাছ থেকে তিনি নিয়ম করে অভিনয় শিখেছেন। যখন যাঁর কাছ থেকে যা নেবার তা একজন বাধ্য শিক্ষার্থীর মতো ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছেন। যেমন ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন শিখেছিলেন প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা সন্তোষ সিংহের কাছ থেকে। সন্তোষদা আমার কাছে নিজেই স্বীকার করেছেন উত্তমবাবুর নিষ্ঠার কথা। সন্তোষদা বলেছিলেন, সারা জীবনে অনেককেই অভিনয় শিখিয়েছি, এখনও রেগুলার রবীন্দ্রভারতীর স্টুডেন্টদের শেখাই, কিন্তু উত্তমের মতো অমন নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থী আমি আর একটিও দেখিনি। উত্তম অত্যন্ত পপুলার আর্টিস্ট, বাজারে তার কত নাম, প্রযোজকদের কাছে তার কত দাম, কিন্তু আমার কাছে যখন শিখতে বসতো তখন একেবারে নতুন শিক্ষার্থীর মতো তার ব্যবহার। এতটুকু দম্ভ নেই। এই যে শেখবার মানসিকতা, এটাই উত্তমকে বড় করেছে। আরও বড় করবে।

সন্তোষদার কথা শুনে একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তখন সবে অগ্রদূতের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ছবিটা রিলিজ করেছে। নিজের ইমেজ ভেঙে উত্তমবাবু রাইচরণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাই নিয়ে ভালো-মন্দ দুই ধরনের আলোচনাই চলেছে। সেই সময়ে একদিন ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে প্রখ্যাত অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা।

আমি স্টুডিওতে গিয়েছিলাম উত্তমবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। উনি ফ্লোরে ছিলেন। আমি আর ফ্লোরে গেলাম না। বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ফ্লোর থেকে বেরিয়ে মেক-আপ রুমে এলে ওঁর সঙ্গে দরকারি কথাটা সেরে নেব। এমন সময় দেখলাম কানুদা আসছেন। কানুদার কুশল সংবাদ নেবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কানুদা, আপনি 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ছবিটা দেখেছেন?

কানুদা বললেন : হ্যাঁ ভাই, দেখেছি।

আমি বললাম : উত্তমবাবুকে রাইচরণ হিসেবে কেমন লাগল?

কানুদা বললেন : ভালোই তো। বেশ ভালো। উত্তম খুব মন দিয়ে অভিনয় করেছে। তবে—

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তবে কী?

কানুদা বললেন : ছবিতে যখন রাইচরণ বয়স্ক হয়ে গেছে, তখন উত্তমের উচিত ছিল চোখের দৃষ্টিটাকে একটু ঝাপসা করে নেওয়া। ওর চোখ দুটো তখন কম বয়সের মতোই ঝক ঝক করছিল।

এটা করতে পারলে খুব ভালো হত।

কানুদা যখন এই কথা বলছিলেন, ঠিক সেই সময়ে উত্তমবাবু ফ্লোর থেকে বেরিয়ে মেক-আপ রুমের দিকে যাচ্ছিলেন। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম কানুদার প্রত্যেকটি কথাই তাঁর কানে গেছে।

সেদিন উত্তমবাবুর সঙ্গে দেখা করে দরকারি কাজের কথা সেরে চলে এসেছিলাম। রাইচরণ সম্পর্কে কানুদার মতামতের কথাটা ইচ্ছে করেই উত্থাপন করিনি। উত্তমবাবুও কিছু জিজ্ঞাসা করেননি।

এর কয়েক বছর পরে সুশীল মজুমদারের 'লাল পাথর' ছবিতে উত্তমবাবুর অভিনয় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ছবির একটি অংশে উত্তমবাবু হয়েছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ। বয়সের ভারে চোখ দুটো কুঁচকে গেছে। দু'চোখের দৃষ্টি ঘষা কাচের মতো। সঙ্গে সঙ্গে কানুদার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

এর কয়েকদিন পরেই উত্তমবাবুর সঙ্গে দেখা। উত্তমবাবু বললেন : আপনার সঙ্গে কানুদার দেখা হবে রবিবাবু?

আমি বললাম : হতে পারে।

উত্তমবাবু বললেন : দেখা হলে জেনে নেবেন তো, 'লাল পাথর' ছবিতে আমাব চোখের দৃষ্টিটা ঠিক ছিল কিনা!

সেই কতদিন আগে কানুদা কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু উত্তমবাবু সেটা মনে রেখেছিলেন। সুযোগ পাওয়া মাত্রই নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছেন।

এই ধরনের নিষ্ঠা না থাকলে কি আর বড় শিল্পী হওয়া যায়! মৃত্যুর এত বছর পরে আজও উত্তমকুমারকে নিয়ে যে দর্শকরা হইচই করছেন, এর মূলে যে প্রচণ্ড নিষ্ঠা ছিল সেটা তো আর অস্বীকার করা যায় না। এই গুণ ছিল বলেই না তিনি মহানায়ক হতে পেরেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে উত্তমকুমার কী একজন সর্বাংশে সুখী মানুষ ছিলেন? উত্তমবাবুর তিরোধানের পর এ প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করেছেন। আমি তাঁদের কোনও সদুত্তর দিতে পারিনি। পারিনি, কারণ এই প্রশ্নের উত্তরটা তো আমিও দীর্ঘকাল ধরে খুঁজে বেড়িয়েছি। উত্তমবাবুর সঙ্গে যতটুকু ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ আমার হয়েছে, তাতে করে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমি কোনওদিনই খুঁজে পাইনি। কখনও তাঁকে দেখে মনে হয়েছে দারুণ সুখী একটি মানুষ। আবার তার কয়েক দিনের মধ্যেই মনে হয়েছে এমন অসুখী মানুষ বোধহয় দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

এই সুখ-অসুখের ব্যাপারটা নিয়ে সরাসরি কোনওদিনই প্রশ্ন করতে পারিনি উত্তমবাবুকে। আসলে প্রশ্ন করার সাহসটাই হয়নি। সাহস যে হয়নি তার কারণও আছে। সে কারণটা হল উত্তমকুমারের চরিত্রের মধ্যেকার মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি। মানুষটাকে আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না।

কেন পারতাম না, তার কারণটা জানাই। অন্য কে তাঁকে কীভাবে দেখেছেন বা জেনেছেন, তা তো আমি বলতে পারব না। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাটুকুই কেবল বলতে পারি। এক একদিন উত্তমবাবু আমার সঙ্গে এতটাই হলাহলি আর গলাগলি করলেন যে মনে হল আমার চেয়ে বড় বন্ধু আর তাঁর কেউ নেই। আবার ঠিক তার পরের দিনই এমন ব্যবহার করলেন যে মনে হল তিনি যেন আমাকে চিনতেই পারছেন না। সেই সময়টায় মনে খুব কষ্ট হত। ভাবতাম আর ওঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করব না। চিরকাল শুনে এসেছি, 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ'। উত্তমবাবুর ওই ধরনের ব্যবহারের পর সেই প্রবাদবাক্যটির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতাম।

যেমন একটা দিনের ঘটনা বলি। এটা ঘটেছিল অগ্রগামী পরিচালিত 'বিলম্বিত লয়' ছবির তোপচাঁচির আউটডোরে। তোপচাঁচি উত্তমবাবুর খুব প্রিয় জায়গা। বিহার প্রদেশের এই অঞ্চলটির প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব। এখানে একটি নয়নাভিরাম লেক আছে। এই লেকে কত যে বাংলা ছবির শুটিং হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। নায়ক-নায়িকার কণ্ঠের প্রচুর রোম্যান্টিক গান এখনও বোধ হয় এই লেকের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। বিখ্যাত 'হারানো সুর' ছবির শুটিং করবার সময় থেকেই তোপচাঁচির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন উত্তমবাবু। নিজে তো জমি কিনেছেন, আরও অনেককে দিয়ে জমি কিনিয়েছেন। ইচ্ছে ছিল এখানে একটি অবসর-নিবাস তৈরি করবেন, কর্মক্লান্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে ওখানে কয়েকটা দিনের অবসর যাপন করে আসবেন। কিন্তু তাঁর সেই আশা পূর্ণ হয়নি। তার আগেই ঈশ্বর তাঁকে নিজের

কাছে টেনে নিয়েছেন। উত্তমবাবুর বড় সাধের সেই তোপচাঁচির জমি এখন কী অবস্থায় আছে তা আমি জানি না।

উত্তমবাবু আমাকে দিয়েও তোপচাঁচিতে জমি কেনাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার যে ভাঁড়ে মা ভবানী সেটা তো উনি জানতেন না। আজকের দিনে হয়তো কোনও সাংবাদিক জমি কেনার কথা ভাবতে পারেন। শুনেছি তো অনেকেই নাকি পাঁচ অঙ্কের মাইনে পান। কিন্তু আমাদের সেই আমলে তো তো ছিল না। সুতরাং জমি কেনার ব্যাপারটা আমার কাছে আকাশ-কুসুম।

তা আমার সেই অভাবের কথাটা তো উত্তমবাবুকে বলতে পারি না। ওঁর ধারণা ছিল সাংবাদিকরা প্রচুর রোজগার-টোজগাব করেন। কেউ কেউ তো করতেন নিশ্চয়। নইলে বাড়ি-গাড়ি করতেন কী করে! তাঁদের নিশ্চয় উপবি আয় ছিল। কিন্তু অধিকাংশেরই তো তা ছিল না। উত্তমবাবু সেটা জানলে হয়তো আমাকে প্লট বুকিংয়ের প্রথম কিস্তির টাকাটা নিজের পকেট থেকেই দিয়ে দিতেন। বুকের খাঁচাটা তো অনেক বড় ছিল তাঁর। গোপন দানধ্যান তো তাঁর প্রচুব ছিল। কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকে হাত পেতে টাকা-পয়সা তো নিতে পারি না। যতই উদার মনের মানুষ হোন উত্তমকুমার, টাকা-পয়সা লেনদেনেব সম্পর্ক ঘটলে প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট হতে বাধ্য।

তা সেবারে উত্তমবাবু হঠাৎ আমাকে তাগাদা দিয়ে বসলেন। বললেন : আপনাব নামে একটা পাঁচ কাঠার প্লট বুক করে দিচ্ছি রবিবাবু। ফার্স্ট ইন্সটলমেন্টের টাকাটা আপনি কালকে নিয়ে আসবেন। আর তোপচাঁচির মতো স্বাস্থ্যকর জায়গা আর হয় না মশাই। সাতদিন থাকলেই দেখবেন চেহারা ফিরে গেছে।

উত্তমবাবুর কথা শুনে আমি তো চোখে সর্ষেফুল দেখলাম। আজ সকালেই বাজার খরচের টাকা নিয়ে গৃহিণীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ মনকষাকষি হয়ে গেছে। আর উনি কি না বলছেন, ফার্স্ট ইন্সটলমেন্টেব টাকাটা কাল নিয়ে আসতে! কী করা যায় এখন?

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম : আপনিই তো বাডি কবছেন উত্তমবাবু সুতরাং আমার আর জমি কেনবার দরকার কী! অবসর কাটানোর জন্যে আপনি কয়েকটা দিন কি আর আমাকে থাকতে দেবেন না?

উত্তমবাবু বুঝলেন আমি জমি কেনার ব্যাপারে ইচ্ছুক নই। তাই এভাবে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছি। তিনি একটু হেসে বললেন : 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। এর পরে যখন জমির দর হু হু করে তিন-চার গুণ বেড়ে যাবে, তখন কিন্তু হা-হুতাশ করতে হবে।

আমি বললাম : বাঃ, আপনি খুব চমৎকারভাবে আমার কথাটাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন তো?

উত্তমবাবু বললেন : পাশ কাটিয়ে গেলাম! কোন কথাটা বলুন তো?

আমি বললাম : ওই যে বললাম, আপনার বাড়ির একখানা ঘরে মাঝে মাঝে অবসর কাটাতে যাব! ওখানে বসে আমাদের সেই প্রোজেক্টটায় হাত দেওয়া যাবে।

হ্যাঁ, উত্তমবাবুর সঙ্গে যুগ্মভাবে আমার একটা প্রোজেক্টে হাত দেবার কথা ছিল। সেটা হল উত্তমকুমারের পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনী রচনা। ওঁর জীবনীর ব্যাপারে আমি ওঁকে নিয়মিত তাগাদা দিতাম। এটা আমার মাথায় এসেছিল প্রসাদ পত্রিকার উত্তমকুমার সংখ্যা প্রকাশ করার সময় থেকে। তার আগে অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেনকে নিয়ে নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিখ্যাত সাহিত্যিক আলবেয়ার কামুর একটি লেখা পড়েছিলাম। কী অসাধারণ সেই লেখা।

আমিও চেয়েছিলাম উত্তমকুমারকে নিয়ে কোনও বিশিষ্ট সাহিত্যিক একটি বই লিখুক। এটা নিয়ে প্রয়াত সমরেশ বসুর সঙ্গে আমার অনেকবার কথা হয়েছে। আমার তাগাদায় সমরেশবাবু মাঝে মাঝে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। ওঁদের মধ্যে তো অনেকদিন থেকেই জানাশোনা ছিল। সমরেশবাবুর কাহিনী নিয়ে অগ্রদূত গোষ্ঠীর বিভূতি লাহা মশাই 'কুহক' নামে একটি ছবি করেছিলেন। তখন থেকেই উত্তমবাবুর সঙ্গে সমরেশবাবুর পরিচয়। তারপর সমরেশবাবুর আরও অনেক গল্পের নায়ক হয়েছেন উত্তমকুমার। কাজেই আমি চেয়েছিলাম সমরেশবাবুই উত্তমবাবুকে নিয়ে লিখুন।

কিন্তু আমার সে আশা ফলবতী হয়নি। সমরেশবাবু মাঝে মাঝে খুবই উৎসাহিত হতেন ঠিকই, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সে উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়ত। কী কারণে জানি না। উত্তমকুমারকে নিয়ে

লিখলে সাহিত্যিক হিসেবে কী সমরেশ বসু জাতিচ্যুত হতেন? তাই বা কেন হবেন! সোফিয়া লোরেনকে নিয়ে লেখার জন্য আলবেয়ার কামু তো জাতিচ্যুত হননি। কেউ তাঁকে ছি ছি করেছেন বলেও শুনিনি। তাহলে সমরেশবাবু এতো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন কেন সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না।

যাই হোক, সমরেশবাবুর পেছনে বেশ কয়েক বারের পণ্ডশ্রমের পর আমি ঠিক করলাম, আমি নিজেই উত্তমবাবুকে নিয়ে লিখব। ব্যাপারটা খোঁড়ার পাহাড় ডিঙোনোর মতো নিশ্চয়। কিন্তু কী করব। কেউ যখন এগিয়ে আসছেন না, তখন আমার মতো বোকাদেরই এগোতে হবে। প্রবাদ আছে, 'ফুলস রাসেজ দেয়ার হোয়্যাব এঞ্জেলস ফিয়ার টু ট্রেড।' আমি না হয় সেই বোকাদেরই একজন হলাম।

কথাটা উত্তমবাবুর সামনে পাড়তে ওঁকে খুব খুশি খুশি দেখাল। কিন্তু মুখে উনি আমতা আমতা করতে লাগলেন। বললেন : আমার জীবনী কে পড়বে মশাই! ভারি তো একটা জীবন, তার আবার জীবনী। দেখবেন আপনাকে নিয়ে লোকে হাসাহাসি করবে।

তার উত্তরে আমি বললাম : উত্তমকুমার সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তাব যখন দিয়েছিলাম তখনও তো আপনি এই কথাই বলেছিলেন। কই, লোকে তো হাসাহাসি করল না। উল্টে পাঠকরা বরং হৈ চৈ বাধিয়ে দিল। দেখবেন, আপনাব জীবনী বেরুলে ঠিক সেইরকম হবে।

উত্তমবাবুর সঙ্গে আমার এইসব কথা হয়েছিল ১৯৭০-৭১ সাল নাগাদ। সেই সময়ে আমার কথার উত্তরে উত্তমবাবু বলেছিলেন : তাহলে আর কয়েকটা বছর অপেক্ষা করুন। বছর পনেরো পরে আমি অ্যাকটিং থেকে রিটায়ার করব। ঠিক রিটায়ার নয়, অভিনয়ের ব্যাপাবটা কমিয়ে দেব। ইচ্ছে আছে পুরোপুরি ডাইরেকশানে কনসেনট্রেট করবার। তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাবে।

আমি বললাম : এই ভাবনার সঙ্গে আমার নামটা যুক্ত থাকবে তো?

উত্তমবাবু বললেন : নিশ্চয়। আমার জীবন, আমার ভাবনা। আর আপনার লেখা। ব্যাপারটা জমে যাবে না?

আমি বললাম : তা যাবে কিনা বলতে পারছি না। তবে একটা চেষ্টা তো হবে। আপনাকে কেন্দ্র করে বাংলা সিনেমার প্রায় আধখানা শতাব্দীর একটা দলিল তো হয়ে থাকবে।

এর কিছুকাল পরেই হঠাৎ উত্তমবাবুর স্বাক্ষরিত একখানা আত্মজীবনী বাজারে বেরিয়ে গেল। বইটা পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ কি হল! এমন একটা বিকলাঙ্গ ব্যাপার তো আমরা চাইনি।

ছুটে গেলাম ময়রা স্ট্রিটে। আমাকে দেখে উত্তমবাবু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। যে হাসির দিকে এর আগে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম, এখন সে হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে গেল। কোনও কথা না বলে চুপ করে বসে রইলাম এক ধারে।

উত্তমবাবুকে ঘিরে কিছু লোকজন ছিল। তাঁরা বিদায় নেবার পর উত্তমবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন : কী ব্যাপার রবিবাবু, আকাশের পুরো মেঘটাই মুখে মেখে বসে আছেন যে!

মেঘের এই উপমাটা বেশ ভালো লাগল। কিন্তু সেটা মুখে প্রকাশ করলাম না। বললাম : কেন মেঘ মেখেছি সেটা বুঝতে পারছেন না?

উত্তমবাবু বললেন : পারছি বৈকি। কিন্তু আমি তো ভূমিকাতে লিখেই দিয়েছি এটা আমার পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী নয়।

আমি বেশ রাগ রাগ গলাতেই বললাম : তাহলে এই অর্ধাঙ্গ ব্যাপারটার কী দরকার ছিল?

উত্তমবাবু বললেন : কী করব বলুন। আপনি তো জানেন, আমি কাউকে তিনবারের বেশি না বলতে পারি না। তাছাড়া ছেলেটা এমন করে ধরল, দিলাম নামটা সই করে। তবে এটা নিয়ে এত ভাববার কী আছে। আমাদের তো কথাই আছে, নাইনটিন এইট্টিসিক্সে আমরা বসব। তখন সবকিছু উজাড় করে দেব।

সেই নাইনটিন এইট্টিসিক্স আর এল না। তার আগেই উত্তমবাবু চলে গেলেন। সারা জীবনের মতো আমার একটা আক্ষেপ থেকে গেল। সেই আক্ষেপ দ্বিগুণিত হয়ে উঠল সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'অমিতাভ বচ্চন' বইখানা পড়ে। কী প্রচণ্ড পরিশ্রম করে, কী নিদারুণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে সৌম্য বইখানা লিখেছে। ঠিক এইরকম একটা ব্যাপার তো আমরাও করতে চেয়েছিলাম। ঈশ্বর আর তা হতে দিলেন

না।

কিন্তু আজও তো সময় চলে যায়নি। উত্তমবাবুকে নিয়ে এখনও লেখা যেতে পারে। তবে সে দায়িত্ব নিতে হবে তাঁর ভাই তরুণকুমারকে। ওঁরা উত্তম মঞ্চ করছেন। খুব ভালো কথা। কিন্তু তাতে করে উত্তমকুমারের নামটিই বেঁচে থাকবে কেবল। সেই মানুষটিকে তো জানতে পারা যাবে না। আজ থেকে একশো বছর পরে উত্তমকুমারের কোনও ফিল্ম আর থাকবে না। থাকলেও আর্কাইভে রাখা থাকবে। সাধারণ মানুষের সে ছবি দেখার সুযোগ থাকবে না। কিন্তু একটা বই থাকলে যুগ যুগ ধরে উত্তমকুমারকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে। এখনও অনেকের স্মৃতিতে উত্তমকুমার জ্বলন্ত। সেইসব স্মৃতির সহায়তায় তরুণকুমার যদি একখানা জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলেই উত্তমকুমারের প্রকৃত স্মৃতিরক্ষা হবে। বযোবৃদ্ধ এক সাংবাদিকের এই সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল, তরুণকুমার এবং অন্যান্য উত্তম ভক্তদের কাছে।

এ তো গেল আমাব আক্ষেপ আর আকাঙক্ষার কথা। এবারে আবার ফিরে আসি উত্তমকুমারের সুখ অসুখের ব্যাপারে। উত্তমবাবু ঠিক কী পরিমাণ সুখী ছিলেন আর কতটা পরিমাণ অসুখী ছিলেন তা বেশ কয়েক বছব ঘনিষ্ঠতার পবও আমি ঠিকমতো পরিমাপ করতে পারিনি। কখনও তাঁকে দেখে মনে হয়েছে এমন একখানি সুখী মানুষের দর্শন পাওয়া খুবই দুর্লভ ব্যাপার। আবার কখনও কখনও মনে হত এমন দুঃখী মানুষ বোধহয় ভূভারতে আর কোথাও নেই। একটা দিনের একটা ঘটনার কথা বলি।

সেদিন উত্তমবাবুর সেটে আমি ছিলাম। সেদিন একটু সকাল সকাল শুটিং প্যাক-আপ হয়ে গেল। এরকম ঘটনা সচবচার ঘটে না। উত্তমবাবু যদি কোনওদিন তাড়াতাড়ি প্যাক-আপ করতে বলেন, তো সেটা আলাদা কথা। নইলে উত্তমকুমাব সেটে আছেন অথচ ডিরেকটার সময়ের আগে প্যাক-আপ করে দিচ্ছেন, এটা প্রায় হয়ই না। উত্তমকুমারের মূল্যবান ডেট থেকে দু ঘণ্টা বরবাদ করতে কেউ রাজি নন। সেদিন কী হয়েছিল ঠিক মনে পড়ছে না। যতদূর মনে হয় ফিল্ম ফুবিয়ে গিয়েছিল ক্যামেরায়।

যাই হোক, তাড়াতাড়ি ছুটি পেযে উত্তমবাবু বেশ খুশি। মেক আপ রুমে বসে মেক আপ তুলতে তুলতে উত্তমবাবু বললেন : কী রবিবাবু, সন্ধেবেলা অন্য কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে নাকি?

আমি বললাম : না, আব কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। আমি তো কেবল আপনার শুটিং দেখতেই এসেছি।

উত্তমবাবু বললেন . শুটিং তো প্যাক-আপ হয়ে গেল। এখন কী করা যায?

আমি বললাম : বাড়ি ফিরে চলুন।

উত্তমবাবু বললেন : দূর। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। সাবাদিন ইনডোরে কাটিয়ে আবার ইনডোর! চলুন আজ একটু আউটডোব করে আসা যাক।

আমি বললাম : সে কী! এখন আবার কোনও প্রোডিউসারের আউটডোর শুটিং আছে নাকি?

উত্তমবাবু বললেন : না না, সে আউটডোর নয়। চলুন একটু ফাঁকা হাওয়ায় ঘুরে আসি।

আমি বললাম : কোথায় যাবেন?

উত্তমবাবু বললেন : ডায়মন্ডহারবারের দিকে খানিকটা ঘুরে আসা যায়।

আমি বললাম : ওরে বাবা' সে তো ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন : নাই বা ফিরলেন একটা দিন।

আমি বললাম : তাহলে আমার বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে যাবে। থানা পুলিশ করাটাও বিচিত্র নয়।

উত্তমবাবু বললেন : তাহলে চলুন একটু আউটরাম ঘটে গিয়ে বসি।

আমি বললাম : এই ব্রড ডে লাইটে। তাহলে তো সেখানেও পুলিশ ডাকতে হবে।

উত্তমবাবু বললেন : তাও তো বটে। এই হয়েছে এক জ্বালা আমার। ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারি না। যা খুশি তাই করতে পারি না। তাহলে এক কাজ করা যাক। এখানে বসেই খানিকটা টাইম কিল করা যাক। তারপর বেরোনো যাবে। আজ যখন আউটরামে যাব বলেছি, তখন যাবই।

আমরা যখন আউটরামে গিয়ে পৌঁছলাম তখন ভরা সন্ধ্যা। ঘাটের উল্টোদিকে ফোর্ট উইলিয়ামের গা ঘেঁষে একটা ঢালু জমি আছে, সেখানে গিয়ে বসলাম। এদিকটা একেবারে ফাঁকা ফাঁকা নিরিবিলি।

আমি একটা রুমাল বিছিয়ে বসলাম। কিন্তু উত্তমকুমার বসলেন ঘাসের ওপর। এলোমেলো দু চারটে কথাবার্তা হতে লাগল। সবটাই হালকা হালকা। তেমন গভীর কিছু নয়। সোজা বাংলায় যাকে ঠাট্টা ইয়ার্কি বলে, তাই।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ উত্তমবাবু মুখটা নিচু করে ফেললেন। কোনও কথার উত্তর দিলেন না। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু একটু পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পাবলাম। ওই ভাঁড়ে করে যারা চা বিক্রি করে তেমন একজন এসে হাজির চা বিক্রি কবতে। তাকে দেখেই উত্তমবাবু মুখ নামিয়ে নিয়েছিলেন। পাছে ধরা পড়ে যান।

এইভাবে চা-ওলাব পর বাদামওলা, তারপর তেল মালিশ এবং তাবও পরে গোটা চারেক ইয়ং ছেলে শিস দিতে দিতে আমাদের দিকে দেখতে দেখতে চলে গেল। ওরা হয়তো ভেবেছিল এক জোড়া কপোত কপোতিকে দেখতে পাবে। তার বদলে দুটো জোয়ান মদ্দকে দেখতে পেয়ে ওদেব শিস দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

আমি সমস্ত ব্যাপারটা উপভোগ করছিলাম। কিন্তু উত্তমবাবু হঠাৎ কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। নিজেব হাতের তালুতে একটা ঘুষি মেরে বলে উঠলেন : দূর দূর। এটা একটা জীবন নাকি! ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারি না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিনেবাদাম কিংবা ফুচকা খেতে পারি না, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলেব খেলা দেখতে যেতে পারি না। এ যেন একটা বন্দীজীবন। এভাবে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে কারও'

হঠাৎ উত্তমবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : চলুন আপনাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই।

গাড়ি ছুটলো খিদিরপুরের দিকে। পোর্ট কমিশনার্সেব কাছে এসে দূর থেকে একটা দোতলার জানালার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে উত্তমবাবু বললেন : ওই জানলাটার পাশে বসে আমি কাজ করতাম। তখন ভাল লাগত না। কিন্তু এখন আবাব সেই জীবনটাতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। কোনও টেনশন ছিল না লাইফে।

তারপর ডকে কর্মরত পোর্টারদের দিকে দেখিয়ে বললেন . এই এরা সব ছিল আমার বন্ধু। কী ভালোবাসত আমাকে।

বলতে বলতে উত্তমবাবুর গলার স্বর কাঁপছিল। চোখ দুটো বোধহয় একটু জ্বলজ্বলও করছিল। তখন ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল মানুষটি বড় দুঃখী। অভিনয় ওঁকে অর্থ দিয়েছে, জনপ্রিয়তা দিয়েছে, প্রতিপত্তি দিয়েছে, কিন্তু সহজ সরল জীবনটাকে কেড়ে নিয়েছে।

এবারে ফেরার পালা। গাড়ি ছুটে চলেছে হেস্টিংসের ওপর দিয়ে। ফাঁকা রাস্তা। ফুল স্পিডে গাড়ি চলছে। হঠাৎ উত্তমবাবু উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন, 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছো দান'। গাইতে গাইতে আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলেন : কই রবিবাবু, আপনিও গলা মেলান আমার সঙ্গে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই মানুষটির মতো সুখী মানুষ বোধহয় ভূভারতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

অথচ সেদিন তোপচাঁচিতে ব্যাপারটা কেমন উল্টো হয়ে গেল। তার আগের দিন গভীর রাত পর্যন্ত উত্তমবাবু আর সুপ্রিয়া দেবীকে নিয়ে ভয়ানক একটা নাটক হয়ে গেছে। সেই নাটকের আমিও ছিলাম অন্যতম কুশীলব।

উত্তমকুমারের জীবনে কোনও ব্যাপারটাই খুব সহজে আসেনি। সব কিছুই তাঁকে লড়াই করে আদায় করে নিতে হয়েছে। সেই পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি সমালোচিত অভিনেতা। উত্তম-সুচিত্রা জুটির রোম্যান্টিক অভিনয়ের দাপটে যখন সারা বাংলা তোলপাড়, তখন এক শ্রেণীর সো-কলড ইনটেলেকচুয়াল মানুষ তাঁকে অভিনেতা বলেই মনে করতেন না। তাঁদের কেউ কেউ বলতেন : কী আছে ওর মধ্যে যে তোমরা ওকে নিয়ে নাচানাচি করছো। চোখ ঘোরালে, ঘাড় ফেরালে, আধো-আধো কথা বললে যদি অ্যাকটিং হয় তাহলে তো আর বলার কিছু নেই। অভিনয় জিনিসটা ছেলের হাতের মোয়া নয়। তার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে

হয়। বুঝলে হে!

তখন আমাদের রক্ত গরম। ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্কে বসে যেতাম। বলতাম : 'বসু পরিবার' ছবিতে উত্তমকুমারের অ্যাকটিংটাকে কী বলবেন আপনি?

ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে যেতেন 'বসু পরিবার' ছবির উদাহরণ দেওয়াতে। কিন্তু ইনটেলেকচুয়াল বলে যাঁরা দাবি করেন, অর্থাৎ স্বঘোষিত ইনটেলেকচুয়াল যাঁরা, তাঁরা তো অত সহজে হার স্বীকার করে নেবার পাত্র নন। সামান্য আমতা আমতা করে বলতেন : ও একটা বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেছে। তোমরা তো ওকে নিয়ে এত লেখা-টেখো, কাগজে ছবি-টবি ছাপো, তোমরা ওকে বলতে পারো না ভালো করে অ্যাকটিংটা শিখতে।

এ কথার কী জবাব দেব বলুন। তবু তো ওঁকে সেই ১৯৫৪ সালে মুক্তি পাওয়া 'হ্রদ' ছবিটার কথা স্মরণ করিয়ে দিইনি। অভিনয় জীবনের সেই প্রথম পর্বে অর্ধেন্দু সেন পরিচালিত ওই ছবিতে অভিনয় করে উত্তমকুমার সে বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিমল করের লেখা ওই কাহিনীতে যখন উত্তমবাবু অভিনয় করেন তখনও তিনি জনপ্রিয়তার আস্বাদ পাননি। বিমলদা নিজেও খুব খুশি হয়েছিলেন উত্তমবাবুর অভিনয় দেখে। একদিন কথায় কথায় বিমলদা বলেছিলেন : আমার লেখা ওই চরিত্রে উত্তম অভিনয় করবে জেনে আমার মনে একটু সন্দেহ জেগেছিল। কিন্তু পর্দায় ওর অভিনয় দেখে আমার মনের সব মেঘ কেটে গিয়েছিল। চরিত্রটা একটু ডিফিকাল্ট। সেটাতে উত্তম যে অত সুন্দর অভিনয় করবে, সেটা আমি ভাবতেই পারিনি।

তা ওইসব ইনটেলেকচুয়ালদের মুখ বন্ধ হয়েছিল 'নায়ক' ছবিতে সত্যজিৎ রায় উত্তমবাবুকে কাস্ট করার পর। কিন্তু কেউ কেউ তো আবার ভাঙেন তবু মচকান না। বললেন : বুঝলেন না মশাই, ছবিটা তো একজন ফিল্ম স্টারকে নিয়ে, তাই মানিকদা উত্তমকুমারকে নিয়েছেন। নইলে উনি থোড়াই নিতেন ওইরকম একজন রাঙামুলো অ্যাকটরকে।

অথচ 'নায়ক' ছবির শুটিং চলাকালেই সত্যজিৎবাবু উত্তমকুমার সম্পর্কে আমার কাছে বলেছিলেন: উত্তম দারুণ ফ্রি অ্যাকটর। আমাদের এখানে অন্য কেউ ওর ধারে-কাছে আসতে পারে না।

কিন্তু এসব কথা তো সেইসব ইনটেলেকচুয়ালদের বোঝানো যাবে না। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা উত্তমকুমারের সাকসেসটা একটা অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে তাঁদের মুখ খানিকটা বন্ধ হয়েছিল যখন সত্যজিৎবাবু তাঁর পরবর্তী ছবি 'চিড়িয়াখানা'-য় আবার উত্তমবাবুকে নিলেন আর উত্তমবাবুও সত্যজিৎবাবুর সে নির্বাচনের মর্যাদা রেখেছিলেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সিকে তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং জীবন্ত করে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে দূরদর্শনের পর্দায় আরও দু-একজনকে আমরা ব্যোমকেশ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছি। তাঁরাও নিঃসন্দেহে ভালো অভিনেতা। কিন্তু উত্তমবাবুর অভিনয়ের সঙ্গে তাঁদের কোনও তুলনাই হয় না। তফাতটা উনিশ-বিশের নয়, তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি। বিশেষ করে যে দৃশ্যে উত্তমবাবু জাপানি ছদ্মবেশে অভিনয় করলেন, সেখানে ওঁর অভিনয়ের তো তুলনাই হয় না। ছোট ছোট চোখে কুতকুতে চাউনি, কথায় কথায় নড্ করা, সব মিলিয়ে অসাধারণ।

আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ওইসব সো-কল্‌ড ইনটেলেকচুয়ালদের সমালোচনা শুনতে শুনতে আমি নিজেও খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যদিও আমি উত্তমকুমারের প্রচণ্ড ফ্যান ছিলাম, তা সত্ত্বেও তাঁকে পরিপূর্ণ শিল্পীর মর্যাদা দিতে মনের মধ্যে একটা দ্বিধা এসে গিয়েছিল। একটা কথা বার বার শোনার একটা প্রভাব তো মনের মধ্যে পড়বেই।

আমার সেই দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা সম্পূর্ণ কেটে গেল পরবর্তীকালে উত্তমবাবুর সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করতে বসে। বাইরে থেকে দেখলে মানুষটিকে কিছুটা ব্লান্ট মনে হবে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড গভীরতা। 'গৃহদাহ' ছবি করার সময় তাঁর সঙ্গে আমার একবার তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। ছবিটির প্রযোজক উত্তমকুমার নিজেই। কাস্টিং করার সময় উনি নিজের জন্যে মহিমের চরিত্রটা রাখলেন। সুরেশের চরিত্র দিলেন প্রদীপকুমারকে। আর অচলা যে সুচিত্রা সেন করবেন সেটা তো ধরাবাঁধা কথা।

কাস্টিং দেখে আমি খুব মুষড়ে পড়েছিলাম। সুরেশের চরিত্রে কত কী করবার আছে, অথচ উত্তমবাবু

সেটা নিজে না করে দিয়ে দিলেন প্রদীপকুমারকে। এটা তো ঠিক হল না।

কিছুদিন পরে উত্তমবাবুর সঙ্গে দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলাম : সুরেশের চরিত্রটা আপনি নিজের জন্যে রাখলেন না কেন?

উত্তমবাবু গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন : মহিমের চরিত্রটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট বলে তাই।

সেই সময়ে তর্ক করাটা আমার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেইরকম তর্কের মুডেই বললাম: কক্ষনো না, সুরেশের চরিত্র অনেক বেশি ডিফিকাল্ট, ওই চরিত্রে অভিনয়ের স্কোপটা অনেক বেশি।

আমার উত্তেজনা দেখে উত্তমবাবু একটু হাসলেন। বললেন : গৃহদাহ উপন্যাসটা আপনার ভালো করে পড়া আছে তো? না কি দু-চার পাতা পড়েই তর্ক করতে এসেছেন?

আমি বললাম : খুব ভালো করে পড়া। এই তো আপনি 'গৃহদাহ' ছবি করবেন অ্যানাউন্স করবার পর আবার একবার মন দিয়ে পড়লাম।

উত্তমবাবু বললেন : তার পরও মনে হচ্ছে যে সুরেশ চরিত্রটা মহিমের চেয়ে বেশি ডিফিকাল্ট?

আমি বললাম : তাই তো মনে হয়েছে।

উত্তমবাবু আমার উত্তরটা শুনে পুনরায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন : আজকাল খুব যাত্রা-টাত্রা দেখছেন বুঝি?

আমি বললাম : হঠাৎ এ কথাটা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

উত্তমবাবু বললেন : একটা কারণ আছে তাই জিজ্ঞাসা করছি।

আমি বললাম : হ্যাঁ, আমি যাত্রা দেখতে ভালোবাসি। যাত্রা হল আমাদের একটা ফোক্-আর্ট—

উত্তমবাবু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন : আপনি থোড়াই ফোক-আর্টের কথা ভেবে যাত্রা দেখতে যান। অ্যাকটিং-এর মধ্যে অত্যধিক হাত-পা ছোঁড়া দেখতে আপনার ভালো লাগে, তাই যাত্রা দেখতে যান।

আমি বললাম : বেশ, তাই না হয় গেলাম। তাতে কী?

উত্তমবাবু বললেন : সেইজন্যেই তো সুরেশকে বেশি ভালোবেসে ফেলেছেন। ওই রোলটায় তো যাত্রা করার স্কোপ আছে। তবে আমাদের ছবিতে তো সুরেশকে দিয়ে যাত্রা করানো হবে না। তা সত্ত্বেও বলছি, মহিমেব চরিত্রটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট। ওটা একটা ইনট্রোভার্ট চরিত্র। মেরুদণ্ড সোজা রেখে চলে, মনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। অথচ দর্শককে মনের ভেতরকার সেই ঝড়টা বোঝাতে হবে। সুরেশের চরিত্র তো এক্সট্রোভার্ট। বইয়ের ডায়লগগুলো ঠিক ঠিক মতো করে বলে গেলে চলবে। সূক্ষ্ম অভিনয়ের স্কোপ ওই চরিত্রে খুব বেশি নেই। যেটুকু আছে সেটা প্রদীপদার কাছ থেকে আমরা আদায় করে নেব। এবার বলুন মহিমের চরিত্র নিয়ে আমি কি খুব ভুল কিছু করেছি?

উত্তমবাবুর ভাবনার গভীরতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই মানুষকে কি না লোকে ব্লান্ট বলে। ভদ্রলোক আমাকে একেবারে বিষ্ঠার ওপর বসিয়ে দিলেন। আমার নিজের বোকামির জন্যে যা নয় তাই শুনতে হল। তাই একটু পাল্টা প্যাঁচে ফেলবার জন্যে বললাম : কিন্তু লোকে তো বলছে পাছে সুচিত্রা সেনের নায়ক আর কাউকে করতে হয় তাই আপনি মহিমের চরিত্রটা ধরে বসে আছেন।

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন : তাই যদি হয় তাতে আর লজ্জার কী! রমার মতো অমন একজন সুন্দরী অভিনেত্রীর নায়ক হতে কে না চায় বলুন। আপনি অভিনেতা হলে আপনি চাইতেন না বুঝি?

এই রে! আবার আমাকে প্যাঁচে ফেলে দিলেন উত্তমবাবু। আজ যে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলাম কে জানে!

এইভাবে দিনের পর দিন নানা ঘটনায় উত্তমবাবু আমার সমস্ত সত্তাটাকে অধিকার করে নিয়েছিলেন। এটা আমার গৌরব।

উত্তমকুমারের শিল্পবোধের এইরকম আরও অনেক ঘটনা আমার জানা আছে। কিন্তু তার সবগুলি তো এখানে প্রকাশ করা যাবে না। তা সত্ত্বেও আশুবাবুর কাছে যে ঘটনাটা শুনেছিলাম, সেটা না বলে পারছি না।

আশুবাবু অর্থে সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর অনেকগুলি রচনার ফিল্ম হয়েছে।

পরিচালক অসিত সেন প্রথম তাঁর উপন্যাস নিয়ে ছবি করেন। 'চলাচল'। তারপর পঞ্চতপা, জীবনতৃষ্ণা, জোনাকির আলো, দীপ জ্বেলে যাই, সাবরমতী, আমি সে ও সখা, কাল তুমি আলেয়া ইত্যাদি অনেকগুলি উপন্যাসের চিত্ররূপ দিয়েছেন বিভিন্ন পরিচালক। এর মধ্যে অনেকগুলি ছবিতে উত্তমকুমার অভিনয় করেছেন। আশুবাবুর লেখা উত্তমবাবুর দারুণ ভালো লাগত। শুধু আশুবাবু কেন, বাংলার সব সাহিত্যিকেরই লেখার ভক্ত ছিলেন উত্তমকুমার। সাহিত্যের বাইরের কোনও কাহিনী নিয়ে ছবি করা হচ্ছে শুনলে উত্তমবাবু নাক সিঁটকোতেন। বলতেন : কেন, আমাদের সাহিত্যের পুঁজি কি ফুরিয়ে যাচ্ছে নাকি যে সিনেমার জন্যে নিজেদের গপ্পো লিখতে হবে। বড়জোর বিদেশি সাহিত্যের অ্যাডপটেশন চলতে পারে। তার বাইরে পা বাড়ানো উচিত নয়।

তা সেই আশুবাবুর সঙ্গে একবার উত্তমবাবুর একটা ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়ে গেল 'কাল তুমি আলেয়া' উপন্যাসটাকে কেন্দ্র করে। সংঘর্ষ অর্থে ছোরা-ছুরির ব্যাপার নয় মোটেই। বাক্‌-সংঘর্ষ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাল তুমি আলেয়া' উপন্যাসটা বাজারে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তমবাবু পড়ে ফেললেন। ওই ঢাউস উপন্যাসটি পড়তে তাঁর দু' দিনের বেশি সময় লাগেনি। অথচ সেই সময়ে ছবির কাজের চাপে উত্তমবাবু চোখে-কানে দেখতে পাচ্ছেন না। তারই মধ্যে সময় করে উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত পড়ে ফেললেন।

বিখ্যাত সাউন্ড রেকর্ডিস্ট দেবেশ ঘোষ তখন ছবি প্রযোজনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। অবশ্যই উত্তমবাবুর দৌলতে। উত্তমবাবু তখন কোনও ছবিতে সই করলেই ডিস্ট্রিবিউটাররা ছুটে আসতেন টাকার থলি নিয়ে। ছবির তিনভাগ খরচ তাঁরাই বহন করতেন। প্রযোজকের আর্থিক ঝুঁকি বিশেষ থাকত না বললেই চলে। এইভাবে উত্তমবাবুর দৌলতে অনেকেই প্রোডিউসার হয়েছেন। অসীম সরকার আর দেবেশ ঘোষ তাঁদের অন্যতম।

তা 'কাল তুমি আলেয়া' উপন্যাসটা পড়বার পর উত্তমবাবু দেবেশবাবুকে বললেন : দেবেশ, তুই এক্ষুনি একবার আশুবাবুর কাছে চলে যা। যত টাকা চাইবেন তাই দিয়ে তুই গল্পের রাইটটা কিনে নিয়ে আয়।

উত্তমবাবুর কথা শুনে দেবেশবাবু তৎক্ষণাৎ ছুটলেন। ঘণ্টা তিনেক বাদে ফিরে এলেন মুখ কালো করে। বললেন : হল না।

উত্তমবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : কী হল না?

দেবেশবাবু বললেন : আশুবাবু এ গল্পটা বিক্রি করবেন না।

উত্তমবাবু বললেন : কেন? তুই বোধহয় টাকার ব্যাপারে দর কষাকষি করেছিলি। তোর তো আবার এই অভ্যেসটা আছে।

দেবেশবাবু বললেন : টাকা-পয়সার কথা ওঠাবার স্কোপই পাওয়া গেল না। উনি এ গল্পের রাইট কাউকেই বিক্রি করবেন না।

উত্তমবাবু বললেন : তুই গিয়ে বলেছিলি আমি পাঠিয়েছি?

দেবেশবাবু বললেন : গোড়াতে তো সে কথা বলেই ঢুকেছি।

উত্তমবাবু বললেন : তা সত্ত্বেও রাজি হলেন না। তাজ্জব ব্যাপার তো!

দেবেশবাবু বললেন : আশুবাবু বললেন, উত্তমবাবু কেন, স্বয়ং ভগবান এসে বললেও এ গল্পের ফিল্ম রাইট আমি বিক্রি করব না।

কথাটা শুনে উত্তমবাবু একটু গুম হয়ে গেলেন। তারপর বললেন : তোর দ্বারা হবে না। আমাকেই যেতে হবে।

সেদিন কিংবা তার পরের দিনই উত্তমকুমার স্বয়ং হাজির হলেন আশুবাবুর প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়িতে। উত্তমকুমারকে ওভাবে তাঁদের বাড়িতে আসতে দেখে চমকে গেলেন আশুবাবু। হাসতে হাসতে বললেন : আপনি আসবেন জানলে আগে থেকে পুলিশের ব্যবস্থা করে রাখতাম। নায়ক-দর্শনার্থীদের চাপে আমাদের এই পৈতৃক বাড়িটি ভেঙে পড়লে তার ক্ষতিপূরণ দেবে কে মশাই।

উত্তমবাবু বললেন : হালকা কথা এখন থাক আশুবাবু। আপনি নাকি বলেছেন 'কাল তুমি আলেয়া'র

ফিল্ম রাইট বিক্রি করবেন না?

আশুবাবু বললেন : যতদূর মনে পড়ছে দেবেশবাবুকে তো সেই কথাই বলেছি।

উত্তমবাবু বললেন : কিন্তু কেন?

আশুবাবু বললেন : এটা আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখা। এটাকে আমি ছবির পর্দায় পণ্য কবতে পারব না।

উত্তমবাবু বললেন : তাহলে এমন লেখা লিখলেন কেন যেটা একজন ফিল্ম স্টারের দিনেব শান্তি, রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। উপন্যাসটা পড়ার পর থেকে আমি ঠিকমতো খেতে-শুতে পর্যন্ত পারছি না। এ চরিত্রটা ছবিতে করতে না পেলে আমি যে মরে যাব আশুবাবু।

অনেকদিন পরে আশুবাবু কথায় কথায় বলেছিলেন : উত্তমের কথা শুনে আমি তো রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম রবিবাবু। আমার লেখা চরিত্রের জন্যে একটা মানুষের এতখানি দরদ আমি তো ভাবতেই পারিনি।

আমি বললাম · শুধু সেই কারণেই আপনি 'কাল তুমি আলেযা' ছবি কবার অনুমতি দিলেন। তবে যে বলেছিলেন স্বয়ং ভগবান এসে বললেও আপনি ওই গল্পের ফিল্ম রাইট বিক্রি করবেন না। সেটা কি তাহলে কথার কথা।

আশুবাবু বললেন : মোটেই কথার কথা নয়। উত্তমের মতো ওইরকম একজন দরদী পাঠক তো আমার কাছে ভগবানের চেয়েও বড়।

এইরকম একজন দরদী মানুষকে দীর্ঘকাল 'রাঙামুলো' বিশেষণ হজম করতে হয়েছে। ভাবা যায়।

উত্তমবাবুকে আমি একবার আমার দেশ তমলুকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই উদ্দেশ্যেই সেবারে তোপর্চাচিতে যাওয়া। আর সেখানেই একরাশ ঘটনা আব দুর্ঘটনার ঘনঘটা।

উত্তমকুমারের শিল্পী জীবন সম্পর্কে অল্পবিস্তর জানা আছে সকলেরই। কিন্তু তাঁর রোমাঞ্চকর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অনেকেরই বিশেষ কিছু জানা নেই। আমারও যে যথেষ্ট পরিমাণ জানা আছে সে দাবি আমি কবি না। তবে বেশ কিছুদিন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে করতে অল্প কিছু জানা হয়ে গেছে। এগুলি যে উত্তমবাবু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জানিয়েছেন তা নয়, কথাপ্রসঙ্গে কিছু কিছু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। তাও কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে। সেগুলির সূত্র ধরে কিছু প্রশ্ন আমি করেছি। তার কতকগুলির উত্তর উত্তমবাবু দিয়েছেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে চুপ করে থেকেছেন। সেই নিশ্চুপ থাকাটাকে 'মৌনং সম্মতিলক্ষমণ্' ধরে নিলে ভুল করা হবে। সুতরাং সে ভুল করবার চেষ্টা আমি করব না।

যেমন উত্তমবাবুর নায়িকাদের সম্পর্কে কোনও কথা উঠলেই উনি সতর্ক হয়ে যেতেন। সেইসব মুহূর্তে আমাকে প্রশ্ন করার কায়দাটা বদল করে নিতে হত। আমি তাঁর নায়িকাদের অভিনয়ের ধারা বিশ্লেষণ করতে বলতাম তাঁকে। উত্তমবাবুও সানন্দে সেই আলোচনায় যোগ দিতেন। তারই কোনও এক ফাঁকে কোনও নায়িকার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার প্রশ্ন তুললেই উত্তমবাবু চুপ করে যেতেন। আমারও তখন উচিত ছিল চুপ করে যাওয়া। কিন্তু আমি সাহস করে এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ করতাম যেটা আদৌ মিথ্যে নয়। উত্তমবাবুকে তখন খুব অসহায় দেখাত। কিন্তু উনি তো মস্ত বড় অভিনেতা। তাই আমার সেই প্রশ্নের কোনও প্রতিবাদ না করে হাসতে হাসতে বলতেন : এঃ, আপনি দেখছি ব্যাপারটা জেনে ফেলেছেন। তা ওটা নিয়ে ব্ল্যাকমেল করবার বাসনা আছে নাকি মশাই?

এইভাবেই আমাকে লজ্জার প্যাঁচে ফেলে দিতেন উত্তমবাবু। সুতরাং নিজের কৌতূহলটাকে নিজেই ঢোক গিলে ফেলতে হত। তবে ওঁর নায়িকাদের অভিনয়ের ধারা সম্পর্কে ওঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। ভাবতাম ভদ্রলোক এতটা চোখ-কান খোলা রেখে চলেন কী করে।

উত্তমকুমারের প্রথমদিককার ছবিগুলি যে ফ্লপ করেছিল, তার মূলে ছিল নায়িকা-বিভ্রাট। ওঁর বিপরীতে তখন যাঁরা নায়িকা করতেন তাঁদের অনেকেই উত্তমবাবুর থেকে বয়সে বড়। যেমন উনি প্রথম যে ছবির নায়ক হলেন, সেই 'কামনা' ছবির নায়িকা ছিলেন শ্রীমতী ছবি রায়। সেইসময় ভদ্রমহিলার বয়স কত ছিল তা আমি জানি না, তবে উত্তমবাবুর থেকে তিনি যে বয়সে বড় ছিলেন সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই আমার। 'কামনা' যে বছর রিলিজ করে সেই বছর আমি একদিন ছবি দেবীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। উনি তখন থাকতেন গ্রে স্ট্রিট আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর মোড়ে মিত্র কাফে নামক যে

বিখ্যাত রেস্তোরাঁটি আছে, তারই দোতলায় একটি ঘরে। ভদ্রমহিলার সামনা-সামনি হয়ে আমি চমকে উঠেছিলাম। চেহারায় বয়সের ছাপ স্পষ্ট। দর্শনেও এমন কিছু আহামরি নন। এঁর বিপরীতে রোম্যান্টিক নায়ক করে ছবি জমিয়ে দেবার ক্ষমতা অতি বড় অভিনেতার পক্ষেও বোধহয় সম্ভব নয়। আর উত্তমবাবু তো তখন একেবারেই নবাগত। কাজেই তাঁর আর দোষ কী বলুন!

এর পরে স্মরণ করা যেতে পারে এম পি প্রোডাকসন্সের 'সহযাত্রী' ছবির কথা। ওই ছবিতে উত্তমবাবুর নায়িকা ছিলেন ভারতী দেবী। ভারতীদি চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে তোলা 'ডাক্তার' ছবির নায়িকা ছিলেন। পঞ্চাশ দশকে তাঁকে কী উত্তমবাবুর নায়িকা হিসেবে মানায়?

তা সত্ত্বেও উত্তমবাবু আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন নিজেকে সঠিকভাবে প্রোজেক্ট করতে। কিন্তু দর্শকরা নেবেন কেন? তাঁরা তো পয়সা দিয়ে ছবি দেখতে যান। এই অনাসৃষ্টি তাঁরা সহ্য করবেন কেন!

উত্তমবাবু কথায় কথায় বলছিলেন : আমার অবস্থাটা তখন একবার ভাবুন রবিবাবু। পায়ের নিচে মাটি পাচ্ছি না। অথচ যেমন করেই হোক আমাকে দাঁড়াতেই হবে। তাই প্রোডিউসাররা যে নায়িকা দিচ্ছেন তার বিপরীতে অভিনয় করতে হচ্ছে। ভালো ভালো সব প্রেমের সংলাপ দারুণ আবেগ দিয়ে অভিনয় করতে গেলাম। কিন্তু নায়িকার মুখের দিকে চোখ পড়তেই সব কেমন যেন গোলমান হয়ে যেতে লাগল। যাঁকে পায়ে হাত দিয়ে দিদি বলে প্রণাম করার কথা, তাঁর হাত ধরে রোম্যান্টিক প্রেমের সংলাপ মুখ দিয়ে বার করি কী করে! তা সত্ত্বেও আমি চেষ্টা করে গিয়েছিলাম। এক-আধ বছর নয়, বেশ কয়েকটা বছর। কিন্তু কোনও ফল পাচ্ছিলাম না। অথচ আমি যে খুব খারাপ অভিনয় করছিলাম তা নয়। একটা কাজ করার পর নিজের থেকেই তো খানিকটা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তো কোনও লাভ হল না।

ঠিক এই একই প্রবলেমে পড়েছিলেন শ্রীমতী সন্ধ্যারাণীকে নিয়ে। সন্ধ্যাদির বিপরীতে উত্তমবাবু নায়ক হিসেবে অন্তত খান দশেক ছবিতে কাজ করেছেন। তবে সেসব ছবিতে রোম্যান্সের ব্যাপারটা অনেক কম ছিল, এটাই রক্ষে। ওঁদের দু'জনের অভিনয়ের ব্যাপারটা খুবই জমেছিল। দর্শকরা সেসব ছবি দেখে প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু উত্তমবাবুর যেটা খুব দরকার ছিল, রোম্যান্টিক নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া, সেটা তিনি পাননি সন্ধ্যাদির সঙ্গে অভিনয় করে।

সেটা পেলেন সুচিত্রা সেনকে নায়িকা হিসেবে পাবার পর। উত্তমবাবু বলছিলেন : 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে আমার অপোজিটে রমাকে নায়িকা হিসেবে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার নায়িকা এসে গেছে। সেটা ভালো করে বোঝা গেল 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবির পর। তারপর তো আমাদের দু'জনকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এই যে আপনি একটু আগে বলছিলেন না যে আমরা বাংলা ছবিতে রোম্যান্টিসিজমের একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছি, সেটা কিন্তু আমার একার দ্বারা সম্ভব ছিল না। রমাকে বিপরীতে না পেলে ওই ব্যাপারে কতটা এগোতে পারতাম, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

উত্তমবাবুর এ কথায় আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলাম। তারপর বেশ সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছিলাম: একটা প্রশ্ন করব উত্তমবাবু?

উত্তমবাবু বললেন : নায়িকাদের সম্পর্কে শারীরিক কোনও প্রশ্ন ছাড়া আর সবকিছুই করতে পারেন অনায়াসে।

আমি বললাম : না না, এটা শারীরিক প্রশ্ন নয়, মানসিক। সেটা করা চলবে তো?

উত্তমবাবু বললেন : অত ধানাই-পানাই করবার কী আছে মশাই। যা জানতে চান সেটা খোলাখুলি বলুন না। ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হোক আমি তো আপনার পোঁতা হাড়িকাটে গলা দিয়ে বসে আছি।

আমি বললাম : উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত বেশ কয়েকটা ছবি দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে, অভিনয়ের সময় আপনাদের দু'জনের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা চলে। একে অন্যকে মেরে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা। মনে হয় যেন একটা জেলাসি কাজ করছে। এটা কি ঠিক?

উত্তমবাবু বললেন : জেলাসি শব্দটা ব্যবহার করবেন না। তাতে আমাদের দু'জনকেই ছোট করা

হয়। তবে হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন তার মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে বৈকি। ওটাকে এক ধরনের স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বলতে পারেন। স্টেজে এই জিনিসটা হরদম চলে। সিনেমার ক্ষেত্রে চলা উচিত নয়। সেখানে মাথার ওপর ডিরেক্টার আছেন। তবু আমাদের অভিনয়ের মধ্যে ওই ব্যাপারটা কিছুটা এসে যেত বৈকি।

আমি বললাম : অন্য নায়িকাদের সঙ্গে অভিনয়ের সময় কি এই জিনিসটা আসে?

উত্তমবাবু বললেন : খুব কম। আমি ছবির নায়িকা দেখে দেখে আমার অভিনয়ের প্যাটার্নটা ঠিক করে নিতাম।

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

উত্তমবাবু বললেন : ধরুন কোনও ছবিতে আমার নায়িকা অরুন্ধতী মুখার্জি। তা ওঁর সঙ্গে অভিনয়ের সময় আমি আমার অভিনয়ের মধ্যে কিছুটা ইনটেলেকচুয়াল ফ্লেভার আনার চেষ্টা করতাম। প্রেমের ডায়লগ বলবার সময় ততটা গদগদভাব প্রকাশ করতাম না। কারণ জানতাম অরুন্ধতী ওই রাস্তায় কদাচ হাঁটবেন না। ওটা করতে গেলে আমি মার খেয়ে যেতাম।

আমি বললাম : আর সাবিত্রী চ্যাটার্জির বেলায়?

উত্তমবাবু বললেন : ওরে বাব্বা, সাবুর কথা আর বলবেন না। ওর সঙ্গে অভিনয় করার সময় আমাকে প্রতিটা মুহূর্তে তটস্থ থাকতে হয়। কখন কোথা দিয়ে যে সাবু আমাকে মেরে দেবে তা আমি বুঝতেও পারব না। অভিনয় করবার সময় সাবুর যেন সবক'টা ইন্দ্রিয়ই কাজ করে। সাবুর মতো পাওয়ারফুল অ্যাকট্রেস আমি আমার লাইফে আর একটিও দেখিনি।

আমি বললাম : কেন, ছায়া দেবী?

উত্তমবাবু বললেন : আপনার মতো বেরসিক লোক তো আমি আর একটিও দেখিনি মশাই। হচ্ছে আমার নায়িকাদের কথা, আর আপনি তার মধ্যে ছায়াদিকে টেনে নিয়ে এলেন।

আমি বললাম : ঠিক আছে। তা হলে আপনি যাঁর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ছবিতে নায়ক করেছেন। সেই সুপ্রিয়া দেবীর কথা বলুন।

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে একটা চোখ টিপে বললেন : ওটা তো আপনার বন্ধুর ব্যাপার। তার কাছ থেকেই জেনে নিন না কেন!

এই শুরু হল উত্তমবাবুর পাগলামি। একটা চান্স পেয়েছেন কী সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চেপে ধরলেন। আমি একবার আমার লেখা একটা আর্টিকেলে সুপ্রিয়া দেবীকে আমার 'বন্ধু' বলে উল্লেখ করেছিলাম। উত্তমবাবু তা নিয়ে চান্স পেলেই ঠাট্টা-মস্করা করতেন। কোনওদিন সকালে হয়তো ময়রা স্ট্রিটে গেছি। আমাকে দেখামাত্রই উত্তমবাবু প্রশ্ন করলেন : কী ব্যাপার, এত সকালে কার কাছে? রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি বুঝি বন্ধুর কথা ভেবে ভেবে!

উত্তমবাবুর এই ধরনের রসিকতার মধ্যে অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকত না। এটা নিছক রসিকতাই। আমিও এটা হাসিমুখেই সহ্য করতাম। না করে আর উপায় কী! পাপ যা করবার সেটা তো আমিই করেছি। তার ফল ভোগ করতে হবে না!

সুপ্রিয়া দেবীর প্রতি আমার এই বন্ধুকৃত্যের ব্যাপারটি ঘটেছিল ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। সুপ্রিয়া দেবী তখন ফিল্মে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। তবে তখনও উত্তমবাবুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জমেনি। সেবার আগ্রায় গিয়েছিলাম অসীম ব্যানার্জি পরিচালিত 'হারানো প্রেম' ছবির শুটিং কভার করতে। সেইখানেই সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। লরিস হোটেলের লাউঞ্জে নাইট শুটিং হচ্ছিল। অসীমের পীড়াপীড়িতে আমাকে ক্যামেরার সামনে বসতে হয়েছিল একটা চায়ের টেবিলে। পরিধেয়র ব্যাপারে আমি সাধারণত ধুতি-পাঞ্জাবিতেই অভ্যস্ত। তা সেবার কী খেয়াল হল, আগ্রা যাবার আগে চাঁদনী থেকে একটা স্যুট তৈরি করিয়ে ফেললাম। পার্টির দৃশ্যে ওই স্যুট-টাই শোভিত চেহারাটাই আমার কাল করল। অসীম বলল : আপনাকে বেশ সাহেব-সাহেব দেখাচ্ছে। আপনি এই শট্‌টায় একটু বসে যান রবিদা।

ওই লটের শুটিং-এ বিশ্বজিৎ ছিল, আমার বন্ধু নির্মলকুমার ছিলেন, সুপ্রিয়া দেবী তাঁর মেয়ে

সোমাকে নিয়ে আগ্রায় এসেছিলেন। ওঁদের কেয়ারটেকার হিসেবে এসেছিলেন সুপ্রিয়া দেবীর স্বামী বিশু চৌধুরির ভাগনে কমলবাবু। কমলবাবু উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার গ্রুপে অভিনয় করতেন। সেই সুবাদে আমার পূর্বপরিচিত।

একজন সাংবাদিক শট্ দিচ্ছেন শুনে কৌতূহলের বশে সুপ্রিয়া দেবী শুটিং স্পটে এসে হাজির হয়েছিলেন। মেয়েকে খাইয়ে-দাইয়ে রুমে ফেরাব পথে একটা মজা দেখতে এলেন আর কী! সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে আমার তার আগে সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না। শট্-টট্ হয়ে যাবার পর উনি নিজেই এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।

সেই আলাপটা ভয়ানকভাবে জমে গেল। শুটিং-এর বাইরে অধিকাংশ সময় আমরা একসঙ্গে কাটাতাম। লরিস হোটেলের বাগানে পায়চাবি করতাম। সন্ধের সময় লাউঞ্জে বসে জমিয়ে আড্ডা দিতাম। ওইরকম আড্ডা দিতে দিতেই একদিন একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেল।

সেদিন সন্ধেবেলা লাউঞ্জে গিয়ে বসবাব সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়া দেবী বললেন . ববিদা, আমাব একটা ট্রাঙ্ককল আসবার কথা আছে কলকাতা থেকে। আপনি একটু রিসেপশানে বলে আসুন না, ওটা এলে যেন আমাকে ডেকে দেয়। আমরা তো লাউঞ্জেই আছি।

আমি উঠে গিয়ে রিসেপশানকে সেই নির্দেশই দিয়ে এলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যেই কলটা এল। সুপ্রিয়া দেবীর স্বামী বিশুবাবু ফোন করছেন বাড়ি থেকে। সুপ্রিয়া দেবীর কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম ওঁদের কলকাতার বাড়িতে তখন জোর আড্ডা বসেছে। সুপ্রিয়া দেবী ফোনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ রিসিভারটা জোব করে আমার কানে গুঁজে দিলেন। খুব সুরেলা কণ্ঠে একটা গানের প্রথম কলিটা শুনতে পেলাম, 'আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি, আব মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি'।

আমি রিসিভারটা আমার কান থেকে সরিয়ে সুপ্রিয়া দেবীর কানে দিলাম। মিনিট খানেকের মধ্যে ওঁর কথা শেষ হয়ে গেল। আমি বললাম : কে গাইছিলেন বলুন তো গানটা? গলাটা তো ভারী চমৎকার।

সুপ্রিয়া দেবী হাসতে হাসতে বললেন : ও মা, আপনি হেমন্তদার গলা চিনতে পারলেন না!

আমি বললাম · তাই নাকি ! হেমন্ত মুখার্জি গাইছিলেন ! আমি ভাবলাম কে রে বাবা, এত সুরেলা গলায় গাইছে। তা হেমন্তদা ওখানে কী করছেন?

সুপ্রিয়া দেবী বললেন : হেমন্তদা তো আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। কলকাতায় থাকলে উনি মাঝে মাঝে আসেন আড্ডা দিতে। শুধু হেমন্তদা কেন, আরও অনেকেই আসেন। পরিচালক অসিত সেন আসেন। জনতা পিকচার্সের মালিক মহেন্দ্র গুপ্তা আসেন।

বুঝলাম সুপ্রিয়া দেবীকে কেন্দ্র করে চারিদিক থেকে তখন সুন্দরের অভিনন্দন চলছে। তাই উল্টোরথ পত্রিকায় এক প্রতিবেদনে আমিও সুপ্রিয়া দেবীকে 'বন্ধু' বলে উল্লেখ করেছিলাম।

ওইভাবে উত্তমবাবুও আসতেন সুপ্রিয়া আর বিশু চৌধুরির বাড়িতে আড্ডা দিতে। এটা শুনেছি আমাদের উল্টোরথের ফটোগ্রাফার হেমেন মিত্রের মুখ থেকে। তারপর তো সেই অঘটনটা ঘটে গেল। মতান্তরের কারণে সুপ্রিয়া দেবী বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন প্রচণ্ড অভিমানের বশে। সে অভিমান আর কোনওদিনই মিটল না। উত্তমবাবুর সঙ্গে নতুন একটা সম্পর্কের সূচনা হল সেই ঘটনার পর থেকে।

আমি যতদূর জানি সুপ্রিয়া দেবীর গৃহত্যাগের পিছনে উত্তমবাবুর কোনও হাত ছিল না। এটা সুপ্রিয়া দেবীই আমাকে বলেছেন। উনি এক বস্ত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন। আত্মহত্যা করার একটা বাসনা সেই সময়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল সুপ্রিয়া দেবীর মনে। হয়তো তাই-ই করে ফেলতেন, যদি না উত্তমবাবুর সমবেদনা পেতেন। উত্তমবাবু ওঁকে রাজভবনের সামনে স্পেন্সেস হোটেলে সাময়িক আশ্রয় দেন। অভিমান ভাঙিয়ে ওঁর মত পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

না, তারও পরে বহুদিন পর্যন্ত ওঁদের মধ্যে কোনও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। ওটা ঘটেছিল ময়রা স্ট্রিটে আসার পর। সেটা একটা আলাদা পর্ব। আপাতত তা আমার আলোচনার বিষয় নয়।

সেই উত্তমবাবু আর সুপ্রিয়া দেবীকে আমার দেশ তমলুকে একবার নিয়ে গিয়েছিলাম। আর সেই উদ্দেশ্যেই আমার তোপচাঁচি যাওয়া। ওঁরা দু'জনে তখন সেখানে অগ্রগামী পরিচালিত 'বিলম্বিত লয়' ছবির শুটিং করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই একদিন রাত একটার পর ঘটেছিল সেই রোমহর্ষক ঘটনাটা।

উত্তমবাবুর জীবনের একটা দিক ছিল দানশীলতা। উনি যে গোপনে কত দান করতেন তার পুরো হিসেব যদি কারও কাছে থাকত তবে তাঁকে অনায়াসে 'দানবীর' আখ্যা দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু সে হিসেব কারও কাছে নেই। থাকবার কথাও নয়। কারণ উনি দান করতেন অত্যন্ত গোপনে। সামান্যতম ঢাকঢোল পিটিয়ে নয়।

একটা ঘটনার কথা বলি। এটা আমি শুনেছি অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। ওঁরা দুজনে তো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। যে কারণে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিজস্ব সংগঠন 'শিল্পী সংসদ' নিয়ে উত্তমবাবুর যে স্বপ্ন ছিল, সেগুলিকে রূপায়িত করবার জন্য উত্তমবাবুর মৃত্যুর পর ওই সংসদের গুরু দায়িত্ব অনিল চট্টোপাধ্যায়কেই নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে শারীরিক নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও।

এবারে ঘটনাটা বলি। এই ঘটনার কথা সম্ভবত অনিল চট্টোপাধ্যাযকে নিয়ে লেখার সময় উল্লেখ করেছিলাম। তা সত্ত্বেও আবার উল্লেখ করায় কোনও বাধা নেই। কারণ আমি বিশ্বাস করি, কোনও ভাল কাজের গুণগান শতমুখে শতবার হওয়া উচিত। আজকালকার মানুষ তো কে কী ভাল কাজ করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আলোচনা করেন কে কী খারাপ কাজ করেছেন তা নিয়ে। এইভাবে খারাপ আলোচনা করতে করতে মানুষ নিজেও যে কত খারাপ হয়ে যান সেটা তো তাঁরা বুঝতে পারেন না। যাই হোক, এবার মূল বক্তব্যে ফিরে আসি।

সেবার দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠীর দিন ভবানীপুরের একটি পূজামণ্ডপে আগুন লেগে প্রতিমাটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল। পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতার মন খুব খারাপ। তাহলে আর এ বছর পাড়ায় পুজো হবে না। বিশেষ করে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মন তো আরও বেশি খারাপ। পূজামণ্ডপে তারা সারাদিন ঘুরে ঘুরে আনন্দ করে বেড়াত। এ বছর আর তা হবে না। অন্য পাড়ার পুজোয় তাদের তো পাত্তাই দেবে না।

উদ্যোক্তাদের মনেও চূড়ান্ত বিষাদ। তাদের এতদিনকার এত পরিশ্রম সব বিফল হয়ে গেল। রাতারাতি তো কয়েক হাজার টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয় যে কালীঘাটের পোটোপাড়া অথবা কুমারটুলি থেকে প্রতিমা আনানো যাবে। পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারাও মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। অষ্টমীর দিন সিঁদুরখেলা অথবা দশমীর দিন মায়ের সিঁথিতে সিঁদুর ছোঁয়ানো এ বছর আর বোধহয় হল না। দুঃখভরা মন নিয়ে তাঁরা রাত্রে ঘুমোতে গেলেন।

খুব ভোরবেলা পাড়ার সকলের ঘুম ভাঙল সানাইয়ের আওয়াজে। এ কী! মণ্ডপে তো প্রতিমা নেই। তাহলে কোন বেয়াক্কেলে এমন করে সানাই বাজায়! এ যে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের সমান।

পাড়ার দু-চারজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ রাগত ভঙ্গিতে প্যান্ডেলের দিকে চললেন। ছোঁড়াগুলোকে বেশ করে ধমকে দিতে হবে। কিন্তু ধমকে দিতে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে চমকে গেলেন তাঁরা। মণ্ডপ আলো করে জগজ্জননী মা দুর্গা তাঁর সন্তানসন্ততিদের নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

এত বড় চমকের জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। এ যে পি. সি. সরকারের ম্যাজিক। কেমন করে এটা সম্ভব হল? খোঁজ নিয়ে জানলেন পাড়াবই একজন সহৃদয় ব্যক্তি রাতারাতি হাজার কয়েক টাকা বার করে দিয়েছেন প্রতিমা আমার আনবার জন্য।

কে সেই ব্যক্তি?

উদ্যোক্তারা জানান : সেটা বলা সম্ভব নয়। এই টাকা দেবার পেছনে তাঁর একটাই শর্ত। তাঁর নাম কেউ জানবে না।

এই যুগেও এমন মহানুভব কেউ আছেন নাকি? আজকালকার মানুষ তো ভিখিরিকে দশটা পয়সা দেবার সময়ও আশেপাশে তাকিয়ে দেখেন কোনও চেনা মানুষের নজরে পড়ল কি না। না পড়লে তো দানের আনন্দটাই মাটি।

এই প্রশ্নটা বোধহয় অনিল চট্টোপাধ্যায়ের মনেও জেগেছিল। তাই কেউ না পারলেও তিনি শার্লক হোমসের কায়দায় উদ্যোক্তাদের পেটের ভিতর থেকে সেই দাতা ভদ্রলোকটির নাম বার করে নিয়েছিলেন।

তাঁর নাম উত্তমকুমার।

উত্তমবাবুর এইরকম গোপন দানের কথা আমারও কিছু কিছু জানা আছে। শোনা আছে অনেক। কিন্তু আমি সেই সব শোনা কথা আপনাদের না শুনিয়ে আমার চোখে দেখা একটা ঘটনার কথা বলি।

উত্তমবাবু নিজের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে খুব বেশি দূর এগোতে পারেননি। তাই কোনও দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রী পয়সার অভাবে বই কিনতে পারছে না, এটা তাঁকে বড়ই বেদনা দিত। সেজন্যে তিনি ঠিক করেছিলেন এই ধরনের কোনও ছাত্র বা ছাত্রী তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁদের বিমুখ করবেন না। এর জন্যে ওই ছাত্র বা ছাত্রীর স্কুলের হেডমাস্টারের একটি চিঠির দরকার হত।

আমি একটা সময়ে প্রায়ই উত্তমবাবুর ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে যেতাম। সেই সময়ে ইয়ার এন্ডিং-এ এইরকম বহু ছাত্র-ছাত্রীকে সাহায্য নেবার জন্যে আসতে দেখেছি। উত্তমবাবু তাদের হাতে নগদ টাকা দিতেন না। তাদের কাছ থেকে বুকলিস্টটা চেয়ে নিতেন। তারপর নিজের লোকজনদের দিয়ে বই কিনিয়ে আনিয়ে তাদের হাতে তুলে দিতেন।

সেবার একটা মজার ব্যাপার হল। ক্লাস সেভেনের এক ছাত্র কলকাতা থেকে অনেক দূরে থাকে, এসেছে সাহায্য চাইতে। কিন্তু সে হেডমাস্টারমশাইয়ের চিঠি আনেনি। এটা যে আনার দরকার সেটা তার জানা ছিল না।

বিকাশ রায়ের প্রধান সহকারী সুনীল রায়চৌধুরি সেই সময়ে উত্তমবাবুর ওখানে খুব যাওয়া-আসা করতেন। অকৃতদার এই মানুষটির কাজই ছিল পরোপকার করে বেড়ানো। যে কারণে সুনুদা ইন্ডাস্ট্রিতে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। উত্তমবাবুও তাঁকে খুব ভালবাসতেন এবং অনেক ব্যাপারেই সুনুদার ওপর নির্ভর করতেন। সুনুদা ছেলেটিকে বললেন : হেডমাস্টারের চিঠি ছাড়া তো কোনও সাহায্য দেওয়া যাবে না বাবা। তুমি তাঁর চিঠি নিয়ে কাল এসো।

ছেলেটি বললে · আমি তো মেদিনীপুর জেলার একটা গ্রামে থাকি স্যার। সেখান থেকে যাওয়া আসা করতে অনেক গাড়িভাড়া লাগে। আমার মা তো খুব গরিব। আর একবার গাড়িভাড়া করে আসবার টাকা তো তাঁর কাছে নেই।

সুনুদা বললেন . তা বললে তো হবে না। যেটা নিয়ম সেটা তো করতে হবে।

সুনুদা ময়রা স্ট্রিটের বাড়ির দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেইসব কথাবার্তা ঘরের ভেতরে উত্তমবাবুর কানে যাচ্ছিল। উনি বললেন : সুনুদা, ছেলেটিকে ভেতরে আসতে বলো তো।

ছেলেটি সিনেমা-টিনেমা বেশি না দেখলেও উত্তমকুমার যে কত বড় অভিনেতা সেটা তার জানা ছিল। তাই তেমন একটি মানুষের সামনে দাঁড়াতে তার পা দুটো তির তির করে কাঁপছিল। একটু দূরে বসেও আমি সেটা বুঝতে পারছিলাম।

উত্তমবাবু ছেলেটিকে জিজ্ঞাস করলেন : তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে গাড়িভাড়া চেয়ে এনেছো বলছিলে। কেন, তোমার বাবা নেই?

ছেলেটি মুখটা নিচু করে বললে : আছেন, কিন্তু আমাদের কাছে থাকেন না।

উত্তমবাবু বললেন : তিনি কোথায় থাকেন?

ছেলেটি বললে : হাওড়ায়। তিনি আর একজন মাকে বিয়ে করেছেন।

উত্তমবাবু বললেন : তুমি তাঁর কাছে যাও না?

ছেলেটি বললে : আমি তাঁর ঠিকানা জানি না। মা জানেন। কিন্তু মা আমাকে সেখানে যেতে দেবেন না।

উত্তমবাবু বললেন : তোমাদের সংসার চলে কেমন করে?

ছেলেটি বললে : মা অন্য লোকদের বাড়িতে ধান সেদ্ধ করেন। ধান ভেনে দেন।

উত্তমবাবু বললেন : তোমার স্কুলের মাইনে কে দেয়?

ছেলেটি বললে : আমার তো স্কুলে মাইনে লাগে না। আমি প্রতি বছর ফার্স্ট হই তো। তাই মাইনে দিতে হয় না।

উত্তমবাবু বললেন : তুমি তো ক্লাস সেভেনে উঠেছ বলছো। এতদিন বই কেনা হত কেমন করে?

ছেলেটি বললে : মা সকলের কাছে চেয়ে চেয়ে বই কিনে দিতেন। ক্লাস সেভেনের বই কিনতে তো অনেক বেশি টাকা লাগবে। তাই আমাদের গ্রামের ভূষণকাকা বললেন, আপনার কাছে আসতে।

উত্তমবাবু বললেন : আমার ঠিকানা পেলে কোথায়?

ছেলেটি বললে : ভূষণকাকাই দিলেন। আপনার ঠিকানা তো সকলেই জানে।

এইসব কথা শুনতে শুনতে দেখলাম উত্তমবাবুর চোখটা কেমন যেন ছল ছল করে উঠছে। তিনি কপালে হাত দিয়ে একটুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন : তুমি একটু বসো। আমি ভিতর থেকে আসছি।

মিনিট দশেক পরে উত্তমবাবু ফিরে এলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম একটু আগে চোখে-মুখে জল দিয়েছেন।

উত্তমবাবু একটি খাম ছেলেটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন : এতে কিছু টাকা আছে। সাবধানে নিয়ে যেও। তোমার মায়ের হাতে দিয়ে বলবে বই কিনে দিতে। তোমাকে আর হেড মাস্টারমশাইয়ের চিঠি আনতে হবে না। পরের বছর পাশ করবার পর দেখা করে যেও।

এই বলে উত্তমবাবু ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। ছেলেটিকে তিনি কত টাকা দিলেন তা আমি বলতে পারব না। তবে খামটির হৃষ্টপুষ্ট চেহারা দেখে আন্দাজ করে নিতে পারি যে অন্তত হাজার খানেক টাকা তো হবেই।

এই হলেন দানবীর উত্তমকুমার। মানবদরদী উত্তমকুমার। ভাবতেও বড় কষ্ট হচ্ছে যে এই মানুষটি আর আমাদের মধ্যে নেই। থাকলে কত অনাথ বালকের যে উপকার হত।

এবারে আমার তোপচাঁচি অভিযানের কথা বলি। এটা ১৯৬৯ সালের কথা। আমার দেশ তমলুক মিউসিনিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান অমিয় জানার ইচ্ছে হল তমলুক শহরে একবার উত্তমকুমারকে নিয়ে যাবার। সে ওখানে উত্তমবাবুকে নাগরিক সংবর্ধনা দিতে চায়।

অমিয় আমার খুবই স্নেহভাজন। সে আমাকে তার ইচ্ছের কথাটা বলা মাত্রই আমিও লাফিয়ে উঠলাম। এটা তো একটা দারুণ ভাল ব্যাপার। তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি তমলুকেরই মানুষ। তাঁর হাত দিয়ে উত্তমবাবুকে সংবর্ধনা দেওয়াতে পারলে ব্যাপারটা খুবই জমকালো হয়।

পরদিনই অমিয়তে আর আমাতে অজয়দার বেলভেডিয়ার প্রেসের বাড়িত গিয়ে দেখা করলাম। ওখানে অজয়দার ভাইপোর কোয়ার্টার। মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও অজয়দা ওই ফ্ল্যাটেই অতি সাধারণ ভাবে বসবাস করতেন। গান্ধীবাদী এই মানুষটি সারা জীবন এইরকম বাহুল্যহীন জীবন কাটিয়ে গেছেন।

অজয়দাকে প্রস্তাবটা দিতে উনি প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। উনি ভয় পাচ্ছিলেন যে উত্তমকুমারের মতো অমন জনপ্রিয় একজন শিল্পীকে নিয়ে গিয়ে আমরা না ফ্যাসাদে পড়ি। মানুষের ভিড় সামলাবে কে? তখন অজয়দাকেই বললাম : আপনি যদি যথেষ্ট পুলিশের ব্যবস্থা করে দেন তা হলে আর অসুবিধা কোথায়?

যাই হোক অজয়দা তো শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। কিন্তু যাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে সেই উত্তমকুমারকে রাজি করাতে তো হবে। আর রাজি হলেও তাঁর যাওয়া-আসা, তমলুকে থাকার ব্যবস্থা, বেশ বড়সড় করে একটা প্যান্ডেল বাঁধা, সে সবের তো বিরাট খরচ। সেটা বহন করবে কে?

অমিয় বললে : রবিদা, আপনার আশীর্বাদে টাকা-পয়সার অভাব আমার নেই। ও টাকাটার যোগাড় হয়ে যাবে। তবে আমি বলি কী, সেই সঙ্গে কলকাতার শিল্পীদের নিয়ে গিয়ে একটা হোল নাইট ফাংশান করলে কেমন হয়। টাকাটা তাহলে আমার একার পকেট থেকে যায় না।

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমি তো একা উত্তমবাবুকে সামলানো আর শিল্পীদের সামলানো দুটো কাজ করতে পারব না। সেই জন্যে শিল্পীরা মান্য করেন এমন একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষের দরকার।

তা সেই মানুষটি আর কে হতে পারেন সেবাব্রত গুপ্ত ছাড়া। সেবাব্রত গুপ্ত হলেন বাংলার চলচ্চিত্র সংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক বিরাট পুরুষ। এক্ষেত্রে তাঁর অবদানও বিরাট। আনন্দলোক পত্রিকার সমস্ত

দায়িত্ব ওঁর কাঁধে। ওঁকে কী এ ব্যাপারে রাজি করানো যাবে?

আমার পরম সৌভাগ্য যে সেবাব্রতবাবু আমাকে দারুণ ভালবাসতেন। আজও বাসেন। আমার জীবনের বহু ক্ষেত্রে তাঁর কাছে যে উপকার পেয়েছি তার কোনও সীমা পরিসীমা নেই। বাইরে থেকে মানুষটিকে দেখলে রুক্ষ এবং বদরাগী মনে হবে। কিন্তু সেবাব্রতবাবুর মনের ভেতরটা যে কী নরম তা যাঁরা ওঁর কাছে স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছেন তাঁরাই জানেন। কত মানুষের কত রকমের উপকার যে উনি করছেন তার ইয়ত্তা নেই। যে কারণে উনি সকলের প্রিয় 'সেবাদা'।

রাতভর বিচিত্রানুষ্ঠান সামলানোর ব্যাপারে সেবাব্রতবাবুর সাহায্য চাইতেই উনি পত্রপাঠ নাকচ করে দিলেন। বললেন : আমার কি ওইসব কাজ নাকি?

আমি বললাম : এসব কাজ আপনার নয় সেটা আমি জানি। কিন্তু এটা তো আপনি আমার জন্যে করছেন। আমি জানি আর সবাইকে ফিরিয়ে দিতে পারলেও আমাকে আর নিমু ভৌমিককে আপনি কোনদিন বিমুখ করবেন না।

এবারে সেবাবাবু হেসে ফেললেন। বললেন . আপনার জন্যে আর কত করব?

আমি বললাম : সারা জীবন করে যেতে হবে।

সেবাবাবু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন . আমি কিন্তু সর্বক্ষণ বসে বসে উত্তমকে সঙ্গ দিতে পারব না। ও ধরনের কাজ আমার ডিগনিটিতে বাধে।

আমি বললাম . না না, ওটা আপনাকে করতে হবে না। সে দিকটা আমি সামলাব। আপনি শুধু শিল্পীদের দিকটা দেখবেন। ফাংশানটা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই দিকে নজর রাখবেন।

সেবাবাবু বললেন · উত্তমের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে? ও যেতে রাজি হয়েছে?

আমি বললাম : না, উত্তমবাবুর কাছে এখনও প্রস্তাবটা পেশ করিনি।

এবারে সেবাব্রতবাবু রেগে গেলেন। বললেন : তো সেই কাজটা তো আগে করবেন। ঘোড়াই কেনা হল না· তো চাবুক কিনতে ব্যস্ত।

সেবাবাবুর ধমক খেয়ে ঘোড়া কেনবার জন্যে ছুটলাম তৎক্ষণাৎ। ময়রা স্ট্রিটে গিয়ে জানতে পারলাম উত্তমবাবু আর সুপ্রিয়া দেবী দুজনেই চলে গেছেন তোপচাঁচিতে 'বিলম্বিত লয়' ছবির আউটডোর করতে। সঙ্গে সোমাও গেছে। তাতেই মনে হয় ফিরতে কয়েক দিন দেরি হবে।

অতএব চলো তোপচাঁচি।

উত্তমকুমার কী কোনও রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন? এটা নিয়ে অনেকের মনেই কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে। একটা সময়ে উত্তমবাবুকে রাজনীতির অঙ্গনে আনবার জন্য বেশ কিছু চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু উত্তমবাবু সে ফাঁদে পা দেননি। কোনও রাজনৈতিক দলের হ্যান্ডবিলেও স্বাক্ষর প্রদান করেননি। তা সেটা যতই মহৎ প্রয়োজনে হোক না কেন!

একবার কথায় কথায় উত্তমবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম : আপনি কোন্ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করেন?

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন : আমি কোনও মতবাদে বিশ্বাস করি না, আবার কোনও মতবাদে অবিশ্বাসও করি না।

আমি বললাম : এটা কি একটা উত্তর হল নাকি? আপনি কোন্ দলকে ভোট দেন সেটাই বলুন না।

উত্তমবাবু বললেন : আমি তো ভোট দিই না।

আমি বললাম : সে কী! আপনি স্বাধীন ভারতের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না?

উত্তমবাবু বললেন : আমি লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে গেলে ভক্তদের হাতে যে ভালবাসার চোটটা পেতে হবে, সেটা কি আপনি সামলাতে আসবেন মশাই।

আমি বললাম : সে তো আপনি নায়ক হিসেবে জনপ্রিয় হবার পরের ব্যাপার। তার আগে আপনি কখনও ভোট দেননি?

উত্তমবাবু বললেন : ঠিক মনে পড়ছে না। বোধহয় দিইনি। তাছাড়া ওইসব ভোট-টোট তো শুরু হল বোধহয় ফিফটিজের মাঝামাঝি। তখনই তো আমার একটু-আধটু নাম-ধাম হয়ে গেছে।

আমি বললাম : তাহলে আপনি রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না বলছেন?

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন : রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না, সে কথা একবারও বলেছি কি? রাজনীতি হল কত বড় জিনিস! মহৎ জিনিস। রাজনীতি আমাদের খাওয়াচ্ছে-পরাচ্ছে, ট্রামে বাসে বাদুড়ঝোলা ঝোলাচ্ছে, মাঝে মাঝে লাঠি গুলি টিয়ারগ্যাস উপহার দিচ্ছে, ও হেন মহান জিনিসে বিশ্বাস করব না, এ কথা বলার মতো আমার বুকের পাটা আছে নাকি!

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিলেন : আমি হলাম ছোটখাটো মানুষ, অভিনয়-টভিনয় করে পেটের ভাত জোগাড় করি। আমার কি ওসব বড় বড় ব্যাপারে মাথা ঘামানো সাজে।

এই যে কথাটা উত্তমবাবু বললেন, এটা একেবারে ওঁর অন্তরের কথা। ঠিক এই রকম কিছু ডায়লগ ছিল সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবিতে ওঁর মুখে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওসব কথা হয়েছিল 'নায়ক' ছবি হবার বেশ কয়েক বছর আগে।

প্রকৃতপক্ষে উত্তমবাবু সব সময়েই নিজেকে রাজনীতির ছোঁয়াচ থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও একটা সময়ে তাঁর চরিত্রে রাজনীতির রং লাগাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। আর সেটা হয়েছিল ওঁরা যখন অভিনেতৃ সংঘ থেকে বেরিয়ে গিয়ে শিল্পী সংসদের প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন।

অভিনেতৃ সংঘ শিল্পীদের সুখঃদুঃখের অংশভাক্ একটি বহুদিনের পুরনো প্রতিষ্ঠান। স্বর্গত ছবি বিশ্বাস বহুদিন অভিনেতৃ সংঘের সভাপতি ছিলেন। এখানকার যাঁরা সদস্য তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে নানা মতবাদে বিশ্বাস করতেন। কেউ কংগ্রেস, কেউ কমিউনিস্ট, কেউ বা হিন্দু মহাসভা। কিন্তু সংঘের ক্ষেত্রে এই সব মতবাদের কোনও প্রতিফলন ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে যে যাই হোন না কেন, সংঘের ক্ষেত্রে তাঁরা সবাই শিল্পী। রাজনৈতিক ভাবে কেউ সংঘকে ব্যবহার করার চিন্তা করেননি কোনদিন।

কিন্তু সত্তরের দশকে এসে সেই ধরনের কিছু প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেল। যে কারণে উত্তমকুমার, বিকাশ রায়, জহর গাঙ্গুলি, অনিল চ্যাটার্জী প্রমুখ শিল্পীরা অভিনেতৃ সংঘ থেকে বেরিয়ে গিয়ে শিল্পী সংসদের প্রতিষ্ঠা করলেন, যাঁর সভাপতি হলেন উত্তমকুমার।

ঠিক সেই সময়ে উত্তমকুমারকে কংগ্রেসের অনুরাগী হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা করা হয়। তার প্রতিবাদ করে কলকাতার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। সেখানে সংসদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেন বিকাশ রায়। বিকাশদা বলেন : আমরা শিল্পীদের নিয়ে গড়া কোনও প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঘটতে দেব না। তাই নতুন করে সংসদের প্রতিষ্ঠা। এই সংসদের কোনও রাজনৈতিক রং নেই।

জহর গাঙ্গুলি বলেন : আমি কংগ্রেসের সদস্য। কিন্তু অভিনেতৃ সংঘে বসে কাউকে কোনদিন বলেছি কি ওরে তুই কংগ্রেসকে ভোটটা দিস? সংঘকে আমরা চিরকাল রাজনীতির বাইরে রেখেছি। সংসদকেও তাই রাখতে চাই।

এটা যে সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বহুবার। ব্যক্তিগত মতবাদ কোনদিন সংসদকে প্রভাবিত করেনি। উত্তমবাবুর মৃত্যুর পর শিল্পী সংসদের সভাপতি হয়েছেন অনিল চ্যাটার্জী। কিন্তু তিনি বামফ্রন্টের তালিকাভুক্ত একজন নির্দল বিধায়ক। তিনিও সংসদকে রাজনীতির ছোঁয়াচ থেকে দূরে রেখেছেন।

এটা ভাল কি মন্দ তা আমি জানি না। তবে এটাই ঘটনা।

এই শিল্পী সংসদের সভাপতি হিসেবে উত্তমবাবু যে কী পরিমাণ সিরিয়াস এবং অ্যাকটিভ ছিলেন সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওঁকে নিয়ে তমলুকে অনুষ্ঠান করার সময়। সে কথায় পরে আসছি।

উত্তমবাবুর রাজনৈতিক মনোভাবটা যে কোন্ দলের প্রতি অনুকূল, সেটা আবিষ্কার করার চেষ্টা আমি বহুভাবে করেছি, কিন্তু তার তল খুঁজে পাইনি কোনদিন। একবার, সেই ১৯৬৭ সালে যেবার অজয়দা আরামবাগ থেকে প্রফুল্ল সেন মশাইকে ভোটে হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অকংগ্রেসী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হলেন, সেবারই প্রথম দেখলাম উত্তমবাবুর মুখ থেকে ফট করে দু-একটা রাজনীতির কথা বেরিয়ে এল। তার আগে যখনই আমরা রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা বলেছি তখন উত্তমবাবু হয় চুপ করে

থাকতেন নয়তো সেই আলোচনার আসর থেকে সরে যেতেন। কোনদিনই তাঁর মুখ থেকে রাজনীতি নিয়ে কোন কথা বেরয়নি।

তা সেই ১৯৬৭ সালে যখন অজয় মুখার্জীকে কংগ্রেস থেকে বার করে দিলেন অতুল্যবাবুরা, তখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে অজয়দা বাংলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করলেন। আমরা তমলুকের মানুষজন চিবকালই অজয়দার ফলোয়ার। তমলুকে বেয়াল্লিশের আন্দোলনের তিনিই ছিলেন নায়ক। আমরা তখন হ্যামিলটন স্কুলের ছাত্র। তাঁরই আহ্বানে আমরা স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম আন্দোলনে যোগ দিতে। কংগ্রেস কী তা তখন ভাল করে বুঝতাম না। কিন্তু অজয়দা যা বলবেন সেটাই শিরোধার্য।

১৯৬৭-র ইলেকশানে অজয়দার হয়ে আমরা প্রচুর খেটেছিলাম। আমি তখন উল্টোরথ পত্রিকায়। পুরো দুটো মাস পত্রিকার কাজকর্ম শিকেয় তুলে রেখে ভোটের কাজে মেতে গিয়েছিলাম। অজয়দার প্রতি বদুবাবুদের এই অন্যায়ের একটা মুখের মতো জবাব দিতে হবে আমাদের।

সেবারের ভোটে অজয়দা দু জায়গা থেকে দাঁড়ালেন। তমলুক আর আরামবাগ থেকে। প্রফুল্লদা তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তার ওপর তিনি আবামবাগের গান্ধী বলে পরিচিত। একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী। সেই প্রফুল্লদাকে যে অজয়দা আরামবাগ থেকে হারিয়ে দেবেন এটা আমবা স্বপ্নেও ভাবিনি। তবে আমরা তমলুকের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম।

ভোটের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হল। অজয়দাই হলেন মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের তখন আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই। সেই সময় একদিন উত্তমবাবুর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে উনি বললেন কী মশাই, খুব তো ভোট-টোট নিয়ে মেতেছেন শুনলাম। পত্রিকার কাজকর্ম একেবারে ছেড়েই দিলেন?

আমি বললাম : পত্রিকার কাজ ছেড়ে দিলে খাবটা কী?

উত্তমবাবু বললেন : কেন, আপনাদের তমলুকেরই তো তিন-চারজন মন্ত্রী হয়েছেন দেখলাম। তাঁদেরই কারও সি-এ টি-এ হয়ে যাবেন।

আমি বললাম : ঠাট্টা করছেন?

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন : রাজনীতি করতে গিয়েও দেখছি আপনার বুদ্ধিটা একদম ভোঁতা হয়ে যায়নি। ঠাট্টা-ফাট্টা এখনও বুঝতে পারেন তাহলে!

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন : আপনার অজয়দা একটা খেল দেখিয়ে দিলেন মশাই। আরামবাগের মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল সেনকে হারিয়ে দিলেন। একেবারে জায়েন্ট কিলার।

আমি বললাম : এতদিনে বুঝতে পেরেছি আপনি কোন্ দলের সমর্থক।

উত্তমবাবু বললেন, কোন্ দলের?

আমি বললাম : কংগ্রেসের।

উত্তমবাবু বললেন : কেমন করে বুঝলেন?

আমি বললাম : ওই যে আপনি অজয়দার প্রশংসা করলেন।

উত্তমবাবু বললেন : অজয়বাবু তো অকংগ্রেসী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। সেই হিবেবে আমি তো কমিউনিস্ট সমর্থকও হতে পারি।

তাই তো! সব গোলমাল হয়ে গেল। উত্তমবাবু যে কোন্ দলের সমর্থক তার কোনও হদিসই করতে পারা গেল না। সেটা বোধহয় কেউ পারেননি কোনদিন। তাই তো তাঁর মৃত্যুর পর কোনও দলের ঝাণ্ডাই তাঁর মরদেহের ওপর চাপানোর চেষ্টা হয়নি। আপামর জনসাধারণ কেবল তাঁর শোক মিছিলেন পথটা চোখের জলে ধুইয়ে দিয়েছে।

নাঃ, অনেকক্ষণ রাজনীতি নিয়ে কথা হয়েছে। আর নয়। এবার চলুন আমরা ফিরে যাই তোপচাঁচির পথে। যে পথের সন্ধানে আমাদের গাড়িটা ধানবাদের দিকে ছুটে চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

তোপচাঁচি যাবার সময় আমার পরম স্নেহভাজন সাংবাদিক বিমল চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। বিমল উত্তমবাবুর খুব প্রিয়পাত্র। দিনের বেশিরভাগ সময় ও ময়রা স্ট্রিটেই কাটায়। উত্তমবাবুর ব্যক্তিগত কাজকর্মও কিছু কিছু করে থাকে। বিমলকে সঙ্গে নেবার প্রধান উদ্দেশ্য উত্তমবাবুকে রাজী করানো। আমার অনুরোধের সঙ্গে বিমলের অনুরোধ যুক্ত হলে ব্যাপারটা খুব জোরালো হবে। অনুষ্ঠানটা

কলকাতায় হলে তেমন কোনও অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কলকাতা থেকে অত দূরে তমলুকে উত্তমবাবু যাবেন কিনা সে ব্যাপারে আমার একটু সন্দেহ ছিল। তাই বিমলকেও সঙ্গে নেওয়া। বিমলকে নেবার এই পরামর্শটা আমার প্রধান উপদেষ্টা সাংবাদিক সেবাব্রত গুপ্তই দিয়েছিলেন। বিমলকে সেবাবাবুও স্নেহ করতেন। দেশ পত্রিকায় বিচক্র নামে লেখার সুযোগ বিমলকে উনিই করে দিয়েছিলেন।

তোপচাঁচি যাবার জন্যে কালীঘাট না কোথাকার কোন্ গ্যারাজ থেকে বিমল একটা ঝকঝকে অ্যামবাসাডর ভাড়া করে নিয়ে এল। ড্রাইভারের নাম শিউশরণ। রওনা হবার আগে বিমল বললে : রবিদা, রাজদর্শনে যাচ্ছেন, কিছু ভেট নিয়ে যাবেন না?

আমি বললাম : কী ভেট নিতে হবে বলো?

বিমল বললে : উত্তমদার একটা ফেভারিট ড্রিঙ্ক আছে। সেটাই এক বোতল নিয়ে নিলে হয়। তবে দামটা একটু বেশি পড়বে। প্রায় চারশো টাকা।

শুনে আমি চমকে উঠলাম। ওরে বাবা, এ তো প্রায় আমার এক মাসের মাইনের সমান। তা হোক। বিমল যখন বলেছে তখন ওটা তো নিতেই হবে। ফাংশানের খরচপত্রের জন্যে অমিয় জানা আমার কাছে বেশ কিছু টাকা রেখে দিয়েছিল। তা থেকেই পানীয়ের দাম দেওয়া যেতে পারে। বললাম : ওই পানীয়টি কোথায় পাওয়া যায় তা তো আমি জানি না।

বিমল বললে : আমি জানি। থিয়েটার রোডে সুমার বলে একটা অফ-শপ আছে, ওখান থেকেই উত্তমদার ড্রিঙ্কস্ যায়।

যাবার পথে সুমার থেকে একটা ড্রিঙ্কসের বোতল নিয়ে নেওয়া হল। সেই সঙ্গে আমাদের পথের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে গোটাচারেক বিয়ার। ওটা অবশ্য আমার নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে।

তোপচাঁচির বাংলোর সামনে আমাদের গাড়ি যখন গিয়ে পৌঁছল তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। বাংলোয় ঢুকে দেখলাম ক্যামেরাম্যান কেষ্ট চক্রবর্তী বিছানা পাতার তোড়জোড করছেন। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে একটা ঘরের ভেতর থেকে ওখানে যে ছবিটার শুটিং চলছে সেই 'বিলম্বিত লয়' ছবির পরিচালক অগ্রগামী গোষ্ঠীর প্রধান পুরুষ সরোজ দে ওরফে কালুবাবু বেরিয়ে এলেন। ওই অত রাতে দু'জন সাংবাদিককে দেখে কালুবাবুর ভ্রূ দুটো একটু কুঁচকে উঠল। ওঠবারই কথা। উনি তো কোন সাংবাদিককে আউটডোরে আমন্ত্রণ জানাননি। হঠাৎ যদি দুটো কাগজে ওঁদের আউটডোরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বেরিয়ে যায় তাহলে অন্য সাংবাদিকরা ভাবতে পারেন যে কালুবাবু তাঁদের আমন্ত্রণ না জানিয়ে বিশেষ ভাবে দুই সাংবাদিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। এতে কালুবাবুকে অস্বস্তিতে পড়তে হবে। ভবিষ্যতে অন্যান্য সাংবাদিকরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা নাও করতে পারেন।

অতএব আমাদের দুই সাংবাদিককে দেখে কালুবাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। উনি কোন কথা না বলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। অন্য সময় হলে কালুবাবুর এই ব্যাপারে মনঃক্ষুণ্ণ হতাম। কিন্তু এখন হলাম না। আমি ওঁর মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছিলাম। আগে থেকে ভেবে রেখেছিলাম উত্তমবাবুর সঙ্গে দেখা করে ফাংশানের ব্যাপারে কথাবার্তা বলা ছাড়াও শুটিংয়ের কিছু কভারেজ করব। রথ দেখা আর কলা বেচা দুটোই একসঙ্গে হয়ে যাবে। এখন দ্বিতীয় সঙ্কল্পটি পরিত্যাগ করলাম। ওটা করতে গেলে কালুবাবুর ক্ষতি করা হবে।

ক্যামেরাম্যান কেষ্টবাবুর কাছে জেনে নিলাম উত্তমবাবু আর সুপ্রিয়া দেবী কোন্ ঘরে আছেন। তারপর আস্তে আস্তে সেই ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিলাম।

মিনিট খানেকের মধ্যেই দরজাটা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে উত্তমকুমার। আমাকে দেখে তাঁর মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন : কী ব্যাপার মশাই। এত রাত্তিরে কোথা থেকে আগমন?

আমি বললাম : আপনার কাছেই তো ছুটে এলাম কলকাতা থেকে।

উত্তমবাবু বললেন : আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।

তারপর আমার পেছনে বিমলকে দেখে বলে উঠলেন : ছড়িদারটিও সঙ্গে আছেন দেখছি।

আমি বললাম : ছড়িদার মানে?

উত্তমবাবু বললেন : তীর্থস্থানে কোনও একটা দল গেলে তাদের একজন পথপ্রদর্শক থাকে। তাকেই

বলে ছড়িদার।

আমি বললাম : আপনার কাছে আসা মানেই তো তীর্থস্থানে আসা। তাই বিমলের মতো একজন ছড়িদারের দরকার হয়েছে।

উত্তমবাবু বললেন : খুব আমড়াগাছি করতে শিখেছেন দেখছি। এ গুণটি তো আপনার আগে ছিল না। এটাও কি বিমলের কাছ থেকে ট্রেনিং নেওয়া।

উত্তমবাবুর কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। বললাম : আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।

উত্তমবাবু হঠাৎ আমার হাতে এক গ্লাস পানীয় ধরিয়ে দিয়ে বললেন : আগে এটাতে চুমুক দিন, তারপর আপনার সব জরুরি কথা শুনব।

আমাদের কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে ভেতরের ঘর থেকে সুপ্রিয়া দেবী বেরিয়ে এলেন।

উত্তমকুমার কি ধর্মকর্মে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন? রীতিমত ধুমধাম করে গিরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে এবং ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে তাঁর লক্ষ্মীপুজো করার বহর দেখে মানুষের সেই কথাই মনে হতে পারে। কিন্তু ওই ব্যাপারটা আদপেই গভীর ধর্মবোধের ব্যাপার নয়। উত্তমবাবু ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা নিয়ে তাঁর কোনও আদিখেতা ছিল না। তাঁর কাছে ঈশ্বর ছিলেন বাবা আর মা। ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে দেখেছি প্রতিদিন সকালে স্নান-টান সারার পর একগোছা জ্বলন্ত ধূপ হাতে চলে আসতেন ড্রইং রুমে। সেখানে একদিকের দেওয়ালে নিজের বাবার আর অপর দিকের দেওয়ালে সুপ্রিয়া দেবীর বাবার বিরাট তৈলচিত্র বাঁধানো ছিল। উত্তমবাবু ওই দুটি ছবির সামনে চোখ বুজে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর হাতের জ্বলন্ত ধূপের গোছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিনিট তিনেক আরতি করতেন। এটি ছিল তাঁর প্রাত্যহিক কাজের অঙ্গ। কলকাতায় থাকলে কোনওদিনই এই রুটিনের ব্যত্যয় ঘটত না।

এরপরের পর্বটি আরও চমৎকৃত করার মতো। ঠিক ন'টার সময় স্টুডিওতে যাবার পথে একবার গিরিশ মুখার্জি রোডে যাবেনই। মায়ের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকবেন। ভণ্ডামি করে লোক দেখিয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নিতেন না ভক্তি গদগদ হয়ে। কিন্তু মায়ের কাছে যেভাবে বসে নীরবে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেন, সেটা ফুল-বেলপাতা দেওয়া পুজোর থেকে অনেক বড় মাপের ভক্তি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে অত ঘটা করে দুই বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো করা কেন? এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেটা আবিষ্কার করলাম, সেটা রীতিমত রোমাঞ্চকর। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম উত্তম-ভ্রাতা তরুণকুমারকে। ওঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম : এই লক্ষ্মীপুজোর ব্যাপারটা কি আপনাদের বংশে চিরকাল চলে আসছে?

তরুণকুমার বললেন : না না, আমাদের বংশে এক আমাদের দেশের গৃহদেবতার পুজো ছাড়া আর কোনও পুজোই হয় না।

আমি বললাম : তাহলে এই যে ঘটাপটা করে লক্ষ্মীপুজো?

তরুণকুমার বললেন : এটা দাদার একেবারে নিজস্ব ব্যাপার।

আমি বললাম : আর কোনও পুজো না করে কেন উত্তমবাবু কেবল লক্ষ্মীপুজোতেই উৎসাহী হলেন? এটা কি ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করার জন্যে।

তরুণকুমার বললেন : এটা দাদার মাথায় এসেছিল একটা গ্রামে লক্ষ্মীপুজো দেখতে গিয়ে।

আমি বললাম : এত জায়গা থাকতে হঠাৎ উত্তমবাবু গ্রামে কেন লক্ষ্মীপুজো দেখতে গেলেন। কলকাতা শহরে কি তখন লক্ষ্মীপুজো হত না নাকি?

তরুণকুমার বললেন : দাদা কি লক্ষ্মীপুজো দেখতে গ্রামে গিয়েছিলেন নাকি? তিনি গিয়েছিলেন একটা নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। শুধু দাদা নয়, আমি আর মেজদাও গিয়েছিলাম সেই নেমন্তন্নে।

আমি বললাম : তারপর?

তরুণকুমার বললেন : সেদিন যে পূর্ণিমা ছিল তাও আমরা জানতাম না। দুপুরে নেমন্তন্ন রক্ষা করে কথাবার্তা বলতে বলতে সন্ধে হয়ে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসছিলাম কলকাতা ফেরার ট্রেন ধরব বলে। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ একটা মেটে বাড়ির উঠোনে দেখলাম লক্ষ্মীপুজো হচ্ছে। দাদার

হঠাৎ কী খেয়াল হল, বললেন : আমরা না হয় পরে ট্রেনে ফিরব। আয়, খানিকক্ষণ লক্ষ্মীপুজো দেখে যাই।

আমি বললাম : সে কী! উত্তমবাবু উপযাচক হয়ে লক্ষ্মীপুজো দেখতে গেলেন। তাঁকে দেখবার জন্যে ভিড় ভেঙে পড়েনি?

তরুণকুমার বললেন : না, তা পড়েনি। ওটা তো একেবারেই গণ্ডগ্রাম। সেখানকার লোক সিনেমা-টিনেমা বিশেষ দেখে বলে মনে হয় না। তাছাড়া দাদা তখনও অত পপুলার হয়নি। তাই আর ভিড়-টিড় হয়নি।

আমি বললাম : তারপর কী হল বলুন।

তরুণকুমার বললেন . দাদা বলাতে আমি আর মেজদাও সেই মেটেবাড়ির উঠোনে গেলাম। উঠোনটি চমৎকার লেপা-পোঁছা। চারপাশে বেশ সুন্দর করে আলপনা দেওয়া হয়েছে। ধূপধুনোর গন্ধে চারদিক মশগুল। তার মাঝখানে ছোট্ট একটি লক্ষ্মীঠাকুর বসানো। সব মিলিয়ে একটা ভক্তির ভাব ছড়ানো।

আমি বললাম : উত্তমবাবু কি ওই লক্ষ্মীঠাকুরের সামনে গিয়ে হাত জোড় করে বসলেন?

তরুণকুমার বললেন : একদম না। দাদা শুধু মুগ্ধ হয়ে চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। তারপর কেমন যেন সম্মোহিতের মতো সেখানে বসে রইলেন।

আমি বললাম : তারপর?

তরুণকুমার বললেন : এদিকে দাদার কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা তো মনে মনে ভয় পেয়ে গেলাম। আরও দুটো ট্রেনের সময় চলে গেল, দাদার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি সেই একই রকমভাবে মোহমুগ্ধের মতো বসে আছেন। শেষ পর্যন্ত আমি গিয়ে দাদার কানে কানে বললাম : দাদা, অনেক রাত হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে হবে না?

আমি বললাম : শুনে উত্তমবাবু কী বললেন?

তরুণকুমার বললেন : শুনে দাদা চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন · চুপ করে বসে থাক। আমরা একেবারে লাস্ট ট্রেনে কলকাতা ফিরব।

আমি বললাম : সত্যি সত্যি লাস্ট ট্রেনেই ফিরলেন?

তরুণকুমার বললেন : হ্যাঁ। আর আসবার সময় দেখলাম এ যেন আমাদের পরিচিত দাদা নয়। একেবারে অন্য মানুষ। চুপচাপ। কারও সঙ্গে একটি কথাও বলছে না।

আমি বললাম : তাই নাকি?

তরুণকুমার বললেন : ঠিক তাই। আমি এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না রবিদা।

আমি বললাম : আশ্চর্য ব্যাপার। এটা কী বলে মনে হয় আপনার? উত্তমবাবু সত্যি সত্যি ধর্মভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

তরুণকুমার বললেন : একদম না। আমারও প্রথম প্রথম তাই মনে হয়েছিল। তাই তার পরের দিন সকালে দাদাকেও প্রশ্নটা আমি করেছিলাম। তাতে দাদা কী উত্তর দিয়েছিল জানেন!

আমি বললাম : কী?

তরুণকুমার বললেন : দাদা বলেছিল, লক্ষ্মীর আর একটা অর্থ যে 'শ্রী' সেটা আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। ওই যে অমন করে নিকানো উঠোন, ওই যে অমন সুন্দর আলপনা, এটাই আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে বাঁচার মতো বাঁচতে গেলে জীবন আর তার আশপাশটাকে সুন্দর করে তুলতে হবে। ওই ধূপের গন্ধের মতো নিজের অন্তরের সুগন্ধে চারদিক আমোদিত করে রাখতে হবে।

আমি বললাম : সেইজন্যেই কি উত্তমবাবু তারপর থেকে আর কোনও পুজো না করে নিজের বাড়িতে কেবল লক্ষ্মী পুজোরই আয়োজন করলেন?

তরুণকুমার বললেন : বোধহয় তাই। কিন্তু সেই পুজো করা নিয়ে বাবার সঙ্গে দাদার গোলমাল বেঁধে গেল।

আমি বললাম : তাই নাকি। সেটা কী রকম?

তরুণকুমার বললেন : ওই গ্রাম থেকে ফিরে আসার কদিন পরেই দাদা বায়না ধরলেন আমাদের গিরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে এবারে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো করতে হবে। তাই শুনে বাবা বললেন: তা কেমন করে হবে। একমাত্র গৃহদেবতার পুজো ছাড়া আমাদের বংশে তো আর কোনও পুজো করা হয় না। সে নিয়ম তো ভাঙা চলবে না।

আমি বললাম : শুনে উত্তমবাবু কী করলেন?

তরুণকুমার বললেন : দাদা গোঁ ধরে বসে রইল। পুজো করতেই হবে। বাবা তো দারুণ রাশভারি মানুষ ছিলেন। তাঁর মতের বিরুদ্ধে আমাদের বাড়িতে কোনও কাজ করার সাহস কারও ছিল না। বাবা আমাদের যেমন ভালবাসতেন তেমনি আবার আমাদের কোনও কাজ পছন্দ না হলে ভয়ানক বকাঝকাও করতেন।

আমি বললাম : শেষ পর্যন্ত বাবার মত বদলাল কী করে?

তরুণকুমার বললেন : দাদার ওই রকম ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে। দাদার কথা শুনে বাবা বুঝতে পেরেছিলেন, এটা নিছক ধর্মের ব্যাপার নয়, তার থেকেও বড় কিছু।

আমি বললাম . সেই থেকে আপনাদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর পত্তন?

তরুণকুমার বললেন : হ্যাঁ। আর সে পুজো তো তুমি দেখেছো রবিদা। কী রকম ধুমধাম হত বলো। দাদা একদম মুক্তহস্তে খরচ করতেন। লোকের বাড়িতে দুর্গাপুজোতেও অত খরচ হয় না। কত লোক যে আসত, দুটো দিন কী রকম আনন্দের স্রোত বয়ে যেত, সেটা তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছ। কত ছবি তুলেছ তোমরা। এমন কোনও ম্যাগাজিন ছিল না যেখানে আমাদের ওই পুজোর ছবি ছাপা হয়নি।

এই হল উত্তমকুমারের লক্ষ্মীপুজোর নেপথ্য কাহিনী।

যাক, এসব ভক্তিমার্গের কথা এখন থাক। তার চেয়ে বরং ভাবমার্গে বিচরণকারী উত্তমকুমারের কথাটা এবার শোনাই আপনাদের। সেই অনুভূতি আমার ঘটেছিল ওই তোপচাঁচি গিয়ে। তার আগে খণ্ড খণ্ড ভাবে উত্তমবাবুকে নানা রূপে দেখেছি। কিন্তু তোপচাঁচিতে যে উত্তমকুমারকে দেখলাম তিনি যেন নতুন একটি মানুষ। তাঁর মধ্যে যে ভাবের এতটা গভীরতা আছে তা আগে কোনওদিন বুঝতে পারিনি। সেটা জেনেছিলাম সেদিন রাত্রে ওঁর সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত পান করতে করতে।

আমার হাতে উত্তমবাবুকে পানপাত্র তুলে দিতে দেখে বিমল চক্রবর্তীর চোখ দুটো যেন কপালে উঠে গেল। বলে উঠল : আপনার কী ভাগ্য রবিদা। উত্তমদা নিজে হাতে আপনাকে ড্রিংক অফার করলেন।

বিমলের কথা কানে যেতে উত্তমবাবু মুখ ফিরিয়ে কটমট করে বিমলের দিকে তাকালেন। ওই তাকানো দেখে বিমল কেমন যেন মিইয়ে গেল। তারপর উত্তমবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন : একেবারে বাচ্চা ছেলে।

ততক্ষণে সুপ্রিয়া দেবীও আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে উত্তমবাবু বললেন: এই দেখো বেণু কারা এসেছেন।

সুপ্রিয়া দেবী কোনও কথা না বলে তাঁর ঝকঝকে দাঁতে এক মুখ হাসলেন।

ততক্ষণে বিমল উঠে গিয়ে গাড়ি থেকে আমাদের কেনা পানীয়ের বোতলটি নিয়ে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে উত্তমবাবু বললেন : ওটা আবার আনতে গেলেন কেন? আমার কাছে তো ছিলই।

আমি বললাম : বা রে। রাজদর্শনে আসব আর ভেট আনব না, তা কি হয়?

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন : আপনি পারেনও মশাই।

সুপ্রিয়া দেবী বললেন : এখন তো আর কিচেনে কিছু পাওয়া যাবে না। আমার কাছে হোয়াইট অয়েল আছে। আমি বরং কিছু ভাজাভুজি করে দিই।

উত্তমবাবু বললেন : তাহলে তো খুবই ভাল হয়।

সুপ্রিয়া দেবী ওটা করে আনবার জন্যে বেরিয়ে গেলেন।

আমি বললাম : এবারে আমার প্রয়োজনের কথাটা বলে নিই।

উত্তমবাবু বললেন : শুনব, শুনব। অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! তাছাড়া আমরা তো কালই কলকাতা যাচ্ছি। মিছিমিছি আপনারা এতদূব ছুটে এলেন।

আমি বললাম : কালই কি শুটিং প্যাক-আপ হয়ে যাচ্ছে নাকি?

উত্তমবাবু বললেন : কালুদার কি প্রোগ্রাম তা আমি জানি না। তবে আমার আর বেণুর আউটডোরের কাজ কাল শেষ।

মনে মনে ভাবলাম : ইস্ আর একটা দিন অপেক্ষা করলেই হত। মিছিমিছি এতগুলো টাকা খরচ হত না।

ততক্ষণে সুপ্রিয়া দেবী একরাশ ভাজাভুজি এনে আমাদের সামনে বসিয়ে দিয়েছেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে এসে ঢুকলেন সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। তিনি এই 'বিলম্বিত লয়' ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন। এখানে বোধহয় একটা গান পিক্চারাইজ করা হয়েছে। তাই নচিবাবুকেও সঙ্গে আসতে হয়েছে।

এর আগে অনেকদিন নচিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি। দেখলাম তাঁর শরীরটা খুব ভেঙে গেছে। কয়েকদিন আগে একটা অ্যাটাক হয়ে গেছে তাঁর হৃদ্যন্ত্রের ওপর।

নচিবাবু লোভার্ত দৃষ্টিতে এগিয়ে এলেন ভাজাভুজির প্লেটটার দিকে। তাই দেখে উত্তমবাবু বলে উঠলেন · উঁহু, নচিদা, একদম নয়। ডাক্তার না তোমাকে বারণ করেছে।

নচিবাবু বাড়ানো হাতটা সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিলেন। একবার করুণ চোখে তাকালেন আমার দিকে। তারপর বললেন : যাই শুযে পড়িগে।

উত্তমবাবু বললেন : হ্যাঁ, তাই যাও।

নচিবাবুকে বললেন বটে, কিন্তু উত্তমবাবুরও তো ক'দিন আগে একটা মাইল্ড অ্যাটাক হয়ে গেছে। একবার ভাবলাম ওঁকেও সে কথাটা মনে করিয়ে দিই। কিন্তু কিছু বললাম না।

একটু পবে উত্তমবাবু বললেন : আপনাদেব সিনেমা জগৎ পত্রিকায় বিমল মিত্রের লেখা 'শনি রাজা রাহু মন্ত্রী' গল্পটা উপন্যাস হযে বাজারে বেরিয়েছে দেখেছেন?

আমি বললাম : হ্যাঁ। বিমলবাবু ওটার নতুন নাম দিয়েছেন 'স্ত্রী'।

উত্তমবাবু বললেন : সলিল দত্তকে দিয়ে ওটার রাইট কিনিয়েছি। ছবি হলে ওটা জমবে না?

আমি বললাম : জমা তো উচিত। স্ক্রিপ্ট কে করছেন?

উত্তমবাবু বললেন . সলিলই করছে। তবে আমার অংশটা আমি নিজেই ভেবে রেখেছি। ওটা নিয়ে সলিলের সঙ্গে বসতে হবে। শুনবেন নাকি একটুখানি।

আমি বললাম · শুনতে তো ইচ্ছে করছে। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেল যে। কাল তো আবার শুটিং! কখন থেকে?

উত্তমবাবু বললেন : সকাল থেকে। তা হোক গে। তাতে আমার আসুবিধে হবে না। কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হল। একটু জমিয়ে গল্প-টল্প করি।

সেদিন প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে উত্তমবাবু মুখে মুখে শুনিয়ে গেলেন 'স্ত্রী' ছবিতে তাঁর অংশটা কী ভাবে ভেবেছেন। রীতিমত অ্যাকটিং করে। আর ফিটন গাড়ির ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, চাবুকের আওয়াজ, সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুনিয়ে দিলেন।

একটা মানুষ যে বড় অভিনেতা হয় তা তাঁর এই গুণগুলো থাকে বলেই না। কবে ছবির কাজ আরম্ভ হবে তার ঠিক নেই। স্ক্রিপ্ট করছেন অন্য একজন। কিন্তু উত্তমবাবু তাঁর চরিত্রটা নিয়ে এখন থেকেই ভাবছেন। মনে মনে তার রিহার্সাল দিয়ে চলেছেন। দিনে দিনে সেটার মধ্যে আরও কত পরিবর্তন ঘটাবেন। এই না হলে বড় অ্যাকটর। জনপ্রিয়তা তো আর আকাশ থেকে পড়ে না। সেটাকে অর্জন করবার জন্যে অনেক মেহনত করতে হয়।

উত্তমবাবুর এই মৌখিক স্ক্রিপ্ট শোনানো যখন শেষ হল তখন রাত প্রায় দেড়টা। কিন্তু আমার কথা তো এখনও হল না। সেটা কি এত রাতে বলা ঠিক হবে। বোধহয় না। কাল সকালে তো আবার দেখা হবে। তখন বললেই চলবে।

উত্তমবাবুকে গুড নাইট করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সুপ্রিয়া দেবী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন সোমাকে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে আর দেখা হল না।

বাইরে এসে দেখলাম বিমল একটা জায়গা জোগাড় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার পাশে আমার জন্যও একটু জায়গা রেখেছে।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম উত্তমবাবুর অসম্ভব প্রাণশক্তির কথা। এত রাতে শুতে গেলেন, কাল সকাল থেকে আবার শুটিং করবেন। কিন্তু পর্দায় তাঁর অভিনয়ের মধ্যে ক্লান্তির ছাপ এতটুকুও দেখা যাবে না। উনি কি মানুষ না অন্য কিছু।

এই ভাবনার মধ্যে তন্দ্রায় যখন চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে তখনই একটা কাচ ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল উত্তমবাবুদের ঘরের ভেতব থেকে। বোধহয় গ্লাস-টাস কিছু ভাঙল। কিন্তু তাব পরেই বাংলোর কম্পাউন্ড থেকে সশব্দে একটা গাড়ি বেরিয়ে যাবার আওয়াজ পাওয়া গেল।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম বিছানা ছেড়ে। ব্যাপারটা তো সুবিধের নয় বলেই মনে হচ্ছে।

মধ্যবিত্ত বাড়িতে জন্মালেও উত্তমকুমাব পরবর্তীকালে অর্থ ও জনপ্রিযতাব সুবাদে উচ্চবিত্ত সমাজের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। নিউ আলিপুবে বিরাট বাড়ি করেছিলেন। তারপর ময়রা স্ট্রিটের মতো পশ্ এলাকায় বসবাস করেছেন। কিন্তু উত্তমবাবু তাঁর মধ্যবিত্ত মানসিকতা কোনদিনই পরিত্যাগ করতে পারেননি। করতে চানওনি বোধহয়।

এই যেমন বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ঘুড়ি ওড়ানো। এটা উচ্চবিত্ত সমাজে একেবারেই অচল। কিন্তু ষাটের দশকের শেষদিক পর্যন্ত দেখেছি উত্তমবাবু বিশ্বকর্মা পুজোর দিন রীতিমতো হইচই করে ছাদে দাঁড়িয়ে ঘুড়ি ওড়াতেন। আমি ঘুড়ি ওড়াতে পারি না। কিন্তু একবার উত্তমবাবুর ঘুড়ি ওড়ানোর পার্টনার হতে হয়েছিল। অর্থাৎ লাটাই ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। উত্তমবাবু সেবার বড়াই করে বলেছিলেন: দেখবেন, এবারে একেবারে আকাশ ফাঁকা করে ছেড়ে দেব।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেবারে উত্তমবাবু নিজেই ভোকাট্টা হয়ে গিয়েছিলেন। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। কিন্তু এহেন দুর্ঘটনার পর তাঁর মুখে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না। আনন্দে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেটা দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। বলেছিলাম: কী ব্যাপার, আপনার মনে দুঃখ হচ্ছে না?

উত্তমবাবু বলেছিলেন: একদম না। বরং খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি যেটা মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম, সেটাই হয়েছে।

আমি বলেছিলাম: সে কী! আপনি নিজেই ভোকাট্টা হতে চেয়েছিলেন?

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন: হ্যাঁ, তাই চেয়েছিলাম।

আমি বললাম: কিন্তু কেন?

উত্তমবাবু বললেন: আশেপাশে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। তাদের ঘুড়িগুলো কেটে গেলে তাদের মুখের কী করুণ অবস্থা হয় ভাবুন তো? আমি তো জীবনে অনেক ঘুড়ি কেটেছি। সবাই জানে এই ছাদ থেকে আমি ঘুড়ি ওড়াই। আমার ঘুড়ি কাটতে পেরে তাদের মুখগুলো আনন্দে কতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে একবার চিন্তা করে দেখুন তো! আমি তাই চেয়েছিলাম এবার অন্তত ওরা আমাকে হারিয়ে দিক।

আমি বললাম: তাই যখন চেয়েছিলেন তাহলে আমাকে একটা হারা টিমের পার্টনার করলেন কেন?

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন: বা রে, হেরে যাবার দায় ঘাড়ে চাপাবার জন্য একজনকে খাড়া করতে হবে না। আপনি হলেন আমার সেই স্কেপ-গোট। সবাইকে বলতে পারব যে, আপনি এমন ট্যারাবাঁকা করে লাটাইখানা ধরেছিলেন যে আমি ভাল করে প্যাঁচ খেলতেই পারলাম না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম: আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই!

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন: সেটা এতদিনে টের পেলেন।

এই হল উত্তমকুমারের চরিত্রের আর একটি দিক। এক সদানন্দময়, সদা রহস্যময় পুরুষ। কিন্তু তার কোনও বাহ্যিক প্রকাশ নেই।

যাক, আবার সেই তোপচাঁচির দুর্যোগপূর্ণ রাতের ঘটনায় ফিরে আসি।

গাড়ি চলে যাবার শব্দ শুনে বিছানায় আর শুয়ে থাকা গেল না। পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে উত্তমবাবুর ঘরে গিয়ে দেখলাম, দরজা খোলা। থমথমে মুখে বসে আছেন সুপ্রিয়া দেবী।

তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : কী হয়েছে কী? উত্তমবাবু কোথায় গেলেন?

শ্লেষ্মাজড়িত ভারি গলায় সুপ্রিয়া দেবী জবাব দিলেন : জানি না।

আমি বললাম : জানি না বললে চলবে কেন! কোথায় গেছেন কিছু বলে গেছেন?

সুপ্রিয়া দেবী নিরুত্তর।

আমি বললাম : চুপ করে থাকবেন না। কাল সকালে শুটিং। শুটিং না করে ইউনিট ফিরে গেলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। সারা কলকাতায় ঢি ঢি পড়ে যাবে।

এবারে সুপ্রিয়া দেবী বললেন : আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে?

আমি বললাম : আছে।

সুপ্রিয়া দেবী বললেন : ও কতকগুলো দরকারি ওষুধ ফেলে গেছে। হার্টের ওষুধ। কলকাতায় পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে আনানো হয়েছে। গাড়িটা নিয়ে এগুলো পৌঁছে দিয়ে আসুন।

আমি বললাম : আপনিও চলুন আমার সঙ্গে।

সুপ্রিয়া দেবী বললেন : না।

এবারে ধমকে উঠলাম। বললাম : ছেলেমানুষি করবেন না। উঠুন। ওষুধগুলো নিয়ে চলুন আমার সঙ্গে।

এই ধমকটায় কাজ হল। ওধুষগুলো নিয়ে সুপ্রিয়া দেবী উঠে দাঁড়ালেন।

ড্রাইভার শিউ সিংকে তুলে গাড়ি বার করতে মিনিট পাঁচেক দেরি হল। গাড়িতে বসে বললাম : তাড়াতাড়ি চালান। ফাঁকা রাস্তা আছে। যতটা পারেন স্পিড তুলুন।

বাংলোর সামনের রাস্তা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়বাব মুখে দেখলাম টহলদার পুলিশ দাঁড়িয়ে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : ইধারসে একঠো গাড়ি কো যানে দেখা?

পুলিশটি বললে : জি হাঁ। অ্যাক্টর সাবকা গাড়ি।

আমি বললাম : কিধর গ্যয়া?

পুলিশটি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে : ধানবাদ কি তরফ।

বুঝলাম উত্তমবাবু কলকাতার রাস্তা ধরেছেন। আমাদের গাড়ি সেই পথেই চলল ঝড়ের গতিতে। গাড়িতে বসে সুপ্রিয়া দেবীকে বোঝালাম : যেমন করেই হোক উত্তমবাবুকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আপনি নিজে হাতে ধরে ডেকে আনবেন। না হলে কাল সকালে অনেক গুজব রটে যাবে, যেটা আপনাদের কারও কাছেই মুখরোচক হবে না।

সুপ্রিয়া দেবী পাথরের মতো মুখ করে বসে রইলেন।

বেশ খানিকটা যাবার পর দূরে একটা গাড়ির লাল ব্যাকলাইট দেখা গেল। গাড়িটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে। এত রাতে ফাঁকা রাস্তায় কোনও গাড়ির এত আস্তে যাবার কথা নয়। তবে সেই গাড়ির আরোহীর যদি অভিলাষ থাকে যে পেছন থেকে কোনও গাড়ি এসে তাঁকে ধরে ফেলুক, তাহলে সেটা আলাদা কথা। মনে মনে বললাম : জ্ঞানপাপী!

আমাদের গাড়িটা গিয়ে আগের গাড়ির পথ রোধ করে দাঁড়াল। সুপ্রিয়া দেবী ওষুধগুলো গাড়ি থেকে নিয়ে গট গট করে উত্তমবাবুর পাশে রেখে বললেন : তোমার ওষুধ।

তারপর আমাকে ফেলে রেখে আমার গাড়িটা নিয়ে হুশ করে বেরিয়ে গেলেন তোপচাঁচির দিকে।

উত্তমবাবু আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছেন। বললেন : কী রবিবাবু, আপনার বন্ধু তো আপনার গাড়ি নিয়ে পালাল। এখন আপনি কোনদিকে যাবেন?

আমি বললাম : আমি তো বাংলোয় ফিরব।

উত্তমবাবু বললেন : তাহলে রাতটা রাস্তায় পায়চারি করে কাটিয়ে দিন। সকালের দিকে বাস পেয়ে যাবেন নিশ্চয়। বাসগুলোয় ভিড় থাকে বেশ। তা ছাদে বসেও চলে যেতে পারবেন।

যেন ভয়ানক বিপদে পড়েছি তেমনি একটা ভাব চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলে বললাম : কী করি বলুন তো? আপনি কাইন্ডলি আমাকে একটু বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে আসুন না।

উত্তমবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন : না, আমি আর ফিরে যাব না।

আমি অনুরোধের সুরে বললাম : না না, আমি আপনাকে ফিরে যেতে বলছি না। আপনি কেবল আমাকে বাংলোর সামনে নামিয়ে দেবেন। ব্যস, তাহলেই হবে।

উত্তমবাবু কী একটু ভাবলেন। তারপর বললেন : অগত্যা। গাড়িতে উঠে পড়ুন তাহলে। আমি তো আর আপনার বন্ধুর মতো মাঝরাত্তিরে আপনাকে রাস্তায় ফেলে চলে যেতে পারি না!

আমি দরজা খুলে উত্তমবাবুর পাশে গিয়ে বসলাম। গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে বাংলোর রাস্তা ধরল। গাড়িতে বসে বসে উত্তমবাবু মাঝে মাঝে চিপটেন কাটতে লাগলেন : কী রকম 'বন্ধু' করেছেন দেখুন রবিবাবু। মাঝ রাত্তিরে আপনাকে রাস্তায় ফেলে পালাল। এদিকে আবার নেকড়ে টেকড়ে বেরোয় বলে শুনেছি। সে কথাটাও একটু ভাবল না।

আমি গোরুচোরের মতো মুখ করে বললাম : সত্যি কথাই বলেছেন আপনি। বন্ধু নির্বাচনে খুব ভুল হয়ে গেছে দেখছি।

উত্তমবাবু বললেন : মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মানে চোরাবালিতে পা রাখা। কখন যে ভুস করে ডুবে যাবেন জানতেও পারবেন না।

আমি বললাম : তাই তো দেখছি। আজ থেকে সব বন্ধুত্বের ইতি।

উত্তমবাবু রসিকতার ভঙ্গিতে বললেন : হুঁঃ। আপনি আবার ইতি করবেন! মেয়েদের দেখলেই আপনার জিভে জল ঝরে সে কি আর আমি বুঝি না।

আমি বললাম : সে তো আপনারও ঝরে। ডায়মন্ডহারবারে সাগরিকা হোটেলের ব্যাপার-ট্যাপার আমি জানি না ভেবেছেন!

উত্তমবাবু বলে উঠলেন : আহা, সে তো আপনার বন্ধুর ব্যাপার। আপনি জানবেন না তো কে জানবে।

দেখলাম উত্তমবাবু বেশ রসস্থ অবস্থায় আছেন। অনেক দিনের একটা কৌতূহল ছিল, সেটা এই মুহূর্তে মিটিয়ে নিতে চাইলাম। বললাম : একটা কথা জিগ্যেস করব। সত্যি উত্তর দেবেন?

উত্তমবাবু বললেন : কী জানতে চান বলেই ফেলুন না।

একটু ইতস্তত করে বললাম : আপনি কি সুচিত্রা সেনকে ভালবাসেন?

কথাটা শুনে উত্তমবাবু বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন : হ্যাঁ, বাসি। কিন্তু সে ভালবাসা অন্য জাতের। অন্য ধরনের। 'কামগন্ধ নাহি তায়'।

আমি বললাম : প্লেটনিক।

উত্তমবাবু বললেন · খানিকটা তাই বলতে পারেন। আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

আমি বললাম : সুচিত্রা দেবী জানেন?

উত্তমবাবু বললেন : জানি না। এই ভালবাসার কথা আমি কাউকে জানতে দিই না। একটা দুর্বল মুহূর্তে আপনার কাছেই কন্‌ফেস্ করে ফেললাম। দেখবেন যেন পাঁচকান না হয়। এটা জানাজানি হলে রমা অন্যরকম কিছু ভাবতে পারে।

উত্তমবাবুর এই কনফেসন্ আমার অনেক দিনের একটা কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটাল। তিনি বেঁচে থাকতে আমি এই কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি। মারা যাবার পরও নয়। তার বহুদিন পরে ভাবলাম, এমন একটা স্বর্গীয় প্রেম, এমন একটা নিষ্কলুষ ভালবাসা, সে কথাটা সারা পৃথিবীর জানা উচিত। এই জাতীয় প্রেম আজকের পৃথিবীতে দুর্লভ।

অনেকের ফিল্ম লাইন সম্পর্কে একটা অন্য ধারণা আছে। তাঁরা ভাবেন এখানে যেহেতু অবাধ মেলামেশা, তাই অবারিত প্রেম। কিন্তু না, তা নয়। এখানে নরক যেমন আছে, তেমনি স্বর্গও আছে। উত্তমবাবুর এই প্রেমই তো সেই স্বর্গ।

যাক, আবার আমার কথায় ফিরে আসি। আমাদের গাড়িটা বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াতেই

উত্তমবাবুকে বললাম : আপনি এখনি চলে যাবেন না প্লিজ। আমার জন্য পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি আমার ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে আসছি। আপনার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাব।

উত্তমবাবু বললেন : সে কী! আপনি এখনই ফিরে যাবেন কেন? সবে তো এলেন।

আমি বললাম : আর থেকে কী করব! আপনি যখন চলে যাচ্ছেন তখন কালই তো প্যাক-আপ হয়ে যাবে। তার জন্যে সকালবেলা উঠে কালুবাবুর কাছে কথা শুনতে রাজি নই আমি।

উত্তমবাবু বললেন : আপনার গাড়িটার কী হবে?

আমি বললাম : ওটা বিমল নিয়ে কাল কলকাতায় ফিরবে।

উত্তমবাবু বললেন : ঠিক আছে। আপনি আসুন তাহলে। আমি কিন্তু ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব। তারপর চলে যাব।

আমি তাড়াতাড়ি বাংলোর বাগানটা পেরিয়ে উত্তমবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সুপ্রিয়া দেবী আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি চোখ দুটো মুছে নিলেন। বোধহয় কান্নাকাটি করছিলেন।

ওঁর সামনে গিয়ে আমি বললাম : উত্তমবাবু বাইরে গাড়িতে বসে আছেন। আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওঁকে ডেকে নিয়ে আসুন।

সুপ্রিয়া দেবী বললেন : না, আমি যাব না। কেন যাব?

দেখলাম ওঁর কণ্ঠস্বরে আগের সেই জেদি ভাবটা নেই। বরং কিছুটা অভিমানের ছোঁয়া। বুঝলাম, এই তরফের বরফ গলতে শুরু করেছে।

আমি বললাম : ছেলেমানুষি করবেন না। আমি কোনরকমে উত্তমবাবুকে আটকে রেখেছি পাঁচ মিনিটের জন্যে। দেরি হলে চলে যাবেন।

কথাটা শুনে সুপ্রিয়া দেবী উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পায়ে এগোতে লাগলেন বাংলোর গেটের দিকে। আমি আর ওঁর সঙ্গে গেলাম না। এই সময় তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অবাঞ্ছিত। যদিও গাড়িতে ড্রাইভার আছে। কিন্তু ড্রাইভাররা কখনই ব্যক্তি নয়। সে ঈশ্বরের মতো মূক ও বধির।

সুপ্রিয়া দেবীকে এগিয়ে দিয়ে আমি একটু দূরে একটা ফুলঝোপের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করলাম। যেখানে দাঁড়ালাম সেখান থেকে গাড়িটাও দেখা যায় আর কথাবার্তাও সব কিছু শোনা যায়।

সুপ্রিয়া দেবী গাড়ির কাছে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন : ভেতরে চলো।

এর উত্তরে উত্তমবাবুর সেই বহুপরিচিত আদুরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, যা তিনি প্রায়শ রোম্যান্টিক ছবির নায়িকাদের উদ্দেশে শোনান। উত্তমবাবু বললেন : না আমি যাব না।

সুপ্রিয়া দেবীর কণ্ঠস্বরেও সেই আদরের ছোঁয়া। তিনি বললেন : রাস্তার ওপর সিন ক্রিয়েট কোরো না। ঘরে চলো।

উত্তমবাবু বললেন : তুমি যা ব্যবহার করেছ তার পরে কি আমার যাওয়া উচিত?

সুপ্রিয়া দেবী বললেন : তুমি কী ব্যবহার করেছো সেটা একবার ভেবে দেখো।

আমি ভাবলাম, এই রে! সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার এত প্রচেষ্টা সব বোধহয় বিফলে গেল! এরা যে আবার ঝগড়াঝাটি শুরু করল দেখছি।

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত সেটা আর ঘটল না। সুপ্রিয়া দেবী দরজা খুলে উত্তমবাবুর একটা হাত ধরে আকর্ষণ করলেন। বললেন : ঘরে চলো বলছি।

আর কী আশ্চর্য! যিনি বাংলোয় ফিরবেন না বলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন, সেই উত্তমকুমার সুড়সুড় করে নেমে এলেন সুপ্রিয়া দেবীর হাতখানি ধরে।

বুঝলাম ওদিকের বরফ অনেক আগেই গলে জল হয়ে গিয়েছিল। যেটা বরফ বলে ভেবেছিলাম সেটা সরের মতো একটা আস্তরণ মাত্র। একটু হাতের ছোঁয়া পেতেই সেটা ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে।

ওঁরা ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচালাম। যাক, ভয়ঙ্কর একটা পরিণতির হাত থেকে পরিস্থিতিটা সামাল দেওয়া গেছে। চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম বাগানের একটা নিচু পাইপ থেকে অল্প অল্প জল পড়ছে। সেই সামান্য জল বার বার নিয়ে মুখে চোখে মাথায় বোলাতে লাগলাম। শরীরটা একটু ঠাণ্ডা হল।

মুক্ত হাওয়ায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে এই এক-দেড় ঘণ্টার ঘটনাগুলো ভাবতে লাগলাম। ঠিক যেন সিনেমার কয়েকটি দৃশ্য।

ভাবতে ভাবতেই চোখ দুটো জড়িয়ে আসছিল। এমন সময় আবার একবার কাচ ভাঙার আওয়াজ পেলাম। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। না, বেশ খানিকক্ষণ পরেও কোনও গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল না।

এখন নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বোজানো যেতে পারে।

অন্যান্য জনপ্রিয় নায়কদের মতোই উত্তমকুমারও তাঁর সমকালে তরুণসমাজকে প্রভাবিত করেছিলেন স্টাইলের দ্বারা। আমাদের কিশোর বয়সে পাড়ার দাদা-কাকাদের দেখেছি প্রমথেশ বড়ুয়ার দ্বারা প্রভাবিত হতে। তাঁরা তখন বড়ুয়া কাফ জামা-টামা পরতেন, বড়ুয়ার স্টাইলে হাঁটতেন, আধো-আধো ভাষায় কথা বলতেন। আমরা তরুণ বয়সে প্রভাবিত হয়েছিলাম জহর গাঙ্গুলি আর রবীন মজুমদারের দ্বারা। 'শহর থেকে দূরে' ছবিতে জহর গাঙ্গুলি যে ভাবে তড়বড় করে কথা বলেছিলেন, আমরা সেটা অনুকরণ করবার চেষ্টা করতাম। 'শাপমুক্তি' ছবিতে রবীন মজুমদার যেভাবে মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরেছিলেন, সেইভাবেই পরতাম। তবে দীর্ঘদীন এটা চালিয়ে যেতে পারিনি। কিছুকাল পরেই ফিরে গিয়েছিলাম বাপ-ঠাকুর্দার সনাতন সামনে কোঁচা দিয়ে ধুতি পরার কায়দায়। আজকাল তো আর মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরার চল নেই। একমাত্র সংগীত পরিচালক নিখিল চট্টোপাধ্যায় আর তরুণ সাংবাদিক রিন্টু চট্টোপাধ্যায়কে দেখি মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরতে।

উত্তমবাবুর আমলে তরুণ সম্প্রদায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর কেশ বিন্যাসের দ্বারা। তা ছাড়া আধো-আধো ভাষায় কথা বলা কিংবা 'হ্রদ' ছবির অনুকরণে চোখ-মুখ ঘোরানোর চেষ্টা অনেকে করতে চাইতেন, কিন্তু সেটা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, যেমন হয়েছিল তাঁর কেশবিন্যাসের কারুকার্য। সেটা হল ইউ-ছাঁটে চুল কাটা। ট্রামে বাসে দেখেছি তখন মাথার পেছনের চুল অনেকেই 'ইউ' ছাঁটে সাজাতেন। পাড়ার হেয়ার কাটিং সেলুনগুলিকে এর জন্যে বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে যেমন চালু হয়েছিল লম্বা করে জুলফি রাখা। এই 'ইউ' ছাঁটের ব্যাপারটা উত্তমবাবুর নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত অথবা তাঁর কেশশিল্পী নরসুন্দর মহাশয়ের, তা আমি জানি না, তবে আমার সম্পাদিত উত্তমকুমার সংখ্যায় কর্মরত সেই নরসুন্দরের ছবি আমি ছেপে দিয়েছিলাম। শুনেছি ওই ছবিটি দেখে নাকি পাঠকরা প্রীত হয়েছিলেন। মজাও পেয়েছিলেন।

যাক, আবার সেই তোপচাচির ঘটনায় ফিরে আসি। সেদিন সেই রাতের নাটকীয় ঘটনার পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় আবার যে এমন কিছু কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটে যাবে সেটা তো আমার কল্পনাতেও ছিল না। যে উত্তম-সুপ্রিয়ার ভালবাসাকে আমি অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করতাম, তাঁদের মধ্যেও যে এমন প্রফেশ্যনাল রেষারেষি থাকতে পারে তা তো আমি ভাবতেও পারিনি।

পরের দিন আমার ঘুম ভাঙতে একটু বেলাই হয়ে গিয়েছিল। মুখ-হাত ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম উত্তমবাবু পূর্ণবেগে মর্নিং-ওয়াক করছেন। বাংলোর বাগানটা ততক্ষণে বার সাতেক প্রদক্ষিণ করা হয়ে গেছে তাঁর। সঙ্গী বিমল চক্রবর্তী। বিমলের ঘুম ভোরবেলাতেই ভেঙে গিয়েছিল। ওকে তো আমার মতো সারারাত ধকল পোয়াতে হয়নি।

আমার কাছাকাছি হতে উত্তমবাবু একটা চোখ টিপে জিজ্ঞাসা করলেন : কী রবিবাবু, রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

এই চিপটেন কাটা প্রশ্নের কী জবাব দেব আমি। একটু হাসলাম কেবল।

উত্তমবাবুর কপালের এক কোণে দেখলাম এক টুকরো স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। কাল শেষ রাতে যে কাচ ভাঙার আওয়াজ শুনেছিলাম, বোধহয় তারই জের। এটাকেই বোধহয় বলে 'লাভ ইন ফ্রেঞ্চ স্টাইল'। ফরাসী দেশে শুনেছি কোনও কোনও প্রেমিকার প্রেমের প্রগাঢ়তা আসে না প্রেমিকের শরীরে কিঞ্চিৎ রক্ত দর্শন না করা পর্যন্ত। এটাও বোধহয় সেইরকমই কিছু হবে।

পরিচালক কালুবাবুর কাছে শুনলাম, সেইদিনই নাকি উত্তমবাবু আর সুপ্রিয়া দেবীর শুটিং প্যাক-আপ হয়ে যাবে। বিকেল চারটে নাগাদ ওঁরা কলকাতা রওনা হয়ে যাবেন। যে কারণে আজ আর লাঞ্চের জন্যে কোনও ব্রেক দেওয়া হবে না। প্যাক-লাঞ্চ যাবে। হাতে হাতে খেয়ে নেবেন সবাই।

খবরটা শুনে আমার তো মাথা খারাপ হবার জোগাড়। যে কারণে এতদূর ছুটে আসা সেই তমলুক যাবার কথাটা তাহলে বলব কখন? আজ তো শুটিং-এর মধ্যে কথা বলারই ফুরসত পাওয়া যাবে না।

তখন মনে মনে ঠিক করে নিলাম আমিও আজ কলকাতা ফিরব। সম্ভব হলে উত্তমবাবুর সঙ্গে একই গাড়িতে। যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে ওঁর পেছন পেছন ময়রা স্ট্রিটে গিয়ে হাজির হব। আমি যে অমিয় জানাকে দিন চারেক পরে ফাংশানের ডেট দিয়ে দিয়েছি। সেই অনুসারে রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবল গ্রাউন্ডে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখন উত্তমবাবু যদি না যান তাহলে তো প্যান্ডেলে আগুন জ্বলে যাবে। পাবলিক তো অমিয়র ছাল-চামড়া খুলে নেবে!

উত্তমবাবু ভয়ানক কাজের চাপের মধ্যে থাকবেন জানতাম, তবু একবার শুটিং স্পটে গেলাম। দেখলাম জোর কদমে কাজ চলছে। একটু উঁচু জায়গায় শুটিং হচ্ছে। যেহেতু ডাক্তার উত্তমবাবুকে সিঁড়ি ভাঙতে বারণ করেছেন তাই সেই সামান্য উচ্চতার জায়গাটুকুও উত্তমবাবুকে গাড়িতে করে পৌঁছে দিতে হচ্ছে। এতসব ডামাডোলের মধ্যে কথা বলবার ফুরসত কোথায়!

একা একাই বাংলোর ফিরে এলাম। দেখলাম কেউ কোথাও নেই, কেবল সোমা বসে বসে একটা পেপারব্যাক থ্রিলার পড়ছে। এককালে সোমাকে আগ্রায় 'হারানো প্রেম' ছবির শুটিং-এর সময় কোলে তুলে ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন তো সোমা প্রায় লেডি হয়ে গেছে। চেহারার সঙ্গে তার চরিত্রেও একটা গাম্ভীর্য এসে গেছে। তবু দু-একটা কথা সোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম। ওর দিক থেকে এতই সংক্ষিপ্ত উত্তর এল যে কথা বলার আর উৎসাহ পেলাম না।

বেলা তিনটে নাগাদ উত্তমবাবু ফিরে এলেন। ওঁর কাজ শেষ। সুপ্রিয়া দেবীর কাজ তখনও একটু বাকি। উনি একটু পরে আসবেন। ঠিক সেই সময়ে কলকাতা থেকে একটা টেলিফোন এল। ফোন করছেন উত্তমবাবুর পরম স্নেহভাজন অসীম সরকার। অসীমবাবু তখনই ছবি প্রযোজনা শুরু করে দিয়েছেন। এখন তো একজন নামকরা প্রযোজক।

অসীমবাবু কলকাতার দিক থেকে ফোনে কী কথা বলছিলেন সেটা তো আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু উত্তমবাবু কী বলছিলেন সেটা পাচ্ছিলাম। উত্তমবাবু বলছিলেন : হ্যাঁ, অসীম, বল।...বাঃ, ইটস্ এ ভেরি গুড নিউজ।...হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আসামাত্রই আমি খবরটা দিচ্ছি।...হ্যাঁ...আর অ্যাকটর?...বাঃ! তুই সৌমিত্রকে একটা ফোন করে আমার শুভেচ্ছা জানাস।...হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা রাত বারোটা একটার মধ্যেই পৌঁছে যাব। তুই থাকিস বাড়িতে...ঠিক আছে, ঠিক আছে...

এই বলে উত্তমবাবু ফোনটা রেখে দিলেন। আমি ওঁর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছি দেখে বলে উঠলেন : বেণু আপনাদের বি এফ জে এ-র বেস্ট অ্যাকট্রেস হয়েছে এ বছরে। বেস্ট অ্যাকটর হয়েছে, সৌমিত্র। ঝাজী অসীমকে টেলিফোন করেছিলেন ময়রা স্ট্রিটে। দুটোই খুব ভাল নিউজ, তাই না?

উত্তমবাবু যতটা উৎফুল্ল হয়ে খবরটা আমাকে দিলেন, আমি কিন্তু ওঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে ততটা উৎফুল্লতার সুর খুঁজে পেলাম না। মনে হল উনি যেন উৎফুল্ল হবার অ্যাকটিং করছেন। উত্তমবাবু খুব ভাল অ্যাকটর সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার কাছে সেদিন ওঁর ব্যাড অ্যাকটিংটা ধরা পড়ে গিয়েছিল।

কথাগুলো বলে উত্তমবাবু ঘরের ভেতর চলে গেলেন। কলকাতা যাবার প্রস্তুতি নিতে হবে। একটু পরেই এসে হাজির হলেন সুপ্রিয়া দেবী। আমিই তাঁকে বি এফ জে এ পুরস্কারের সুসংবাদটা দিলাম। শুনে তাঁর মুখটা ঝলমল করে উঠল। কিন্তু উত্তমকুমার বেস্ট অ্যাকটর হননি শুনে সেই ঝলমলে মুখটাই কেমন যেন মলিন হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হল। দেরি করলে কলকাতা ফিরতে ভোর হয়ে যাবে। উত্তমবাবুদের গাড়িতে গেলেন উত্তমবাবু, সুপ্রিয়া দেবী আর সোমা। আমাদের গাড়িতে আমি আর বিমল চক্রবর্তী। আমার ইচ্ছে ছিল উত্তমবাবুদের গাড়িতে যাবার। তাহলে তমলুক যাবার কথাটা বলে নিতে পারতাম। কিন্তু উত্তমবাবু না ডাকলে ওঁদের গাড়িতে উঠি কী করে।

ভগবান বোধহয় আমার প্রার্থনা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন, তাই অভাবিত ভাবে উত্তমবাবুদের গাড়িতে যাবার সুযোগ হয়ে গেল। মাইল আটেক রাস্তা পেরিয়ে আসার পর একটা ধাবার সামনে

দেখলাম উত্তমবাবুর গাড়ির ড্রাইভার আমাদের গাড়িটাকে থামতে বলছে। কী ব্যাপার? না উত্তমবাবু এই ধাবাতে ঢুকেছেন। আমাদেরও যেতে বলেছেন সেখানে।

গাড়ি থেকে নেমে ধাবার দিকে গিয়ে দেখলাম উত্তমবাবুরা সদলে একটা দড়ির খাটিয়ায় বসে আছেন। তাঁদের হাতে এক একখানা ডিশে দুখানা করে চাপাটি আর ডিম-তড়কা। আমার আর বিমলের জন্যে দুটো ডিশ সামনে রাখা। আমরা যেতেই উত্তমবাবু বললেন . চটপট এগুলোর সদ্‌গতি করুন। আজ লাঞ্চটা ঠিক জুতের হয়নি। দেরি করবেন না। এখনি দু-চারটে কৌতূহলী চোখ আমাদের দিকে দেখছে। এরপর ভিড় হয়ে যাবে। চটপট হাত লাগান।

আমরা চটপট হাত লাগালাম। খাওয়ার ব্যাপারে আমার কৃতিত্ব সুবিদিত। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবার কারণ নেই।

খাওয়া শেষ হতে উত্তমবাবু বললেন : রবিবাবু, বি এফ জে এ-র বেস্ট অ্যাকট্রেস হবার জন্যে বেণুর অনারে আমাদের তো সেলিব্রেট করা উচিত। তাই না?

আমি বললাম · নিশ্চয়।

উত্তমবাবু বললেন . তাহলে আপনি আর বিমল আমাদের গাড়িতে চলে আসুন। আপনাদের গাড়িটাকে বলে দিন বুদবুদের ডাকবাংলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। আমরা ওই বাংলোয় কিছুক্ষণ বসব।

দুটো গাড়িই চলল বুদবুদের দিকে। গাড়িতে বসে উত্তমবাবু একটি পানীয়ের বোতল উদ্বোধন করলেন। সুপ্রিয়া দেবী নিলেন না। সোমার তো নেবার প্রশ্নই নেই। আমি, বিমল আর উত্তমবাবুর হাতের গ্লাস একত্রে ঠেকিয়ে চিয়ার্স করা হল। উত্তমবাবু বললেন : এটা কিন্তু শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর অনারে।

কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন খোঁচা যে ছিল সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারলাম। ভেবেছিলাম সুপ্রিয়া দেবী ফুঁসে উঠবেন। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। গুম্ হয়ে বসে রইলেন। এরপর শুরু হল উত্তমবাবুর গান। অবশ্যই রবীন্দ্রসংগীত। এই পরিবেশে রবিঠাকুরের গান মানায় কিনা সে হুঁশ তখন আমাদের নেই। উচ্ছল প্রাণে উত্তমবাবু গান গেয়ে চলেছেন একের পর এক। মাঝে মাঝে আমিও একটু-আধটু গলা মেলাচ্ছি। তারই মধ্যে উত্তমবাবু সুপ্রিয়া দেবীকেও গলা মেলাতে বললেন। কিন্তু সুপ্রিয়া দেবী কোনও উত্তর না দিয়ে কঠোর মুখে চোখ বুজে বসে রইলেন। সোমা কিন্তু সব ব্যাপারটা উপভোগ করছিল। সুপ্রিয়া দেবী আর উত্তমবাবুর মাঝখানে বসে সে খানিকটা চপলতাও প্রকাশ করে ফেলছিল।

এইভাবে আনন্দের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে আমরা বুদবুদ ডাকবাংলোয় পৌঁছে গেলাম। কিন্তু বাংলো তালাবন্ধ। কেয়ারটেকার মাইনে নিতে বর্ধমান চলে গেছে চাবি সঙ্গে নিয়ে। অতএব আমরা বাংলোর পুকুরঘাটে গিয়ে বসলাম। কেয়ারটেকারের ছেলে তাদের বাড়ি থেকে একখানা জ্বলন্ত হ্যারিকেন নিয়ে ঘাটের পৈঠার ওপর বসিয়ে দিয়ে গেল। ওই আলো-আঁধারি পরিবেশে বসে আমরা পানোন্মত্ত তিনটি পুরুষ প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটালাম।

উত্তমবাবুকে আমি এর আগে বহুবার পান করতে দেখেছি, কিন্তু এমন উচ্ছল হতে কখনও দেখিনি। আমার কেমন যেন মনে হল উনি ভেতরের কোনও একটা যন্ত্রণাকে চাপা দেবার জন্যে এমন আচরণ করছেন। কিন্তু সেটা কী হতে পারে তা অনেক মাথা ঘামিয়েও খুঁজে বার করতে পারলাম না।

খানিক পরে আমরা গাত্রোত্থান করলাম। আমাদের গাড়ি কলকাতার পথ ধরল। ততক্ষণে আরও একটি বোতলের ছিপি উদ্‌ঘাটন করা হয়ে গেছে। উত্তমবাবুর কথার মধ্যেও কেমন একটা তীব্রতা এসে গেছে। আমার দিকে তাকিয়ে উত্তমবাবু বললেন : সুপ্রিয়া দেবীর তো সবে শুরু। আজ বি এফ জে এ, কাল নিশ্চয় ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের উর্বশী, পরশু অস্‌কার। কী বলুন রবিবাবু, তাই না?

ব্যাপারটা খুব বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। আমি কোনও উত্তর দিলাম না। কিন্তু ধন্য সুপ্রিয়া দেবীর সহ্যশক্তি। তাঁর তো এতক্ষণে রাগে ফেটে পড়ার কথা। কিন্তু তিনি যেমন চোখ বুজিয়ে বসে ছিলেন, তেমনি বসে রইলেন।

বর্ধমানে এসে আমাদের পানীয় ফুরিয়ে গিয়েছিল। তখন প্রায় মধ্যরাত। বিমল বললে : আমি একটা জায়গা জানি যেখানে ড্রিংকস্ পাওয়া যেতে পারে। আমাদের গাড়ি সেইদিকেই চলল। কিন্তু বিমলের

তৎপরতা কোনও কাজে লাগল না। ফেরবার পথে দেখলাম সিনেমার নাইট শো ভেঙেছে। রাস্তার স্বল্প আলোতেও সিনেমা ফেরত দর্শকরা উত্তমবাবু আর সুপ্রিয়া দেবীকে চিনে ফেলেছে। হই হই করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির ওপর। মুখে তাদের চিৎকার: গুরু গুরু, একবার দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াও।

কী কষ্টে যে আমাদের গাড়ির ড্রাইভার সেখান থেকে গাড়িটাকে মুক্ত করে এনেছিল সেটা ভাবলে আজও বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। হর্ন দিতে দিতে কোনরকমে ভিড় কাটাতে কাটাতে একটু ফাঁক পেয়েই ফুলস্পিডে দৌড়। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো মাঝ রাস্তায় পুলিশ আমাদের গাড়ি আটকেছিল ওইভাবে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে দেখে। কিন্তু গাড়ির মধ্যে তাঁরা উত্তমকুমারকে সশরীরে বসে থাকতে দেখে সসম্মনে আমাদের যাবার পথ করে দিয়েছিলেন।

গাড়ি যখন শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে এসে পৌঁছোল তখন আমার হাতের ঘড়িতে রাত দেড়টা। আমি উত্তমবাবুকে বললাম · গাড়িটাকে বিধান সরণি দিয়ে নিয়ে যেতে বলুন। আমি হেদোর ধারে নেমে যাব। কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আমাব জরুরি কথাটা তো বলা হল না এখনও।

উত্তমবাবু বললেন : তাই কখনও হয় মশাই। আমাদের সেলিব্রেশন তো কম্‌প্লিট হয়নি এখনও। সোজা ময়রা স্ট্রিটে চলুন। আপনাকে আধ ঘণ্টার বেশি আটকাব না।

পড়েছি যবনেব হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। কাজেই কোনও কথা না বলে চুপ করে বসে রইলাম।

ময়রা স্ট্রিটে এসে আমরা সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠলাম। কিন্তু উত্তমবাবুর সিঁড়ি ভাঙা বারণ। দু'জন হৃষ্টপুষ্ট দারোয়ান একটা চেয়ারে উত্তমবাবুকে বসিয়ে ওপরে তুলল। আমি বললাম : এ যে দেখছি চেয়ার কার?

উত্তমবাবু চেয়ারে বসতে বসতে আমার কথা শুনে হাসলেন।

আমরা সোজা এসে উত্তমবাবুর শোবার ঘরে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলাম। উত্তমবাবু কেবল চোখে-মুখে জলটুকু দিয়ে এসে বসলেন। কিন্তু সুপ্রিয়া দেবী একদম স্নানটান সেরে এসে বসলেন। তাঁকে বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছিল। নতুন করে আবার পানীয়ের গ্লাস ভরে দেওয়া হল সকলের সামনে।

গ্লাসটি হাতে তুলে উত্তমবাবু বলে উঠলেন : লং লিভ বি এফ জে এ-র শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী।

এতক্ষণে হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন সুপ্রিয়া দেবী। চিৎকার করে বলে উঠলেন : সেই বিকেল থেকে আমি তোমার বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করছি। আর তো পারছি না। বি এফ জে এ আমাকে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী করেছে তাতে তোমার এত জ্বালা কেন? তোমাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা না করে সৌমিত্র চ্যাটার্জিকে করেছে সে দোষটা কি আমার? তুমি আমাকে কী পেয়েছ কী?

বলতে বলতে সুপ্রিয়া দেবীর দুটো চোখ জলে ভরে এল। আর উত্তমবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর মুখখানা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছে। চোখ দুটো দিয়ে গনগনে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে।

বুঝলাম এই মুহূর্তে অবস্থাটাকে সামাল দিতে না পারলে এখনি একটা ভয়ানক রকমের অঘটন ঘটে যেতে পারে। তাই জীবনে কখনও অভিনয় না করা সত্ত্বেও সেদিন সেই মুহূর্তে অভিনয় করতে হল আমাকে। বুকের মধ্যে যতটুকু নিঃশ্বাস জমা ছিল তার সবটুকু একত্র করে প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম : কী ছেলেমানুষি হচ্ছে! এমন অসভ্যের মতো ঝগড়া করতে আপনাদের লজ্জা করে না! আপনারা না শিল্পী। ফর গডস্ সেক, প্লিজ স্টপ ইট!

আমার ওই অমানুসিক চিৎকারে বোধহয় কাজ হল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম উত্তমবাবুর চোখ দুটো কোমল হয়ে এল। তাঁর কণ্ঠস্বরে ফিরে এল রোম্যান্টিকতা। আদুরে আদুরে গলায় তিনি বললেন : বেণু, রবিবাবু আমাদের গেস্ট। তুমি ওঁকে খেয়ে যাবার কথা বলবে না?

সুপ্রিয়া দেবী কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে বসে রইলেন। তারপর অপরাধীর মতো মুখটা তুলে বললেন : স্যরি রবিদা, এক্সট্রিমলি স্যরি। আমি এখনই খাবার নিয়ে আসছি। তোমাদের সকলের জন্যে।

উত্তমবাবুদের বাড়ি থেকে সেদিন যখন বিদায় নিয়েছিলাম, তখন রাত প্রায় সাড়ে তিনটে। রাত বলা ভুল হল। ভোরের আলো তখন ফুটি ফুটি করছে। গাড়িতে বসে গত আটচল্লিশ ঘণ্টার সমস্ত

ব্যাপারটার পর্যালোচনা করছিলাম। বড় বিচিত্র এই মনুষ্যচরিত্র। উত্তমবাবু তো এর আগে কত কতবার বি এফ জে এ পুরস্কার পেয়েছেন, ভারত সরকার তাঁকে অভিনয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ভরত পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন, তবু পুরস্কারের প্রতি তাঁর এই মোহ কেন? জনগণ তো অকাতরে তাঁদের হৃদয়ের পুরস্কার তুলে দিয়েছেন উত্তমবাবুর হাতে। তবু পুরস্কারের প্রতি এত আগ্রহ কেন? ভেবেছিলাম পরে কোনও একটা সময়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন করে উত্তরটা জেনে নেব। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি। এই ঘটনার মাত্র দশ বছর পরে ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন আমাদের সকলের কাছ থেকে। তার আগে একটা মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে পারিনি উত্তমবাবু এমন করে আমাদের কাঙাল করে চলে যাবেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর সঙ্গে আত্মজীবনী রচনার কাজে বসার কথা ছিল। সেটা আর হল না। সে আক্ষেপ আমার মরণকাল পর্যন্ত থাকবে।

ম্যাডাম সুচিত্রা

একটা বয়স ছিল যখন সুচিত্রা সেনের নাম শুনলেই বুকের মধ্যে জলতরঙ্গ বাজত। ছবির পর্দায় সুচিত্রা সেনের অভিনয় দেখলে সারা মনটা খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠত। আর দৈবাৎ যদি সুচিত্রা সেনকে রক্তমাংসের অবয়বে দেখতে পেতাম তাহলে দুটো চোখে বিদ্যুৎচমকের ঘোর লেগে যেত। বেশ খানিকক্ষণের জন্যে মনে হত এই পৃথিবীতে বোধহয় ওই ভদ্রমহিলা ছাড়া আর কোনও কিছুর অস্তিত্বই নেই।

পবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওইসব উচ্ছলতা অনেকটাই কমে গেছে বটে, তবে তার বদলে জায়গা নিয়েছে সুচিত্রা সেন সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা। ওঁর অভিনয়ের কুশলতা দিনের পর দিন যতই বেড়েছে, আমার অভিভূতির পরিমাণ তার দ্বিগুণ আকার ধারণ করেছে। জনবিমোহিনী তাবকা থেকে একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসেবে আমার মনে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে।

কয়েক মাস আগে আমার এক বন্ধু আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন : দেখুন মশাই, আপনার স্মৃতির সরণিতে আর যাঁকে নিয়ে লিখতে চান লিখুন, কিন্তু সুচিত্রা সেনকে নিয়ে কখনও লিখতে যাবেন না যেন।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম বন্ধুর কথা শুনে। বলেছিলাম এ কথা বলছেন কেন?

বন্ধুটি বলেছিলেন : আপনার লেখার মধ্যে যদি ভুলচুক কিছু ঘটে যায় তাহলে ওঁর হাতে আপনার আর নিস্তার নেই। পান থেকে চুনটি খসলেই উনি খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন আপনার ওপর। চেনেন না তো সুচিত্রা সেনকে!

আমি বন্ধুকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম : আপনি চেনেন বুঝি? আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে?

বন্ধুটি আমতা আমতা করে বলেছিলেন : না, তা নেই অবশ্য। তবে সাংবাদিকদের যে উনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, সেটা তো আপনার অজানা থাকার কথা নয়। কালীশ মুখোপাধ্যায়ের 'রূপমঞ্চ' আব সুধাংশু বক্‌সির 'রূপাঞ্জলি' পত্রিকা নিয়ে সুচিত্রা সেন কী কাণ্ড করেছিলেন সেটা কি আপনি ভুলে গেছেন?

না ভুলিনি। সে সব কথা স্পষ্ট মনে আছে। এবং সেইসব ঘটনা সুচিত্রা সেন আর সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়েছে। অস্বীকার করব না, ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সময়ে আমি মানসিকভাবে কালীশদা আর সুধাংশুবাবুর পক্ষই নিয়েছিলাম। পরে বুঝেছিলাম, ওই ঘটনায় সুচিত্রা সেনের কোন দোষই ছিল না। কালীশদা আর সুধাংশুবাবু খানিকটা পায়ে পা দিয়ে ঝগড়াটা বাধিয়েছিলেন। এবং তার ফলে শ্রীমতী সেন চিরকাল সাংবাদিকদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণাই পোষণ করে গেলেন। এতে সুচিত্রা সেনের কোনও ক্ষতি হয়নি। বরং সাংবাদিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁরা ওই ভদ্রমহিলার অন্তরটিকে আবিষ্কার করার কোনও সুযোগ পাননি। সুচিত্রা সেনের মন এবং গৃহের দরজা পরবর্তী প্রজন্মের সাংবাদিকদের কাছে বন্ধই থেকে গেছে। যদি বা কারও জন্যে ঘরের দরজা কোনদিন খুলেওছে, কিন্তু সেখান থেকে কেবল ভদ্রতাসূচক শুষ্ক আপ্যায়নটুকুই জুটেছে। মনের দরজা কারও কাছেই তিনি খোলেননি।

কিন্তু সেসব কথা আপাতত থাক। প্রয়োজন বুঝলে পরে তা বিস্তারিতভাবে বলা যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে বন্ধুর কথার জবাব দেওয়া দরকার। তাঁর মতো অনেকেই সুচিত্রা সেন সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে বসে আছেন। সেটা ভাঙিয়ে দেওয়া প্রয়োজন তাই বললাম : সেসব ঘটনায় আমি তো মিসেস সেনের কোনও দোষ দেখতে পাই না। ওঁরাই তো কুৎসিত ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন।

আমি যে এমনভাবে সোজাসুজি সুচিত্রা সেনের পক্ষ নেব সেটা বোধহয় আমার বন্ধুটি কল্পনাও করেননি। তাই আমার কথা শুনে খানিকটা দমে গেলেন। উনি জানেন সেই সময়ে ওই দুটি পত্রিকার

সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। যদিও কাজ করতাম উল্টোরথ পত্রিকায়। তাই আমার কথার প্রতিবাদ করতে সাহসী হলেন না। তবে নাছোড়বান্দা কিছু মানুষ তো পৃথিবীতে থাকে। নইলে হঠাৎ আর একটি ফ্রন্ট দিয়ে সুচিত্রা সেনকে আক্রমণ করতে যাবেন কেন!

বন্ধুটি হঠাৎ বলে বসলেন : তাছাড়া সুচিত্রা সেনকে নিয়ে এত লেখারই বা কী আছে। উনি তো একজন পপুলার ফিল্মস্টার মাত্র। উনি তো দেবিকারানি নন, কিংবা মীনাকুমারী নন, অথবা নার্গিসও নন যে ওঁর অভিনয়প্রতিভা নিয়ে আমাদের দু'হাত তুলে নাচানাচি করতে হবে। আপনার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। সুচিত্রা সেনের নামে জিভ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

বন্ধুটি যে হঠাৎ এমন বডিলাইন বল দেবেন সেটা আমি ভাবিনি। সুচিত্রা সেনকে ছেড়ে হঠাৎ এভাবে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। বেশ খানিকটা বাগও হয়ে গেল। বললাম : 'হারানো সুর' কী 'সপ্তপদী' ছবির কথা না হয় বাদই দিলাম। আপনি কি 'দীপ জ্বেলে যাই', 'উত্তর ফাল্গুনী' কিংবা 'আঁধি' ছবিতে ওঁর অভিনয় দেখেনি? 'সাত পাকে বাঁধা' ছবিতে অভিনয় কবে উনি যে মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলেন, সেটাও কি শোনেননি?

বন্ধুটি হাসতে হাসতে বললেন . শুনেছি বৈকি। আপনি যেসব ছবির নাম করলেন সেগুলো দেখেছিও। আর মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল নিযে আপনারা সাংবাদিকরা যতই নাচানাচি করুন না কেন, ওটা যে একটা মেজর ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল নয়, সাংবাদিক হিসেবে সেটাও তো আপনার অজানা থাকাব কথা নয়। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলুন তো রবিবাবু, কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া সুচিত্রা সেনের অভিনযেব মধ্যে কি আপনি বেশিরভাগ সময়েই কৃত্রিমতা খুঁজে পাননি? উনি সব ছবিতেই সুচিত্রা সেন, কখনও তো ওঁকে ভুলেও মনে হয়নি যে উনি সুচিত্রা সেনের ক্যারিশমাকে ছাপিয়ে সত্যিকারের চরিত্র হয়ে উঠতে পেরেছেন। আমাদেব কি ভুলিয়ে দিতে পেরেছেন যে উনি মিসেস সুচিত্রা সেন নন, কমললতা? অথবা বালিগঞ্জ প্লেসের ম্যাডাম সুচিত্রা সেন নন, শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের নায়িকা সরযূ?

এ তো আমাকে বড কঠিন প্রশ্নেব মুখে ফেলে দিলেন বন্ধুবব। ওঁর কথা অস্বীকারও কবতে পারছি না, আবার স্বীকার করতেও প্রাণ চাইছে না। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে মিন মিন করে বললাম . কিন্তু ওঁর জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করবেন কী করে! পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে সত্তবের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওঁর মোহময়তার আকর্ষণে দর্শকরা যে পতঙ্গের মতো প্রেক্ষাগৃহের দরজায় ছুটে আসত সেটা ভুলে যাবেন কেমন করে?

বন্ধুটি বললেন · না, সেটা ভুলিনি। আর সেই সঙ্গে এটাও ভুলিনি যে ওই বিপুল জনপ্রিয়তাকে তিনি কোনও বড় কাজে লাগাতে পারেননি। দর্শকরা যখন তাঁর হাতের মুঠোয় তখন কেন উনি চেষ্টা করেননি এমন কোনও চরিত্রে অভিনয় করতে যা ওঁকে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে চিবকালের মতো বিখ্যাত করে রাখত। বিশেষ করে ছায়া দেবীর মতো একজন অল টাইম গ্রেট অভিনেত্রী যখন ওঁর চোখের সামনে ছিলেন। তাঁব সঙ্গে তো উনি কত ছবিতে অভিনয়ও করেছেন। তবু উনি জনপ্রিয়তার খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেননি কেন?

আমি বললাম : কে বললে করেননি। 'উত্তর ফাল্গুনী'তে মায়ের চরিত্রটা ভাবুন তো। একদম ডি-গ্ল্যামারইজড একটা চরিত্র।

বন্ধুটি হাসলেন। বললেন : সেটা করেছিলেন পাশাপাশি মেয়ের চরিত্রটা ছিল বলে। যেখানে উনি ফুল অব গ্ল্যামার। ওটা না থাকলে পরিচালক অসিত সেনের ক্ষমতা ছিল ওঁকে ওই চরিত্রে অভিনয় করানো? আর যে 'আঁধি' ছবিতে ওঁর অভিনয়ের প্রশংসায় আপনি পঞ্চমুখ, সেই ছবিতে যদি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আদলে মেক-আপ আর মিসেস গান্ধীর জীবনের কিছুটা ছায়া না থাকত, তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াত বলুন তো? ভদ্রমহিলা অসম্ভব রকমের ক্যালকুলেটিভ?

আমি বললাম : ছি ছি! অত কঠিন কথাটা মিসেস সেন সম্পর্কে বলা বোধহয় ঠিক নয়।

বন্ধু বললেন : কেন নয়? যা সত্যি আমি তাই বলেছি।

আমি বললাম : কিসের সত্যি। আপনি ওঁর ক্যালকুলেটিভনেসের কী দেখলেন?

বন্ধুটি এবার তাঁর ঢোলা পাঞ্জাবির হাত দুটো গুটিয়ে নিয়ে রণং দেহি মূর্তিতে বললেন : সুচিত্রা

সেন অভিনীত শেষ ছবির নাম কী?

আমি বললাম : 'প্রণয়পাশা'। মঙ্গল চক্রবর্তী সে ছবির ডিরেক্টার ছিলেন।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন : ও ছবিটা কত সালে রিলিজ করেছিল?

আমি বললাম : ১৯৭৮ সালে।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন : ওই ছবিটার ফেট্ কী?

আমি বললাম : তার মানে?

বন্ধু বললেন : ছবিটা কী হিট্ না সুপারহিট্ না অ্যাভারেজ?

আমি বললাম : এর কোনটাই নয়। সত্যি বলতে কী, ছবিটা ফ্লপই করেছিল। সুপারফ্লপও বলতে পারেন। মাত্র চার সপ্তাহ চলেছিল ছবিটা যা সুচিত্রা সেন অভিনীত কোনও ছবির ক্ষেত্রে অকল্পনীয়।

বন্ধুটি বললেন : নাউ কাম টু দ্য পয়েন্ট। ওই ছবি ফ্লপ কবার ফলে কি সুচিত্রা সেনের ডিমান্ড কমে গিয়েছিল? প্রোডিউসাররা কি তাঁকে আর কাজ দিতে চাইছিলেন না?

আমি বললাম : কে বললে? আজও তাঁর ডিমাণ্ড আছে। এখনও বহু প্রোডিউসার তাঁকে ব্ল্যাংক চেক লিখে দিতে রাজি আছেন।

বন্ধু বললেন : তাহলে তিনি আর ছবি করলেন না কেন?

আমি বললাম · সেটাই তো রহস্য। ক'বছর আগে পর্যন্ত শুনেছি তাঁকে কেউ কেউ স্ক্রিপ্ট শুনিয়ে এসেছেন। কিন্তু তিনি তাঁদের কারও ছবিতেই শেষ পর্যন্ত কাজ করতে রাজি হননি। এই তো সেদিন পর্যন্ত শুনলাম তিনি নাকি রামকৃষ্ণের সহধর্মিনী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী নিয়ে একটা ছবিতে শ্রীশ্রীমায়ের রোল করবেন। তারপর সব চুপচাপ। আর কোনও খবর নেই। আমার কাছে সবটাই কেমন রহস্যময় বলে মনে হয়।

বন্ধুটি বললেন : আমার কাছে এটা কোন রহস্যই নয়। উনি হয়তো আবারও কারও স্ক্রিপ্ট শুনতে রাজি হবেন। কিন্তু ছবি আর উনি কোনদিনই করবেন না। উনি একজন পয়লা নম্বরের এস্কেপিস্ট।

আমি বললাম : আপনি মশাই বড় বেশি যা-তা কথা বলছেন। একজন শ্রদ্ধেয়া অভিনেত্রী সম্পর্কে আপনার সংযত হয়ে কথা বলা উচিত।

আমার কথায় বন্ধু লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন : স্যরি রবিবাবু, আই বেগ টু বি অ্যাপোলোজাইজড্। শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকে আমি আপনার চেয়ে কম শ্রদ্ধা করি না। যন্ত্রণাটা সেই জন্যেই জিভ দিয়ে ঝরে পড়ছে। ওঁর কাছে আমাদের কত না প্রাপ্তির আশা ছিল। কিন্তু উনি এটা কী করলেন। মুমূর্ষু বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচাতে যে সময়ে ওঁকে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার, সেই সময়ে উনি পালিয়ে বাঁচলেন। কাজেই ওঁকে এস্কেপিস্ট বলব না তো কাকে বলব?

আমি বললাম : পালিয়ে বাঁচলেন কথাটার অর্থ কী?

বন্ধু বললেন : তার অর্থ উনি নিজের ইমেজটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই অভিনয়ের জগৎ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

আমি বললাম : এ আবার কী নতুন কথা শোনালেন মশাই!

বন্ধু বললেন : ঠিকই বলছি। 'প্রণয়পাশা' ওই ভাবে ফ্লপ করার পর উনি নিশ্চয় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এরপর কী করা উচিত, কী ধরনের ছবি করা উচিত, এইসব ভাবনাচিন্তা করবার জন্যে সময় নিচ্ছিলেন। এমন সময়, এর দু-তিন বছর বাদেই উত্তমকুমার মারা গেলেন। আর উনিও মনে মনে অভিনয়ের জগৎটাকে গুডবাই জানাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

আমি বললাম : এ আবার কী নতুন ব্যাখ্যা দিলেন মশাই! মিসেস সেন তো শেষের দিকে উত্তমকুমার ছাড়াই অভিনয় করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। উইদাউট উত্তম অনেক ছবি হিট করিয়েছেন। উত্তম-সুচিত্রা ইমেজের বাইরে নিজস্ব একটা ইমেজ তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাহলে আর উত্তমকুমারের মৃত্যুতে ওঁর অভিনয় ছাড়ার প্রসঙ্গটা আসছে কেন?

বন্ধু বললেন : গোলমালটা সেখানে নয়। উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁর রোম্যান্টিক ইমেজটা দর্শকের কাছে অমর হয়ে রইল। ম্যাটিনি আইডল উত্তমকুমার কোনদিনই বুড়ো হলেন না।

তিনি বেঁচে থাকলে কী হত জানি না। হয়তো অভিনয়ের প্যাটার্ন বদলে তিনি খুব উচ্চস্তরে চলে যেতেন। সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। অথবা তাঁর অভিনয় দেখে দর্শকরা দূরছাই করত। কিন্তু তা থেকে উত্তমকুমার মুক্তি পেয়ে গেলেন। এই ব্যাপারটাই নিশ্চয় শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই নিজের ইমেজ অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনিও পর্দার আড়ালে চলে গেলেন।

আমি বললাম : এই লুকোচুরির তো কোনও দরকার ছিল না। উনি তো স্বচ্ছন্দে ঘোষণা করে দিতে পারতেন যে, আমি খুব ক্লান্ত, তাই অভিনয়জীবন থেকে অবসর নিচ্ছি।

বন্ধু বললেন : সেইখানেই তো খেলা। তাহলে তো দর্শকরা বলে উঠত, ওই দ্যাখো, উত্তমকুমার নেই বলে সুচিত্রা সেন ভয় পেয়ে অভিনয় ছেড়ে দিল। কিন্তু মিসেস সেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তিনি দর্শককে ওসব কথা বলার সুযোগ দেবেন কেন! তাই 'করছি করব' বলে কালক্ষয় করতে লাগলেন আর নতুন নতুন স্ক্রিপ্ট শুনতে লাগলেন। এমন একটা ভাব দেখাতে লাগলেন যে তাঁর যেন কোনও স্ক্রিপ্টই পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু আমি বলছি আপনাকে, স্ক্রিপ্ট পছন্দ হলেও উনি আর অভিনয় করবেন না। করবেন না নিজের ইমেজ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। উনি জীবিতকালেই লিজেন্ড হয়ে থাকতে চাইছেন। ওঁর সম্পর্কে সকলের আগ্রহ চিরকালের মতো অটুট রইল। উনি এখন সেটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন।

আমি বললাম : কী জানি। আপনার কথাটা আমি তেমন করে মানতে পারছি না।

বন্ধু বললেন : পারছেন না। বেশ তো, আপনার এই স্মৃতির সরণি মারফত আমি মিসেস সেনের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, মুমূর্ষু বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচাতে উনি বেশি নয়, মাত্র তিনখানা বাংলা ছবি করুন। আমি বলছি, উনি এখনও যদি অভিনয় করেন তাহলে প্রতিটা ছবিই সিলভার জুবিলি তো বটেই গোল্ডেন জুবিলি করবে। বাংলা ছবির মরা গাঙে আবার বান আসবে। হায় হায়, কতদিন যে বাংলা ছবির গোল্ডেন জুবিলি দেখিনি। কিন্তু উনি কি আমার প্রস্তাব মেনে নেবেন? বিশ্বাস হয় না। তাহলে কি ওঁকে ক্যালকুলেটিভ আর এস্‌কেপিস্ট বলে আমি ভুল করেছি?

এই বলে বন্ধুটি ইমোশানাল হয়ে পড়ে প্রায় চোখের জল চাপতে চাপতে বেরিয়ে গেলেন।

ওঁর এইভাবে চলে যাওয়া দেখে বুঝতে পারলাম উনি বাংলা ছবির জগৎটাকে সত্যিই ভালবাসেন। আর শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করেন। তা নইলে তাঁর সম্পর্কে এসব কটু কথা ওঁর মুখ দিয়ে বেরোত না।

বন্ধু চলে গেলেন আর তাঁর এই সুচিত্রাপ্রীতি আমাকে আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত করল সুচিত্রা সেন সম্পর্কে লিখতে। স্মৃতির সরণি পর্যায়ে সুচিত্রা সেনকে বাদ দেওয়ার কথা তো ভাবাই যায় না। তাঁর সম্পর্কে আমি লিখতামই। কিন্তু মনের মধ্যে যেটুকু আড়ষ্টতা ছিল সেটা আমার বন্ধু কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। এর জন্যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কিন্তু শুরুটা করব কোথা থেকে। মিসেস সেনের সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় সেটা নেহাতই সৌজন্যমূলক। বাক্যালাপ যেটুকু হয়েছে তাও অত্যন্ত পরিমিত। কিন্তু দূর থেকে হলেও আমি তাঁকে দেখেছি বহুবার। সেইসব মুহূর্তে তাঁকে আমি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আর তাঁর সম্পর্কে শুনেছি প্রচুর। সব মিনিয়ে তাঁকে নিয়ে আমি অনেক বড় লেখাই লিখতে পারি। কিন্তু স্মৃতির সরণির জন্যে বিভাগীয় সম্পাদক একটি গণ্ডি এঁকে দিয়েছেন। লক্ষ্মণ যেমন সীতা দেবীর চারপাশে এঁকে দিয়েছিলেন। সীতা দেবী সেই গণ্ডি অতিক্রম করে রাবণের হাতে পড়ে অনর্থ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। আমি সেই ভুল করব না। নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের বহুবিচিত্র জীবনের একটা ছবি আঁকবার চেষ্টা করব। কতটা সফল হব জানি না। ত্রুটি-বিচ্যুতি যে ঘটবে না তেমন ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারি না। পাঠকদের কাছে তো বটেই, মিসেস সেনের কাছেও এর জন্যে অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

সুচিত্রা সেনের ছেলেবেলার কথা আমি কিছুই জানি না। উনি যে পাটনার মেয়ে তাও জানতাম না। সেটা প্রথম জানতে পারি জহরদার কাছে। জহরদা মানে আমাদের সময়ের দুরন্ত আর দুর্দান্ত কৌতুকাভিনেতা জহর রায়। মির্জাপুরে জহরদা যে মেসে থাকতেন সেখানে আমি প্রায়ই যেতাম জহরদার সঙ্গে আড্ডা দিতে। একদিন কথায় কথায় সুচিত্রা সেনের প্রসঙ্গ উঠল। জহরদার কাছে সখেদে

বলেছিলাম : ম্যাডাম যা রাশভারি তাতে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় করে। অথচ ওঁর সম্পর্কে জানার কত ইচ্ছে। তা আর কোনদিনই পূরণ হবে না।

জহরদা বললেন : ম্যাডাম কাকে বলছিস রে?

আমি বললাম : কেন, সুচিত্রা সেনকে! ওঁকে যে হোল্ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ম্যাডাম বলে সেটা কি তুমি জানো না। ম্যাডাম বলতে তো ওই একজনই। কানন দেবীও তাঁর প্রাইম পিরিয়ডে ম্যাডাম হতে পারেননি।

জহরদা বললেন : তা ঠিক। তবে আমি ওকে কোনওদিন ম্যাডাম বলিনি। আমার কাছে ও সুচিত্রা সেন নয়, রমা দাশগুপ্ত। আমাদের পাটনার করুণাময় দাশগুপ্তর মেয়ে।

আমি বললাম . তাই নাকি! তাহলে দিবানাথ সেনের সঙ্গে বিয়ের আগে থেকে তুমি ওঁকে চিনতে?

জহরদা বললেন : আমি চিনতাম কি না জানি না, তবে ও আমাকে চিনত।

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

জহরদা বললেন : শুধু রমা কেন, রমা শ্যামা ঝুমা তনিমা অনিমা এইসব মা নামের ল্যাজ দিয়ে পাটনার যত মেয়ে ছিল সবাই আমাকে চিনত।

আমি বললাম : যাঃ, এবারে তুমি গুল্ দিচ্ছো জহরদা।

জহরদা বললেন : এক বিন্দুও গুল্ দিচ্ছি না। পাটনার মেয়েরা আমাকে চিনবে না কেন! আমি যে তখন পাটনার হিরো রে।

আমি জহরদার তখনকার স্ফীতকায় বপুটির দিকে তাকিয়ে বললাম : হুঃ! তুমি আবার হিরো।

জহরদা বললেন : বিশ্বাস হল না? বেশ তো, তোদের সুচিত্রা সেনকে একদিন জিজ্ঞেস করে দেখিস আমি পাটনার হিরো ছিলাম কিনা?

আমি বললাম : হ্যাঁ, তোমার কথায় আমি মিসেস সেনকে ওই কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ধমক খাই আব কি! আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি।

জহরদা বললেন : সত্যি রে রবি। সেই সময়ে সত্যিই আমি পাটনার হিরো ছিলাম। আমার চার্লি চ্যাপলিনের কমিক শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়নি, এমন একটা মেয়েও তুই পাটনায় খুঁজে পেতিস না তখন। তোদের সুচিত্রা সেন তো আমাকে এখনও চার্লি বলেই ডাকে।

জহরদার এই কথাটা যে একবিন্দু অতিরঞ্জিত নয়, তা তাঁর মৃত্যুর পর বুঝতে পেরেছিলাম। সুচিত্রা সেনকে আমি কোনওদিন কোনও শিল্পীর শোকমিছিলে দেখিনি। শুনিওনি কারও কাছে। কিন্তু জহরদার মৃতদেহের শোকমিছিলে তাঁকে দেখেছিলাম। শোকমিছিল যখন হেদুয়ার কাছে বেথুন কলেজের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন সেখানে গাড়িতে করে এসে হাজির হয়েছিলেন শ্রীমতী সুচিত্রা সেন। তাঁকে দেখে মিছিল থেমে গিয়েছিল। গাড়ি থেকে শুভ্রবেশ পরিহিতা মিসেস সেন নেমে এসেছিলেন। ধীর পায়ে জহরদার মৃতদেহের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর নিচু হয়ে জহরদার কপালে আলতো করে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন : তুমি চলে গেলে চার্লি!

সেদিন সেই মুহূর্তে গ্রেট অ্যাকট্রেস সুচিত্রা সেন যে একবিন্দুও অভিনয় করেননি, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

কিন্তু সুচিত্রা সেনের এই গ্রেট অ্যাকট্রেস হয়ে ওঠার পিছনে যে কত মর্মান্তিক করুণ কাহিনী লুকিয়ে আছে তার খোঁজ কজন রাখে।

শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকে ছবির পর্দায় প্রথম দেখার পর আমি কিছুতেই ভাবতে পারিনি যে উনি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। অমন উজ্জ্বল চেহারা, চলাফেরায় অমন অভিজাত ভঙ্গি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারেই সম্ভব। ব্যতিক্রম যে থাকে না তা নয়। কিন্তু আমরা তো ব্যতিক্রমটাকে হিসেবের মধ্যে আনি না।

পরে, অনেক পরে, শ্রীমতী সেনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি গোপালকৃষ্ণ রায়ের লেখা থেকে জানতে পেরেছি শ্রীমতী সেন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা। বাবার নাম শ্রীযুক্ত করুণাময় দাশগুপ্ত। মায়ের নাম ইন্দিরা। জন্মেছিলেন পাটনায় মামার বাড়িতে। শ্রীমতী সেনের পিতৃদত্ত নাম রমা। মামারা আদর করে ডাকতেন

কৃষ্ণা বলে। ছোটবেলাটা মামার বাড়িতেই কেটেছে। বাবা বাড়ি করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। বাবা-মা দুজনেই পরলোকে। সুচিত্রা সেনের পিত্রালয় অদ্যাপি শান্তিনিকেতন, যেখানে উনি মাঝে-মাঝেই যাওয়া আসা করেন।

১৯৪৭ সালে যে বছর ভারত স্বাধীন হল, সে বছরই রমা দাশগুপ্তর পদবী বদলে হয়ে গেল রমা সেন। বালিগঞ্জ প্লেসের অভিজাত ব্যক্তিত্ব শ্রীযুক্ত আদিনাথ সেনের পুত্র দিবানাথ সেনের সঙ্গে রমার বিয়ে হয়ে গেল। তার চার বছর পরে পুরো নামটাই বদলে গেল রমার। হয়ে গেলেন সুচিত্রা সেন। শ্রীযুক্ত নীতীশ রায় ওঁর এই নতুন নামকরণ করেছিলেন।

এই সবই বললাম গোপালকৃষ্ণ রায়ের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। কিন্তু গোপালবাবু যে তথ্য দিতে পারেননি, অথবা দিতে চাননি, সেটা হল মিসেস সেনের জন্মের সালটি কত? শ্রীমতী সেনকে সেটা উনি জিজ্ঞাসাও করেছিলেন। মিসেস সেন জবাবে জানিয়েছিলেন, সুচিত্রা সেনের জন্ম ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

এই হিসেবটা মেনে নিতে গেলে শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের বয়স এখন তেতাল্লিশ। কিন্তু একটি শিশুও বলে দিতে পারবে এই হিসাবটা সঠিক নয়। এর মধ্যে কোথাও একটা লুকোচুরি আছে। তাহলে কি শ্রীমতী সুচিত্রা সেন মিথ্যা কথা বলছেন?

আজ্ঞে না। একদম না। আমি যতদূর জানি শ্রীমতী সুচিত্রা সেন নিজে তো মিথ্যাচারণ করেনই না, বরং যাঁরা করেন তাঁদের তিনি ঘৃণা করেন। সুতরাং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের বয়স এখন তেতাল্লিশ। হযতো দু-এক মাসের এধার-ওধার হতে পারে।

এতদ্‌সত্ত্বেও আপনাদের সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তো? তাহলে ব্যাপারটা খোলসা করে দিই। আমরা তো তাঁকে সুচিত্রা সেনের বযস জিজ্ঞাসা করেছি। এই সুচিত্রা সেন নামকরণ হয় তাঁর প্রথম ছবিতে অভিনয়ের সময়। সেটা ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। অতএব সুচিত্রা সেনের জন্ম যে ১৯৫১ সালে এটা বলে মিসেস সেন মোটেই মিথ্যাচারণ করেননি। তাঁর স্ক্রিন-এইজ তেতাল্লিশ।

কিন্তু এরপর যদি শ্রীমতি সুচিত্রাকে রমা দাশগুপ্তাব বয়স জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তিনি উত্তব দেবেন কি? সম্ভবত না। কারণ রমা দাশগুপ্তার সঙ্গে তো আমাদের অর্থাৎ দর্শকদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের যা কিছু সম্পর্ক, যা কিছু ভালবাসা, যা কিছু হাসিকান্নার দোলদোলানো খেলা, সবই তো শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের সঙ্গে। কুমারী রমা দাশগুপ্তা সেখানে অপাংক্তেয়। সেই তরুণী মহিলাটি তাঁর বাবা-মায়ের সম্পত্তি, তাঁর মামা-মামীমাদের সম্পত্তি, তাঁর ভাই-বোন এবং সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধবীদের সম্পত্তি। বাংলা কিংবা হিন্দি ছবির মোহমুগ্ধ দর্শকদের সেখানে প্রবেশের অধিকার নেই।

কিন্তু আমার যে কুমারী রমা দাশগুপ্তার বয়সটা না জানলেই নয়। পৃথিবীতে বাস করব কিন্তু তার উৎপত্তির কারণ জানব না, তা তো হয় না। তা না হলে স্কুলে কষ্ট করে এসব শিখতে হয় কেন?

আমি অঙ্কে বরাবরই কাঁচা। কিন্তু সুচিত্রা সেনের আসল বয়সের অঙ্কটা এবার মিলিয়ে ফেলতে পেরেছি। গোপালবাবুর লেখা থেকে জানতে পেরেছি ওঁর বিয়ে হয়েছে ১৯৪৭ সালে। তখন ওঁর বয়স আঠারো বছর। কাজেই ১৯৪৭ থেকে আঠারো বছর পিছিয়ে গিয়ে যে সালটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ১৯২৯। অতএব শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের, থুড়ি রমা দাশগুপ্তার জন্ম ১৯২৯ সালে। হয়তো এক-আধ বছর আগুপিছু হতে পারে। সঠিক হিসেবটা আজকের সর্বনন্দিতা বহুবন্দিতা সুচিত্রা সেনই জানেন।

আমার এই হিসাব অনুযায়ী শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের বয়স এখন আটষট্টি। উনিশশো আটাত্তর সালে উনি শেষ ছবি করেছেন 'প্রণয়পাশা'। তাহলে তখন ওঁর বয়সে উনপঞ্চাশ। এই উনপঞ্চাশ কি একজন অভিনেত্রীর রিটায়ার করার বয়স? এখন বুঝতে পারছি আমার পূর্বোক্ত বন্ধুর কেন এত অভিমান সুচিত্রা সেনের উপর। যে বয়সে একটি মানুষের কাছে সবথেকে বেশি প্রাপ্তির আশা, সেই বয়সে উনি কিনা অভিনয়জীবন থেকে সন্ন্যাস নিয়ে নিলেন। দোহাই মিসেস সেন, আর একবার ভাল করে ভাবুন এটা উচিত হচ্ছে কি না? বাংলার মানুষ এখনও আপনাকে ভালবাসে। মুমূর্ষু বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের কথা চিন্তা করে, তার হতভাগ্য টেকনিশিয়ানদের কথা চিন্তা করে সিরিয়াসলি ভাবুন না সিদ্ধান্তটা বদল করা যায় কিনা। দেখবেন, আপনার প্রতি মানুষের ভালবাসা দ্বিগুণ কেন চতুর্গুণ হয়ে যাবে।

বালিগঞ্জ প্লেসের অভিজাত ব্যক্তিত্ব আদিনাথ সেনের পুত্রবধূ সিনেমা করতে আসবে এটা যেমন অস্বাভাবিক ঘটনা, তেমনি রমা দাশগুপ্ত নামক একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা ওই বাড়ির পুত্রবধূ হয়ে আসবে সেটাও তেমনি এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। এটা সম্ভব হয়েছিল রমা নামক তরুণীটির অসামান্য রূপলাবণ্যের কারণেই। আদিনাথবাবু তাঁর পুত্র দিবানাথ সেনের জন্য একটি সুন্দরী, লাবণ্যময়ী, সর্বসুলক্ষণযুক্তা পাত্রীর সন্ধান করছিলেন। রমা নামক তরুণীটির মধ্যে তিনি তাঁর প্রার্থিত সব কিছুই খুঁজে পেয়েছিলেন। কাজেই অর্থকৌলিন্যে অসমান হওয়া সত্ত্বেও সেন এবং দাশগুপ্ত পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে বিলম্ব হয়নি।

আমার চোখে সুচিত্রা সেনের চেহারার যে আভিজাত্য এবং ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'সাত নম্বর কয়েদি' চিত্রটির মধ্যে দিযে ধরা পড়েছিল তা কি তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়িতে এসে আয়ত্ত করেছিলেন, না পিতৃগৃহ থেকেই সঙ্গে করে এনেছিলেন? আমার কাছে এটা একটা বড় প্রশ্ন। সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত 'ওরা থাকে ওধারে' ছবিতে সুচিত্রা সেনেব অভিনয়ের মধ্যে বেশ কিছুটা আড়ষ্টতা ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর চেহারার চটক এবং চলন বলনের অভিজাত্য সে ছবিতে স্পষ্টই প্রকাশ পেয়েছিল। নবাগতা হিসেবে একমাত্র সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় আর মঞ্জু দে ছাড়া আর কারও মধ্যে আমি ওই ধরনের আভিজাত্য খুঁজে পাইনি।

সুচিত্রা সেনের বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৭ সালে, আর তিনি ছবির জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন ১৯৫১ সালে। মাত্র তিন-চার বছবের মধ্যে অতখানি আভিজাত্য কারও পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। আর আভিজাত্য শেখানোর জন্যে কলকাতা শহরে কোনও স্কুল আছে বলেও তো কখনও শুনিনি। কাজেই সুচিত্রা সেন যখন পাটনা শহরের রমা দাশগুপ্ত ছিলেন তখন থেকেই তাঁর আভিজাত্যের অনুশীলন শুরু হয়েছে। নতুবা আদিনাথ সেনের মতো অভিজ্ঞ মানুষের চোখে রমা দাশগুপ্তর আভিজাত্যের অভাবটুকু ধবা পড়ে যেত। তাহলে কিছুতেই আর বালিগঞ্জ প্লেসেব সেনবাড়ির পুত্রবধূ হতে পারতেন না তিনি।

একটি নিম্নমধ্যবিত্তও বাডির মেয়ে হয়েও সুরুচির অনুশীলন, জীবনের পথে উর্ধ্বমুখী হবার আকাঙ্ক্ষা, এটা সুচিত্রা সেনের চরিত্রের মধ্যেই আছে। তাই তিনি চলচ্চিত্র জগতে এসেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন একেবারে শুরু থেকেই। এর জন্যে কালক্রমে তাঁকে দাম্ভিকতার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে সকলের সঙ্গে তিনি পা মিলিয়ে চলতে পারেন না। স্টুডিওপাড়ার সব হৈ-হট্টগোল আর উচ্ছলতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন।

এর সবকটি অভিযোগই সত্য। এবং এই সবকটি ব্যবহারই প্রশংসনীয়। যিনি অনন্য তাঁর পদছন্দ অন্যের সঙ্গে মিলবে কেন? যিনি আত্মস্থ হবার সাধনায় মগ্ন তিনি অকারণ হৈ-হট্টগোল আর উচ্ছলতার মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দেবেন কেন? তবে এইসব কারণের জন্য তাঁর মধ্যে ভদ্রতার অভাব কখনও ঘটেছে বলে তো আমি কারও কাছে শুনিনি। যিনি তাঁর কাছে কোনও কিছুর আশা করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন তিনিও তাঁর ভদ্রতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন একটি মানুষকে আমি জানি। তিনি আমার শ্রদ্ধেয়। বিশেষ কারণে তাঁর নাম প্রকাশ করা যাবে না। সুচিত্রা সেনের কাছ থেকে তিনি তাঁর অপ্রাপ্তির জন্য বার বার আমার কাছে আক্ষেপ করেছেন, কিন্তু ভুলেও কোনদিন অভিযোগের আঙুল তোলেননি সুচিত্রা সেনের বিরুদ্ধে।

এই যে একটু বেশি জায়গা নিয়ে শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলাম, এরও একটা কারণ আছে। শ্রীমতী সেনের সম্পর্কে অনেকের ভুল ধারণা আছে। তাঁর সম্পর্কে মানুষকে ভুল বোঝানো হয়েছে। বেশির ভাগ মানুষই তা বিশ্বাস করেছে। এই ভুলের নিরসন হওয়া দরকার। তাছাড়া আমাদের চলচ্চিত্রের অঙ্গনটি তো আদ্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। যে সব তরুণী এই শিল্পে নতুন আসছেন তাঁদের কাছে শ্রীমতী সুচিত্রা সেন একটি অবশ্য অনুকরণীয় চরিত্র। আমাদের এই শিল্পে দুটি সিঁড়ি আছে। একটি দিয়ে ওঠা যায়, অন্যটি দিয়ে নামা যায়। নবাগতারা যাতে সিঁড়ি চিনতে ভুল না করেন তাই সুচিত্রা সেনকে উপলক্ষ করে তাদের সিঁড়ি চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করা গেল মাত্র। বয়েস হলে তো মানুষের একটু অভিভাবকগিরি করবার প্রবণতা জন্মায়। আমারও সেই অবস্থা হয়েছে আর কী। এই জন্যেই তো

আগেকার দিনে মুনিঋষিরা গৃহী মানুষদের উদ্দেশে বলতেন, পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ। তা আমি আর বন কোথায় পাব। টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ার জন-অরণ্যেই বিচরণ করতে হচ্ছে। আর আমার সৌভাগ্য, এখানেই সুচিত্রা সেনেদের মতো বেশ কয়েকজন বনদেবীর দর্শন পেয়ে গেছি।

কিন্তু বালিগঞ্জ প্লেসে সেনবাড়ির মতো এক অভিজাত বাড়ির গৃহিণী হঠাৎ ফিল্ম করতে এলেন কেন? অনেকে আসেন অর্থোপার্জনের তাগিদে। কিন্তু দিবানাথ সেনেদের তো অর্থের অভাব ছিল না। অনেকে আসেন শখের তাগিদে। কিন্তু সুরুচিসম্পন্না মহিলা সুচিত্রা সেনের মনে এই ধরনের শখের চপলতা তো আসার কথা নয়। অনেকে আসেন ভেতরের একটা আর্জ থেকে। কিন্তু সুচিত্রা সেন তো তার আগে কোনও গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করেছেন বলে শোনা যায়নি। তাহলে হঠাৎ তিনি বিয়ের তিন বছর পরেই সিনেমা করবার জন্যে উঠেপড়ে লাগলেন কেন?

শ্রীমতী সেনের এই বাসনার পিছনে আর একটি মানুষের ছোট্ট একটি ভূমিকা আছে। তিনি হলেন একদা নিউ থিয়েটার্সের এবং পরবর্তীকালে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত চিত্র পবিচালক বিমল রায়। বিমলবাবু সম্পর্কে সুচিত্রা সেনেব মামাশ্বশুর হন। তিনি একদিন তাঁর প্রথম দর্শনেই সুচিত্রা সেনের ফটোজিনিক ফেস দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিমল রায় তো শুধু একজন বড় পরিচালক নন, তিনি একজন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যানও। নিউ থিয়েটার্সের প্রচুর ছবি তাঁর ক্যামেরার কাজে সমৃদ্ধ। ওই ক্যামেরাম্যান থেকেই তিনি পরিচালক হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রথম ছবি 'উদয়ের পথে' করে সারা দেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন।

সেই বিমল রায়ই সুচিত্রা সেনকে বলেছিলেন : বাঃ! তোমার ফেস্‌টি তো বড় চমৎকার! সিনেমায় নামলে তুমি দারুণভাবে অ্যাকসেপ্টেড হবে।

একটি নির্দোষ মন্তব্য। একটি কথার পিঠে কথা মাত্র। কিন্তু সেই কথাটিই নববধূ রমা সেনের মনে একটা বিরাট আলোড়ন তুলল।

আগেই বলেছি সুচিত্রা সেন সর্বদাই উর্ধ্বমুখী। তাঁর ভাবনাচিন্তা সবই আকাশছোঁয়া। বিমল রায়ের ওই কথা শুনে তিনি ভাবলেন, মন্দ কী! সিনেমাই তো ভাল। ওখানে ওপরে ওঠার স্কোপ অনেক বেশি। জানতেন ওখানে অনেক নর্দমা আছে। সেই নর্দমায় অনেক পাঁক আছে। কিন্তু আকাশচারী বিহঙ্গের কি নর্দমার দিকে নজর পড়ে, না নর্দমা দেখে আকাশে ওড়া থেমে যায়?

একদিন রাত্রে স্বামীব কাছে মনের বাসনা প্রকাশ করলেন রমা। জানতেন তাঁর এই বাসনায় আদিনাথ সেনের মতো অভিজাত পুরুষ সায় দেবেন না। যদিও তিনি তাঁর এই সুন্দরী পুত্রবধূটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তবু সিনেমা জগতের তথাকথিত পঙ্কিল রূপটির কথা তাঁর অশ্রুত ছিল না। তাই রমা আর দিবানাথ একত্রে দরবার করলেন তাঁর কাছে। সিনেমা জগতের বেশ কয়েকজন অভিজাত মানুষের উদাহরণও দিলেন। অনেক সাধ্য সাধনার পর মত পাওয়া গেল আদিনাথের। তবে তিনি রমাকে একা একা এই জগতে বিচরণের অনুমতি দিলেন না। নির্দেশ দিলেন, দিবানাথ যেন সর্বদা সঙ্গে থাকে।

রমাও তো তাই চাইছিলেন। স্বামী সঙ্গে থাকলে অনেক লোভী মানুষ নিজেকে সংযত করে নেবে। অনেক পশু তার বিস্তৃত থাবা গুটিয়ে নেবে। তাছাড়া স্বামী হলেন তাঁর আত্মরক্ষার বর্ম। তাঁর অক্ষয় রক্ষাকবচ।

এরপর শুরু হল অনুসন্ধানপর্ব। কোথায় গেলে, কার কাছে গেলে, কার সঙ্গে যোগাযোগ করলে ফিল্ম লাইনের সিংহদরজায় প্রবেশের চিচিং ফাঁক নামক মন্ত্রটি জানা যাবে তারই অনুসন্ধান। একটি অভিজাত বাড়ির পুত্র এবং পুত্রবধূ, তাঁরা তো আর ফিল্ম লাইনের দালালদের তোষামোদ করতে পারেন না। ওরই মধ্যে নিজেদের সম্মান বাঁচিয়ে চললো বিভিন্ন জনের কাছে আনাগোনা। অনুরোধ-উপরোধ।

এই অনুসন্ধান পর্বে কত গ্লানি যে শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকে সহ্য করতে হয়েছে তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। অনেকেই ভাবেন যে সুচিত্রা সেনের মতো একজন সুন্দরী মহিলা স্টুডিওর গেটে পা দেওয়া মাত্র তাঁকে ফুলের মালা গলায় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দিনের পর দিন তাঁকে যে ভাবে এক দরজা থেকে আর এক দরজায় ছুটে বেড়াতে হয়েছে এবং পরের পর বিফল মনোরথ হতে হয়েছে, তাতে সুচিত্রা সেনের মতো জেদি মহিলারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম

হয়েছিল। কিন্তু সুচিত্রা সেন আলাদা ধাতুতে গড়া। যতই প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন ততই তাঁর জেদ বেড়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করেছেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, এত সহজে হাল ছেড়ে দেবেন না। এর শেষ দেখে তিনি ছাড়বেন। রণে ভঙ্গ দেওয়া প্রকৃত যোদ্ধার কর্তব্য নয়।

ওই সময়কার একটি ঘটনা আমি আমার শ্রদ্ধেয়-অগ্রজপ্রতিম খগেন রায় মশাইয়ের কাছে শুনেছি। খগেনদা বাংলা ছবির একজন বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক। অনেকগুলি ছবি উনি করেছেন। তার মধ্যে একটি ছবির নায়িকা ছিলেন সুচিত্রা সেন। ছবিটির নাম আমার বউ। এটি ১৯৫৬ সালের ছবি। তখন সুচিত্রা সেন বাংলা ছবিতে সুপ্রতিষ্ঠিতা। ছবিটি অবশ্য বেশিদিন চলেনি। মাত্র পাঁচ সপ্তাহ। তবে তার কারণ অন্য। সুচিত্রা সেনের অভিনয় দর্শকদের কেমন লেগেছিল জানি না, তবে আমার তো মন্দ লাগেনি। সেটা সুচিত্রা সেনের প্রতি অনুরাগ এবং খগেনদার প্রতি শ্রদ্ধা, এই দুটো কারণেও হতে পারে।

সত্তরের দশকে খগেনদা ছবি করা ছেড়ে দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন। অধুনালুপ্ত হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার উনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। সেই সময়ে আনন্দবাজার অফিসে আমরা একত্রে কাজ করেছি। পরে খগেনদা ইংরিজি সিনে অ্যাডভান্স পত্রিকায় যোগ দেন। এখন বয়সের কারণে লেখাজোখা থেকে অবসর নিয়েছেন। তবে বয়স হলে কী হবে, খগেনদার স্মৃতি এখনও ভয়ানকভাবে সতেজ। সুচিত্রা সেনের সেই প্রথম জীবনের অনুসন্ধান পর্বের একটি দিনের ঘটনা আমি খগেনদার মুখ থেকে কিছুকাল আগে শুনেছিলাম।

খগেনদা বললেন : "ভবানীপুরে বিজলী সিনেমার ম্যানেজার ছিলেন বিশ্বাবসু রায়চৌধুরী। আমি মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে গিয়ে বসতাম গল্পগুজব করতে। একদিন ওঁর ঘরে বসে আছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বিশ্বাবসুর কাছে এলেন। মেয়েটিকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। বছর বাইশ-তেইশ বয়েস। ফর্সা রঙ। সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুতের ঝলক। আর চোখ দুটিতে অসম্ভব গভীরতা। মনে মনে ভাবলাম, এমন একটি মেয়ে যদি সিনেমায় অভিনয় করতে আসে তো খুব ভাল হয়।

সত্যি কথা বলতে কী তখন আমাদের ফিল্ম লাইনে তরুণী নায়িকার একটু অভাব যাচ্ছিল। যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁরা সবাই ভাল অভিনেত্রী, কিন্তু বয়সের দরুনই হোক আর যে কোন কারণেই হোক তাঁদের মধ্যে চটকের খানিকটা অভাব ছিল। রোম্যান্টিক রোলে তাঁদের সেভাবে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছিল না। যে কারণে আবেগবহুল ঘরোয়া কাহিনীর ছবি করতে হচ্ছিল। এই মেয়েটিকে দেখে মনে হল, মেয়েটি যদি অভিনয় করতে আসে তাহলে ওকে কেন্দ্র করেই রোম্যান্টিক কাহিনী ভাবা যেতে পারে।

কিন্তু আমার এই ভাবনার কথা তো ওঁদেব সামনে মুখ ফুটে বলা যেতে পারে না। ওঁদের তো দেখে মনে হচ্ছে অভিজাত বংশের। সিনেমা করার কথা বললে ওঁদের হয়তো মর্যাদায় আঘাত লাগতে পারে। ভাবলাম ওঁরা চলে যাক, তারপর বিশ্বাবসুর কাছে আমার মনের কথা বলবো। ওঁদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেব।

একটু পরে দেখলাম আমি যে কথা ভাবছি ওঁরা ঠিক সেই কারণেই বিশ্বাবসুর কাছে এসেছেন। সেই প্রসঙ্গেই কথাবার্তা বলছেন।

মেয়েটি বিশ্বাবসুকে বললেন : আর তো পরীক্ষা দিতে পারছি না। ক্রমেই সাহস হারিয়ে ফেলছি। সেদিন একজন পরিচালক তো স্ক্রীন টেস্ট নেবেন বলে মেক-আপ করিয়ে সারাটা দিন বসিয়েই রাখলেন। পড়ে রইলাম যে তিমিরে সেই তিমিরে।

বিশ্বাবসু বললেন : অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। এ লাইনে প্রথম ঢোকাটা একটু শক্ত। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। নতুনদের তো কেউ চট করে চান্স দিতে সাহস করে না। একটু ধৈর্য ধরুন। তেমন তেমন ডিরেক্টারের নজরে পড়লে চান্স হবেই হবে।

এই বলে বিশ্বাবসু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আমি মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। এই রে, বিশ্বাবসু আমার পরিচয় দিয়ে দেবে নাকি। দিলে খুব মুশকিলে পড়ে যাবো। আমার হাতে তো এখন কোন ছবি নেই। পরিচয় পেলে ওঁরা যদি রেগুলার আমার কাছে আসা-যাওয়া শুরু করেন তাহলে খুব অস্বস্তিতে পড়ে যাবো।

তা বিশ্বাবসু আমার পরিচয় ওঁদের কাছে দিলেন না। সেটা দেখে আশ্বস্ত হলাম। তবে মনে মনে

ঠিক করে রাখলাম, এরপরে যখনই ছবি করার সুযোগ পাব তখন এই মেয়েটিকেই আমার ছবির হিরোইন করবো। ওঁরা চলে যাক, তারপর বিশ্বাবসুর কাছে ওঁদের নাম-ধাম জেনে রাখবো।

একটু পরেই ওঁরা চলে গেলেন। যাবার আগে মেয়েটির স্বামী বিশ্বাবসুকে বললেন : দেখুন না একটু ভাল জায়গায় কাজ-টাজ পাওয়া যায় কি না। আপনার সঙ্গে তো ফিল্মের কত লোকের পরিচয়। ছবি বিলিজের সময় তাঁদের তো আপনাব কাছে আসতেই হয়।

বিশ্বাবসু বললেন : অত কবে বলছেন কেন। চেষ্টা তো আমি করবোই। ভাববেন না। কিছু না কিছু একটা ঠিক হয়ে যাবে।

ওঁরা চলে গেলেন। যাবার পর বিশ্বাবসু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : কেমন দেখলেন মেয়েটিকে?

আমি বললাম : ভালই তো। ফেসটা তো বেশ ফটোজিনিক। চেহারাতেও আভিজাত্য আছে। চলাফেরাতেও স্মার্ট।

বিশ্বাবসু হাসতে হাসতে বললেন : তাহলে আপনার পরের ছবিতে ওঁকে নায়িকা হিসেবে আশা করতে পারি তো?

আমি বললাম . আমিও তো সেই কথাই ভাবছিলাম। তবে সব ব্যাপারটা তো আমার হাতে নেই। আমার এর পরের ছবির যিনি প্রোডিউসার হবেন তিনি যদি একজন একজন হিরোইনকে সঙ্গে করে এনে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন তাহলে তো আমার কিছু করার থাকবে না।

আমার কথা শুনে বিশ্বাবসু হাসতে হাসতে বললেন : তা বটে।

বিশ্বাবসুর কাছে শুনলাম, মেয়েটির নাম রমা সেন। ওঁর স্বামীর নাম দিবানাথ সেন। থাকেন দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ প্লেসে।

এর বছর সাতেক পরে আমি 'আমার বউ' নামে একটা ছবি করেছিলাম। তার নায়িকা করেছিলাম ওকে। নায়ক করেছিল বিকাশ রায়। মেয়েটি তখন নাম পালটে সুচিত্রা সেন হয়ে গেছে। দর্শকদের কাছে ওর তখন দারুণ চাহিদা।

'আমার বউ' ছবিটা ভাল চলেনি। তার জন্যে আমি সুচিত্রাকে দোষ দিই না। দোষটা আমার ভাগ্যের। ও খুব চমৎকার অভিনয় করেছিল।"

হ্যাঁ, এইভাবেই সুচিত্রা সেনকে ধাপে ধাপে লড়াই করতে করতে এগোতে হয়েছে। দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়েছে সুযোগ পাবার জন্যে। সেরকম আরও একটি ঘটনা আমি জানি।

শ্রীমতী সুচিত্রা সেন প্রথম যে ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান, সেটির নাম ছিল 'শেষ কোথায়'। সেটা ১৯৫১ সাল। আর ছবিটি শেষ হয়েছিল কবে জানেন? ১৯৭৪ সালে। অর্থাৎ মিসেস সেন ছবির জগৎ থেকে রিটায়ার করার মাত্র চার বছর আগে। তখন ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'শ্রাবণ সন্ধ্যা'। ওই ছবিতে আমরা সুচিত্রা সেনকে দু রকম চেহারায় দেখতে পাই। ছবির কোনও অংশে তাঁর যৌবনকালের রোগা ছিপছিপে চেহারা। আবার কোনও অংশে পরিণত বয়সের ভরভরন্ত চেহারা। এক জায়গায় ভীক ভীরু আড়ষ্ট একজন তরুণী। আবার তার পর মুহূর্তেই হয়তো তিনি একজন সাবলীল স্বচ্ছন্দ অভিনেত্রী। সব ব্যাপারটা যে কী কুৎসিত তা যাঁরা ছবিটি দেখেননি, তাঁদের বলে কিংবা লিখে বোঝানো যাবে না। তবে আমাদের তথা সুচিত্রা সেনের পরম সৌভাগ্য যে 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' ছবিটি বেশি দর্শক দেখেননি। মাত্র তিন সপ্তাহ ছবিটি চলেছিল। তাও কোনরকমে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে। সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবির মধ্যে এটিই সবচেয়ে কমদিন চলেছে।

'শেষ কোথায়' ছবিটি কার পরিচালনায় শুরু হয়েছিল সেটা আমি জানি না। ডিরেকটার হিসেবে তাঁর কতটা যোগ্যতা ছিল তাও আমার জানা নেই। তবে সুচিত্রা সেনের সামনে তখন একটা ওপেনিং-এর দরকার ছিল। তাই অমন একটা অকিঞ্চিৎকর ছবির সঙ্গে তাঁকে যুক্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু ছবির শুটিং খানিকটা হবার পর ছবির কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই প্রথম ইনিংসে ভাল করে ব্যাট করার সুযোগ পাননি সুচিত্রা সেন। এবং তার মাসুল তাঁকেই গুণতে হয়েছিল। আবার কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল স্বামী দিবানাথ সেনকে সঙ্গে নিয়ে।

পরবর্তী জীবনে শ্রীমতী সুচিত্রা সেন যখন খ্যাতির তুঙ্গে, তখন তিনি তাঁর ওই অসমাপ্ত ছবিতে

কাজ করতে রাজি হয়েছিলেন। এটা একটা অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। ছবিটি পুনরায় শুরু হয়েছিল 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' নাম দিয়ে, যার পরিচালক ছিলেন চিত্রসারথী ছদ্মনামে একটি গোষ্ঠী অথবা একক ভাবে কেউ। সে প্রচেষ্টা যে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল তা ছবিটি দেখে বোঝা গিয়েছিল। তবে এই ছবির গানগুলি ভাল হয়েছিল। বিশেষ করে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের একখানি গান, যাতে শ্রাবণ সন্ধ্যা শব্দ দুটির উল্লেখ আছে, সেই গানখানি দর্শকদের ভাল লেগেছিল। গানটি এখনও রেডিওতে বাজে, মাঝে মাঝে দূরদর্শনের পর্দায় ওই গানের অংশটি দেখা যায়। শ্রীমতী সন্ধ্যা একদিন কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, ওই গানখানি তাঁর প্রিয় গানের তালিকার অন্তর্গত।

কিন্তু শ্রীমতী সুচিত্রা সেন তাঁর ওই অসমাপ্ত ছবির কাজ শেষ করার ব্যাপারে রাজি হলেন কেন? ছবিটি অকিঞ্চিৎকর জেনেও? আমার কাছে তার দুটি ব্যাখ্যা আছে। প্রথমত শ্রীমতী সেন চাননি তাঁর আরব্ধ কোনও কাজ অসমাপ্ত থাকুক। অনেক শিল্পীর বহু ছবিই অসমাপ্ত পড়ে আছে। এমন কি উত্তমকুমারেরও। কিন্তু সুচিত্রা সেনের কেরিয়ারে এই ব্যাপারটি পরিচ্ছন্ন হয়ে রইল। দ্বিতীয় কারণ, তাঁকে যাঁরা প্রথম সুযোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। জানি না কোন্ কারণটি সঠিক। তবে শেষেরটি যদি হয় তাহলে শ্রীমতী সেনের উদ্দেশ্যে আমার অজস্র প্রশংসো রইল।

সুচিত্রা সেনের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'সাত নম্বর কয়েদী'। ১৯৫৩ সালে। পরিচালক ছিলেন সুকুমার দাশগুপ্ত। নায়ক ছিলেন সমর রায়। সমর রায় তখনকার অনেক ছবিতেই নায়ক হয়েছিলেন। দেখতেও সুন্দর ছিলেন। একটু কবি-কবি ভাব। কিন্তু সুচিত্রা সেনের ওই ছবিটি হিট্ করেনি। মাত্র পাঁচ সপ্তাহ চলেছিল। সুকুমারদা একজন ভাল ডিরেক্টার। তাঁর অনেক ছবিই হিট্ করেছে। কিন্তু সুকুমারদার সঙ্গে সুচিত্রা সেনের ভাগ্যটা ঠিক খাপ খায়নি। কারণ এর পরে সুকুমারদা সুচিত্রা সেনকে নিয়ে আরও যে দুটি ছবি করেছেন, তার একটির নাম 'ওরা থাকে ওধারে' এবং অপরটির নাম 'সদানন্দের মেলা'। প্রথমটির আয়ু ছয় সপ্তাহ আর দ্বিতীয়টির আয়ু চার সপ্তাহ। অথচ দুটি ছবিতেই সুচিত্রা সেনের নায়ক হয়েছিলেন উত্তমকুমার। এটাকে সুকুমারদার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলব। যদিও রোম্যান্টিক নায়ক-নায়িকা হিসেবে উত্তম-সুচিত্রা জুটির যে জনপ্রিয়তা, সেটা তখনও শুরু হয়নি। সেটা শুরু হয়েছিল আরও পরে। 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবিটা রিলিজ করার পর। সে কথায় পরে আসছি।

ওই ১৯৫৩ সালে 'সাত নম্বর কয়েদী' ছবি মুক্তি পাবার ঠিক পনেরো দিন পরেই সুচিত্রা সেনের আকাশে এক ঝলক আলো দেখা গেল। মুক্তি পেল নির্মল দে পরিচালিত 'সাড়ে চুয়াত্তর'। এই ছবিতেই সুচিত্রা সেন আর উত্তমকুমার দু'জনেই দর্শকদের নজর কেড়ে নিলেন। যদিও 'সাড়ে চুয়াত্তর' ওঁদের ছবি নয়। ও ছবিটা মলিনা দেবী আর তুলসী চক্রবর্তীর। এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ওই ছবিতে মলিনাদি আর তুলসীদা দুজনেই অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। তবুও সুচিত্রা সেন দর্শকদের নজরে পড়ে গেলেন তাঁর সৌন্দর্যের কারণে। আর উত্তমকুমার ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয়ের জন্য। এর পরে 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবিতে ওই দুজন যে দারুণ পপুলারিটি পেয়েছিলেন, তার সূচনা কিন্তু এই 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবি থেকেই।

কিন্তু সুচিত্রা সেনের দুর্ভাগ্যের তখনও অবসান হয়নি। দর্শকের নজরে পড়লেন, খবরের কাগজেও তাঁকে নিয়ে দু লাইন লেখা হল, কিন্তু সেই অনুপাতে ছবির কাজ হাতে এল না। অতএব তখনও সমানে চালিয়ে যেতে হল কাজের অনুসন্ধান।

ঠিক এই সময়ে নীরেন লাহিড়ির 'কাজরী' ছবিতে নায়িকা হতে হতেও হওয়া হল না সুচিত্রা সেনের। নীরেন লাহিড়ি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বেণুদা নামে পরিচিত। বেণুদার ইচ্ছে ছিল সুচিত্রা সেনকে নায়িকা করার। কিন্তু ওই ছবির প্রোডিউসারের পছন্দ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে। 'পাশের বাড়ি' ছবির দৌলতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের তখন প্রচণ্ড পপুলারিটি। কাজেই বেণুদা জোর গলায় আপত্তি জানাতে পারলেন না। সুচিত্রা সেনের বরাতে জুটল ওই ছবির পার্শ্বচরিত্র।

এই ব্যাপারে মিসেস সেন মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন বলে শুনেছি। প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল বেণুদার ওপর। যে কারণে বার বার অফার আসা সত্ত্বেও এর পর তিনি নীরেন লাহিড়ি পরিচালিত কোনও ছবিতে অভিনয় করতে রাজি হননি। বছর পাঁচেক পরে একমাত্র 'ইন্দ্রাণী' ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন। তাও বেণুদার অনুরোধে নয়। অন্য একজনের অনুরোধে।

সুচিত্রা সেনের অসহযোগিতার কারণে পরবর্তীকালে বেণুদার প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছিল। ফিল্ম লাইন থেকে বেণুদা বেশ কিছুকালের জন্য আউট হয়ে গিয়েছিলেন। যে কোনও প্রযোজকের সঙ্গে তাঁর কাজের কথা হলেই তাঁরা নায়িকা হিসেবে সুচিত্রা সেনকে চাইতেন। কিন্তু সুচিত্রা সেনকে রাজি করানোর ক্ষমতা বেণুদার ছিল না। সুতরাং কাজ কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোঠায় এসে গেল। অথচ এই বেণুদার হাত দিয়ে অজস্র ছবি হয়েছে। তাঁর ছবি একের পর এক হিট্ করছে। অথচ সেই বেণুদাকে ফিল্ম লাইন ছেড়ে অন্য লাইনে চলে যেতে হল, যে লাইনের সঙ্গে আর্ট আর কাল্চারের কোনও সম্পর্কই ছিল না।

ওই সময়ে বেণুদা একদিন বড়বাজার অঞ্চলের এক চায়ের দোকানে বসে কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন : দেখো ভাই, রমা আমাকে ভুল বুঝে আমার ওপর অবিচার করল। 'কাজরী' ছবিতে আমি তো ওকেই নায়িকা হিসেবে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রোডিউসার রাজি না হলে আমি কী করতে পারি বলো। অনেক পরে 'ইন্দ্রাণী' ছবিতে ও কাজ করল বটে, কিন্তু ছবিটা হিট্ করল না। আর হিট্ করলেই বা কী হত। ও তো আমার কথায়, আমার ছবিতে আর কাজ করত না। সবই আমার কপাল।

এখানেই এক বিচিত্র চরিত্রের সুচিত্রা সেনকে আমি দেখতে পাই। উনি তো ভাল করেই জানতেন যে একজন পড়ন্ত বেলার পরিচালকের এমন ব্যক্তিত্ব থাকে না, যাতে তিনি প্রোডিউসারের মতামতের ওপর তাঁর নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে পারেন। 'কাজরী' ছবির সময় বেণুদার তো পড়ন্ত বেলাই। অবশ্য সুচিত্রা সেনও তখন নবাগতা। তাঁর অভিমান হতেই পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে তো তিনি চিত্র জগতে সাবালিকাত্ব অর্জন করেছেন। সুতরাং তখন তো তাঁর অভিমান অন্তর্হিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে তিনি চিরকাল মনের মধ্যে অভিমান পুষে রাখলেন। বেণুদার সঙ্গে অসহযোগিতা করে গেলেন। তাহলে কি আমাকে ধরে নিতে হবে যে শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের অভিধানে ক্ষমা বলে কোনও শব্দই নেই। কী জানি! উনি তো ভাল করে মনটা খুললেনই না কারও কাছে। তবে এটা একান্তই আমার ধারণা। আমার এই ধারণা ভুল হলে আমি খুব খুশি হব।

নবাগতা নায়িকা সুচিত্রা সেন যে কেবল সৌন্দর্যের কারণেই মনোহারিণী নন, ওঁর মধ্যে যে বিরাট অভিনয়ের প্রতিভা লুকিয়ে আছে, তার পবিচয় পাওয়া গেল ওই ১৯৫৩ সালেই দেবকী বসু পরিচালিত 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিতে। দর্শকরা চমকে গেল সুচিত্রা সেনের বিস্ময়কর অভিনয় দেখে।

দেবকী বসু এমন একজন পরিচালক যিনি ঘোড়া পিটিয়ে হাতি করতে পারেন। যদি কোনও শিল্পীর মধ্যে পাঁচ পার্সেন্ট প্রতিভা থাকে, তবে দেবকীবাবু তাঁর কাছ থেকে অন্তত পঞ্চাশ পার্সেন্ট অভিনয় আদায় করে নেবেনই। সে অভিনীত চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবধারাটি তার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়েই হোক, অথবা প্রয়োজন হলে মারধর করেই হোক। কত শিল্পী যে দেবকীবাবুর হাতে মার খেয়েছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। এমন কি প্রমথেশ বড়ুয়ার মতো শিল্পীও তাঁর বকাঝকার হাত থেকে রেহাই পাননি। এ কথা আমি দেবকীবাবুর মুখ থেকেই শুনেছি। বড়ুয়া সাহেবের মৃত্যুর পর এক শোকসভায় দেবকীবাবুর মুখ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছিল। কোন্ একটা ছবির শুটিংয়ের সময় বার বার বুঝিয়ে দেবার পরও প্রমথেশ বড়ুয়া যখন ক্রমাগত ভুল করছিলেন তখন দেবকীবাবু রাগ করে বলেছিলেন : আবার যদি ভুল করেন তাহলে আমি আপনার কান দুটো মলে দেব।

রাজকুমার প্রমথেশ বড়ুয়া ছিলেন সেই ছবির প্রযোজক। তিনিই দেবকীবাবুর ওপর পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন। ছবির প্রযোজককে যদি ছবির পরিচালক কান মলে দেবার কথা বলেন তাহলে তো প্রযোজকের রেগে যাবার কথা। বিশেষ করে সেট ভর্তি লোকজনের সামনে। কিন্তু প্রমথেশ বড়ুয়া দেবকীবাবুর সেই কথার উত্তরে কী বলেছিলেন জানেন? তিনি বলেছিলেন : তাই মলে দিন না স্যার। তাহলে বোধহয় আর এমন ভুল হবে না।

এই ছিল তখনকার দিনে শিল্পীদের সঙ্গে পরিচালকদের সম্পর্ক। গুরু-শিষ্যের মতো। আজকের দিনে কোনও শিল্পী-প্রযোজককে বোধহয় পরিচালক এমন কথা বলতে সাহস করবেন না। তাহলে হয়তো ছবির কাজই বন্ধ হয়ে যাবে।

দেবকীবাবুর হাতে মারধর খেয়েছেন এমন শিল্পীর সংখ্যা খুব কম নয়। রবীন মজুমদারের কাছে

শুনেছি, 'কবি' ছবির শুটিং-এর সময় রবিদা আর অনুভা গুপ্তা দুজনেই মার খেয়েছেন। ওই ছবিতে রবিদা করেছিলেন কবিয়াল আর অনুভাদি ঠাকুরঝি। রবিদা তো বলতেন যে ওই মারধর খেয়েছিলেন বলেই 'কবি' ছবিতে ওঁরা অমন দুর্দান্ত অভিনয় করতে পেরেছিলেন। যেটা অদ্যাপি রবিদা আর অনুভাদির জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় হয়ে আছে।

যেমন হয়ে আছে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রে শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের অভিনয়। পরবর্তীকালে বহু ছবিতে শ্রীমতী সেনের অনেক চমকপ্রদ অভিনয় দেখেছি। কিন্তু আমার কাছে শ্রেষ্ঠ হয়ে আছে তাঁর বিষ্ণুপ্রিয়া। অনেকে হয়তো এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন না। তাঁরা 'সপ্তপদী', 'দীপ জ্বেলে যাই', 'সাত পাকে বাঁধা' কিংবা 'উত্তর ফাল্গুনী' অথবা 'আঁধি' ছবির প্রসঙ্গ তুলবেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আমি বলব, আমার কাছে ওই বিষ্ণুপ্রিয়াই তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রচিত্রণ। কেন?

তাহলে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিটার কথা একবার ভাল করে ভাবুন। ওই ছবির মুখ্য চরিত্র চৈতন্যদেব, যেটি রূপায়িত করেছিলেন বসন্ত চৌধুরী। দেবকী বসুর চিত্রনাট্যেও চৈতন্যদেবকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেই তুলনায় বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রের সুযোগ কত কম। কিন্তু ওই চরিত্রেও সুচিত্রা সেন কী অসাধারণ অভিনয় করলেন। ছবির অন্য সব চরিত্রকে ছাপিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর প্রতিটি সংলাপ যেন উঠে আসছিল হৃদয়ের গভীর থেকে। স্বামীর প্রতি তাঁর আত্মনিবেদনের ভঙ্গিটি প্রকাশিত হচ্ছিল বোধের গভীরতা থেকে। সারা ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন যেন একটা ঘোরের মধ্যে। কোথাও এতটুকু বাড়াবাড়ি নেই। কোথাও এতটুকু খামতি নেই। তাঁর চলা-ফেরা-তাকানো সব যেন আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিল যে তিনি বালিগঞ্জ প্লেসের এক অভিজাত বাড়ির গৃহবধূ। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল তিনি যেন নবদ্বীপের চৈতন্য ঘরণী। ওটা ছাড়া পৃথিবীতে তাঁর আর কোনও অস্তিত্বই নেই।

এই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে হাততালি পাওয়া যায় না। এক স্বামী পরিত্যক্তা গৃহবধূর জন্যে বড় জোর কিছু বেদনাবোধ থাকে দর্শকদের মনে। তাও যে মহৎ প্রয়োজনে চৈতন্যদেব গৃহত্যাগ করেছেন তাতে দর্শকের পূর্ণ সহানুভূতি চৈতন্য চরিত্রের প্রতিই ন্যস্ত থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও ছবি দেখার পর দর্শকের সারা মন জুড়ে যে বিষ্ণুপ্রিয়া বিরাজ করতে থাকেন এটা শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের অসাধারণ অভিনয়ের জন্যই। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না। সুতরাং আমি যদি বলি আমার দেখা সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে ওই বিষ্ণুপ্রিয়াই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রচিত্রণ, তাহলে কি আমাকে অনৃতভাষণের জন্য দায়ী করা যাবে? বোধহয় না।

কিন্তু এই যে বালিগঞ্জ প্লেসের একজন গৃহবধূ একটা ছবিতে এমন অসামান্য অভিনয় করতে পারলেন, সে কৃতিত্ব কি একা সুচিত্রা সেনের? না। এর পেছনের মূল কারিগরটি হলেন দেবকীকুমার বসু। 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবির আগে মিসেস সেন যে ক'টি ছবিতে অভিনয় করেছেন তাতে তো তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ তেমন একটা দেখা যায়নি। তাহলে এমন একটা যুগান্তকারী ঘটনা কেমন করে সম্ভব হল?

সেটা জানতে গেলে দেবকী বসুর প্রতিভা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। দেবকীবাবুর সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন তাঁরাই জানেন দেবকী বসু একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করতেন। পরে যখন চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হলেন তখন তিনি অভিনয়ও করেছেন। বাংলা সাহিত্য নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা। বিশেষ করে বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুদিন মেশবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন তিনি আমার কাছে নিমাই চরিত্রটি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন, সেটা আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে। তার আগে নিমাই সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল খোল-করতাল সহযোগে হরিনামে নিমগ্ন একজন মহাভক্ত। কিন্তু দেবকীবাবুই আমাকে প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিলেন, নিমাই মানুষটি সত্যিকারের কেমন। নিমাইয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য আর সেই পাণ্ডিত্যের অহংকার বিসর্জন দিয়ে কেমন করে তিনি ঈশ্বরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন তা বিশদভাবে শুনতে পেরেছিলাম দেবকীবাবুর মুখ থেকে। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলাম সমাজ-সংস্কারক নিমাইয়ের চেহারাটি কেমন ছিল। কোন্ শক্তিতে শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অহিংস অভিযান সংগঠিত করেছিলেন, জাতপাতের ঊর্ধ্বে থেকে কেমন করে মানুষকে ভালবেসে মানুষকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। সেইসব

কাহিনী শুনতে শুনতে আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এখন ভাবি, নিমাই সম্পর্কে দেবকীবাবুর যে পরিমাণ জ্ঞান ছিল তাতে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের নিমাইকে নিয়ে অন্তত পাঁচ-ছ'খানা ছবি করা উচিত ছিল তাঁর। তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম বুঝতে পারত নিমাই কত বড় বিপ্লবী ছিলেন। কতখানি প্রগতিশীল ছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, সাধারণ মানুষের ধ্যানধারণা নদের নিমাইয়ের জগাই-মাধাইকে নিয়ে 'মেরেছিস কলসীর কানা, তা বলে কী প্রেম দেব না' পর্যন্ত এসেই আটকে গেছে। একজন অত্যন্ত প্রগতিশীল বিপ্লবী মহাপুরুষের সম্পর্কে আমরা এই ধারণা নিয়েই বেঁচে আছি। তাঁর সত্যিকারের চেহারাটা প্রকাশের আগ্রহ তো কারও মধ্যেই দেখি না। কেউ যদি করেও থাকেন তবে তা কঠিন তত্ত্বকথার মধ্যেই আবদ্ধ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে যার কোনও যোগ নেই। আমাদের চলচ্চিত্রে কি নিমাই পণ্ডিতের প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড নিয়ে ছবি করার কেউ নেই? যাতে দেশ ও জাতির উপকার হতে পারত?

যেভাবে আমার কাছে নিমাই চরিত্রের বিশ্লেষণ করে দেবকীবাবু আমার মনে নিমাই পণ্ডিত্যের আসল চেহারাটি এঁকে দিয়েছিলেন, আমার তো মনে হয় শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের মনেও সেইভাবেই গেঁথে দিতে পেরেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রটি। তাই বালিগঞ্জ প্লেসের এক গৃহবধূ আস্তে আস্তে বিষ্ণুপ্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। মিসেস সেনের মধ্যে যে একটি সংবেদনশীল অনুভূতির অস্তিত্ব আছে সেটা দেবকীবাবু আবিষ্কার করেছিলেন। তাই সেই কাদামাটির তালটিকে নিজের মনের মতো করে গড়ে নিতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। তাঁরই কল্যাণে আমরা সুচিত্রা সেনের মতো একজন বড় মাপের শিল্পীকে পেয়ে গেলাম, যিনি আজ আমাদের গর্বের বস্তু। কালক্রমে যিনি সোভিয়েট রাশিয়া থেকে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান কুড়িয়ে এনে আমাদের গৌরবান্বিত করেছেন।

কিন্তু এই বিষ্ণুপ্রিয়া করার পরও কি সুচিত্রা সেনের ভাগ্যের আকাশ থেকে মেঘমুক্তি ঘটেছিল। বোধহয় না। কারণ এর পরেই আমরা তাঁকে যে ধরনের কুৎসিত ছবিতে একটি কুৎসিততম ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখি, সেটা ভাবলে আজও শিউরে উঠি।

ছবিটির নাম 'অ্যাটম বোম্'। পরিচালক তারু মুখোপাধ্যায়। না, এটি হিরোসিমা-নাগাসাকিতে আমেরিকার অ্যাটম বোম্ ফেলা নিয়ে যুদ্ধবিরোধী কোনও বক্তব্যের ওপর ছবি নয়। এ ছবির আদৌ কোনও বক্তব্য ছিল বলেও মনে হয় না। অতি কুৎসিত একটি ছবি। আর সেই ছবিতে কুৎসিততম বেশবাসে সজ্জিতা সুচিত্রা সেনের অতি অকিঞ্চিৎকর একটি ভূমিকা। ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারি ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে। তখনও 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিটি সগৌরবে চলছে। আর তারই পাশাপাশি মিনার সিনেমার দেওয়ালে সুচিত্রা সেনের বুকে কাচুলি আঁটা কুৎসিত ওয়াল-পেইন্টিংটি আমাদের যথেষ্ট মর্মবেদনার কারণ ঘটিয়েছিল। 'অ্যাটম বোম' এক সপ্তাহও চলার মতো ছবি নয়, কিন্তু যেহেতু সুচিত্রা সেনের নাম-ধাম হয়েছে তাই ছবির একজন গৌণ শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও ওই ছবির পরিবেশক ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেওয়ালের গায়ে সুচিত্রা সেনকে প্রায়-নগ্ন করে এঁকে চার সপ্তাহ চালিয়ে দিয়েছিলেন ছবিটিকে। রুচি কতটা নিম্নগামী হলে একজন শিল্পীকে এভাবে অপমান করা যায় সেটা ভেবে দেখুন একবার। জানি না বিজলী সিনেমার দেওয়ালের গায়ে এই উদ্দেশ্যে সুচিত্রা সেনকে আঁকা হয়েছিল কি না, এবং হয়ে থাকলে তা যদি মিসেস সেনের নজরে পড়ে থাকে তাহলে তিনি কী পরিমাণ মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু তখন তো তাঁর আর করার কিছু নেই। ছবির সন্ধানে বেরিয়ে হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাতেই রাজি হয়ে গেছেন। কী করে বুঝবেন চলচ্চিত্র নামক শিল্পের ব্যবসাতে এমন কিছু কুৎসিত মানুষও আছে।

তবে ওই ঘটনাটি সম্ভবত সুচিত্রা সেনকে সচেতন করে তুলেছিল। কারণ এর পর থেকেই তিনি দেখে শুনে বাছাবাছি করে ছবি করতে থাকেন। যদিও পায়ের নিচের মাটিটা তখনও শক্ত হয়নি। তবু কিছুটা মাটি তো পেয়েছেন। বাছাবাছি না করলে তাঁর কেরিয়ারটাই মাটি হয়ে যেত যে।

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকে শিল্পী হিসেবে জীবন দান করেছিল। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত তাঁকে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে কাজের সন্ধান করতে হয়েছে। তেমন একটি ঘটনার কথা আমি জানি। ঘটনাটি শুনেছি বিশিষ্ট কৌতুকশিল্পী সুশীল চক্রবর্তীর মুখ থেকে।

১৯৫৩ সালে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য দু'জনে মিলে একটি ছবি

করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। ছবিটির নাম 'ময়লা কাগজ'। ওই সময়ে প্রেমেনদা এবং ধীরাজদার সঙ্গে কৌতুকশিল্পী নবদ্বীপ হালদারের খুবই হৃদ্যতা ছিল। মাঝে মাঝে নবাদার বাড়িতে ওঁদের পান-ভোজনের আড্ডা বসত।

প্রেমেনদার মতো সাহিত্যিক যে আড্ডায় বসতেন সেখানে যে নিম্নমার্গের কোনও আলোচনা হতো এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না। ধরে নিতে পারি সেই আড্ডায় ওঁদের ছবির পরিকল্পনা নিয়েই আলোচনা হত।

একদিন ওইরকম আড্ডা বসেছে। সুশীল প্রায় নিয়মিত নবদ্বীপবাবুব বাড়িতে যেতেন। তাঁর কিছু ফাই-ফরমাসও শুনতে হত তাঁকে। আড্ডা যখন পুরোদমে চলেছে তখন বাড়ির কাজের লোকটি এসে খবর দিল, একজন ভদ্রমহিলা প্রেমেনবাবুকে খুঁজছেন।

কথাটা শুনে নবদ্বীপ বলে উঠলেন : প্রেমেন কী দুনিয়ার মেয়েকে আমার বাড়ির ঠিকানা দিয়ে এসেছ নাকি যে এখানে তোমাকে মেয়েরা খুঁজতে আসছে?

প্রেমেনদা বললেন : ক্ষেপেছ! আমার বাড়ি থাকতে তোমার বাড়ির ঠিকানা দিতে যাব কোন্ দুঃখে। তোমার বাড়িটা তো আমার বাড়ির তুলনায় এমন কিছু রাজপ্রাসাদ নয়!

নবদ্বীপ বললেন : তবে কে মরতে এল এই বিকেলবেলায়! এই সুশীল, দেখ তো কে এসেছে। তেমন বুঝলে হটিয়ে দিবি।

নবদ্বীপের কথা শুনে সুশীলবাবু বাইরে এলেন। দেখলেন সুচিত্রা সেন। কয়েকটি ছবিব দৌলতে সুচিত্রা সেনের মুখটি তখন পরিচিত। অল্পস্বল্প হলেও তাঁকে নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়েছে দর্শকদের মধ্যে।

সুশীলবাবুকে দেখে সুচিত্রা সেন বললেন . এখানে প্রেমেনবাবু আছেন? প্রেমেন্দ্র মিত্র?

সুশীলবাবু বললেন : হ্যাঁ আছেন। কিন্তু তিনি তো এখন ব্যস্ত।

সুচিত্রা সেন বললেন : আমি ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম উনি এখানে এসেছেন। ওঁর সঙ্গে আমার একটু দেখা করা দরকার।

কথাটা শুনে সুশীল চক্রবর্তী একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন : আপনি একটু বসুন। আমি ভেতরে গিয়ে খবর দিচ্ছি।

সুশীলবাবু ভেবেছিলেন একজন উঠতি নায়িকা যখন দেখা করতে এসেছেন তখন প্রেমেনবাবু হয়তো দেখা করতেও পারেন। কিন্তু ভেতরে এসে খবরটা দিতেই নবদ্বীপ হালদার বলে উঠলেন : নিশ্চয় পার্ট চাইতে এসেছে। তুই গিয়ে বলে দেগা আমাদের সব পার্ট দেওয়া হয়ে গেছে। আপনি যেতে পারেন।

প্রেমেনদা বললেন : না না, অত কড়া কথা বলার দরকার নেই। তুমি বরং গিয়ে বলগে যাও যে, উনি যেন পরে আমার বাড়িতে দেখা করেন। আজ আমি ব্যস্ত। এখন দেখা করা যাবে না।

সুশীলবাবু বাইরের ঘরে গিয়ে সেই সংবাদটি দিলেন। শুনে শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের মুখটা কেমন মলিন হয়ে গেল। ব্যাগ থেকে রুমালটা বার করে কপালের ঘামটা মুছে নিলেন। তারপর শ্লথ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন নবদ্বীপ হালদারের বাড়ি থেকে।

এর প্রায় দু দশক পরে সুশীল চক্রবর্তীর সঙ্গে সুচিত্রা সেনের আবার দেখা হল স্টুডিওর ফ্লোরে। একটি ছবির শুটিং-এ। সুচিত্রা সেন সে ছবির নায়িকা। আর সুশীল চক্রবর্তী একটি ক্ষুদ্র ভূমিকার কাজ করতে গেছেন। ফ্লোরের মধ্যে সুচিত্রা সেনকে দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে অনেকদিন আগেকার সেই ঘটনাটি তার সামনে গিয়ে বললেন সুশীলবাবু। শুনে সুচিত্রা সেন তাঁর ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত করে গম্ভীর হয়ে সেখান থেকে সরে গেলেন একটিও কথা না বলে।

সহজ সরল মানুষ সুশীল চক্রবর্তী ভেবেছিলেন, সেই পুরনো দিনের কথা শুনে সুচিত্রা সেন তাঁর সঙ্গে সেদিনকার মতোই সহজ ভঙ্গিতে বাক্যালাপ করবেন। কিন্তু সুশীলবাবু কি জানতেন না সেদিনের সেই কর্মপ্রার্থী সুচিত্রা সেন আজ বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বহুজন পূজ্যা ম্যাডাম সুচিত্রা সেন। ম্যাডামের এখন পুরনো দিনের কথা স্মরণ করতে নেই। করতে গেলে সুশীল চক্রবর্তীর মতো একজন জুনিয়ার আর্টিস্টের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হয়। যেটা এখন আর বলা চলে না। বললে যে ম্যাডামের মর্যাদাহানি

হয়!

আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন কোনও মেয়ে এলেই তাঁর সম্পর্কে একটা কৌতূহল জেগে ওঠে সকলের মনে। বিশেষ করে সেই মহিলাটি যদি সুন্দরী হন। 'শেষ কোথায়' ছবিতে সুচিত্রা সেন নামে একটি নতুন মহিলা অভিনয় করছেন শুনে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তখনকার দিনে তো আজকের মতো কেবল দৈহিক সৌন্দর্য থাকলেই অভিনয় করার ছাড়পত্র পাওয়া যেত না। প্রযোজক ও পরিচালকেরা অপেক্ষা করে থাকতেন নতুন মেয়েটি তাঁর প্রথম ছবিতে কতদূর কী অভিনয় করেন সেটা দেখবার জন্য। যদি তাঁর মধ্যে কিছুমাত্র প্রতিভার সন্ধান পেতেন তাহলে প্রযোজক ও পরিচালকেরা ঝাঁপিয়ে পড়তেন সেই অভিনেত্রীকে তাঁদের পরবর্তী ছবিতে পাবার জন্য। যেটা হয়েছিল সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। তাঁর প্রথম ছবি 'পাশের বাড়ি' মুক্তি পাবার পরপরই তিনি বেশ কিছু ছবির কাজ পেয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু সুচিত্রা সেনের দুর্ভাগ্য, তাঁর প্রথম ছবির কাজ কিছুটা এগোবার পরই বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর অভিনয় প্রতিভার পরিমাপ করা গেল না বটে তবে তাঁর সৌন্দর্যের খ্যাতি বেশ ভালভাবেই ছড়িয়ে পড়ল। এবং সেই সৌন্দর্যের কারণেই ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই তাঁকে মনে রাখলেন। ফলে সেই প্রথম চিত্রাবতবণের বছরখানেকের মধ্যেই তিনি সুকুমার দাশগুপ্তের মতো একজন বিশিষ্ট চিত্রপরিচালকের ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় সুযোগ পেয়ে গেলেন। সেই ছবিটির নাম তো আপনাদের আগেই জানিয়েছি। 'সাত নম্বর কয়েদী'।

কোনও নতুন শিল্পীকে ছবিতে নিতে গেলে তখনকার প্রযোজক ও পরিচালকরা যত বেশি সতর্ক থাকতেন, বাছবিচার করতেন, তৎকালীন সাংবাদিকরা বোধহয় তার থেকেও অনেক বেশি সতর্ক থাকতেন। এখন যেমন কোনও উঠতি নায়িকা একখানা ছবিতে মুখ দেখাতে না দেখাতেই সিনেমা পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় তাঁকে নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি রকমের হইচই শুরু হয়ে যায়, জীবন শুরু হতে না হতেই তাঁর জীবনী প্রকাশেব ধুম পড়ে যায়, তখনকার দিনে কিন্তু তা ছিল না। সংবাদিকরা অনেক বাছবিচার করে কোনও শিল্পীকে স্বীকৃতি দিতেন। দৈহিক সৌন্দর্য নয়, একমাত্র অভিনয়ের ক্ষমতাই ছিল তখনকার দিনের সাংবাদিকদের মনযোগ আকর্ষণের মাপকাঠি। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়। তবে তার সংখ্যা কোটিকে গুটিক।

ঠিক সেই রকমই একজন সাংবাদিক ছিলেন কালীশ মুখোপাধ্যায়। তখনকার দিনের জনপ্রিয় সিনেমা পত্রিকা 'রূপমঞ্চ'-র তিনি সম্পাদক ছিলেন। নতুন কোনও শিল্পী সিনেমা লাইনে এলেই কালীশদা নিজের স্টুডিওতে তাঁকে ডেকে এনে ছবি-টবি তুলে বিরাট করে তাঁর পাবলিসিটি দিতেন। তার মধ্যে অবশ্য মহিলা শিল্পীদের সংখ্যাই বেশি। কালীশদার সেই প্রয়াসে সেইসব নবাগতা মহিলা শিল্পীরা সানন্দেই সহযোগিতা করতেন। কারণ এতে করে প্রযোজক ও পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ হত।

কিন্তু কালীশদা বোধহয় এ ব্যাপারে তাঁর জীবনের প্রথম ধাক্কাটা খেলেন সুচিত্রা সেনের কাছ থেকে। আর তার পরিণতিতে যা ঘটল সেটা মর্মান্তিক। মনে হয় ওই ঘটনার পর থেকেই সুচিত্রা সেনের মনের দরজা সাংবাদিকদের কাছে চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। সাংবাদিকদের আর উনি বন্ধু মনে করতে পারেননি। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই হয়তো সুচিত্রা সেনের পরিচয় আছে, দু-একজনের কাছে সুখ দুঃখের কথাও হয়তো উনি বলেছেন, কিন্তু মিসেস সেনের মনের গভীরে যে স্ট্রংরুমটি আছে তা চিরকালই তালাবন্ধ করে রেখেছেন।

কিন্তু সেদিনের ঘটনাটা এমন কী ছিল যাতে শ্রীমতী সুচিত্রা তাঁর জীবনের এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন? সেটা জানতে গেলে আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ফিরে যেতে হবে আমাদের। ১৯৫২ সালে। যখন শ্রীমতী সুচিত্রা তাঁর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'সাত নম্বর কয়েদী'র শুটিং করছেন টালিগঞ্জে।

কালীশ মুখোপাধ্যায়ের 'রূপমঞ্চ' পত্রিকাটির অবস্থান ছিল উত্তর কলকাতার হাতিবাগান বাজারের ওপরে একটি বেশ বড়সড় ফ্ল্যাটে। কালীশদার পত্রিকাটি যেমন জনপ্রিয় ছিল, কালীশদা মানুষটিও

ছিলেন তেমনি জনপ্রিয়। ওঁর অফিসে সিনেমা-থিয়েটাবের শিল্পীদের আনাগোনা লেগেই থাকত। কালীশদা ছিলেন প্রাণখোলা আড্ডাবাজ মানুষ। আমি যখন সাংবাদিকতা শুরু করিনি তখন থেকেই কালীশদার সঙ্গে আমার আলাপ। অবশ্যই ওঁর পত্রিকার পাঠক হিসেবে। সেই সময়ে একবার ওঁর অফিসের একটা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ওঁর কাছে থেকে আমন্ত্রণও পেয়েছিলাম। বিখ্যাত গায়ক এবং সংগীত পরিচালক শচীনদেব বর্মন তখন বোম্বাই প্রবাসী। সেই সময়ে তিনি একবার কলকাতায় এসেছিলেন। কালীশদা তাঁকে পুরো বাঙালি কায়দায় মাছ ভাত খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মাছ অর্থে বাঙালির প্রিয় খাদ্য ইলিশ মাছ। কালীশদার মধ্যে এই বাঙালিয়ানার ভাবটা খুব প্রবল ছিল। ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম। কালীশদা আরও অনেক শিল্পীকে সেই মধ্যাহ্ন ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। একসঙ্গে একঝাঁক বিখ্যাত শিল্পীকে চোখে দেখা এবং তাদের সঙ্গে একত্রে বসে খাওয়া আমার মতো একজন অর্বাচীনের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার তো বটেই।

পরে সাংবাদিকতাব সঙ্গে যুক্ত হবাব পর কালীশদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছে। আমি যেহেতু হাতিবাগানের কাছাকাছিই থাকতাম, সেই হেতু কালীশদার সঙ্গে আড্ডার স্থায়িত্বও বেড়েছে। কালীশদা পরে বি এফ জে এ'র সহ-সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন বেশ কিছুদিন।

আমার সেই পরিচিত ভালবাসার মানুষ কালীশ মুখোপাধ্যায়ের একটি ব্যবহারে আমি খুব মর্মাহত হয়েছিলাম। সেটা সুচিত্রা সেন সংক্রান্ত। আগেই বলেছি, কালীশদা নতুন শিল্পীদের, বিশেষ করে মহিলা শিল্পীদের তাঁর ওই হাতিবাগান বাজারের ওপরকার স্টুডিওতে আনিয়ে ছবি-টবি তুলিয়ে খুব পাবলিসিটি দিতেন। অনেকের আবার ইন্টারভিউ ছাপা হত। কালীশদা এর জন্য সেই শিল্পীদের কাছ থেকে কোনওবকম অর্থাদি নিতেন কি না সেটা আমার জানা নেই। নিলেও কিছু বলার ছিল না। কারণ প্রথমত ছবি তোলার একটা খরচ আছে। তার ওপর ঝকঝকে আর্ট পেপারে সেই ছবি ছাপা। তার খরচ তো আবও বেশি। আর এর জন্য যে পত্রিকার সার্কুলেশন খুব বাড়ত সেটাও মনে হয না। লোকে জনপ্রিয় শিল্পীদের ছবি দেখবার জন্যই আগ্রহী। নতুন মুখ দেখার জন্য তেমন আগ্রহ থাকার তো কথা নয়। যাই হোক, এবারে সুচিত্রা সেনেব সেই ঘটনাটির প্রসঙ্গে আসি।

সুচিত্রা সেন যখন 'সাত নম্বব কয়েদী' ছবিতে অভিনয় করতে এলেন, তখন অন্যান্য নবাগতাদের মতো কালীশদা তাঁকেও আমন্ত্রণ জানালেন রূপমঞ্চ পত্রিকার অফিসে এসে ছবি তোলাবার জন্য।

মিসেস সেন তার আগে কালীশদা সম্পর্কে কতটা কী জানতেন তা জানি না। কিন্তু তিনি সরাসরি কালীশদার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন · না না, আমি কারও স্টুডিও-ফুডিওতে গিয়ে ছবি তোলাতে পারব না। ছবি তুলতে হয় তো এখানেই তুলুন।

কালীশদা বললেন : আমি তোমার যে ধরনের ছবি তুলতে চাইছি সেটা তো এখানে সম্ভব নয়। ডিফারেন্ট পোজে, ডিফারেন্ট মেকআপে। লাইট অ্যান্ড শেডের কিছু খেলাও সেইসব ছবিতে থাকবে। তার জন্যে অন্য ধরনের লাইট অ্যারেঞ্জমেন্টের দরকার। বেশ তো, আজ না হয় অন্য যে কোন একদিন তুমি আমার হাতিবাগান বাজারের ওপরের স্টুডিওতে চলে এসো।

মিসেস সেন বললেন : মাফ করবেন কালীশবাবু, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কালীশদা একজন সিনেমা পত্রিকার দুঁদে সম্পাদক। জনপ্রিয়তার জোয়ারে তখন তিনি ভাসছেন। তাঁর মুখের ওপর একজন নবাগতা শিল্পী এভাবে যে 'না' বলতে পারেন সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। বিশেষ করে নবাগতা শিল্পীরা যেভাবে লালায়িত হয়ে থাকেন কালীশদার আমন্ত্রণ পাবার জন্য। কেউ কেউ তো আবার নিজে থেকেই যোগাযোগ করেন অথবা একে ওকে তাকে ধরাধরি করেন কালীশদার এক কণা অনুগ্রহ পাবার জন্য। একটা ছবি কিংবা দু লাইন লেখানোর জন্য।

কিন্তু এই মেয়েটির কথা শুনে কালীশদা ভাবলেন, তিনি ভুল শুনছেন না তো। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন : আমার ওখানে গিয়ে ছবি তুলতে তোমার আপত্তির কারণ কী? ওখানে আমার স্ত্রী আছেন, সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যান্য কর্মীরা আছেন। তাছাড়া ইচ্ছে করলে তুমি তোমার স্বামীকেও সঙ্গে আনতে পারো।

মিসেস সেন বললেন : এসব নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। আমার পক্ষে যাওয়া

সম্ভব নয়, সেটাই জানিয়ে দিলাম।

মিসেস সেনের এই ধরনের কথা শুনে রাগে আর অপমানে কালীশদার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। দু কান দিয়ে আগুন ছুটে বেরোতে লাগল। আর একটি কথাও না বলে তিনি সেট থেকে গট গট করে বেরিয়ে গেলেন। ওই ছবির পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত কালীশদাকে খুবই ভালবাসতেন। সেই সুকুমারদার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলেন না।

পরবর্তী সংখ্যা রূপমঞ্চে যাচ্ছেতাই করে একটি লেখা বেরলো সুচিত্রা সেন সম্পর্কে। মনের সবটুকু তিক্ততা কলমের আগায় এনে কালীশদা বোধহয় সেই নিবন্ধটি লিখেছিলেন। সেই দীর্ঘ নিবন্ধেব সবটুকু আজ আর স্মরণে নেই। তবে একটি লাইন স্পষ্ট মনে আছে। কালীশদা লিখেছিলেন, 'নটী নটীর মতোই থাকবে। তাকে আমরা এর চেয়ে বেশি কোনও মর্যাদা দিতে চাই না।'

ব্যস, এরপব থেকেই সুচিত্রা সেনের মনের দরজা সাংবাদিকদের জন্য চিরকালের মতো লক্‌ড হয়ে গেল। শুধু কালীশদাই নন, তার আগে আরও একজন সম্পাদক তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। সেটা সেই 'শেষ কোথায়' ছবিব সময়। একজন ফটোগ্রাফার মিসেস সেনেব একটি ছবি তুলে সম্পাদক মশাইকে অনুরোধ করেছিলেন, ছবিটি কভার পেজে ছাপবার জন্য। তাতে ওই সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন, এত বড় বড় দাঁত নিয়ে হিরোইন হওয়া চলে না। বড জোর কলিনোস টুথপেস্টেব বিজ্ঞাপনে চলতে পারে।

সে কথাটি মিসেস সেনেব কানে গিয়েছিল সেই ফটোগ্রাফার মারফত।

পর পর এই দুটি ঘটনা সাংবাদিকদেব সম্পর্কে মিসেস সেনকে বিতৃষ্ণ করে তুলল। তাঁর মনের দরজা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল সাংবাদিকদের জন্য। এর দায়ভাগ বহন করতে হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের সাংবাদিকদের। অত বড় মাপের একজন শিল্পী, যাঁব জনপ্রিয়তা প্রায় আকাশছোঁয়া, তাঁর জীবনের স্বপ্ন সাধনা আর সংগ্রামের কোনও খবরই আর জানার উপায রইল না। লোকের মুখে শুনতে পাই অনেক সাংবাদিক নাকি দাবি করেন, তিনি সুচিত্রা সেনের খুব ঘনিষ্ঠ, তাঁর অন্তর্লোকের অনেক সংবাদই নাকি তাঁদের জানা। কিন্তু আমি সে কথা বিশ্বাস করি না। শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের মনেব দরজা উন্মুক্ত করে খোলা আর যাঁর কাছেই হোক না কেন, তিনি যে কোনও সাংবাদিক নন, এ ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চিত।

এখন তো আর ভদ্রতা রক্ষা করার প্রয়োজনও অনুভব করেন না শ্রীমতী সুচিত্রা সেন। এই তো মাসখানেক আগে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্‌ অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ বি এফ জে এ'র বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল মিসেস সেনের কাছে। কিন্তু ক্যুরিয়ার সার্ভিসের লোকটি এসে খবর দিল, তিনি চিঠিটি রিফিউজ করেছেন। দারোয়ানকে দিয়ে খবর দিয়েছেন তিনি ওই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অক্ষম। অথচ এই বি এফ জে এ-র অনুষ্ঠানে তিনি একাধিকবার সশরীরে উপস্থিত থেকেছেন পুরস্কার নিতে। আর এখন একটি চিঠি গ্রহণ করার মতো ভদ্রতা রক্ষার্থেও তিনি অক্ষম। ফিল্ম লাইন ছাড়ার দীর্ঘ পনেরো বছর পরেও তাঁর মনের অভিমান দূব হয়নি। ফিল্ম জগতের কোনও ব্যাপারের সঙ্গেই তিনি নিজেকে আর জড়াতে চান না। এই পনেরো বছরে তাঁর সেই অভিনয় জীবনের প্রথম দিককার অপমানের যন্ত্রণা সম্ভবত আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে।

যাক, আবার সেই পুরনো কথায় ফিরে যাই। সুচিত্রা সেন সম্পর্কে কালীশদার ওই রচনাটি আমাকে রীতিমত আহত করেছিল। কার কতটা দোষ সেটা তো জানি না, কিন্তু একজন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে এই জাতীয় মন্তব্য কিছুতেই সমর্থন করতে পারিনি। কালীশদাকে শ্রদ্ধা করতাম বলেই আঘাতটা আরও বেশি করে বুকে বেজেছিল। কিন্তু কালীশদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তখন এমন কিছু ঘনিষ্ঠ ছিল না, যাতে ওই ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারি। আমার মনের দুঃখের কথা জানাতে পারি।

এই ঘটনার প্রায় বারো বছর পরে কালীশদার সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। কালীশদা ততদিনে নখদন্তহীন সিংহে রূপান্তরিত হয়েছেন। রূপমঞ্চ পত্রিকার সেই গৌরবরবি অস্তমিত হয়েছে। কিন্তু কালীশদার সেই আড্ডার মেজাজটি তখনও অটুট আছে। রূপমঞ্চের সেই ভাঙা হাটে আমি এবং আরও দু চারজন আড্ডা দিতে যেতাম। সেখানেই কথাপ্রসঙ্গে সুচিত্রা সেনকে নিয়ে লেখা কালীশদার

সেই আর্টিকলটার কথা উল্লেখ করেছিলাম।

আমি বলেছিলাম : কালীশদা, সেদিন কিন্তু আপনি ভদ্রতা এবং শালীনতার সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। মিসেস সেনকে ওই ভাষায় আক্রমণ করা আপনার উচিত হয়নি। আফটার অল্ আপনি তো একজন ভদ্রলোক। কালচার্ড মানুষ।

কালীশদা বললেন : ঠিক বলেছ ভাই রবি। সেদিন আমার সংযত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো, ও আমার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। তাই আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।

আমি বললাম : চরিত্র নিয়ে সন্দেহ মানে?

কালীশদা বললেন : ওই যে আমার স্টুডিওতে আসতে চাইল না। তার মানে ওর ধারণা হয়েছিল ছবি তোলার অজুহাতে আমি ওর সঙ্গে ফুর্তিফার্তা করবার জন্য ডাকছি। এরপর আর মাথার ঠিক থাকে?

আমি বললাম : মিসেস সেনেরও হয়তো দোষ নেই। কেউ হয়তো ওঁর কান ভাঙিয়েছে।

কালীশদা বললেন : ভাঙালেই বা শুনবে কেন? ও তো আর কচি খুকি নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি যে অন্যায় করেছেন, এ কথাটা কেউ আপনাকে বলেনি?

কালীশদা বললেন : বন্ধুবান্ধব দু-একজন বলেছে। কিন্তু আমার পাঠকদের কেউ একটি প্রতিবাদও করেনি।

আমি বললাম : তা আর করবে কী করে। সুচিত্রা সেনকে তখন কেউই তো চেনে না। একটা ছবিও রিলিজ করেনি। আজকের দিনে ঘটনাটা ঘটলে পাঠকরা আপনাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত।

কালীশদা হাসতে হাসতে বললেন : তা আর বলতে! তবে একটা কথা আমি অকপটে স্বীকার করব ভাই রবি।

আমি বললাম : কী কথা?

কালীশদা বললেন : সুচিত্রা আমার সঙ্গে সেদিন যে ব্যবহারই করে থাকুক, ওর স্পিরিট দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, ভেতরে একটু যদি মাল মশলা থাকে তাহলে এ মেয়েটা অনেকদূর এগোবে। ওকে কেউ আটকাতে পারবে না।

আমি বললাম : আপনার সেই অনুমান তো ঠিক ঠিক মিলে গেছে কালীশদা?

কালীশদা বললেন : গেছে মানে! একশো ভাগের ওপর দুশো ভাগ মিলে গেছে। একজন আর্টিস্টের জন্যে এমন ক্রেজ আমি তো এর আগে আমাদের এই বাংলা মুলুকে কখনও দেখিনি। আমি কাননবালার যৌবনকালেও দেখেছি আর চন্দ্রাবতীরও প্রাইম পিরিয়ড দেখেছি, কিন্তু এমন স্তুতির প্লাবন আর কখনও দেখিনি। আর অভিনয়ও করছে বটে মেয়েটা। ওর 'উত্তর ফাল্গুনী' দেখে তো আমি পাগল হয়ে গেছি। বলতে পারো আমি এখন ওর একজন ফ্যান।

কালীশদার এই অকপট স্বীকারোক্তি একজন শিল্পীর পক্ষে খুবই মর্যাদার ব্যাপার। বিশেষ করে যে শিল্পীর চলচ্চিত্রে অভিষেক হয়েছিল কালীশদার সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে।

তা এ তো গেল এক পক্ষের স্বীকারোক্তি। কিন্তু অপর পক্ষ কী বলেন?

না, তাঁর মনের কথা জানার কোনও উপায় আমার জানা নেই। তিনি এক নির্জন দ্বীপের অধিবাসিনী। সেখানে প্রবেশের অধিকার আমার নেই। যেহেতু আমি একজন সাংবাদিক। আর সাংবাদিকদের তিনি সযত্নে পরিহার করে চলেন বলে শুনেছি। তাই প্রবেশের চেষ্টাও কোনও দিন করিনি।

তাছাড়া কথাতেই তো আছে, নারীদের মন, দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। বিশেষ করে সে নারীর নাম যদি হয় শ্রীমতী সুচিত্রা সেন, তবে তো আর কথাই নেই। যিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন অপার রহস্যের এক ঘেরাটোপের মধ্যে।

তবে সাংবাদিকদের সম্পর্কে তাঁর যত তিক্ততাই থাক না কেন, মানুষ হিসেবে সুচিত্রা সেন যে খারাপ, এ অপবাদ তাঁর অতি বড় শত্রুতেও দিতে পারবে না। তিনি কোনও প্রোডিউসারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকা আত্মসাৎ করেছেন তাঁর ছবিতে কাজ না করে, এমন কথা বলার সাহস কারও নেই। তিনি ফিল্ম লাইনের কারও সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছেন এমন কথাও কোনওদিন শুনিনি। তিনি তাঁর অধস্তন কোনও কর্মচারীকে কটু কথা বলেছেন এমন কথা আজও শোনা যায়নি।

তবে হ্যাঁ, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য যা যা করা দরকার তা তিনি অবশ্যই করেছেন। তাতে হয়তো তাঁকে অপ্রিয় হতে হয়েছে। এতে তো আমি দোষের কিছু দেখতে পাই না। এটা সকলেই করে। করতে হয়। মিসেস সেনও তাই করেছেন।

একটা সময়ে তাঁর চরিত্র নিয়ে কিছু গুঞ্জন উঠেছিল। একজন স্মার্ট অভিনেতা পরিচালককে জড়িয়ে কিছু কুৎসিত কথাবার্তা বাজারে চাউর হয়েছিল। পরে জেনেছি সেগুলি সব ডাহা মিথ্যে কথা। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজেদের স্বার্থে মিসেস সেনের চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নির্জলা মিথ্যার যা পরিণতি হয় এ ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। ম্যাডাম সেন এখনও সগর্বে বিরাজমান। আর সেইসব স্বার্থান্বেষীর দল এখন কোথায়? ফুৎকারে মিলিয়ে গেছেন। তাঁদের নামও আজ আর শোনা যায় না।

মিসেস সেন সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিলেন যখন তাঁর ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে বলে একদল মানুষ চারদিকে রটিয়ে দিয়েছিল। এমন কথাও শোনা গিয়েছিল যে, তাঁকে প্রতিদিন নতুন করে রক্ত নিতে হচ্ছে। তাঁর বাঁচাব দিনগুলি একান্তই সীমিত।

অথচ ব্যাপারটা আদৌ তেমন কিছু নয়। শবীর খারাপ হয়েছিল বলে কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন কয়েকটা মাত্র শুটিং ক্যানসেল করে। ক'দিন পরে আবার যখন স্টুডিওপাড়ায় ফিরে এসে শুনলেন তাঁর শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে এইসব বটনা হয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে বসে আছেন, তখন তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। এ কী কুৎসিত ব্যবহার। একটা মানুষকে হাতে না মারতে পেরে ভাতে মারার চেষ্টা।

আজ যদি বলি, এইসব কুৎসিত ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে তারই প্রতিবাদে শ্রীমতী সুচিত্রা সেন ধীরে ধীরে নিজেকে চিরদিনের জন্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে সরিয়ে নিয়েছেন তাহলে কি সেটা খুব মিথ্যে বলা হবে। ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে হলে, ভদ্রভাবে কাজ করতে হলে একটা ভদ্র পরিবেশ তো দরকার। সে পরিবেশটা কি পুরোপুরি আছে আজকেব বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে? নতুন প্রজন্মের অন্য ধরনের ছবির নির্মাতারা কেন স্টুডিওমুখো হতে চান না, আউটডোরে কাজ করেন, সেটা তো ভেবে দেখতে হবে। পুরনো পরিচালকদেরও তো কেউ কেউ দেখেছি ওড়িশায় গিয়ে কাজ করতে ভালবাসেন। এটা কেন হচ্ছে?

যাক ওসব দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে কোনও লাভ নেই। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি উচ্ছন্নে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আবও যাবে, এটাই আমার ধারণা। তবে আমি পুরোপুরি আশাবাদী মানুষ। আমি স্থির নিশ্চিত, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সুদিন আবার ফিরে আসবে। তবে তার আগে বর্তমান সেট-আপটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়া দরকার। যে ইমারতের ভিত নড়বড়ে হয়ে গেছে তাতে আর নতুন করে প্রাসাদ গড়ার পরিকল্পনা বাতুলতা মাত্র। ধ্বংসের ওপরেই নতুন সৃষ্টি গড়ে ওঠে। সেই দিনটি যত তাড়াতাড়ি আসে ততই মঙ্গল।

আর সেদিন হয়তো সুচিত্রা সেনের মতো আরও অনেক শিল্পী যাঁরা স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন অথবা এই মুহূর্তে অবসর নেবার কথা ভাবছেন, তাঁদের আবার সসম্মানে ফিরিয়ে আনা যাবে। তবে ওসব ভবিষ্যতের ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে। আবার বর্তমানেই ফিরে আসি।

অতি সম্প্রতি মাসখানেক ধরে চলচ্চিত্রের মহানগরী বোম্বাইতে কাটিয়ে এলাম। ওখানে গিয়ে সুচিত্রা সেনের একটি নতুন রূপের সঙ্গে পরিচিত হলাম। এর আগে আরও একজন বোম্বাইয়ের শিল্পীর কাছে সুচিত্রা সেনের আর এক রূপের পরিচয় পেয়েছিলাম। কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে মধ্যরাত্রে বসে সেই শিল্পীর মুখ থেকে সুচিত্রা সেন সম্পর্কে যা শুনেছিলাম, তাতে আমি রীতিমতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম। সেই মহান শিল্পী আজ প্রয়াত। তিনি আপনাদের সকলের প্রিয় সঞ্জীবকুমার। আমার কাছে তিনি হরিভাই। হরিভাইয়ের কথায় পরে আসছি। তার আগে বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সর্বজনশ্রদ্ধেয় হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের কথাটা বলে নিই।

বান্দ্রার কার্টার রোডে আড়াই কোটি টাকায় কেনা নতুন ফ্ল্যাটে বসে হৃষীদা বললেন : জানেন রবিবাবু, আজ যে আমি এই বিশাল ঢেউয়ের মাঝখানে বসে আছি, একে একে চল্লিশখানা ছবি করতে পেরেছি, তার মূলে আছে রমা। আপনাদের কাছে যিনি সুচিত্রা সেন।

হৃষীদার এই মন্তব্যের কারণ সম্পর্কে আলোচনায় আসছি একটু পরেই।

সুচিত্রা সেনকে কেন্দ্র করে বাংলা ছবির দর্শকদের মনে যত রস, ততই রহস্য। সেই রসের উৎস সুচিত্রা সেনের অভিনয়ের মধ্যেকার রোম্যান্টিক অ্যাপ্রোচ, তাঁর দুই চোখের চঞ্চলতা, তাঁর পাগলকরা হাসি। আর রহস্যের কারণ তাঁর নিজেকে অপ্রকাশ রাখা। তাঁর প্রাত্যহিক জীবনচর্যার কণামাত্র বাইরের পৃথিবীকে জানতে না দেওয়া।

এর ফলে শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকে কেন্দ্র করে কত যে গুজবের গুঞ্জন বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। কোন্ শিল্পপতির সঙ্গে তাঁর কেন এত বন্ধুত্ব তা নিয়ে পাড়ার চায়ের দোকান থেকে শুরু করে অভিজাত পানশালার সরস মুহূর্তগুলি সরগরম হয়ে উঠেছে। কবে তিনি বিলেত গেছেন, তাঁর সহযাত্রী কে কে ছিলেন, এবং কেনই বা ছিলেন, তা নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু হয়ে গেছে সাধারণ থেকে অসাধারণ সব ধরনের মানুষের মধ্যে। এইসব আলোচনার সবটা না হলেও কিছুটা তো শ্রীমতী সেনের কানে গেছে নিশ্চয়। আমার মনে হয়, তিনি তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন। ফলে একদা যা ছিল মৃদু গুঞ্জন, কালক্রমে সেটা কলগুঞ্জনে পরিণত হয়েছে।

শ্রীমতী সেনের পক্ষ থেকে এর কোনও প্রতিবাদ কোনদিনই হয়নি। এসব গুঞ্জনের প্রতিবাদ তো নিজের মুখে করা যায় না। সেটা শোভনও নয়। এব জন্য দরকার ছিল খবরের কাগজের সাংবাদিকদের সহযোগিতা। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে নয়, তাঁদের কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করলেই কাজ হত। কিন্তু শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের সঙ্গে সাংবাদিকদের তেমন সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল না। কাজেই গুজবগুলি কালক্রমে পরিপুষ্ট হয়েছে। নদীর স্রোতের মতো তর তর করে ছড়িয়ে পড়েছে নানা প্রান্তে।

এইসব কলগুঞ্জন, একদা যা ছিল মিসেস সেনের উপভোগের বস্তু, পরবর্তীকালে সেটা তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীমতী সেনের ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে, তাঁর আয়ুষ্কাল অতীব সীমিত, এই ধরনের একটি গুজব সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি একটি জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। বরং বলা চলে বিশ্বাসের পাল্লাটাই কিছুটা ভারি ছিল। সুতরাং মিসেস সেনকে এই গুজব মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। ইচ্ছা না থাকলেও নিজের কর্মক্ষমতা প্রমাণ করবার জন্য এমন দু-একটি অপাংক্তেয় ছবির কাজ হাতে নিতে হয়েছিল, যা অন্য সময়ে তিনি কোনমতেই নিতেন না।

এইভাবে শ্রীমতী সুচিত্রা সেন চিরকালই রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থেকেছেন সাধারণ মানুষের মনে। আজও, ফিল্ম লাইনে দীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তিনি রহস্যাবৃতা। কখনও শোনা যায় তিনি রাজনীতির আসরে আসছেন। কখনও শোনা যায় তিনি সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করবেন। কখনও শোনা যায় তিনি শেষের দিনগুলি ধর্মের আশ্রয়ে কাটাবেন। কিন্তু এর কোন্‌টা যে ঘটবে, অথবা আদৌ কিছু ঘটবে কি না, এটা কারুরই জানা নেই। ছবির জগৎ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসনের দীর্ঘকাল পরেও যে তিনি সকলের কাছে এমন ভয়ানকভাবে জীবন্ত, এমন নজির আর দ্বিতীয়টি আছে কি না আমার জানা নেই।

সুচিত্রা সেনের জীবনের কত ঘটনাই তো আমাদের কাছে অজানা থেকে গেছে। তাঁরই প্রেরণায় যে একজন চিত্রপরিচালকের জন্মলাভ সম্ভব হয়েছিল, যিনি আজ সারা ভারতের মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয়, সে ঘটনাও জানতে পারতাম না যদি এবার এক মাসের জন্য বোম্বাই না যেতাম একটি বিশেষ কাজে।

সেই পরিচালকটি হলেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। এবার বোম্বাই গিয়ে প্রথমেই হৃষীদার বাড়িতে গিয়েছিলাম। হৃষীদা বাড়ি পালটেছেন। কার্টার রোডে নিজের বিশাল বাংলো বিক্রি করে দিয়ে ঠিক তার পাশেই আর একটি বিরাট ফ্ল্যাট কিনেছেন আড়াই কোটি টাকা দিয়ে। ওই ফ্ল্যাটের অর্ধবৃত্তাকার গ্লাস-উইন্ডো দিয়ে আরব সাগরের ঢেউ গোনা যায়। সাগরের গা ঘেঁষে বিরাট জগার্স পার্ক। প্রতিদিন সকাল-বিকেল একগুচ্ছ ধনী মানুষ গাড়ি চালিয়ে সেখানে ছুটে আসেন স্বাস্থ্যরক্ষার্থে জগিং করতে।

বোম্বাইতে পৌঁছেই আমাদের পুরনো বন্ধু, 'কস্তুরী' ছবির পরিচালক কবি বিমল দত্তর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর বাড়ি থেকেই হৃষীদাকে ফোন করেছিলাম। ফোন পেয়েই হৃষীদা বলেছিলেন: শীগগির চলে আসুন। বহুদিন আড্ডা দেওয়া হয়নি আপনার সঙ্গে।

দিন দুয়েকের মধ্যেই হৃষীদার বাড়ি গিয়েছিলাম। অনেক দিনের অনেক সুখ-দুঃখের কথা জমানো

ছিল উভয় তরফেই। তারই লেনদেন চলতে লাগল নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত দুটি মানুষের মধ্যে। শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক প্রশান্ত ভট্টাচার্য আর বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক অনিল ঘোষ। অনিলবাবু এখন হৃষীদার সঙ্গে যুক্ত আছেন।

কথায় কথায় শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের প্রসঙ্গও এসে গেল। কারণ সেদিন সকালেই ম্যাডাম সুচিত্রা সম্পর্কে এক কিস্তি লেখা শেষ করে পাঠিয়েছি বর্তমান পত্রিকার দফতরে। অনিবার্যভাবেই আমার দ্বারা উত্থাপিত হল সুচিত্রা সেনের প্রসঙ্গ।

মিসেন সেনের কথায় উত্তেজনায় নড়েচড়ে বসলেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। বললেন : আজ' যে এই বিপুল বৈভবের মধ্যে আমি বসে আছি, একের পর এক চল্লিশখানা ছবি করতে পেরেছি, আপনাদের প্রশংসা আর ভারত সরকাব প্রদত্ত সম্মান পেয়েছি, তার মূলে আছে রমা। সে আর দিলীপকুমার যদি আমাকে অমন ভাবে উদ্বুদ্ধ না করত তাহলে আমি পরিচালনার কাজে হাত দিতে পারতাম কি না সন্দেহ। আমাকে হয়তো কলকাতাতেই ফিরে যেতে হত।

সত্যিই তাই। সকলেই জানেন পরিচালক হবার আগে হৃষীদা ছিলেন ফিল্মের এডিটার। বিমল রায় প্রোডাকসন্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁর ছবির সম্পাদক হিসেবে। কিন্তু আয় উপার্জন এমন কিছু ছিল না যাতে দীর্ঘকাল বোম্বাই শহরে থেকে ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করা চলে। তাই একদিন মনের দুঃখে কলকাতায় ফেরার জন্য ট্রেনের টিকিট কেটে ফেললেন।

এবার পরিচিত মানুষদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা। বিশিষ্ট সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বোম্বাইতে। ফিল্মের গল্পলেখক হিসেবে যুক্ত আছেন বম্বে টকিজ এবং পববর্তীকালে ফিল্মিস্থানেব সঙ্গে। শরদিন্দুবাবু হৃষীদাকে খুব স্নেহ করতেন। কলকাতা ফিরে যাবার কথা শুনে তিনি বললেন · তাই তো! এমন করে হেরে ফিরে যাবে বম্বে থেকে।

হৃষীদা বললেন : কী করব বলুন। এখানে তো কোনরকম আশার আলোই দেখতে পাচ্ছি না। ফিবে যাওয়া ছাড়া উপায় কী?

শরদিন্দুবাবু বললেন : তোমার ঠিকুজি কোষ্ঠী আছে?

এটা হয়তো অনেকেই জানেন না যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বড় মাপের কোষ্ঠী বিচারক। তবে ওটা ওঁর নেশা। ওটাকে যদি পেশা করতেন তাহলে অনেক জ্যোতিষাচার্যের যে ভাত মারা যেত তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

শরদিন্দুবাবুর কথা শুনে হৃষীদা বললেন : তা আছে একটা। ছোটবেলায় করানো হয়েছিল। তবে আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। তাই কাউকে আমার কোষ্ঠী দেখাইওনি কোনদিন।

শরদিন্দুবাবু বললেন : না দেখিয়ে ভালই করেছ। কোন্ আনাড়ি সেটা দেখে উল্টোপাল্টা কী বলত কে জানে। তুমি ওটা আমার কাছে নিয়ে এসো।

পরের দিন হৃষীদা তাঁর ঠিকুজি-কোষ্ঠী শরদিন্দুবাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শরদিন্দুবাবু অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই কোষ্ঠী বিচার করেছিলেন। কাগজ-কলম নিয়ে গ্রহ-নক্ষত্রের সন্নিবেশের হিসেব করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন : না হে বাপু, তোমার তো বোম্বাই ছাড়া হচ্ছে না।

শুনে চমকে উঠেছিলেন হৃষীদা। বলেছিলেন : সে কী! আমার তো কলকাতার টিকিট কাটা হয়ে গেছে। দু-তিন দিন পরেই যাবার ডেট্।

শরদিন্দুবাবু বললেন : টিকেট ফেরত দিয়ে দাও। আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমার ভাত-জল সব বোম্বাইয়ের মাটিতেই। এখানে তোমার কর্মস্থল। অনেক অর্থ হবে। প্রচুর নাম কিনবে। তোমার কপালে তো দেখছি রাজসম্মান যোগও আছে।

শুনে তো বিস্মিত হয়ে গেলেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু শরদিন্দুবাবু বলছেন তাই অবিশ্বাস করতেও পারছেন না। দোনামোনা করতে করতে ট্রেনের টিকেটটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

সেদিনকার কথা বলতে গিয়ে হৃষীদা বললেন : বিমলদা, মানে বিমল রায় মশাই তখন 'দেবদাস'

ছবিটা করছিলেন। কলকাতা থেকে উনি সুচিত্রা সেনকে আনিয়েছিলেন পার্বতীর চরিত্রটা করবার জন্য। দেবদাস করছিলেন দিলীপকুমার। আমি ওই ছবির এডিটার। ওই ছবির সেটেই রমা একদিন বললে: আপনি নিজে ছবি করছেন না কেন হৃষীদা?

হৃষীদা বললেন : ছবির ব্যাপারটা যে আমার মাথার মধ্যে বুড়বুড়ি কাটত না তা নয়। কিন্তু আমার মতো একজন আনকোরা নতুনকে দিয়ে কে ছবি করাবে! তেমন প্রোডিউসার কোথায়?

তা ওই কথার পিঠে রমার কথায় সায় দিয়ে দিলীপও বলে উঠল : তুমি সাহস করে ছবি করতে নেমে যাও হৃষীদা। আমি আর মিসেস সেন তোমাকে সব রকম সাহায্য করব।

দিলীপকুমার তখন বম্বের টপ্ হিরো। ও সই করলেই ফিনান্সিয়ার এগিয়ে আসে। তার ওপর রমা ভরসা দিচ্ছে। তাই আমি ব্যাপারটা সিরিয়াসলি চিন্তা করতে লাগলাম। শুরু হল আমার প্রথম ছবি 'মুসাফির'। একটা বাড়িকে কেন্দ্র করে ঘটনা। সেই বাড়িতে পর পর তিনটি পরিবারের কাহিনী। বোম্বাইয়ের প্রচলিত ধারার বাইরে ছবিটা একটু অন্য ধরনের। রিলিজের পর কাগজপত্রে প্রশংসো বেরোল। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও পেয়ে গেলাম। শরদিন্দুবাবুর কোষ্ঠী গণনা হুবহু মিলে গেল। তারপর থেকে একের পর এক চল্লিশখানা ছবি করে গেছি।

আমি বললাম : আপনার এই সাফল্যের পিছনে মিসেস সেনের ওই ভরসাটাই কাজ করেছিল তাহলে?

হৃষীদা বললেন : একশোবার। ও আর দিলীপ ভরসা না দিলে তো আমি এগোতেই সাহস করতাম না।

আমি বললাম : এখন ওঁর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?

হৃষীদা বললেন : খুব ভাল। এই তো কিছুদিন আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম। আমি রমাকে ফোনও করেছিলাম। রমা বাড়িতে ছিল না। ফিরে এসে আমাকে রিং ব্যাক করে। অনেক সুখ-দুঃখের কথা হল সেদিন। ওর চিন্তা এখন মুনমুনের কেরিয়ার নিয়ে।

আমি বললাম : তা তো হবেই। প্রায় মায়ের মতোই অতটা সৌন্দর্য নিয়েও মেয়েটি কিছু করে উঠতে পারছে না। অথচ অভিনেত্রী হিসেবে মুনমুন যে খুব খারাপ তাও তো বলতে পারি না। আপনার একটা সিরিয়ালে তো ও বেশ ভালই অভিনয় করল। শরদিন্দুবাবু বেঁচে থাকলে ওর ঠিকুজি-কোষ্ঠীটা দেখে বলে দিতে পারতেন কেন এমন হচ্ছে।

আমার কথা শুনে হৃষীদা সহ উপস্থিত সবাই হেসে উঠলেন।

এ তো গেল হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের ফিল্ম কেরিয়ারে সুচিত্রা সেনের অবদানের কথা। এবারে আমার প্রিয় বন্ধু হরিভাই ওরফে সঞ্জীবকুমারের কথাটা বলি। তাঁর জীবনেও সুচিত্রা সেন একটা ঘটনা।

সঞ্জীবকুমারের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন চিত্রপরিচালক অসিত সেন। এটা সেই ১৯৬৯ সালের কথা। অসিতবাবু তখন হরিভাইকে নিয়ে 'আনোখা রাত' বলে একটা ছবি করছিলেন। আমি সেই সময়ে বম্বে গিয়েছিলাম। ওই প্রথম আলাপেই আমাদের দুজনের দুজনকে ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছিল। পরে আমি যখন বম্বে যেতাম তখন খোঁজ করে হরিভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতাম। আর সঞ্জীবকুমার কলকাতায় এলেই আমার খোঁজ করতেন। আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকায়। কাজেই খোঁজ পেতে অসুবিধে হত না। কখনও পার্ক হোটেলে, কখনও বা গ্র্যান্ড হোটেলে, হরি যখন যেখানে এসে উঠত, সেখানেই আমরা মিলিত হতাম। আর সেই সব সাক্ষাৎকারে শিল্পী ও সাংবাদিকের মামুলি কথাবার্তা ছাড়াও আমাদের অন্য কিছু আদানপ্রদান হত। সেটা হৃদয়ের কথা, জীবনদর্শনের কথা। সুতরাং হরি আমার কাছে নিছক শিল্পী ছিল না, কিংবা আমি তার কাছে সাংবাদিক। তার বাইরে আমরা উভয়ের কাছে অন্য একটি পরিচয়ে মিলিত হতাম।

ওই সময়ে একদিন মধ্যরাত্রে গ্র্যান্ড হোটেলের একটি রুমে বসে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন শ্রীমতী সুচিত্রা সেন। কথায় কথায় হরি বলে উঠেছিল : শি ইজ এ গ্রেট লেডি।

আমি বললাম : হঠাৎ তুমি মিসেস সেনকে এত বড় সার্টিফিকেট দিয়ে ফেললে! তার কারণটা কী?

হরি বললে : জীবনের বিশেষ একটা মুহূর্তে উনি আমাকে মানুষ্যত্বের পথটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তিনি আমার কাছে গ্রেট।

ওইখানেই হরির কাছে গুলজার পরিচালিত 'আঁধি' ছবির শুটিং-এর একটি ঘটনা শুনেছিলাম। সব ঘটনা বলা যাবে না। তবে যেটুকু না বললেই নয়, সেইটুকুই বলছি।

হরি ব্যক্তিগত জীবনে একজন প্রেমিক পুরুষ। তার ছবির নায়িকাদের বেশির ভাগেরই প্রেমে পড়ত সে। আর সেসব প্রেমের প্রতিদানও কিছু কিছু পেত। ওইভাবেই 'আঁধি' ছবির শুটিং চলার সময় সে সুচিত্রা সেনের প্রেমে পড়ে গেল।

সুচিত্রা সেন আবার এসব ব্যাপারে ভয়ানক স্ট্রিক্ট। অন্য কেউ হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিতেন। কিন্তু হরি মানুষটি তো অন্যরকম। যত বড় অভিনেতা, তার মনটা তত বড়। ওই একটা দোষ ছাড়া তার চরিত্রে আর অন্য কোনও দোষ নেই। তাই মিসেস সেন সযত্নে হরির নাগাল এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। কিন্তু কাশ্মীরে শুটিং চলার সময় হরি বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করতে গিয়েছিল। সেদিন মিসেস সেন তাকে আর ছেড়ে কথা বললেন না। তীব্র ভাষায় হরির বিবেকের সামনে, মনুষ্যত্বের সামনে, কাল্চারের সামনে যে প্রশ্নগুলি রাখলেন, তাতে হরির তো মরমে মরে যাবার জোগাড়।

হরি বললে : সেইদিন থেকে দাদা আমি ওই মহিলার অনুরাগী ভক্ত হয়ে গেলাম। ওঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে দিলাম। চূড়ান্ত অবক্ষয়ের পথ থেকে উনি আমাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন সেদিন। আমি ওঁকে মনে মনে প্রণাম জানালাম।

সত্যি কথা বলতে কী, ওই ঘটনার পর থেকে হরির জীবন যেন কিছুটা অন্য খাতে বইতে শুরু করল। ঠিক ওইদিন থেকে সঞ্জীবকুমার আর সুচিত্রা সেন উভয়ে উভয়ের বন্ধু হয়ে গেলেন। সেই বন্ধুত্ব হরির আকস্মিক মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অটুট ছিল। একটা অন্য সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওঁদের মধ্যে। মুনমুনের বিয়েতেও হরি এসেছিল।

সুচিত্রা সেনের এ এক মহিয়সী রূপ। এই রূপটিকে আমারও প্রণাম জানাতে ইচ্ছে করে।

এবারে যাঁর কথা না বললে সুচিত্রা সেনের প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাঁর কথাতেই আসি। তিনি হলেন উত্তমকুমার। বাংলা ছবির সর্বযুগের সর্বকালের সর্বোৎকৃষ্ট রোম্যান্টিক জুটির অন্যতম অংশীদার তিনি। তবে উত্তম-সুচিত্রা জুটির যাবতীয় তথ্য, যতটুকু আমার অধিগত, তার সবটাই এই মুহূর্তে উজাড় করে দিতে চাইছি না। কারণ অনতিকাল পরেই 'স্মৃতির সরণি' পর্যায়ে উত্তমকুমারকে নিয়ে একটি বড় লেখা আমাকে লিখতে হবে। কাজেই আমার হাতের সবকটি তাস এই মুহূর্তে ফেলা চলবে না।

উত্তম-সুচিত্রা জুটির সূচনা হয়েছিল ১৯৫৩ সালে 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে। কিন্তু রোম্যান্টিক জুটি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে আরও দেড়টি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল এই জুটিকে। এর মধ্যে নায়ক-নায়িকা হিসেবে আরও চারখানি ছবি তাঁরা করেছেন। সেগুলি হল 'ওরা থাকে ওধারে', 'মরণের পরে', 'সদানন্দের মেলা' এবং 'অন্নপূর্ণার মন্দির'। কিন্তু রোম্যান্টিকতার দিক থেকে তার কোনটিই ক্লিক করেনি। যদিও মরণের পরে এবং অন্নপূর্ণার মন্দির দুটো ছবিই তেরো সপ্তাহ করে চলেছিল, কিন্তু তার কারণ অন্য।

অবশেষে এল 'অগ্নিপরীক্ষা'। অগ্রদূতের পরিচালনা। মুক্তি পেল ১৯৫৪ সালের তেসরা সেপ্টেম্বর ঠিক পুজোর আগে। আর এই ছবিতেই উত্তম-সুচিত্রার জীবনের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু প্রতীক্ষিত বিস্ফোরণটি ঘটে গেল।

উত্তমবাবু একবার কথায় কথায় বলেছিলেন : 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবিতে কাজ করতে করতেই আমি বুঝতে পারছিলাম একটা কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে। রমা আর আমি দুজনেই মনেপ্রাণে চাইছিলাম আমাদের একটা স্থায়ী পেয়ার তৈরি হোক। তার জন্যে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু কিছুতেই যেন ছন্দটা পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল সামথিং ইস মিসিং। কিন্তু সেটা কী কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। 'অগ্নিপরীক্ষা'-য় কাজ করতে করতে মনে হচ্ছিল সেই ছন্দটা বোধহয় আসতে শুরু করেছে। তাই ওই ছবি রিলিজের সময় আমি খুব উৎকণ্ঠায় ছিলাম। তার আগে দুটো রাত ভাল করে ঘুমোতে পারিনি।

বিলিজের দিন ভাল করে খেতেও পারিনি। চেনা-জানা সব ঠাকুরের মন্দিরে মানত করেছি। আমার ভাই বুড়োকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় হলে পাঠিয়েছি ছবির রিপোর্ট নেবার জন্যে। ম্যাটিনি শো-এর রিপোর্ট পাবার পরও উৎকণ্ঠা কাটেনি। সেটা কেটেছিল ইভনিং শো-এর রিপোর্ট পাবাব পর। তার পরও দুটো দিন ভয়ে ভয়ে ছিলাম। যদি রিপোর্টটা ঘুরে যায়। ঈশ্বরের দয়ায় সেটা আর ঘটেনি।

এ তো গেল উত্তম-সুচিত্রা জুটির মেল্ পার্টনারের ভাবনার কথা। কিন্তু ফিমেল পার্টনার ওই ছবি সম্পর্কে কী ভেবেছিলেন তা জানার কোনও উপায় আমার জানা নেই। হয়তো উনি কিছু ভাবেনইনি। কারণ একটা সময়ের পর তো উনি না চাইতেই অনেক কিছু পেয়ে গেছেন। অর্থ, সম্মান, জনপ্রিয়তা ইত্যাদি ইত্যাদি।

'অগ্নিপরীক্ষা'-র পর উত্তম সুচিত্রা জুটির রোম্যান্টিক পেয়ার দীর্ঘ কয়েকটি বছর দাপটে বাজত্ব করে গেছে। উত্তমের বিপবীতে অন্য নায়িকা কিংবা মিসেস সেনের বিপরীতে অন্য নায়ক নিয়ে নতুন রোম্যান্টিক জুটি তৈরির চেষ্টা বেশ কয়েকবারই হয়েছে, কিন্তু তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। আবার ঘুরেফিরে উত্তম-সুচিত্রাতেই স্থিত হতে হয়েছে। বাংলা ছবিতে এ এক অবিস্মরণীয় জুটি।

ওই জুটির আর একটি বিখ্যাত ছবি 'সাগরিকা'। অগ্রগামী গোষ্ঠী পরিচালিত এই ছবিটি উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত ছবির মধ্যে সব থেকে বেশিদিন চলেছে। চব্বিশ সপ্তাহ। যে 'হারানো সুর' আর 'সপ্তপদী' ছবি দুটিকে আমরা সার্থকতম রোম্যান্টিক ছবি বলে আখ্যা দিই, তার থেকেও অনেক বেশি চলেছে 'সাগরিকা'। 'হারানো সুর' চলেছে বারো সপ্তাহ, আর 'সপ্তপদী' পনেরো সপ্তাহ।

এই রোম্যান্টিক জুটি নিয়ে উত্তমবাবুকে একবার একটা প্রশ্ন করেছিলাম। তখন ওঁর ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে মাঝে মাঝে আমাদের মিডনাইট কন্‌ফারেন্স বসত। তেমনি এক আড্ডায় উত্তমবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'অগ্নিপরীক্ষা'-র পর থেকে ওই যে আপনারা দুজনে পর্দার বুকে প্রেমের নতুন নতুন লীলারঙ্গ দেখাতে শুরু করলেন, তার কতটা ডিরেকটারদের নির্দেশে, আর কতটা এক্সটেম্পো?

উত্তমবাবু একটু হাসলেন। বললেন : আপনার এই প্রশ্নটার উত্তব দিতেই হবে?

আমি বললাম : সেটা আপনার অভিরুচি।

উত্তমবাবু বললেন : ডিরেকটারদের এক ভাগ আর আমাদের তিন ভাগ।

আমি বললাম : আর একটু ডিটেলে বলুন।

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন : আপনি খুব শয়তান আছেন। এভাবে আমাদের ট্রেড সিক্রেটটা জেনে নিতে চাইছেন কেন?

আমি বললাম : না না, ঠাট্টা নয়। এটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আপনাদের অভিনয়ে রোম্যান্টিসিজম যে এতটা হাইটে উঠল তার একটা কারণ অনুসন্ধান করতে চাইছি। এভাবে হেসে প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে যাবেন না।

উত্তমবাবু এবারে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। কী যেন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন : আমাদের ওই রোম্যান্টিক অভিনয়ের পুরো ব্যাপারটাই অ্যাকশন আর রি-অ্যাকশন। রমা দারুণ অ্যাকট্রেস। অসম্ভব রি-অ্যাকট করতে পারে। প্রেমের দৃশ্যে আমি যদি একটা স্টেপ দিই তো ও দুটো স্টেপ দেয়। আবার ও যদি দুটো স্টেপ দেয় তো আমি তিনটে স্টেপ দিই। ব্যাপারটা এইভাবেই জমে যায়। এর মধ্যে ছবির ডিরেক্টারদের বিশেষ কোনও ভূমিকা থাকে না। তাঁরা শুধু লক্ষ রাখেন আমরা চরিত্র থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি কি না।

তবে এই রোম্যান্টিক জুটির বাইরে উত্তমবাবু আর সুচিত্রা সেনের আরও অনেক ছবি আছে যা ছবি হিসেবে তো বটেই, বাণিজ্যিক দিক থেকেও সার্থক। এই মুহূর্তে সুচিত্রা সেনের তেমন সাতখানি ছবির কথা আমার মনে পড়ছে যার নায়ক উত্তমকুমার নন। সেগুলি হল 'দীপ জ্বেলে যাই' (বসন্ত চৌধুরী), 'স্মৃতিটুকু থাক' (বিকাশ রায় ও অসিতবরণ), 'সাত পাকে বাঁধা' (সৌমিত্র চ্যাটার্জি), 'উত্তরফাল্গুনী' (বিকাশ রায় ও দিলীপ মুখার্জি), 'ফরিয়াদ' (উৎপল দত্ত), 'দেবী চৌধুরানী' (রঞ্জিত মল্লিক) এবং 'দত্তা' (সৌমিত্র চ্যাটার্জি)। এর মধ্যে শেষোক্ত ছবিটি চলেছিল তেইশ সপ্তাহ যাবৎ, যার স্থান উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত 'সাগরিকা'-র পরেই।

কিন্তু এই যে পর্দাব বুকে উত্তম-সুচিত্রাব এত রোম্যান্টিসিজম, বাস্তব জীবনে তার কতটুকু প্রভাব পড়েছিল ওঁদেব মধ্যে? উত্তমবাবুর তরফের ব্যাপাবটা জানি, তবে সেটা এখন প্রকাশ করব না। যথাসময়েই করব। কিন্তু সুচিত্রা সেনেব তরফে সবটাই অজ্ঞাত। আমি কেবল দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব। তাতে পাঠকেবা যদি কিছু ধারণা কবে নিতে চান, করতে পারেন। তবে তাতে আমার কোনও দায় নেই, দায়িত্বও নেই।

প্রথম ঘটনাটি হল, আমি যখন 'প্রসাদ' পত্রিকার সম্পাদনা করতাম, তখন একটি 'উত্তমকুমার সংখ্যা' প্রকাশ করেছিলাম। সেই সংখ্যার জন্য মিসেস সেনের কাছে একটি লেখা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম অসিত চৌধুরি মারফত। কিন্তু সে লেখাটি আমি পাইনি।

আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর আনন্দবাজার পত্রিকার তরফ থেকে ওঁকে ফোন করা হযেছিল ওঁর রি-অ্যাকশন জানবার জন্য। উনি তার উত্তরে খানিকক্ষণ নীরব থেকে বলেছিলেন : হ্যাঁ, খবরটা পেয়েছি। নমস্কার।

তার পরই লাইনটা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হয়তো সেই মুহূর্তে মিসেস সেন খুবই শোক পেয়েছিলেন, তাই কথা বলতে পারেননি। অধিক শোকে তো মানুষ পাথর হয়ে যায়। হয়তো তেমনই কিছু।

কিন্তু শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের যে অসংখ্য অনুরাগী সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছেন তাঁরা তাঁর কাছে আরও একটু সোচ্চার শোকপ্রকাশ আশা করেছিলেন। মুখে না হোক, কাগজে কলমেও তো তা করা যেত।

এই দুটি প্রশ্নের কোনও সদুত্তর আমি আজও পাইনি। এটাই বোধহয় শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের রহস্যময় জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই সব কিছু মিলিয়ে তিনি এখনও আমাদের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু।

শ্রীমতী সুচিত্রা সেন এখন পরিপূর্ণ অবসবজীবন কাটাচ্ছেন। তাঁব জীবনের দিনগুলি এখন কেমন ভাবে কাটছে তা আমরা জানি না, তবে তিনি যদি সেই জীবনে শান্তি পেয়ে থাকেন তবে সেইভাবেই থাকুন। আমাদের হাজার ঔৎসুক্য নিয়ে তাঁর শান্তির জীবনে ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না। ঈশ্বর তাঁকে সুখে রাখুন, শান্তিতে রাখুন, এই কামনাই করি।

সংক্ষিপ্ত শিল্পী পরিচিতি

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১১)

জন্ম পানিহাটিতে। পিতার নাম আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এন্ট্রান্স পাশ করে আই. এস. সি. পাশ করেন। ইন্দোবার্মা পেট্রোলিয়াম সংস্থায় চাকরি নেন কিছুদিন। তারপর অন্য একটি সংস্থায়। অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল ছোটবেলা থেকেই। যে কারণে সখের নাটকে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। 'গড়পার বিশ্বজনীন ক্লাব' সেইরকম একটি সৌখিন সম্প্রদায়। প্রথম অভিনয় করেন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'শান্তি' ছবিটিতে। তারপর একাধিক ছবি। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সংস্পর্শে এসে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম অভিনীত নাটক 'প্রফুল্ল'। উল্লেখযোগ্য নাটক প্রফুল্ল, ঝিন্দের বন্দী, শ্রীকান্ত, দাবী ইত্যাদি। বেতার নাটকে অভিনয় করেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কলকাতা দূরদর্শনের হয়েও নাটক অভিনয় করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের একাধিক ছবিতে অভিনয় করেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ পণ্ডিতমশাই, মহারাজা নন্দকুমার, শাখাপ্রশাখা, মরণের পরে, নবজন্ম, গুপী বাঘা ফিরে এলো ইত্যাদি।

উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬—১৯৮০)

পিতা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়। জন্ম কলকাতায়। পোশাকি নাম অরুণকুমার। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেন। পোর্টকমিশনার্সে চাকরি করেছেন প্রথম জীবনে। সখের যাত্রা নাটকে অভিনয় করেছেন। প্রথম অভিনয় করেন 'মায়াডোর'-এ। সে ছবি মুক্তি পায়নি। প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি নীতীন বসুর 'দৃষ্টিদান'। পরিচিতি আসে 'বসু পরিবার'-এ অভিনয় করে। জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন 'অগ্নিপরীক্ষা'য় সুচিত্রা সেনের সঙ্গে জুটি বেঁধে। উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন জুটির শুরু নির্মল দে-র 'সাড়ে চুয়াত্তর' থেকে। জুটির শেষ ছবি 'প্রিয়বান্ধবী'। সুচিত্রা সেন ব্যতীত সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী, অরুন্ধতী দেবী, মালা সিন্‌হা, অপর্ণা সেন প্রমুখের বিপরীতে নায়ক হয়েছেন। বাংলা ছবির জনপ্রিয়তম তারকা হয়ে ওঠেন। সত্যজিৎ রায় ওই জনপ্রিয় তারকা ব্যক্তিত্বকে ভেবেই তাঁর 'নায়ক' ছবিটি তৈরি করেন। নায়ক করেন উত্তমকুমার। সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা' এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এন্টনী ফিরিঙ্গী' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে 'ভরত' পুরস্কার পান। তিনিই প্রথম নায়ক যাঁকে কলকাতা পুরসভা নাগরিক সংবর্ধনা জানায় ১৯৬৯ সালে। ছবি ছাড়া পেশাদার মঞ্চে 'শ্যামলী' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। 'শ্যামলী' সে সময়ে জনপ্রিয়তার নজির সৃষ্টি করে। অভিনয়ের পাশাপাশি ছবি পরিচালনা করেছেন। পরিচালিত ছবি শুধু একটি বছর, বনপলাশির পদাবলী, কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী। সংগীত পরিচালনা করেছেন কাল তুমি আলেয়া এবং সব্যসাচী ছবি দুটিতে। স্বকণ্ঠে গান গেয়েছেন 'নবজন্ম'তে। সুরকার ছিলেন নচিকেতা ঘোষ। একাধিক হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন। 'আলোছায়া প্রোডাকসন' ও 'উত্তমকুমার ফিল্মস' তৈরি করে ছবি প্রযোজনা করেছেন। প্রযোজিত উল্লেখ্য ছবি 'হারানো সুর', 'সপ্তপদী', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'গৃহদাহ' ইত্যাদি। একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ হ্রদ, সপ্তপদী, স্ত্রী, লাল পাথর, গৃহদাহ, এখানে পিঞ্জর, যদুবংশ, নায়ক, চিড়িয়াখানা, জতুগৃহ, অগ্নীশ্বর, নগরদর্পণে, বিচারক, সন্ন্যাসীরাজা ইত্যাদি।

কমল মিত্র (১৯১১—)

জন্মেছিলেন বর্ধমান শহরে। পিতা নরেশচন্দ্র মিত্র। ছোট থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ ছিল। সখের নাটকে অংশ নিতেন নিয়মিত। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে বর্ধমান কালেক্টারিতে চাকরি করেছেন এগার বছর। ১৯৪৪ সালে চাকরি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে 'নীলাঙ্গুরীয়' ছবিতে কাজ করার সুযোগ পান। সেটিই প্রথম ছবি। বিশিষ্ট পরিচালক দেবকীকুমার বসুর সংস্পর্শে আসেন ওই সময়ে। তারপর একাধিক ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ। সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত 'সাত নম্বর বাড়ি'তে অভিনয় করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তারপর বহু ছবি। হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন। পেশাদার মঞ্চে প্রথম অভিনয় 'কেদার রায়' নাটকে। তারপর কঙ্কাবতীর ঘাট, গৈরিক পতাকা, টিপু সুলতান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য নাটক। ছবিতে নায়ক চরিত্রের পাশাপাশি খলনায়ক করেছেন একাধিকবার। সবচেয়ে বেশিবার নায়ক নায়িকার পিতার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : সাত নম্বর বাড়ি, কংস, কঙ্কাবতীর ঘাট, বিধিলিপি, সংগ্রাম, সূর্যতোরণ ইত্যাদি।

চন্দ্রাবতী দেবী (১৯০৮—১৯৯২)

বিহারের মজঃফরপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। পিতার নাম গঙ্গাধর প্রসাদ সাহু। এন্ট্রান্স পাশ করে বেথুন কলেজে পড়েন। কলকাতায় এসে ছায়াছবির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। দিদি কঙ্কাবতী সাহুও ছিলেন অভিনেত্রী। ব্যক্তিগত জীবনে কঙ্কাবতী ছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সহধর্মিনী। প্রথম অভিনয় করেন নির্বাক ছবি 'পিয়ারী'তে। অভিনীত প্রথম সবাক ছবি দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'মীরাবাই'। মুক্তি পায় ১৯৩৩ সালে। নিউ থিয়েটার্স নিবেদিত দ্বিভাষিক ছবিটিতে অভিনয় করে খ্যাতি পান। তারপর বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। পরবর্তী সময়ে বাংলা ছবিতে একাধিকবার চরিত্রাভিনেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। কিছু ছবিতে স্বকণ্ঠে গানও গেয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : দেবদাস, প্রতিশ্রুতি, মীরাবাই, দক্ষযজ্ঞ, পথের দাবী, দিদি, বিজয়া, মানদণ্ড, মরুতীর্থ হিংলাজ, জীবনতৃষ্ণা ইত্যাদি।

জহর গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৩—১৯৬৯)

চব্বিশ পরগণার এক অখ্যাত গ্রামে জন্মেছিলেন। ডাক নাম সুলাল। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেছেন। তারপর কলেজে পড়তে পড়তে চাকরি নেন। অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল বলে যুক্ত হয়ে পড়েন মিত্র থিয়েটারের সঙ্গে। 'শ্রীদুর্গা' নাটকে অভিনয় করেন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে ওঠেন। তিনকড়ি চক্রবর্তীর সহায়তায় 'সীতা' ছবিটিতে অভিনয় করেন। সেটিই প্রথম ছবি। জনপ্রিয়তা পান কানন দেবীর সঙ্গে 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ছবিটিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে। তারপর অসংখ্য ছবিতে নায়ক এবং চরিত্রাভিনেতার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। পাশাপাশি পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছেন। উল্লেখ্য অভিনীত নাটক দুই পুরুষ, বিজয়া, নিষ্কৃতি, কেদার রায়, শ্রীকান্ত ইত্যাদি। শেষ মঞ্চাভিনয় অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী নাটকে। একাধিকবার বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর পুরস্কার পেয়েছেন। মোহনবাগান অ্যাথেলেটিক ক্লাবের হকি সচিব ছিলেন একসময়ে।

উল্লেখযোগ্য ছবি : মানময়ী গার্লস স্কুল, শহর থেকে দূরে, বন্দী, ছদ্মবেশী ইত্যাদি।

জহর রায় (১৯১৯—১৯৭৭)

জন্মেছিলেন অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। পিতার নাম সত্য রায়। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে কিছুদিন চাকরি করেন। নিজস্ব দর্জির দোকান করেছিলেন পাটনায়। সখের অভিনয়ে আগ্রহ ছিল। পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে 'পূর্বরাগ'এ অভিনয় করেন। 'পূর্বরাগ' তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি। তারপর বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন মূলত হাস্যকৌতুকশিল্পী হিসেবে। হাস্যকৌতুক অভিনয়ে কিংবদন্তী হয়ে ওঠেন বলে তাঁর নামে ছবির নামকরণ হয়েছে পরবর্তী সময়ে। এ জহর সে জহর নয়, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিসট্যান্ট তার উদাহরণ। বাংলা পেশাদারী মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করেছেন প্রধানত রঙমহল মঞ্চে। উল্লেখ্য নাটক উল্কা, আমি মন্ত্রী হব, সেমসাইড, অনন্যা, নহবৎ ইত্যাদি। ছবি প্রযোজনা করেছেন। বিভিন্ন জলসায় কৌতুক নকশা পরিবেশন করতেন নিয়মিত।

উল্লেখযোগ্য ছবি : এ জহর সে জহর নয়, সাড়ে চুয়াত্তর, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট, ভানু পেল লটারি, ছদ্মবেশী, গুপী গাইন বাঘা বাইন।

জীবেন বসু (১৯১৫—১৯৭৩)

জন্ম কলকাতায়। অল্প বয়স থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। একাধিক সখের নাটকে অভিনয় করেছেন। স্কুলে পড়বার সময়েই স্কুল পালিয়ে স্টুডিওতে শুটিং দেখতে গিয়ে নির্বাক ছবি বৃন্দাবনধাম ও আঁখিজল-এ অভিনয় করেন। পড়াশুনা শেষ করে চাকরি নেন। চাকরি ছেড়ে যোগাযোগ করেন নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে। মঞ্চাভিনয় শিক্ষা করেন নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে এসে। শিশির ভাদুড়ির সঙ্গেও অভিনয় করেছেন। ছবির প্রতি আকর্ষণ প্রবল থাকায় যোগাযোগ করেন পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তীর সঙ্গে। ওই পরিচালকের 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ছবিতে অভিনয় করেন। এটিই অভিনীত প্রথম সবাক ছবি। তারপর বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন চরিত্রাভিনেতা হিসেবে। বাংলা ছবির অপরিহার্য চরিত্রাভিনেতা হয়ে উঠেছিলেন একসময়ে। পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্মিলিত

ভাবে 'আজ প্রোডাকসন' গঠন কবে একাধিক বাংলা ছবি প্রযোজনা কবেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : পাত্রী চাই, সাগবিকা শেষবক্ষা, একটি বাত, বসু পবিবাব, নববিধান, শেষ পর্যন্ত, ইন্দ্রানী ইত্যাদি।

তুলসী চক্রবর্তী (১৮৯৯—১৯৬১)

জন্মেছিলেন নদীযাব কৃষ্ণনগবে। পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী। অল্পবযসে 'বোসেজ সার্কাস' নামে একটি সার্কাস দলেব সঙ্গে যুক্ত হযে যান। তাবপব কলকাতাব এক অখ্যাত ছাপাখানায কম্পোজিটাবেব চাকবি কবেছেন। জ্যাঠামশাই প্রসাদ চক্রবর্তী ছিলেন থিযেটাবেব সংগীতশিল্পী। তাঁব সূত্রে প্রথম মঞ্চাভিনযেব সুযোগ ঘটে স্টাব বঙ্গমঞ্চে। সেই সূত্রে নিউ থিযেটার্স সংস্থাব সঙ্গে যুক্ত হযে যান। প্রথম অভিনীত ছবি প্রেমাঙ্কুব আতর্থী পবিচালিত 'পুনর্জন্ম'। তাবপব একাধিক ছবিতে দক্ষ চবিত্রাভিনেতা রূপে খ্যাতি পেযেছেন। মঞ্চাভিনযও কবেছেন নিযমিত। বেতাব নাটকেবও নিযমিত শিল্পী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে সংগীত চর্চা কবতেন। সত্যজিৎ বাযেব 'পবশপাথব' এ অবিস্মবণীয অভিনয কবেন। পেশাদাব মঞ্চে নিযমিত অভিনয কবেছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : শ্রীগৌবাঙ্গ, সাড়ে চুযাত্তব, সবাব উপবে, পবশ পাথব, মেজদিদি চাওযা পাওযা ইত্যাদি।

ধীবাজ ভট্টাচার্য (১৯০৫—)

অধুনা বাংলাদেশেব যশোহবে জন্ম। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ কবে আই এস সি পর্যন্ত পডেছিলেন। কলকাতায এসে বসবাস শুরু কববাব সমযে নিজেই ম্যাডান কোম্পানিব সঙ্গে যোগাযোগ কবে একটি নির্বাক ছবিতে অভিনয কবেন। তাবপব চাকবি নেন। পুলিশেব চাকবি। চাকবি কবতে কবতে আবাব যোগাযোগ কবেন ম্যাডান সংস্থাব সঙ্গে। পবিচালক মধু বসুব নির্বাক 'গিবিবালা' ছবিতে নাযকেব ভূমিকায অভিনয কবেন। এবপব একাধিক নির্বাক ছবিতে অভিনযেব পব সবাক ছবিতে অভিনযেব সুযোগ পান। অভিনীত প্রথম সবাক ছবি জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যাযেব 'কৃষ্ণকান্তেব উইল'। মুক্তি পায ১৯৩২ সালে। বাংলা ছবিব প্রণযী নাযক হিসেবে প্রথমে খ্যাতি জনপ্রিযতা অর্জন কবেন। তাবপব একাধিক ছবিতে খলনাযক হিসেবেও খ্যাতি পেযেছেন তিনি। খলচবিত্র অভিনযেব ক্ষেত্রে তিনি অভিনযেব একটি ধাবা সৃষ্টি কবেন। পববর্তী সমযে চবিত্রাভিনযও কবেছেন। ছবিব পাশাপাশি পেশাদাব মঞ্চেব একাধিক নাটকে অভিনয কবেছেন। অভিনীত নাটকেব মধ্যে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' আজও স্মবণীয।

উল্লেখযোগ্য ছবি : পবশমণি, শহব থেকে দূবে, হানাবাড়ি, মবণেব পবে, কঙ্কাল কালোছাযা, ওবা থাকে ওধাবে ইত্যাদি।

নবেশচন্দ্র মিত্র (১৮৯৯—১৯৬৮)

জন্মেছিলেন ত্রিপুবাব আগবতলায। পিতা বঙ্কুবিহাবী মিত্র। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি এ পাশ কবেন। ওকালতি পাশ কবে পাটেব দালালি কবতেন প্রথমে। ছেলেবেলায অ্যামেচাব নাটকে অভিনয কবেছেন। সেই আকর্ষণকে অবলম্বন কবেই পেশাদাবী মঞ্চে যোগ দেন ১৯২০ সালে মিনার্ভা থিযেটাবে। 'চন্দ্রগুপ্ত'তে 'চাণক্য', 'কর্ণার্জুন-এ 'শকুনি', 'সাজাহান' এ 'দিলদাব' কবেন। খ্যাতি হয তাতে। মূলত নাট্যশিল্পী নবেশবাবু পববর্তী সমযে নাট্যশিক্ষক হযে উঠেছিলেন। শেষেব দিকেব উল্লেখ্য মঞ্চাভিনয 'ক্ষুধা' বিশ্বরূপা মঞ্চে। নাটকের পাশাপাশি ছবির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। নির্বাক যুগেব ছবি 'আঁধাবে আলো'তে অভিনয় কবেন প্রথমে। তাবপব 'চন্দ্রনাথ'। ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেট, ম্যাডান কোম্পানি সহ একাধিক চলচ্চিত্র সংস্থাব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একাধিক ছবি পবিচালনা কবেছেন। তাব মধ্যে উল্লেখ্য 'গোরা' 'বউ ঠাকুবানীব হাট' 'অন্নপূর্ণাব মন্দিব' 'স্বযং-সিদ্ধা', 'কঙ্কাল'।

উল্লেখযোগ্য ছবি : গোবা, কালিন্দী, স্বযংসিদ্ধা, অন্নপূর্ণাব মন্দিব, বউঠাকুবানীব হাট ইত্যাদি।

নীতীশ মুখোপাধ্যায় (১৯১৭—১৯৬৫)

নদীয়ার সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। পিতা ভূজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ছেলেবেলা থেকেই গান বাজনা এবং অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল। গান শিখেছেন সংগীত সাধক তারাপদ চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। ম্যাট্রিকুলেশন এবং আই. এ পাশ করেন। পরিচালক প্রফুল্ল বায়েব সঙ্গে

যোগাযোগের সূত্রে 'পরশমণি' ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ ঘটে। তারপর দেবকী বসুর 'চন্দ্রশেখর' সহ বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। মাঝে জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে চাকরিও করেছেন। চাকরি ছেড়ে পুরো সময়ের অভিনেতা হিসেবে কাজ করবার সময়ে পেশাদার মঞ্চেও নিয়মিত অভিনয় করেছেন। স্মরণীয় নাটক 'যুগদেবতা' 'উল্কা' 'আরোগ্য নিকেতন' ইত্যাদি। 'রাঙামাটি' 'পতিব্রতা' ইত্যাদি ছবিগুলিতে স্বকণ্ঠে গান গেয়েছিলেন। 'দ্বীপান্তর' নাটকটি অভিনীত হয় তাঁর নির্দেশনায়।

উল্লেখযোগ্য ছবি : কবি, চন্দ্রশেখর, সাহেব বিবি গোলাম, মরণের পরে, ঢুলী, রাইকমল ইত্যাদি।

নৃপতি চট্টোপাধ্যায় (১৯০৭—)

নারায়ণগঞ্জের এক অখ্যাত গ্রামে জন্মেছিলেন। পড়াশুনায় বেশিদূর এগোতে পারেন নি। তবে বাড়ির আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল বলে চাকরি করতে হত না। বরাবরই ভবঘুরে স্বভাবের ছিলেন। সেই সূত্রেই আচমকা কলকাতায় চলে এসেছিলেন। এক পরিচিত বন্ধুর সহায়তায় পরিচালক সুশীল মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সুশীল মজুমদারের সহকারীর কাজ পান। সেই সঙ্গে তাঁর ছবিতে কাজ করবার সুযোগও। প্রথম অভিনয় করেন অবশ্য ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'দ্বীপান্তর' ছবিতে। উল্লেখ্য চরিত্র চিত্রণ করেন সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা', কমল মজুমদারের 'লুকোচুরি', তপন সিংহের 'নির্জন সৈকতে' ইত্যাদি ছবিতে। তিনি মূলত হাস্যকৌতুক শিল্পী হিসেবেই বাংলা ছবির দর্শকদের কাছে পরিচিত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : কবি, পোস্টমাস্টার, লুকোচুরি, বিন্দু ইত্যাদি।

প্রেমাংশু বসু (১৯২৫)

রাজা মনীন্দ্র স্কুলে পড়তে পড়তে ষোল বছর বয়সে স্কুলের সরস্বতী পুজো উপলক্ষে 'কেদার রায়' নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। বাবাও নাটকপাগল মানুষ ছিলেন। সেটাই অনুপ্রেরণা। প্রথম তারুণ্যে 'শিল্পশ্রী' 'রঙ্গনাট্যম' ইত্যাদি নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ছবিতে অভিনয়ের প্রথম সুযোগ দেন 'আজ প্রোডাকসন্সে'র অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। ছবির নাম 'পাত্রী চাই'। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র করেন 'কেরানীর জীবন' ছবিতে। মঞ্চেও ওই-কাহিনী আশ্রিত নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'পটল'ই করতেন প্রেমাংশুবাবু। ছবিতে 'পটল' প্রশংসিত হয়। তারপর তিনি যুক্ত হন নিউ থিয়েটার্স সংস্থার সঙ্গে। 'বনহংসী' 'নদ ও নদী' ইত্যাদি ছবিতে কাজ করেন। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন নির্মল দের 'চাঁপা ডাঙ্গার বউ', সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ইত্যাদি ছবিতে। একসময়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কাছে নিয়ম করে অভিনয় শেখেন প্রেমাংশুবাবু। বাংলা রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করেছেন। স্টার-এ স্টাফ আর্টিস্ট ছিলেন একটানা একুশ বছর। মিনার্ভা, বিজন থিয়েটার, রঙ্গনাতেও অভিনয় করেছেন। তাঁর নিজস্ব নাট্যগোষ্ঠী আছে 'শ্রীমঞ্চ'। নানান ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক নাটক প্রযোজনা করেছেন শ্রীমঞ্চের পতাকাতলে। অবিবাহিত প্রেমাংশুবাবু এখনও অভিনয় করেন। বেতারেও অভিনয় করেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : কেরানীর জীবন, চাঁপাডাঙার বউ, কুহক, পূরবী প্রিয়তমা, নায়ক ইত্যাদি।

বসন্ত চৌধুরি (১৯২৮)

জন্মেছিলেন নাগপুর শহরে। পিতা সিদ্ধিশচন্দ্র চৌধুরি। ম্যাট্রিকুলেশন এবং বি. এ পাশ করেন। অভিনয় ভালোবাসতেন। সেই সূত্রে পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। প্রথম অভিনয় করেন ছবিতে। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম ছবি 'মহাপ্রস্থানের পথে'। প্রথম ছবি তাঁকে জনপ্রিয় করে দেয়। তারপর বহু ছবি। ছবির পাশাপাশি পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে ক্ষুধা, আরোগ্য নিকেতন, দেনাপাওনা তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক। হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন। অভিনয় করেছেন নট্ট কোম্পানির যাত্রা দলেও। বিজয় বসু পরিচালিত রাজা রামমোহন-এ নাম ভূমিকায় অভিনয় করে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার পান। অভিনয় ছাড়া বিদেশী মুদ্রা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে তিনি প্রচণ্ড আগ্রহী। সংগ্রাহকও। কলকাতার 'শেরিফ' পদে ছিলেন কিছুদিন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্র কেন্দ্র 'নন্দন'-এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : মহাপ্রস্থানের পথে, যদুভট্ট, বসন্তবাহার, দিবারাত্রির কাব্য, রাজা রামমোহন, প্রথম প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি।

বিকাশ রায় (১৯১৬—১৯৮৭)

কলকাতায় জন্ম। পিতা যুগলকিশোর রায়। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবাব পর বি এ বি. এল পাশ কবেন। কিছুদিন ওকালতি করেছেন। নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। শখের নাটকেও অভিনয় করেছেন। চাকরি করেছেন অল ইন্ডিয়া বেডিওতে। রেডিওতে থাকার সময়ে পরিচালক জ্যোতির্ময় রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। সেই সূত্রে 'অভিযাত্রী' ছবিতে প্রথম অভিনয়। দ্বিতীয় ছবি 'ভুলি নাই' খ্যাতি এনে দেয়। তারপর প্রচুর ছবিতে অভিনয় করেছেন। বাংলা ছবিতে খলনায়ক হিসেবে অপরিসীম খ্যাতি পেয়েছেন। নায়ক এবং চরিত্রাভিনয়েও দক্ষতা দেখিয়েছেন। পেশাদারী নাটক চৌরঙ্গী, আসামী হাজির, নহবৎ। 'বিকাশ রায় প্রোডাকশন' এবং 'ছায়াচিত্র পরিষদ' নামের প্রতিষ্ঠান গঠন করে ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন। প্রযোজিত উল্লেখ্য ছবি মরুতীর্থ হিংলাজ, অর্ধাঙ্গিনী, কেরী সাহেবের মুন্সি। পরিচালকও ছিলেন তিনি। সর্বশেষ পরিচালনা 'কাজললতা'। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : বিয়াল্লিশ, ভুলি নাই, মরুতীর্থ হিংলাজ, আরোগ্য নিকেতন, উত্তরফাল্গুনী, ছেলে কার, অন্নদাদিদি শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ, জতুগৃহ, রত্নদীপ ইত্যাদি।

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৭)

মামার বাড়ি গড়পারে। মামাদের আদর্শেই মানুষ হয়েছিলেন। বড় মামা হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগ ছিল 'গড়পার বিশ্বজনীন ক্লাব'-এর। সেখানেই প্রথম জীবনে অভিনয় করেন। অ্যামেচার নাটকে। ছবিতে অভিনয়ের প্রথম সুযোগ করে দেন 'অগ্রগামী' পরিচালক গোষ্ঠীর সরোজ দে। ছবির নাম 'ডাকহরকরা'। ছোট্ট চরিত্র ছিল। নায়ক চরিত্রের সুযোগ প্রথম পান মায়ামৃগ-তে। চিত্ত বসুর 'মায়ামৃগ' সুপার হিট করে। বিশ্বজিৎ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তারপর থেকে বহু বাংলা ছবিতে নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এখনও অভিনয় করছেন। হিন্দি ছবিতে নায়ক হওয়ায় প্রথম সুযোগ দেন সংগীত পরিচালক গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবির নাম 'বিশ সাল বাদ'। পরিচালক ছিলেন বীরেন নাগ। নায়িকা ওয়াহিদা রহমান। সে ছবিও হিট করে। ফলে বিশ্বজিৎ হিন্দি ছবির জগতেও খ্যাতি পান। অনেকগুলি হিন্দি ছবিতেই তিনি নায়ক হয়েছেন। চিত্র পরিচালনাও করেছেন বিশ্বজিৎ। হিন্দিতে 'কহতে হ্যায় মুঝকো রাজা' এবং বাংলায় 'রক্ততিলক' 'অবিচার' 'সোরগোল' ইত্যাদি। বিশ্বজিৎ পেশাদারী মঞ্চেও নিয়মিত অভিনয় করেছেন একসময়ে। প্রথম অভিনয় করেন রঙমহলে 'মায়ামৃগ'। তারপর 'একমুঠো আকাশ', 'এক পেয়ালা কফি' 'সাহেব বিবি গোলাম' 'বিষ' ইত্যাদি। বর্তমানে একাধিক বাংলা হিন্দি ছবির সঙ্গে অভিনেতা হিসেবে যুক্ত রয়েছেন। ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছেন। গানের রেকর্ডও আছে। বিশ্বজিৎ-এর পুত্র প্রসেনজিৎ বাংলা ছবির নায়ক। কন্যা পল্লবীও অভিনেত্রী।

উল্লেখযোগ্য ছবি : 'দাদাঠাকুর', 'শেষ পর্যন্ত', 'দুই ভাই', 'গোধূলিবেলায়', 'রাহগীর', 'বিশ সাল বাদ' ইত্যাদি।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০—১৯৮৩)

জন্মেছিলেন অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। পিতা জীতেন্দ্রনাথ। ভানুবাবুর আসল নাম ছিল সাম্যময়। পড়াশুনা করেছেন ঢাকায়। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তারপর ঘটনাচক্রে চলে আসেন কলকাতায়। ঢাকায় থাকতে অ্যামেচার নাটকে অভিনয় করেছেন একাধিকবার। তাই অভিনয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কিন্তু কলকাতায় এসে প্রথমে চাকরি নেন কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থায়। কলকাতায় যেখানে থাকতেন সেখানে শখের নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত'-তে চাণক্য করেছিলেন। সেই অভিনয়ের সূত্রে ভানুবাবুর সঙ্গে প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার সহকারী বিভূতি চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যায়। যদিও তাঁর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'যা হয় না'। পরিচালক ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। তারপর পাশের বাড়ি, তথাপি ইত্যাদি ছবিতে তিনি অভিনয় করেন সাফল্যের সঙ্গে। প্রথম পরিচিতি পান নির্মল দে-র 'বসু পরিবার'-এ অভিনয় করে।

বাংলা ছবির জনপ্রিয় হাস্যকৌতুক শিল্পী হয়ে ওঠেন কালক্রমে। তাঁর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতেই 'ভানু পেল লটারী', 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' ছবিগুলির নামকরণ হয়েছিল। বহু হাসির ছবির নায়কও হয়েছেন। ছবির পাশাপাশি মঞ্চেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। উল্লেখ্য মঞ্চাভিনয় 'জয় মা কালী

বোর্ডিং'। যাত্রাতেও অভিনয় করেছেন। ছবি এবং যাত্রা প্রযোজনাও করেছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, সাড়ে চুয়াত্তর, বসুপরিবার, ভ্রান্তিবিলাস, পার্সোনাল অ্যাসিসট্যান্ট, নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে, হরিলক্ষ্মী ইত্যাদি।

মলিনা দেবী (১৯১৬—১৯৭৭)

নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মেছিলেন, তাই ছোট থেকেই অভিনয় জগতে আসতে হয়েছিল। প্রথম জীবনে ছিলেন মঞ্চের নৃত্যশিল্পী। সখীর নাচের শিল্পী থেকে নিজের চেষ্টায় অভিনয় শেখেন। 'মিনার্ভা', 'মন মোহন থিয়েটার', 'স্টার' মঞ্চে অভিনয় করেছেন পরপর। মঞ্চের পাশাপাশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। প্রথম কাজ করেন ম্যাডান কোম্পানির 'চাষার মেয়ে' ছবিতে। সে ছিল নির্বাক যুগ। তারপর তিনি যোগ দেন নিউ থিয়েটার্সে। নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় তৈরি 'চিরকুমার সভা' মলিনা দেবী অভিনীত প্রথম সবাক ছবি। তারপর একাধিক নাটক এবং ছবিতে অভিনয় করেছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর অভিনয় করা 'রানী রাসমণি' চরিত্র অসাধারণ জনখ্যাতি পায়। ছবিতে তো বটেই, মঞ্চেও তিনি রানী রাসমণি চরিত্র করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। মলিনা দেবী অভিনীত উল্লেখ্য নাটক হল 'যুগদেবতা', 'বিপ্রদাস', 'নিষ্কৃতি' ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে তিনি অভিনেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রযোজনা সংস্থা গড়ে তোলেন। শিল্পী মলিনা দেবী সংগীত নাটক অ্যাকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। গিরীশ সংসদ তাঁকে 'নাট্যসম্রাজ্ঞী' উপাধিতে ভূষিত করে। হিন্দি এবং বাংলা একাধিক ছবির সফল অভিনেত্রী মলিনা দেবী জলু বড়ালকে বিবাহ করেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : মাতৃহারা, রজত জয়ন্তী, শহর থেকে দূরে, মাটির ঘর, রানী রাসমণি, একটি রাত, সাড়ে চুয়াত্তর ইত্যাদি।

মঞ্জু দে (১৯২৬-১৯৮৯)

জন্ম বহরমপুরে। পিতা অমরেন্দ্রলাল মিত্র। বি. এ পাশ করেন আশুতোষ কলেজ থেকে। অল্পবয়স থেকে সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিচালক সুশীল মজুমদারের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে প্রথম অভিনয় করেন হিন্দি ছবি 'সিপাহী কা স্বপ্না'য়। প্রথম অভিনীত বাংলা ছবি হেমেন গুপ্তের দেশাত্মবোধক 'বিয়াল্লিশ'। প্রথম ছবির সূত্রেই খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা। তারপর বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন নায়িকা এবং চরিত্রাভিনেত্রী হিসেবে। তপন সিংহ পরিচালিত একাধিক ছবির যৌথ প্রযোজক ছিলেন। ছবিগুলি হল অঙ্কুশ, টনসিল ইত্যাদি। ছবি ব্যতীত পেশাদার মঞ্চে নাটকে অভিনয় করেছেন। অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক চৌরঙ্গী, ব্যাভিচার ইত্যাদি। যাত্রায় অভিনয় করেছেন। স্মরণীয় অভিনয় করেন বীরসেন নির্দেশিত 'বিশ্ববন্দিতা ইন্দিরা'য়। নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ছবি পরিচালনা করেছেন। পরিচালিত ছবি অভিশপ্ত চম্বল, সজারুর কাঁটা। অভিনয়ের বাইরে কমনওয়েলথ মোটরিং কনফারেন্সের প্রতিনিধিত্ব করেন আন্তর্জাতিক আসরে। বিদেশে যান।

উল্লেখযোগ্য ছবি : বিয়াল্লিশ, জিঘাংসা, কার পাপে, কল্যাণী, পরেশ, অভিশপ্ত চম্বল, কাবুলীওয়ালা ইত্যাদি।

মহুয়া রায়চৌধুরি (১৯৫৮—১৯৮৫)

জন্ম কলকাতায়। পিতার নাম এন. রায়চৌধুরি। তিনি একসময়ে ছিলেন চলচ্চিত্র সম্পাদক। স্কুলে পড়বার সময়েই চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেই সময়েই গায়িকা বনশ্রী সেনগুপ্তর সহায়তায় পরিচালক তরুণ মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তরুণ মজুমদার তাঁর পরিচালনার ছবি 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'-এ নায়িকার ভূমিকায় মহুয়াকে নির্বাচিত করেন। মহুয়া নামকরণটি তরুণবাবুর করা। মহুয়ার প্রকৃত নাম শিপ্রা। প্রথম ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭৩ সালে। 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' জনপ্রিয় হওয়ায় মহুয়াও খ্যাতি পান। তারপর অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন। পরিচালক তপন সিংহের টেলিফিল্ম 'আদমি আউর আওবত'-এ স্মরণীয় অভিনয় করেন। পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করেছেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যু ঘটে মহুয়ার। স্বামী অভিনেতা তিলক চক্রবর্তী।

উল্লেখযোগ্য ছবি : শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, অনুরাগের ছোঁয়া, দাদার কীর্তি, বেহুলা লখীন্দর, অভিমান, আজ কাল পরশুর গল্প, আদমি আউর আওরত (হিন্দি) ইত্যাদি।

রাজলক্ষ্মী দেবী (বড়) (১৯০২—১৯৭২)

তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের মীরাটে জন্ম। ছোটবেলা থেকেই মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। পরবর্তী সময়ে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সংস্পর্শে আসেন। প্রথম খ্যাতি আসে রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে অভিনয় করে। কলকাতার বিখ্যাত পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘদিন। অভিনীত উল্লেখ্য নাটক গোরা, বঙ্গেবর্গী, প্রফুল্ল ইত্যাদি। প্রথম অভিনীত ছবি 'পল্লীসমাজ'। দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় হিন্দি 'পুরাণ ভকত' ছবিতে অভিনয় করেন। বাংলা ব্যতীত হিন্দি উর্দু ইত্যাদি ভাষার ছবিতে একাধিকবার অভিনয় করেছেন। ছোট থেকে সংগীতচর্চা করেছেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে গান গেয়েছেন। তাঁর গাওয়া গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। মূলত বাংলা ছবির চরিত্রাভিনেত্রী হিসেবেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : বামের সুমতি, অভিজ্ঞান, কবি, লুকোচুরি, জীবন জিজ্ঞাসা ইত্যাদি।

রেণুকা রায় (—১৯৬৮)

জন্ম কলকাতায়। ছোট থেকেই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। মঞ্চে সখীর দলে নাচতেন। ব্যালেনাচের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিনেত্রী উমাশশী দেবীর সাহায্যে শিল্পী জীবন গড়ে তোলেন। মঞ্চে অভিনয় করতে করতে পরিচালক রমেশ দত্তর 'খাসদখল' ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন। খ্যাতি পান নরেশ মিত্র পরিচালিত 'মহানিশা'য় অভিনয় করে। একাধিক ছবিতে নায়িকা হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে বহু বাংলা ছবিতে খল চরিত্রে অভিনয় করেন। বাংলা ছাড়া হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : মহানিশা, শহর থেকে দূরে, ঠিকাদার, মেজদিদি, শেষ অঙ্ক, তরুণের স্বপ্ন, আরজু (হিন্দি) ইত্যাদি।

শ্যাম লাহা (১৯১১—)

কলকাতায় জন্ম। পিতার নাম যদুনাথ লাহা। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক তিমিরবরণের দলে যোগ দেন বাদ্যযন্ত্রী হিসেবে। সেই সূত্রে লক্ষ্ণৌ পৌঁছে পরিচয় হয় পাহাড়ী সান্যালের সঙ্গে। সুযোগ পেয়ে নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম অভিনীত ছবি দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'চণ্ডীদাস'। 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে অভিনয় করে পরিচিতি পান। তারপর কৌতুক অভিনেতা হিসেবে একাধিক বাংলা হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত 'কালোছায়া' ছবির একটি চরিত্রে অভিনয় করে চরম খ্যাতি পান। দুটি ছবি প্রয়োজনাও করেছেন। ছবির নাম ভোলামাস্টার, ভুলের শেষে।

উল্লেখযোগ্য ছবি : মানিকজোড়, লাখ টাকা, কালোছায়া ইত্যাদি।

সন্তোষ সিংহ (১৮৯৮—১৯৮২)

জন্ম কলকাতায়। পিতা কালিপ্রসন্ন সিংহ। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। চাকরি নেন তারপর। চাকরি বাঁচিয়েই আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন। অভিনয় করেন 'কর্ণার্জুন' নাটকে। একসময়ে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। একাধিক মঞ্চসফল নাটকে অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য নাটক ঋষির প্রেম, আলিবাবা, রাজসিংহ, চিরকুমার সভা ইত্যাদি। প্রথম ছবিতে অভিনয় করেন অহীন্দ্র চৌধুরি পরিচালিত 'কৃষ্ণসখা' ছবিতে। সেটি নির্বাক ছবি। প্রথম অভিনীত সবাক ছবি 'যমুনা পুলিনে'। অভিনয়ের পাশাপাশি হয়ে উঠেছিলেন নাট্য শিক্ষক।

উল্লেখযোগ্য ছবি : ব্যবধান, বাংলার মেয়ে, মানে না মানা, বিদ্যাসাগর, দেশের দাবী, জিঘাংসা, জয় বাবা ফেলুনাথ ইত্যাদি।

সন্ধ্যারাণী (১৯২৫—)

জন্ম কলকাতায়। প্রকৃত নাম 'আঙুর'। ওই নামেই প্রথম ছবিতে অভিনয় করেন। সে ছবির নাম ছিল 'বেকার নাশন'। পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান অল্পবয়সেই। মূলত নৃত্যশিল্পী হিসেবে অভিনেত্রী জীবন শুরু করেন। পরিচালক নরেশ মিত্র 'বাংলার মেয়ে' ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ করে দেন। সেই ছবি থেকেই পরিচিতি। তারপর একাধিক ছবি। অসিতবরণ পরেশ ব্যানার্জির বিপরীতে জুটি

বেঁধে একাধিক হিট সুপার হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে উত্তমকুমারের নায়িকা হয়েছেন একাধিক ছবিতে। ষাটের দশক থেকেই চরিত্রাভিনয়ে আত্মনিয়োগ করেন। চরিত্রাভিনেত্রী হিসেবেও একাধিক ছবিতে সুঅভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : স্বপ্ন ও সাধনা, সাত নম্বর বাড়ি, মানে না মানা, পরিণীতা, ব্রতচারিণী, মা, সমাধান, নিরুদ্দেশ ইত্যাদি।

সুচিত্রা সেন (১৯২৯)

জন্ম পাটনা শহরে মামার বাড়িতে। পিতা করুণা দাশগুপ্ত। আসল নাম রমা। ডাক নাম কৃষ্ণা। স্বামী দিবানাথ সেনের উৎসাহে ছবিতে অভিনয়ের কথা প্রথম চিন্তায় আসে। পরিচালক বীরেশ্বর বসুর 'শেষ কোথায়' ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন। সে ছবি অনেক পরে সুচিত্রা সেনের অর্ধসমাপ্ত ভূমিকা নিয়ে 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' নামে মুক্তি পায় ১৯৭৪ সালে। 'শেষ কোথায়'-এর সময়েই নীরেন লাহিড়ীর 'কাজরী', সুকুমার দাশগুপ্তের 'সাত নম্বর কয়েদি' ছবিতে অভিনয়েব সুযোগ পান। প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'সাত নম্বর কয়েদি'। মুক্তি পায় ১৯৫৩ সালে। একই বছরে নির্মল দের 'সাড়ে চুয়াত্তর' মুক্তি পায়। সাড়ে চুয়াত্তর-এ প্রথম উত্তম-সুচিত্রা একসঙ্গে জুটি বাঁধেন। এই জুটি অসাধাবণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে অগ্রদূতের 'অগ্নিপরীক্ষা' মুক্তি পাওয়ার পর। উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন কিংবদন্তী জুটির মোট ছবির সংখ্যা তিরিশ। বাংলা ছবির পাশাপাশি হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছেন। উল্লেখ্য হিন্দি ছবি দেবদাস, মমতা, আঁধি ইত্যাদি। একাধিকবার পুরস্কাব পেয়েছেন। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশান পুরস্কৃত করেছে একাধিকবার। মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে অজয় করের 'সাত পাকে বাঁধা' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। সেটা ১৯৬৩ সাল। ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' লাভ করেছেন। স্বকণ্ঠে গাওয়া গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে একদা। স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে অভিনয় জগৎ থেকে দূরে সরে রয়েছেন এখন। একমাত্র কন্যা মুনমুন সেনও অভিনেত্রী।

উল্লেখযোগ্য ছবি : অগ্নিপরীক্ষা, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, সপ্তপদী, সাত পাকে বাঁধা, দীপ জ্বেলে যাই, উত্তরফাল্গুনী, দেবদাস (হিন্দি) এবং আঁধি (হিন্দি) ইত্যাদি।

সুমিত্রা দেবী (১৯২৩—১৯৯০)

জন্ম বীরভূমের সিউড়িতে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে বলে অল্পবয়সে বিবাহ হয়ে যায়। ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকার সময়েই পরিচালক অপূর্ব মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যায়। সেই সূত্রে ওই পরিচালকের 'সন্ধি' ছবিতে নায়িকার চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান। পারিবারিক বাধাকে সরিয়ে অভিনেত্রী জীবন বেছে নেন। প্রথম ছবিই জনপ্রিয়তা এনে দেয়। অভিনেতা দেবী মুখোপাধ্যায়কে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তারপর একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। বাংলা হিন্দি দু ভাষার ছবিতেই অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন। প্রথম ছবিতে অভিনয় করে বি. এফ. জে. এ. পুরস্কার পেয়েছিলেন। বাংলা ছবিতে সুন্দরী অভিনেত্রী হিসেবে এক সময়ে কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : সন্ধি, পথের দাবী, স্বামী, সাহেব বিবি গোলাম, সমর (হিন্দিতে 'মশাল') ইত্যাদি।

স্বপনকুমার (১৯৩৩)

জন্মেছিলেন কাঁচড়াপাড়ায়। পোশাকি নাম সনৎকুমার। পিতা অবনীমোহন। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কিছুদিন কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন। সখের নাটকের প্রতি আগ্রহ ছিল। প্রেমাংশু বসুদের নাটকের দলে অভিনয় করেছেন। পেশাদার হিসেবে প্রথম অভিনয় আর্য অপেরার হয়ে। পালার নাম ব্রজেন দের 'বাঙালি'। তারপর একাধিক যাত্রাপালায় অভিনয় করেছেন। যাত্রার জগতে জনপ্রিয়তম ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। অভিনীত উল্লেখ্য পালা স্ত্রী, মাইকেল মধুসূদন, সপ্তপদী, তামসী ইত্যাদি। যাত্রার পাশাপাশি ছবিতেও অভিনয় করেছেন। প্রথম ছবি উত্তমকুমার পরিচালিত শিল্পী সংসদ নিবেদিত 'বনপলাশির পদাবলী'। তারপর সন্ন্যাসী রাজা, রাজবংশ, আমি সে ও সখা, শঙ্খবিষ, ইত্যাদি ছবিতে অভিনয় করেছেন। পেশাদারী মঞ্চেও অভিনয় করেছেন। একাধিক পালার নির্দেশক ছিলেন।